দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা

জুল ভের্ন অমনিবাস

অনুবাদ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জুল ভের্ন অমনিবাস

দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা

জুল ভের্ন (১৮২৮-১৯০৫)

জুল ভের্ন অমনিবাস

২

দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা

অনুবাদ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ ১৩৯৯
নভেম্বর ১৯৯২

স্বত্ব :
কৌশল্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

I S B N – 81-7079-221-5

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রহণ :
অরিজিৎ কুমার
লেজার ইম্পেসন্স
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক :
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সত্তর টাকা

কত-যে বিচিত্র

এটা অনেক সময়েই দেখা যায় যে কোনো লেখক যদি বিশেষ-কোনো-এক ধরনের লেখা লিখে পাঠকদের মন জয় ক'রে থাকেন, তাহ'লে অনবরত প্রকাশকের কাছ থেকে ঠিক সেই ধরনেরই আরেকখানা লেখা তৈরি ক'রে দেবার জন্যে তাগাদা আসে : 'ঐ-রকমই আরেকখানা বই লিখে দিন আমাদের, মঁসিয় ভের্ন।' এবং, অনেক সময়েই, যদি লেখকের ইচ্ছে না-থাকে ও-রকম আরেকখানা বই লিখবার, নিজেকে যদি তিনি পুনরাবৃত্তি করতে না-ও চান, যদি মনে হয় নিজের সাফল্যের চর্বিতচর্বণের চাইতে বরং নতুন-কোনো উদ্ভাবনের দিকে নজর দেয়া উচিত, তবু অনেক সময় উপরোধে—লোকে তো উপরোধে ঢেঁকিও গেলে—প'ড়ে লেখককে আবার আগেকার বইয়েরই মতো আরেকটা বই লিখে দিতে হয়, বিশেষত লেখাই যদি তাঁর জীবিকা হয়, আর জীবিকা নির্বাহের জন্যে প্রকাশকের মন জুগিয়ে চলা যদি অনেক সময়েই জরুরি হ'য়ে পড়ে। যাঁরা সমগ্র জ়ুল ভের্ন তন্নতন্ন ক'রে পড়েছেন—এবং তেমন পণ্ডিতের খুব-একটা অভাবও নেই পৃথিবীতে—তাঁরা তখনও লক্ষ করেছেন জ়ুল ভের্ন কিন্তু সত্যি-সত্যি কখনোই পুরোপুরি নিজের চর্বিতচর্বণ করেননি — আরেকখানা ও-রকম বই লিখতে গিয়েও এমন-সমস্ত চমক ও বিস্ময়ের অবতারণা করেছেন যা নতুন লেখাটিকে আগের লেখার সঙ্গে অনেক মিল সত্ত্বেও একেবারে *নতুন* ক'রে দিয়েছে। শুধু-যে নিজের লেখাকেই খোলনলচে পালটে নতুন ক'রে উপস্থাপিত করতে হয়েছে তা-ই নয় — অনেক সময় আরো-সব বিখ্যাত লেখারও মজার-মজার প্যারডি বা লালিকা লিখেছেন।

জ়ুল ভের্ন-এর আমলে অনেকের লেখাই পাঠকের হাতে-হাতে ঘুরতো। এমন অনেক বিখ্যাত লেখক ছিলেন, জ়ুল ভের্ন নিজেও তাঁদের খুব পছন্দ করতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও তিনি ভাবতেন যে তিনি নিজে যদি লেখাটি আবার লিখতে সুযোগ পান তবে তাকে তিনি নিশ্চয়ই অন্যরকমভাবে লিখতেন। তাঁর ভালো লাগতো আলেক্সাঁদ্র দ্যুমা, এডগার অ্যালান পো, ওয়ালটার স্কট, ইয়োহান হ্বিস, ডানিয়েল ডিফো—আর নিশ্চয়ই স্বয়ং জ়ুল ভের্নকেও। এই কথাটি মনে রাখলেই আমরা বুঝতে পারবো তাঁর দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালায় কেবলমাত্র কল্পবিজ্ঞান কাহিনীই ছিলো না, ছিলো অনেক ধরনেরই অ্যাডভেনচার উপন্যাস : সমসাময়িক ইতিহাসকে জড়িয়েই অনেক কাহিনী ফাঁদতেন জ়ুল ভের্ন, বিশেষ ক'রে ইওরোপের বাইরে নানান মহাদেশে এত-যে এবং কত-কী রুদ্ধশ্বাস ও রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘ'টে যাচ্ছে তা তাঁর মনের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলতো; ফলে বারে-বারেই পটভূমি বদলে যেতো তাঁর লেখায় : কখনও আফ্রিকা, কখনও অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড, কখনও-বা

আমেরিকা (উত্তর ও দক্ষিণ—দুইই), তাছাড়া এশিয়া তো আছেই—বিশেষ ক'রে চিনদেশ আর ভারতবর্ষ। তাঁর কল্পবিজ্ঞান কাহিনীতে তিনি কখনও আমাদের নিয়ে গেছেন সমুদ্রের তলায়, কিংবা আকাশের অসীমে—তাঁর সঙ্গে আমরা গেছি পৃথিবীর তলায়—একেবারে কেন্দ্রে, অথবা কামানের গোলায় চেপে (এ-কালে লিখলে তা হ'তো রকেট—কামানের বদলে থাকতো অন্য কোনোরকম উৎক্ষেপক) চাঁদের দিকে, কিন্তু সেই সঙ্গে মাটির পৃথিবীরও কোনো কোনা বাকি থাকেনি, অজানা থাকেনি আমাদের। এমনকী আমরা চেনা সমুদ্রের মধ্যে নাম-না-জানা কত-যে অজ্ঞাত আজব দ্বীপে গিয়েও হাজির হয়েছি!

কত জায়গার তাজ্জব সব কাহিনী লিখেছেন জুল ভের্ন, তাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রধানত বই প'ড়ে, ভূগোল আর প্রকৃতিবিদ্যার বই আর ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি যেন গুলে খেয়েছিলেন। এবং মার্কো পোলো বা মাঙ্গো পার্ক বা ক্রিস্তোবাল কোলোন তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তে অনেক আজগুবি বেঘোরবিভ্রমের কথা লিখলেও—কিংবা নিছক গুলগাপ্পা দিয়ে পাঠকদের বিস্ময় উদ্রেক ক'রে দিতে চাইলেও—জুল ভের্ন কিন্তু জীবজন্তু, গাছপালা, ঋতুচক্রের বর্ণনায় যতদূরসম্ভব পণ্ডিত ও গবেষকদের নির্ভরযোগ্য বইয়েরই আশ্রয় নিতেন। তিনি নিজে সে-সব দেশ চোখে দ্যাখেননি ব'লেই, সে-সব দেশকে যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য ক'রে দেখাবার দায় ছিলো তাঁর। 'নিজের চোখে দেখেছি' এই ব'লে বড়াই ক'রে যত গুল দেয়া যায়, নিজের চোখে না-দেখলে কিন্তু আদপেই তেমনভাবে চোখেমুখে অবিশ্রাম বানানো কথা ব'লে যাওয়া যায় না।

অর্থাৎ, তৎকালীন জ্ঞানবিজ্ঞান যা-যা তথ্য (অথবা সত্য) ব'লে মেনে নিতো জুল ভের্ন তা-ই শুধু ব্যবহার করতেন তাঁর বর্ণনায়। কিন্তু রহস্য পাকানো মানে তো দুটি গল্প লেখা। একটাতে দমআটকানো সব পাকিয়ে-যাওয়া জট, অন্যটায় তাকেই খুলে দেয়া—ঘটনার পর ঘটনায় রহস্য জমিয়ে, সাজিয়ে, ক্রমাগত চমকে দিতে-দিতে কাহিনী নিয়ে এগুনো—শেষটায় বিস্ময়কর কোনো তথ্যের অপ্রত্যাশিত উদ্‌ঘাটন ক'রে সব জট খুলে দিয়ে তাক লাগিয়ে দেয়া হবে—এ যেন কোনো বাজিকরের মতোই করতে পারতেন জুল ভের্ন। ঘটনা আর চরিত্রকে নিয়ে যেন সহাস্যে লোফালুফি খেলতেন, যেমন ভাবে ওস্তাদ কোনো বাজিকর বল নিয়ে লোফালুফি খেলে।

এককালে বিজ্ঞান ছিলো ভরসার স্থল, মানুষের বন্ধনমুক্তির উপায়—অন্তত জুল ভের্ন-এর তা-ই মনে হ'তো গোড়ায়; কিন্তু বিজ্ঞানকে সমাজ, সরকার বা কোনো-কোনো মানুষ যেভাবে ব্যবহার করছিলো তা দেখে হতশ্রদ্ধায় জুল ভের্ন লজ্জায় অধোবদনও হ'য়ে যাচ্ছিলেন। তবু, শেষ পর্যন্ত, মানুষ বা মানুষের প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর থেকে সমস্ত বিশ্বাস হারাতে তিনি রাজি হচ্ছিলেন না। মানুষ মারণকল বানাতে পারে, তবে এই কলের প্রয়োগ কে করবে, কেমন ক'রে, তাও তো মানুষেরই ভেবে নেয়া উচিত।

অথচ এ-সব হিংটিংছট হাতকামড়ানো প্রশ্ন না-ক'রে মজা মেশানো রুদ্ধশ্বাস

রহস্য-অ্যাডভেনচার লিখতেই যে তিনি বেশি ভালোবাসতেন তারই নজির বেশি পাই তাঁর লেখায়। কিন্তু যে-বৈচিত্র্য তাঁর প্রত্যেকটি নতুন লেখাকে আগ্রহে ও প্রত্যাশায় পাঠককে উদ্‌গ্রীব ক'রে রাখতো, সেই বৈচিত্র্যেরই সন্ধান দেবার জন্যে এই অমনিবাস গ্রন্থমালার পরিকল্পনা। কত ধরনের অ্যাডভেনচারের কথাই যে ভেবেছিলেন জুল ভের্ন, আর কেমন ওস্তাদের মতো সে-সব নিয়ে খেলা ক'রে গেছেন তারই ইঙ্গিত রইলো এখানে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯
তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : কলকাতা ৭০০ ০৩২

এ ড্রামা ইন লিভোনিয়া
দ্য স্কুল ফর রবিনসন্‌স
ট্রিবুলেশন্‌স অভ এ চাইনিজ জেণ্টলম্যান
দ্য লাইটহাউস
মাস্টার জাকারিয়ুস

এ ড্রামা ইন লিভোনিয়া

১

সীমান্তরেখা

আস্ত কালো রাতটায় লোকটি ছিলো একা।

দীর্ঘ শীতকাল ধরে বরফের স্তূপগুলো জমেছে একের পর এক, আর তারই উপর দিয়ে সে দৌড়ুচ্ছে নেকড়ের মতো মরীয়া ও হন্যে। কনকনে হাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সে পরেছে ডবল-পুরু কাপড়ের পাৎলুন আর কাফতান আর কানঢাকা টুপি—কিন্তু ছুরির ফলার মতো হিম হাওয়া তবু মাঝে-মাঝে গায়ে বিঁধে যাচ্ছে। তার ঠোঁট আর হাত দুটি নীলবর্ণ হ'য়ে আছে, আঙুলের ডগাগুলোয় কোনো সাড় নেই। মিশকালো অন্ধকারের মধ্যে তবু সে সারাক্ষণ জোর ক'রেই এগুচ্ছে; মাথার উপরে ঝুলে আছে ভারি নিচু মেঘ, হয়তো এক্ষুনি আবার শুরু হ'য়ে যাবে তুষারঝুরি। সময়টা এপ্রিলের গোড়ার দিক, কিন্তু জায়গাটা আটান্ন ডিগ্রিতে। কিছুতেই থামবে না—এটাই তার পণ, কারণ পরে হয়তো আর কখনো সে এক পা-ও এগুতে পারবে না।

রাত এগারোটা নাগাদ অবিশ্যি সে থামলো একবার। তার কারণ এই নয় যে তার পা দুটি তাকে আর বহন করতে পারছিলো না, কিংবা তার দম ফুরিয়ে এসেছিলো, অথবা অবসাদে সে প্রায় নেতিয়ে পড়েছিলো। তার বুকের জোর যতটা, শরীরেরও ততটাই। একবার কেবল সে চেঁচিয়ে বললে; 'শেষকালে সত্যিই সীমান্ত...লিভোনিয়ার সীমান্ত...আমার দেশের সীমান্তরেখা!'

তার পায়ের কাছেই পশ্চিমে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর—হাত বাড়িয়ে সে একবার অভিবাদন ক'রে নিলে সেই বিশাল বরফ-ঢাকা মাটিকে। তারপর শাদা তুষারঝরা মাটির উপর চাপ দিয়ে-দিয়ে সে হাঁটতে লাগলো—যেন এখানে সে চিরকালের উদ্দেশে তার পায়ের ছাপ রেখে যেতে চায়।

অনেক দূর থেকে এসেছে সে—হাজার-হাজার মাইল পেরিয়ে। সাহসে ভর ক'রে সে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে পথের বিপদের, তুচ্ছ করেছে সে সমস্ত ভয় আর আতঙ্ক, তার সহ্যশক্তি নাড়া খায়নি কিছুতেই। পুরো দু-মাস ধ'রে সে সূর্যাস্ত লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসছে, পেরিয়ে এসেছে অনন্ত স্তেপি, কশাকদের পাহারা এড়াবার জন্যে কতবার যে নানা কষ্টের মধ্যে দিয়ে ঘোরাপথে ছুটতে হয়েছে তাকে, উঁচু পাহাড়ের বন্ধুর ঘোরানো গিরিখাত পেরিয়েছে সে নির্ভীক ও একাগ্রভাবে, এমনকী রুশ সাম্রাজ্যের একেবারে মাঝখানেও যেতে সে পেছ্-পা হয়নি, যদিও জানে যে সেখানে কড়া পাহারা আছে পুলিশের। একবার মুখোমুখি পড়লেই তার প্রাণ যেতো, কিন্তু অবশেষে দৈবের দয়াতেই সে পেরিয়ে এসেছে তাদের, আর তারপর এখন আবেগভরা গলায় শুধু ব'লে উঠেছে 'সীমান্ত...লিভোনিয়ার সীমান্ত!'

২

অত বছর পরে, অবশেষে, সে কি তাহ'লে ফিরে আসছে আতিথ্যেভরা তার দেশের মাটিতে? আর তবে তার কিছু ভয় নেই? তার নিরাপত্তার কোনো বিঘ্ন নেই আর? বন্ধুরা অপেক্ষা ক'রে আছে তার জন্য? স্নেহে দু-হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে নেবে ব'লে কি অপেক্ষা ক'রে আছে আত্মীয়পরিজন? তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা কি রয়েছে এখানে? উৎকণ্ঠায় ভ'রে গিয়ে উদগ্রীবভাবে প্রতীক্ষা ক'রে আছে তারই ফিরে আসার জন্য? না কি আচমকা হাজির হ'য়ে প'ড়ে সব্বাইকে সে তাক লাগিয়ে দিতে চাচ্ছে? কাউকেই হয়তো সে জানায়নি যে সে এত শীগগির ফিরে আসবে?

না। এর কোনোটাই নয়। এটা কেবল তার আরো-দূরে পালাবার পথের রাস্তা। সবচেয়ে কাছের সমুদ্রবন্দরে গিয়ে পৌঁছুতে চাচ্ছে সে, যেখানে গিয়ে কারু মনে কোনো সন্দেহ না-জাগিয়ে সে একটা জাহাজ ধরতে পারবে। লিভোনিয়ার উপকূল পিছনের দিগন্তে মিলিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই, তার নিরাপত্তা নেই।

'সীমান্ত!' দেখেই সে ব'লে উঠেছিলো। কিন্তু এ কী ধরনের সীমান্ত? কোনো চিহ্ন নেই, যা দেখে বোঝা যায়। নেই কোনো খুঁটি, জলের ধারা বা গিরিশ্রেণী; এমনকী কোনো জঙ্গলও নেই। তাহ'লে কি কেবল একটা কল্পিত রেখা দিয়েই দেশ দুটি ভাগ করা? কোনো প্রাকৃতিক বিভাজক নেই দু-দেশের মধ্যে?

রুশ সাম্রাজ্য আর তিনটি বলটিক দেশের সীমান্ত এটা। বলটিক দেশ তিনটি হ'লো এস্‌তোনিয়া, লিভোনিয়া ও কুরল্যাণ্ড। লেক পেইপুসকে উত্তরে দক্ষিণে ভাগ ক'রে গেছে সীমান্ত—শীতকালে তার তল থাকে নিরেট, তুষারজমা; আর গ্রীষ্মকালে তরল, স্রোতোময় জলধারা গর্জায়।

+

বয়েস তার চৌত্রিশ; ঢ্যাঙা, শক্ত গড়ন, বুকের খাঁচা মস্ত, পেশিবহুল, পা ফেলার ভঙ্গিতে ব্যক্তিত্বের ছাপ। কানঢাকা টুপির তলায় ঘন সোনালি দাড়ি দেখা যাচ্ছে—হাওয়ায় যখন টুপির কানা মাঝে-মাঝে স'রে যায়, দেখা যায় উজ্জ্বল দুটি জ্বলন্ত চক্ষু—সেই হিম ঝড়েও তাদের দীপ্তি একফোঁটাও কমেনি। চওড়া কোমরবন্ধের আড়ালে গোঁজা একটা ছোট্ট চামড়ার থলি, তাতেই তার যথাসর্বস্ব—কেবল কয়েকটা কাগজের নোট, কয়েকটাই মাত্র রুবল—দূরে কোথাও যাবার খরচ তাতে কিছুতেই কুলোবে না। আর যা জিনিশ আছে তার কাছে,তা হ'লো একটা ছ-ঘড়া রিভলবার, চামড়ার খাপে মোড়া একটা ধারালো ছুরি, একটা থলিতে সামান্য-কিছু খাদ্য, একটা ফ্লাস্ক ভর্তি মদ, একটা শক্ত ছড়ি। খাবারের থলি, ফ্লাস্ক, টাকার থলি—এ-সব তার কাছে অস্ত্রগুলোর মতো তত দামি মনে হয় না। নেকড়েরা কিংবা পুলিশের লোক আক্রমণ করলে এগুলো সে ব্যবহার করবে ব'লে ঠিক ক'রে আছে। সারাদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকে সে, কেবল রাতেই বেরোয় রাস্তায় : ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রণালী বা বলটিক সাগরের কোনো একটা বন্দরে গিয়ে পৌঁছুতে হবে তাকে, পৌঁছুতে হবে সকলের অগোচরে। কোনো পাস্‌পোর্ট নেই তার, তবু এই বিপজ্জনক দীর্ঘ পথ এ-পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই পেরিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু তীরের কাছে পৌঁছুলে কাজটা এত সহজ হবে ব'লে মনে হয় না—সেখানে পাহারা আরো কড়া, সেখানে সঙিন উঁচনো লোক দাঁড়িয়ে আছে তারই অপেক্ষায়।

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে এই ফেরার মানুষটার কথা এতক্ষণে সর্বত্র র'টে

গিয়েছে—তার নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে এতক্ষণে, কিন্তু রাজনৈতিক বন্দী না নিছক আইন-ভাঙিয়ে হিশেবে তার নামে খোঁজ-খোঁজ রব প'ড়ে গেছে, তা সে জানে না। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই ঠিক যে পুলিশ তাকে হন্যে হ'য়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এতদিন ধ'রে দৈব তার উপর ছিলো প্রসন্ন, কিন্তু এই লিভোনিয়ার সীমান্তে অদৃষ্ট যদি তাকে ছেড়ে যায়, তাহ'লে তার সব আশাই বন্দরের জলে ডুবে যাবে।

কিন্তু কে সে? কে এই ফেরারি?

গ্রীষ্মকালে লেক পেইপুসে মাঝে-মাঝে ভিড় করে জেলেডিঙি আর মালের নৌকো। কিন্তু এই অক্ষরেখায় বসন্ত আসে দেরি ক'রে —হ্রদটা এখন আর নৌচালনার যোগ্য নয় —এখন হ্রদের উপর দিয়ে সদলবলে সাঁজোয়া গাড়িশুদ্ধু অনায়াসেই এক গোলন্দাজবাহিনী পেরিয়ে যেতে পারে, কারণ দীর্ঘ শীতকালের ঠাণ্ডায় সব জল জ'মে নিরেট বরফ হ'য়ে গেছে। কোনো মস্ত সমতলের মতো ধবল-কঠিন প'ড়ে আছে আস্ত হ্রদটা—আর বরফের চাঙড়গুলো প'ড়ে আছে জড়াজড়ি ক'রে, স্তূপের মতো।

ফেরারি চলেছে এই ভীষণ তুষারবনের মধ্য দিয়েই। কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না তার, নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত পায়ের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এই তল্লাটটা বুঝি তার চেনা : সকাল হবার আগেই সে হ্রদের পশ্চিম তীরে পৌঁছে যাবে।

'এখন রাত দুটো বাজে,' মনে-মনে সে হিশেব করছিলো, 'আরো কয়েক মাইল গেলেই ওখানে কোথাও নিশ্চয়ই জেলেদের ফাঁকা কুঁড়েবাড়ি পাওয়া যাবে—বাকি রাতটুকু সেখানে কাটিয়ে দেয়া যাবে। এর পর থেকে আমাকে আর হুড়মুড় দুদ্দাড় ক'রে যেতে হবে না।'

সব অবসাদ সে গা থেকে ঝেড়ে ফেললো। এতক্ষণে তার আস্থাও ফিরে এসেছে। পুলিশ আর তার হদিশ জানে না সম্ভবত। যদি-বা দুর্ভাগ্যবশত আবার তারা তার সন্ধান পেয়ে যায়, তাহ'লে কী ক'রে তাদের চোখে ধুলো দিতে হবে, তা সে জানে।

হ্রদটা পেরুবার আগেই সকাল হ'য়ে যাবে কিনা, এটাই তার ভয় এখন। সেইজন্যই সে যেন একটা শেষ চেষ্টা করলে। ফ্লাস্ক খুলে ঢকঢক করে মদ ঢেলে দিলে গলায়, বেশ চাঙ্গা লাগলো; মুহূর্তও না-থেমে আরো তাড়াতাড়ি ক'রে সে ছুটতে লাগলো।

অবশেষে চারটে নাগাদ দিগন্তে দেখা গেলো এলোমেলো কতগুলো বেঁটেখাটো গাছ —তুষার প'ড়ে ডালগুলো শাদা হ'য়ে আছে।

লেক পেইপুসকে দু-ভাগ ক'রে গেছে লিভোনিয়ার সীমান্ত, কিন্তু কাস্টমসের ঘাঁটিগুলো বসানো সীমান্ত থেকে একটু দূরে। হ্রদের পশ্চিম তীরে গ্রীষ্মকালে যেখানে নৌকোগুলো ঘাটে লাগে, ঘাঁটিগুলো সেখানেই বসানো।

তা সে জানে ব'লে দূরে কুয়াশা চিরে একটা হলদে আলো জেগে উঠতেই সে মোটেই অবাক হ'লো না। কেবল একটা মস্ত বরফের স্তূপের আড়ালে থেমে প'ড়ে সে বোঝবার চেষ্টা করলে আলোটা নড়ছে কি না।

আলোটা যদি ন'ড়েচ'ড়ে বেড়ায়, তাহ'লে নিশ্চয়ই মশালের আলো—হয়তো কাস্টমসের লোকেরা মশাল হাতে রোঁদে বেরিয়েছে। এবং পারতপক্ষে তাদের ধারে-কাছে না-ঘেঁষাই ভালো। স্থির আলো হ'লে বোঝা যাবে যে কাস্টমসের কোনো ঘাঁটিতে জ্বলছে। কারণ

জেলেদের কুঁড়েবাড়িগুলো এখনও ফাঁকাই আছে; এপ্রিলের মাঝামাঝি বরফ গ'লে গেলেই তারা ফিরে আসবে। কাজেই ওই আলোর কাছে না-যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে—হয় একটু এ-পাশে স'রে যেতে হবে তাকে, নয়তো অন্য পাশ দিয়ে।

বাঁ দিকটাই সে বেছে নিলে। ভোররাতের হাওয়ায় কুয়াশা একটু-একটু ক'রে পাতলা হ'য়ে যাচ্ছে, আর তারই আড়াল থেকে এ-পাশে দেখা যাচ্ছে গাছপালার ঘন সারি—ডানদিকে অতটা ঘনভাবে গাছপালা গজায়নি। যদি কেউ তার পিছু নেয়, তাহ'লে চট ক'রে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে পারবে সে—এমনকী গাছপালার আড়াল দিয়ে পালিয়ে যাওয়াও হয়তো তেমন কঠিন হবে না।

পঞ্চাশ পা গেছে কি না-গেছে, হঠাৎ ডানদিক দিয়ে আওয়াজ উঠলো গম্ভীর ও ভারিক্কি : 'হুকুমদার!'

উচ্চারণের ভঙ্গিটা টিউটনিক, ঠিক যেন আলেমান 'হ্বের ডা!' শোনালো কথাটা, আর তার কানে এই 'হুকুমদার' কথাটা মোটেই মোলায়েম বা মধুর ঠেকলো না। অথচ বালটিক দেশগুলোয় আলেমান কথাই বলে লোকে—ঠিক চাষীরা হয়তো বলে না, কিন্তু শহুরেদের মুখে আলেমান খুব চলে।

সে—ফেরারি—এ-কথার কোনো সাড়াই দিলে না। সোজা মুখ থুবড়ে সটান প'ড়ে গেলো সে বরফের উপর লম্বালম্বি। ভাগ্যিশ সে শুয়ে পড়ছিলো, কারণ তক্ষুণি 'গুড়ুম' ক'রে আওয়াজ হ'লো বন্দুকের—আরেকটু হ'লেই গুলিটা ঠিক তার বুকে গিয়ে লাগতো। কাস্টম্সের লোকেরা রোঁদে বেরুলে পালাতে পারবে কি সে? নিশ্চয়ই তারা তাকে দেখে ফেলেছে, কোনো সন্দেহই নেই তাতে...ঐ 'হুকুমদার'! আর গুলির শব্দই তার প্রমাণ...কিন্তু এই কুয়াশা আর ছায়ার মধ্যে হয়তো তারা এখুনি ভাবতে শুরু করেছে যে সমস্তটাই তাদের চোখের ভুল...

অনুমানটায় বোধকরি ভুল হয়নি। ধাবমান লোকগুলোর কথাবার্তা শুনে এটাই তার মনে হ'লো।

লেক পেইপুসের কাস্টম্সের ঘাঁটির লোক তারা। বেচারিরা! সবুজে রঙের উর্দি নোংরা হ'য়ে-হ'য়ে হলদে হ'য়ে গেছে তাদের; বখশিশের বা উৎকোচের জন্য সারাক্ষণ তারা হাত বাড়িয়েই আছে—এত কম বেতন পায়! সংখ্যায় তারা দুজন, টহল দিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছিলো, এমন সময় মনে হ'লো বরফের চাঙড়গুলো মধ্যে একটা ছায়ামূর্তি ন'ড়ে বেড়াচ্ছে।

'ঠিক দেখেছো তো? না কি চোখের ভুল?' জিগেশ করলে একজনে।

'ঠিকই দেখেছি,' অন্যজন বললে, 'নিশ্চয়ই কোনো স্মাগলার—চোখে ধুলো দিয়ে লিভোনিয়ায় ঢুকে পড়তে চাচ্ছিলো!'

'এবারকার শীতে ওই প্রথম স্মাগলার নয়—এবং শেষজনও নয়—হয়তো এখনও লোকটা প্রাণপণে ছুটছে—না-হ'লে তার কোনো হদিশই পেলুম না কেন!'

'তা আর কী করবে?' যে গুলি ছুঁড়েছিলো, সে বললে, 'এই কুয়াশায় ঠিকমতো তাগ করা যায় নাকি! ইশ! ভারি আপশোশ হচ্ছে, লোকটাকে পেড়ে ফেলতে পারলে দিব্যি হ'তো... স্মাগলারদের ফ্লাস্ক সবসময়েই ভর্তি থাকে...এই ঠাণ্ডায় দিব্যি দুজনে মিলে ফ্লাস্কটা ভাগাভাগি ক'রে নিতে পারতুম!'

'এখন তো জঠরের মধ্যেটা গরম ক'রে নেবার কোনো সুযোগই নেই,' ভাগ্যের বিরুদ্ধে

নালিশ করলে অন্যজনে।

খোঁজাখুঁজি ছাড়লে না তারা। বিশেষ ক'রে দু-এক ঢোক স্নাপ বা ভোদ্‌কা মিলতে পারে, এই লোভেই তারা তল্লাশি চালিয়ে গেলো—স্মাগলারটি সম্বন্ধে কোনো মাথাব্যথাই নেই তাদের। কিন্তু খোঁজাখুঁজিই সার হ'লো—কোথাও কারু কোনো হদিশ নেই।

কাস্টমসের পাহারাওলারা দূরে স'রে গেছে ব'লে যেই মনে হ'লো, অমনি ফেরারি বরফের উপর থেকে উঠে দাঁড়ালে। সকালের আগেই একটা পরিত্যক্ত ও ফাঁকা পোড়ো বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলে সে—কুঁড়েবাড়িটা কাস্টম্‌সের ঘাঁটি থেকে অন্তত দু-মাইল দক্ষিণে হবে।

অন্য সময় হ'লে সে নিশ্চয়ই খুব সাবধানে সারাদিন ধ'রে নজর রাখতো সন্দেহজনক কেউ এসে এখানে হাজির হয় কিনা—যাতে কাস্টম্‌সের লোকেরা তল্লাশিতে বেরুলে, কুঁড়েবাড়ির কাছে হাজির হ'লে চটপট চম্পট দেয়া যায়। কিন্তু অবসাদে তার সর্বাঙ্গ যেন ভেঙে পড়ছিলো; সহ্যশক্তি তার যতই বিপুল হোক না কেন, এখন আর সে কিছুতেই ঘুমকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। এক কোনায় লম্বালম্বি শুয়ে পড়লো সে কাফতান মুড়ি দিয়ে; সেই গভীর ঘুম যখন তার ভাঙলো, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো বেলা বাজে তিনটে। ভাগ্যিশ কাস্টম্‌সের লোকেরা আর ঘাঁটি ছেড়ে বেরোয়নি—রাত্তিরে একটা গুলি চালিয়েই তারা বেশ সহজেই জেনে নিয়েছে যে পুরোটাই ছিলো কুয়াশার মধ্যে চোখের ভুল। দেশের মাটিতে পা দেবা মাত্রই প্রথম বিপদ—কিন্তু সেটাকে কাটাতে পেরেছে ব'লে সে নিজেকেই অভিনন্দন দিয়ে ফেললে।

ঘুমিয়ে উঠে বেশ ঝরঝরে আর চাঙ্গা লাগছে। এখন একটু খাবার-দাবার চাই। তার থলিতে খাদ্য যা অবশিষ্ট আছে, তাতে দু-একবার মাত্র চলবে—কিন্তু পরবর্তী কোথাও আশ্রয় নেবার আগেই তাকে কিছু খাবার জোগাড় ক'রে নিতে হবে। চাই ফ্লাস্ক ভর্তি ক'রে স্নাপ—কারণ শেষ ফোঁটা অবধি সে কাল রাত্তিরে ঢকঢক ক'রে গলায় ঢেলে দিয়েছিলো।

'অন্তত চাষীরা আমাকে কখনো ফেরায়নি,' নিজেকে সে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করলে, 'আর লিভোনিয়ার চাষীরা কি তাদের মতোই কোনো স্লাভকে বিমুখ করবে? নিশ্চয়ই না।'

ঠিকই ধরেছিলো সে। যদি কোনো আলেমান চাষীর পাল্লায় না-পড়ে, তাহ'লে তার আর কোনো চিন্তা নেই, স্লাভরা তাকে কিছুতেই ফেরাবে না। তবে আলেমান চাষীর সংখ্যাও এ-তল্লাটে নেহাৎ কম নেই। কোনো রুশকে তারা নিশ্চয়ই স্বাগতম্‌ জানাবে না।

তবে সে তো আর দান চাইবে না—এখনো তার কাছে কয়েক রুবল অবশিষ্ট আছে। ঐ রুবলগুলো দিয়েই শেষ পর্যন্ত চ'লে যেতে পারবে সে—অন্তত লিভোনিয়া পর্যন্ত তো যেতে পারবে। এটা ঠিক যে কোনো-একটা জাহাজে গিয়ে উঠতে হবে তাকে। কিন্তু জাহাজে চড়বে সে কী ক'রে?.... সে-কথা না-হয় পরেই ভাবা যাবে। সবচেয়ে জরুরি এবং প্রাথমিক কাজ হ'লো কিছুতেই ধরা না-পড়া ও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে উপকূলের কোনো-একটা বন্দরে গিয়ে পৌঁছনো। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই এখন তাকে সব চেষ্টা করতে হবে।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ যখন বেশ অন্ধকার হয়েছে ব'লে মনে হ'লো, তখন সেই ফেরারি প্রথমে তার রিভলবারটায় গুলি ভরা আছে কি না দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সারাদিন

ধ'রে বাতাস বয়েছে দক্ষিণমুখো, তাপমাত্রা ছিলো প্রায় বরফ-জমানো, হিমাঙ্কর একটু উপরে; বরফের মধ্যে ছোটো-ছোটো কালো ফুটকিগুলো দেখে বোঝা গেলো যে তুষার গলা শুরু হ'লো ব'লে।

ভূদৃশ্য কিন্তু একটুও পালটায়নি; এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর কোনো পথিকের কাছেই বাধার সৃষ্টি করবে না—যদি-না বরফ গ'লে গিয়ে পা রাখাই বিষম বিপজ্জনক হ'য়ে ওঠে—আর কেবল সেই ভয়টাই এখন প্রবল হয়ে উঠেছে। কাজেই বন্দরে গিয়ে পৌঁছনোই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কাজ এখন; বরফ যদি হঠাৎ অসময়েই গ'লে যায় তাহ'লে একদিক থেকে ভালোই —নৌ-চলাচল সম্ভব হবে তাহ'লে।

হ্রদ আর এক্স শহরের মধ্যে দূরত্ব হবে প্রায় আট মাইল। সকাল ছটা নাগাদ ফেরারি গিয়ে এক্স-এ পৌঁছুলো। কিন্তু তখনো সে একটুও অসাবধান হয়নি—শহরে ঢোকবার চেষ্টা সে তখন করলেই না। ঢুকতে গেলেই পুলিশ তার কাছে কাগজপত্তর দেখতে চাইবে—আর মস্ত ঝামেলা শুরু হবে। শহর থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা ফাঁকা কুঁড়েবাড়িতেই সে সারাদিন কাটিয়ে দিলে।

সন্ধে ছটা নাগাদ সে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ধ'রে চলতে শুরু ক'রে দিলে; প্রায় সাত মাইল হেঁটে আসার পর পৌঁছলো এমবাখ্ নদীর তীরে—হ্রদের পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে হ্রদের সঙ্গে মিশেছে নদীটা। এখানে এসে হ্রদের তীরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা তার নিরাপদ মনে হ'লো না—বরং হ্রদের উপর দিয়ে এগুনোই ভালো, বিশেষত হ্রদের জল যখন এখনো জমাট বেঁধে নিরেট ও কঠিন হ'য়ে আছে।

বৃষ্টি পড়েছিলো মুষলধারে, আর তাতেই বরফ গলার সাহায্য হচ্ছিলো—চারপাশেই বরফ গলার সব লক্ষণ বিদ্যমান। শিগগিরই হয়তো বরফের মধ্যে দেখা দেবে একের পর এক ফাটল আর জলের ধারা।

সকালের আগেই হ্রদের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছনো চাই—ফেরারি দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো। যেতে হবে তাকে পনেরো মাইল—কোনো ক্লান্ত লোকের পক্ষে সেটা আরো অবসাদজনক—তার উপর এই টানা রাস্তাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো। কাল যে দশ ঘণ্টা সময় সে বিশ্রাম নেবে, সেটা সে সত্যিই অর্জন করবে, বলা যায়।

কপাল মন্দ, না-হ'লে কি বৃষ্টিবাদল শুরু হ'য়ে যায় হঠাৎ! শুকনো ঠাণ্ডা হ'লে আরো তাড়াতাড়ি যেতে পারতো সে। এটা ঠিক যে মাটির চেয়ে নিরেট বরফের উপরেই পা ফেলতে পারবে সে অনায়াসে, মাটির উপরে নিশ্চয়ই বরফ-গলা জলে কাদা হ'য়ে গেছে, আর পা পিছলে যাবারও সম্ভাবনা। কিন্তু চড়চড় ক'রে শব্দ হচ্ছে বরফের উপর, বোঝা যাচ্ছে যে বরফ ফাটতে শুরু করেছে, এর পরেই জলের উপর আলাদা-আলাদা অসংলগ্ন বরফের চাঙড় ভাসতে থাকবে। তাতে আবার আরেক মুশকিল দেখা দেবে—নদী পেরুতে হবে তাকে, কোনো উপায় বার করতে না-পারলে হয়তো সাঁৎরে পেরুতে হবে ঐ ঠাণ্ডা জল। আর তাতে সব জায়গাতেই তার অনেকক্ষণ ক'রে দেরি হ'য়ে যাবে।

ব্যাপারটা বোঝামাত্র লোকটা যেন অতিমানুষিক শক্তি পেলো তার শরীরে। আঁটো ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে সে কাফতান, জলের ছাঁটের হাত থেকে সেটাই তাকে রক্ষা করবে। জুতোজোড়াও বেশ মজবুত আছে—ভাগ্যিশ কয়েকদিন আগেই জুতোজোড়া সে এক মুচিকে

দিয়ে সারাই ক'রে নিয়েছিলো, না-হ'লে এই পিছল বরফে পা ফেলতো কী ক'রে? তাছাড়া অন্ধকার সত্ত্বেও রাস্তা খুঁজে হাৎড়ে মরার ভয় নেই—কারণ এমবাখ্ তাকে সরাসরি তার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।

রাত তিনটে নাগাদ সে প্রায় বারো মাইল রাস্তা পেরিয়ে এলো। আর দু-ঘণ্টার মধ্যে গিয়েই পৌঁছুতে পারবে গোপন আশ্রয়ে। এবারও কোনো গাঁয়ে ঢুকে প'ড়ে সরাইখানায় গিয়ে আশ্রয় নেবার ঝুঁকি না-নেয়াই ভালো, কী দরকার ঐ ঝামেলা পুইয়ে, সঙ্গে যা খাবার আছে তাতে আরো-একটা দিন কাটিয়ে দেয়া যাবে। কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিলো, তাতে কিছুই এসে-যায় না; সন্ধে অব্দি কোনোরকমে নিরাপদ থাকাটাই হচ্ছে আসল কথা। হ্রদের উত্তর ধারে যেসব বন আছে, সেখানে শিকারীদের কুঁড়েবাড়ি মিলবে নিশ্চয়ই—কেবল শীতকালেই ও-সব বাড়িতে লোকে আশ্রয় নেয়। ভিতরে থাকবে কয়লার স্তূপ, গাছপালার শুকনো ডালপালাও থাকবে নিশ্চয়ই ভিতরে—দিব্যি একটা আগুন জ্বালানো যাবে—তার আঁচেই শরীর মন সেঁকে নেয়া যাবে। এই মস্ত ফাঁকা জায়গায় ঐ অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়া উঠলেও ভয় নেই—কে আর আসবে এখানে তার খোঁজে!

বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছিলো এবার শীতে; কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডায় বিষম কষ্ট পেলেও পালাবার পক্ষে শীতকাল তাকে বেশ সাহায্যই করেছে।

হঠাৎ এমবাখ্-এর বাম তীর থেকে একটা চাপা রাগি গর্জন রাত ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো! কোনো সন্দেহই নেই—কয়েক শো গজ দূরেই কোনো বুনো জানোয়ার রয়েছে ওৎ পেতে। ওৎ পেতে আছে, না এদিকে এগুচ্ছে! বড্ড অন্ধকার—কিছুই ভালো ক'রে দেখা যাচ্ছে না।

লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে শোনবার চেষ্টা করলে। সাবধানে থাকতে হবে তাকে, খেয়াল রাখতে হবে চারপাশে; জন্তুটা যাতে আচমকা তার উপর ঝাঁপাতে না-পারে, সেদিকটায় নজর রাখতে হবে তাকে।

কালো রাতটাকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে আরো-কয়েকবার উঠলো সেই বিষম রাগি গর্জন! ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে শব্দটা! আর তার ডাকে সাড়া দিয়েই আরো-সব জন্তুদের বিলম্বিত ডাক উঠছে অন্ধকারে! হয়তো মানুষের গন্ধ পেয়েছে তারা অন্ধকারে—রক্তের নেশায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে!

তার পরেই সেই বুকের রক্ত ঠাণ্ডা-ক'রে-দেয়া ঐকতান উঠলো এত জোরে ও এত কাছে যে তার মনে হ'লো বুঝি-বা তার উপরে ঝাঁপিয়েই পড়ে জন্তুগুলো!

'নেকড়ে...নেকড়ের পাল!' ফিশফিশ ক'রে দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে, 'বড্ড কাছ থেকে ডাক উঠছে—নিশ্চয়ই খুব দূরে নেই-'

ভীষণ বিপদের সম্ভাবনায় তার হাত-পা যেন পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে চাইলো। কর্কশ ও কঠিন শীতকাল কেটেছে অনাহারে—জন্তুগুলো যে হন্যে হ'য়ে আছে, তাতে সন্দেহ নেই! নেকড়ে যদি একটা হ'তো, তাহ'লে সে এতটা ভয় পেতো না। গায়ে যদি জোর থাকে, মাথা যদি ঠাণ্ডা থাকে, আর হাতে যদি থাকে লাঠি—তাহ'লে একটা নেকড়ে তার কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু এ-রকম ছ-সাতটা জন্তু একসঙ্গে চড়াও হ'লে সে কী করবে—কী ক'রে সে এদের তাড়াবে; এমনকী রিভলবারই বা কোন্ কাজে লাগবে? যদি একটাও তাগ না-ফশকায়, তাহ'লে অবশ্যি—

আর আশ্রয়? এদের ক্ষুধার্ত কামড় থেকে রক্ষা পাবার উপযোগী আশ্রয়? পাগল! তা সে পাবে কোথায় এখানে। এমবাখ্-এর তীর বেশ ঢালু ও নিচু—আর একেবারেই ফাঁকা। কোথাও গিয়ে যে কোনো গাছের ডাল বেয়ে উঠে পড়বে, সে-রকম কোনো গাছই নেই কোথাও! কোন্‌খান দিয়ে আসছে নেকড়েরা? বরফের উপর দিয়ে? না কি স্তেপি পেরিয়ে? এটা ঠিক যে আর পঞ্চাশ গজও দূরে নেই তারা!

যত জোরে পারে, তাকে ছুটতে হবে— এ ছাড়া আর-কিছুই করার নেই! দৌড়ের পাল্লায় যে জন্তুগুলোর সঙ্গে পারা যাবে তারও কোনো ভরশা নেই। কিন্তু শেষ চেষ্টা ক'রে দেখুক একবার—তারপর না-হয় তাদের মুখোমুখি দাঁড়াবে। তা-ই সে করলে। কিন্তু ছোটবার সঙ্গে-সঙ্গেই পিছনে একটা হন্যে চিৎকার উঠলো—বোধহয় কুড়ি পাও দূরে নেই নেকড়েগুলো। থামতেই তাকিয়ে দ্যাখে অন্ধকারের মধ্যে ঝকঝকে চুল্লির মতো সারি-সারি জ্বলন্ত চোখ!

নেকড়ের চোখ—ক্ষুধায় আর লোভে জ্বলন্ত। দীর্ঘ উপবাসের পর সামনেই শিকার—চোখা হলদে দাঁতের পাটির কাছেই! ক্রুদ্ধ গর্জন উঠলো রোগা চিমশে ক্ষুধার্ত নেকড়েগুলোর।

এক হাতে তার লাঠি, আরেক হাতে রিভলবার—সে মুখোমুখি দাঁড়ালে নেকড়েগুলোর। লাঠির ঘায়েই যদি কাজে হয়, তবে আর রিভলবার ছুড়বে না—রিভলবারের গুলিতে ওদিকে আবার পুলিশ আর পাহারা সজাগ হ'য়ে উঠবে!

কাফতানের ভাঁজ থেকে হাত বার ক'রে এনে সোজা সে দাঁড়ালে স্থির পায়ে। বনবন ক'রে ঘুরলো তার হাতের মস্ত লাঠি — ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে নেকড়েগুলো থমকে গেলো। তবু একটা নেকড়ে তার ঘাড় তাগ ক'রে লাফ দিয়েছিলো, লাঠির ঘায়ে সে ছিটকে পড়লো মাটিতে।

কিন্তু নেকড়েরা সংখ্যায় আধ ডজন — কজনকে সে ভয় দেখাবে? রিভলবার ছুঁড়ে একটা-একটা ক'রে সবগুলোকে খতম না-করলে আর চলবে না। আরেকটা নেকড়ের মাথায় সে ঘা মারলে প্রাণপণে — নেকড়ের মাথার খুলিটা ফেটে গেলো, কিন্তু তার হাতের লঠিটা ভেঙেও দু-টুকরো!

আবার সে প্রাণপণে ছুটলো। নেকড়েগুলো মৃত সঙ্গীদের চেটেপুটে খেলে সেখানে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই হাড়গোড় ছাড়া বরফের উপর কিছু রইলো না। আবার তারা তার পিছনে ধেয়ে এলো। থামলো সে আবার, ফিরে দাঁড়িয়ে পর-পর গুলি ছুঁড়লো চারবার।

দুটি নেকড়ে ছিটকে পড়লো বরফে, মারাত্মক জখম হয়েছে তারা, রক্ত ঝরছে গলগল ক'রে। কিন্তু শেষ গুলি দুটো ফশকালো--বাকি নেকড়ে দুটো লাফিয়ে স'রে গেলো একপাশে, আর তারপরেই ধেয়ে এলো তার দিকে। রিভলবারে গুলি ভরারও আর সময় নেই। দুশো গজ ছুটে যেতে না-যেতেই একটা নেকড়ে কামড়ে ধরলে তার কাফতান — হ্যাঁচকা টানে চামড়াটা গেলো ছিঁড়ে, খপ ক'রে সেই চামড়ার টুকরোই গিলে ফেললে নেকড়েটা।

নেকড়ে দুটোর তপ্ত ফোঁশফোঁশ গায়ে লাগছে তার। একবার যদি গলন্ত বরফে পা হড়কে যায়, তাহ'লেই সব শেষ — আর তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে না, মুহূর্তের মধ্যেই হিংস্র নখগুলো তাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলবে।

তাহ'লে এই তার জীবনের শেষ ঘণ্টা! এত কষ্ট, এত বিপদ, এত অবসাদ — সব

সহ্য ক'রে সে ফিরে আসতে চাচ্ছে নিজের দেশে— কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের দেশের মাটিতেও সে মরতে পাবে না!

প্রথম ঊষার রশ্মি জেগে উঠলো দিগন্তে, আর তারই সঙ্গে দেখা গেলো হ্রদের শেষ মাথা। এখন আর বৃষ্টি পড়ছে না। হালকা কুয়াশায় মুড়ি দিয়ে চুপচাপ প'ড়ে আছে চারপাশ। নেকড়েগুলো লাফিয়ে পড়লো শিকারের উপর। শেষ দুটো গুলি স্তব্ধতাকে ফেঁড়ে দিয়ে বেজে উঠলো 'গুড়ুম! গুড়ুম!' রিভলবারের বাঁট দিয়ে সে পাগলের মতো মারছে নেকড়েগুলোকে —দাঁতের আর নখের আঁচড় তাকেও রক্তাক্ত ক'রে দিয়েছে!

হঠাৎ লোকটা গিয়ে একটা মইয়ের গায়ে ধাক্কা খেলো! .... কোথায় উঠে গেছে এই মই?...কী এসে যায়? একবার উঠে গেলে নিশ্চিন্ত, নেকড়েগুলো মই বেয়ে উঠতে পারবে না পিছন-পিছন — অন্তত একটুক্ষণের জন্য তো নিরাপদ।

হেলানো মইটা কিন্তু মাটি অব্দি নামেনি। আশ্চর্য, যেন ঝুলে আছে উপর থেকে। উপরে কী আছে কুয়াশায় তা দেখা যাচ্ছে না।

শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরলো সে মই। নেকড়েরা যেই তাঁকে লক্ষ্য ক'রে ঝাঁপাবে, নিচের ধাপে সে পা দিলে। হুড়মুড় ক'রে উঠতে গিয়ে টের পেলে জুতোর সুখতলাই কামড়ে ছিঁড়ে নিলে নেকড়েগুলো।

মইটা তার ভারে মড়মড় করছে। দুলছে শূন্যে অনবরত। ভেঙে পড়বে না কি?... তাহ'লে জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে তাকে নেকড়েগুলো—আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে নেবারও তর সইবে না...

বেশ শক্ত মইটা। একেবারে শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছলো সে হুড়মুড় ক'রে। একটা থাম বেরিয়ে আছে, পুরু একটা অক্ষদণ্ডর মতো—তারই উপর সে বসলো পা ঝুলিয়ে।

যাক! নেকড়েদের নাগালের বাইরে তো পৌঁছনো গেলো।

জানোয়ার দুটো তখনও ভীষণ গরজাচ্ছে, ফোঁশফোঁশ করছে রাগে আর লাফিয়ে-লাফিয়ে মইটাকে পাকড়ে ধরার চেষ্টা করছে।

২

একজনের জন্যে আরেকজন

এবার সে নিরাপদ—আপাতত। নেকড়েরা তো আর ভালুকদের মতো মই বেয়ে উঠতে পারে না — কিন্তু যতক্ষণ-না নেকড়ে দুটো পালিয়ে যায় ততক্ষণ অব্দি তার পক্ষেও আর নিচে নামা সম্ভব হবে না, আর নেকড়েরা যে দিনের আলো না-ফুটলে পালাবে না, সে-সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই মইটা এখানে কী করছে আর কীসের সঙ্গেই বা মইটা ঠেশ দিয়ে রাখা? কীসের থেকে মইটা ঝুলছে?

একটা চাকার অক্ষর উপর সে ব'সে আছে—সে দেখতে পেলে। চাকাটা থেকে আরো তিনটে ও-রকম মই ঝুলছে—টিলার উপরে যে হাওয়াকল বানানো হয়, তারই চারটে পাখনা নিশ্চয়ই। ভাগ্যিশ! না-হ'লে ওই পাখনা বেয়ে যখন সে উঠেছিলো, তখন ঐ হাওয়াকল চললেই হয়েছিলো আর-কী — তাকে শুদ্ধু বনবন ক'রে ঘুরতে শুরু ক'রে দিতো, নাগরদোলার মতো!

হাওয়া এলে সকালবেলাতেই এটা হয়তো ঘুরপাক খেতে থাকবে—এই সম্ভাবনাটা কিছুতেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। আর, তখন, এর ঘুরতে-থাকা অক্ষর উপর ব'সে-থাকা তার পক্ষে বিষম কঠিন হ'য়ে উঠবে। তাছাড়া কলওলা যখন পাখনা ছড়িয়ে কল চালিয়ে দিতে আসবে, তখন তাকে দেখতে পাবে ব'সে আছে এই অক্ষদণ্ডে। কিন্তু নিচে নামবে সে কোন্ সাহসে? নেকড়েগুলো এখনো নিচে ঘুরছে, লাফাচ্ছে আর গরজাচ্ছে—হয়তো তাদের হন্যে ডাক শুনে আশপাশের বাড়িঘরের লোকেরাই ঘুম ভেঙে ছুটে আসবে!

এখন তাহ'লে একটা কাজই সে করতে পারে। ঐ মিল-এর মধ্যেই ঢুকে পড়া তার পক্ষে সমীচীন; সেখানে সারাদিন কাটাতে হবে লুকিয়ে—অবিশ্যি সবই নির্ভর করছে কলওলা এখানে থাকে কিনা তার উপর; দেখে-শুনে মনে হচ্ছে কলওলা সম্ভবত এখানে থাকে না; সেক্ষেত্রে সারাদিন এখানে গা-ঢাকা দিয়ে থেকে রাত্তিরে আবার রওনা হ'য়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

এই ভেবে সে অতি সাবধানে ছাদের দিকে চ'লে গেলো—তারপর গিয়ে পৌঁছলো জানলার কাছে। জানলা ফুঁড়েই উঠেছে পিছনের লম্বা খুঁটিটা, একেবারে মাটিতেই পোঁতা বোধহয়।

ওই তল্লাটে এ-রকম হাওয়াকল অনেক আছে। বাঁকানো একটা কীলকের টুপি পরানো হাওয়াকল, দেখে মনে হয় যেন একটা শিরস্ত্রাণ। এই ছাদটা ঘর্ষণ-ঘোরকের উপর ভর দিয়ে চলে, আর চাকাগুলো হাওয়ার তোড়ে পাক খায়। এই কাঠের বাড়ির প্রধান অংশটা কিন্তু কোনো কেন্দ্রীয় হাওয়াকলের উপর বসানো নয়, মাটির সঙ্গেই আটকানো—পরস্পরের মুখোমুখি দুটি দরজা আছে তাই দিয়েই সেখানে পৌঁছনো যায়।

জানলার কাছে পৌঁছেই ফেরারি সেই সরু ফোকরটা দিয়ে সহজেই কোনো শব্দ না-ক'রে নেমে এলো। ফোকরটা দিয়ে এসে পৌঁছনো যায় হাওয়াকলের মতো এক জায়গায়, হাওয়াকলের চাকা দিয়ে সেটা আড়াল করা। ঘুটঘুটে অন্ধকার, স্তব্ধতাও যেন তেমনি নিরেট। অন্তত এখন যে নিচে কেউ নেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটা বন্ধুর সিঁড়ি নিচের তলা অব্দি নেমে গেছে—মেঝেটা নোংরায় ভর্তি।

কিন্তু চিলেকোঠা ছেড়ে নিচে নেমে আসাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। প্রথমে চাই কিছু খাদ্য, ওদিকে এতক্ষণে ঘুমেও দু-চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে : ক্ষুধা আর ঘুমকে সে এখন ঠেকাবে কী ক'রে? এদিকে শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়েই সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছিলো, ভেবেছিলো পরে কোথাও গিয়ে কিছু খাবার জোগাড় ক'রে নেবে। কিন্তু কোত্থেকে সে খাবার জোটাবে এখন—আর কেমন ক'রেই বা জোটাবে? মাথা ঠাণ্ডা ক'রে এখন সে-বিষয়টা ভেবে নেয়া উচিত।

সাড়ে-সাতটায় যখন কুয়াশা স'রে গেলো, হাওয়াকলের আশপাশটা ভালো ক'রে নজরে

পড়লো ; হাওয়াকলের ডানদিকেই রয়েছে মস্ত সমভূমি, মাঝে-মাঝে বরফের স্তূপ, আর তারই পাশ দিয়ে গেছে এক অন্তহীন পথ, পশ্চিমদিকে, গাছপালার তলা দিয়ে, একটা জলাভূমির পাশে মোচড় মেরে। বাঁদিকে ছড়িয়ে আছে হ্রদ, সেখানটায় এমবাখ্ নদী এসে মিশেছে, সেই মোহানার কাছটা ছাড়া হ্রদটা এখনো তুষারধবল ও নিরেট প'ড়ে আছে। মাঝে-মাঝে ইতস্তত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দেবদারু, তাদের ডালপালা কালো পাতার ঝাড় যেন পাতাঝরা কঙ্কালসার মেপল আর এলডার গাছগুলোরই প্রতিতুলনা। সে আরো তাকিয়ে দেখলে যে নেকড়েদেরও আর-কোনো পাত্তা নেই—কিছুক্ষণ ধ'রে সত্যিই অবশ্য তাদের গর্জন আর কানে আসছিলো না।

'ভালোই হ'লো,' ভাবলে সে মনে-মনে, 'কিন্তু কাস্টম্‌সের লোক আর পুলিশ হ'লো ঐ নেকড়েগুলোর চেয়েও ভয়ানক!... উপকূলের যত কাছে গিয়ে পৌঁছুবো, ততই তাদের চোখে ধুলো দেয়া কঠিন হ'য়ে পড়বে...ঘুমে দু-চোখের পাতা একেবারে জড়িয়ে যাচ্ছে...ঘুমের ঘোরে প'ড়ে না-যাই নিচে । কিন্তু নিচে নামবার আগে একবার চারপাশ ভালো ক'রে দেখে নেয়া যাক —হঠাৎ কেউ এসে চড়াও হ'লে কোথায় পালাবো, সেটা অন্তত ঠিক ক'রে রাখি।'

বৃষ্টি ধ'রে গিয়েছে। হাওয়া বইছে পশ্চিমমুখো। তাপমাত্রাও একটু উঠে এসেছে। কিন্তু হাওয়ার জোর দেখে কলওলা এসে তার কলটা চালিয়ে দিতে চাইবে নাকি এখন?

জানলা দিয়ে তাকালে প্রায় আধ মাইল দূরে এলোমেলো ছড়ানো কতগুলো বাড়ি চোখে পড়ে। বাড়িগুলোর চালে শাদা তুষার জ'মে আছে, চিমনিগুলো দিয়ে উঠছে সকালবেলার আড়মোড়া-ভাঙা অলস ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কলওলা নিশ্চয়ই ওই বাড়িগুলোর একটাতেই থাকে।

মই বেয়ে সে প্রধান অংশটায় নেমে পড়লো। সার-সার প'ড়ে আছে কতগুলো গমের বস্তা। কলটা তাহ'লে রোজই চালানো হয়—হাওয়া উঠলেই আজকে চালানো হবে! কলওলা কি তাহ'লে শিগগিরই এসে হাজির হবে না—পাখাগুলোকে হাওয়ার মুখে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে?

তাহ'লে এই একতলায় থাকা আর বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরং চিলেকোঠাতে গিয়েই ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে নেয়া যাক। আচমকা ধরা প'ড়ে যাবার ভয় অবিশ্যি রয়েইছে। মিলের দরজায় কেবল সাধারণ হুড়কো লাগানো ; বৃষ্টি যদি আবার আসে, আশপাশের লোকেরা এসে আশ্রয় নেবে নির্ঘাত। ওদিকে হাওয়ার জোরও বেড়ে যাচ্ছে ; কলওলা নিশ্চয়ই এক্ষুনি এসে উদিত হবে!

আবার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সে উঠে পড়লো—ওঠবার আগে শেষবার জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো চারদিক। চিলেকোঠায় পৌঁছেই সে ধপ ক'রে প'ড়ে গেলো লম্বালম্বি ; অবসাদে সারা শরীর ভেঙে পড়ছে ; শোবামাত্রই গভীর ঘুম।

জেগে যখন উঠলো, তখন ক-টা বাজে?—চারটে হবে বোধহয় ; তখনও স্পষ্ট দিনের আলো আছে। অথচ আশ্চর্য, হাওয়াকল মোটেই চলছে না!

আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে সে দেখলে যে তার হাতে-পায়ে কোনো সাড় নেই। নড়তেই পারলো না সে। আর নড়তে পারলো না ব'লেই এক মস্ত বিপদ থেকে বেঁচে গেলো।

নিচের তলায় কারা যেন কথা বলছে—বেশ উত্তেজিতভাবেই কথা বলছে লোকগুলো।

তারা যে কখন এসে পৌঁছেছে, ঘুমের ঘোরে তা সে একেবারেই টের পায়নি। চিলেকোঠায় এসে তাকে দেখে গেছে নাকি!

নড়াচড়া না-ক'রে নিঃসাড়ে সে প'ড়ে রইলো লম্বালম্বি—কেবল উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে লাগলো নিচে কী বলাবলি হচ্ছে।

দু-একটা কথা শুনেই আগন্তুকদের পরিচয় সে জেনে ফেললে, আর তক্ষুনি বুঝতে পারলে যে কোনো ভীষণ বিপদের হাত থেকে সে এইমাত্র বেঁচে গেলো! বেঁচে অবিশ্যি ঠিক যায়নি ; কলওলার সঙ্গে যে-তিনটি লোক তর্কাতর্কি করছে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের আগে বা পরে চম্পট দিতে পারলেই সে বেঁচে যাবে।

লোক তিনটে আর কেউ নয়, পুলিশ : একজন সারজেন্ট, আর অন্য দুজন তার সহকারী।

+

সেই সময়ে বলটিক দেশগুলোর কর্মচারীদের রুশীকরণ মাত্র শুরু হয়েছে—আলেমানদের চাকরি থেকে বরখাস্ত ক'রে নিয়োগ করা হচ্ছে স্লাভদের। তখনও পুলিশের অনেক লোকই ছিল আসলে আলেমান, আর তাদের মধ্যে সারজেন্ট য়েক ছিলো সবচেয়ে নামজাদা। সারজেন্ট য়েক ছিলো খুবই একচোখা ও সাম্প্রদায়িক—লিভোনিয়ার রুশীরা কোনো দুষ্কর্ম করলে সে কিছুতেই ছেড়ে কথা কইতো না, কিন্তু সেই একই কুকর্মের জন্য আলেমানদের সে অনেক সময় মাফ ক'রে দিতো।

এমনিতে ভারি কাজের লোক, গম্ভীর ও ভারিক্কি ; ওপরওলারা তার উপরে ছিলো খুবই সন্তুষ্ট। একবার কোনো দুষ্কর্মের কথা তার কানে এলেই হ'লো, একেবারে নাছোড়বান্দার মতো তার সুরাহা না-হওয়া পর্যন্ত সে লেগে থাকতো। সব কাজেই তার সাফল্য ছিলো অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী— কোনো মামলা-মোকদ্দমাতেই একবারও পরাস্ত হয়নি ব'লে ভারি অহংকার ছিলো তার। কোনো জরুরি তদন্ত হাতে এলে ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকে ; অবসাদ ব'লে কোনো কথা তার অভিধানে নেই, ভীষণ চালাকচতুর। লিভোনিয়ার এক স্লাভ সাইবেরিয়া থেকে পালিয়েছে, তাকে পাকড়াতে হবে—এ-কথা শুনেই সে উঠে-প'ড়ে লেগে গিয়েছে।

ফেরারি যখন ঘুমিয়েছিলো, কলওলা তখনই এসে পৌঁছেছিলো তার মিলে। নটা নাগাদ হাওয়ার গতি ছিলো বেশ প্রসন্ন ; তখন যদি সে কলটা চালিয়ে দিতো, তাহ'লে হাওয়াকলের পাখার ক্যাঁচকোঁচ শব্দে ফেরারির ঘুম ভেঙে যেতো নিশ্চয়ই। কিন্তু হঠাৎ গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে থাকে, তক্ষুনি হাওয়া প'ড়ে যায়, কাজেই কলওলা অলসভাবে দাঁড়িয়েছিলো চৌকাঠের কাছেই। এমন সময়েই সারজেন্ট য়েক সদলবলে এসে হাজির—কলওলাকে নিয়েই য়েক তার মিলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

'দ্যাখোনি তুমি লোকটাকে?' জেরা করছিলো য়েক, 'বয়েস হবে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ—হ্রদের ঠিক মুখটায় তাকে দেখা গিয়েছিলো!'

'কই, কাউকেই তো দেখিনি,' কলওলা বললে, 'এই ঠাণ্ডায় দিনে দুটি লোকও গ্রামে এসে হাজির হয় কি না সন্দেহ।...লোকটা কি বিদেশী?'

'বিদেশী?...না, রুশী...বলটিক এলাকার রুশী। বদমায়েশের ধাড়ি! লোকটাকে গ্রেফতার করতে পারলে বেশ নামজাদা হ'য়ে যাবো।'

পুলিশের লোকের কাছে ফেরারি মাত্রেই বদমায়েশের ধাড়ি—তা সে রাজনৈতিক বন্দীই হোক, কি খুনে বাঁটপাড়ই হোক!

'আপনি তার পিছু নিয়েছেন? খুঁজছেন তাকে?' কলওলা জিগেশ করলে।

'চব্বিশ ঘণ্টা আগে তাকে একবার সীমান্তের কাছে দেখা গিয়েছিলো।'

'কোথায় যাচ্ছিলো সে? কেউ জানে সেইকথা?' কলওলা বেশ অনুসন্ধিৎসু মানুষ।

'অনুমান করা যায়,' য়েক তাকে বললে, 'বরফ গ'লে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই জাহাজে ওঠা যায় এমন জায়গায় যেতে চাচ্ছে নিশ্চয়ই– রিগার বদলে রেফেল-এর দিকেই যাচ্ছে নিশ্চয়ই লোকটা।'

সারজেন্ট য়েক ভুল করেনি। কারণ রেফেল বেশ বড়োশড়ো ব্যাবসার কেন্দ্র, আর বন্দরও আছে। কিন্তু হাওয়াকল থেকে রেফেল-এর দূরত্ব অন্তত আশি মাইল– সেখানে পৌঁছুতে হ'লে কম করে চারটে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।

'রেফেল কেন?...পেরনাউ গেলেই তো তার সুবিধে হবে,' বললে কলওলা।

পেরনাউ সত্যিই অপেক্ষাকৃত কাছে—ষাট মাইল দূরে। কিন্তু রিগা, সে প্রায় ডবল দূরে... কাজেই রিগার রাস্তায় অতটা কড়া তল্লাশি হবে না নিশ্চয়ই।

বলাই বাহুল্য, ফেরারি তখন চিলেকোঠার মেঝেয় দম বন্ধ ক'রে শুয়ে উৎকর্ণভাবে প্রতিটি কথা শোনবার চেষ্টা করছে। সব কথা ঠিকমতো শুনতে পেলে তার সুবিধেই হবে শেষকালে।

'হ্যাঁ,' সারজেন্ট বললে, 'পেরনাউ-এর কথা অবিশ্যি মনে রাখতে হবে। ফাললেন-এর ঘাঁটিগুলোয় খবর দেয়া হয়েছে, যাতে পেরনাউ-এর রাস্তায় কড়া নজর রাখে। কিন্তু সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে লোকটা সম্ভবত রেফেলই যেতে চাচ্ছে– রেফেল-এ তার পক্ষে জাহাজে ওঠা অনেক সহজ হবে।'

এটা আসলে মেজর ফেরডের-এর অনুমান। কর্নেল রাগেনোফ-এর ডান হাত এই মেজর ফেরডের—লিভোনিয়ার পুলিশের বড়ো কর্তা। তিনিই য়েককে রেফেল-এর রাস্তায় কড়া নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কর্নেল রাগেনোফ নিজে স্লাভ আর মেজর ফেরডের হলেন আলেমান—কাজেই দুজনের দ্বেষ ও ভালোবাসা, সহানুভূতি ও অনীহা সমান নয়। কিন্তু সারজেন্ট য়েক-এর মনোভাব বেশ ভালো ক'রেই জানেন মেজর ফেরডের। এটা ঠিক যে তাঁর এত কড়াক্কড়কে মোলায়েম করবার জন্য আছেন জেনারেল গোরকো—বালটিক দেশগুলোর রাজ্যপাল, বেশ উঁচুতলার মানুষ—তিনিই প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় রুশীদের চাকরি দেবার পক্ষপাতী।

আরও কয়েক মিনিট চললো কথাবার্তা। পুলিশের কাছে যে-বিজ্ঞপ্তি পৌঁছেছিলো, সেই অনুযায়ী ফেরারির চেহারার একটা বর্ণনা দিলে সারজেন্ট য়েক : প্রমাণ মাপের চেয়ে একটু লম্বা লোকটা, বেশ সবল গড়ন, বয়েস পঁয়ত্রিশ, ঘন দাড়ি মুখে—লালচে রঙের, গায়ে একটা বাদামি রঙের কাফতান—অন্তত সীমান্ত পেরুবার সময় এই তার পরনে ছিলো।

'আচ্ছা, আবার বলুন তো,' কলওলা জিগেশ করলে, 'লোকটা... রুশী, তাই তো বললেন আপনি?'

'হ্যাঁ, রুশী।'

'হুম! না, আমাদের গ্রামে তাকে কোথাও দেখা যায়নি—কোনো বাড়িতেই তার কোনো হদিশ পাবেন না!'

'জানো তো,' সারজেন্ট তাকে মনে করিয়ে দিলে, 'যে তাকে আশ্রয় দেবে, তারও গ্রেফতার হবার সম্ভাবনা আছে—তাকে ঐ ফেরারির শাগরেদ ব'লেই গণ্য করা হবে।'

'ভগবান রক্ষে করুন! আমি বাপু ও-সব ঝক্কিঝামেলায় নেই!'

'ঠিকই ভেবেছো তুমি,' য়েক যোগ করলে, 'মেজর ফেরডের-এর সঙ্গে ঝগড়া বাঁধালে ফল খুব একটা ভালো হয় না।'

'নিশ্চয়ই। মেজর ফেরডের যাতে আমার উপর চ'টে না-যান, সেদিকে লক্ষ রাখবো বৈকি!'

য়েক বিদায় নেবার জন্যে তৈরি হ'লো। পেরনাউ থেকে রেফেল—এক টুকরো জমিও সে বাদ দেবে না, সব তন্নতন্ন ক'রে খুঁজবে;—যাবার আগে আবার সে শাসিয়ে গেলো, 'সব জায়গার পুলিশকেই খবর জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সবাই সারাক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।'

'আমরা কথা বলছি, এই ফাঁকে হাওয়ার জোর দেখছি আবার বেড়ে উঠলো—বেশ জোরে বইতে শুরু ক'রে দিয়েছে হাওয়া,' কলওলা বললে, 'আপনার লোকদের বলবেন একটু সাহায্য করতে? পাল খাটাবো....তাহ'লে আর আমাকে গ্রামে ফিরে যেতে হয় না—সারা রাতটাই এখানে কাটিয়ে দিতে পারি। বলবেন ওদের একটু হাত লাগাতে?'

দ্বিরুক্তি না-করেই সাগ্রহে রাজি হ'লো য়েক। উলটো দিকের দরজা দিয়ে তার অনুচর দুজন বেরিয়ে গেলো, তারপর হাওয়াকলের চাকাগুলো ঘুরিয়ে হাওয়ার মুখে এনে হাজির ক'রে দিলো। পালে হাওয়া লাগলো, শুরু হ'লো চাকার শব্দ : ক্যাঁচ-কোঁচ, ক্যাঁচ-কোঁচ!

তারপরেই সারজেন্ট য়েক সদলবলে উত্তর-পশ্চিমমুখো রওনা হ'য়ে পড়লো।

+

সব কথাই সে যেন গোগ্রাসে গিলছিলো। যতটুকু শোনা গেলো, তাতেই বোঝা গেলো, বুঝি তীরে এসে তরী ডোবে—তার যাত্রার শেষটায় মস্ত বিপদ ওঁৎ পেতে আছে! সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে তার পালাবার খবর। পুলিশ চারপাশ একেবারে চ'ষে ফেলছে...বিভিন্ন পুলিশের ঘাঁটি একই কাজের জন্য হাত মিলিয়েছে....রেফেল যাবার চেষ্টা করা কি ঠিক হবে তার? না, তক্ষুনি সে মনস্থির ক'রে ফেললো। বরং পেরনাউ যাওয়াই ভালো—অন্তত তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছুতে পারবে। তাপমাত্রা যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে বরফ গলা শুরু হ'য়ে গেলো বলে।

যেমনি ভাবা অমনি কাজ : অন্ধকার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাকে মিল ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।

কিন্তু লক্ষ রাখতে হবে যাতে কলওলার চোখে না-পড়ে। পাখাগুলো দিব্যি ঘুরছে, রাত্রে সম্ভবত আর হাওয়া প'ড়ে যাবে না, লোকটা তো রাতের নাম ক'রেই আশ্রয় নিয়েছে এখানে। নিচের তলায় নেমে গিয়ে সোজাসুজি দরজা খুলে বেরুবার কথা ভাবাই চলে না আর—আবার ওই ফোকরটা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরুবে না কি ? খুঁটি বেয়ে নেমে যাবে তারপরে মাটিতে?

যদিও পাখনার অক্ষদণ্ডটা এখন পাক খাচ্ছে আর চাকার দাঁতে জড়িয়ে যাবার ভয়ও রয়েছে, তবু কোনো শক্তসমর্থ ক্ষিপ্র লোকের পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। একবার বেশামাল হ'লেই একেবারে পিষে যাবে—কিন্তু ঝুঁকিটা তো তাকে নিতেই হবে।

অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। যদি তার আগে কোনো কাজে কলওলা চিলেকোঠায় এসে হাজির হয়, তাহ'লেই সব ফাঁস হ'য়ে যাবে...তাকে দেখে ফেললেই সর্বনাশ! যদি দিনের আলো থাকে, তাহ'লে দেখে তো ফেলবেই! আর যদি রাতই হয়, তখন তার হাতে তো মশাল বা লণ্ঠন একটা-কিছু থাকবেই!

হুম! কলওলা এসে যদি তাকে চিলেকোঠায় লুকিয়ে থাকতে দ্যাখে, তাহ'লে সোজা সে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, একদম পেড়ে ফেলবে তাকে, বেঁধে রেখে দেবে। কলওলা যদি বাধা দিতে চায়, যদি আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টা করে, যদি চেল্লাচিল্লি ক'রে চারপাশে শোর তুলে দেয়, তাহ'লে আর দেখতে হবে না, তার ছুরিটা তার সব চ্যাঁচামেচিকে স্তব্ধ ক'রে দেবে। এত বিপদ পেরিয়ে, এত ঝুঁকি সামলে সে এত দূরে আবার গ্রেফতার হ'তে আসেনি—মুক্তির জন্য সে সবকিছু করতে পারে—এমনকী খুন করতেও কোনো দ্বিধা করবে না।

কিন্তু তবু—তবু হয়তো এখনো রক্তপাতের কোনো প্রয়োজনই হবে না, হয়তো এখনো ও-রকম চূড়ান্ত-কিছু করবার দরকার হবে না তার...আর তাছাড়া ওই কলওলা খামকা এখন এই চিলেকোঠাতেই বা হানা দেবে কেন ?...তার তো এখন হাওয়াকলের তদারকি করার কথা, পাখা ঘুরছে বন-বন, তার সঙ্গে-সঙ্গে গম-পেষাইয়ের জাঁতাগুলো কেমন ঘুরছে, সেদিকেই তো সে নজর রাখবে এখন।

অক্ষদণ্ডের শব্দ হচ্ছে ক্যাঁচ-কোঁচ, পাখা ঘুরে যাচ্ছে একটানা, চাকার শব্দ, বাতাসের শোঁ-শোঁ, গম-পেষার শব্দ, জাঁতা ঘুরছে : আর এরই মধ্যে কেটে গেলো এক ঘণ্টা সময়। এ-রকম উঁচু অক্ষরেখায় সন্ধ্যা থাকে অনেকক্ষণ। আস্তে-আস্তে ছায়া ক'রে এলো চারপাশে। চিলেকোঠার ভিতরটায় অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে। এবার তাকে ধীরেসুস্থে রওনা দিতে হবে। রাতে ভারি কষ্ট হবে যেতে—আরো চব্বিশ মাইল না-গেলে কোনো আশ্রয়ই মিলবে না ; আর দেরি করা উচিত নয় তার, সম্ভব হ'লে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া উচিত।

খাপের মধ্যে ছুরিটা সহজে ও মসৃণভাবে নড়াচড়া করে কি না, সেটা সে একবার দেখে নিলে ; রিভলবারে পুরে নিলে ছটা গুলি।

এবার সেই মস্ত ঝক্কিটা : সরু ফোকরের মধ্যে শরীরটা গলিয়ে দিতে হবে এবার, লক্ষ রাখতে হবে সেই ঘূর্ণ্যমান অক্ষদণ্ড যাতে ছুঁয়ে না-ফ্যালে। একবার যদি অক্ষদণ্ডটা না-ছুঁয়েই ফোকরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, তাহ'লে নিচে নামতে আর কতক্ষণই বা!

নিঃশব্দে ধীরে-সুস্থে সে যেই ফোকরের দিকে এগোবে, এমন সময় হাওয়াকলের ক্যাঁচ-কোঁচ ছাপিয়ে আরেকটা আওয়াজ তার কানে এলো। ভারি জুতোর মশমশে আওয়াজ, কাঠের সিঁড়ির উপরে জুতোর শব্দ। লণ্ঠন হাতে কলওলা শেষকালে চিলেকোঠাতেই উঠে আসছে।

কলওলা যখন দেখা দিলে, ফেরারি তখন তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি—ধনুকের মধ্যে ছিলার মতো সে টান হ'য়ে আছে। কিন্তু চিলেকোঠার মেঝে বরাবর যখন কলওলার শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ দেখা গেলো, তখুনি কলওলা ফিশফিশ ক'রে বললে, 'ছোটো

বাবা*, এবার যাবার সময় হ'লো...আর দেরি কোরো না... নিচে নেমে এসো...দরজা খোলাই আছে।'

স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো ফেরারি, কোনো কথাই হাৎড়ে পেলে না সে। তাহ'লে কলওলা জানতো যে সে এখানে আছে...তাকে এই চিলেকোঠায় আশ্রয় নিতে সে আগেই দেখেছিলো ? ...হ্যাঁ, যখন সে ঘুমিয়েছিলো, তখনই নিশ্চয়ই কলওলা চিলেকাঠায় এসে হাজির হয়েছিলো ; তাকে ঘুমন্ত দেখে নিশ্চয়ই আর জাগাবার চেষ্টা করেনি। কারণ সেও তো তারই মতো স্লাভ একজন।... একবার দেখেই একজন স্লাভ অন্য স্লাভকে চিনে নিতে পারে।...লিভোনিয়ার পুলিশ যে তাকে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে, এটা নিশ্চয়ই কলওলা বুঝতে পেরেছিলো।...কেন তাড়া করছে, তা সে জানতে চায়নি, কিন্তু তাই ব'লে সারজেন্ট য়েক আর তার দলবলের হাতেও তাকে তুলে দিতে চায়নি সে।

'নেমে এসো নিচে,' চাপা গলায় বললে কলওলা।

বুকের মধ্যে তার যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। আবেগে তার সারা গা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। চুপচাপ সে নেমে এলো নিচে। নিচের তলার একদিকের দরজা খোলা।

'এই রইলো কিছু খাবার,' তার থলির মধ্যে কিছু শুকনো মাংস আর রুটি ভ'রে দিলে কলওলা। 'থলিটায় কিছু নেই, আগেই দেখেছিলুম।...ফ্লাস্কটাও তো ফাঁকা...ওটাও ভ'রে নাও, তারপর কেটে পড়ো...'

'কিন্তু...পুলিশ যদি জানতে পারে...'

'চেষ্টা কোরো তাদের এড়িয়ে চলতে। আর আমার কথা? ও নিয়ে কিচ্ছু ভেবো না.. আমি জানতেও চাই না তুমি কে... আমি শুধু জানি যে তুমি একজন স্লাভ, আর একজন স্লাভকে কি আরেকজন কখনো আলেমান পুলিশের হাতে তুলে দেয়!'

'ধন্যবাদ...ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতায় ফেরারির গলা বুজে এলো।

'তাহ'লে তুমি এসো, ছোটো বাবা। ভগবানই যেন তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান... তিনিই তোমাকে ক্ষমা করবেন, অবিশ্যি যদি তুমি ক্ষমা চাওয়ার মতো কোনো অপকর্ম ক'রে থাকো!'

+

আবার অন্ধকারে ঢাকা রাত্রি। উঁচু টিবিটার তলা দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে রাস্তা—ফাঁকা রাস্তা—কেউ কোথাও নেই। ফেরারি কলওলার দিকে পিছন ফিরে শেষবার হাত নেড়ে বিদায় নিলে, তারপর হনহন ক'রে চলতে শুরু ক'রে দিলে।

এই যে নতুন রাস্তাটা সে বেছে নিয়েছে, তাতে তাকে আজ রাত্তিরের মধ্যেই ফাললেন পৌঁছুতে হবে ; পৌঁছে সেখানে দিনটা কাটিয়ে দেবার মতো একটা গোপন ও নিরাপদ আশ্রয়ও খুঁজে বার করতে হবে। চব্বিশ মাইল...মনে-মনে সে হিশেব করলে : চব্বিশ মাইল পেরুতে হবে তাকে আজ রাত্তিরে। তারপরে আর মাত্র ছত্রিশ মাইল বাকি থাকবে পেরনাউ-এর। আরো দুটো রাত ; যদি দুম ক'রে হঠাৎ সব পরিকল্পনা ভেস্তে না-যায়, তাহ'লে ১১ই এপ্রিল

* ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার সাধারণ লোকেরা সাধারণতঃ পরস্পরকে 'ছোটো বাবা' বলেই সম্বোধন করতো, আর স্ত্রীলোক হ'লো বলতো 'ছোটো মা'

মাঝরাত্তির নাগাদ গিয়ে পৌঁছুতে পারবে পেরনাউ-এ। সেখানে তারপর লুকিয়ে থাকতে হবে তাকে—যতদিন-না কোনো জাহাজে গিয়ে ওঠবার সুযোগ আসে, ততদিন তাকে সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। বরফ গ'লে গেলেই অবিশ্যি বলটিকের জলে একের পর এক জাহাজ ছাড়বে—তার যে-কোনো একটায় জায়গা সে পাবেই।

হনহন ক'রে এগুচ্ছে সে, এইভাবে এগুতে পারলে ভাবনা নেই। এই পথে পড়ছে ফাঁকা সমভূমি, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আবার হঠাৎ কালো বনের ছায়ায় পথ গেছে এঁকেবেঁকে। কখনো-বা ছোটো টিলার তলা দিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে, সাবধানে কাটাতে হচ্ছে সংকীর্ণ একেকটা খাদ, কখনো-বা পেরিয়ে যাচ্ছে গ্র্যানাইট পাথরের ধার ঘেঁষে ব'য়ে-চলা জমাট নদী, গাছপালার তলায় নদীর স্রোতকে কে যেন 'তিষ্ঠ' ব'লে আঙুল তুলে থামিয়ে দিয়েছে, ঠাণ্ডায় জমিয়ে দিয়েছে। লেক পেইপুসের কাছে, পায়ের তলার বরফ ছিলো নিরেট, শুকনো, জমাট-বাঁধা—এখানে মাঝে-মাঝে পা পিছলে যাচ্ছে—বরফ গলা শুরু হয়েছে ব'লে। মাঝে-মাঝে, অনেকক্ষণ পরে-পরে, দেখা দিচ্ছে ঘুমন্ত গ্রাম, আশপাশের বরফ-ঢাকা মাঠ।

তাপমাত্রা বেশ বেড়ে যাচ্ছে। আদ্ধেক-গলা বরফ প্রায় যেন কাদাজল হ'য়ে গেছে। এ-বছর বরফ গলবে খুব তাড়াতাড়ি।

ফাললেন-এ পৌঁছুবার আগেই, ভোর রাতে, পাঁচটা নাগাদ ফেরারি এসে পৌঁছুলো একটা ফাঁকা ও পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপের ধারে। এখানেই তো সে লুকিয়ে থাকতে পারে। কলওলা যে রুটি-মাংস দিয়েছিলো তাতেই দিব্যি চাঙ্গা হ'য়ে নেয়া যাবে—একটু ঘুমিয়ে নিলে তো কথাই নেই, বেশ ঝরঝরে ও হালকা লাগবে।

সারাদিন ঘুমিয়ে কাটালো সে, গভীর ক্লান্তিহরণ ঘুম। তারপর সন্ধে ছটা নাগাদ আবার সে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। পেরনাউ আরো ছত্রিশ মাইল দূরে—আজ ৯ই এপ্রিল রাত্তিরে যদি আদ্ধেকটা পথ পেরিয়ে যেতে পারে, তাহ'লে আর মাত্র একটা রাত লাগবে—তার পরেই...

তাই হ'লো। সকালবেলায় তাকে থামতে হ'লো আবার, কিন্তু এবার তেমন সুবিধের কিছু পেলো না ব'লেই আশ্রয় নিতে হ'লো রাস্তার ধারের পাইন গাছের বনে। কোনো সরাইখানা বা খামার-বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম ও খাদ্য চাইবার চেয়ে এটা অনেক ভালো—অনেক ঝক্কি কম। ঐ কলওলার মতো সদয় গৃহস্বামী তো আর সুলভ নয় সবখানে।

বিকেলবেলায় সে ব'সে আছে ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে, হঠাৎ দেখতে পেলে একদল পুলিশ পেরনাউ-এর রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। পাইন বনের কাছে এসে পুলিশবাহিনী একটু থমকে দাঁড়ালে—আস্ত পাইন বনটাই তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখবে কিনা, হয়তো সেই কথাই ভাবলে একবার। কিন্তু তারপর, একটু বিশ্রাম ক'রে, তারা আবার রাস্তা ধ'রে এগিয়ে গেলো।

সন্ধেবেলায় ছটা নাগাদ ফেরারি আবার রাস্তায় নেমে পড়লো। নির্মেঘ আকাশ, ভরা চাঁদ উঠেছে আকাশে, হাসছে যেন তার দিকে তাকিয়ে মিটি-মিটি। রাত তিনটে নাগাদ পেরনোভ নদীর বাম তীরে এসে পৌঁছুলো সে—পেরনাউ আরো তিন মাইল উজানে। এগুতে গিয়েই এসে পৌঁছুলো শহরতলিতে। ছোটখাটো একটা সরাইখানায় গিয়ে দিন কাটালে কেমন হয়, সে ভাবলে একবার।

পেরনোভা নদীর বরফ গ'লে যাচ্ছে, বড়ো-বড়ো বরফের চাঙড় স্রোতে ভেসে চ'লে

যাচ্ছে উপসাগরের দিকে—দেখে তার ভারি ভালো লাগলো। আর কয়েকটা দিন কেবল, তার পরেই শেষ হবে তার এই অন্তহীন কুচকাওয়াজ, এই লম্বা পথ হাঁটা, তার পরেই শেষ হবে সব বিপদ-আপদ, সব অবসাদ।

অন্তত এই কথাই সে ভেবেছিলো।

হঠাৎ উঠেছিলো চিৎকারটা। ঠিক লেক পেইপুসের ধারে সে যে সম্ভাষণ শুনেছিলো ঠিক তেমনি একটা মুচমুচে টিউটনিক চিৎকার 'হ্বের ডা?' 'হুকুমদার!' কিন্তু এবার সম্ভাষণটা কোনো কাস্টমসের লোকের মুখ থেকে বেরোয়নি।

একদল পুলিশ নিয়ে যেন মাটি ফুঁড়ে এসে হাজির হয়েছে সারজেন্ট য়েক, এই রাস্তায় তারা টহল দিচ্ছিলো।

ফেরারি কেবল থমকে দাঁড়িয়েছিলো এক মুহূর্ত, তারপরেই লাফিয়ে নেমে গেলো টিলা থেকে।

'ঐ যে—ঐ লোকটা,' চেঁচিয়ে বললে একজন।

জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো সব—চোখের আড়ালে যাবে কী ক'রে এই চাঁদের আলোয়! য়েক আর তার শাগরেদরা তাড়া ক'রে ধেয়ে এলো পিছন-পিছন। কিন্তু এখন, এতদিন পরে, অবসাদে তার হাঁটুর জোড় যেন খুলে যেতে চাচ্ছে—কিছুতেই সে জোরে ছুটতে পারছিলো না। এই পুলিশদের হাত থেকে ছুটে সে পালাবে কী ক'রে? তারা তো আর তার মতো রাতের পর রাত মাইলের পর মাইল পথ হাঁটেনি!

'মরবো, কিন্তু ধরা দেবো না—কিছুতেই না!' সে ঠিক ক'রে ফেললে।

নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলো একটা মস্ত বরফের চাঁই—তীর থেকে পাঁচ-ছ গজ দিয়ে। মস্ত লাফ দিলে সে, প্রকাণ্ড ; লাফিয়ে গিয়ে পড়লো সে তার উপর!

'গুলি চালাও! গুলি!' য়েক চেঁচিয়ে উঠলো।

গুড়ুম! গুড়ুম! গ'র্জে উঠলো চারটে রিভলবার—ভাঙন-ধরা বরফের উপর গিয়ে পড়লো গুলিগুলো।

ফেরারি গিয়ে উপরে পড়তেই বরফের মস্ত চাঙড়টা জলের উপর এক পাক ঘুরে গেলো, তার পরেই স্রোতে ভেসে চ'লে গেলো দূরে। বরফ গলার সময় পেরনোভার জলে স্রোত থাকে দারুণ।

য়েক আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নদীর তীর ধ'রে তাড়া ক'রে এলো— বেশ অসুবিধেই হচ্ছিলো ছুটতে, চলন্ত বরফের চাঙড় লক্ষ ক'রে ঠিকমতো তাগ করাও যাচ্ছিলো না। বরং যাকে তারা ধাওয়া করছে তারই মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে বরফের চাঙড়গুলোর উপর দিয়ে যেতে পারতো তারা।

চেষ্টা করতে তারা ছাড়লে না। য়েক লাফিয়ে এলো সব আগে, পিছন-পিছন অন্যরা। হঠাৎ এমন সময় দারুণ একটা হুলুস্থুল উঠলো। নদী যেখানে সরু হ'য়ে গিয়ে ডানদিকে বাঁক ফিরেছে, সেখানে কয়েকটা ভাসমান বরফের চাঙড়ের সঙ্গে ফেরারিসমেত বরফের চাঙড়টার লাগলো এক বিষম ধাক্কা। চাঙড়টা তক্ষুনি এ-কাৎ হ'লো, ও-কাৎ হ'লো, পাক খেলো, আবার চাপা প'ড়ে মিলিয়ে গেলো। নদীর সরু বাঁকে অনেকগুলো মস্ত বরফের চাঙড় এসে আটকে প'ড়ে বাঁধের সৃষ্টি করেছিলো।

বরফের চাঙড়টা আটকে যেতেই পুলিশেরা এদিক-ওদিক দিয়ে ছুটে এলো। এক ঘন্টা ধ'রে তন্নতন্ন ক'রে তাকে খুঁজলো তারা। কেউ কোথাও নেই—শুধু শাদা তুষারমরু প'ড়ে আছে খাঁ খাঁ। ধাক্কা লেগে বরফের চাঙড়টা যখন উলটে পড়েছিলো, তখনই নিশ্চয়ই সে মারা গেছে।

'জ্যান্ত ধরতে পারলে হ'তো লোকটাকে...' প্যান-প্যান করলে একটি পুলিশ।

'জ্যান্ত ধরতে পরলে তো হ'তোই,' বললে সারজেন্ট য়েক, 'কিন্তু জ্যান্ত যখন তাকে পাকড়ানো গেলো না, তখন মৃতদেহটা পেলেও চলবে—তারই চেষ্টা করতে হবে আমাদের ।'

৩

নিকোলেফ পরিবার

পরের দিন ১২ই এপ্রিল। ব'সে কথা বলছিলো তিনজনে—অনেকক্ষণ ধ'রে তারা ব'সে আছে আরেকজনের অপেক্ষায়। রিগা শহরের একটা বাড়ির খাবার ঘর এটা ; সন্ধে হ'য়ে গেছে —সাতটা থেকে আটটার মধ্যে হবে সময়। শহরের এদিকটায় সব বাড়িই রুশীদের। এ-বাড়িটা খুব-একটা অবস্থাপন্ন লোকের নয় ; মধ্যবিত্তদের বাড়ির মতো, ইট-কাঠের তৈরি। এদিকটায় ইট-কাঠের বাড়ি খুব একটা নেই, বেশির ভাগ বাড়িই কাঠের । দেয়ালের গা কেটে বসানো হয়েছে চুল্লি ; সারাদিন ধ'রে চুল্লিটা জ্বলছে, ৬০° ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপ দিচ্ছে—বেশ গা-সওয়া গরম ; বাইরে দেয়ালের গায়ে তাপমান যন্ত্রে অবিশ্যি হিমাঙ্কর একটু উপরে উঠেছে পারদ। মাঝখানের টেবিলে জ্বলছে একটা ছোট্ট প্যারাফিন লণ্ঠন। মারবেল-পাথর বসানো একটা খাবার-গাড়ির উপর টগবগ ফুটছে স্যামোভার ; সাজানো পেয়ালা-পিরিচ দেখে বোঝা যায় চারজন লোকের চা খাবার কথা। কিন্তু চার-নম্বর ব্যক্তিটি তখনও এসে পৌঁছোয়নি, যদিও চল্লিশ মিনিট আগেই তার আসবার কথা ছিলো।

'দিমিত্রি বড্ড দেরি করছে,' অতিথিদের একজন মন্তব্য করলেন। ডবল জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি, রাস্তা দেখতে লাগলেন। বয়েস তাঁর পঞ্চাশ, পেশা ডাক্তারি, নাম হামিনে— ও-বাড়ির অনেক দিনের বন্ধু। পঁচিশ বছর যাবৎ রিগায় তিনি ডাক্তারি করছেন, মস্ত পশার, নামডাকও যথেষ্ট। অন্য ডাক্তাররা ঈর্ষা করলেও অত্যন্ত দয়া আছে ব'লে লোকজনের মধ্যে তাঁর দারুণ খাতির। তবে পেশাগত ঈর্ষা যে কত নিচে নামতে পারে, তা তো সব্বাই জানে—পৃথিবীর সবত্রই এই রকম। রুশদেশ তো আর সৃষ্টিছাড়া নয়।

দুই জানলার মাঝখানে দেয়ালে ঝুলছিলো এক পিতামহ-ঘড়ি। তার দিকে তাকিয়ে অতিথিদের আরেকজন বললেন, 'হ্যাঁ....আটটা প্রায় বাজে। কিন্তু মঁসিয় নিকোলেফের জন্য আরো সিকি ঘন্টা অপেক্ষা করা যেতে পারে— এবং ফরাশি দেশে আমরা বলি যে শেষ সিকি ঘন্টা পনেরো মিনিটের চেয়েও অনেক লম্বা হয়।' বক্তার নাম মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ—তিনি

রিগার ফরাশি রাজদূত। বয়েস চল্লিশ, দশ বছর যাবৎ এই শহরে আছেন। হাবভাবে চলনে-বলনে আভিজাত্য, সহজে মেজাজ খারাপ করেন না, স্বভাবটা শান্ত।

'বাবা পড়াতে গেছেন শহরের একেবারে অন্য প্রান্তে,' তৃতীয়জন ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলো, 'বড্ড দূর যেতে হয় তাঁকে, তাছাড়া এই দুর্যোগে যাতায়াত করাটাও খুব একটা সহজ নয়,—এই আদ্ধেক ঝড় আর আদ্ধেক বরফগলা...ফিরে যখন আসবেন, হাতে-পায়ে আর কোনো সাড় থাকবে না!'

'হুম!' ডাক্তার হামিনে বললেন, 'চুল্লিটা তো দেখছি আদালতের জজ-সাহেবের মতো নাক ডাকাচ্ছে!... ঘরের ভিতরটায় বেশ গরম আছে, তার উপর স্যামোভারটাও চুল্লির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে...কয়েক পেয়ালা চা গলায় ঢাললেই দিমিত্রির গা গরম হ'য়ে যাবে.... কিচ্ছু ভেবো না, ইল্‌কা।... আর তাছাড়া তার জন্য যদি ডাক্তার ডাকতে হয়, তাহ'লেও ঘরের বাইরে যেতে হবে না—আর ডাক্তারও তার অনেক দিনের বন্ধু!'

'আমরা তা জানি, ডাক্তার!' মেয়েটি হেসে ফেললো।

ইল্‌কা নিকোলেফ-এর বয়েস চব্বিশ—পুরোদস্তুর স্লাভ দেখতে। রিগার আলেমান মেয়েদের চেয়ে একেবারে আলাদা রকম দেখতে—তাদের গায়ের রঙ বড্ড লালচে, চোখগুলোও বড্ড বেশি নীল, চোখে কোনো ভাষা নেই, ধরনধারণ বড্ড টিউটনিক। ইল্‌কার চুল আর চোখের তারা কুচকুচে কালো—গায়ের রঙ বেশি ময়লা নয়, কেমন যেন একটা উষ্ণতা মাখানো, সোজা দাঁড়ায়, মুখচোখ সব যেন কেটে বসানো, চোখের দৃষ্টিতে রয়েছে কেমন একধরনের গাম্ভীর্য, কিন্তু সেই কঠোর গাম্ভীর্য মোলায়েম হ'য়ে যায়, যখন সে কারু দিকে তাকায়—চোখের তারার আড়ালে যেন কোনো অন্তহীন বিষাদ লুকোনো। গম্ভীর ধরনের ভাবুক মেয়ে, ছলাকলা বা চতুরালি নেই স্বভাবে বা পোশাকে, শাদাশিধে সাজে, কিন্তু রুচির ছাপ স্পষ্ট, —অর্থাৎ রুশী রক্তওলা লিভোনিয়ার তরুণীর এক নির্ভেজাল প্রতিভূ সে।

দিমিত্রি নিকোলেফ-এর স্ত্রী মারা গেছেন দশ বছর হ'লো। ইল্‌কাই কিন্তু তাঁর একমাত্র সন্তান নয়। ইলকার ভাই জাঁ আঠারোতে পড়বে শিগগিরই; ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ ক্লাসে পড়ে। ছেলেবেলায় ইল্‌কাই ছিলো জাঁ-এর মায়ের মতো— ও-রকমভাবে আর-কেউ তাকে ভালোবাসতে বা আদর করতেই পারতো না। ইল্‌কা যেভাবে সংসার চালায়, তাকে প্রায় বলা যায় অলৌকিক। না-হলে অত কম টাকায় সংসার চালিয়ে কিছুতেই জাঁ-কে হয়তো ও-রকম খরচ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেখে পড়ানো যেতো না।

দিমিত্রি নিকোলেফ-এর আয় কেবল ছাত্র পড়িয়ে। গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক তিনি, নিজের বিষয় তাঁর নখদর্পণে; বাপের টাকা ছিলো না, কাজেই পড়িয়ে ক-পয়সাই বা পান! অধ্যাপনার মজুরি সব দেশেই খুব কম, রুশদেশে তো আরো। লোকের শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রমকে যদি টাকার অঙ্কে হিশেব করা যেতো তো দিমিত্রিকে বলা যেতো ক্রোড়পতি, রিগার ধনকুবেরদের একজন—স্লাভদের মধ্যে সবচেয়ে গণ্যমান্যই বুঝি-বা হ'য়ে পড়তেন রিগায়। মঁসিয় দ্যালাপোর্ৎ আর ডাক্তার হামিনের কথাবার্তা থেকে সেটাই অনুমান হচ্ছিলো। কথাবার্তা হচ্ছিলো রুশ ভাষায়—শিক্ষিত রুশীরা অবিশ্যি ফরাশিতেই কথা বলে, কিন্তু দ্যালাপোর্ৎ চোস্ত রুশ বলেন, শিক্ষিত রুশীর কেতাদুরস্ত ফরাশির চেয়েও রুশ ভাষায় তিনি বেশি শড়গড়।

'আচ্ছা ডাক্তার,' মঁসিয় দ্যালাপোর্ৎ বলছিলেন, 'আন্দোলন শুরু হ'লে বলটিক

দেশগুলোর রাজনৈতিক অবস্থাই পালটে যাবে—আর ঠিক আন্দোলনের আগের মুহূর্তে আমরা কথা বলছি... দেখছেন তো এস্তোনিয়ার খবর-কাগজগুলো কেমন জমকালো আর্য ভাষায় গুজব রটাচ্ছে!'

'আস্তে-আস্তে সব হবে,' ডাক্তার ঘোষণা করলেন, 'বিপ্লব নয়, বিবর্তন। তবে এই আলেমানদের হাত থেকে শিগগিরই শাসন-ব্যবস্থা ও পৌরসভা মুক্তি পেয়ে যাবে—সে-দিনের আর দেরি নেই। এই যে আমাদের দেশের উপর ওদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রয়েছে—তা কি একটা অদ্ভুত জরদগব ব্যবস্থা নয় ?'

'দুর্ভাগ্যবশত,' ইল্‌কা বললে, 'যখন তাদের হাতে শাসনভার থাকবে না, তখনও তারা সর্বশক্তিমানই থাকবে— কারণ ওদের হাতে অঢেল টাকাকড়ি আছে। তারাই তো জমির মালিক—আর বড়ো-বড়ো চাকরি খালি হ'লে তো তারাই পায়।'

'বড়ো-বড়ো চাকরিগুলো,' দ্যলাপোর্ৎ বোঝালেন, 'না-হয় তাদের হাত থেকে কেড়ে নেয়া যাবে। কিন্তু জমিজমার ব্যাপারে ভারি মুশকিল হবে—যদি-বা একান্তই অসম্ভব না-হয়, সে-সম্বন্ধে কিছু করা যে অত্যন্ত কঠিন হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।...এক লিভোনিয়াতেই তো আলেমানদের হাতেই বেশির ভাগ জমি।'

অকাট্য তথ্য। বলটিক দেশগুলোর অভিজাত, প্রভাবশালী, নিদেন মধ্যবিত্ত কি ব্যাবসাদার সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই প্রায় টিউটনিক। এটা ঠিক যে এই আলেমানদের হাতে প'ড়ে অন্যরা কেউ-বা হয়েছে ক্যাথলিক, কেউ-বা হয়েছে প্রটেস্টান্ট, কিন্তু তবু কেউই একেবার পুরোদস্তুর জর্মান হ'য়ে যায়নি। ফিনদেরই গোত্রের লোক এই এস্তোনীয়রা—বেশির ভাগ লোকেই চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত থাকে; কিন্তু রেফেল, ডোরপাট, এমনকী সেন্ট পিটার্সবুর্গে পর্যন্ত অনেকগুলো খবরের কাগজ এস্তোনীয়দের দাবি ও অধিকার বজায় রাখবার জন্যে শোরগোল তুলেছে— কোথাও কেউ তাদের বৈদেশিক প্রভুদের উপরকার রাগ ও অনীহা চেপে রাখবার চেষ্টা করছে না।

দ্যলাপোর্ৎ আরো বললেন, 'আর এই স্লাভ ও আলেমান রক্তওলা রুশদের মধ্যে সংঘর্ষে কার যে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে, তা-ই এখনো আমি বুঝতে পারছি না!'

'সম্রাট কিছু করুন,' বললেন ডাক্তার হামিনে, 'তাঁর তো বিশুদ্ধ স্লাভ রক্ত। কী ক'রে আমাদের দেশ থেকে বৈদেশিক উৎপাত হঠানো যায় তিনি নিশ্চয়ই সেটা সবচেয়ে ভালো বুঝবেন।'

'সত্যিই একটা-কিছু করুন তিনি অবশেষে,' ইল্‌কা বেশ আবেগ দিয়েই বললে, 'সাতশো বছর ধ'রে, আলেমান বিজয়ের পর থেকে, আমাদের চাষীমজুররা বিজেতার অত্যাচার ঠেকাবার চেষ্টা করছে—অথচ আশ্চর্য, এখনও আলেমানরা এ-দেশে র'য়ে গেছে!'

'তোমার বাবা,' ইল্‌কাকে মনে করিয়ে দিলেন ডাক্তার, 'তোমার বাবা তো কী ভীষণ দুঃসাহসের সঙ্গে আমাদের হ'য়ে লড়েছেন।...তাঁরই হাতে স্লাভদের নেতৃত্ব পড়া উচিত—সেটাই সংগত হবে।'

'লড়েছেন যেমন, তেমনি দুর্ধর্ষ একেকটা শত্রুও তৈরি করেছেন,' মন্তব্য করলেন দ্যলাপোর্ৎ ।

'আর তাদের মধ্যে প্রধান হ'লো ইয়োহাউজেন ভাইগুলো,' ডাক্তার সায় দিলেন,

'ধনকুবের একেকটা ব্যাঙ্কার—দিমিত্রি নিকোলেফ যেদিন রিগা পৌরসভার ভার নেবে, সেদিন তারা তো একেবারে জ্ব'লে-পুড়ে মরবে! আমাদের শহরে রুশীদের সংখ্যা ছাব্বিশ হাজার, আর লাটরা সবশুদ্ধু চব্বিশ হাজার—অথচ আলেমানরা সংখ্যায় মাত্র চুয়াল্লিশ হাজার! স্লাভরাই দলে ভারি—আমি ঠিক জানি তারা নিকোলেফকেই ভোট দেবে!'

'বাবার তেমন উচ্চাশা নেই,' ইল্‌কা প্রতিবাদ করলে, 'কেবল স্লাভরা নিজের দেশে নিজেরা সব ভার পেলেই তিনি খুশি হবেন।'

'আগামী নির্বাচনেই সেটা হবে, মাদ্‌মোয়াজেল ইল্‌কা,' দ্যলাপোর্ৎ তাকে আশ্বস্ত করলেন, 'আর দিমিত্রি যদি নির্বাচনে দাঁড়াতে রাজি হয়...

'বাবার অবস্থা তো মোটেই সচ্ছল নয়—নির্বাচনে দাঁড়াতে গেলে মস্ত একটা বোঝা কাঁধে এসে চাপবে,' ইল্‌কা বাধা দিয়ে বললে, 'আর আপনি তো এটা জানেন, ডাক্তার, যে লোকসংখ্যার হিশেব থেকে যে-হদিশই মিলুক না কেন রিগা আসলে যতটা-না রুশ শহর, তার চেয়েও অনেক বেশি জর্মান।'

'দ্বিনা নদীর জল ব'য়ে যাক,' ডাক্তার আবেগে ভরে গেলেন, 'পুরোনো সব ধ্যান-ধারণা ভেসে যাবে তার জলে, উজান বেয়ে আসবে নতুন ধ্যান, নতুন ধারণা...আর সেই ঢেউয়ের পিঠে সওয়ার হবে দিমিত্রিই।'

'ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই, মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ। বাবাকে আপনারা খুবই ভালোবাসেন, কিন্তু আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। দ্যাখেননি কি মাঝে-মাঝে বাবা কেমন বিমর্ষ হ'য়ে পড়েন—আর তাঁর মন-খারাপ হয়েছে দেখলেই আমার ভারি অস্বস্তি হয়।'

দ্যলাপোর্ৎ ও হামিনে—দুজনেই দিমিত্রির এই হঠাৎ-হঠাৎ বিষণ্ণ হ'য়ে পড়াটা লক্ষ করেছিলেন। বেশ কিছুকাল ধ'রেই দিমিত্রি নিকোলেফ কী-একটা বিষয় নিয়ে যেন বড্ড ভাবিত হ'য়ে পড়েছেন। কিন্তু দিমিত্রি মানুষটা খুব চাপা ধরনের, সহজে কারু কাছে মন খোলেন না, ছেলেমেয়েদেরও সহজে কিছু বলেন না, এতদিনকার বন্ধু হামিনেকেও কিছু না। সেইজন্যেই কখনও অত্যন্ত ব্যাকুল ও চিন্তিত হ'য়ে পড়লে আরো জেদ ক'রে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি—কাজকর্মই তাঁর সান্ত্বনা ও আশ্রয়, হয়তো কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে সব ভুলে থাকতে চান। অবিশ্যি তৎসত্ত্বেও রিগার সমস্ত স্লাভ বাসিন্দাই তাঁকে নতুন পৌরসভার ভাবী প্রতিনিধি ব'লে মনে করতো।

+

এটা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বলটিক দেশগুলোকে রুশী ক'রে ফ্যালো—এই ভাবনাটা ততদিনে শতাব্দী-প্রাচীন হ'য়ে উঠেছে। একদিন এই দেশজোড়া জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্যাথরিন দি গ্রেট। বড়ো-বড়ো গ্রাম ও শহরের শাসনযন্ত্র থেকে ততদিনে জর্মান অপসারণের কাজ শুরু হ'য়ে গেছে; আঞ্চলিক পরিষদ্ গুলোর প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হ'লে নাগরিকদের ততদিনে বাধ্যতামূলকভাবে কতগুলো দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক হ'য়ে উঠেছে। বলটিক দেশগুলোর লোকসংখ্যা হবে প্রায় কুড়ি লক্ষ—তার মধ্যে ইহুদি সমেত আলেমানদের সংখ্যা হবে মাত্র দেড় লক্ষ। কাজেই রাজ্যপাল বা উচ্চপদে আসীন কর্মচারীদের পরিচালনায় স্লাভদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টাটা খুব সহজেই সফল হচ্ছিলো। দ্বন্দ্বটা

এখন শুরু হয়েছে পৌরসভা নিয়ে—বর্তমান পৌরসভায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব এক ব্যাঙ্কার পরিবারের—ইয়োহাউজেনদের।

রিগার শহরতলিতে, নিকোলেফ পরিবারের সাধারণ পৈতৃক বাড়িটা যেখানে ছিলো, অধ্যাপক নিকোলেফের শ্রদ্ধা ও সম্মান খুব;—এদিকটায় প্রায় আট হাজার রুশীর বাস।

ইল্‌কার বয়স চব্বিশ, কিন্তু এখনও যে তার বিয়ে হয়নি, তার কারণ কি দিমিত্রির আয় বেশি নয়? অন্যান্য দেশের মতো লিভোনিয়ার প্রচল কী? মেয়ের সুন্দর মুখই কি তার ঐশ্বর্য, তারপরে যৌতুক কি কেবল গুণপনা আর লাবণ্য হ'লেই চলে? না, এখানকার স্লাভদের মধ্যে টাকাকড়িই ভালো বিয়ের একমাত্র উপাদান নয়। সেইজন্যেই ইল্‌কার পাণিপ্রার্থনা ক'রে মাঝে-মাঝে যে প্রস্তাব আসতো না, তা নয়; কিন্তু আশ্চর্য, দিমিত্রি আর তাঁর কন্যা সব রাজযোটক বিয়ের প্রস্তাবও এতকাল বারে-বারে প্রত্যাখ্যান ক'রে এসেছেন।

তার একটা কারণ অবিশ্যি আছে। কয়েক বছর আগে দিমিত্রির এক বন্ধু মিখায়েল ইয়ানোফ ব'লে এক স্লাভের একমাত্র ছেলের সঙ্গে ইল্‌কার বিয়ে ঠিক হয়েছিলো। ইয়ানোফদের বাড়িও রিগায়, এই একই শহরতলিতে; ভ্লাদিমির ইয়ানোফ পাত্র হিশেবে যোগ্যই- -বয়েস তার বত্রিশ, ওকালতি করে, বেশ নাম করেছে এর মধ্যেই। বয়েসের ব্যবধান সত্ত্বেও ভ্লাদিমির আর ইল্‌কা ছেলেবেলা থেকেই একসঙ্গে বড়ো হয়েছে। এই গল্প শুরু হবার চার বছর আগে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, বাগ্‌দান হ'য়ে গিয়েছিলো—তরুণ ব্যবহারজীবীর বয়েস তখন ছিলো আটাশ, আর পাত্রীর বয়েস কুড়ি। ঠিক ছিলো বিয়েটা হবে সেই বছরেই। তবু বিয়ের কথা খুব-একটা রটানো হয়নি—দুই বাড়িরই গোপন কথা হ'য়ে ছিলো এটা। বাগ্‌দানের ব্যাপারটা এতই গোপনে ছিলো যে বন্ধুবান্ধবরা পর্যন্ত তার টুঁ-শব্দটি শোনেনি। তারপর যেই সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে বিয়ের উৎসব হবে, অমনি হঠাৎ সব জল্পনা ভেস্তে গেলো—এলো এক নিদারুণ আঘাত।

জারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে-সব গোষ্ঠী রচিত হয়েছিলো, তারই একটায় যোগ দিয়েছিলো ভ্লাদিমির ইয়ানোফ। এই গোষ্ঠি অবশ্য সরাসরি জারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নামেনি, কেবল আদর্শের দিক দিয়ে স্বৈরাচারকে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলো—কিন্তু সন্দেহপরায়ণ কর্তৃপক্ষ সরাসরি সংঘর্ষ আর আদর্শগত প্রত্যাখ্যানের মধ্যে কোনো ব্যবধান দেখতে পাননি।

সব চেষ্টার আশু মূলোচ্ছেদ করতে হ'লে আইনের বালাই রাখলে চলে না—তার উপর কর্তৃপক্ষ যা-খুশি তাই করতে পারে। কাজেই সারা দেশে ধরপাকড় শুরু হ'য়ে গেলো, শহরে-শহরে গ্রেফতার হ'লো লোক; রিগাতেও গ্রেফতার হ'লো একজন—ভ্লাদিমির ইয়ানোফকে তার বাড়ি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'লো, পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো পূর্ব-সাইবেরিয়ার মিনুসিংস্ক খনিতে। আর কি সে কোনোদিন ফিরে আসবে? সাইবেরিয়ায় একবার যে যায়, সে কি আর কখনও ফেরে? এই দুরাশা করবে কে?

দুই পরিবারই দারুণ ঘা খেলো এতে—সারা শহর তাদের সঙ্গে ব্যথিত হ'লো। এই চোটটা ইল্‌কা হয়তো সামলাতেই পারতো না, কিন্তু তার ভালোবাসাই তাকে জিইয়ে রেখে দিলে। বাগ্‌দত্তকে ছেড়ে সে থাকবে না, তার সঙ্গেই যাবে নির্বাসনে, কেবল কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেই হয়—আর সেই অনুমতি পাবার প্রত্যাশাতেই সে কোনোরকমে নিজেকে টিকিয়ে

রেখেছে। কিন্তু, ইতিমধ্যে, ভ্লাদিমিরের পরিণাম কী হয়েছে? সত্যি-সত্যি তাকে কোথায় পাঠানো হয়েছে, সে-খবর কিছুতেই পাওয়া গেলো না। এই চার বছরেও ইল্‌কা সে-সম্বন্ধে কোনো খবর পায়নি।

ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবার ছ-মাসের মধ্যেই মিখায়েল ইয়ানোফ টের পেলেন যে তাঁর অন্তিম দশা উপস্থিত। কালমাত্র বিলম্ব না ক'রে তিনি তাঁর সব সম্পত্তি বেচে দিলেন—বেশি হ'লো না, সবসুদ্ধ মাত্র ২০,০০০ রুবল পাওয়া গেলো ব্যাঙ্কনোটে—সব টাকা মিখায়েল পাঠিয়ে দিলেন দিমিত্রিকে, তাঁর ছেলের জন্য গচ্ছিত রাখলেন। কাজটা এমন গোপনে চোকানো হ'লো যে এমনকী ইল্‌কাও তা ঘুণাক্ষরেও টের পেলে না। সব টাকা দিমিত্রি গোপনে তুলে রেখে দিলেন।

কস্মিনকালেও যদি জগৎ থেকে মানুষের মর্যাদা ও বিশ্বাস হারিয়ে যায়, তবে তার শেষ আশ্রয় হবে লিভোনিয়া—এ-রকম একটা প্রবাদ আছে। এমন-সব চমকপ্রদ প্রেমিক-প্রেমিকারও খবর মেলে সেখানে, যারা নাকি এমনকী কুড়ি-পঁচিশ বছর ধ'রে দূর থেকে ভালোবেসে তবে বিয়ে করে—বিয়ে না-ক'রে এতদিন কাটাবার কারণ আর-কিছু নয়, তারা জীবনে প্রতিষ্ঠা না-পেয়ে কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না। ভ্লাদিমির আর ইল্‌কার বেলায় অবিশ্যি এ-কথা খাটে না—কারণ সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠায় কোনো প্রশ্নই তাদের মধ্যে ছিলো না। ইল্‌কার ছিলো না কিছুই, আর তরুণ ব্যবহারজীবীও তার কাছ থেকে কিছুই চায়নি—এমনকী তার বাবা তার জন্য কী রেখে গেছে, তাও সে জানতো না। তার ছিলো প্রচণ্ড মেধা ও প্রতিভা, আর ভবিষ্যৎকেও সে ডরাতো না। ভ্লাদিমির তো গেলো নির্বাসনে, কিন্তু ইল্‌কা জানতো যে তার বাগ্‌দত্ত তাকে কোনোকালেই ভুলে যাবে না, সেও তাকে কখনও ভুলতে পারবে না। 'যুগল আত্মা'র দেশ নয় কি লিভোনিয়া?...মাটির পৃথিবীতে প্রায়ই এই যমল আত্মার মিলন হয় না, যদি-না ভগবান দয়া করেন। না-হলে শাশ্বত মিলন ছাড়া আর উপায় কী—চিরন্তন মুহূর্তের মধ্যেই তাহ'লে পরস্পরে লীন হ'তে হয়।

ইল্‌কা ব'সেই রইলো পথ চেয়ে, আর তার মনপ্রাণ প'ড়ে রইলো ভ্লাদিমিরেরই সঙ্গে, নির্বাসনে। যদি ভগবানের দয়া হয়, যদি সে ক্ষমা পায়—সম্ভাবনা অবিশ্যি খুবই কম—কিন্তু যদি সে ফিরে আসে। নিজেকে তার শুধুমাত্র বাগ্‌দত্তা ব'লেই মনে হয় না, সে যেন তার পরিণীতা, তার স্ত্রী। ভ্লাদিমির যদি না-আসে তো সে-ই তার কাছে যাবার জন্যে অনুমতি চাইবে। কিন্তু সে চ'লে গেলে তার বাবার দশা কী হবে? একলা, বুড়োমানুষ বাবা!

সব সত্ত্বেও ইল্‌কা কিন্তু সবচেয়ে দামি কথাটাই জানতো না। দিমিত্রি নিকোলেফ কিছুতেই কিছু খুলে বলবেন না—যদিও কথাটার মধ্যে এমন-কিছু নেই, যেটা গোপন রাখা চলে। কিন্তু বলবেনই বা কেন? এই মুহূর্তের দুঃখকে আরো দুর্বিষহ ক'রে তুলে ভাবী বিপদের কথা ব'লে লাভ কী। শিগগিরই ইল্‌কা সব জানতে পারবে—ফয়সালা হবার দিন এগিয়ে এলো ব'লে।

দিমিত্রি নিকোলেফের বাবা রিগায় ব্যাবসা করতেন। মারা যাবার সময় ব্যাবসার অবস্থা মোটেই ভালো ছিলো না, ধারে-কর্জে ব্যাবসাটাই বিকিয়ে যেতে বসেছিলো। সেই ঋণ শোধ করতে গেলে চাই নগদ পঁচিশ হাজার রুবল। বাবা দেউলে হ'য়ে যান, এটা দিমিত্রি চাননি—কাজেই ঠিক করেছিলেন তিনিই সব ধার শোধ ক'রে দেবেন। নিজের স্থাবর-অস্থাবর সব

কুড়িয়ে-বাড়িয়ে মাত্র কয়েক হাজার রুবল তিনি যোগাড় করেছিলেন। বাকি টাকাটা শোধ ক'রে দেবার জন্যে সময় দেয়া হয়েছিলো তাঁকে; প্রভূত কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে একটু-একটু ক'রে বাকি টাকাটা তিনি অ্যাদ্দিন ধ'রে শোধ করছিলেন। উত্তমর্ণ আর কেউ নয়, ইয়োহাউজেনরা। দিমিত্রি নিকোলেফ পিতার ঋণ কাঁধে নিয়ে এতটাই জড়িয়ে পড়েছিলেন যে এখনো সে-টাকা তিনি শোধ করতে পারেননি—এখনও আঠারো হাজার রুবল দেনা রয়েছে, তাঁর কাছে যেটা একটা বিপুল অঙ্ক। এদিকে বকেয়া টাকা চুকিয়ে দেবার তারিখ হচ্ছে আগামি পনেরোই মে—আর পাঁচ সপ্তাহও বাকি নেই।

ইয়োহাউজেনরা আর দেরি করতে রাজি হবে না—নতুন কোনো তারিখই তারা দেবে না। শুধু যদি ব্যাঙ্কার বা ব্যাবসাদারদের সঙ্গে নিকোলেফের কারবার হ'তো, তাহ'লে না-হয় কথা ছিলো; কিন্তু ইয়োহাউজেনরা তাঁর রাজনৈতিক শত্রু—লোকের মতে তাঁরই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ইয়োহাউজেনদের বড়ো ভাই ফ্রাঙ্ক—সে-ই ব্যাবসার কর্ণধার ; ঐ দেনার দরুন সে তাঁকে প্রায় কিনে রেখেছে।

ফ্রাঙ্ক তাঁকে ছেড়ে কথা কইবে না—মোটেই দয়া করবে না।

ডাক্তার, রাজদূত আর ইল্‌কা আরো আধঘন্টা ধ'রে নানা বিষয়ে আলোচনা করলে, কিন্তু বাবার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ইল্‌কা ক্রমেই অস্থির হ'য়ে পড়ছিলো। হঠাৎ এমন সময় দিমিত্রি দরজার কড়া নাড়লেন।

দিমিত্রির বয়স মাত্র সাতচল্লিশ, কিন্তু দেখে মনে হয় বুঝি আরো দশ বছরের বড়ো। লম্বায় মাঝারি মাপের, দাড়িতে পাক ধরেছে, কপালে রেখা পড়েছে—বিষণ্ণ হ'লেই বা গম্ভীর হ'লেই ভাঁজ পড়ে কপালে, কিন্তু মানুষটা এমনিতে বেশ বলিষ্ঠ। মর্মভেদী দৃষ্টি তাঁর, যুবা বয়স থেকেই তাঁর চাউনি এই রকম—ভরাট গলা, যেন সোজা বুক থেকে আওয়াজ ওঠে।

বৃষ্টিভেজা কোট ছাড়তে-ছাড়তে ঘরে ঢুকলেন দিমিত্রি। টুপি খুলে রাখলেন একটা আরাম-চেয়ারের মাথায়, তারপর মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে দুই বন্ধুর হাত ধ'রে সজোরে ঝাঁকুনি দিলেন।

ইল্‌কা তিরস্কার ক'রে বললে, 'তুমি বড্ড দেরি করেছো, বাবা!'

'আটকে গেলুম হঠাৎ,' দিমিত্রি বললেন, 'বড্ড বেশিক্ষণ পড়াতে হ'লো।'

'নাও, চা নাও,' ইল্‌কা বললে।

'যত খুশি পড়াও, কিন্তু দেখো, খামকা ক্লান্ত হ'য়ো না,' ডাক্তার বললেন, 'নিজেকে এভাবে বাজে খরচ কোরো না, দিমিত্রি। তোমাকে দেখে আমার ভালো ঠেকছে না। কয়েকদিন বিশ্রাম নাও না।'

'বিশ্রাম? তা অবিশ্যি মন্দ নয়,' নিকোলেফ সায় দিলেন, 'তা, ও কিছু না—একটা রাত বিশ্রাম নিলেই আবার চাঙ্গা হ'য়ে উঠবো। নাও, তোমরাও চা নাও। তোমাদের মিথ্যে আটকে রাখতে চাই না। আজ একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে চাই।'

'বাবা, কী হয়েছে, বলো। কিচ্ছু লুকিয়ো না,' ইল্‌কা সোজা তার বাবার চোখের দিকে তাকালে।

'কিছু হয়নি। তুই যদি অত ভাবিস, শেষটায় হ্যমিনে আমার কাঁধে একটা মনগড়া অসুখ চাপিয়ে দেবে—আমাকে সারিয়ে তোলার সুখ পাবার জন্যে যা-তা একটা রোগের নাম

ব'লে বসবে!'

'উঁহু,' ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'কিছু-কিছু লোক আছে, যারা রোগ পুষে রাখে, কিছুতেই সারাতে চায় না।'

'নতুন কিছু শুনেছেন নাকি, মঁসিয় নিকোলেফ?' দ্যলাপোর্ৎ জিগেশ করলেন।

'উঁহু। কেবল শুনতে পেলুম গবর্নর-জেনারেল গোরকো হঠাৎ রিগায় ফিরে এসেছেন—অথচ তাঁর এখন সেন্ট পিটার্সবুর্গে থাকার কথা ছিলো।'

'বাঃ, চমৎকার!' ডাক্তার খুশি হ'য়ে উঠলেন, 'এ-খবর পেয়ে ইয়োহাউজেন খুব-একটা খুশি হবে ব'লে মনে হয় না। তার আবার ও-মহল্লায় তেমন দহরম-মহরম নেই।'

নিকোলেফের কপালে ভাঁজ পড়লো। দেনার দায়ে বিকিয়ে আছেন ব'লেই কি ইয়োহাউজেনের নাম শোনবামাত্র তিনি শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন!

চা তৈরি ছিলো—ইল্‌কা সবাইকে চা ঢেলে দিলে। আরো আধঘণ্টা সবাই মিলে আলোচনা হ'লো। বলটিক দেশগুলোর দশা কী, রিগার অবস্থাও কি তথৈবচ, স্লাভ-আলেমান সংঘর্ষ, রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয় উঠলো কথাপ্রসঙ্গে। রিগায় যে পৌরসভার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল আকার নেবে, সে-বিষয়ে কারুরই কোনো সন্দেহ দেখা গেলো না।

দিমিত্রি ব'সে-ব'সে কী যেন ভাবছিলেন। বড্ড আনমনা দেখাচ্ছিলো তাঁকে। যদিও মাঝে-মাঝেই তাঁর মত চাওয়া হচ্ছিলো তবু তিনি বিশেষ হুঁ-হাঁ করলেন না। তাঁর মন যেন অন্যত্র প'ড়ে আছে। কিন্তু কোথায়?... কেবল তিনিই জানেন। তাঁর কাছে যখন বিশদ মত চাওয়া হ'লো, তিনি কেবল দু-এক কথায় সারতে চাইলেন— কিন্তু তাঁর এই এড়িয়ে যাওয়াটা ডাক্তারের মোটেই মনঃপূত হলো না।

'শোনো, দিমিত্রি,' ডাক্তার ফের বললেন, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি আমাদের সঙ্গে মোটেই রিগায় ব'সে নেই।...কোনখানে প'ড়ে আছে তোমার মন?...নাকি তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছো?.. লোকে তোমাকে চায়, কর্তৃপক্ষও তোমার উপরেই সদয়...তুমি কি চাও যে ইয়োহাউজেনই আবার নির্বাচনে জিতুক?'

আবারও সেই নামটা। ওই নামটা শোনবামাত্র দিমিত্রির সর্বাঙ্গ কেবল কেঁপে ওঠে! 'হামিনে,' নিকোলেফ বললেন, 'ইয়োহাউজেনদের শক্তি কতটুকু তোমার জানা নেই।'

'ওরা যতটা ঢক্কানাদ করে, তার চেয়ে অনেক কম। সে তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে,' ডাক্তারও অমনি ব'লে উঠলেন।

+

সাড়ে-নটা বাজলো ঘড়িতে। ডাক্তার হামিনে আর মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ বিদায় নেবার জন্য উঠে পড়লেন। আবহাওয়া বিশ্রী হ'য়ে আছে। হাওয়ার ঝাপটা লাগছে জানলায়। কনকনে ঠাণ্ডা। বৃষ্টিও পড়ছে। বাইরে রাস্তার কোণে হাওয়া শোঁ-শোঁ শিস দিচ্ছে, এমনকী চিমনি দিয়ে হাওয়ার ঝাপটা আসছে মাঝে-মাঝে, আর অমনি লাফিয়ে নেচে উঠছে চুল্লির আগুন।

'কী ঝড় বাইরে!' দ্যলাপোর্ৎ ব'লে উঠলেন।

'এমনকি কোনো ডাক্তারও এই ঝড়বাদলে বাড়ি ছেড়ে বেরুতে চাইবে না,' হামিনে ঘোষণা করলেন। 'আসুন, দ্যলাপোর্ৎ। আমার কোচবাক্সে ক'রে আপনাকে পৌঁছে দেবো—আমার এই চাকাছাড়া দু-পেয়ে কোচবাক্স...'

অনেকদিনকার অভ্যাসবশত ডাক্তার ইল্‌কার কপালে চুমু খেলেন, বন্ধুর হাতে দিলেন মস্ত ও সহৃদয় ঝাঁকুনি—আর বন্ধু তাঁদের সদর দরজা অবধি পৌঁছে দিলেন। তারপরেই অতিথিরা ঝড়ের মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

ইল্‌কা গেলো বাবাকে শুভরাত্রি জানাতে। নিকোলেফ যেন অন্য দিনের চেয়েও একটু বেশি আদর করলেন মেয়েকে।

'আচ্ছা বাবা, ভালো কথা,' ইল্‌কা বললে, 'তোমার কাগজ তো দেখতে পেলুম না। ...পিয়ন দিয়ে যায়নি?'

'দিয়ে গেছে। সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরবার সময় পিয়নের সঙ্গে রাস্তায় দেখা—আমাকে হাতে-হাতেই দিয়ে দিয়েছে কাগজটা।'

'কোনো চিঠি আসেনি?'

'না, ইল্‌কা, চিঠি ছিলো না।'

রোজ, চার বছর ধ'রে রোজ রাত্রে সেই একই উত্তর—'না তো, চিঠি আসেনি তো।' চিঠি নেই—অন্তত সাইবেরিয়া থেকে কোনো চিঠি আসে না একদিনও। ইল্‌কার চোখের জলে একদিনও কোনো চিঠির তলায় ভ্লাদিমির ইয়ানোফ নামটা ধুয়ে যায় না—একদিনও না —কোনোদিনও না ।

'শুভরাত্রি, বাবা,' আস্তে বললে ইল্‌কা।

'শুভরাত্রি।'

৪

ডাকের গাড়িতে

পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে না-যেতে চাইলে বলটিক দেশগুলোর অন্তহীন সমভূমিতে পরিবহণ ব্যবস্থা রয়েছে মাত্র দুটি। এক হচ্ছে রেলপথ—রেফেল থেকে সেন্ট পিটার্সবুর্গ অব্দি মস্ত রাস্তা গেছে রেলের। আর আছে ডাকগাড়ি বা তেলেগ্যু, তাছাড়া আর-কোনো গাড়িই এদিকে চলে না— আর তেলেগ্যু হচ্ছে পাজির পাঝাড়া, দারুণ তার বদনাম—আসলে খামারের চার-চাকার বিশ্রী গাড়ি ছাড়া তা আর কিছু নয়। আর ডাক-বওয়া কোচবাক্সটি ততটা আদিম হয়তো নয়। ঠিক গোরুর গাড়ি নয়, বরং ডাকগাড়িকে বলা যায় রীতিমতো একটা শকটই —কিন্তু ভিতরটা নিঃসন্দেহে আরো আরামপ্রদ করা যেতো অনায়াসেই। তবে ঝড়-বৃষ্টি-হাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় বটে। ভিতরে বসবার জায়গা থাকে মাত্র চারটে-—সপ্তাহে দু-বার ক'রে এই ডাকের গাড়ি রিগা থেকে রেফেল-এ যাতায়াত করে।

১৩ই এপ্রিল সকালবেলায় রেফেল-এর উদ্দেশে যে-ডাকগাড়িটি ছাড়বে ব'লে অপেক্ষা করছিলো, তার একমাত্র যাত্রীটি তখনও এসে পৌঁছোয়নি। আগের দিনই যাত্রীটি আগাম মাশুল দিয়ে ডাকগাড়ির আসনটা ভাড়া ক'রে গিয়েছিলো। ভদ্রলোকের বয়েস হবে প্রায় পঞ্চাশ;

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় গাড়ি ছাড়বার সময় এসে হাজির হ'লো সে। দিব্যি হাসিখুশি মানুষ, প্রফুল্ল বয়ান, মুখে হাসিটি লেগেই আছে, বেশ তাগড়াই একটা জ্যাকেটে গা মুড়ে রেখে কানঢাকা মাথাঢাকা একটা ওভারকোট চাপিয়েছে তার উপর, বগলে আঁটো ক'রে ধ'রে রেখেছে একটা ব্রীফ-কেস।

আপিশে ঢুকতেই মেইল-কোচের কনডাকটার সম্ভাষণ জানালে, 'আরে—পোখ! তাহ'লে তুমিই ডাকগাড়ির আসন ভাড়া করেছিলে?'

'হ্যাঁ, ব্রোক্স।'

'তাহ'লে তেলেগুয়াতে গেলে তোমার আর মন ওঠে না আজকাল!...দিব্যি একটা তিন ঘোড়ার কোচবাক্স চাই নিজের তাঁবে!'

'আর তাছাড়া তোমার মতো সদাজাগ্রত প্রহরীও চাই কিনা!'

'অর্থাৎ, ছোটো বাবা, খরচের অঙ্কটা ধর্তব্যেই পড়ে না...'

'না, বিশেষ ক'রে টাকাটা যখন আমি দিচ্ছি না।'

'কে দিচ্ছে তাহ'লে?'

'বড়ো কর্তা স্বয়ং—হের ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন।'

'হুম!' কনডাকটার ব'লে উঠলেন, 'তা তিনি ইচ্ছে করলে অবিশ্যি আস্ত কোচবাক্সটাকেই কিনে নিতে পারেন!'

'তা ঠিকই বলেছো। তবে কিনা, ব্রোক্স, আমি কেবল একটা টিকিটই কিনেছি—দু-একজন সঙ্গী ছাড়া চলে কী করে। সঙ্গে কেউ থাকলে রাস্তাটা অত একঘেয়ে আর বিরক্তিকর ঠেকে না...'

'বেচারা! তা'হলে আজ তোমাকে সঙ্গী ছাড়াই যেতে হবে। এ-রকম অবিশ্যি রোজ হয় না, তবে আজকে...আজকে কেবল একটাই টিকিট বিক্রি হয়েছে, আর সেটা তোমার।'

'সে কি! আর কেউ যাবে না?'

'না। যদি-না রাস্তায় আর-কাউকে তুলে নিই তো সারাক্ষণ আমার সঙ্গেই বকবক করতে হবে...উঠে পড়ে, উঠে পড়ো। তা আর কী করবে—তাতে তো আর জখম হ'য়ে যাবে না! আর তুমি তো জানোই—একটু-আধটু কথাবার্তায় আমার কিছু এসে যায় না।'

'না, ব্রোক্স, তাতে আমারও কিছু ফোসকা পড়ে না।'

'কোথায় যাচ্ছো বলো দিকি?'

'একেবারে শেষ অব্দি—রেফেল-এ—ইয়োহাউজেনের এক প্রতিনিধির কাছে।' ব'লে পোখ তার ব্রীফ-কেসের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে ইঙ্গিত করলে— তামার শেকল দিয়ে ব্রীফ-কেসটা তার কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধা।

'আরে-আরে, ছোটো বাবা,' ব্রোক্স বললে, 'ও-রকমভাবে কথা বোলো না!...আমাদের দেখছি শেষ অব্দি একা যেতে হবে না!'

সত্যিই সেই সময়ে আরেকটি যাত্রী হন্তদন্তভাবে আপিশে এসে ঢুকে পড়েছিলো। পোখ-এর ইঙ্গিতটা সে দেখেছে কিনা, ঠিক বলবার জো নেই।

কেউ যাতে তাকে চিনতে না-পারে, যাত্রীটি সেইজন্য যথেষ্ট সাবধান হ'য়ে এসেছে।

আপাদমস্তক মুড়ে রেখেছে ওভারকোটে, টুপিটা শুদ্ধু চোখ পর্যন্ত নামিয়ে সে মুখ ঢেকে রেখেছে। কনডাকটারের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে জিগেশ করলে, 'কোচবাক্সে আর-কোনো খালি আসন আছে?'

'তিন-তিনটে আসন খালি পড়ে আছে,' উত্তর দিলে ব্রোক্স।

'একটা হ'লেই চলবে।'

'কদ্দুর যাবেন? রেফেল?'

'হ্যাঁ...রেফেল,' একটু ইতস্তত ক'রে বললে যাত্রীটি, তারপর কাগজের নোটে ভাড়ার টাকা গুনতে-গুনতে কাটা-কাটা গলায় জিগেশ করলে, 'কখন ছাড়বে?'

'দশ মিনিটের মধ্যেই।'

'সন্ধেবেলায় কোথায় গিয়ে পৌঁছবো?'

'আবহাওয়া খারাপ না-থাকলে পেরনাউ অবধি চ'লে যেতে পারবো। তবে এই ঠাণ্ডা ঝড়-বাদলে সে কি আর ঠিক ক'রে বলা যায়?'

'কী মনে হয় তোমার? রাস্তায় থামতে-টামতে হবে নাকি?' এবার কথাটা জিগেশ করলে পোখ।

'হুম,' ব্রোক্সকে একটু ভাবিতই দেখালো, 'আকাশের চেহারা তো ভালো ঠেকছে না। বড্ড তাড়াতাড়ি মেঘ জমছে!...তবে কেবল যদি বৃষ্টি পড়ে তাহ'লে ভয় পাই না। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি তুষার-ঝুরিও নেমে বসে...'

'ব্রোক্স, শোনো, পাশের ঘোড়ার সোয়ারদের যদি একটু-আধটু ভোদকা গিলতে দাও, তাহ'লে কাল সন্ধের মধ্যেই আমরা রেফেল পৌঁছে যাবো।'

'আশা তো করি তাই। ছত্রিশ ঘণ্টা—তার বেশি সচরাচর লাগে না।'

'তাহ'লে,' পোখ বললে, 'এক্ষুনি রওনা হ'য়ে পড়লে হয় না? খামকা পায়চারি ক'রে কী লাভ?'

'ঘোড়াগুলো তো তৈরিই আছে, জিন পরানো, লাগাম মুখে,' বোক্স বললে, 'আর কারু জন্যে অপেক্ষাও করছি না...এক পেয়ালা গলায় ঢালা যাক পোখ, চাঙ্গা হয়ে নেয়া যাক —স্নাপ্স না ভোদকা?'

'স্নাপ্স,' ব্যাঙ্কের হরকরা জানালে।

গেলো দুজনে সরাইখানায়। কোচোয়ানের সহকারী—যে পাশের ঘোড়াটা শামলাবে—তাকেও পিছন-পিছন আসতে ইঙ্গিত ক'রে গেলো। দু-মিনিট বাদেই তারা ফিরে এলো কোচবাক্সে। অচেনা যাত্রীটি ততক্ষণে নিজের জায়গায় গিয়ে বসেছে। পোখ তার পাশে গিয়ে বসলো, চাকার শব্দ হ'লো ঘড়ঘড়, আর ঘোড়ার খুরের শব্দ মিশে গেলো তার সঙ্গে। যে-তিনটে ঘোড়া কোচবাক্সে জোতা হয়েছিলো, তারা আকারে ছোটো কিন্তু ভারি তেজিয়ান ও টগবগে। শিস দিলেই কাজ হয়—জোর কদমে ছুটে চলে তারা।

ইয়োহাউজেন ব্যাঙ্কে অনেক দিন ধ'রে চাকরি করছে পোখ। চাকরিতে ঢুকেছিলো অত্যন্ত অল্প বয়েসে, একেবারে পেনশন নেবার আগে পর্যন্ত এই কাজই সে ক'রে যাবে। প্রভুর আস্থাভাজন সে, প্রায়ই মস্ত বড়ো-বড়ো অঙ্ক নিয়ে ব্যাঙ্কের নানা জায়গার প্রতিনিধিদের কাছে যেতে হয় তাকে—যেতে হয় রেফেল, পেরনাউ, মিট্টাউ বা ডোরপাট—শুধু

কোচবাক্সওলাদের হাতে এত টাকা ছেড়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় ব'লেই এ-সব ক্ষেত্রে সে সঙ্গে যায়। তার ব্রীফকেসে এখন আছে পনেরো হাজার রুবল। রেফেল-এর প্রতিনিধির হাতে এ-টাকাটা তুলে দিয়ে আবার সে রিগায় ফিরে আসবে।

যত শিগগির ফিরে আসতে পারে ততই ভালো। ফেরার তাড়াটা মস্ত। কেন তার এত তাড়াহুড়ো, তা হয়তো ব্রোক্সের সঙ্গে তার কথাবার্তা থেকেই আমরা জেনে নিতে পারবো।

+

রুশী ধরনে লাগাম ধ'রে আছে কোচোয়ান, হাত দুটো সামনে বাড়ানো, ঘোড়াগুলোকে তাড়া দিচ্ছে খুব ক'রে। শহরের উত্তরভাগ থেকে রওনা হয়েছিলো গাড়ি—এখন অনন্ত স্তেপির উপর দিয়ে গেছে মস্ত রাস্তা—আর তারই উপর দিয়ে যাচ্ছে কোচবাক্স।

আকাশের চেহারা মোটেই আশাপ্রদ নয়, ব্রোক্স আগেই সেটা দেখিয়েছিলো। মাঝে-মাঝে ভীষণ দমকা হাওয়া ঝাপটা মেরে যাচ্ছে—সূর্য যখন দিগন্তের উপরে উঠলো, ঝোড়ো হাওয়ার প্রতাপও আরো বেড়ে গেলো। তবে ভাগ্য ভালো যে হাওয়া বইছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে।

কুড়ি মাইল পর-পর একেকটা ঘাঁটি আছে—সেখানে কোচবাক্সের ঘোড়া বদল করার ব্যবস্থা আছে, যাতে যাত্রীরা সুস্থ ও সতেজ ঘোড়ায় যেতে পারে—ক্লান্ত ঘোড়ার জন্য যাতে খামকা বেশি দেরি না-হয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পোখ-এর মেজাজটা বিগড়ে গেলো। হাজার চেষ্টা ক'রেও সে তার সহযাত্রীর মুখ থেকে টুঁ শব্দটি বার করতে পারলে না—লোকটা যেন মুখে কুলুপ এঁটে ব'সে আছে, কিছুতেই গল্পগুজবে যোগ দেবে না, সে ব'সে আছে গুটিশুটি মেরে এককোনায়, টুপিটা একেবারে চোখ অব্দি নামানো—কাউকেই সে তার শ্রীমুখ দেখাতে চায় না বোধহয়, এবং হয় সে ঘুমিয়ে পড়েছে, নয়তো ঘুমের ভান করছে। পোখ কত কথা পাড়লে, কিন্তু কোনো কথারই কোনো উত্তর এলো না।

এদিকে সারাক্ষণ বকবক না-করলে পোখ-এর আবার পেটের খাদ্য হজম হয় না, কাজেই ব্রোক্সের সঙ্গেই গল্প-গাছা করতে হ'লো তাকে শেষটায়। বোক্স বসেছিলো কোচোয়ানের পাশে, চামড়ার একটা মাথাঢাকায় নিজেকে মুড়ে রেখেছিলো সে— যাতে হাওয়ার ঝাপটা গায়ে না-লাগে। তবু কোচবাক্সের সামনে জানলার পাল্লাটা তুলে তারই সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে বাঁচলো পোখ। আর কোচবাক্সের রক্ষীটিও যেহেতু আড্ডা দিতে পারলে আর কিছু চায় না, তারও জিভ যেহেতু সারাক্ষণ শুড়শুড় করে, তাই তাদের বকর-বকর আর কিছুতেই থামতে চাচ্ছিলো না।

এবং চতুর্থবার আবার পোখ তাকে জিগেশ করলে, 'ঠিক বলছো তো, ব্রোক্স? কাল সন্ধের মধ্যেই রেফেল-এ পৌঁছুতে পারবো তো?'

'হ্যাঁ, পোখ—যদি অবশ্য আবহাওয়া একেবারে বেশামাল হ'য়ে না-ওঠে। রাত্তিরে গাড়ি চালানো অসম্ভব হ'য়ে না-উঠলে আমরা ঠিক সময়েই পৌঁছে যাবো।'

'আর রেফেল-এ পৌঁছুবার চব্বিশ ঘণ্টা পরেই কোচবাক্স আবার ফিরে আসবে তো?'

'হ্যাঁ, চব্বিশ ঘণ্টা পরেই আবার রওনা হবে,' ব্রোক্স তাকে আশ্বস্ত করলে, 'ওই ভাবেই

তো টাইম-টেবিল তৈরি হয়েছে।'

'আবার তুমিই তো আমাকে রিগায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে?'

'হ্যাঁ পোখ, আমিই—'

'সন্ত মিখায়েল-এর দোহাই—ইশ, এটা যদি ফিরতি পথ হ'তো—তোমার সঙ্গেই ফিরে আসছি, এটা যদি হ'তো!'

'তা তোমার অত তাড়া কীসের পোখ? আর আমার সঙ্গেই বা ফিরতে চাচ্ছো কেন?'

'কারণ তোমার একটা নেমন্তন্ন আছে, ব্রোক্স!'

'নেমন্তন্ন? আমার?'

'হ্যাঁ, তোমার। আর এই নেমন্তন্নে যেতে তোমার ভালোই লাগবে। ভালো-ভালো খাবার, দামি মদ—আর সঙ্গীরাও খুব ভালো।'

'তা,' ব্রোক্স ঠোঁট চাটলো, 'ও-রকম একটা নেমন্তন্ন আমার পছন্দ না-হ'লে আমি নিজের উপরেই যে চ'টে যাবো তা সত্যি... কেউ বুঝি ভূরিভোজ দিচ্ছে!'

'দূর! তার চেয়েও বেশি। একটা সত্যিকার বিয়ের ভোজ।'

'বিয়ের ভোজ!' ব্রোক্স একটু অবাকই হ'লো, 'তা বিয়ের ভোজে খামকা আমাকে নেমন্তন্ন করবে কেন কেউ?'

'করবে এই জন্য যে বর তোমাকে খুব ভালোভাবে চেনে, জানে।'

'বর আমাকে চেনে?'

'কনেও তোমাকে চেনে।'

'তাহ'লে,' ব্রোক্স ঘোষণা করলে, 'এই সুখী যুগল কারা সেটা না-জেনেই আমি নেমন্তন্নটা গ্রহণ করছি।'

'জানবে না কেন? আমিই তোমাকে বলবো।'

'তাদের নাম বলার আগে, পোখ, এ-কথা আমাকে বলতে দাও যে ঐ ভাবী বরবধূ—তারা ভারি চমৎকার মানুষ।'

'চমৎকার মানুষ যে, তাতে আর সন্দেহ কী? কারণ আমিই সেই ভাবী বর কি না!'

'তুমি, পোখ!'

'হ্যাঁ ব্রোক্স, আমি। আর কনে কে জানো—ভজেনাইদা পারেনসোফ!'

'ওঃ, চমৎকার! সত্যি, এর পরে আমার আর-কোনো দ্বিধা নেই!'

'শুনে তুমি আবাক হ'লে নাকি?'

'উঁহু, মোটেই না। আর পোখ, তোমার বয়েস পঞ্চাশ হ'লেও এটা ঠিক জানি যে তোমরা দুজনেই বিয়ের পরে খুব সুখে থাকবে।'

'আমার বয়েস পঞ্চাশ, আর ভজেনাইদার পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু তাতে কী এসে যায়। কয়েক দিনের জন্যে তো আমরা সুখী হ'তে পারবো—আর সেটাই আসল। বুঝলে ব্রোক্স, যদি কখনো তুমি প্রেমে প'ড়ে যাও, তাহলে কিন্তু হুড়মুড় ক'রে বিয়ে ক'রে বোসো না —যদ্দিন পারো, বিয়েটা পিছিয়ে দিয়ো। আমি আর ভজেনাইদা প্রেমে পড়েছিলুম পঁচিশ বছর আগে—তখন আমার বয়েস ছিলো পঁচিশ, আর ভজেনাইদার কুড়ি। কিন্তু দুজনের সব টাকা কুড়িয়ে-বাড়িয়েই

কুল্লে একশো রুবলও হয়নি—কাজেই অপেক্ষা করাটাই ছিলো বুদ্ধিমানের কাজ। অন্তত যদ্দিন-না আমার কিছুটা টাকা জমে, আর তারও কিছু যৌতুক যোগাড় হয়, তদ্দিন আর ভাগাভাগি ক'রে নেবার কী ছিলো বলো? এখন অবশেষে আমার পকেটে কিছু টাকা জমেছে—লিভোনিয়ার গরিব লোকদের পক্ষে কিছু টাকা জমানোই কী অসম্ভব কাজ, তা তো জানো! যাই হোক, বছরের পর বছর ধ'রে আমরা কেবল আশাই ক'রে গেছি—কিন্তু তাতে ভালোবাসায় ভাটা পড়েনি। তারপর অবশেষে একদিন ভবিষ্যতের ভার ও ভাবনা চ'লে গেলো।'

'তুমি হক কথাই বলেছো, পোখ।'

'ইয়োহাউজেন ব্যাঙ্কে আমার চাকরিটা এখন বেশ ভালো—বছরে পাঁচশো রুবল মাইনে। বড়ো কর্তা বলেছেন, বিয়ের পরে আরো-কিছু বাড়িয়ে দেবেন। আর ভজেনাইদারও অল্পস্বল্প কিছু আছে। কাজেই আমরা এক অর্থে এখন বেশ ধনীই—মানে আমাদের পক্ষে যতটা ধনী হওয়া সম্ভব। তাহ'লেও এই ব্রীফ-কেসে যত টাকা আছে, তার সিকির সিকিও আমাদের নেই—'

পোখ থেমে তার সহযাত্রীর দিকে সন্দেহের চোখে তাকালে। লোকটা সেই থেকে একবারও নড়েনি—বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে । হয়তো পোখ এরই মধ্যে বড্ড বেশি কথা ব'লে ফেলেছে।... তারপর পোখ আবার বলতে লাগলো, 'হ্যাঁ, ব্রোক্স—আমাদের নিজের ধরনে এখন বেশ ধনীই হ'য়ে পড়েছি! যা টাকাকড়ি আছে, তা দিয়ে ভজেনাইদা বোধ হয় একটা ছোটোখাটো মনোহারী দোকান খুলে বসবে।...বন্দরের কাছে একটা ছোট্ট মনোহারী দোকান বিক্রি হচ্ছে শিগগিরই।'

'অন্তত একজন ভালো খদ্দের পাবে তোমরা, এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,' ব্রোক্স জানালে।

'ধন্যবাদ, ব্রোক্স, আগাম ধন্যবাদ দিচ্ছি। বিয়েতে তোমাদের যে-খানা খাওয়ানো হবে, অন্তত তার জন্যেই তোমার আমাদের দোকানের খদ্দের হ'য়ে পড়া উচিত।'

'কোথায় খাওয়াবে?'

'ভজেনাইদাদের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। বিয়ের পোশাকে ভজেনাইদাকে কী সুন্দর দেখাবে, দেখে নিয়ো! মাথায় থাকবে মার্টলের টোপর, মাদাম ইয়োহাউজেন আবার ওকে একটা নেকলেসও দিয়েছেন।'

'তা তো বটেই!... ভজেনাইদার মতো ভালো মেয়ের সুন্দরী না-হ'য়ে উপায় কী! তা, বিয়েটা কবে?'

'আর চারদিন পরে, ব্রোক্স—ষোলো তারিখে। আর সেইজন্যেই তো আমি তোমাকে অত তাড়া দিচ্ছি। কোচোয়ানকে একটু বেশ ক'রে কড়কে দাও তো হে—না-হয় এদের দু-এক গেলাশ ভোদকাই খাইয়ে দেবো। কিন্তু ঘোড়াগুলো যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে না ছোটে! আরে বাপু, বিয়ের বর যাচ্ছে তোমাদের কোচবাক্সে—এক যাত্রাতেই তাকে বুড়ো হ'য়ে গেলে চলবে কেন?'

'না না, তা কী হয়! বুড়ো বরকে ভজেনাইদা হয়তো আর পছন্দই করবে না,' ব'লে ব্রোক্স হো-হো ক'রে হেসে উঠলো ।

'উঁহু! ভজেনাইদা মোটেই সে-রকম মেয়ে নয়!...আমার বয়স যদি আরো কুড়ি বছর

বেশিও হ'তো, তবু সে আমাকেই চাইতো।'

ব্রোক্সের সঙ্গে পোখের এই হার্দ্য সম্পর্ক ও বন্ধুতার ফলেই শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো যে কোচোয়ান ও সহিসরা ঢক-ঢক ক'রে কিছুটা শ্নাপ্‌স গলায় ঢেলে নিয়ে এমনই তাড়াহুড়ো ক'রে গাড়ি ছোটালে যে রিগার ডাকগাড়ি কস্মিনকালেও এর আগে এত জোরে ছোটেনি। কুড়ি মাইল পর-পর ঘোড়াগুলো বদল হয়, জিন খোলা হয়, লাগাম খোলা হয়, ব্রোক্স আর পোখ মাটিতে নেমে আড়মোড়া ভেঙে হাত-পাগুলো একটু টান-টান ক'রে নেয়। কিন্তু সেই অচেনা যাত্রীটি একবারও তার আসন ছেড়ে উঠলো না, যদিও পোখরা নেমে গেলেই মাঝে-মাঝে সে জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলো।

'আমাদের সহযাত্রী দেখছি খুব-একটা অস্থির নয় ; যাকে বলে জাড্য, তাতেই সে ভরা,' বললে পোখ।

'তেমন বলিয়ে-কইয়ে লোকও তো নয়,' বললে ব্রোক্স।

'জানো নাকি লোকটাকে? কে সে?'

'জানি না। আরে বাপ্‌ তার দাড়ির রঙটা যে কী, তাই কখনো দেখিনি ।'

'দুপুরবেলায় যখন আবার আরেক দফা বদলানো হবে, আর আমরা খাওয়াদাওয়া করবো, তখন অবিশ্যি তাকে শ্রীমুখ দেখাতে হবে...'

'সে যেমন বলিয়ে-কইয়ে, খাইয়েও যদি সে তেমনি তাহ'লে অবিশ্যি তার দরকার হবে না,' তক্ষুনি ফোড়ন কাটলে ব্রোক্স।

বেলা একটা নাগাদ গাড়ি ঢুকলো একটা মস্ত গ্রামে। এখানে আরেক দফা ঘোড়া বদলানো হয়, সহিস কোচোয়ান জিরিয়ে নেয়, যাত্রীরা মধ্যাহ্নভোজ সাঙ্গ করে। বড়োশড়ো একটা সরাইখানা আছে এই গ্রামে, আরামের ব্যবস্থা আছে, আর সেখানে যাত্রীরা বেশ ভূরিভোজ ক'রে নেয় : শুয়োরছানার স্টু, কুষ্মাণ্ডর শুরুয়া, কালো রুটির কয়েক টুকরো, দিনা নদীর স্যালমন মাছ, শব্জিসমেত টাটকা বেকন, কাভিয়ার, আদা-কুঁচি, মুলোর টুকরো, জামের চাটনি এবং স্যামোভার থেকে সদ্য নামানো ধোঁয়া-ওঠা অনিবার্য চা। চমৎকার ভোজ যাকে বলে, আর এই ভোজ ব্রোক্স আর পোখ-এর মেজাজ সারাদিনের জন্য বেশ শরীফ ক'রে রাখলে।

অন্য যাত্রীটির উপরে কিন্তু এই মুখরোচক খাদ্যতালিকা তেমন সুখকর প্রভাব ফেললে না। রেকাবি ভর্তি খাবার নিয়ে সে গিয়ে বেছে-বেছে বসলো ঘরের এককোনায়, মাথার টুপি একবারও খুললো না, একবারও তার পাক-ধরা দাড়ি-গোঁফ দেখতে দিলে না কাউকে। খামকাই পোখ আর ব্রোক্স উঁকিঝুঁকি দিয়ে তার মুখটা নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করলে, কিন্তু সে তার কোনো সুযোগই দিলে না। চটপট নিজের খাবার খেয়ে নিয়ে অন্যদের অনেক আগেই গিয়ে নিজের আসন আবার দখল ক'রে বসলো।

'লোকটা কে বলো তো? আমরা কি তা কক্‌খনো জানতেও পাবো না?' জিগেশ করলে পোখ।

'আচ্ছা, আমি তোমাকে বলছি লোকটা কে,' বললে ব্রোক্স।

'তুমি ওকে চেনো নাকি?'

'নিশ্চয়ই। ঠিকঠাক ভাড়া দিয়ে একজন এসে গাড়িতে উঠেছে—বাস্‌! এই পরিচয়ই আমার কাছে যথেষ্ট।'

দুটো বাজতে যখন কয়েক মিনিট বাকি, তখন আবার কোচবাক্স ছেড়ে দিলে। এবার বেশ জোর কদমেই ছুটছে ঘোড়াগুলো। সহিস কোচোয়ানের মুখে খই ফুটছে, সপ-সপ ক'রে চাবুকের শব্দ হচ্ছে হাওয়ায় আর খুরের শব্দ হচ্ছে খটাখট। পোখ বোধহয় এতক্ষণে তার সব খবরের তহবিল শেষ ক'রে ফেলেছিলো, কারণ এখন আর কনডাকটারের সঙ্গে তার কথাবার্তা তেমন জমলো না। তাছাড়া পেটভর্তি নরম-গরম সুস্বাদু খাবার, তার উপর ভোদকার ভাপ, কাজেই একটু পরেই সে ঘুমে ঢুলে পড়লো—ঘোড়ার খুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার হেলানো মাথাটা নড়তে লাগলো। মিনিট পনেরোর মধ্যেই গভীর ঘুমে ঢ'লে পড়লো সে—সম্ভবত ভজেনাইদা পারেনসোফের দিব্য ও লাবণ্যময় উপস্থিতিতে তার স্বপ্নাতুর ঘুম ভ'রে গিয়েছে।

কিন্তু আবহাওয়া তখন ক্রমেই খারাপ হ'য়ে আসছে। নিচু ভারি মেঘ ঝুলে আছে আকাশে। আর কোচবাক্স যাচ্ছে একটা জলাভূমি দিয়ে—ঠিক ঘোড়ার গাড়ি যাবার উপযুক্ত রাস্তা এটা নয়, ছোটো-ছোটো জলের ধারায় মাটি কীরকম ভেজা-ভেজা আর নরম, কতগুলো জায়গা বেশ এবড়োখেবড়ো।

মাটি যে-সব জায়গায় বড্ড বেশি নরম হ'য়ে পড়েছিলো, সে-সব জায়গায় গাছের ডাল কেটে পাতা হয়েছে, যাতে চাকা মাটির মধ্যে ব'সে না-যায়। কিন্তু পদাতিকদের পক্ষেই তা যথেষ্ট নয়, কোনো যানবাহনের তো কথাই নেই। কতগুলো গাছের ডাল বড্ড বাজেভাবে পাতা হয়েছিলো, কোচবাক্সের চাকার তলায় তারা একেবারে ডেবে ব'সে গেলো বা কখনো সজোরে ন'ড়ে উঠলো— বেশ ভয়ই করছিলো তাতে, যদি গাড়ি উলটে যায়! এই অবস্থায় কোচোয়ান ঘোড়াদের আর তাড়া দেবে কী ক'রে। যাক তারা নিজেদের ইচ্ছে-মতো, সাবধানে। ঘোড়াগুলো টাল শামলাতে-শামলাতে চলেছে আস্তে-আস্তে, কোচবাক্সটা দুলছে। কয়েক জায়গায় দুর্ঘটনা হ'তে-হ'তেও হ'লো না। শেষটায় যখন ঘোড়াগুলো নতুন ঘাঁটিতে পৌঁছুলো, তখন এই বিষম রাস্তার ধকলে তারা ভারি কাবু হ'য়ে পড়েছে—ঘোড়া বদলের ব্যবস্থা না-থাকলে যে কী হ'তো বলাই যায় না ; এই ঘোড়াগুলোকে দিয়ে যে কোনো কাজ চলতো না, তা তো বলাই বাহুল্য।

বেলা পাঁচটা নাগাদই বেশ অন্ধকার ক'রে এলো। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া কালো মেঘ জমেছে। ঐ জলার মধ্যে দিয়ে ঠিক পথ চিনে চলাই মুশকিল। খুরের তলায় শক্ত মাটি পড়ছে না দেখে ঘোড়াগুলো বারে-বারে ভীত ও চকিত হ'য়ে চিহিঁ ডাক ছেড়ে পাশে স'রে যেতে চাচ্ছে।

'আস্তে, হট্, আস্তে যেতেই হবে আমাদের!' ব্রোক্স কেবলই বলতে লাগলো, 'মাঝরাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ার চেয়ে বরং এক ঘণ্টা দেরি ক'রে যাওয়াই ভালো পেরনাউতে....হট্...'

'এক ঘণ্টা দেরি!' এক ঝটকায় পোখ-এর ঘুম ভেঙে গেলো।

'সেটাই যথেষ্ট বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' বললে কোচোয়ান। কয়েকবার এমনকী তাকেও নিচে নেমে পড়তে হয়েছে, লাগাম ধ'রে টেনে-টেনে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে ঘোড়াদের।

অন্য যাত্রীট হাঙ্গামা দেখে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে বাইরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে। নিরেট অন্ধকার—এই ঘন অন্ধকারে কোনো-কিছুই চেনবার

জো নেই। কোচবাক্সের লণ্ঠনের ছোটো-ছোটো টুকরো আলোয় অন্ধকার যেন আরো ঘন হ'য়ে উঠলো।

'কোথায় এসেছি আমরা?' পোখ জিগেশ করলে।

'পেরনাউ এখনো বারো মাইল দূরে', ব্রোক্স ব্যাখ্যা করলে, 'একবার ঘাঁটিতে পৌঁছুতে পারলে বাকি রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দিতে হবে। সেটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'ধুত্তোর! শয়তান ঝড়টাকে নিক...মাঝখান থেকে একদিন দেরি করিয়ে দিলে,' চ্যাটাং ক'রে জবাব দিলে বাক্সের লোকটি।

+

তবু তারা এগুতেই থাকলো। মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়ার ঝাপটায় গাড়িটাই উলটে যাবার ভয় হয়। ঘোড়াগুলো ফিরে দাঁড়াতে চায়—বা একপাশে স'রে দাঁড়ায়—বা অন্ধকারে ঝাঁপ খায়। অবস্থা ক্রমশই এত ভয়ানক হ'য়ে উঠেছে যে পোখ আর ব্রোক্স পায়ে হেঁটেই পেরনাউ যাবার কথা বলাবলি করছে; গাড়ির মধ্যে ব'সে থাকার চেয়ে হেঁটে যাওয়াটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে, হাওয়ার ঝাপটায় কখন কী হয় বলা যায় না।

অন্য যাত্রীটির ভাবগতিক দেখে মনে হ'লো না সে কোচবাক্স ছেড়ে যেতে রাজি হবে। চারপাশের এই তুলকালাম কাণ্ড দেখে কোনো ইংরেজও এতটা উদাসীন থাকতে পারতো কিনা সন্দেহ। পকেটের পয়সা দিয়ে সে কোচবাক্সের ভাড়া গুনেছে,পায়ে হেঁটে যাবে ব'লে তো নয়—এখন তাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব কোচবাক্সের, সে কেন খামকা এই হাওয়ার মধ্যে হেঁটে যাবে!

হঠাৎ সাড়ে-ছটা নাগাদ, হাওয়ার দাপট যখন চরমে পৌঁছেছে, এক বিষণ্ণ ঝাঁকুনি খেলে কোচবাক্স। সামনের একটা চাকা পড়েছিলো ভিজে নরম মাটিতে, ঘোড়াগুলোকে চাবুক কশিয়ে দিতেই তারা এত জোরে চাকাটায় টান দিলে যে চাকাটা শব্দ ক'রে ভেঙে গেলো, —আর তক্ষুনি টাল শামলাতে না-পেরে কোচবাক্স বাঁ দিকে কাৎ হ'য়ে পড়লো।

কে যেন যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো! পায়ে চোট পেয়েছে পোখ, কিন্তু একটাই তার ভাবনা, সেই পেট-মোটা ব্রীফ-কেসটা শামলে রাখার দায়িত্ব তার। একবারও সে ব্রীফ-কেসটাকে হাতছাড়া করেনি—এবার চামড়ার ব্যাগটাকে সজোরে আঁকড়ে বগলদাবা ক'রে সে কোনো রকমে উলটোনো কোচবাক্স থেকে বেরিয়ে এলো।

ব্রোক্স আর অন্য যাত্রীটির গা একটু কেবল ছ'ড়ে গিয়েছে। কোচোয়ানের গায়ে আঁচড়টুকুও লাগেনি, লাফিয়ে নেমে সে ঘোড়াগুলোর দিকে ছুটে গেলো।

ফাঁকা একটা জায়গা, কেবল বাঁ দিকে কতগুলো গাছ এলোমেলো দাঁড়িয়ে।

'কী হবে আমাদের?' জিগেশ করলে পোখ।

'কোচবাক্সের তো আর যাবার কোনো উপায় নেই,' ব্রোক্স তাকে জানালে।

অচেনা যাত্রীটি তবু টুঁ শব্দটিও করলো না।

'পেরনাউ অব্দি হেঁটে যেতে পারবে তো?' পোখকে জিগেশ করলে ব্রোক্স।

ঐ বারো মাইল! পোখ কাৎরে উঠলো, 'পায়ে এই চোট লাগার পরেও!'

'তা হেঁটে না-গেলেও ....ঘোড়ার পিঠে?'

'ঘোড়ার পিঠে! ...কয়েক কদম গেলেই তো অক্কা পাবো!'

তাহ'লে কোনো সরাইখানা খুঁজে বার ক'রে তাতে আশ্রয় নিয়ে রাতটা কাটানো ছাড়া আর উপায় কী! কিন্তু আশপাশে কোনো সরাই আছে কি না কে জানে! পোখ আর অচেনা যাত্রীটির তাছাড়া আর-কিছু করার নেই। ব্রোক্স আর কোচোয়ান না-হয় ঘোড়ায় চ'ড়ে ছুতোরের কাছে যাবে—চাকাটা সারিয়ে নেবার জন্যে মিস্ত্রি ডাকতে।

অতগুলো টাকার দায়িত্ব তার ঘাড়ে না-থাকলে এই চমৎকার ব্যবস্থাটা পোখ-এর মনঃপূত হ'তো সন্দেহ নেই...কিন্তু এই পনেরো হাজার রুবল নিয়ে...

তাছাড়া এ-রকম ফাঁকা জায়গায় সরাইখানাই বা কোথায়! সরাই না-হোক, কোনো খামার বা মদের দোকান হ'লেও চলে। কিন্তু রাত কাটাবার উপযোগী কোনো-কিছু আছে না কি কাছাকাছি? পোখ-এর প্রথম প্রশ্ন হ'লো এটাই।

'হ্যাঁ...ঐ দিকে কিছু-একটা আছে নিশ্চয়ই!' অন্য যাত্রীটি হাত তুলে দেখালে। প্রায় দুশো গজ দূরে, বনের একপাশে ক্ষীণ একটা আলোর রেখা। অন্ধকারের মধ্যে গাছপালাগুলো আবছাভাবে জটলা ক'রে আছে যেদিকটায়, তারই এক প্রান্তে। কিন্তু কীসের আলো ওটা? কোনো সরাইখানার লণ্ঠন, না কি কাঠুরেদের উনুন?

কোচোয়ানকে জিগেশ করতেই সে বললে, 'ওটা ক্রোফের ভাটিখানা।'

'ক্রোফের ভাটিখানা?' পোখ জিগেশ করলে।

'হ্যাঁ। "ভাঙা ক্রুশ" নাম।

'তাহ'লে,' ব্রোক্স তাদের দিকে ফিরে বললে, 'তোমরা যদি "ভাঙা ক্রুশে" রাত কাটাতে রাজি থাকো তো সকালে আমরা এসেই তোমাদের তুলে নিতে পারি।'

অচেনা যাত্রীটি এই প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি করলে না, কারণ এক্ষেত্রে সেটাই হ'লো মন্দের ভালো ব্যবস্থা। আবহাওয়া ক্রমশ ভয়ংকর হ'য়ে উঠছে, আরেকটু পরেই নিশ্চয়ই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হ'য়ে যাবে। কনডাকটার আর কোচোয়ানও ঘোড়াগুলো নিয়ে পেরনাউ যেতে মহা মুশকিলে পড়বে।

পোখ-এর জখম হাঁটু বড্ড ব্যথা করছিলো। বাধ্য হ'য়েই সে প্রস্তাবটায় সায় দিলে, 'তাহ'লে তাই হোক। রাত্তিরটা জিরিয়ে নিলে নিশ্চয়ই চোটটা শামলে ওঠা যাবে। আমি কিন্তু তোমারই ওপর পুরোপুরি নির্ভর ক'রে আছি, ব্রোক্স।'

ব্রোক্স তাকে আশ্বস্ত করলে, 'আমি ঠিক সকালেই এসে হাজির হবো, দেখো।'

ঘোড়াগুলো খুলে নেয়া হ'লো। কারণ কাৎ-হ'য়ে-প'ড়ে-থাকা কোচবাক্সটা ছেড়ে তাদের চ'লে যেতে হবে। এই রাতে এ-রাস্তায় আর-কোনো কোচবাক্স আসবে ব'লেও মনে হয় না, কাজেই কোচবাক্সটা রাস্তা জুড়ে প'ড়েই রইলো।

হাতঝাঁকুনি দিয়ে বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে পোখ ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে ওই ক্ষীণ আলোর রেখা ধ'রে এগুলো।

কিন্তু খুঁড়িয়েও সে ভালো ক'রে হাঁটতে পারছিলো না দেখে অচেনা যাত্রীটি বললে যে তার কাঁধে ভর দিয়ে যেতে। সঙ্গীকে যথোচিত ধন্যবাদ দিয়ে ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পোখ তার সাহায্য নিতে রাজি হ'লো। আগে লোকটাকে দেখে, বা না-দেখে, যা মনে হয়েছিলো, আসলে হয়তো সে ততটা অসামাজিক নয়।

আর-কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো না। সরাইখানাটা ছিলো বড়ো রাস্তার উপরেই। দুশো গজ পথ তারা চট ক'রে পেরিয়ে এলো।

সরাইয়ে ঠিক ঢোকবার মুখে একটা প্যারাফিন লণ্ঠন ঝুলছে। দেয়ালের এককোনায় একটা ঢ্যাঙা খুঁটি উঠেছে—দিনের বেলায় যাতে লোকে দূর থেকে দেখতে পায় সাইনবোর্ডটা। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা আসছে। গেলাশের শব্দ ও কথাবার্তার টুকরো শুনে বোঝা গেলো যে সরাইটা একেবারে নির্জন নয়। সদর দরজার উপরে ঝুলছে একটা সাইনবোর্ড —লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেলো ত্যাড়াবাঁকা হরফে তাতে লেখা 'ভাঙা ক্রুশের সরাইখানা'।

৫

ভাঙা ক্রুশের সরাইখানা

'ভাঙা ক্রুশ' নামটা যে যথাযোগ্য এটা প্রমাণ করার জন্যই সরাইখানার বাড়ির গায়ে ষাঁড়ের রক্তে একটা ছবি আঁকা : রুশী ধরনের একটা ডবল ক্রুশ, মাটি থেকে উপড়ে গিয়ে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। সন্দেহ নেই অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে-যাওয়া কোনো ঘটনার কথাই এটা মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছে।

সরাইয়ের মালিক হ'লো জনৈক ক্রোফ। লোকটা স্লাভ নয়, বিপত্নীক, বয়েস পঁয়তাল্লিশ। রিগা-পেরনাউর বড়ো রাস্তায় এই সরাইটা অনেক দিন ধ'রে আছে—ক্রোফের আগে তার বাপ এটার দেখাশুনো করতো। আশপাশে দু-তিন ভের্স্টের মধ্যে না-আছে কোনো ঘর-বাড়ি, না-আছে কোনো পাড়া-গাঁ ; ফলে মনে হয় এই 'ভাঙা ক্রুশ' যেন শূন্য ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

খদ্দের বলতে আছে কেবল কোচবাক্সের যাত্রীরা ; কেউ-কেউ নিয়মিত আসে, কেউ-বা কোচবাক্সে যাবার সময় হঠাৎ একদিন নেমে পড়ে ; আর আসে আশপাশের খেত-খামারের কাজ করা জনা দশ-বারো চাষী আর কাঠুরে।

কেমন চলে তার ব্যাবসা? ক্রোফ অবিশ্যি কখনোই প্যানপ্যান করে না, নিজের কথা সাতকাহন ক'রে বলা তার ধাতে নেই। তিরিশ বছরের পুরোনো এই সরাই, আগে চালাতো তার বাপ, চোরাই মালের ব্যাবসা আর এর-ওর বাগান ও বনবাদাড় থেকে এটা-ওটা চুরি ক'রে ব্যাবসা বেশ ফাঁপিয়ে তুলেছিলো। এখন চালাচ্ছে ক্রোফ—চ'লে তো যাচ্ছে বেশ। তা থেকে চেনা লোকের ধারণা ক্রোফ হচ্ছে টাকার কুমির, কিন্তু পরের ব্যাপারে নাক গলাতে যাবার কী দরকার?

ক্রোফ বিশেষ বাকতাল্লা করে না, হুঁ-হ্যাঁ দিয়েই কাজ চালিয়ে দেয়। থাকে চুপচাপ নিরিবিলিতে, সরাই ছেড়ে বিশেষ বেরোয় না, মাঝে-মাঝে পেরনাউ-এ যায়, না-গেলে অবসর সময়ে নিজের বাগানের শাক-শবজির তদারকি করে। ছেলেপুলে নেই, বউটাও মারা গেছে, একা-একা সে করেই বা কী? জোয়ান মানুষ ক্রোফ, লাল মুখো, ঝোপের মতো দাড়ি মুখ ভ'রে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কখনও অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় না, নিজেও কম কথায় জবাব সারে।

বাড়িটা একতলা, ঢোকবার দরজাটা এক পাল্লার, পাল্লা খুললেই একেবারে মদের আড্ডায় গিয়ে পৌঁছনো যায়—কোনায় একটা জানলা আছে, তাই দিয়েই আলো আসে ; বাঁয়ে আর ডান দিকে দুটো ঘর, সে-ঘর দুটোর জানলা রাস্তার দিকে খোলা। ক্রোফের ঘরটা বাড়ির পিছন দিকে, শবজি-বাগানের পাশেই।

সরাইয়ের দরজা-জানলা-খড়খড়ি সব খুব মজবুত আর টেকসই, ভিতর দিক থেকে আটকাতে হয়, খিল আছে, আংটা লাগানো, তার উপর ছিটকিনিও আছে, এদিকটা এমনিতে সরাইওলাদের পক্ষে খুব নিরাপদ নয় ; তাই সন্ধে হ'তে-না-হ'তেই সবাই দরজা-জানলা এঁটে ব'সে যাবে। 'ভাঙা ক্রুশ' অবিশ্যি এমনিতে দশটা অব্দি খোলা থাকে, ছ-সাতজন মক্কেল ব'সে স্নাপস আর ভোদ্‌কা গেলে খোশ মেজাজে।

ছোট্ট শবজি-বাগান, ঝোপের বেড়া দেয়া চারপাশে ; শবজিগুলো বেচে ক্রোফের বেশ লাভই হয়। গাছের ফল তো প্রকৃতি-ঠাকরুনের বদান্যতার উপরেই নির্ভর করে ; মাঝারি জাতের চেরি আর আপেল ফলে, আর আছে কিছু জাম আর জামরুল—লিভোনিয়ায় এ-সব ফলের ভারি কদর।

সেদিন সন্ধেবেলায় টেবিলে ব'সে মদের গেলাশে চুমুক দিতে-দিতে আড্ডা দিচ্ছিলো আশপাশের গ্রামের জনা সাত-আট চাষী আর কাঠুরে। রোজ বাড়ি ফেরবার আগে স্নাপস-এর টানে এসে তারা এখানে জড়ো হয়—কেউই অবশ্য রাত কাটায় না। যাত্রীরাও কদাচিৎই রাত কাটাতে চায়, তবে কোচবাক্সের সহিস আর কনডাকটাররা অবিশ্যি পেরনাউ পৌঁছোবার আগে এখানে একবার গলা ভিজিয়ে নিতে ভালোই বাসে।

নিয়মিত খদ্দেরদের মধ্যে দুজন ছিলো স্বতন্ত্র, তারা একপাশে ব'সে সকলের উপর নজর রাখতে-রাখতে নিচু গলায় কথা বলছিলো : তারা হলো পুলিশ-সারজেন্ট য়েক আর তার এক সহকারী। পেরনোস্কায় সেই তাড়া দেয়ার পর তারা একটা উড়ো খবর পেয়ে এ-তল্লাটে চ'লে এসেছে—শুনেছে এখানে নাকি কয়েকটা যণ্ডা-বাঁটপাড়ের উপদ্রব হয়েছে, তাই বিভিন্ন টহলদারি দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে এদিকটায় তারা সরেজমিন তদন্তে বেরিয়েছে।

গত অভিযানটার ব্যর্থতায় য়েক তখনও অসন্তুষ্ট বোধ করছিলো। ভেবেছিলো, সেই পলাতককে জ্যান্ত পাকড়ে নিয়ে মেজর ফেরডেরের হাতে তুলে দেবে, কিন্তু পেরনোস্কোর সেই বরফের মধ্যে তাব লাশটা অব্দি সে বার করতে পারেনি।

'লোকটা অবিশ্যি ডুবে মরেছে ব'লেই মনে হয়,' য়েক তার সঙ্গীকে বোঝালে।

'নিশ্চয়ই তা-ই,' পুলিশটি সায় দিলে।

'নিশ্চয়ই ডুবে মরেছে—এটা অবিশ্যি বলা যায় না, কারণ আমরা তার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাইনি...আর যদি তার জল খেয়ে ঢোল-হওয়া দেহটা খুঁজেও পেতুম, সেই অবস্থায় হতভাগাকে কিছুতেই আবার সাইবেরিয়া পাঠিয়ে দেয়া যেতো না।...না, পাজিটাকে জ্যান্ত গ্রেফতার করা উচিত ছিলো আমাদের। পুরো ব্যাপারটায় পুলিশের ভূমিকা মোটেই তারিফ করবার মতো হয়নি।'

'পরের বারে আমাদের বরাত খুলবে, সারজেন্ট,' বেশ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলে অন্য পুলিশটি।

সারজেন্ট য়েক তা শুনে বেশ বিরক্তভাবেই মাথা নাড়লে—ও-সব দার্শনিকতায় তার মন ভেজে না।

হঠাৎ বাইরে ঝড় ভীষণভাবে গ'র্জে উঠলো। সদর দরজা এমনি ভাবে ন'ড়ে উঠলো যে মনে হ'লো এক্ষুনি বুঝি কব্জা ভেঙে পুরো পাল্লাটাই দুম ক'রে খ'শে পড়বে। মস্ত চুল্লিটা হাওয়ার ঝাপটায় একেকবার নিভে আসছে আবার পরক্ষণেই দপ ক'রে জ্ব'লে উঠছে। আশপাশের গাছপালার ডালে মড়মড় শব্দ হচ্ছে, সরাইখানার ছাদে ভাঙা ডালগুলো আছড়ে পড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'কেবল কাঠুরেদের সুবিধের জন্যই এ-রকম ঝড় হয়,' একজন চাষী বিজ্ঞ মন্তব্য করলে, 'তাদের আর-কী—কেবল ভাঙা কাঠকুটো কুড়িয়ে নিলেই হ'লো।'

'চোর-বাঁটপাড়দেরও ফূর্তির সময় সন্দেহ নেই,' পুলিশটি বললে।

'তা ঠিক বলেছো,' য়েক সায় দিলে, 'কিন্তু তাই ব'লে তাদের ছেড়ে দিলে তো চলবে না... আমরা তো জানি একটা মস্ত ডাকাতদল দেশটা ছারখারে দিচ্ছে—এই তো টারফার্টে চুরি হয়েছে সেদিন, আর কারকুসে একটা লোক একটু হ'লেই খুন হ'য়ে যাচ্ছিলো। তাছাড়া রিগা-পেরনাউর রাস্তাও আজকাল মোটেই নিরাপদ নয়। একটার পর একটা খুন-জখম-রাহাজানির খবর আসছে, অথচ কাউকেই এখন অব্দি পাকড়ানো যায়নি। আর পাকড়াতে পারলেই বা ষণ্ডাগুলোর কী হবে—সাইবেরিয়ায় গিয়ে কেবল মাটি কোপাবে। তাতে তাদের ভারি ব'য়ে যায়। যদি ফাঁসিতে ঝুলতে হ'তো, তাহ'লে একটা কাজ করার আগে পাজিগুলো দু-বার ক'রে ভাবতো।'

কী ক'রে যে লোকে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেবার কথা বলে, এটা তার একেবারেই অনধিগম্য। এটা ঠিক যে রাজনৈতিক কারণে এখনো কাউকে-কাউকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু সাধারণ চুরি বাঁটপাড়ি রাহাজানির জন্যে কাউকেই আজকাল আর ফাঁসিতে ঝুলতে হয় না। এটা যে য়েক-এর কত বড়ো দুঃখ, তা সে কাকে বোঝাবে?

'যাক্ গে, এবার আমাদের রওনা হ'য়ে পড়া উচিত,' য়েক উঠে পড়ার জন্যে তাড়া দিলে, 'পেরনাউতে ফিফ্‌থ স্কোয়াডের সারজেণ্টের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে,' ব'লে সে টেবিল চাপড়ালে।

ক্রোফ চটপট তাদের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে।

'কত হয়েছে, ক্রোফ?' সারজেণ্ট তার পকেট থেকে কিছু খুচরো বার করলে।

'কত হয়েছে তা তো আপনি জানেনই সারজেণ্ট,' সরাইওলা বললে, 'আমার এখানে সকলের জন্যেই একদর...'

'এমনকী তাদের জন্যেও একদর, যারা জানে তোমার এখানে এলে তুমি তাদের কাগজপত্তর দেখতে চাইবে না বা এমনকী নামটাও জানতে চাইবে না?'

'আমি তো আর পুলিশ নই,' সোজাসুজি বললে ক্রোফ।

'কিন্তু সব সরাইওলা যদি তা করতো তাহ'লে দেশে খুন-জখমের সংখ্যা অনেক বেড়ে যেতো। দেখো, একদিন যেন এজন্য তোমাকে পাততাড়ি গোটাতে না-হয়।'

'ফেলো কড়ি ভরো গেলাশ, এই হ'লো আমার নীতি,' সরাইওলা বললে, 'কে কোত্থেকে এসেছে, আর কে কোথায় যেতে চাচ্ছে—তা জানবার আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।'

'ওহে ক্রোফ, আমার কাছে কালা-বোবা সাজার চেষ্টা কোরো না। তুমি ঠিকই জানো, আমি কী বলতে চাচ্ছি। এখনও সাবধান হও, না-হ'লে একদিন কিন্তু ভীষণ পস্তাতে হবে। আচ্ছা, চলি।'

সারজেন্ট য়েক উঠে দাঁড়িয়ে সব দাম চুকিয়ে দিলে, তারপর তার সঙ্গীকে নিয়ে দরজার দিকে এগুলো। অন্য খদ্দেররাও উঠে দাঁড়ালে এক-এক ক'রে—এই বিচ্ছিরি আবহাওয়ায় চটপট বেরিয়ে না-পড়লে পরে মুশকিলে পড়তে হবে।

ঠিক সেই সময়ে সশব্দে দরজাটা খুলে গেলো...পরক্ষণেই আবার পাল্লাটা হাওয়ার ঝাপটায় বন্ধ হ'য়ে গেলো।

ঘরে ঢুকেছে দুটি লোক—একজন খোঁড়াচ্ছে, সে অন্যজনের কাঁধে ভর দিয়ে আছে। লোক দুটি আর কেউ নয়, পোখ আর তার সহযাত্রী। আগের মতোই অচেনা যাত্রীটির গা ওভারকোটে মোড়া, টুপিটা একেবারে ভুরু পর্যন্ত নামানো ব'লে তার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সরাইওলার সঙ্গে কথা বললো কিন্তু সে-ই : 'প্রায় দুশো গজ দূরে আমাদের কোচবাক্সটা ভেঙে পড়েছে। কোচোয়ান আর কনডাকটার সহিসদের নিয়ে পেরনাউ গেছে—সকালে ফিরে এসে তারা আমাদের খোঁজ করবে। রাত্তিরটা কাটাবার মতো দুটো ঘর পাওয়া যাবে কি?'

'হ্যাঁ,' ক্রোফ জানালে।

'আমি একটা ঘর নেবো,' পোখ বললে, 'আর যদি ভালো একটা বিছানা থাকে—'

'পাবেন,' ক্রোফ তাকে আশ্বস্ত করলে, 'চোট লেগেছে না কি?'

'পা-টা ছ'ড়ে গেছে, তবে তেমন লাগেনি,' বললে পোখ।

'আমি অন্য ঘরটা নেবো,' যাত্রীটি বললে।

য়েক-এর মনে হ'লো গলাটা তার খুবই চেনা। যার গলা বলে মনে হ'লো, তাকে এখানে দেখতে পাবে ব'লে সে আশা করেনি। তবে পুলিশ হিশেবে তার কর্তব্য একেবারে নিঃসন্দেহ হ'য়ে নেয়া। কেন যেন তার মনে হ'লো, এটা জানা তার খুবই জরুরি। ইতিমধ্যে পোখ একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে পাশের টেবিলে তার ব্রীফ-কেসটা রেখেছে—সেটা তখনো একটা শেকল দিয়ে তার কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধা।

'ঘর পাওয়া যাবে...উত্তম প্রস্তাব,' বললে পোখ, 'কিন্তু পা ছ'ড়ে গেলেও বেশ খিদে পায়—আমি কিছু খাদ্যও চাই।'

'তাও পাবেন,' ক্রোফ তাকে আশ্বস্ত করলে।

'তাহ'লে যত তাড়াতাড়ি পারেন, দেখুন,' পোখ জানালে।

সারজেন্ট য়েক গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো। 'ভাগ্যি ভালো, হের পোখ যে! আপনার বেশি লাগেনি...'

'আরে!' পোখ খুশিই হ'লো : 'সারজেন্ট য়েক! আপনি!'

'হ্যাঁ, আমি। বেশি জখম হননি তো?'

'না। মনে হয় না কাল কোনো ব্যথা থাকবে!'

ক্রোফ এসে রুটি, ঠাণ্ডা বেকন আর চায়ের পেয়ালা সাজিয়ে দিলে । তারপর অন্য যাত্রীটিকে জিগেশ করলে, 'আপনিও খাবেন নাকি?'

'না, আমার খিদে পায়নি,' যাত্রীটি জানালে, 'আমাকে বরং আমার ঘরটা দেখিয়ে দিন...এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেয়া উচিত, কারণ হয়তো কাল কনডাকটাররা ফিরে আসার আগেই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমি ভোর চারটেয় বেরিয়ে পড়তে চাই।'

'আপনি যা বলবেন,' বললে সরাইওলা। পানশালার বাঁ দিকের ঘরটার দিকে সে যাত্রীটিকে নিয়ে গেলো—ডান দিকের ঘরটা রইলো পোখ-এর জন্য।

কিন্তু যাত্রীটি যখন কথা বলছিলো, তখন তার মাথার টুপিটা একদিকে একটু স'রে যায়। সারজেন্ট য়েক সারাক্ষণই তার উপর নজর রাখছিলো, যতটুকু দেখতে পেলে, তাই যথেষ্ট। 'হুম!... ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম।...কিন্তু অত সকালে কোচবাক্স ছাড়াই চ'লে যেতে চাচ্ছে কেন! অত তাড়া কীসের?' সত্যি, পুলিশের চোখে অত্যন্ত স্বাভাবিক জিনিশও অনেক সময় অদ্ভুত ব'লে ঠেকে। 'আর তাছাড়া যেতেই বা চাচ্ছে কোথায়?' কথাগুলো নিজেকেই জিগেশ করছিলে য়েক; কারণ তার মনে হচ্ছিল জিগেশ করলে হয়তো যাত্রীটি তাকে সব কথা নাও বলতে পারে। আর সারজেন্ট যে তাকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিলো, এটা যাত্রীটির যেন চোখেই পড়েনি। সে ক্রোফের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। পোখ তখন গোগ্রাসে রুটি বেকন গিলছিলো, য়েক গিয়ে তার কাছে দাঁড়ালো।

'ওই যাত্রীটি কি আপনার সঙ্গে কোচবাক্সে ক'রে এলো?' য়েক জিগেশ করলে।

'হুঁ।' বললে পোখ, 'সারা রাস্তায় তার কাছ থেকে চারটে কথাও বার করতে পেরেছি কি না সন্দেহ।'

'কোথায় যাচ্ছে, তা জানেন?'

'না...রিগায় উঠেছিলো, সম্ভবত রেফেল অব্দি যাবে। ব্রোক্স থাকলে সব ঠিক বলতে পারতো।'

'না না, আমি এমনি জিগেশ করছিলুম।'

ক্রোফ অবিশ্যি সব কথাই শুনছিলো, কিন্তু এ-সব কথায় তার কিছু এসে যাচ্ছিলো ব'লে মনে হচ্ছিলো না। চাষী আর কাঠুরেরা একজন-একজন ক'রে চ'লে যেতে লাগলো। ক্রোফ সব গোছগাছ করায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। য়েক-এর এখন আর অবিশ্যি খুব তাড়া দেখা গেলো না, সে বেশ চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে পোখ-এর সঙ্গে। পোখও চেনা লোক দেখে খুব খুশি। কথা কইতে না-পারলে তার পেট ফেঁপে যায়, খাবার হজম হয় না।

'আপনি বুঝি পেরনাউ যাচ্ছেন?' য়েক জিগেশ করলে।

'না—আমিও রেফেলই যাচ্ছি, সারজেন্ট য়েক।'

'হের ইয়োহাউজেন-এর কাজে?'

'হ্যাঁ,' ব'লে নিজের অজান্তেই পোখ তার ব্রীফ-কেসের উপর হাত বুলিয়ে নিলে।

'অ্যাক্সিডেন্টটায় তো অন্তত বারো ঘন্টা দেরি হ'য়ে গেলো!'

'সকালবেলায় যদি ব্রোক্স ঠিকঠাক এসে পৌঁছোয়, তা'হলে অবিশ্যি চারদিনের মধ্যেই রিগায় ফিরতে পারবো...বিয়ের সময়...'

'ভজেনাইদা পারেনসোফ-এর সঙ্গে...হ্যাঁ, আমি জানি...'

'আপনি তো সবই জানেন!'

'কই আর জানি? আমি কি জানি আপনার সঙ্গী কোথায় যাবেন? অত সকালে যখন ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়ছেন, তখন নিশ্চয়ই পেরনাউতে একবার থামবেন...'

'হ্যাঁ, তা সম্ভব।' বললে পোখ, 'আর হয়তো তার সঙ্গে কখনো দেখাই হবে না।...তা হের য়েক আপনিও কি এই সরাইতে রাত কাটাচ্ছেন নাকি?'

'না, হের পোখ। পেরনাউতে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।...তা খাওয়াদাওয়ার পর ভালো ক'রে ঘুমিয়ে নেবেন, দেখবেন শরীরটা ঝরঝরে লাগবে...আর ওই ব্রীফ-কেসটা যেন চোখের আড়ালে করবেন না।'

পোখ হাসলো, 'মাথার সঙ্গে যেমন কান থাকে, তেমনি ওটাও আমার কাছে থাকবে।'

'চলো,' সঙ্গীকে বললে য়েক, 'ভালো ক'রে বোতাম এঁটে নাও, নইলে হাড়ের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা লাগবে। ...শুভরাত্রি, হের পোখ!'

'শুভরাত্রি, সারজেণ্ট য়েক!'

সারজেণ্ট য়েক আর তার সঙ্গী দরজা খুলে বাইরে ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে গেলো। ক্রোফ প্রথমে পাল্লাটা আটকে খিল তুলে দিলে, তারপর মস্ত একটা তালা ঝুলিয়ে চাবি লাগালে। এই রাত্তিরে ভাঙা ক্রুশে আর-কেউ আসবে বলে মনে হয় না। কোচবাক্স না-ভেঙে গেলে এই দুই যাত্রীও এখানে আশ্রয় নিতো কিনা সন্দেহ।

ততক্ষণে পোখ-এর খাওয়া শেষ হ'য়ে গেছে। পেটে দানাপানি পড়তেই বেশ চাঙ্গা লাগছে—এবার বিছানায় একটু গড়িয়ে নিলেই, বাস, আজকের মতো ঝক্কি-ঝামেলা শেষ হ'য়ে যাবে।

ক্রোফ তার গনগনে উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো, পোখ কখন তার ঘরে যায়। মাঝে-মাঝে হাওয়ার ঝাপটায় আগুনের শিখা লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে, ঘরের মধ্যে ধোঁয়া ঢুকে পড়ছে। টেবিলের উপর মোমবাতির আলোগুলো কাঁপছে, দেয়ালে ছায়াগুলো নেচে উঠছে, বাইরে হাওয়া এত জোরে বইছে যে মনে হচ্ছে কে যেন দরজা-জানলায় একটানা ধাক্কা দিচ্ছে।

'শুনলেন?' হঠাৎ দরজাটা এত জোরে কেঁপে উঠলো যে পোখ জিগেশ ক'রে বসলো।

'কেউ না।...ও হাওয়া,' সরাইওলা বলল, 'কেউ না...ও আমার অভ্যেস হ'য়ে গেছে। ....এবার শীতে প্রায়ই তো আবহাওয়া খারাপ যাচ্ছে।'

'অবিশ্যি আজ রাত্তিরে পথে-ঘাটে কেউ আছে ব'লে মনে হয় না—কেবল চোর-পুলিশের কথা আলাদা।'

'হ্যাঁ। এই আবহাওয়ায় কে আর বেরুবে?'

পোখ উঠে দাঁড়ালো নটা নাগাদ, ব্রীফ-কেসটা বগলদাবা ক'রে ক্রোফের দেয়া একটা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ক্রোফের হাতে একটা পুরু কাচ বসানো লণ্ঠন। পোখ দরজা বন্ধ করতে করতে জিগেশ করলে, 'আপনি শুতে যাবেন না?'

'যাবো,' ক্রোফ বললে, 'তবে একবার চারদিক দেখেশুনে নিচ্ছি। রোজই শুতে যাবার আগে চারদিক দেখে নিই। তাছাড়া উঠোনে মুরগির খাঁচা আছে—মুরগিরা সব খাঁচায় ঢুকেছে কিনা দেখা উচিত। মাঝে-মাঝে সকালে একটা-দুটোর পাত্তা মেলে না।'

'ও,' পোখ জিগেশ করলে, 'খ্যাঁকশেয়াল?'

'হ্যাঁ, শেয়াল আছে—নেকড়ে আছে। নেকড়েগুলো মহা বদমাশ, বেড়া ডিঙিয়ে চ'লে আসে। তবে আমার জানলা থেকে উঠোনটা দেখা যায় কিনা, নেকড়ে দেখলেই গরম শিশে

ছুঁড়ে মারি...রাত্তিরে বন্দুকের আওয়াজ শুনলে তাই ঘাবড়ে যাবেন না যেন।'

'ওঃ,' পোখ উত্তর দিলে, 'একবার ঘুমোলে আমাকে জাগাতে কামান দাগতে হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা। আমার অবিশ্যি যাবার খুব তাড়া নেই। আমার সঙ্গী যদি বিছানা ছাড়তে চায় তো সে তার ইচ্ছে। ব্রোক্স পেরনাউ থেকে ফিরে কোচবাক্স মেরামত করবার পর আমাকে ডাকলেই চলবে।'

'ঠিক আছে.' সরাইওলা তাকে আশ্বস্ত করলে, 'আপনাকে কেউ জাগাবে না। যাত্রীটি যাবার সময় আপনি যাতে উত্যক্ত না-হন, আমি তা লক্ষ রাখবো।'

হাই চেপে পোখ ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ ক'রে তালা ঝুলিয়ে দিলে।

মস্ত ঘরটায় ক্রোফই রইলো একা। আবছা আলো জ্বলছে লণ্ঠনের। পোখ-এর টেবিলটা সাফ ক'রে সে ছোটোহাজারি সাজিয়ে রাখলে। বেশ গোছানে লোক ক্রোফ, কোনো কাজই পরদিনের জন্য তুলে রাখা পছন্দ করে না। কাজকর্ম শেষ ক'রে সে উঠোনের দিকের দরজাটা গিয়ে খুললো। সেটা উত্তর-পশ্চিম দিক, ঝড়ের দাপট সেদিকটায় একটু কম, হয়তো বাড়িটার কাঠামো একটু বাঁচিয়েছে। কিন্তু বেড়ার ওপাশে কনকনে হাওয়া সমানে গর্জাচ্ছে। এই ঠাণ্ডায় তার আর বেরুতে ইচ্ছে করলো না। চৌকাঠে দাঁড়িয়েই সে চারপাশটা দেখে নিলে। না, উঠোনে সন্দেহজনক কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ছায়ার মতো নিঃশব্দে কোনো নেকড়ে বা শেয়াল এসে হাজির হয়নি। লণ্ঠনটা নাড়িয়ে চারদিক দেখে নিয়ে সে আবার দরজাটা লাগিয়ে দিলে। এই ঠাণ্ডায় উনুনটাকে নিভতে দেওয়া ঠিক হবে না। কয়েকটা কাঠকুটো গুঁজে দিলে সে চুল্লিতে। চারপাশটা দেখে নিয়ে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

তার ঘরটা বাগানের একেবারে লাগোয়া। পাশে বারান্দা আছে— বারান্দার ওপাশে পোখ-এর ঘর। পোখ এতক্ষণে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ক্রোফ লণ্ঠন হাতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

দু-তিন মিনিট পরে খশখশে শব্দ শুনে বোঝা গেলো জামাকাপড় ছেড়ে সে রাতকাপড় প'রে নিচ্ছে—তারপরে অপেক্ষাকৃত জোরালো আওয়াজ শুনে বোঝা গেলো সে তার বিছানায় উঠে পড়লো।

ঘুমন্ত সরাইটাকে ঘিরে ক্ষুধার্ত হাওয়া গর্জাতে লাগালো সারারাত; হাওয়া আর বৃষ্টি আর ঝড়ের গোঙানি—পাতা-ঝরা পাইনগাছের ডালপালার মধ্যে দিয়ে একটানা ব'য়ে যেতে লাগালো।

ক্রোফ উঠে পড়লো চারটের একটু আগেই। লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিয়ে বড়ো ঘরটায় হাজির হয়ে দ্যাখে যে রহস্যময় যাত্রীটির ঘরের দরজাও ঠিক তক্ষুনি খুলে গেছে। সারা গায়ে ওভারকোট চাপানো কালকের মতো, টুপিটাও চোখ অব্দি এমনভাবে নামানো যে মুখ দেখা যাচ্ছে না।

'এক্ষুনি যাবেন?' ক্রোফ জিগেশ করলে। 'হুঁ।,' ব'লে যাত্রীটি পকেট থেকে দু-তিনটে কাগজের রুবল বার করলে, 'রাতের জন্য কত ঘরভাড়া দেবো?'

'এক রুবল।'

'এই নিন।...দরজটা খুলে দিন, বেরিয়ে পড়ি।'

'দিচ্ছি।' লণ্ঠনের আলোয় নোটটা উলটে-পালটে দেখে ক্রোফ চাবি বার করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। জিগেশ করলে, 'যাবার আগে কিছু চাই নাকি?'

'না।'

'ভোদকা? বা একফোঁটা স্নাপ্‌স্‌।'

'না। আমার একটু তাড়া আছে। দরজা খুলে দিন।'

'তা আপনি যদি বলেন...'

ক্রোফ খিল নামিয়ে তালা খুলে দিলে।

বাইরে তখনও অন্ধকার। বৃষ্টি ধ'রে এসেছে, তবে তখনও ঝোড়ো হাওয়া গর্জাচ্ছে অবিরাম—রাস্তায় আজস্র ভাঙা ডালপালা প'ড়ে আছে।

টুপিটা আরো নামিয়ে চিবুকশুদ্ধুই যেন ঢেকে ফেললে যাত্রীটি, তারপর ওভারকোটের বোতাম আঁটতে-আঁটতে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। ক্রোফ দরজাটা এঁটে আবার খিল তুলে দিলে।

৬

হুলুস্থুল

ট্রাঙ্কেল—ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন-এর সে খাশ বেয়ারা—গিয়েছিলো থানায় পঁচিশ ঘা বেত খাবে ব'লে। ইয়োহাউজেনরা প্রায় সমরবাহিনীর মতো সময়নিষ্ঠ ও নিয়মানুবর্তী। রোজ সকাল নটায় রুটি-মাখন সহযোগে সে-বাড়িতে চায়ের আসর বসে। কিন্তু সেদিন ট্রাঙ্কেলের গাফিলতির জন্যই নটার সময় স্যামোভার কাজ করছিলো না। কর্তামশায়ের কাছে কোনো ওজর-ওজুহাত চলে না। তিনি চটপট একটা চিরকুট লিখে ট্রাঙ্কেলকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন; চিরকুটটায় লেখা ছিলো, 'আমার বেয়ারা ট্রাঙ্কেল কাজের গাফিলতির জন্যে পঁচিশ ঘা বেত খাবে—ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন।' বেত খেতে যাবার আগে ফ্রাঙ্ক তাঁর খাশ বেয়ারাকে মনে করিয়ে দিলেন, সে যেন থানা থেকে লিখিয়ে আনে বেত্রাঘাতের জন্য কত মজুরি চাই । যে-লোকটা বেত মারবে সে এই বাবদ সব সময়েই ইয়োহাউজেনদের কাছ থেকে মজুরি পায়—বিনি পয়সায় তিনি কাউকেই খাটান না।

খুব যে হুড়মুড় ক'রে থানায় যাবার ইচ্ছে ছিলো ট্রাঙ্কেলের, তা নয়। তবে সে রাস্তায় আর ঢিমে তেতালায় হাঁটলে না। কী জানি, খুব-একটা দেরি হ'লে যদি আরেক শাস্তি জোটে। তবে যাবার আগে বেতের ঘা শামলাবার জন্য ভোদকা-সহযোগে একটু চা গিলে নিলে। তারপর সাহসে পিঠ বেঁধে থানার রাস্তা ধরলো সে।

থানায় তার ভারি খাতির। যেন পুরোনো বন্ধু। হাত-ঝাঁকুনি, স্বাস্থ্য-কামনা ইত্যাদি সব হ'লো।

একটি পুলিশ বললে, 'এই যে, ট্রাঙ্কেল! বেশ অনেক দিন পরে দেখা হ'লো—প্রায় মাসখানেক তো হবেই।'

'না, অতদিন হবে না।'

‘তা কে পাঠালেন তোমাকে, শুনি?’

‘স্বয়ং কর্তামশাই—হের ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন।’

‘হুম...মেঝর ফেরডেরের সঙ্গে দেখা করতে চাও, তাই না?’

‘যদি তিনি দয়া ক’রে দেখা করেন।’

‘এইমাত্র আপিশে এসেছেন মেজর। তোমাকে দেখলে উনি খুশিই হবেন।’

এ-কথা শুনে ট্রাঙ্কেল সোজা গিয়ে মেজর ফেরডেরের কামরার দরজায় আস্তে টোকা দিলে। অমনি ভিতর থেকে ভারিক্কি চালে ঢুকে পড়বার নির্দেশ এলো।

মেজর তাঁর চেয়ারে ব’সে-ব’সে এক বাণ্ডিল কাগজপত্তর উলটে-পালটে দেখছিলেন। ট্রাঙ্কেল ঘরে ঢুকতেই তাকিয়ে বললে, ‘ও, তুমি ট্রাঙ্কেল!’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, হের মেজর।’

‘তুমি এসেছো এখানে?’

‘আজ্ঞে, হের ইয়োহাউজেন পাঠিয়েছেন।’

‘ভীষণ-কিছু ব্যাপারে নাকি?’

‘আজ্ঞে যত নষ্টের গোড়া ঐ স্যামোভার! সকালবেলা সময়মতো টগবগ করছিলো না।’

‘কেন? তুমি বুঝি জ্বালাতে ভুলে গিয়েছিলে?’ মেজর হাসলেন।

‘আজ্ঞে...’

‘তা ক ঘা, শুনি?’

‘এই যে, কর্তামশাই লিখে দিয়েছেন।’ ট্রাঙ্কেল হাত বাড়িয়ে চিরকুটটা এগিয়ে ধরলো।

মেজর কাগজটা প’ড়ে বললেন, ‘ও, মাত্তর এই কটা! তা বেশি নয় ।’

ট্রাঙ্কেল একবার আর্তনাদ ক’রে উঠলো।

‘মাত্তর পঁচিশ ঘা।’

এক-আধ ডজন বেতের ঘা পেলেও ট্রাঙ্কেল এবার কোনোরকমে শামলে নিতে পারতো। পঁচিশ ঘা জানলে আরো-কিছু ভোদকা গলায় ঢেলে আসা যেতো।

‘তা তোমাকে আর খামকা দেরি করিয়ে দেবো না । চটপট ব্যবস্থা ক’রে দিচ্ছি,’ ব’লে তিনি হাঁক পাড়লেন।

একটা লোক এসে গোড়ালি ঠুকে খাড়া হ’য়ে তাঁকে সেলাম জানালে।

‘পঁচিশ ঘা বেত,’ মেজর হুকুম দিলেন, ‘খুব জোরে মেরো না কিন্তু...এ কেবল বন্ধুর পিঠে পড়বে। স্লাভ হ’লে অবিশ্যি অন্য কথা ছিলো।...যাও ট্রাঙ্কেল, জামা খুলে গিয়ে ইনাম নাও। যখন ফিরে যাবার মতো অবস্থা হবে, এসে রশিদ নিয়ে যেয়ো।’

হের মেজরকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রাঙ্কেল কাঁপতে-কাঁপতে পুলিশের লোকটাকে অনুসরণ করলে। ভাগ্যিশ জর্মানরা ভৃত্যদের পারিবারিক বন্ধু ব’লে ভাবে, তাই তার আর নালিশ করার মতো কিছু নেই। কামিজ খুলে পিছন ফিরে পিঠ বাঁকিয়ে দাঁড়ালো সে, আর পুলিশের লোকটা বেত তুললো। ঠিক এমন সময়ে থানায় হুলুস্থুল শুরু হ’য়ে গেলো।

হন্তদন্ত হ’য়ে একটা লোক ঢুকলো, হাঁফাতে-হাঁফাতে সে চেঁচালে, ‘মেজর ফেরডের! মেজর ফেরডের!’

বেতটা আর ট্রাঙ্কেলের পিঠে পড়লো না, কারণ কী ব্যাপার জানবার জন্যে পুলিশের লোকটা তখন দরজা খুলে তাকাচ্ছে। ট্রাঙ্কেলও মুখ বাড়িয়ে সব দেখবার চেষ্টা করলে।

শোরগোল শুনে মেজর ফেরডের তখন তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। 'কী ব্যাপার?'

হন্তদন্ত লোকটা হাঁফাতে-হাঁফাতে তাঁর কাছে গিয়ে একটা তারবার্তা তুলে দিলে। বললে, 'সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে! ভীষণ অপরাধ!'

'কখন?'

'কাল রাতে।'

'কী হয়েছে?'

'খুন!'

'খুন? কোথায়?'

'পেরনাউ-এর রাস্তায়। "ভাঙা ক্রুশের" সরাইখানায়।'

'কে খুন হয়েছে?'

'ব্যাঙ্কের কেরানি—ইয়োহাউজেন ব্যাঙ্কের কেরানি!'

'অ্যাঁ!...পোখ!' ট্রাঙ্কেল চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমাদের পোখ!'

'খুনের কারণ কিছু জানা গেছে? কোনো মোটিভ?' মেজর ফেরডের জিগেশ করলেন।

'চুরি—কারণ পোখ-এর ব্রীফ-কেসটা পাওয়া গেছে...মৃতদেহের পাশেই প'ড়ে ছিলো —ভিতরে কিছু পাওয়া যায়নি।'

'ভিতরে কী ছিলো ব'লে অনুমান করছে?'

'এখনো জানা যায়নি ব্রীফ-কেসে কী ছিলো। তবে ব্যাঙ্কে খবর নিলেই তা এক্ষুনি জানা যাবে।'

তারবার্তায় সত্যি এর বেশি-কিছু জ্ঞাতব্য ছিলো না। মেজর ফেরডের তাঁর অনুচরদের একজনকে বললেন, 'তুমি...তুমি গিয়ে জজ কেরস্টোফকে খবর দাও...'

'এক্ষুনি যাচ্ছি।'

'আর তুমি গিয়ে ডাক্তার হামিনেকে ব'লে এসো। বলো যে এক্ষুনি যেন দু'জনে ইয়োহাউজেনদের ব্যাঙ্কে চ'লে আসেন। ওঁদের অপেক্ষায় আমি সেখানে ব'সে থাকবো।'

হন্তদন্ত হ'য়ে লোক দুটি থানা থেকে বেরিয়ে পড়লো। মেজর ফেরডেরও ইয়োহাউজেন ব্যাঙ্কের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়লেন।

আর তালেগোলে ট্রাঙ্কেল বড়ো বাঁচা বেঁচে গেলো। এই হুলুস্থুলুর মধ্যে কেউ খেয়ালই করলে না যে তার পিঠে পঁচিশ ঘা বেত পড়েনি।

সরেজমিন তদন্ত

দু-ঘণ্টা পরে দেখা গেলো খটাখট আওয়াজ তুলে পেরনাউ রোড ধ'রে একটা কোচবাক্স ছুটে যাচ্ছে ; ঘোড়ার গাড়িটা আসলে ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের ; রাস্তার সব কটা আস্তাবলের সঙ্গে ইয়োহাউজেনদের দহরম-মহরম আছে—একেক জায়গায় পৌঁছে ক্লান্ত ঘোড়ার বদলে তেজি ঘোড়া জুতে দিতে তাই আর মোটেই দেরি হয় না ; কিন্তু যত জোরেই গাড়ি ছুটুক, রাত্তিরের আগে ওই ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায় গিয়ে পৌঁছনো অসম্ভব ; সেক্ষেত্রে একটা কোনো আস্তাবলের লাগোয়া বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে সকালে গিয়েই ওই সরাইখানায় পৌঁছনো ভালো।

কোচবাক্সে বসেছিলেন ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন স্বয়ং—আর ছিলেন মেজর ফেরডের, ডাক্তার হামিনে, বিচারপতি কেরস্টোফ—কেরস্টোফই হচ্ছেন তদন্তকারী বিচারক, আর আছে আদালতের এক কেরানি ও দুটি সাধারণ পুলিশ।

বিচারপতি কেরস্টোফের বয়েস পঞ্চাশ হবে ; সহযোগীরা ও জনসাধারণ—সকলেই তাঁর নৈপুণ্য ও কর্মক্ষমতায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাবান। কোনো উৎকোচ নেন না বা কর্তৃপক্ষের চাপে বা প্রভাবে টলেন না, কোনো রাজনৈতিক মতবাদের পক্ষপাতী হ'য়েও বিচারকের কর্তব্য থেকে তিনি কক্খনো ভ্রষ্ট হন না। বলা যায় তিনি মনুষ্যবেশী ন্যায়বিচার। চাপা মানুষ, কিছুতেই মুখ খোলেন না—অর্থাৎ ভাবেন বেশি, বাজে বকেন কম।

ডাক্তার হামিনে যাচ্ছেন পোখ-এর মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে। ময়নাতদন্তের আগে মৃত্যুর কারণ ও সময় ইত্যাদি তিনি অনুমান করবেন। আগের দিন সন্ধেবেলায় রোজকার মতোই তিনি গিয়েছিলেন অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে—গিয়ে শোনেন অধ্যাপক বাড়ি নেই। ইল্‌কার কাছ থেকে শুনেছেন যে তার বাবা কোথায় যেন গেছেন—সেদিনই সকালে নাকি অধ্যাপক মেয়েকে জানিয়েছিলেন যে দু-তিনদিনের জন্য তিনি রিগা ছেড়ে যাচ্ছেন। কোথায় গেছেন, তা ইল্‌কা জানে না। হঠাৎ কেন কোথাও যাবার তাড়া পড়লো, তা মোটেই বোঝা গেলো না। তবে তারও আগের দিন সন্ধেবেলায় তাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমনা দেখাচ্ছিলো। তবে তাঁর মতো ভারিক্কি মানুষকে এই দুশ্চিন্তার কারণ জিগেশ করবে কে? এখন এই চলন্ত গাড়িতে ব'সে হঠাৎ অধ্যাপক নিকোলেফের কথা ভেবে ডাক্তার হামিনের বেশ উদ্বেগ হ'লো।

গাড়ি খুব জোরেই ছুটছে। ঘণ্টা তিনেক আগে বেরুতে পারলে আজকেই তদন্ত শুরু করা যেতো। হাওয়া শুকনো, কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডা, আগের রাত্তিরের সেই বিষম দুর্যোগের কোনো চিহ্ন অবিশ্যি এখন আর নেই। তবে রাস্তার যা জীর্ণ দশা, তাতে ঘোড়াগুলোর উপর দিয়ে খুব ধকল যাচ্ছে যা হোক।

সবাই চুপচাপ ব'সে যে যার ভাবনায় তন্ময়—কেবল মেজর ফেরডের আর ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের মধ্যে মাঝে-মাঝে ছোটোখাটো বিষয়ে বাণী বিনিময় হচ্ছে। কাল সকালে ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায় পৌঁছে কী শোচনীয় হত্যা-রহস্যের মুখোমুখি হবেন, কে জানে!

+

কোচোয়ান, সহিস আর একটা খামারের গাড়ি নিয়ে যথাসময়ে এসেই সরাইখানায় হাজির

হয়েছিলো ব্রোক্স, ভেবেছিলো পোখ ও অন্য যাত্রীটি নিশ্চয়ই তখনও কোচবাক্সের মেরামতের জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু হাসিখুশি পোখ-এর বদলে তার মৃতদেহ দেখে ব্রোক্সের অবস্থা যে কী-রকম কাহিল ও আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলো, সেটা সহজেই বোঝা যায়। বেচারি বিয়ে করবার জন্য রিগায় ফিরবে ব'লে কীরকম উদ্‌গ্রীব হয়েছিলো, কিন্তু তার বদলে কি না এই! তক্ষুনি সহিস কোচোয়ান সব্বাইকে ফেলে রেখে একটা ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠে পড়ে ব্রোক্স সোজা চ'লে যায় পেরনাউতে, পুলিশকে খবর দিতে। পেরনাউ থেকে, খবরটা শোনবামাত্র, তারবার্তায় সব জানানো হয় মেজর ফেরডেরেকে, আর কয়েকজন পুলিশ ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায় এসে হাজির হয়। ব্রোক্সও কালবিলম্ব না-ক'রে ফিরে আসে, কারণ তদন্তকারীরা নিশ্চয়ই তারও এজাহার চাইবে।

১৫ই এপ্রিল—অর্থাৎ পরদিন-সকালবেলায় মেজর ফেরডেরেদের নিয়ে কোচবাক্স এসে অকুস্থলে পৌঁছনোমাত্র তদন্তের কাজ শুরু হ'য়ে গেলো। সরাইখানার বাইরে রাস্তার উপরে কড়া পুলিশ পাহারা বসেছে, রান্নাঘরের ওদিকটাতে ঠিক পাইন জঙ্গলের মুখটাতে পুলিশ রয়েছে—তাদের উপর আদেশ আছে কাউকেই যেন সরাইখানায় ঢুকতে দেয়া না-হয়। কৌতূহলী চাষী ও কাঠুরেরা চারপাশে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু পুলিশের জন্য ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। এ-তল্লাটে রাস্তাঘাটে খুনজখম রাহাজানি হয় সত্যি, কিন্তু কোনো সরাইখানায় এ-রকম কোনো হত্যাকাণ্ড সচরাচর ঘটে না।

ক্রোফ দাঁড়িয়েছিলো দরজার কাছেই; মেজর ফেরডেরেরা পৌঁছুতেই সে তাদের প্রথমেই পোখ-এর মৃতদেহ যে-ঘরটায় পড়েছিলো সে-ঘরে নিয়ে গেলো।

মৃতদেহটা দেখেই হের ইয়োহাউজেন আর শোক সংবরণ করতে পারলেন না। হ্যাঁ, পোখই বটে, চব্বিশ ঘণ্টা আগে হিম মৃত্যু তাকে স্পর্শ করেছে, এখন মৃতদেহটা প'ড়ে আছে শক্ত ও ঠাণ্ডা। ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেছে পোখ, ঘুমের মধ্যেই চোট পেয়েচে। পোখ-এর নির্দেশমতো ক্রোফ তাকে সেদিন সকালবেলায় জাগাতে আসেনি—যখন ব্রোক্স সব সাহায্য নিয়ে এসে হাজির হ'লো তখনই ব্রোক্সকে সঙ্গে ক'রে এসে সে দরজায় কড়া নাড়ে। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিলো। অনেক ডাকাডাকি সত্ত্বেও কোনো সাড়া না-পেয়ে দুজনেই খুব শঙ্কিত হ'য়ে উঠে শেষকালে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে, তখনও মৃতদেহটি উষ্ণ ছিলো।

বিছানার পাশেই টেবিলটায় প'ড়ে আছে পোখ-এর ব্রীফ-কেস, উপরে ব্যাঙ্কের নামের আদ্যক্ষর লেখা; ব্রীফ-কেসের শেকলটা মেঝেয় লুটোচ্ছে—ভিতরে একটা কানাকড়িও নেই।

প্রথমেই ডাক্তার হামিনে মৃতদেহটা পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে —বিছানা রক্তে মাখামাখি, এমনকী মেঝেতেও রক্তের ফোঁটা পড়েছে। পোখ-এর পঞ্চম পাঁজরের কাছে, একটু বাঁ দিক ঘেঁষে, একটা জখমের চিহ্ন—পাঁচ-ছ ইঞ্চি লম্বা কোনো ধারালো ছোরা ব্যবহার করেছে খুনী, ছোরাটা এত জোরে বসানো হয়েছে যে তক্ষুনি পোখ-এর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিকল হ'য়ে যায়।

খুনের কারণ বুঝতে কারুরই কোনো দেরি হ'লো না। সেই ব্রীফ-কেসের শূন্যতাটা যথেষ্ট জাজ্বল্যমান ও বাঙ্ময়।

+

কিন্তু বন্ধ ঘরটার মধ্যে খুনী ঢুকেছিলো কী ক'রে? দরজাটা তো বন্ধ ছিলো, ক্রোফ আর ব্রোক্সকে শেষটায় দরজা ভেঙে ঢুকতে হয়েছিলো। তাহ'লে নিশ্চয়ই রাস্তার ধারের জানলাটা দিয়েই খুনী ঢুকেছে। বালিশের গায়ে রক্তের দাগ দেখে বোঝা গেলো ব্রীফ-কেসটা ছিলো বালিশের নিচে—সেটার খোঁজ করতে গিয়ে খুনী রক্তমাখা হাতে চারপাশে হাৎড়েছে আর রক্তের দাগ লেগে গিয়েছে। পনেরো হাজার রুবল বার ক'রে নিয়ে খুনী তারপর ব্রীফ-কেসটা টেবিলে রেখে চ'লে যায়।

ক্রোফের সামনেই তদন্ত চলছিলো। কেরস্টোফের জেরার জবাবে বেশ বুদ্ধিমান উত্তর দিচ্ছিলো ক্রোফ। তবে তাকে ভালো ক'রে সবকিছু জিগেশ করার আগে চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখে নেয়া উচিত। খুনী যদি পালাবার সময় রাস্তায় কোনো সূত্র ফেলে যায়।

ডাক্তার হ্যমিনে, ইয়োহাউজেন, ক্রোফ ও রিগার পুলিশদের নিয়ে মেজর ফেরডের আর বিচারপতি কেরস্টোফ রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। যে-সব চাষী ও কাঠুরে হাঁ ক'রে সব দেখছিলো, তাদের পুলিশ আরো দূরে সরিয়ে দিলে।

প্রথমে ঘরের জানলাটা অন্তত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হ'লো। ডান দিকের খড়খড়িটা জীর্ণ ছিলো, কোনো শক্ত-কিছু ঢুকিয়ে খড়খড়ি তুলে জোরে হ্যাঁচকা টান মেরে আস্ত ছিটকিনিটাই তুলে নেয়া হয়েছে। তারপর খুনী জানলার একটা শার্সি ভেঙেছে—নিচে কাচের টুকরো প'ড়ে আছে এলোমেলো, তারপর হাত ঢুকিয়ে ভিতরকার খিলটা খুলে ফেলে ভিতরে ঢুকেছিলো আততায়ী—দুষ্কর্মের পরে এই পথ দিয়েই সে চম্পট দিয়েছে।

অজস্র পায়ের ছাপ দেখা গেলো রাস্তায়। ঝড়-বৃষ্টিতে মাটি ভেজা ছিলো, কিন্তু এত লোকের পায়ের ছাপ সেখানে আছে, আর এমনভাবে একটার উপর আরেকটা ছাপ পড়েছে যে পায়ের ছাপ দেখে কোনো-কিছুই বোঝা গেলো না। পুলিশ আসার আগে নিশ্চয়ই প্রচুর কৌতূহলী লোক ভিড় করেছিলো সরাইয়ের সামনে— একা ক্রোফের পক্ষে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি!

মেজর ফেরডের আর কেরস্টোফ তারপর গেলেন সেই অজ্ঞাত যাত্রীটি যে ঘরে ছিলো, তার জানলার কাছে। গোড়ায় সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়লো না। খড়খড়ি বন্ধ। কিন্তু ভালো ক'রে তাকিয়ে জানলার গোবরাটে কতগুলো আঁচড়ের চিহ্ন দিখা গেলো, দেয়ালেও কিসের আঁচড় লেগেছে—সম্ভবত কেউ ঐ জানলা দিয়ে রাত্তিরে বাইরে বেরিয়েছিলো।

সব্বাই ভিতরে এসে এবার অচেনা যাত্রীটির ঘরে ঢুকে দেখলেন। অন্ধকারে ঢাকা বন্ধ ঘর, মেজর ফেরডের গিয়ে জানলাটা খুলে দিতেই ঘরে আলো এসে ঢুকলো। দুটো কাঠের চেয়ার ঠিক জায়গামতো রয়েছে, বিছানাটা দেখে বোঝা গেলো কেউ তাতে পরশু রাতে শোয়নি, টেবিলের উপর মোমবাতিটার পোড়া টুকরো প'ড়ে আছে। জানলার গোবরাটে আর দেয়ালে সেই কয়েকটা আঁচড় ছাড়া আর-কোনো সূত্রই পাওয়া গেলো না। ঐ আঁচড়গুলো অবিশ্যি খুব জরুরি ও রহস্যময়।

ক্রোফের ঘর, মুরগির খাঁচা, শবজি-বাগান—সবখানেই একবার ক'রে গিয়ে অনুসন্ধান করা হ'লো। না, বাইরে থেকে কেউ যে রাত্তিরে এই সরাইতে ঢুকেছিলো, এদিকটায় অন্তত তার কোনো ইঙ্গিত নেই। পোখ-এর ঘরের জানলা দিয়েই আততায়ী ঢুকেছিলো, তবে জানলাটা

যেহেতু রাস্তার উপর সেইজন্যই বাইরের কারুর পক্ষে ভিতরে ঢোকা একেবারে অসম্ভব ছিলো না।

তারপর সরাইওলাকে জেরা শুরু করলেন কেরস্টোফ। বড়ো ঘরটায় বসলো তদন্ত কমিটি, পাশেই বসলো আদালতের কেরানি। মেজর ফেরডের, ডাক্তার হামিনে ও হের ইয়োহাউজেন—সবাই সরাইওলার এজাহার শোনবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে ছিলেন, তাঁরা পাশেই গোল হ'য়ে বসলেন। তারপর ক্রোফকে বলা হ'লো সে যা জানে সব খুলে বলতে।

'ধর্মাবতার,' ক্রোফ সরাসরি বলতে শুরু ক'রে দিলে, 'পরশু রাত আটটা নাগাদ দুজন যাত্রী ঝড়ের মধ্যে সরাইখানায় এসে হাজির হয়, রাতটা তারা সরাইতে কাটাতে চায়। গাড়ি উলটে পড়েছিলো না কি তাদের, সেইজন্যে একজনে একটু খোঁড়াচ্ছিলো।'

'সে-ই হ'লো পোখ, ইয়োহাউজেন ব্যাঙ্কের কেরানি।'

'হ্যাঁ...এই পরিচয়ই সে দিয়েছিলো আমাকে।...সব বলেছিলো সে, ঝড়ের পাল্লায় ঘোড়াগুলোর নাজেহাল হওয়া, গাড়ি উলটে পড়া, চোট পাওয়া...সব। পায়ে চোট না-লাগলে সেও কোচবাক্সের পাহারাওলার সঙ্গে পেরনাউ চ'লে যেতো, কিন্তু বেচারা...তার বদলে কিনা যম তাকে টান দিলো!...কোচবাক্সের পাহারাওলাকে আমি অবিশ্যি দেখিনি, পরের দিন সকালেই তার ফিরে আসার কথা ছিলো...তা সে এসেও ছিলো...'

কেরস্টোফ জিগেশ করলেন, 'রেফেল যাচ্ছিলো কেন পোখ? কিছু বলেছিলো সে-সম্বন্ধে?'

'না...আমাকে নৈশভোজের ব্যবস্থা করতে বলেছিলো শুধু, দিব্যি খেলো ভালোমানুষের মতো...খাওয়াদাওয়ার পর ন-টা নাগাদ সে নিজের ঘরে যায়, আর ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়।'

'আর অন্য যাত্রীটি?'

'অন্য যাত্রীটি কেবল রাত কাটাবার জন্য একটা ঘরই চেয়েছিলো, খাবার-দাবার কিচ্ছু চায়নি। শুতে যাবার আগে আমাকে কেবল বলেছিলো যে, সে কোচবাক্সের পাহারাওলার ফিরে আসা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করবে না, ভোরবেলাতেই চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়বে।'

'সে কে, তা কিছু জানা গেছে?'

'না, ধর্মাবতার। পোখ বেচারাও তার পরিচয় কিছু জানতো না। খেতে-খেতে সে তার সঙ্গী সম্বন্ধে সব বলেছিলো আমাকে—সারা রাস্তায় সে নাকি কুল্লে গোটা দশেক কথা বলেছে, সারাক্ষণ নাকি টুপির তলায় মুখ ঢেকে বসেছিলো...বোধহয় কেউ তাকে চিনে ফেলুক এটা তার উদ্দেশ্য ছিলো না। আমিও তার মুখটা দেখতে পাইনি। কী-রকম দেখতে, জিগেশ করলে আমি কিছুই বলতে পারবো না।'

'ওরা দুজনে যখন আসে, তখন সরাইতে অন্য-কেউ ছিলো?'

'এখানকার জনাছয়েক চাষী আর কাঠুরে ছিলো। আর ছিলেন সারজেন্ট য়েক আর তাঁর এক অনুচর।'

'সারজেন্ট য়েক ছিলো নাকি?' ইয়েহাউজেন ব'লে উঠলেন, 'সে পোখকে চিনতে পারেনি?'

'পেরেছিলেন নিশ্চয়ই, কারণ পোখ-এর সঙ্গে তিনি একটু আলাপ করেছিলেন।'

কেরস্টোফ জিগেশ করলেন, 'তারপর সবাই চ'লে গেলো? কখন?'

'সাড়ে-আটটা নাগাদ। আমি তারপর দরজা বন্ধ ক'রে দিই—খিল তুলে দিয়ে তালা এঁটে দিই।'

'তাহ'লে বাইরে থেকে দরজা খোলবার কোনো উপায় ছিলো না?'

'না, ধর্মাবতার।'

'ভিতর থেকে চাবি ছাড়া কারু পক্ষে দরজা খোলা সম্ভব ছিলো না?'

'না।'

'আর সকালবেলায় দরজাটা সে-রকমই তালা-বন্ধ ছিলো?'

'হ্যাঁ। অচেনা যাত্রীটি ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় চারটেয় তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে...আমি লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিই...। এক রুবল পাওনা হয়েছিলো, আমার প্রাপ্য সে তক্ষুনি চুকিয়ে দেয়। তখনও তার মুখটা ওভারকোটের কলার আর টুপির ডগা দিয়ে ঢাকা ছিলো—কাজেই মুখটা আর দেখতে পাইনি। দরজা খুলে দিতেই সে চ'লে গেলো—আমি আবার ভিতর থেকে দরজা এঁটে দিলুম।'

'কোথায় যাচ্ছে, তা সে কিছু বলেছিলো?'

'না।'

'রাত্তিরে কোনো সন্দেহজনক আওয়াজ শুনেছিলে?'

'উঁহু, কিছু না।'

'তোমার নিজের ধারণা কী, ক্রোফ?' কেরস্টোফ জিগেশ করলেন, 'যাত্রীটি চ'লে যাবার আগেই কি পোখ খুন হয়েছিলো?'

'আমার তো তা-ই মনে হয়'

'তা, সে চ'লে যাবার পর তুমি কী করলে?'

'আমি আবার নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। তখনও পুরো সকাল হয়নি, আলো ফোটেনি...উঠে করবো কী? তবে আমি আর ঘুমোইনি।'

'তার মানে চারটে থেকে ছটার মধ্যে পোখ-এর ঘরে কোনো ধস্তাধস্তি বা চ্যাঁচামেচি হ'লে তুমি ঠিক শুনতে পেতে?'

'নিশ্চয়ই পেতুম। কারণ আমার ঘরটা বাগানের দিকে ফেরানো হ'লেও আসলে পোখ-এর ঘরের একেবারে লাগোয়া। কাজেই কোনো ধস্তাধস্তি হ'লে শুনতে পেতুম বৈকি!'

'তা ঠিক,' বললেন মেজর ফেরডের, 'কিন্তু পোখ বেচারি ধস্তাধস্তি করারও সময় পায়নি—ঘুমন্ত অবস্থাতেই ছোরার ঘা খেয়েছে।'

তবে সব শুনে ওটা স্পষ্ট বোঝা গেলো যে সেই রহস্যময় যাত্রীটি সরাই ছেড়ে চ'লে যাবার আগেই খুনটা হয়েছিলো । তবে একবারে নিশ্চিত আর কী ক'রে হওয়া যাবে? কারণ চারটে থেকে পাঁচটা অব্দি একে চারদিক ছিলো অন্ধকার, তার উপর ছিলো বিষম ঝড়। এই দুর্যোগের মধ্যে রাস্তাও নিশ্চয়ই ছিলো ফাঁকা—ফলে বাইরে থেকে কেউ যদি ভিতরে ঢুকেও থাকে, তবে তাকে দেখাও সম্ভব ছিলো না, কোনো আওয়াজও শোনা যেতো না।

কেরস্টোফ যা-ই জিগেশ করতে লাগলেন, ক্রোফ তারই সরাসরি উত্তর দিতে লাগলো।

তারও উপর যে সন্দেহ পড়তে পারে, এটা সে বোধহয় একবারও ভাবেনি। সব শুনে যেটা বোঝা গেলো তা এই : আততায়ী এসেছিলো বাইরে থেকে, জানলা ভেঙে ঢুকেছিলো ভিতরে, তারপর পোখকে হত্যা ক'রে পনেরো হাজার রুবল নিয়ে আবার ওই জানলা দিয়েই চম্পট দিয়েছিলো।

খুনের ব্যাপারটা ক্রোফ টের পেলো কী ক'রে, সেটা সে খুলে বললে। সাতটা নাগাদ সে যখন বড়ো হল ঘরটায় টুকিটাকি কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত, ব্রোক্স তখন পেরনাউ থেকে ফিরে এসেছে...দুজনে মিলে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে পোখকে জাগাবার অনেক চেষ্টা করলে...যখন কোনো উত্তরই এলো না, তখন বিপদের আশঙ্কা করে দুজনে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে...ঢুকেই দ্যাখে রক্তারক্তি কাণ্ড...

'তখন যে পোখ-এর দেহে প্রাণ ছিলো না, তা তুমি হলফ ক'রে বলতে পারবে?'

'পারবো, ধর্মাবতার। নিশ্বেস পড়ছিলো না। ব্রোক্স আর আমি অনেক চেষ্টা করেছিলুম...কিন্তু বুকের মধ্যে ছোরা ঢুকেছে, আর কি কেউ বাঁচে!'

'আততায়ী যে-অস্ত্রটা ব্যবহার করেছিলো, সেটা তুমি খুঁজে পাওনি?'

'না, ধর্মাবতার। ছোরাটা বোধহয় সে নিয়ে গিয়েছে!'

'পোখের ঘর যে ভিতর থেকে বন্ধ ছিলো, এটা তুমি হলফ ক'রে বলতে পারবে তো?'

'হ্যাঁ—খিলও তোলা ছিলো, তালাও লাগানো ছিলো। ব্রোক্সও তার সাক্ষী আছে। বন্ধ ছিলো ব'লেই তো দরজাটা ভাঙতে হ'লো আমাদের।'

'তারপর ব্রোক্স চ'লে গেলো?'

'হ্যাঁ, ধর্মাবতার, আর এক মুহূর্তও সে দাঁড়ায়নি। তক্ষুনি পেরনাউ গিয়ে কর্তৃপক্ষকে খবর দিতে চাচ্ছিলো সে। পেরনাউ থেকে শীগগিরই দুজন পুলিশ চ'লে আসে।'

'ব্রোক্স তারপর আর ফেরেনি?'

'না, তবে আজ সকালে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। ওকেও তো এজাহার দিতে হবে কিনা!'

'আচ্ছা,' হের কেরস্টোফ বললেন, 'এবার তুমি যেতে পারো, তবে সরাই ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। ডাকলেই যেন তোমাকে পাওয়া যায়!'

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবার আগে ক্রোফকে তার পুরো নাম, বয়েস, পেশা ইত্যাদি সব তথ্য জানাতে হয়েছিলো ; আদালতের কেরানিটি পুরো প্রশ্নোত্তরটাই টুকে নিয়েছিলো। ক্রোফের এজাহার থেকে যে-তথ্যগুলো জানা গেলো, কেরস্টোফ সে-সব জুড়ে-জুড়ে মিলিয়ে দেখছেন, এমন সময় খবর এলো যে ব্রোক্স ফিরে এসেছে। তক্ষুনি তার ডাক পড়লো। ক্রোফের পরেই তার সাক্ষ্যের গুরুত্ব।

ব্রোক্সকেও প্রথমে নাম-ধাম পেশা জিগেশ করা হ'লো—সেও সব যথাযথ বললে। কোচবাক্সের যাত্রীদের কথা সে বর্ণনা করলে প্রথমে, গাড়ি উলটে যাওয়া, পোখ-এর জখম হওয়া, যাত্রী দুজনের এই সরাইতে রাত কাটাতে আসার কারণ সব সে ঠিকঠাক বললে। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে রক্তারক্তি দেখার যে-বিবরণ সে দিলে, তা ক্রোফের বিবরণের সঙ্গে মিলে গেলো। তবে ব্রোক্স একটা কথা বললে, যেটা বেশ বিবেচনাযোগ্য। রাস্তায় পোখ নাকি

গাড়ির মধ্যে না-ভেবেচিন্তেই তার ব্রীফ-কেসের কথা বলেছিলো—অর্থাৎ তার সঙ্গে যে ব্যাঙ্কের টাকা আছে, এটা সে আদৌ লুকোয়নি।

কোচবাক্সের রহস্যময় যাত্রীটির কথা জিগেশ করতেই ব্রোক্স জানালে, 'উহু, তাকে আমি চিনি না—মুখটাই একবারও ভালো ক'রে দেখতে পাইনি, তো চিনবো কী ক'রে।'

'ঠিক গাড়ি ছাড়ার সময়ে এসে সে হাজির হয়েছিলো?'

'মিনিট কয়েক আগেই এসেছিলো।'

'আগে থেকে আসন সংরক্ষিত ক'রে রেখেছিলো কি?'

'আজ্ঞে না।'

'রেফেলে যাচ্ছিলো কি?'

'রেফেল অব্দি ভাড়া দিয়েছিলো, কেবল এ-কথাই আমি বলতে পারি।'

'পরের দিন তোমরা কোচবাক্স মেরামত ক'রে ফিরে আসবে, তাই তো ঠিক হয়েছিলো, না?'

'হ্যাঁ, ধর্মাবতার । ঠিক ছিলো, পোখ আর সে আবার ওই গাড়িতে ক'রেই যাবে।'

'অথচ পরদিন ভোরবেলায় সে সরাই থেকে চ'লে যায়?'

'হ্যাঁ, ধর্মাবতার। ক্রোফ যখন বললে যে সে চ'লে গেছে, শুনে আমি ভারি অবাক হয়েছিলুম।'

'কিন্তু তার এই আচমকা চ'লে-যাওয়া থেকে তোমার কী মনে হয়?'

'আমি ভেবেছিলুম, তার হয়তো পেরনাউতে কোনো কাজ আছে—আর পেরনাউ যেহেতু কাছেই, সেইজন্য সে হেঁটেই চ'লে গেছে।

'তাই যদি তার উদ্দেশ্য হয় তো গাড়ি ওলটাবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে তো চ'লে যেতো। খামকা এই সরাইতে রাত কাটাতে গেলো কেন?

'হ্যাঁ, ধর্মাবতার,' ব্রোক্স সায় দিলে, 'আমার কাছেও ব্যাপারটা ভারি আশ্চর্য ঠেকেছিলো।'

ব্রোক্সকে আর কিছু জিগেশ করবার ছিলো না ব'লে তাকে তখনকার মতো ছুটি দেয়া হ'লো। সে চ'লে যেতেই মেজর ফেরডের ডাক্তার হামিনেকে জিগেশ করলেন, 'আপনি কি মৃতদেহটা আবার পরীক্ষা করতে চান?'

'না মেজর,' ডাক্তার জানালেন, 'আমি জখমের ধরন, ঠিক কোন্ জায়গায় ঘা লেগেছে, কতটা চোট লেগেছে,সব টুকে নিয়েছি ।'

'ছোরারই ঘা তো?'

'হ্যাঁ।'

ইয়োহাউজেন জিগেশ করলেন, 'তাহলে কি মৃতদেহটা রিগায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বলবো? সেখানেই তার অন্ত্যেষ্টি হবে কিনা।'

কেরস্টোফ মৃতদেহটা নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন।

'আমরাও তো তাহ'লে এখন যেতে পারি?' ডাক্তার জিগেশ করলেন।

'হ্যাঁ,' মেজর বললেন, 'এখানে তো আর কিছু জিগেশ করার নেই।'

'যাবার আগে', হের কেরস্টোফ বললেন, 'আমি আরেকবার পোখের ঘরে যেতে চাই।

হয়তো আগের বারে সব আমরা ঠিকমতো লক্ষ করিনি।'

ক্রোফকে ডেকে নিয়ে আবার সবাই মিলে পোখের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কেরস্টোফ ঘরের চুল্লির পাশে প'ড়ে-থাকা ছাই নেড়েচেড়ে দেখতে চাচ্ছিলেন—যদি সেখানে সন্দেহজনক কিছু প'ড়ে থাকে। আর সেটা দেখতে গিয়েই চুল্লির পাশের কয়লা ঠাশা হাতুড়িটার দিকে তাঁর নজর পড়লো। তুলে নিয়ে সেটা নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়েই আবিষ্কার করা গেলো যে সেটা কী রকম যেন দুমড়ে গেছে, যেন সেটা দিয়ে খুব জোরে কিছু-একটা করা হয়েছে। এটা দিয়েই কি চাপ দিয়ে পোখের জানলার খড়খড়ি খোলা হয়েছে? সম্ভবত। বিশেষ ক'রে দেয়ালের গায়ের আঁচড়গুলো দেখে সন্দেহটা আরো জোরালো হয়। সরাইখানা থেকে বেরিয়েই কেরস্টোফ তাঁর সন্দেহটা খুলে বললেন।

'খুনটা করতে পারতো মাত্র তিনজনে। বাইরের কোনো লোক, কিংবা সরাইওলা, অথবা সেই রহস্যময় যাত্রীটি...কিন্তু কয়লা ঠাশার হাতুড়িটা দেখবার পর সব সন্দেহ ভঞ্জন হ'য়ে যায়। পোখের ব্রীফ-কেসে যে প্রচুর টাকা আছে, ঐ যাত্রীটি তা জানতো। রাতে নিজের ঘরের জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসে সে, তারপর এই কয়লা ঠাশার হাতুড়িটাকে লিভারক হিশেবে ব্যবহার ক'রে পোখের ঘরের জানলা খুলে সে ভেতরে ঢুকে পড়ে। পোখকে খুন ক'রে ব্রীফ-কেস থেকে সব টাকা হাতিয়ে তারপর জানলা দিয়েই সে নিজের ঘরে ফিরে আসে। চারটে বাজতেই চটপট সে সরাই ছেড়ে চ'লে যায়—না, ঐ রহস্যময় যাত্রীটিই যে আততায়ী,তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।'

কিন্তু কে এই রহস্যময় যাত্রী? তাকে শনাক্ত করা যাবে কী ক'রে?

মেজর ফেরডের বললেন, 'হের কেরস্টোফ যা বললেন হয়তো তা-ই ঘটেছিলো। তবে খুনের মামলায় তদন্ত চালাতে-চালাতে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত সব জটিলতা দেখা দেয়। আমি বরং ঐ যাত্রীটির ঘর তালা বন্ধ ক'রে চাবিটা নিয়ে আসি, আর দুটি লোককে ও-ঘরের পাহারায় রেখে দিই। তারা সারাক্ষণ সরাইওলা আর ঐ ঘরটার উপর নজর রাখবে।'

সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করে সবাই যখন কোচবাক্সে উঠতে যাবেন, ইয়োহাউজেন হঠাৎ কেরস্টোফকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি কিন্তু আপনাদের একটা কথা বলিনি। আমার মনে হয় কথাটা আপনার জানা উচিত।'

'বলুন।'

'চোরাই নোটগুলোর নম্বর আমার কাছে টোকা আছে। দেড়শো নোট ছিলো—সব একশো রুবলের নোট।'

'আপনি তাহ'লে নম্বর রেখেছেন?'

'হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক থেকে তা-ই করা হয় সবসময়। বলটিক দেশগুলোয় আর রাশিয়ার সব ব্যাঙ্কে নম্বরগুলো জানিয়ে দিলেই হয়।'

'তাতে কি আমাদের কিছু সুবিধে হবে?' চিন্তিতভাবে বললেন কেরস্টোফ, 'হয়তো কথাটা আততায়ীর কানে পৌঁছে যাবে, ভয় পেয়ে সে হয়তো দেশ ছেড়েই কোথাও চ'লে যাবে...যেখানে নম্বরগুলোর কথা কেউ জানে না, হয়তো সেখানে সে নোটগুলো ভাঙিয়ে ফেলবে। আপনি বরং আপাতত সব চেপে যান, হয়তো টাকা ভাঙাতে গিয়েই সে ধরা প'ড়ে যাবে!'

একটু পরেই সবাইকে নিয়ে কোচবাক্স ছেড়ে দিলো।

৮

ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ে

১৬ এপ্রিল বিকেলবেলায় লিভোনিয়ার ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কয়েকজন ছাত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। উত্তেজিতভাবে তর্কাতর্কি হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে, মশমশে জুতোর শব্দ করতে-করতে তারা পায়চারি করছে, একেকজনের কোমরে চামড়ার বেল্ট, মাথায় ছাত্রদের টুপি।

একজন বলছিলো, 'আমি বাপু গ্যারান্টি দিতে পারি আজ টাটকা মাছ খেতে পাওয়া যাবে। আ থেকে এসেছে মাছগুলো, কাল রাত্তিরেই ধরা হয়েছে। কুমেলে ভালো ক'রে ধুয়ে নেবার পর মাছগুলো যার কাছে মুখরোচক ঠেকবে না, তার মাথার খুলি বাপু এক্ষুনি ফাটিয়ে দেবো।'

বড়ো ছাত্রদের একজন জিগেশ করলে, 'কী হে জিগফ্রিড, তোমার কী মত?'

'আমার?' জিগফ্রিড উত্তর দিলে, 'আমি পাখির মাংসের তদারকি করছি—আমি যা খেতে দেবো, তা যার পছন্দ হবে না, সেই মহাশয়কে এই অধমের সঙ্গে একটু লড়তে হবে।'

'কড়াইশুঁটিওলা মাংস রাঁধছি বাপু, তাজা হ্যাম,' তৃতীয় একজন জানালে, 'কেউ যদি বলে যে এর চেয়ে ভালো রান্না কস্মিনকালে চেখে দেখেছে, তাহ'লে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে! কার্ল, তোমার ভালো লাগবে আশা করি।'

'চমৎকার !' কার্ল বললে, 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস তাহ'লে চমৎকার জমছে, বলো! অবিশ্যি ঐ মস্কোপন্থী কোনো স্লাভ থাকলেই সব মাটি হ'য়ে যাবে।'

'না,' জিগফ্রিড বললে, 'কোনো মস্কোওলার বুকের পাটা হবে না স্লাভ পোশাক প'রে আসে।'

'এলে তাকে কেটেকুটে সমান মাপে টেনে নামাতে হবে। স্লাভদের ওই যে সর্দারটা আছে না, সব্বাই যার চেলা, ঐ জাঁ—সে যদি বেশি টাল্লিবাল্লি করে তো তাকে আমি একহাত দেখে নেবো। তোমাদের সবাইকে ব'লে রাখছি বাপু, শিগগিরই একদিন ওর সঙ্গে আমার হ'য়ে যাবে। যে-আলেমানদের সে অত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তাদের সামনে একদিন ওকে মাথা নোয়াতেই হবে—আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার আগেই তার ব্যবস্থা করবো!' কার্ল জানালে।

'যেমন গুরু, তেমনি চেলা, ওই গোসপোদিনটাও কিচ্ছু কম যায় না!' জিগফ্রিড বললে।

'ও গোসপোদিন-কসপোদিন ছাড়ান দাও। স্লাভ মানে হ'লো স্লেভ—মানে গোলামের জাত! জর্মানদের সঙ্গে তাদের আবার তুলনা!'

কথাবার্তা শুনে বোঝা গেলো যে ওরা বিশ্ববিদ্যালয় দিনের নৈশভোজের জন্য যতটা উৎসুক হ'য়ে আছে তার চেয়েও বেশি উৎসুক হ'য়ে আছে কতগুলো স্লাভ ছাত্রের সঙ্গে

মারপিট করার জন্য। এই জর্মান ছোকরাদের সর্দার হ'লো কার্ল, ব্যাঙ্কার ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এটাই তার শেষ বছর, তারপর রিগায় ফিরে গিয়ে সে বাপের ব্যাবসায় ঢুকে পড়বে। আর যার উপরে তাদের সবচেয়ে জাতক্রোধ সে হ'লো রিগার অধ্যাপক দিমিত্রি নিকোলেফের ছেলে জাঁ। অনেকদিন থেকেই কার্ল আর জাঁর মধ্যে রেষারেষি চ'লে আসছে, কেউ কাউকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। কার্লদের প্রধান চেলা যেমন জিগফ্রিড, জাঁর শাগরেদও তেমনি এই গোসপোদিন, এস্তোনিয়ার এক সম্পন্ন ঘরের ছেলে। গোসপোদিন এমনিতে খুব হাসিখুশি দিলদরিয়া ছেলে, খেলাধুলোয় গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জুড়ি নেই। জাঁ নিকোলেফ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, চাপা ভাবুক স্বভাব তার, প্রচণ্ড দায়িত্ববোধ রয়েছে, এতটা কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়া এ-বয়সে অনেক সময়ে তেমন মানায় না। গোসপোদিনের সঙ্গে তার গলাগলি ভাব। জর্মানদের হাম্বড়া ভাব ও প্রচণ্ড দেমাকি চালচলনের মধ্যে এরাই স্লাভদের আদর্শ ও সম্মান বজায় রাখতে চায় ব'লেই এদের উপর কার্ল ও জিগফ্রিডের এত রাগ।

জর্মান ছোকরারা যখন জাঁ আর গোসপোদিনকে শায়েস্তা করার বিষয় নিয়ে কথা বলছিলো তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য অংশে স্লাভ ছেলেরাও কার্ল ও জাঁর রেষারেষি নিয়ে কথা বলছিলো। কার্লের এই দেমাক, ধরাকে সরাজ্ঞান করা, এ-সব গোসপোদিনের মোটেই পছন্দ নয়। সেজন্যেই সে জাঁকে তাতাবার চেষ্টা করছিলো । যদি তাকে একবার চেতিয়ে তোলা যায়, তাহ'লে এস্পার-ওস্পার একটা কিছু হ'য়ে যাবে। কিন্তু জাঁ খুব ঠাণ্ডা মাথার ছেলে, সাত চড়েও রা কাড়ে না। তার সম্ভ্রমবোধ খুব টনটনে, কিন্তু অহেতুক ছেলেমানুষি করার পক্ষপাতী সে নয়। এটা সে ঠিক জানে একদিন কার্লের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া হবেই হবে, সেই মুহূর্ত আসন্ন ও অনিবার্য; কিন্তু নিজে থেকে কোনো গণ্ডগোল সে শুরু করতে চায় না। তার একটা কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্কুলের ছেলেদের মতো শাস্তি না-দিয়ে ইচ্ছে করলেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাউকে বিতাড়িত করতে পারেন। জাঁ এমন-কিছু করতে চায় না যেটা তার পড়াশুনোর পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে।

অথচ রিগায় যে ইয়োহাউজেনদের সঙ্গে নিকোলেফদের একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়েও তার সাড়া পড়েছিলো। আগামী নির্বাচনে যে এঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এটা ছাত্ররা জানতো। গোসপোদিন গোড়ায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ছেলেদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দিতে চাচ্ছিলো না, কিন্তু যখন কার্লদের টিটকিরি ও ব্যঙ্গ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন সে জাঁকে উশকে দেবার চেষ্টা করলে।

এমন বিঁধিয়ে-বিঁধিয়ে সে কথা বলতে লাগলো যে শোনবামাত্র জাঁর মুখটা লাল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু অনেক ক'রে সে নিজেকে শামলে রাখলে। নতুন কিছু না-ঘটলে সে পুরোপুরি উদাসীন থাকবে ব'লেই সাব্যস্ত করলে। সে জানে কার্লরা একটা ছল-ছুতো খুঁজছে, যাতে একটুতেই বারুদের স্তূপে আগুন দিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু জাঁর সমর্থকরা তার এই ঔদাসীন্যকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলো না। ওরা এ-রকমভাবে অপমান ক'রে চ'লে যাবে, আর তারা কিছু বলবে না, এটা কি কখনও হয়? কিন্তু জাঁকে তারা এতই মান্য করে যে জাঁর মতের বিরুদ্ধে একটা-কিছু করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না। কিন্তু স্লাভরা যদি তোপ দাগা শুরু না-করে তো আলেমানরা কি এমনিতেই ছেড়ে দেবে? তারা নিশ্চয়ই এই বিশ্ববিদ্যালয়-দিবসে একটা-কিছু ঝামেলা পাকাবে ব'লে

এক পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই কথা ভেবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একফোঁটাও স্বস্তি ছিলো না। গত কিছুকাল ধ'রেই রাজনীতিকে—বিশেষ ক'রে স্লাভ বনাম টিউটনিক বিসংবাদকে—বিশ্ববিদ্যালয়ে চেপে রাখা যাচ্ছে না। বেশির ভাগ ছেলেই পারিবারিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। আর তার ফলে আস্ত বিশ্ববিদ্যালয় যেন একটা বারুদের স্তূপ হয়ে আছে—একটুতেই বিস্ফোরণ ঘ'টে যেতে পারে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর চেয়ে ছাত্রদের উপর জাঁ নিকোলেফের প্রভাব বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের উৎসব থেকে কার্ল ও তার বন্ধুরা জাঁকে সবান্ধবে বাদ দিতে চাচ্ছিলো, —জাঁ যখন কিছুতেই তাদের বোঝাতে পারলে না, তখন নিজের বন্ধুদের উপর সে নিজের প্রভাব খাটালে, তারা কিছুতেই যেন উৎসবের মধ্যে গোল না-বাধায়, গোসপোদিনদের সে এ-বিষয়ে রাজি করালে। ভোজসভায় না-ঢুকলেই হয়, এই ছিলো তার বক্তব্য। জর্মান গানের উত্তরে রুশী গান না-গেয়ে উঠলেই হ'লো। তবে যদি তার পরেও তারা অপমান করে বা টিপ্পনী কাটে, তাহ'লে আলাদা কথা। তারা বরং অন্যখানে গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাদা উৎসবের উদ্যোগ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতি সম্মান দেখাবে। যতক্ষণ-না অন্য মহল থেকে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে, অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিড়ম্বনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখবে তারা।

উপাচার্য ভেবেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের উৎসব স্থগিত রাখতে নির্দেশ দেবেন কিন্তু তাতে যদি উপরের মহল থেকে উলটো চাপ আসে, তাহ'লেই মুশকিল—যে-ঝামেলাটা বাদ দেবার জন্য অত মাথাব্যথা সেটাই তখন নানা সংঘ ও সমিতির উত্তেজিত বাদপ্রতিবাদে তুলকালাম কাণ্ড শুরু ক'রে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয় তো কোনো হাতেখড়ি দেবার স্কুল নয় যে জুজুর ভয় দেখিয়ে ছেলেগুলোকে শামলাতে হবে। কাউকে-কাউকে অবশ্য তাড়িয়ে দেয়া যায়— কিন্তু তেমন কঠোর কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করবার আগে সব-কিছু ভালো ক'রে খাতিয়ে দেখা উচিত।

+

ভোজসভার সময় নির্দিষ্ট হয়েছিলো অপরাহ্ণ চারটে। ইয়োহাউজেন, জিগফ্রিড ও তার বন্ধুরা ততক্ষণ উঠোনেই ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে গুলতানি করতে লাগলো। বেশির ভাগ ছাত্রই এসে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাচ্ছে—যেন নেতার কাছে কিংকর্তব্য তার নির্দেশ চাচ্ছে। এদিকে আবার একটা গুজব ছড়িয়েছিলো যে কর্তৃপক্ষ নাকি উৎসব নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন—তার ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে বেশ সাড়া প'ড়ে গিয়েছিলো ; সবাই এসে জানতে চাচ্ছিলো কী ব্যাপার,-জনরব সত্যি কিনা।

জাঁ নিকোলেফ আর তার বন্ধুরা অবশ্য এ-সব গুজব বা হৈ-চৈ-এ মোটেই কান দিচ্ছিলো না। তারা যথারীতি গল্প করতে-করতে হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো উত্তেজিত দলের মুখোমুখি প'ড়ে যাচ্ছে।

সবাই সবাইকে তাকিয়ে দেখছে, স্পষ্টাস্পষ্টি কোনো কথা হচ্ছে না বটে, কিন্তু চোখের ভঙ্গিতেই অনেকটা বলা হ'য়ে যাচ্ছে। জাঁ বেশ শান্ত হ'য়েই আছে কিন্তু চেষ্টা করছে একটা উদাসীন ভঙ্গি আনবার। কিন্তু গোসপোদিনকে শামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। তার

চোখে যেন আগুন ভরা—নাকি ইস্পাতের ফলার মতোই বুঝি তার চাউনি : কার্লকে বুঝি তার চোখের দৃষ্টিতেই একেবারে গেঁথে ফেলবে। মেজাজটাও এমনি তেরিয়া মতো যে লাগে বুঝি একটা হুলুস্থুল! দু-দলের মধ্যে একটা মস্ত ঝমেলা না-পাকিয়ে সে বুঝি থামবে না!

আর এই বিষম অবস্থার মধ্যেই চারটে বেজে গেলো। কার্ল ইয়োহাউজেন তার শাগরেদদের নিয়ে সদলবলে বড়ো হলঘরটার দিকে এগিয়ে গেলো।

একটু পরেই ফাঁকা হ'য়ে গেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর—কেবল রইলো জাঁ নিকোলেফ, গোসপোদিন আর প্রায় জনাপঞ্চাশ স্লাভ ছাত্র। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে যাবে ব'লেই তারা সেখানে অপেক্ষা করছিলো। কোনো কাজকর্ম ছিল না ; কাজেই তারা তক্ষুনি চ'লে গেলে ভালো করতো। জাঁ নিকোলেফ তাদের এই বিচক্ষণ পরামর্শই দিয়েছিলো —কিন্তু তার প্রস্তাবে কেউ রাজি হলে তো! গোসপোদিন ও তার শাগরেদরা যেন মাটিতে শিকড় গজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—যেন চুম্বকের মতো তাদের টান দিচ্ছে ভোজসভা।

মিনিট কুড়ি কাটলো চুপচাপ। হাঁটাহাঁটি করছে তারা এদিক-ওদিক, মাঝে-মাঝে চত্বরের দিকের জানলাগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেন?...রাগি টিপ্পনী শুনতে, আর উত্তরে চ্যাটাং-চ্যাটাং মন্তব্য ছুঁড়ে মারতে? বোধহয় তা-ই তাদের মৎলব!

অতিথিরা আর ভোজসভা শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করলে না, তক্ষুনি গান জুড়ে দিলে, আর পানপাত্র নিয়ে শুভেচ্ছাজ্ঞাপনও শুরু হ'লো। দু-এক চুমুকেই চট ক'রে মাথায় চড়ে গেলো মদ, তাকিয়ে দেখে বুঝলো যে জানলার বাইরে থেকে জাঁ নিকোলেফরা তাদের সব কথাই শুনতে পাবে, অমনি তারা ব্যক্তিগত আক্রমণের সুরে নেমে এলো।

একবার শেষ চেষ্টা করলে জাঁ। বন্ধুদের বললে, 'চলো, যাই।'

'না।' গোসপোদিন উত্তর দিলে।

'না, কিছুতেই না,' অন্যরাও ঐকতানে যোগ দিলে।

'আমার কথা শুনবে না তোমরা? ঠিক তো?'

'ওই জর্মান ছোকরাগুলো কী বলতে চায়, তা আমরা শুনবোই, জাঁ। পুরো ব্যাপারটা যদি আমাদের পছন্দ না-হয় তো আমরা যা করবো তোমাকে তা-ই করতে হবে।'

'ও-রকম জেদ কোরো না, গোসপোদিন। চ'লে এসো...'

'দাঁড়াও না এক মিনিট,' গোসপোদিন তাকে বললে, 'তারপর তুমিও আর যেতে চাইবে না।'

হলঘরের মধ্যে তখন হৈ-হল্লা-হট্টগোল চরমে পৌঁছেছে, গেলাশের শব্দ হচ্ছে ঝনঝন, আর হঠাৎ তারই মধ্যে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে সবাই গান ধ'রে দিলে—সেই পুরোনো 'গাউডেয়ামুস ইগিটুর' গীত—জর্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যেটা অতিপ্রিয় ও শ্রদ্ধাশীল ঐকতান।

তারপরেই আচমকা সব ছাপিয়ে একটা গলা শোনা গেলো, 'রিগা, সোনার দেশ, তোমাকে এত সুন্দর করলো কে! লিভোনীয়দের দাসত্ব। হয়তো একদিন আমরা তোমার জন্য কেল্লা খরিদ করবার টাকাকড়ি জোগাড় করতে পারবো—আর তপ্ত ইট-পাথরের ওপর বেড়ালনাচ নাচাবো স্লাভদের!'

+

রুশী গানটা প্রথমে গলা ছেড়ে ধরলে গোসপোদিন। তারপরে তার বন্ধুরাও একযোগে তাতে গলা মেলালে।

আচম্বিতে দুম ক'রে খুলে গেলো দরজা, প্রায় শ-খানেক ছাত্র হুড়মুড় বেরিয়ে এলো বাইরে। এসেই তারা স্লাভদের ঘিরে ধরলে। স্লাভ ছেলেদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো জাঁ নিকোলেফ, চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই সে বন্ধুদের আর শামলাতে পারছিলো না। কার্ল ইয়োহাউজেন অবিশ্যি ভিতরেই তখনও ঐকতান গাইছে—সে বাইরে বেরোয়নি । কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়ালো জিগফ্রিড আর গোসপোদিন।

গোলমাল শুনে স্বয়ং রেক্টর তাড়াহুড়ো ক'রে অকুস্থলে এসে উপস্থিত, সঙ্গে কয়েকজন অধ্যাপকও। অবস্থাটা যাতে আয়ত্তের বাইরে চ'লে না-যায়, ছেলেগুলোকে যাতে শামলে—শুমলে বুঝিয়ে নিরস্ত করা যায়, সেটাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু হট্টগোলের মধ্যে রেক্টরের গলা শুনবে কে? এদিকে আলেমান ছাত্রদের সংখ্যা পিলপিল ক'রে বেড়েই যাচ্ছে—হলঘর তাদের উগরে দিচ্ছে অনবরত—এই খ্যাপা ও বদরাগি ছেলেদের তিনি কীইবা বোঝাবেন?

সংখ্যায় অনেক কম, কিন্তু অপমান আর শাসানি সইবে না স্লাভরা। জাঁ নিকোলেফ ও তার সঙ্গীরাও দাঁড়িয়ে আছে অকম্পিত।

জিগফ্রিডের হাতে ছিলো মদের গেলাশ—হঠাৎ সে এসে গোসপোদিনের মুখে মদ ছুঁড়ে মারলে।

প্রথম ঘা, কিন্তু আসলে উটের পিঠে শেষ খড়। লাগে বুঝি একটা তুলকালাম কাণ্ড, কিন্তু সব হঠাৎ শান্ত হ'য়ে গেলো, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কার্ল ইয়োহাউজেন। সবাই স'রে গিয়ে তার পথ ক'রে দিলো—যাতে সে নিকোলেফের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

কার্ল সত্যি-সত্যি কী ভাবছিলো বলা মুশকিল। শান্ত, গম্ভীর মুখে রোষ বা ক্রোধের চিহ্ন নেই, বরং যতই নিকোলেফের দিকে সে এগুচ্ছে ততই তার মুখ ঘৃণায় ভ'রে যাচ্ছে। না, তার বন্ধুরা ভুল ভাবলে না—নিকোলেফকে চূড়ান্ত অপমান করাই তার উদ্দেশ্য।

ঐ হট্টগোলের পরেই হঠাৎ যে-স্তব্ধতা নেমে এলো, সেটাই অনেক বেশি ভয়ংকর ছিলো আসলে। গোসপোদিন এগিয়ে এসে কার্লের পথ আটকাবার চেষ্টা করলে। জাঁ তাকে টেনে ধরলে, বললে, 'না, গোসপোদিন, এটা আমার ব্যাপার।'

'আমাকে তুমি থামাতে পারবে না,' গোসপোদিনের সর্বাঙ্গ রাগে জ্ব'লে যাচ্ছিলো।

ঠাণ্ডা গলায় জাঁ নিকোলেফ বললে, 'পারবো।' তারপর সে গলা চড়িয়ে সবাই যাতে শুনতে পায় এইভাবে বললে, 'তোমরা কয়েক শো, আমরা পঞ্চাশজনও নই। বেশ, তাহ'লেও লড়তে এসো। আমরা তোমাদের ঠেকাবো তো বটেই, কিন্তু হেরেও যাবো। অবশ্য হারটাই হবে আমাদের জিৎ, কারণ তোমরা কাপুরুষের মতো কাজ করবে!'

উঠলো আবার হৈ-হৈ, কিন্তু কার্ল ইঙ্গিত করতেই সবাই থেমে গেলো। কার্ল বললে, 'বেশ, আমরা না-হয় কাপুরুষই হলুম। কিন্তু তোমাদের স্লাভদের মধ্যে কেউ কি আছে যে একা লড়বে। আমার সঙ্গে?'

'আছি,.আমরা সবাই আছি।' একসঙ্গে চ্যাঁচালে স্লাভ ছেলেরা।

কিন্তু জাঁ নিকোলেফ দু-পা এগিয়ে বললে, 'আমি আছি। কার্ল যদি চায় ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপারটার বোঝাপড়া হোক, তো আমিই—'

'তুমি?' কার্লের গলা ঘৃণায় বিকৃত শোনালো।

'হ্যাঁ, আমি।'

'তুমি তুমি আমার সঙ্গে লড়বে?'

'হ্যাঁ। এখন যদি তুমি তৈরি না-থাকো তো, কাল। চাইলে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে।'

'কিন্তু জাঁ নিকোলেফ,' কার্ল উত্তর দিলে, 'তুমি একটা মস্ত ভুল করেছো। আমি তো তোমার সঙ্গে ডুয়েল লড়বো না...'

'লড়বে না? কেন?'

'কারণ তার সঙ্গে কে আর লড়তে যাবে বলো যার বাপ হ'লো একজন কুখ্যাত খুনে ডাকাত !'

৯

হত্যাকারী কে?

পোখকে চিনতো না, এমন লোক রিগায় ছিলো না। দিলদরিয়া, হাসিখুশি, শাদাশিধে মানুষ কাঁধে ঝোলা আর হাতে ব্রীফ-কেস নিয়ে সে হন্তদন্ত ছুটছে, আর মুখে সারাক্ষণ খই ফুটছে —এই দৃশ্য দেখতেই লোকে খুব অভ্যস্ত ছিলো। হঠাৎ তার খুন হওয়ার খবরটা তাই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো শহরে—সব্বাই খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো।

উত্তেজনা ছড়িয়েছিলো এমনকী পুলিশের মধ্যেও। পুলিশের বড়োকর্তা কর্নেল রাগুয়েনোফ সুদ্ধু এই খুনের খবরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন। বিভাগের সবচেয়ে ধুরন্ধর গোয়েন্দাদের লাগিয়ে দিয়ে যত চটপট পারা যায় রহস্য ভেদ করবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছিলেন।

১৬ তারিখ সকালবেলায় এই নিয়েই মেজর ফেরডেরের সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিলো। প্রাথমিক তদন্তের বিস্তৃত প্রতিবেদন দিয়ে মেজর ফেরডের ওপরওলার নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। পুরো ব্যাপারটা শুনে কর্নেল বললেন, 'হুম, তোমার তাহ'লে ধারণা অন্য যাত্রীটিই খুন করেছে?'

'সব দেখেশুনে তা-ই তো মনে হয়'।

'আর সেই সরাইওলা? ক্রোফ-এর হাবভাবে কিছু সন্দেহজনক দ্যাখোনি?

'সেও যে খুন করতে পারে, এই সম্ভাবনাটাও আমি একেবারে উড়িয়ে দিইনি—যদিও তার সম্বন্ধে আমরা কখনো কোনো অভিযোগ শুনিনি। কিন্তু সেই রহস্যময় যাত্রীটি যে-ঘরে রাত কাটিয়েছিলো সে-ঘরের জানলায় ও-সব দাগটাগগুলো দেখে মনে হয় ক্রোফ-এর এ-

ব্যাপারে কোনো হাত নেই। খড়খড়ি আর ছিটকিনি খোলবার জন্য যে-হাতুড়িটা ব্যবহার করা হয়েছিলো সেটাও যখন ও-ঘরে পাওয়া গেলো...'

'হুম। তবু ক্রোফ-এর উপর নজর রেখো।'

'নিশ্চয়ই রাখবো। দুজনকে সরাইখানায় পাহারায় রেখে এসেছি। তাছাড়া ক্রোফকেও বলেছি সে যেন কোথাও না-যায়—তাকে পরে আরো দরকার হ'তে পারে।'

'তাহ'লে এটা বাইরের কোনো লোকের কাজ ব'লে তোমার মনে হয় না? সে-রাতে ঐ সরাইখানায় যারা ছিলো, তাদেরই কেউ হত্যাকারী ব'লে তোমার ধারণা?'

'ততটা নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যায় না। তবে পোখ-এর সঙ্গে অন্য যে-যাত্রীটি ছিলো তার বিরুদ্ধে এত প্রমাণ যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন অন্য-কিছু সন্দেহ করাও খুব কঠিন।'

'তুমি দেখছি মোটামুটি মনঃস্থির ক'রে ফেলেছো?'

'জজ কেরস্টোফ, ডাক্তার হামিনে আর হের ইয়োহাউজেনেরও তা-ই ধারণা। লোকটি যে-রকমভাবে নিজের পরিচয় গোপন রাখবার চেষ্টা করছিলো, যে-রকম রহস্যময় তার ধরনধারণ, তাতে তাকে সন্দেহ না-করে উপায় কী?'

'সরাই ছেড়ে যাবার সময় সে কোথায় যাচ্ছে, তা বলেনি?'

'না।

'রিগা থেকে যখন কোচবক্সে উঠলো, তখন তার গন্তব্য পেরনাউ ব'লেই তো মনে হয়।'

'তা হয়। কিন্তু সে শুধু রেফেল অব্দি টিকিট কেটেছিলো।'

'দু-তিনদিনের মধ্যে পেরনাউতে কোনো অচেনা লোক দেখা যায়নি? তুমি খোঁজ নিয়েছিলে?'

'নিয়েছিলুম। পুলিশও অবশ্য এখনও খোঁজ করছে, কিন্তু এ-যাবৎ লোকটার কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি।...কোথায় যে সে গেলো! পেরনাউ গিয়েছিলো কি শেষ অব্দি? নাকি অত টাকা নিয়ে বলটিক প্রদেশ ছেড়েই কেটে পড়েছে?'

'তা সম্ভব। বিশেষ ক'রে কাছেই যখন এত বন্দর আছে, তখন তার পক্ষে এ-তল্লাট ছেড়ে চ'লে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়।'

'হুঁ, সে-সুযোগ যে আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' বললেন মেজর ফেরডের, 'কিন্তু, ফিনল্যাণ্ড উপসাগর বা বলটিকের তীরের সমুদ্রে এখন জাহাজই চলছে না। আমি খবর পেয়েছি যে ঠাণ্ডায় সব এমনি জ'মে আছে যে সম্প্রতি কোনো জাহাজই বন্দর থেকে ছাড়তে পারেনি। কাজেই লোকটা যদি সাগরপাড়ি দিতেই চায়, তাহলে তাকে আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করতেই হবে—তা কোনো বন্দরেই হোক বা পেরনাউতেই হোক। এমনকী রেফেলেও হ'তে পারে।'

'রিগা হ'লেই বা বিচিত্র কী?' কর্নেল রাগুয়েনোফ যোগ করলেন, 'এখানে ফিরে আসতেই বা তার বাধা কী? হয়তো তা-ই সে করেছে—পুলিশ যাতে পাছু ছেড়ে দেয়, যাতে সে অনেকটা স্বস্তি পেতে পারে, সেদিক থেকে রিগার চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর কী আছে?' 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই। সব বিষয়েই আমাদের

নিশ্চিত হ'য়ে নিতে হবে। আমি তো জানিয়ে দিয়েছি, বন্দর ছেড়ে যাবার আগে সব জাহাজই যেন ভালো ক'রে তল্লাশ ক'রে নেয়া হয়। সপ্তাহ শেষ হবার আগে বরফ গলবে ব'লে মনে হয় না—সারা শহর ও বন্দরে ততক্ষণ যেন কড়া নজর রাখা হয়, আমি জানিয়ে দিয়েছি।'

মেজর ফেরডেরের সব ব্যবস্থাই মোটামুটি মনঃপূত হ'লো কর্নেলের। হত্যাকারী কে, সে-সম্বন্ধে তাঁর নিজেরও আসলে কোনো সংশয় ছিলো না। সেই রহস্যময় ও অজ্ঞাত পরিচয় যাত্রীটিই যে হত্যাকারী, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু কে সে? কী তার পরিচয়? কেউ তার মুখ দ্যাখেনি—না সরাইওলা ক্রোফ, না বাসের কণ্ডাকটার ব্রোক্স—কেউ তাকে স্পষ্ট ক'রে দ্যাখেনি একবারও। এমনকী লোকটার বয়েস কত, সে কি যুবক না প্রৌঢ়, তাও জানা নেই। এ-ক্ষেত্রে গোয়েন্দাদের তিনি কীই-বা নির্দেশ দেবেন? কোন্‌খানেই বা সন্ধান নিতে বলবেন? কেবল যদি দৈব কখনো সদয় হয়, তাহ'লেই হয়তো এই জটিল রহস্যের জট ছাড়ানো সম্ভব হবে। যতক্ষণ তা না-হয়, ততক্ষণ অন্ধকার।

+

সেইদিনই সকালবেলা মামলাটার ডাক্তারি প্রতিবেদন নিয়ে ডাক্তার হামিনে নিজে গিয়েছিলেন বিচারপতি কেরস্টোফের আপিসে।

'কী? নতুন কোনো সূত্র পাওয়া গেলো?' হের কেরস্টোফকে তিনি জিগেশ করলেন।

'উঁহু।'

কেরস্টোফের আপিশ থেকে বেরোতেই পথে হঠাৎ ফরাশি রাষ্ট্রদূত মঁসিয় দ্যলাপোর্তের সঙ্গে ডাক্তার হামিনের দেখা হ'য়ে গেলো। এই জটিল ও রহস্যময় মামলাটা নিয়েই কথা হ'লো দুজনে।

দ্যলাপোর্ত বললেন, 'সেই রহস্যময় যাত্রীটিই যদি হত্যাকারী হ'য়ে থাকে তাহ'লে আপনারা যে কী ক'রে তাকে খুঁজে পাবেন, আমি তা ভেবেই পাচ্ছি না...'

'হ্যাঁ, ভালো কথা, নিকোলেফের কোনো খবর জানেন?'

'দিমিত্রির খবর? না তো। উনি তো এখানে নেই...'

'আশ্চর্য, না? তিনদিন হ'লো দিমিত্রি গেছেন, অথচ এ-পর্যন্ত এমনকী তাঁর মেয়েকেও কোনো খবর পাঠাননি।'

'চলুন না,' ডাক্তার বললেন, 'একবার ওঁদের বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি। হয়তো আজকেই ইল্‌কা কোনো চিঠি পেয়ে থাকবে —কিংবা নিকোলেফই হয়তো ফিরে এসেছেন।'

অধ্যাপক নিকোলেফের বাড়িতে গিয়ে কিন্তু তাঁর কোনো খবরই পাওয়া গেলো না। তিনি ফেরেনওনি, কোনো চিঠিও আসেনি; কোথায় গেছেন, তা অব্দি কেউ জানে না; কেন গেছেন, তাও নয়। ইল্‌কা বেচারিকে বড্ড উদ্বিগ্ন দেখালো। লিভোনিয়ার পথ-ঘাট আজকাল মোটেই নিরাপদ নয়। কোনো বিপদ-আপদ হয়নি তো পথে! তাছাড়া যাবার আগে তাঁকে বড্ড অস্বাভাবিক, বড্ড চঞ্চল, বড্ড উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো। এমনকী তিনি যে যাচ্ছেন তাও তিনি ইল্‌কাকে বলেননি, কেবল একটা চিরকুট লিখে রেখে গেছেন।

ইল্‌কা বেচারির দুর্ভাবনা দেখে শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাকে উলটে সান্ত্বনা ও আশা দিয়ে

বেরিয়ে এলেন। 'মিথ্যে ভাবনা কোরো না, ইল্‌কা। নিশ্চয়ই আজকালের মধ্যেই তোমার বাবা ফিরে আসবেন।' এ-কথা ডাক্তার হামিনে মুখে বললেন বটে, কিন্তু কেন যেন তাঁরও মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো বিঁধছিলো।

+

ঐ একই সময়ে মেজর ফেরডেরের পড়ার ঘরে কিন্তু আরেকটা নতুন খবর এসে পৌঁছেছে। য়েক-এর নেতৃত্বে যে-বাহিনীটি বেরিয়েছিলো, সকালবেলাতেই তারা রিগায় এসে হাজির হয়েছে। ফিরে এসেই সারজেন্ট য়েক বড়োকর্তার কছে তার তদন্তের প্রতিবেদন পাঠিয়ে দিয়ে নিজের আপিশে এসে বসেছিলো। সেইখানেই সে খুনের খবরটা প্রথম জানতে পেলো। এই হত্যারহস্যের চাবিটা যে তারই হাতে ছিলো, এটা আর কারু পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব ছিলো, এমনকী য়েক নিজেও বুঝতে পারেনি তার সাক্ষ্য কতটা জরুরি হবে।

মেজর ফেরডের যখন জানতে পেলেন যে ঐ খুনের মামলা সম্বন্ধে সারজেন্ট য়েক-এর কিছু বক্তব্য আছে, তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইলো না।

'পোখকে কে খুন করেছে, তা তুমি জানো? সত্যি?'

'নিজের চোখে লোকটাকে দেখেছি।...পোখকে আমি আগে থেকেই চিনতুম—রিগায় তাকে কে না চেনে? তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে তেরো তারিখ রাত্তিরে।'

'কোথায়?'

'ক্রোফ-এর সরাইখানায়।'

'তুমি তখন ঐ সরাইতে ছিলে?'

'হ্যাঁ। পেরনাউ ফিরে যাবার আগে এক সহকারীকে নিয়ে খানিকক্ষণের জন্য আমি ঐ সরাইখানায় গিয়েছিলুম।

'বেচারা পোখ-এর সঙ্গে তখন তোমার কথা হয়েছিলো?'

'একটু। পোখ-এর সঙ্গে অন্য যে যাত্রীটি ছিলো, আপনারা যার হদিশ চাচ্ছেন, যাকে হত্যাকারী ব'লে সন্দেহ হচ্ছে, তাকেও কিন্তু আমি চিনি।'

'তুমি তাকে চেনো?'

'হ্যাঁ। আর এই যাত্রীটি যদি সত্যি খুন ক'রে থাকে...'

'তদন্ত ক'রে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে আমাদের কোনো সন্দেহই নেই যে ঐ লোকটাই খুনে।'

'এক্ষুনি তাঁর নাম আপনাকে ব'লে দিতে পারি—কিন্তু আপনি কি তা বিশ্বাস করবেন?'

'তুমি বললে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবো।'

'আমি অবশ্য তাকে স্বচক্ষে দেখেছি।' য়েক তাঁকে আশ্বস্ত করলে, 'তার সঙ্গে আমার কোনো কথাই হয়নি, তাছাড়া সে তার টুপির ডগা ভুরুর উপর নামিয়ে দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছিলো—কিন্তু চকিতের মধ্যে তাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলুম।'

'কে সে?'

'অধ্যাপক দিমিত্রি নিকোলেফ।'

'দিমিত্রি নিকোলেফ!' মেজর ফেরডের একেবারে স্তম্ভিত। 'অসম্ভব—তা হ'তেই পারে না।'

'আমি তো বলেইছিলুম যে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে লাগলেন মেজর, বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলেন, 'দিমিত্রি নিকোলেফ!'

আগামী পৌরনির্বাচনে প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন দিমিত্রি, লোকে তাঁকে নির্বাচন করবেই, প্রবল ইয়োহাউজেন পরিবারের তিনি বিরুদ্ধ পক্ষ—জর্মান প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্লাভ জাগরণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার তিনি মূর্ত প্রতীক—আর তিনি, সেই তিনি, কিনা অসহায়, নিরীহ, গোবেচারা পোখ-এর হত্যাকারী!

য়েক-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মেজর, তার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি শপথ ক'রে বলছো?'

'হ্যাঁ, অন্তত সে-রাত্তিরে তিনি রিগা ছিলেন না।...কিন্তু একটু খোঁজ-খবর করলেই তো সে-সম্বন্ধে জেনে নেয়া যাবে।'

'এক্ষুনি তাঁর বাড়িতে লোক পাঠাচ্ছি,' মেজর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, 'হের ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনকে আমার আপিশে আসতে খবর দিচ্ছি, তুমি এখানেই থেকো।'

'নিশ্চয়।'

মেজর তক্ষুনি দুজন পুলিশকে ডেকে নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। দশ মিনিট যেতে-না-যেতেই ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন এসে হাজির। সারজেণ্ট য়েক এবার তাঁর সামনেই সব কথা খুলে বললে।

আবারও সারজেণ্টকে জিগেশ করেন মেজর, 'এ-কথা তুমি শপথ ক'রে বলতে পারো?'

'নিশ্চয়ই,' সারজেণ্ট য়েক-এর গলায় কোনো দ্বিধা নেই।

'কিন্তু উনি সম্ভবত রিগা ছেড়ে যাননি,' ইয়োহাউজেন আপত্তি তুললেন।

'নিশ্চয়ই গেছেন,' য়েক বললে, 'অন্তত চোদ্দ তারিখ রাত্তিরে উনি বাড়ি ছিলেন না, কারণ আমি ওঁকে ক্রোফ-এর সরাইতে দেখেছি—নিজের চোখে দেখেছি...ওঁকে চিনতে আমার ভুল হবার কথা নয়...'

মেজর ফেরডের বললেন, 'একটু বসুন, হের ইয়োহাউজেন। আমি ওঁর বাড়িতে লোক পাঠিয়েছি। মিনিট কয়েকের মধ্যেই সে খবর নিয়ে আসবে।'

জানলার ধারে ব'সে আছেন ইয়োহাউজেন, চুপচাপ ও গম্ভীর, তাঁর মনের মধ্যে আবেগের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। সারজেণ্টের কথাই সত্যি হোক, প্রমাণ হোক যে য়েক কোনো ভুল করেনি, এই ইচ্ছা তাঁর একেবারে বুকের ভিতরে তীব্রভাবে হুলুস্থুল বাঁধাচ্ছে, কিন্তু তবু কেন যেন তাঁর অন্তরাত্মা বলছিলো এ-কথা সত্যি নয়, দিমিত্রি নিকোলেফ তাঁর পরম শত্রু হ'তে পারেন, কিন্তু হত্যাকারী তিনি নন—খুনে নন, জল্লাদ নন—তাঁর সততা ও মর্যাদা তর্কাতীত।

ইয়োহাউজেনের সংবিৎ ফিরলো সংবাদদাতার কণ্ঠস্বরে : 'তেরো তারিখ ভোরবেলা দিমিত্রি নিকেলেফ রিগা ছেড়ে চ'লে গেছেন, কোথায় গেছেন কেউ জানে না—এখনও তিনি ফিরে আসেননি।'

সারজেণ্ট য়েক-এর বিবৃতিই তবে সত্যি!

ইয়োহাউজেন যখন পুলিশ দপ্তর থেকে বেরুলেন তখন তিনি যুগপৎ অভিভূত ও উল্লসিত।

বারুদের স্তূপের মধ্যে আগুনের ফুলকির মতো এই ভীষণ খবর দেখতে-না-দেখতে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়লো।

তাহ'লে দিমিত্রি নিকোলেফই পোখ-এর হত্যাকারী!

+

ইল্‌কা নিকোলেফের কাছে এ-খবর ভাগ্যিশ পৌঁছোয়নি! ডাক্তার হামিনেই ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন যাতে কোনো গুজব বা জনরব ও-বাড়ি না-পৌঁছোয়। কিন্তু সন্ধেবেলায় তাঁর বসার ঘরে যখন অভিভূত ও বিমূঢ় মঁসিয় দ্যালাপোর্তের আগমন হ'লো, তখন তাঁরা পরস্পরের দিকে মুখ তুলেই তাকাতে পারছিলেন না। অ্যাঁ, দিমিত্রি নিকোলেফ নরহন্তা!...অসম্ভব!

কিন্তু ততক্ষণে বেতারে সবখানে খবর পৌঁছে গিয়েছে। সারা তল্লাটের পুলিশবাহিনীকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে ততক্ষণে। দিমিত্রি নিকোলেফকে দেখবামাত্র যেন গ্রেপ্তার করা হয়।

ষোলো তারিখ বিকেলে এই খবরই গিয়ে পৌঁছেছিলো ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ে। খবরটা প্রথম জেনেছিলো কার্ল ইয়োহাউজেন—কাজেই প্রকাশ্যে, জাঁ নিকালেফের সব বন্ধুবান্ধবের সামনে, ঐভাবে চরম আঘাত হানবার সুযোগ সে কিছুতেই হারায়নি।

১০

জেরা

দিমিত্রি নিকোলেফ রিগা ফিরে এলেন ১৬ই এপ্রিল রাতে—ফেরবার সময়ও কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি।

অস্বস্তিতে ভুগছিলো ব'লে ইল্‌কা তখনও ঘুমোয়নি—ঘুমুতে পারেনি। তাও তো বেচারি জানে না কী ভয়ংকর অভিযোগ খড়্গের মতো তার বাবার মাথার উপর ঝুলছে! কিন্তু তা না-জানলেও তার দুর্ভাবনার কোনো ইয়ত্তা নেই। সন্ধেবেলা মঁসিয় দ্যালাপোর্ৎ আর ডাক্তার হামিনে যখন খোঁজখবর নিয়ে চ'লে গেলেন, তখনই ডোরপাট থেকে এক তারবার্তা এসে হাজির; কোনো কারণ উল্লেখ না-ক'রেই তাতে এই বার্তা ছিলো যে জাঁ নিকোলেফ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছুঁড়ে রিগা চ'লে আসছে—কালকেই।

সকালবেলায় ইল্‌কার মনের ভাব অবিশ্যি অনেকটাই ক'মে গেলো যখন সে সিঁড়িতে বাবার পায়ের শব্দ পেলে। রাত্তিরে যে কখন বাবা এসে পৌঁছেছেন, তা সে জানতেও পারেনি।

মেয়েকে দেখেই নিকোলেফ বললেন, 'এত দেরি হবে তা আগে বুঝতে পারিনি...যাক ফিরে তো এলুম অবশেষে...'

'তোমাকে ভারি ক্লান্ত দেখাচ্ছে, বাবা।'

'তা একটু ক্লান্ত লাগছে সত্যি। এ-বেলা জিরিয়ে নিলেই হবে। বিকেলে আবার জরুরি ক্লাস আছে—নিতে হবে।'

‘কাল ক্লাস নিলে হয় না? তোমার ছাত্রদের তো আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো।’

‘না, ইল্‌কা, না। খামকা ওদের ক্লাস না-নেবার কোনো মানে হয় না। আমার তো আর অসুখবিসুখ কিছু করেনি।...কেউ এসেছিলো এর মধ্যে খোঁজ নিতে?’

‘না, শুধু মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ আর ডাক্তার হামিনে এসেছিলেন। তোমাকে না-দেখে তাঁরা ভারি অবাক হলেন।’

নিকোলেফ একটু ইতস্তত ক’রে বললেন, ‘কেবল তো দু-এক-দিনের মামলা...সেই জন্যেই ওঁদের কিছু বলিনি।’

‘তুমি কি ডোরপাট গিয়েছিলে, বাবা?’ হঠাৎ কালকের তারবার্তাটির কথা মনে প’ড়ে গেলো ইল্‌কার।

‘ডোরপাট?’ নিকোলেফ অবাক হলেন, ‘কোন ? হঠাৎ ডোরপাটের কথা কেন?’

‘কাল জাঁ এক তার পাঠিয়েছে—আজকে নাকি রিগা এসে পৌঁছুবে। বাস্, এছাড়া তাতে আর কোনো খবর নেই।’

‘জাঁ আসছে? সত্যি, ভারি আশ্চর্য তো! হঠাৎ ফিরে আসছে কেন? কী জানি, হঠাৎ কোনো জরুরি কাজ পড়েছে হয়তো।’

নিকোলেফ বুঝতে পারছিলেন তাঁর কন্যা তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান নিয়ে খুবই কৌতূহলী হ’য়ে আছে। কিন্তু সে-সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চবাচ্যই তিনি করলেন না। চায়ের টেবিলে ব’সে অন্যান্য বিষয়ে হালকা কথাবার্তা হ’লো। তারপর তিনি পড়ার ঘরে চ’লে গিয়ে ক্লাসের জন্য তৈরি হ’তে লাগলেন।

আবার যথারীতি শান্ত ও নিশ্চিন্ত ভাবে গৃহকর্ম চলতে লাগলো। কিন্তু এই শান্তি যে ঝড়ের আগেকার স্থিরভীষণ থমথমে ভাব, সেটা ইল্‌কা স্বপ্নেও ভাবতে পারলে না।

ঝড় উঠলো সোয়া-বারোটায়।

কোতোয়ালি থেকে এলো এক পুলিশের লোক, ভৃত্যের হাতে একটি চিঠি তুলে গিয়ে বললো এটা এক্ষুনি কর্তার কাছে পৌঁছে দিতে। নিকোলেফ বাড়ি আছেন কি না তা পর্যন্ত সে জিগেশ করলে না। এমনিতে বাইরে থেকে দেখে বোঝবার জো না-থাকলেও আসলে রাত থেকেই এ-বাড়ির উপর কড়া পুলিশ পাহারা বসেছিলো। চিঠির বয়ানটা সংক্ষিপ্ত ; কোনো ধানাই-পানাই না-ক’রে সোজাসুজি তাতে লেখা ছিলো :

‘অধ্যাপক দিমিত্রি নিকোলেফের কাছে বিচারপতি কেরস্টোফের অনুরোধ, অধ্যাপক নিকোলেফ যেন পত্রপাঠ কেরস্টোফের আপিশে এসে দেখা করেন। বিষয়টা খুবই জরুরি।’

নিকোলেফ চিঠি পেয়ে সত্যি খুব অবাক হলেন। কেমন যেন পাংশু হ’য়ে গেলো তাঁর মুখ, কেমন-একটা অস্থির দুর্ভাবনার ছাপ ফুটে উঠলো চোখেমুখে। একবার ভেবেছিলেন এই পরোয়ানা বা এত্তেলাকে মোটেই পাত্তা দেবেন না ; কিন্তু শেষটায় কী ভেবে তলব অনুযায়ী কাজ করলেন তিনি, টপকোট গায়ে চাপিয়ে নিচে নেমে এলেন। বললেন, ‘ইল্‌কা, এক্ষুনি একবার জজ কেরস্টোফের আপিশে যেতে হবে। তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন।’

‘জজ কেরস্টোফ? কেন? হঠাৎ আবার তোমাকে তাঁর কী দরকার?’

'জানি না,' দিমিত্রি নিকোলেফের মুখ কেমন বিবর্ণ দেখালো।

'এর সঙ্গে জাঁ-র কোনো সম্বন্ধ নেই তো? ওকে হঠাৎ ডোরপাট ছাড়তে হ'লো কেন, বুঝতে পারছি না।'

'জানি না...কিছু তো বুঝতে পারছি না...হ'তেও পারে, ওর সঙ্গে জাঁ কোনোভাবে জড়িত। যাই হোক, কী ব্যাপার এক্ষুনি জানতে পারবো।'

আদালতে পৌঁছনোমাত্র তাঁকে জজ কেরস্টোফের আপিশে নিয়ে যাওয়া হ'লো। কেরস্টোফের সঙ্গে ঘরে ব'সে ছিলেন মেজর ফেরডের আর কেরস্টোফের কেরানি। প্রথমে নমস্কার বিনিময় করলেন তাঁরা, তারপর ঘরে কী-রকম একটা বিশ্রী অস্বস্তিকর স্তব্ধতা নেমে এলো। নিকোলেফ চাচ্ছিলেন, কেন তাঁকে হঠাৎ ডেকে পাঠানো হ'লো, তা খুলে বলা হোক।

'মঁসিয় নিকোলেফ,' কেরস্টোফ শুরু করলেন, 'একটা তদন্তের ব্যাপারে আপনাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। আপনার কাছ থেকে কতগুলো খবর জানতে চাই।'

'কী ব্যাপার বলুন তো?' নিকোলেফ জিগেশ করেন।

'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন বসুন।'

নিকোলেফ একটা চেয়ার টেনে ব'সে পড়লেন—ঠিক কেরস্টোফের মুখোমুখি। মেজর ফেরডের জানলার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন। জেরা শুরু হ'লো।

'দিমিত্রি নিকোলেফ,' কেরস্টোফ আগেই সাবধান ক'রে দিলেন, 'প্রশ্ন শুনে চমকে যাবেন না। হয়তো এ-সব প্রশ্ন আপনার কাছে একান্ত ব্যক্তিগত ঠেকবে, কিন্তু ন্যায়বিচারের খাতিরে, এবং আপনার নিজের খাতিরেও, আশা করবো আপনি সব প্রশ্নের খোলাখুলি উত্তর দেবেন...কোনো কথা চেপে যাবেন না।'

নিকোলেফ একদৃষ্টে জজ কেরস্টোফের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সব কথা তাঁর কানে গেছে কি না, বোঝা গেলো না। হাত দুটো ভাঁজ করা, মুখে কোনো কথা নেই, চুপচাপ তিনি শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

কেরস্টোফের সামনে টেবিলের উপর খুনের মামলার সব নথিপত্র। গম্ভীর-গলায় তিনি জিগেশ করলেন, 'আপনি কয়েকদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কবে রিগা ছেড়েছিলেন?'

'তেরো তারিখ ভোরবেলায়।'

'ফিরলেন কবে?'

'কাল রাত্তিরে—একটা নাগাদ।'

'একা গিয়েছিলেন? না কি সঙ্গে আর-কেউ ছিলো?'

'একাই গিয়েছিলুম।'

'রেফেলে যাবার ডাকের গাড়িতে উঠেছিলেন বুঝি?'

একটু ইতস্তত ক'রে নিকোলেফ বললেন, 'হ্যাঁ।'

'ফিরলেন কীসে?'

'তেলেগুতে।'

'কোত্থেকে নিয়েছিলেন তেলেগু?'

'এখান থেকে পঞ্চাশ ভেরস্ট দূরে হবে—রিগার রাস্তায়।'

'তাহলে, ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে আপনি তেরো তারিখ সকালে রিগা থেকে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, সকাল ছটায়।'

'কোচবাক্সে কি একাই যাত্রী ছিলেন আপনি?'

'না...আরেকজন যাত্রী ছিলেন।'

'তাঁকে আপনি চেনেন?'

'না, আগে তাঁর কথা কখনও শুনিনি।'

'কিন্তু এটা নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে দেরি হয়নি যে যাত্রীটির নাম পোখ—ইয়োহাউজেনদের ব্যাঙ্কের তিনি হরকরা?'

'তা দেরি হয়নি। ভদ্রলোক অবিশ্রাম কথা বলছিলেন কণ্ডাকটারের সঙ্গে।'

'ব্যক্তিগত বিষয়েও কথা বলছিলেন?'

'ব্যক্তিগত বিষয়েই বলাবলি করছিলেন।'

'কী বলছিলেন তিনি?'

'যে তিনি ইয়োহাউজেনদের কী-একটা কাজে রেফেল যাচ্ছেন।'

'রিগায় ফেরবার জন্য অধীর তো হননি ভদ্রলোক?...মানে তাঁর তো বিয়ের কথা ছিলো।'

'হ্যাঁ।...আসলে আমি ওসব কথাবার্তায় বিশেষ মনোযোগ দিইনি—টুকরো-টুকরোভাবে কথাগুলো আমার কানে আসছিলো। আমার তো আর ওঁর সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল ছিলো না।'

এবার মেজর ফেরডের মাঝখানে একটা টিপ্পনী কাটলেন : 'সত্যি ছিলো না?'

একটু আবাক হ'য়ে ফেরডেরের দিকে তাকালেন নিকোলেফ। 'মোটেই না। ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমার কৌতূহল থাকবে কেন?'

'হয়তো এই তদন্ত মারফৎ আমরা তা-ই জানবার চেষ্টা করছি,' বললেন কেরস্টোফ।

নিকোলেফকে সত্যি ভারি বিমূঢ় ও অসহায় দেখালো।

কেরস্টোফ বললেন, 'পোখ-এর কাছে একটা ব্রীফ-কেস ছিলো না? ব্যাঙ্কের লোকেরা যাতে টাকাকড়ি রাখে, সে-রকম একটা ব্রীফ-কেস?'

'হ'তে পারে, তবে আমি ভালো ক'রে খেয়াল করিনি। আমি এক কোনায় ওভারকোট মুড়ি দিয়ে ব'সে ছিলুম—মাঝে-মাঝে টুপিটা মুখের উপর নামিয়ে দিয়ে ঘুমিয়েও পড়ছিলুম। কাজেই কে কী করছে না-করছে, বা কার সঙ্গে কী আছে না-আছে, সে-সব মোটেই লক্ষ করিনি।'

'হ্যাঁ, ব্রোক্সও তা-ই বলেছে।' ফেরডের বললেন।

'আপনি পোখ-এর সঙ্গে কোনো কথা বলেননি?' কেরস্টোফ জিগেশ করলেন।

'গাড়ি চলবার সময় আমাদের কোনো কথা হয়নি।...দুর্ঘটনার পরে সরাইখানায় যাবার সময় তাঁর সঙ্গে আমি প্রথম কথা বলি—তাও সরাইয়ের যাবার জন্যই।'

'তাহ'লে সাবধানে টুপির ডগায় মুখ ঢেকে সারাদিন আপনি কোচবাক্সের কোনায় বসেছিলেন?'

'সাবধানে!—এ-কথার মানে?' নিকোলেফ কথাটার মর্মার্থ পুরোটা ধরতে না-পারলেও রূঢ় ইঙ্গিতটি তাঁর অগোচর ছিলো না।

'অর্থাৎ বর্ণনা থেকে মনে হয় কেউ আপনাকে চিনে ফেলুক, এ-ইচ্ছে আপনার ছিলো না।' আবারও এই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যটি করলেন মেজর ফেরডের।

নিকোলেফ এবার এ-ইঙ্গিতটি অগ্রাহ্য করলেন না। শুধু বললেন, 'যদি ধ'রেও নিই যে কেউ আমাকে চিনে ফেলুক এ-ইচ্ছে আমার ছিলো না, তাতে কি কিছু বেআইনি কাজ করা হলো! আমার ধারণা ছিলো পৃথিবীর সবখানেই—এমনকী লিভোনিয়াতেও—এই অধিকার লোকের আছে।'

'হ্যাঁ, কোনো সাক্ষীশাবুদ না-রাখার জন্য এটা যে একটা চমৎকার অধিকার তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' রূঢ়ভাবে বললেন মেজর ফেরডের।

এই বিশ্রী মন্তব্যটি শোনবামাত্র নিকোলেফ কেমন বিবর্ণ হ'য়ে গেলেন। কী-একটা বলতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন।

কেরস্টোফ বললেন, 'পোখ যে সেদিন আপনার সহযাত্রী ছিলো, এ-কথা আপনি তাহ'লে অস্বীকার করছেন না।'

'না, সেদিন পোখ আমার সঙ্গে কোচবাক্সে ছিলেন।'

কেরস্টোফ জেরা চালিয়েই গেলেন : 'কোচবাক্সটি সেদিন গোড়ার দিকে ভালোই যাচ্ছিলো...কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ঘটেনি...দুপুরবেলায় কেবল মধ্যাহ্নভোজের জন্য আধঘণ্টা থেমেছিলো ডাকগাড়ি...তখনও আপনি চাননি যে কেউ আপনাকে চিনে ফেলুক। তারপর আবার ডাকগাড়ি রওনা হ'লো, আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হ'তে লাগলো, ঝড়ের মধ্যে এগুনোই কঠিন ঠেকতে লাগলো...সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ দুর্ঘটনাটা ঘটলো...একটা ঘোড়া প'ড়ে গেলো, গাড়ি গেলো উলটে, ভেঙে গেলো তার...'

নিকোলেফ বাধা দিয়ে বললেন, 'কেন আপনি এ-সম্বন্ধে আমাকে জেরা করছেন, তা কি আমি জানতে পারি?'

'ন্যায়বিচারের জন্য, মঁসিয় নিকোলেফ। ...ব্রোক্স যখন বুঝতে পারলে যে এই ভাঙা গাড়ি নিয়ে পেরনাউ অবধি পৌঁছোনো যাবে না, তখন রাতটা একটা সরাইতে কাটানোই ভালো ব'লে সাব্যস্ত হ'লো। দুশো গজ দূরের সরাইটার দিকে প্রথম আপনিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।'

'সেদিন সন্ধেবেলায় সরাইটায় প্রথম আমি পদার্পণ করি। তার কথা আগে জানতুমই না।'

'একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ব্রোক্স ও সহিসের সঙ্গে পেরনাউ না-গিয়ে সরাইটাতেই রাত কাটানো ঠিক করেছিলেন আপনি।'

'ও-রকম দুর্যোগের মধ্যে পথে কষ্ট পাবার চেয়ে সরাইটাতেই রাত কাটানো ভালো ব'লে মনে হয়েছিলো আমার।'

'আপনিই পোখকে ঐ সরাইতে রাত কাটাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন?'

'আমি তাঁকে কোনো পরামর্শই দিইনি। দুর্ঘটনার ফলে তিনি জখম হয়েছিলেন—পায়ে চোট লেগেছিলো—ও-অবস্থায় ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে তাঁর পেরনাউ যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে

না। ভাগ্যিশ সরাইটা কাছে ছিলো...'

'ভাগ্যিশ!' মেজর ফেরডের নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না।

দিমিত্রি নিকোলেফ কেবল কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাঁর তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন।

কেরস্টোফ কিন্তু পুরো জেরাটা আগেই ছ'কে রেখেছিলেন। তিনি ছকটা নষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না। তাই তক্ষুনি তিনি জিগেশ করলেন, 'ব্রোক্ররা পেরনাউ রওনা হ'য়ে যাবার পর আপনারা ভাঙা-ক্রুশে এসে পৌঁছোন, তাই না?'

"ভাঙা ক্রুশ"! সরাইটার নাম যে "ভাঙা ক্রুশ" তা আমি এই প্রথম শুনলুম।'

'পোখকে নিয়ে সরাইতে পৌঁছোবার পর আপনি সরাইওলা ক্রোফের কাছে রাত্রিবাসের জন্য একটা ঘর চাইলেন....পোখও তাঁর জন্য একটা ঘর চেয়েছিলেন...ক্রোফ যখন জিগেশ করলো কিছু খেতে চান কি না, তখন আপনি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পোখ কিন্তু নৈশভোজনে বসেছিলেন...'

'আমার খিদে ছিলো না।'

'পরদিন ভোরবেলায়, কোচবাক্সের লোকজন ফেরবার আগেই, আপনি বেরিয়ে পড়তে চান, ক্রোফকে এ-কথা জানিয়েই আপনি আপনার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন।'

এ-সব অর্থহীন প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি যে তাঁকে ক্লান্ত ক'রে তুলেছে, নিকোলেফ তা গোপন করলেন না। বললেন, 'হ্যাঁ, তা-ই হয়েছিলো।'

'খাবারঘরের বাঁদিকের ঘরটা আপনাকে দেয়া হয়েছিলো—ঘরটা ছিলো সরাইখানার একেবারে এককোনায়...'

'আমার পক্ষে তো এ-সব তথ্য সঠিক জানা সম্ভব নয়...আগেই তো বলেছি। সেদিনই আমি ওখানে প্রথম পদার্পণ করি...তাছাড়া আমরা যখন সরাইটায় পৌঁছোলুম তখন অন্ধকার ক'রে এসেছিলো, আমি যখন ওখান থেকে রওনা হই, তখনও আলো ফোটেনি...'

'ভাঙচুর সারিয়ে কোচবাক্স চলতে শুরু করা অব্দি আপনি অপেক্ষা করতে চাননি,' কেরস্টোফ আবারও প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন।

'যেতে চাচ্ছিলুম পেরনাউ—ওখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে, তাই খামকা আমার অপেক্ষা করতে ইচ্ছে হয়নি।'

'বেশ। সন্ধেবেলাতেই পরিকল্পনাটা আপনার মাথায় এসেছিলো—আর সাতসকালেই সেটা আপনি কাজে খাটিয়ে ফেললেন।'

নিকোলেফ কোনো কথা না-ব'লে চুপ ক'রে রইলেন।

কেরস্টোফ বললেন, 'এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে-চাই। আশা করি তার সদুত্তর দিতে আপনার আপত্তি হবে না...'

'বলুন।'

'হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে এ-ভাবে যাবার তাড়া পড়লো কেন আপনার? অত গোপনীয়তাই বা কেন ছিলো?'

এই প্রথম নিকোলেফকে ইতস্তত করতে দেখা গেলো। 'ও আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'জানতে পারি কি, কী এমন ব্যক্তিগত...'

'এ-বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।'

'অন্তত এটা কি বলবেন আপনার গন্তব্য কোথায় ছিলো?'

'এ-সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই।'

'রেফেল যাবার জন্য ভাড়া দিয়েছিলেন আপনি। কোথায় যেতে চাচ্ছিলেন? রেফেলেই?'

কোনো উত্তর নেই।

'পেরনাউ যেতে চাচ্ছিলেন ব'লেই মনে হয়। কারণ কোচবাক্স মেরামত অব্দি আপনি অপেক্ষা করেননি। তবে কি পেরনাউ যেতে চাচ্ছিলেন?'

দিমিত্রি নিকোলেফ এবারও চুপ ক'রে রইলেন।

'শেষবারের মতো জিগেশ করছি। আপনার যাত্রার উদ্দেশ্য ও গন্তব্য কী ছিলো...'

ঠাণ্ডাগলায় নিকোলেফ বললেন, 'এ-সব জেরার উদ্দেশ্য কী, জানি না। কেনই বা এভাবে আপনার আপিশে আমায় ডেকে এনেছেন, তাও আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে। কিন্তু তবু এতক্ষণ আমি আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। তাছাড়া আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে যদিও আমি সেদিন যাবার সময় লোকের চোখে পড়তে চাইনি তবুও আপনি জিগেশ করবামাত্র সব স্বীকার করেছি। আপনিও তো বললেন আমাকে কেউ চিনতো না বা চিনতে পারেনি। কাজেই আমি যদি সব অস্বীকার করতুম, তাহ'লে আপনি প্রমাণ করতেন কী ক'রে যে আমিই সেদিন কোচবাক্সে ছিলুম...'

'একজন সাক্ষী কিন্তু আছেন, মঁসিয় নিকোলেফ, যিনি আপনাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন...'

'একজন সাক্ষী আছেন?'

'হ্যাঁ। আপনি এক্ষুনি তাঁর নিজের মুখ থেকে সব কথা জানতে পারবেন।' ব'লে কেরস্টোফ একজন পুলিশকে ডেকে বললেন, 'সারজেন্ট য়েক-কে পাঠিয়ে দাও।'

মুহূর্তের মধ্যে সারজেন্ট য়েক ঘরে ঢুকে তার বড়োকর্তাকে অভিবাদন ক'রে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

'আপনিই ষষ্ঠ স্কোয়াড-এর সারজেন্ট য়েক?'

সারজেন্ট তার পরিচয় দিলে। নিকোলেফ কিন্তু সারজেন্টকে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছেন ব'লে মনেই করতে পারলেন না।

'গত তেরোই এপ্রিল সন্ধেবেলায় আপনি কোথায় ছিলেন? ভাঙা ক্রুশের সরাই-খানায়?'

'হ্যাঁ, পেরনাওয়া থেকে একটা অভিযান সেরে ফিরছিলুম আমি...ফেরবার সময় ঐ সরাইতে ঢুকে খানিকক্ষণ আমরা বিশ্রাম করি। ঘণ্টা দুই ছিলুম ওখানে। তারপর যখন পেরনাউ রওনা হবার জন্য বেরিয়ে পড়বো, এমন সময় সরাইয়ের দরজা খুলে দুই ব্যক্তি এসে ঢোকেন। তাঁরা যে-কোচবাক্সে যাচ্ছিলেন, তা হঠাৎ ভেঙে যাওয়ায় তাঁরা সরাইখানায় আশ্রয় নিতে চাচ্ছিলেন। যাত্রীদের একজন ছিলেন পোখ, তাঁকে আমি আগে থেকেই চিনতুম। অন্য যাত্রী তাঁর ওভারকোটের কলারে নিজের মুখ ঢেকে রাখতে চাচ্ছিলেন, কেউ যে তাঁকে চিনুক এটা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। এতে সন্দিগ্ধ হ'য়ে আমি তাঁর পরিচয় পাবার জন্য উৎসুক হ'য়ে

উঠি। তার পরে এক ঝলকের জন্য যখন তাঁর মাথার টুপিটা স'রে যায়, তখন তাঁর মুখ দেখতে পাই আমি—কারণ আমি সর্বক্ষণ তাঁর দিকেই তাকিয়েছিলুম।'

'ঐ এক ঝলকেই তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন'

'হ্যাঁ। ভদ্রলোককে আমি অনেকবার রিগায় দেখেছি।'

'এবং তিনি হলেন অধ্যাপক দিমিত্রি নিকোলেফ?'

'হ্যাঁ, তিনি এ-ঘরে ব'সে আছেন এখন, দেখতে পাচ্ছি।'

এতক্ষণ নিকোলেফ সব কথা চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। এবার বললেন, 'সারজেন্ট ঠিকই বলেছেন। উনি সম্ভবত সরাইতেই ছিলেন তখন। তিনি আমার সম্বন্ধে কৌতূহলী হ'য়ে থাকলেও তাঁর সম্বন্ধে কিন্তু আমার কোনো কৌতূহলই ছিলো না। তাছাড়া, আমি তো নিজেই আপনাদের বলেছি যে সে-রাতে আমি ঐ সরাইটায় ছিলুম—কাজেই এই সাক্ষীশাবুদের দরকার কেন, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'কেন, তা আপনি শিগগিরই জানতে পারবেন, দিমিত্রি নিকোলেফ। হঠাৎ গোপনে আপনাকে যেতে হয়েছিলো কেন, আপনি তাহ'লে তা বলতে চাচ্ছেন না!'

'না।'

আপনি বুঝতে পারছেন না যে আপনার এই অস্বীকৃতির ফল আপনার পক্ষে ভালো হবে না!'

'তার মানে?'

'সে-রাত্রে ঐ সরাইটায় কী হয়েছিলো, তা খুলে বললে অনেক ঝামেলা বাঁচতো। আপনি যদি আপনার গতিবিধির একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন, তাহ'লে আর আমাদের এভাবে তদন্ত করতে হ'তো না।'

'কেন? সে রাত্রে কী হয়েছিলো?'

'আপনি জানেন না ?'

'না।' এবার নিকোলেফের কণ্ঠস্বরে একটু অস্বস্তি প্রকাশ পেলো, 'এটা বুঝতে পারছি যে একটা গুরুতর ব্যাপারে আমি বোধহয় জড়িয়ে পড়েছি—এবং আপনারা আমাকে সাক্ষ্য দিতে ডেকে এনেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী, তা-ই তো বুঝতে পারছি না।'

'সাক্ষ্য দিতে ডেকেছি আপনাকে? না, দিমিত্রি নিকোলেফ, না । আপনাকে ডাকা হয়েছে অভিযুক্ত আসামী হিশেবে!'

'কীসের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে?'

'তেরো তারিখ রাত্তিরে ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায় পোখ খুন হয়েছে।'

'বেচারি খুন হয়েছে!'

'হ্যাঁ। এবং আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে খুনী হচ্ছে তার ভ্রমণ-সঙ্গী—অর্থাৎ আপনি।'

'আমি! খুনী!' দিমিত্রি নিকোলেফ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি তাহ'লে অভিযোগ অস্বীকার করছেন?' কেরস্টোফও উঠে দাঁড়ালেন আস্তে-আস্তে।

'কতগুলো কথা আছে যাদের আর অস্বীকার করতে হয় না—শোনবামাত্রই বোঝা যায় তারা সত্যি নয়।'

'আপনি সতর্ক হ'য়ে কথা বলবেন...'

'পাগল! আপনারা নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন?'

'আমরা খুব গুরুত্ব দিয়েই কথাটা বলছি...'

দিমিত্রির গলার স্বরে তাচ্ছিল্য ফুটে উঠলো, 'এ-বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমার কোনো তর্ক নেই। কেবল শুনি, কোন্ প্রমাণের বশবর্তী হ'য়ে আপনারা আমাকে খুনী সাব্যস্ত করেছেন?'

'আপনি সে-রাতে যে-ঘরে ছিলেন তার জানলার গোবরাটে কতগুলো দাগ দেখে বোঝা গেছে যে জানলা দিয়ে পোখ-এর ঘরে ঢোকবার জন্য আততায়ী জানলাটা ব্যবহার করেছিলো। যে-হাতুড়িটা দিয়ে জানলার খড়খড়ি ভেঙে আততায়ী ঢুকেছিলো, সেটাও আপনার ঘরে পাওয়া গেছে।'

'হুঁ...এ-সব প্রমাণ থেকে অবিশ্যি সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয়—আপনাদের দোষ নেই। কিন্তু ধ'রেই নিলুম বাইরের কোনো লোক সে-রাতে খুন করেনি—কিন্তু আমি চ'লে যাবার পরেও তো খুনটা হ'তে পারতো?'

'অর্থাৎ আপনি সরাইওলাকে অভিযুক্ত করছেন। কিন্তু তদন্তে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'

'আমি কাউকেই অভিযুক্ত করছি না,' দিমিত্রির গলার স্বরে তাচ্ছিল্যের ভাব সুস্পষ্ট, 'কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে কেউ কী ক'রে ভাবতে পারলো আমার দ্বারা ও-রকম কোনো হত্যাকাণ্ড সম্ভব!'

এবার মেজর ফেরডের বললেন, 'খুনীর উদ্দেশ্য ছিলো চুরি। ইয়োহাউজেন ব্রাদার্সদের টাকা নিয়ে যাচ্ছিলো পোখ—অথচ এর ব্রীফকেসে কোনো টাকা পাওয়া যায়নি।'

'তো আমার তাতে কী?'

এবার কেরস্টোফ আবার জিগেশ করলেন, 'দিমিত্রি নিকোলেফ, আপনি এখনও আপনার ভ্রমণের উদ্দেশ্যও খুলে বলবেন না আমাদের?'

'না।'

'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই অভিযোগ কেমন গুরুতর। অন্য-কেউ হ'লে এই সাংঘাতিক কাণ্ডের জন্য তাকে আমরা গ্রেফতার করতুম—কিন্তু আপনার মতো লোক, যাঁকে দেশশুদ্ধু সবাই শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, তাঁকে সাধারণ কয়েদির মতো হাজতে পুরে রাখা যায় না। আমি আপাতত আপনার গ্রেফতারি পরোয়ানায় দস্তখৎ দিচ্ছি না... কিন্তু সবসময়েই তৈরি থাকবেন—যাতে তদন্তের এত্তেলা পাঠালেই আপনাকে পাওয়া যায়। আর তদন্তের জন্য মাঝে-মাঝেই আপনাকে আমাদের দরকার হবে।'

১১

মুখোমুখি

অন্য অনেকের মতোই—মেজর ফেরডেরের ইচ্ছে ছিলো—যে জেরার পর যেন দিমিত্রিকে গ্রেফতার করা হয়। বিশেষ ক'রে দিমিত্রির প্রবল জেদ—কিছুতেই তিনি তাঁর রহস্যময় ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও গন্তব্যস্থলের কথা যখন খুলে বলবেন না—সন্দেহ আরো বাড়িয়ে দিলে।

তাহ'লে কেন নিকোলেফকে গ্রেফতার করা হ'লো না? হাজতে পুরে ধোলাই দেবার বদলে কেন তাঁকে স্বাধীনভাবে বাড়ি চ'লে যেতে দেয়া হ'লো? বলা হয়েছে অবশ্য যে এত্তেলা পাঠালেই তিনি যেন কেরস্টোফের আপিসে এসে হাজির হন, কিন্তু এই সুযোগে তিনি তো পালিয়ে যেতেও পারেন।

রুশদেশে, বা অন্যত্রও, বিচারবিভাগের স্বাধীনতায় এমনিতে হাত দেয়া হয় না। কিন্তু অভিযোগ যেই কোনো রাজনৈতিক চেহারা নেয়, অমনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আবির্ভাব ঘটে। দিমিত্রি নিকোলেফের মামলাটাই তার একটা দৃষ্টান্ত : যখন স্লাভরা তাঁকে নির্বাচনে দাঁড় করাবার জন্যে তোড়জোড় করছে, ঠিক তক্ষুনি তাঁর বিরুদ্ধে এই ভীষণ অভিযোগ উত্থাপিত হ'লো। সেইজন্যেই আসলে বলটিক প্রদেশের রাজ্যপাল জেনারেল গোরকো তাঁকে গ্রেফতার করাটা সমীচীন বোধ করেননি —যখন একেবারে অকাট্য ভাবে তাঁর অপরাধ প্রমাণিত হবে, তখনই তাঁকে সাজা দেবার জন্য সোপর্দ করা হবে। তাছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কেরস্টোফের উপরও তাঁর গভীর আস্থা ছিলো। কেরস্টোফের মর্যাদাবোধ, মুক্তদৃষ্টি, ব্যক্তিত্ব ও বিবেক তাঁকে সারা দেশেই শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলো। কোনো রাজনৈতিক মতবাদ তাঁকে কর্তব্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

কিন্তু শহরে ততক্ষণে বিষম সাড়া প'ড়ে গেছে। বেশির ভাগ লোকেই ভেবেছিলো এবং তাদের মধ্যে প্রভাবশালী ধনাঢ্যদের সংখ্যাও অল্প ছিলো না—যে, দিমিত্রি নিকোলেফকে গ্রেপ্তার করা হবে। তাই যখন তাঁকে স্বাধীনভাবে বাড়ি ফিরতে দেখা গেলো, তখন কোনো-কোনো মহলে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হ'লো।

তাছাড়া এই বিষম বার্তা ততক্ষণে গিয়ে নিকোলেফ ভবনেও পৌঁছেছে। ইল্‌কা এতক্ষণে জানতে পেরেছে যে কোনো ভয়ংকর অভিযোগের খড়্গ তার বাবার মাথার উপর ঝুলছে। তার ভাই জাঁ এসে পৌঁছেছে বাড়িতে—ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডগোলের কথাও সে সবিস্তারে খুলে বলেছে দিদিকে। বাবা যে স্বপ্নেও কখনও এ-রকম নৃশংস কাজ করতে পারেন না, এ-বিষয়ে তাদের মনে কোনো সংশয় নেই। সংশয় নেই ডাক্তার হামিনে ও মঁসিয় দ্যালাপোর্তের মনেও। খবরটা শোনবামাত্র তাঁরা গিয়ে হাজির হয়েছেন নিকোলেফ ভবনে, এবং ভাইবোনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য হ'লো, নিকোলেফকে কে না চেনে রিগায়, কে না তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, কাজেই অভিযোগ তুললেই তো হ'লো না—তাকে প্রমাণ করা চাই, আর সেক্ষেত্রে তাঁর নিষ্কলুষ অতীত জীবনের স্মৃতি অত্যন্ত সহায়ক হবে।

দিমিত্রি নিকোলেফ বাড়ি ফিরে দেখলেন তাঁর ছেলেমেয়ে ও বন্ধুরা সম্মিলিত হ'য়ে আছেন—বিশ্বাসে অবিচল, বিচারে আস্থাশীল অন্যায় ও আজগুবি অভিযোগের প্রতিবাদে উন্মুখর। বাইরে কিন্তু তখন বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোকদের ভিড় ও কোলাহল শুরু হ'য়ে গেছে—বলাই বাহুল্য রাজনৈতিক দল হিশেবে তারা এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চাচ্ছে। কেরস্টোফের জেরার কথা খুলে বললেন নিকোলেফ, প্রশংসাও করলেন তিনি কেরস্টোফকে—তাঁর মন খোলা, দৃষ্টি স্বচ্ছ—কিন্তু মেজর ফেরডের যে তাঁকে হাজতে পোরবার জন্য উৎসুক ও বদ্ধপরিকর, তাঁর এই ধারণাও তিনি সকলকে খুলে বললেন। কিন্তু সব কথা বলবার সময় কেমন ভাঙা-ভাঙা শোনালো তাঁর গলা, কেমন যেন অবসন্ন দেখালো তাঁকে—যেন এই অভিযোগের বিপুল আঘাতে তাঁর মনের শান্তি ভীষণভাবে নাড়া খেয়েছে। তাঁর এখন বিশ্রাম চাই, এ-সব বাজে ব্যাপার মন থেকে মুছে ফেলা চাই—এ-কথা বুঝতে পেরে বন্ধুরা তখনকার মতো বিদায় নিলেন, যাবার আগে তাঁরা বন্ধুর উপর আস্থা জানিয়ে গেলেন তাঁদের। বন্ধুকে এই অভাবিত বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য নানা শলাপরামর্শ করতে-করতে তাঁরা গেলেন।

এটা তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে নিকোলেফের শত্রুরা তাঁকে নির্দোষ ব'লে জানলেও রাজনৈতিক সুযোগগুলো নিতে ছাড়বে না। কোনো-কোনো মহলে উত্তেজনা ও ষড়যন্ত্র বেশ তীব্র চেহারা নেবে। কাজেই এ-ক্ষেত্রে আসল অপরাধীকে খুঁজে বার করা চাই। না-হ'লে নিকোলেফের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা না-গেলে এবং আততায়ীকে খুঁজে বার করতে না-পারলে, গুজবের বিষ ঝেড়ে ফেলা যাবে না। তাছাড়া জাঁ আর কার্ল-এর ব্যাপারটাও তাঁরা মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছিলেন না। জাঁকে তাঁরা ছেলেবেলা থেকে চেনেন—সে কার্লকে কক্‌খনো ছেড়ে দেবে না, কার্ল-এর এই ইতর ও অন্যায় ব্যবহারের শোধ সে নেবেই। অথচ এখন এই অবস্থায় মাথা গরম ক'রে কিছু ক'রে ফেললেই ইয়োহাউজেনদের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দেয়া হবে। ঈশ, একবার যদি জানা যেতো দিমিত্রি কোথায় গিয়েছিলেন, কেন গিয়েছিলেন—তাহ'লে অনেক রহস্য পরিষ্কার হ'তো অনেক জট খুলে যেতো। কিন্তু কী বিষম তাঁর জেদ—এখনও তিনি পণ ক'রে আছেন সে-সম্বন্ধে কোনো কথাই খুলে বলবেন না।

এদিকে ইয়োহাউজেনদের মধ্যেও নানা শলাপরামর্শ হচ্ছে তখন। এটা তাঁরা জানতেন যে নিকোলেফের সঙ্গে পোখ-এর কোনো পরিচয় ছিলো না। দৈবাৎ যদি নিকোলেফ জেনে থাকেন যে পোখ ব্যাঙ্কে কাজ করে, তাহ'লে সেই কোচবাক্সে এবং সেক্ষেত্রে এই হত্যাকাণ্ড পূর্বপরিকল্পিত নয়, অতর্কিত। তাছাড়া নিকোলেফ যদি হত্যা ও চুরি দুই-ই ক'রে থাকেন, তাহ'লে এটা নিশ্চয়ই তাঁর জানা নেই যে সব হচ্ছে নম্বরি নোট—আর পোখ-এর চিরকেলে অভ্যাস নম্বরগুলো টুকে রাখা। সেক্ষেত্রে চোরাই টাকা খরচা করতে গেলেই তিনি ধরা প'ড়ে যাবেন, গলায় আঁটো হ'য়ে ফাঁস বসবে। কিন্তু, ধরা যাক, তিনি চুরি করেননি, খুনও না—সে-ক্ষেত্রেও তাঁর রেহাই নেই। কারণ তাঁর আর্থিক অবস্থা এখন বিষম শোচনীয়। যে-সব ঋণ ও লগ্নী আছে তাঁর, তা শোধ করবার ক্ষমতাই তাঁর নেই। আর তিন সপ্তাহের মধ্যেই ইয়োহাউজেনদের আঠারো হাজার রুবল তাঁকে ফেরৎ দিতে হবে, কিন্তু সে-টাকা জোগাড় করার মতো সামর্থ্য বা অবস্থা তাঁর নেই। বলাই বাহুল্য, তিনি আরো-কিছু সময় চাইবেন। কিন্তু ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন স্থির ক'রে ফেললেন, কিছুতেই তিনি সময় দেবেন না—কোনো

দয়া দেখাবেন না —কেননা এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারানো যায় না। ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের স্বভাবটাই এ-রকম : নির্মম, দয়াহীন, উদ্ধত, প্রতিশোধপ্রবণ।

+

আঠারোই এপ্রিল কেরস্টোফ এলেন তল্লাশি পরোয়ানা নিয়ে, সঙ্গে মেজর ফেরডের ও সার্জেন্ট য়েক। নিকোলেফ ভবন তাঁরা খুঁজে দেখতে চান—যদি চোরাই টাকার কোনো হদিশ মেলে।

দিমিত্রি নিকোলেফ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাঁদের দেখতে দিলেন সবকিছু—কোনো প্রতিবাদ করলেন না ; সব জিজ্ঞাসারই উত্তর দিলেন, ঘৃণা মিশিয়ে, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। মেজর ফেরডের তাঁর দেরাজ ঘাঁটলেন, আলমারি তাক তন্নতন্ন করে খুঁজলেন, কাগজপত্র পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, বাদ দিলেন না চিঠিপত্র, এমনকী হিশেবের খাতাও দেখতে ছাড়লেন না। আর এটা বুঝতে দেরি হ'লো না যে ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনদের ধারণা মোটেই ভুল নয়—নিকোলেফ একেবারেই নিঃস্ব, কপর্দকশূন্য, শুধু ছাত্র পড়িয়েই কোনোক্রমে তাঁর দিন চলে। কিন্তু এই অভিযোগ যখন উঠেছে, তখন তাঁর ছাত্ররাও টিকলে হয়।

তল্লাশি ক'রে অবশ্য হত্যারহস্যের কোনো কিনারাই হ'লো না। তবে কোনো নিরাপদ গোপন জায়গায় চোরাই টাকা লুকিয়ে রাখার সময় তিনি বিস্তর পেয়েছেন—সরাই থেকে রাত থাকতেই তিনি যে কেটে পড়ে কোথায় গেলেন, সে-জায়গাটার খোঁজ পেলে হ'তো—সম্ভবত সেখানেই সব টাকা লুকোনো রয়েছে। নম্বরি নোট চালাতে গেলেই চোর ধরা প'ড়ে যাবে —কিন্তু সে কি চট ক'রে ও-টাকা চালাতে চাইবে! যখন নিজেকে সে নিরাপদ ও সন্দেহের অতীত ব'লে ভাববে, তখনই সে ও-টাকা চালাবার চেষ্টা করবে।

সারা বলটিক অঞ্চলে ততদিনে আলেমান প্রভাবের ফলে জনমত অধ্যাপক নিকোলেফের বিরুদ্ধে চ'লে গেছে। বেশির ভাগ লোকেই চাচ্ছে তাঁকে গ্রেফতার ক'রে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হোক, বিচার হোক। কেবল গরিব স্লাভরাই আছে তাঁর পক্ষে—কিন্তু তাদেরও মনে আছে খুঁতখুঁতুনি ; খটকা তাদেরও কাটেনি। নিকোলেফ যে নিরপরাধ, এ-কথা তারা হলফ ক'রে বলতে পারবে না। কিন্তু তিনি তো স্লাভ—কাজেই সমর্থন তাঁকে করতেই হবে। কিন্তু তাদের ক্ষমতাই বা কতটুকু, অর্থ ও সামর্থ্যই বা কই! ধনী জর্মানদের প্রভাব ও চেষ্টাকে ব্যর্থ করার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই।

এতসব উত্তেজনার মধ্যে দিমিত্রি নিজে কিন্তু আছেন শান্ত ও অবিচল। কোনো কথাই তিনি বলতে চান না পারতপক্ষে, কারু সঙ্গেই না ; সারাক্ষণ পড়ার ঘরে ব'সে থাকেন চুপচাপ। ছাত্রেরা পড়তে এলে রুটিনমাফিক পড়ান, ব্যাস্, এই পর্যন্ত! শহরের উত্তেজনা দেখে বন্ধুরা তাঁকে বারণ করেছিলেন বাড়ি থেকে বেরুতে ; তিনি শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যভরে তাঁদের সে-অনুরোধ মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই গুটিয়ে নেয়াটাকে সবাই বেশ একটু ভয় পেলেন। এটা বুঝতে কারু দেরি হলো না যে তাঁর মনের উপর বিষম চাপ পড়ছে।

বলাই বাহুল্য, জাঁ তখনও ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরবার কথা ভাবতে পারছিলো না। যতদিন-না নিকোলেফের উপর থেকে সব সন্দেহ কেটে যায়, তদ্দিন ফেরবার কোনো কথাই ওঠে না। তাছাড়া কার্ল-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে নিজেকে শামলে রাখবে কীভাবে!

নিকোলেফ কেবল একটা খবরই মাঝে-মাঝে নিতেন—তাঁর কোনো চিঠি এসেছে কি না। কিন্তু না, কোনো চিঠি নেই। ডাকহরকরা এসে অন্য-সব কাগজপত্র দিয়ে যায়, রোজ

সে বিলি করে স্লাভদলের রাজনৈতিক মুখপত্র, কিন্তু না—কোনো চিঠি নেই। শেষ পর্যন্ত তাঁকে কেমন অধীর ও উত্তেজিত দেখাতে লাগলো। যেন একটা জরুরি চিঠি আসবার কথা—কিন্তু কোনো রহস্যময় কারণে সেটা আর আসছে না।

সেদিন পোখ-এর অন্ত্যেষ্টি। ডাক্তার হামিনে ও মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ সকালবেলাতেই এসে নিকোলেফ ভবনে হাজির হয়েছেন। শবাধারে ক'রে পোখ-এর মৃতদেহকে নিয়ে গোরস্থানের দিকে শোকমিছিল যাবার সময় নিকোলেফদের বাড়ির বাইরে গোলযোগ হ'তে পারে, এই আশঙ্কা ছিলো তাঁদের। আগে থেকেই সেজন্য সাবধান থাকা উচিত। কিন্তু ইল্‌কা ও জাঁকে সাবধান ক'রে দিলেও ব্যাপারটা দিমিত্রি নিকোলেফকে আগে থেকে জানানো তাঁরা সমীচীন বোধ করেননি।

বাইরে আস্তে-আস্তে লোক জমছে। ভিড়, চ্যাঁচামেচি, বিশ্রী সব জিগির উঠছে। ক্রমশ ভিড় বাড়ছে নিকোলেফ-ভবনের বাইরে। এরই মধ্যে মধ্যাহ্নভোজ সারলেন তাঁরা, ডাক্তার হামিনে ও মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ শুদ্ধু। খাবার টেবিলে কোনো কথাই হ'লো না। শোকমিছিল সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্যই হ'লো না।

দেড়টা নাগাদ বাইরে যখন তুমুল হট্টগোল শুরু হলো, বোঝা গেলো শবাধার আসছে। সম্মিলিত চীৎকারে বাড়িটা শুদ্ধু থরথর ক'রে কাঁপছে। হঠাৎ পড়ার ঘর থেকে দিমিত্রি বেরিয়ে এলেন।

'বাইরে এত হৈ-হল্লা কেন?'

ডাক্তার হামিনে অনুরোধ করলেন, 'আপনার ঘরে চ'লে যান। বেরুবেন না। পোখ-এর আজকে অন্ত্যেষ্টি।'

'পোখ? মানে সেই লোকটা, যাকে আমি খুন করেছি!'

'ঘরে চ'লে যান নিকোলেফ, কাতর অনুরোধ করছি আপনাকে...'

'বাবা!' ইল্‌কা ও জাঁও অনুনয় করলো বাবাকে।

কিন্তু দিমিত্রি! তাঁর মনের মধ্যে তখন ঝড় উঠেছে। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, খুলতে চাইলেন জানলার পাল্লা।

'না, দিমিত্রি, না। ও-কাজ করবেন না। এ নিছকই পাগলামি আপনার। আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'আমি দেখতে চাই।' কেউ বাধা দেবার আগেই দিমিত্রি খোলা জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

হাজার কণ্ঠে চীৎকার উঠলো, 'খুন করো ওকে, খুন!'

ঠিক সেই মুহূর্তেই, দৈবের কেমন যোগাযোগ, বাড়ির সামনে এসে পৌঁছুলো শবাধার। পাশে আছে ভজেনাইদে পারেনসোফ, পরনে শোকার্ত বিধবার বেশ, কফিনে ফুল ও মালা। তারপর এলো ইয়োহাউজেনদের ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা। তারপরে উন্মত্ত জনতা—যারা সমস্ত ব্যাপারটার সুযোগ নিতে চাচ্ছে। তুমুল হট্টগোলের মধ্যে শবযাত্রা থামলো বাড়ির মুখোমুখি। আর উঠলো অট্টরোল : 'খুনের বদলে খুন চাই।'

মস্ত পুলিশবাহিনী নিয়ে কর্নেল রাগুয়েনোভ ও মেজর ফেরডের মোতায়েন ছিলেন বাড়ির কাছে। কিন্তু এই উন্মত্ত জনতা ঠেকাবে কে! পুলিশ! তাদের সাধ্য কী! তাছাড়া দিমিত্রিকে জানলায় দেখবামাত্র রোল উঠেছে, 'খুনের বদলে খুন চাই! খুনের বদলে খুন!'

দিমিত্রি দাঁড়িয়ে রইলেন জানলায়, বুকে আড়াআড়ি ভাঁজ করা হাত, গর্বিত শির ; যেন পাষাণমূর্তি, এমনি তিনি অবিচল ও নিশ্চুপ।

শবযাত্রা চলতে লাগলো আবার। চীৎকার উঠলো আরো চরমে, উন্মত্ততা আরো তুঙ্গে। ভিড় থেকে কেউ-কেউ ছুটে এলো বাড়ির দিকে, দরজা তারা ভেঙেই ফেলবে।

পুলিশ শামলে নিলে ব্যাপারটা তখনকার মতো—কিন্তু এটা বুঝতে দেরি হ'লো না যে নিকোলেফকে এই খ্যাপা কুকুরের মতো জনতার হাত থেকে বাঁচাতে হ'লে তাঁকে এক্ষুনি গ্রেফতার করতে হবে—নইলে এক্ষুনি তাঁকে এই জনতা ছিঁড়ে ফেলবে।

পুলিশর সব চেষ্টা সত্ত্বেও জনতা বুঝি বেষ্টনী ভেদ ক'রে এগুতো, যদি-না সেই মুহূর্তে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতো বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বময় এক যুবক। সে এসে ভিড় ঠেলে সোজা গিয়ে উঠলো সিঁড়িতে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সে থামতে বললো সবাইকে। ভিড়ের চীৎকার ছাপিয়ে শোনা গেলো সেই প্রবল নির্ঘোষ, 'থামো!'

এমনি ব্যক্তিত্বদৃঢ় তার ভঙ্গি যে হঠাৎ ভিড় গেলো পেছিয়ে, কোলাহল গেলো থেমে।

ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন এগিয়ে গেলেন তার দিকে : 'কে আপনি?'

মেজর ফেরডেরও প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন, 'আপনি কে?'

'আমি এক নির্বাসিত—নিজের প্রাণ ও সম্মানের বিনিময়ে দিমিত্রি নিকোলেফ যাকে বাঁচাতে চাচ্ছিলেন!'

'আপনার নাম?'

'ভ্লাদিমির ইয়ানোফ!'

১২

ভ্লাদিমির ইয়ানোফ

রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলো ব'লে ভ্লাদিমির ইয়ানোফকে পাঠানো হয়েছিলো সাইবেরিয়ায়—যাবজ্জীবন নির্বাসনে। ইল্কা নিকোলেফ, তার বাগ্‌দত্তা, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি আবার কোনোদিন তাকে চর্মচক্ষুতে দেখতে পারে। তারপর নির্বাসনে চার বছর কেটে যাবার পর, ভ্লাদিমির পালালো। পেরিয়ে এলো রুশদেশের বিস্তীর্ণ স্তেপভূমি, পৌঁছুলো এসে পেরনাউ, ইচ্ছে এখান থেকে জাহাজ চেপে যাবে ফরাশি দেশে। এই পেরনাউতেই সে ছিলো লুকিয়ে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে; বলটিকের সাগরে জাহাজ চলাচল শুরু হ'লেই কোনো-একটা জাহাজে গিয়ে উঠবে সে গোপনে, এই ছিলো স্থির। কিন্তু থাকে কী ক'রে সে পেরনাউতে! ছন্নছাড়া, ঘরছাড়া, হাতে টাকা নেই; আশ্রয় জোটে কোথায়? তাই সে চিঠি লিখেছিলো দিমিত্রি নিকোলেফকে—সাহায্য চেয়ে। এই চিঠি পাবামাত্রই রওনা হয়ে পড়েন অধ্যাপক—ভ্লাদিমিরের বাবা তাঁর কাছে যে-টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন, তাই তিনি ছেলের হাতে তুলে দেবেন। গোড়ায় নিকোলেফ কাউকেই তার কথা খুলে বলেননি—তার কারণ ভ্লাদিমির সত্যি পেরনাউ

পৌঁছেছে কিনা সঠিক তিনি জানতেন না, পরে ভ্লাদিমির তাঁর কাছ থেকে কথা নিয়েছিলো যে কিছুতেই তিনি যেন আপাতত ইল্‌কাকে তার কথা খুলে না-বলেন—বিদেশে নিরাপদ জায়গায় থেকে চিঠি লিখলে পরেই তাকে সব কথা বলা চলবে। কাজেই গোপনে রিগা থেকে পেরনাউ যেতে হয়েছিলো নিকোলেফকে। টিকিট কেটেছিলেন রেফেল পর্যন্ত যাতে কেউ বুঝতে না-পারে তাঁর আসল গন্তব্যস্থল কোথায়।

তারপর এই কাণ্ড।

এখন আর কারু বুঝতে বাকি রইলো না কেন ও-রকম জেদ ক'রে সব কথা দিমিত্রি নিকোলেফ চেপে যাচ্ছিলেন। এই নির্বাসিতকে বাঁচাবার জন্যই তিনি এমনকী নিজের প্রাণ সংশয় ক'রে তুলেছিলেন।

দরজা খুলে গেলো; ভ্লাদিমির ইয়ানোফ আলিঙ্গন করলে দিমিত্রি নিকোলেফকে, সম্ভাষণ জানালে তাঁকে, বুকে চেপে ধরলে তার বাগ্‌দত্তাকে। কর্নেল রাগুয়েনোফ আর মেজর ফেরড়ের কলের পুতুলের মতো তাকে অনুসরণ ক'রে ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। এবার তাঁদের দিকে ফিরে ভ্লাদিমির বললে :

'পেরনাউতে হঠাৎ আমি জানতে পেলুম যে দিমিত্রি নিকোলেফকে এক নৃশংস হত্যার জন্য দায়ী করা হচ্ছে, সন্দেহের প্রধান কারণ, তিনি নাকি কিছুতেই বলতে চাচ্ছেন না কোথায় যাবেন ব'লে তিনি সেদিন কোচবাক্সে চেপেছিলেন, যাত্রার উদ্দেশ্যই বা কী। কেবল আমার নামটি উচ্চারণ করলে সব সন্দেহ থেকে খালাশ পেয়ে যেতেন তিনি, কিন্তু আমাকে তিনি জড়াতে চাননি, সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে এসেছি, একবার হদিশ পেলে আবার পুলিশ আমাকে পাকড়াবে। ব্যাপারটা শোনবামাত্র আমি একতিলও দেরি করিনি—সোজা এখানে এসে হাজির হয়েছি। মিখায়েল ইয়ানোফের বন্ধু আপনি, বন্ধুপুত্রকে বাঁচাবার জন্য আপনি নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে তুলেছিলেন দিমিত্রি নিকোলেফ। কিন্তু আমি তা হ'তে দেবো কেন...'

'ভুল করেছো তুমি, ভ্লাদিমির, ভুল করেছো। আমি নিরপরাধ, আমার কোনো ভয় ছিলো না—শীগগিরই আমার নির্দোষিতা প্রমাণ হ'য়ে যেতো। কিন্তু আবার তুমি...'

'কিন্তু আমি কি ঠিক করিনি, ইল্‌কা?' ভ্লাদিমির তার বাগ্‌দত্তাকে জিগেশ করলে।

নিকোলেফ মেয়েকে বললেন, 'ও-কথার কোনো উত্তর দিস্‌নে, ইল্‌কা। বাবা আর বাগ্‌দত্ত —এ-দুয়ের মধ্যেই তুই বাছবি কাকে?...তোমার কর্তব্যবোধ দেখে আমি তোমাকে সম্মান করছি ভ্লাদিমির, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তুমি একটা আস্ত হাঁদা। কোনো নিরাপদ দেশে চ'লে যাওয়া উচিত ছিলো তোমার। সেখান থেকে তুমি আমাকে চিঠি লিখতে পারতে। আর সে-চিঠি পাবামাত্র আমি সব কথা খুলে বলতে পারতুম। তুমি বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে, এই ভরশাতেই আমি এই বিষম দিনগুলো সহ্য করতে পারতুম।'

'বাবা,' ইল্‌কার গলার স্বর খুবই দৃঢ় শোনালো, 'আমার কথা শোনো। ভ্লাদিমির ঠিক কাজই করেছে। জীবন দিয়েও ওকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারবো না...'

'ধন্যবাদ তোমাকে, ইল্‌কা,' ভ্লাদিমির বললে, 'অন্তত একদিনের জন্যও তোমার বাবাকে আমি যে এই বিষম দুর্বিপাক থেকে বাঁচাতে পেরেছি, তাতেই আমার শান্তি।'

ভিড়ের মধ্যে এদিকে মুহূর্তে সব যেভাবে পালটে গেলো, তা প্রায় অবিশ্বাস্য। জনমতের মতো চঞ্চল ও অবিরাম পরিবর্তমান আর-কিছু নেই। নিকোলেফের বাড়ি আক্রমণ করবার

ইচ্ছে আর কারু রইলো না, পুলিশকে আর জনতার হাত থেকে দিমিত্রিকে বাঁচাবার জন্য তোড়জোড় করতে হবে না।

কিন্তু ভ্লাদিমির ইয়ানোফের অবস্থাটা নতুন অনেক সমস্যা চেতিয়ে তুললো। সন্দেহ নেই, ভ্লাদিমিরের কর্তব্যবোধ ও সহৃদয়তা অনুকরণযোগ্য, কিন্তু সে যে একজন রাজনৈতিক বন্দী তাও তো মানতে হয়। কাজেই কর্নেল রাগুয়েনোফ তাকে বললেন, 'ভ্লাদিমির ইয়ানোফ, আপনি সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে এসেছেন, রাজ্যপালকে এ-কথা আমায় জানাতে হবে। আপনি যদি কথা দেন যে পালাবার চেষ্টা করবেন না, তাহ'লে আপনাকে আপাতত এখানে আমি থাকতে দিতে পারি। আমি সে-ফাঁকে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা ক'রে আসবো।'

'আপনি ভাববেন না, কর্নেল, আমি কথা দিচ্ছি, পালাবো না,' ভ্লাদিমির বললে।

সারজেন্ট য়েক ও তাঁর লোকজনকে রাস্তায় পাহারা বসিয়ে কর্নেল রাগুয়েনোফ চলে গেলেন।

আর পুলিশ চ'লে যেতেই পারিবারিক প্রীতিসম্মিলনীর মধ্যে আনন্দের বন্যা ব'য়ে গেলো। ভ্লাদিমিরের অবস্থা যে সংকটজনক, এ-কথা সবাই যেন ভুলেই গেলো। সবাই তখন ভবিষ্যতের সানন্দ ভাবনাতেই মুখর ও মশগুল। এই দেখে ডাক্তার হামিনে ও মঁসিয় দ্যালাপোর্ৎও সাময়িকভাবে বিদায় নিলেন।

কর্নেল ফিরলেন ঠিক এক ঘণ্টা পরে। ভ্লাদিমিরকে তিনি বললেন, 'জেনারেল গোরকোর আদেশ, আপনাকে রিগা কেল্লায় যেতে হবে। সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে কী নির্দেশ আসে, জেনে, আপনার ব্যবস্থা করা হবে। নির্দেশ আসা পর্যন্ত আপনাকে ঐ কেল্লায় থাকতে হবে।

+

এতদিন সকলের আলোচনার ও উত্তেজনায় বিষয় ছিলো পোখ-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ড। কিন্তু ভ্লাদিমির ইয়ানোফের আবির্ভাবের পর থেকে সব পালটে গেলো। নিকোলেফ সম্বন্ধে লোকের ধারণা শেষ পর্যন্ত যা-ই থাক না কেন, ভ্লাদিমিরের সাহস ও কর্তব্যবোধের প্রশংসা না-ক'রে উপায় নেই। নিকোলেফকে বাঁচাবার জন্য সে এমনকী নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিতেও ইতস্তত করেনি; যাবজ্জীবন নির্বাসন হয়েছিলো তার, ছিলো গুরুতর রাজনৈতিক অভিযোগ; জানে যে এবার ধরা পড়লে তার আর রেহাই নেই; তবু সে বিবেকের আদেশ লঙ্ঘন করতে পরেনি; তাকে বাঁচাবার জন্যই নিকোলেফ নিজের উপর সন্দেহ ঘনীভূত ক'রে তুলেছিলেন—এখন পুরো অবস্থাটা একেবারে উলটে গিয়েছে। সম্রাটের আদেশ কী হবে কে জানে। জার কি আবার তাকে পাঠাবেন সাইবেরিয়ায়—যেখান থেকে অত কষ্ট ক'রে বেচারি পালিয়েছিলো? তাছাড়া এটা ভাবলেও ভুল হবে যে তার আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই নিকোলেফের নির্দোষিতা অকাট্যভাবে প্রমাণ হ'য়ে গেলো। বিশেষ ক'রে রিগায়, যেখানে আলেমানদের সংখ্যা ও প্রভাব নেহাৎ কম নয়, সেখানে এটা ভাবাই ভুল। বড়োলোকদের বেশির ভাগেরই ধারণা এই অধ্যাপক, এই স্লাভ জাগরণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, মোটেই নির্দোষ নন। এখনো তো আততায়ীর কোনো সন্ধান মেলেনি। না-হয় ধ'রেই নেয়া গেলো নিকোলেফ যাচ্ছিলেন ভ্লাদিমিরের উদ্দেশে, কিন্তু এটা তো সত্যি যে ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায় তেরো তারিখ রাত্তিরে তিনি ছিলেন। আর এটাও তো সত্যি যে পোখ ঐ রাত্তিরেই ঐ সরাইতে খুন হয়েছে—সব টাকাও

চুরি হয়েছে! তাছাড়া নিকোলেফ যে-ঘরে ছিলেন, সেই ঘরেই কি জানলা ভাঙার হাতুড়িটা পাওয়া যায়নি? অবশ্য বাইরের কেউ খুন করেছে কি না, তাও নিশ্চিত বলা যায় না। সরাইওলা ক্রোফও খুন ক'রে থাকতে পারে। তারও সব সুযোগ ছিলো। অধ্যাপক চ'লে যাবার আগে কিংবা পরে, যখন ইচ্ছে সে খুন ক'রে থাকতে পাবে। পোখ-এর ব্রীফ-কেসে যে তাড়া-তাড়া নোট রয়েছে, তা তো সেও জানতো।

কিন্তু সব তদন্তের পরেও সরাইওলা ক্রোফের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। এমনও হ'তে পারে যে খুনের জন্য দায়ী আসলে উত্তর লিভোনিয়ার কুখ্যাত ও দুর্ধর্ষ ডাকাতেরা, যাদের ধরবার জন্য পুলিশ অনবরত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

সারাদিন এ-কথাই আলোচনা করছিলেন কর্নেল রাগুয়েনোফ ও মেজর ফেরডের। 'দ্যাখো মেজর, তোমরা যে বলছো, নিকোলেফ তার ঘরের জানলা দিয়ে ঢুকেছিলো, সেটা নিছকই অনুমান ব'লে বোধ হচ্ছে আমার।'

'কিন্তু ঐ দাগগুলো...'

'দাগগুলো?...সেগুলো টাটকা দাগ কি না কে জানে! তা তো আর নির্ভুল ক'রে প্রমাণ করা যায়নি। সরাইটা একেবারে বড়ো রাস্তার উপরে। সে-রাতে বা অন্য কখনো কোনো চোর যে জানলা দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করেনি, তা-ই বা কে বলতে পারে।'

'একটা কথা মনে রাখবেন, কর্নেল। আততায়ী যে-ই হোক না কেন, সে জানতো পোখ-এর ঘরে মূল্যবান কিছু আছে। এবং নিকোলেফের এ-তথ্য অজ্ঞাত ছিলো না।'

'সে তো ক্রোফও জানতো। জানতো ব্রোক্স। রাস্তায়-ঘাটে সহিসরাই কি তা জানতো না? পোখ যে-রকম বাক্যিবাগীশ তাতে দেশশুদ্ধু লোক এ-কথা জানতো ব'লে মনে হয়। সরাইতে যে চাষী বা কাঠুরেরা ছিলো, তারাও এমনকী চট ক'রে টের পেয়ে গিয়েছিলো যে পোখ-ওর ব্রীফ-কেসে প্রচুর টাকা আছে।'

কাজেই আলোচনা ক'রে কোনো সুরাহা হবার জো ছিলো না। প্রমাণ চাই—নির্জল, অকাট্য, শক্ত প্রমাণ। কিন্তু সব তর্কবিতর্ক সত্ত্বেও মেজর ফেরডেরের বদ্ধমূল ধারণা যে নিকোলেফই খুনী—আর-কিছুই তিনি মানতে চান না।

'তাহ'লে,' কর্নেল রাগুয়েনোফ বললেন, 'শেষ পর্যন্ত এ-কথা বলতেই হয় যে আলেমানরা চিরকালই আলেমান।'

'সেই অর্থে স্লাভও চিরকালই স্লাভ থেকে যায়।'

'দেখা যাক, কেরস্টোফ তদন্ত ক'রে কী বার করতে পারেন। তাঁর গোয়েন্দাগিরির উপরেই এখন সব নির্ভর করছে।'

+

কেরস্টোফ কিন্তু চুপচাপ হাত গুটিয়ে ব'সে ছিলেন না। এই হত্যারহস্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সেইজন্যই তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে তদন্ত চালাচ্ছিলেন। সাক্ষীশাবুদ ডাকা, জের করা, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব জানবার চেষ্টা করা—কিছুই বাদ যাচ্ছিলো না। সহিসদের তিনি জেরা করলেন, জেরা করলেন কাঠুরে ও চাষীদের—সেদিন যারা ঐ সরাইতে উপস্থিত ছিলো। ব্রোক্সকে অনেকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হ'লো। কিন্তু ব্রোক্স সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে। দুর্ঘটনার পর সে কোচবাক্সের সহিস ও গাড়োয়ানদের নিয়ে সোজা

গিয়েছিলো পেরনাউ; মাঝখানে একটা সরকারি আস্তাবলে সে যে রাত কাটিয়েছিলো, এ-তথ্য অকাট্য, কেননা প্রচুর সাক্ষী ছিলো তার। কাজেই বাইরের কারু কাণ্ড ব'লে চালিয়ে দেবার জো ছিলো না এটাকে। রাস্তার চোরডাকাত কী ক'রে জানবে যে পোখ-এর কাছে টাকা আছে, তাছাড়া হঠাৎ তাকে সরাইখানায় রাত কাটাতে হচ্ছে—এবং রাত কাটাতে হচ্ছে ঐ ঘরটায়।

কাজেই সব সন্দেহ গিয়ে শেষ পর্যন্ত দুজনের উপরেই পড়ছে—সরাইওলা আর নিকোলেফ। সন্দেহ নেই যে এদের দুজনের একজনই খুনী। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই ক্রোফ ছিলো নজরবন্দী—সবসময় গুপ্তচরের চোখে-চোখে। বহুবার তাকে জেরা করলেন কেরস্টোফ—অনেকক্ষণ ধ'রে তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হ'লো—যদি অতর্কিতে কিছু বেফাঁস ব'লে ফেলে তো চেপে ধরা হবে। কিন্তু তার আচরণে, কথায়-বার্তায় সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেলো না।

+

চব্বিশে এপ্রিল জাঁ চ'লে গেলো ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ে। আপাতত অন্তত খুনীর ছেলে ব'লে কেউ তাকে নিগ্রহ করবে না। সে গিয়ে পৌঁছুতেই তার বন্ধুরা তাকে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে স্বাগত জানালে—সবচেয়ে উল্লাস প্রকাশ করলে অবিশ্যি গোসপোদিন। কিন্তু বিপক্ষদল তখনও ঠাণ্ডা হয়নি। তারা কেবল গোল বাধাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো—বোঝা গেলো যে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড না-হ'য়ে বুঝি যায় না।

কাণ্ডটা ঘটলো পরের দিনেই। জাঁ যখন কার্ল-এর কাছে গিয়ে দাবি করলে যে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে, তখন ছোকরা ইয়োহাউজেন আরো উদ্ধতভাবে তাকে অপমান ক'রে কথা বললে। সঙ্গে-সঙ্গে জাঁ তার গালে চড় কষিয়ে দিলে। ফল হ'লো দ্বন্দ্বযুদ্ধ। এবং তাতে কার্ল ইয়োহাউজেন বিষমভাবে আহত হ'লো।

এ-খবর যখন রিগা পৌঁছলো, তখন যেন আগুনে ঘি পড়লো। হের ও ফ্রাউ ইয়োহাউজেন তক্ষুনি ছেলের শুশ্রূষার জন্য ডোরপাট রওনা হ'য়ে গেলেন। বোঝা গেলো, অচিরেই স্লাভে-জর্মানে ভীষণ দাঙ্গা আসন্ন।

দাঙ্গা বাধার আগেই অবিশ্যি সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে বার্তা এলো। ভ্লাদিমির ইয়োনোফকে জার ক্ষমা করেছেন—তার নির্বাসনকে মকুব করা হয়েছে, আর তাকে সাইবেরিয়ায় ফিরে যেতে হবে না। তাকে ছেড়ে দেবার জন্য আদেশ হ'লো। সবাই মোটামুটি আগেই আন্দাজ করেছিলো যে জারের নির্দেশ এ-রকমই হবে। কেননা ভ্লাদিমির ইয়ানোফের ঘটনাটার কথা সারা দেশে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, তাকে আবার সাজা দিলে তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হয়তো আর শামলানো যেতো না।

১৩

আবার জেরা

ভ্লাদিমির ইয়ানোফকে যে ক্ষমা করা হ'লো তার প্রতিক্রিয়া হ'লো বিপুল—শুধু রিগায় নয়, সমগ্র বলটিক রাজ্যগুলিতেই, সরকার যে এখন জর্মান-বিরোধী প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতে চাচ্ছেন, এই নির্দেশে তারও ইঙ্গিত পাওয়া গেলো। শ্রমিকশ্রেণী, সাধারণ মানুষ এতে খুবই খুশি, শুধু ক্ষুব্ধ হ'লো জমিদারেরা, বণিকসম্প্রদায় ও মধ্যবিত্তরা। তাদের মনে হ'লো এই নির্দেশের মধ্য দিয়ে শুধু ভ্লাদিমিরকেই নয়, দিমিত্রি নিকোলেফকেও দয়া দেখানো হয়েছে। কিন্তু, এটা ঠিকই যে ভ্লাদিমির যেভাবে দিমিত্রিকে বাঁচাবার জন্য জীবন বিপন্ন ক'রে নিজে থেকেই এসে ধরা দিয়েছিলো, তাতে তাকে ক্ষমা না-ক'রে কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে অধ্যপক নিকোলেফকে সন্দেহ করার জন্যও কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ উহ্য আছে —এতদিন তিনি ছিলেন দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও সম্মানযোগ্য নাগরিক, আগামী নির্বাচনে তিনি স্লাভদলের হ'য়ে দাঁড়াবেন ব'লে স্থির; এই অবস্থায় কোনো প্রমাণ ছাড়াই শুধু সন্দেহের উপর ভিত্তি ক'রে তাঁকে লাঞ্ছিত করা সেণ্ট পির্টার্সবুর্গ খুব-একটা সুনজরে দ্যাখেনি।

অন্তত জারের বদান্যতার এই অর্থই করলেন রাজ্যপাল জেনারেল গোরকো। এবং তাঁর মতামত তিনি অধস্তন কর্মচারীদের কাছে চেপে রাখলেন না। ভ্লাদিমির ইয়ানোফকে মুক্ত ক'রে দেয়া হ'লো; সে ফিরে গেলো নিকোলেফ-ভবনে । একটু পরেই এলেন পারিবারিক বন্ধুরা : ডাক্তার হামিনে ও মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ। ভ্লাদিমিরের মুক্তিতে সবাই খুব খুশি।

বিকেলে চায়ের বৈঠক ব'সেই ঠিক হ'লো ইল্‌কা ও ভ্লাদিমিরের বিয়েটা এবারে হ'য়ে যাওয়া উচিত । বিয়ের দিন ঠিক হ'লো ছ-সপ্তাহ পরে। মধ্যবর্তী সময়টা ভ্লাদিমির নিকোলেফ-ভবনেই থাকবে নিচের তলায় একটা ঘরে।

+

নিকোলেফ-ভবনে যখন স্বপ্নেরও অতীত আনন্দের হাট বসেছে, ইয়োহাউজেন পরিবারে তখন কিন্তু অবস্থাটা ঠিক তার উলটো। তার কারণ এই নয় যে, কার্ল-এর দশা শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে—বরং চিকিৎসক জানিয়েছেন যে সময় ও শুশ্রূষা পেলে কার্ল সেরে উঠবে—জখম যদিও গুরুতর, তবু প্রাণের ভয় নেই। আসলে ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের দুঃখের কারণ অন্যত্র। ভেবেছিলেন, অধ্যপক নিকোলেফকে বুঝি তিনি শাবাড় ক'রে এনেছেন, কিন্তু এখন দেখতে পেলেন ঘটনার গতি অন্য খাতে বইছে। এখন কেবল তাঁর হাতে আছে শেষ অস্ত্র—দেনার দায়ে শত্রুকে কোণঠাশা করা ছাড়া এখন আর নিকোলেফের ক্ষতি করার কোনো উপায় তাঁর হাতে নেই। এই ঋণপত্রই তাঁর তুরুপের তাস। কিন্তু এই রঙের টেক্কাটিকে সহজে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন না তিনি, কেননা তার ফলে তাঁর সম্বন্ধে লোকের মনোভাব বিরূপ হ'য়ে উঠবে— বিশেষত এখন যখন লোকের সহানুভূতি নিকোলেফের প্রতি। খুনের ব্যাপারটায় জনমত এখন স্পষ্টতই ক্রোফ-এর বিপক্ষে : সকলেরই এখন ধারণা যে সরাইওলাই সে-

রাত্রে পোখকে সুযোগ পেয়ে খুন করেছিলো। ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের মনস্তাপের কারণ এখন এই জনমত।

+

সত্যি, জনমতের চাপটা এমনি প্রবল হ'য়ে উঠলো যে কর্তৃপক্ষকে আবার নতুন ক'রে তদন্তের ব্যবস্থা করতে হ'লো : আবার যেতে হ'লো সেই ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায়। ৫ই মে কেরস্টোফ নিজে গেলেন সেখানে তদন্তে, সঙ্গে গেলেন মেজর ফেরডের ও সার্জেণ্ট য়েক।

ক্রোফ, দেখা গেলো, তাঁদেরই প্রত্যাশা করছিলো। হঠাৎ এই সমাগম দেখে সে কিন্তু মোটেই অবাক হয়নি। সে শুধু বললে, 'বুঝতে পারছি, কেউ-একজন আমার ঘাড়েই দোষ চাপাবার চেষ্টা করছে; তবে আশা করছি, আপনারা যাবার আগেই বুঝতে পারবেন যে আমি নির্দোষ।'

'দেখা যাক,' উত্তরে ছোট্ট ক'রে বললেন কেরস্টোফ।

আবার সব তন্নতন্ন ক'রে দেখা হ'লো ; দেখা হ'লো বাগান, বাগানের চালাঘর, প্রত্যেক গাছের তলা, ঝোপের ধার, শব্জিখেত। ক্রোফ যদি চুরি করে থাকে, তাহ'লে নিশ্চয়ই চোরাই টাকা সে কোথাও মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছে—সুতরাং এ-বিষয়টায় নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত।

কিন্তু সব খোঁজাখুঁজিই নিস্ফল হ'লো। আর টাকা? ক্রোফের সিন্দুকে দেখা হ'লো সবশুদ্ধ শ খানেক রুব্‌ল আছে—তাদের কোনোটিই নম্বরি নোট নয়।

সব দেখে মেজর ফেরডের একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন কেরস্টোফকে : 'মঁসিয় কেরস্টোফ, এটা ভুলবেন না যে, খুনের পর থেকে ক্রোফ কক্‌খনো একা কোথাও যায়নি —ওর পেছনে সবসময় পুলিশের লোক ছিলো।' মেজর ফেরডেরের এখনও বদ্ধমূল ধারণা, নিকোলেফই খুনী—কাজেই ক্রোফের এখানে তত্ত্বতালাশ করা সবই পণ্ডশ্রম।

কেরস্টোফ বললেন, 'তা আমি জানি। কিন্তু নিকোলেফ সে-রাত্রে সরাই থেকে চ'লে যাবার পর পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত ক্রোফ কয়েক ঘণ্টা সময় পেয়েছিলো। চোরাই টাকা লুকোবার পক্ষে সেই সময়টুকুই যথেষ্ট।'

'কিন্তু এখন তো দেখতেই পেলেন ওকে জড়াবার মতো সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।'

'এখন পর্যন্ত কিছু পাইনি—তা সত্যি। কিন্তু এখনও তো আমাদের অনুসন্ধান শেষ হয়নি। ঘর দুটোর চাবি তো আপনার কাছে আছে, তাই না?'

মেজর ফেরডের চাবি দুটো বার করলেন : সেই দুটি ঘরের চাবি, যার একটায় ছিলো পোখ, অন্যটায় দিমিত্রি নিকোলেফ, পোখ যে-ঘরটায় খুন হয়েছিলো সে-ঘরটাই প্রথমে খোলা হ'লো।

প্রথমবার সরেজমিন তদন্ত করে যাবার সময় পুলিশ ঘরটাকে যেমন রেখে গিয়েছিলো, ঠিক তেমনি আছে ঘরটি। বাইরে থেকে কেউ যে খড়খড়ি খুলে ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করেনি, পরীক্ষা ক'রে দেখে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেলো। তেমনি প'ড়ে আছে বিছানা—এলোমেলো ; বালিশে রক্তের দাগ, দরজা অব্দি মেঝে লাল রঙে ছোপানো! নতুন কোনো সূত্রই পাওয়া গেলো না : খুনী—সে যেই হোক না কেন—পিছনে কোনো সূত্রই রেখে যায়নি।

'চলুন তবে অন্য ঘরটায়,' কেরস্টোফ বললেন।

প্রথমেই দরজাটা তন্নতন্ন ক'রে দেখা হলো : কবাটের বাইরের দিকে সন্দেহজনক কোনো দাগ নেই। তাছাড়া গত দশদিনে কেউ যে ও-ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করেনি, পাহারা-পুলিশ তা হলফ ক'রে বললে—তারা কক্‌খনে ও-জায়গা ছেড়ে নড়েনি গত দশদিনে। ঘরটার মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

সার্জেন্ট য়েক গিয়ে জানলা খুলে দিলে, যাতে ঘরে আলো আসে। না, গতবার যেমন রেখে যাওয়া হয়েছিলো তেমনি আছে ঘরটা—কোনো বদলের কোনো চিহ্ন নেই। নিকোলেফ যে-বিছানায় শুয়েছিলেন, তার শিয়রের কাছে একটা টেবিলে বাতিদানে একটা আধপোড়া মোম প'ড়ে আছে। এক কোনায় একটা চেয়ার, অন্য ধারে একটা টুল। ডানপাশে একটা বন্ধ দেরাজ। চুল্লির উপরে, কিংবা বলা যায় দুটো চ্যাপ্টা পাথরে বসানো কাজ চালানো গোছের চুল্লির উপরে চিমনি বসানো—তার তলার দিকটা সুপরিসর, ছাতের দিকটা ক্রমশ সরু হ'য়ে গেছে। বিছানাটা দেখা হলো তন্নতন্ন করে—না, সন্দেহজনক কিছু নেই। দেরাজ খুলে দেখা হ'লো—সেটা ফাঁকা প'ড়ে আছে— কাপড়চোপড় বা কাগজপত্র কিছুই নেই।

চুল্লির পাশেই পড়েছিলো কয়লা খোঁচাবার লম্বাটে হাতুড়িটা— খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হ'লো সেটাকে। এর মুখটা বাঁকা, দোমড়ানো গোছের, কাজেই খড়খড়ি তুলে হাতুড়িটা ভিতরে ঢুকিয়ে চাপ দিলে জানলা খুলতে দুঃসাধ্য হবার কথা নয়। কিন্তু খিলগুলো এত পুরোনো ও জীর্ণ যে ছোট্ট একটা কঞ্চি ঢুকিয়ে চাপ দিলেই নিশ্চয় ভেঙে যাবে। আর জানলার গোবরাটে যে-দাগগুলো, তা যে জানলা বেয়ে ভিতরে ঢোকবার সময়ে সৃষ্টি হয়েছে, তা কি হলফ ক'রে বলা যায়? অন্য-কোনো কারণেও গোবরাটে ও-দাগ হতে পারে।

চুল্লির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন কেরস্টোফ। 'সে-রাত্তিরে যাত্রীটি কি আগুন জ্বালিয়েছিলো?' জিগেশ করলেন তিনি ক্রোফকে।

'না,' সরাইওলা উত্তর দিলে।

'কিন্তু এই-যে ছাই প'ড়ে আছে? এগুলো কি প্রথমবার তদন্তের সময় পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছিলো?'

মেজর ফেরডের বললেন, 'মনে তো হয় না।'

'তাহ'লে এখন পরীক্ষা ক'রে দেখুন।'

সার্জেন্ট নিভন্ত চুল্লিটার উপর ঝুকে পড়লো। বাঁদিকে দেখতে পেলে একটা কাগজের টুকরো—পোড়া কাগজের টুকরো, ছাই-ভস্মের মধ্যে পড়ে আছে।

পোড়া কাগজটা তুলে দেখবামাত্র সবাই চমকে গেলেন : একটা ব্যাঙ্কনোটের টুকরো। হ্যাঁ, একশো রুবলের একটা নোট—নম্বরের জায়গাটা পুড়ে গিয়েছে, বোধহয় টেবিলের ঐ জ্বলন্ত মোমবাতির শিখায় কোনোভাবে পুড়ে গিয়েছে। আরো সাংঘাতিক : রক্তের ছিটে লেগে আছে নোটটায়। খুনীর হাতে রক্ত ছিলো নিশ্চয়ই, রক্তমাখা হাতে ধরেছিলো ব'লেই রক্তের দাগ লেগেছিলো নোটটায় আর রক্ত লেগেছে ব'লেই নিশ্চয়ই নোটটাকে সে পোড়াতে চাচ্ছিলো।

আর পোখ-এর ব্রীফ-কেস ছাড়া আর কোত্থেকেই বা আসতে পারে নোটটা। কিন্তু পুরো নোটটা পোড়েনি বলে এখন তার দাম একশো রুবলেরও অনেক বেশি—কেননা খুনীর বিরুদ্ধে

এটা প্রজ্বলন্ত প্রমাণ।

ক্রোফ আর নিজেকে শামলাতে পারলে না, ব'লে উঠলো, 'কী বলেছিলুম? এবার আমার নির্দোষিতায় আর সন্দেহ নেই তো আপনাদের?'

কেরস্টোফ প্রথমে তাঁর নোটবইয়ের কাগজের ভাঁজে সন্তর্পণে আধপোড়া নোটকে রাখলেন, তারপর শান্ত ধীর স্বরে বললেন, 'তদন্ত শেষ হয়েছে—চলুন, এবার যাই।'

+

পরদিন সকালবেলাতেই ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন এই নতুন তথ্যটি জানতে পেলেন। ব্যাঙ্কনোটের নম্বরের জায়গাটুকু পুড়ে গিয়েছিলো, তাই মিলিয়ে অবিশ্যি দেখা গেলো না, তবে সন্দেহ নেই যে নোটটা পোখ-এর ব্রীফ-কেসেই ছিলো নইলে ওখানে ঐ চুল্লিতে আর কী ক'রে আসবে।

খবর যেন পাখির মতো উড়াল দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই রিগার সব লোক এই সংবাদ শুনতে পেলে। নিকোলেফের শুভানুধ্যায়ীরা খবরটা শোনবামাত্র অভিভূত হ'য়ে গেলেন। বোঝাই যাচ্ছে যে তদন্তের এটা দ্বিতীয় ও বিষম পর্যায়। ইয়োহাউজেনরা অবিশ্যি খুবই আহ্লাদিত হ'য়ে উঠলেন : এবার আর নিকোলেফের গ্রেফতার ঠেকায় কে? একবার জুরিদের সামনে দাঁড় করালেই এই নৃশংশ হত্যার সমুচিত শাস্তি তিনি পাবেন।

ভ্লাদিমিরকে খবরটা জানিয়েছিলেন ডাক্তার হামিনে। দুজনেই স্থির করেছিলেন যে নিকোলেফকে এ-সম্বন্ধে তাঁরা নিজে থেকে কিছু খুলে বলবেন না—শিগগিরই অন্য ও ভয়ংকর সূত্র থেকে খবরটা তিনি জেনে যাবেন। ভ্লাদিমির চেয়েছিলো ইল্‌কার কাছ থেকে গুজবটা লুকিয়ে রাখে। কিন্তু তা কি আর সম্ভব? ভ্লাদিমির বাড়িতে এসে দেখলে ইল্‌কা ব'সে আছে, গভীর শোকে আচ্ছন্ন। তাকে দেখেই বেচারি তীব্র অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠলো, 'বাবা কোনো দোষ করেননি, ভ্লাদিমির, বাবা নিরপরাধ!'

'কী আশ্চর্য! এটা কি আবার বলবার কথা নাকি? দিমিত্রি যে নিরপরাধ এটা আমরা সব্বাই জানি। আসল অপরাধীকে খুঁজে বার করতে হবে আমাদের—তাহ'লেই এ-সব গুজব আর রটবে না। আমার কিন্তু খুবই মনে হয় যে দিমিত্রিকে এই খুনের মামলায় জড়াবার পেছনে একটা-কোনো গভীর ষড়যন্ত্র আছে।'

খুব-যে একটা ভুল সন্দেহ করেছিলো ভ্লাদিমির, তা নয়। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র যে কী-রকম গভীর ও দূরস্পর্শী হ'তে পারে, তা সাইবেরিয়ায় কিছুকাল কাটিয়ে আসার পর তার চেয়ে ভালো ক'রে আর কে জানে। কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে ষড়যন্ত্রকারীরা যে-রকম আটঘাট বেঁধে নেমেছে তাতে দিমিত্রি না আইনের চোখে দোষী ব'লে প্রমাণিত হ'য়ে যান। ইল্‌কাকে সান্ত্বনা দিলেও ভ্লাদিমির নিজে কিন্তু একফোঁটাও স্বস্তি পাচ্ছিলো না—পুলিশের হাতের এই নতুন সূত্রটিকে তার মনে হচ্ছিলো এই সাজানো মামলার বিরুদ্ধ পক্ষের তুরুপের তাস।

+

বিকেলবেলাতেই এত্তেলা এলো ম্যাজিস্ট্রেটের : নিকোলেফ যেন অবিলম্বে কেরস্টোফের আপিশে গিয়ে হাজির হন। ভ্লাদিমির সঙ্গে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু দিমিত্রি তক্ষুনি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে দিলেন।

কেরস্টোফ নিজে কিঞ্চিৎ বিচলিত ছিলেন—এটা তিনি কিছুতেই ভাবতে পারছিলেন

না যে দিমিত্রির দ্বারা এই খুন সম্ভব। অথচ যেভাবে প্রমাণ জড়ো হচ্ছে, তাতে দিমিত্রিকে তিনি গ্রেপ্তার করবেন কিনা শিগগিরই সে-সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

নিকোলেফকে দেখে প্রথমে তাঁকে বসতে বললেন তিনি, তারপর বললেন, 'মঁসিয় নিকোলেফ, কাল আমরা সরাইখানাটায় সরেজমিন তদন্তে গিয়েছিলুম—আমি নিজে উপস্থিত ছিলুম তদন্তের সময়। পুলিশ পুরো বাড়িটা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেছে। নতুন-কোনো সূত্রই পাওয়া যায়নি, তবে আপনি যে-ঘরটায় রাত কাটিয়েছিলেন, সেই ঘরে এই জিনিশটা পাওয়া গেছে।' ব'লে তিনি আধপোড়া ব্যাঙ্কনোটটা বাড়িয়ে দিলেন অধ্যাপকের দিকে।

'কী কাগজ এটা?'

'একটা ব্যাঙ্কনোটের টুকরো—নোটটা পুড়িয়ে চুল্লিতে ফেলে দেয়া হয়েছিলো।'

'পোখ-এর ব্রীফ-কেসের ব্যাঙ্কনোটের একটা?'

'সম্ভবত। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মঁসিয় নিকোলেফ, এটা আপনার বিরুদ্ধে একটা অকাট্য প্রমাণ হিশেবে...'

'আমার বিরুদ্ধে?' অধ্যাপকের গলার স্বর বিদ্রূপে ভ'রে উঠলো। 'তাহ'লে আমার উপর থেকে আপনাদের সন্দেহ যায়নি এখনো? ভ্লাদিমির ইয়ানোফের বিবৃতি সত্ত্বেও আপনাদের এখনো ধারণা যে আমিই খুন করেছি!'

উত্তর দেবার আগে কেরস্টোফ একটু ইতস্তত করলেন। এই অধ্যাপকের উপর পর-পর অনেক ঝড় গেছে, তার জের শামলাতে না-শামলাতেই আবার এই নতুন ও ভয়ংকর প্রমাণ!

নিকোলেফ বললেন, 'আমি যে-ঘরটায় রাত কাটিয়েছিলুম সে ঘরের চুল্লিতে নোটটা পাওয়া গেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, মঁসিয় নিকোলেফ।'

'ধর্মাধিকরণ প্রথম সেখানে পদার্পণ করার পর থেকে ঘরটা বন্ধ ছিলো।'

'হ্যাঁ, তালা লাগানো ছিলো। দরজাটা যে এর মধ্যে খোলা হয়নি, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

'ফলে কারু পক্ষেই এর মধ্যে সে-ঘরে ঢোকা সম্ভব ছিলো না?'

'না, কারু পক্ষেই ছিলো না।'

ভূমিকাগুলো যেন পালটে গেছে—নিকোলেফ জেরা করছেন, কেরস্টোফ উত্তর দিচ্ছেন। কিন্তু কেরস্টোফ ভেবে দেখলেন, জিজ্ঞাসাবাদের কাজটা যেভাবে এগুচ্ছে, তা আসলে তাঁকে অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্ন করার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেবে। তাই তিনি কোনো রকম দ্বিধা না-ক'রেই নিকোলেফের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

নোটটাকে খুঁটিয়ে দেখে নিকোলেফ বললেন, 'রক্তমাখা নোট, অথচ পুরোটা পোড়েনি। কী বললেন, চুল্লির ছাইয়ের মধ্যে প'ড়ে ছিলো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহ'লে প্রথমবার তদন্তের সময় এটা সকলের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিলো কেমন ক'রে?'

'সত্যি কথা বলবো? আমি তা জানি না। ব্যাপারটা আমাকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু নিশ্চয়ই চুল্লিতেই প'ড়েছিলো নোটটা—কারণ পরে তো কারু পক্ষে ও-ঘরে ঢোকা সম্ভব ছিলো না।'

একটু ব্যঙ্গের স্বরে নিকোলেফ বললেন, 'আমিও আপনার চেয়ে কম স্তম্ভিত হচ্ছি না। তবে আমার বোধহয় খুব ঘাবড়ে যাওয়া উচিত—কারণ আপনাদের অনুমান নিশ্চয়ই এ-রকম যে, আমিই নোটটাকে পুড়িয়ে চুল্লিতে ছুঁড়ে ফেলেছিলুম।'

'তা ঠিক।'

'তাহ'লে,' নিকোলেফ ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'তো এই দাঁড়ায় যে, নোটটা যেহেতু পোখ-এর বাণ্ডিলের একটা, পোখ-এর ব্রীফ-কেস থেকেই যেহেতু তার হত্যার পর এটা চুরি করা হয়েছে, অতএব সে-রাতে ও-ঘরে যে-লোকটা রাত কাটিয়েছিলো সে-লোকটাই চোর আর খুনী—'

কেরস্টোফ আগাগোড়া লক্ষ করছিলেন নিকোলেফকে। 'এ-সম্বন্ধে কারু সংশয় থাকতে পারে কি?'

'না, তা থাকবে কী ক'রে? কী রকম অকাট্য পারম্পর্য, লক্ষ্য করেছেন? একটা শেকলের অংশ—সিদ্ধান্তও চমৎকার। কিন্তু আপনাদেরই যুক্তির ধরনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আরেকটা সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছোনো যায়।'

'বলুন।'

'রাত চারটে নাগাদ সে-রাতে আমি সরাইখানাটা ত্যাগ করি। প্রশ্ন হ'লো, খুনটা কি হ'য়ে গিয়েছিলো ততক্ষণে? আমি যদি খুনী হই, তাহ'লে হয়েছিলো নিশ্চয়ই—আর আমি খুনী না-হ'লে হয়নি। যাকগে, এটা আসলে আমাদের আলোচ্য না। কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে যে আমি চ'লে যাবার পর আততায়ী খুব ভেবেচিন্তে সব সন্দেহ পোখ-এর সহযাত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্য সব-কিছু সাজাতে পারতো। সে কি যেতে পারতো না আমার ঘরে, হাতুড়িটা সঙ্গে নিয়ে? সে কি নোটটা ইচ্ছে ক'রে আদ্ধেক পুড়িয়ে নেভানো চুল্লিতে রেখে দিতে পারতো না? সে কি জানলার গোবরাটে আঁচড় কাটতে পারতো না?'

'আপনি যা বলছেন, মঁসিয় নিকোলেফ, তা থেকে মনে হয় আপনি সরাইওলা ক্রোফকে অভিযুক্ত করছেন।'

'ক্রোফ, কিংবা অন্য-কেউ। তাছাড়া, খুনী কে, সেটা ধ'রে দেবার দায় আমার নয়। আমার কাজ হ'লো নিজেকে বাঁচানো—সব যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা।'

কেরস্টোফ, সত্যি, একটু বিমূঢ় বোধ করছিলেন। নিকোলেফের কথায় সত্যিই যুক্তি যথেষ্ট। তাছাড়া তাঁর মতো মানী লোক, সৎ লোক, গোটা রিগা যাঁকে এতকাল সততার জন্য সম্মান করেছে, তাঁকে তিনি কিছুতেই খুনী ব'লে ভাবতে পারছিলেন না। কিন্তু এটাও তো সত্যি যে তদন্তে ক্রোফ-এর বিরুদ্ধে কোনো তথ্যই পাওয়া যায়নি—কিছু না।

আরো এক ঘণ্টা ধ'রে কথাবার্তা হ'লো দুজনে। কেরস্টোফ নিকোলেফকে এটাও বললেন যে ক্রোফকে সন্দেহ করবার মতো কোনো সূত্র বা প্রমাণ পুলিশের হাতে নেই। কিন্তু ঘটনার পরম্পরা তার প্রতিও বিরূপ।

তখন নিকোলেফ সোজাসুজি বললেন, 'সূত্রগুলো কার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করছে, সেটা

নির্ধারণ করার যাচাই করার দায় আপনাদের। কেউ যদি খোলা মন নিয়ে ব্যাপারটার দিকে তাকায়, তাহ'লে আমাকে খুনী ব'লে সন্দেহ করবে না। আপনি তো এখন জানেন আগে কেন আমি যাত্রার উদ্দেশ্য ও গন্তব্য গোপন রাখতে চাচ্ছিলুম। এখন যখন ভ্লাদিমির ইয়ানোফ নিজেই প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়েছে, তখন আমার সম্বন্ধে আগে যাও-বা সন্দেহ ছিলো তা নিশ্চয়ই কেটে গিয়েছে। কে খুন করেছে—সরাইওলা, না বাইরের কেউ, সেটা বার করার দায়িত্ব পুলিশের। কিন্তু আমার এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে ক্রোফই খুনী। পোখ যে রেফেল যাচ্ছে ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে, এটা সে জানতো—এও জানতো যে টাকার অঙ্ক নেহাৎ কম নয়। আমি যে রাত চারটেতে সরাই ছেড়ে চ'লে যাবো তাও সে জানতো। কত সুবিধে তার—খুনটা ক'রে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলেই চলবে। কখন খুন করেছিলো, আমি সরাই ছেড়ে চ'লে যাবার আগে না পরে, তা জানি না। কিন্তু আমি চ'লে যাবার পর আমি যে-ঘরে রাত কাটিয়েছিলুম, সে-ঘরে ঢুকে আমার বিরুদ্ধে সূত্র ছড়াতে প্রমাণ সাজাতে কতক্ষণই বা তার লেগেছিলো। সব সত্ত্বেও তবু যদি আপনাদের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে আমিই খুনী, বেশ, তবে জুরির সামনে দাঁড় করান আমাকে—সর্বসমক্ষে ক্রোফকে অভিযুক্ত করবো আমি—সবাই বিশ্লেষণ ক'রে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, কে খুনী—আমি, না ক্রোফ।'

নিকোলেফ মোটেই উত্তেজিত হননি। ঠাণ্ডাভাবে, বৈজ্ঞানিক তথ্য বলবার ভঙ্গিতে, সব কথা বলছিলেন। মামলাটার নিস্পত্তি ক'রে ফেলেছেন, এ নিয়ে আর উত্তেজিত হবার কিছু নেই, ভঙ্গিটা ছিলো এ-রকম। কেরস্টোফ সব শুনলেন চুপচাপ, কিছু বললেন না। শেষটায় নিকোলেফ জিগেশ করলেন, 'আপনি কি আমার গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় সই করবেন?'

উত্তরে কেরস্টোফ শুধু বললেন, 'না, দিমিত্রি নিকোলেফ।'

১৪

আঘাতের পর আঘাত

খুনী কে—ক্রোফ, না অধ্যাপক দিমিত্রি নিকোলেফ—এই প্রশ্নটিকে ঘিরেই লোকের মুখে-মুখে কথা ফিরতে লাগলো। প্রথম থেকেই এই খুনের খবরটা বিপুলভাবে প্রচারিত হচ্ছিলো, নানা রকম রাজনৈতিক স্বার্থ জড়ানো ছিলো ব'লে বোধহয় এত তার প্রচার—কিন্তু জটিলঝুরি রহস্য, জটের পর জট পাকিয়ে গেছে, এমন-একটা খুনও সচরাচর হয় না—তাই গোটা বলটিক প্রদেশে এই নিয়ে হৈ-চৈ উঠলো, তুলকালাম কাণ্ড একেবারে। ক্রোফের দেহে জর্মান রক্ত, নিকোলেফ স্লাভ—কাজেই দুটো বিরুদ্ধ দল তৈরি হ'য়ে গেলো চটপট, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সর্বনেশে পূর্বাভাস যেন। এদিকে রাজ্যপালের দশাও ক্রমে করুণ হ'য়ে উঠছে। পৌরনির্বাচন আসন্ন—স্লাভরা এখন অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের বিরুদ্ধে দিমিত্রি নিকোলেফকে নির্বাচনে দাঁড় করাবার জন্য তোড়জোড় শুরু ক'রে দিয়েছে। আর ধনকুবের ইয়োহাউজেনরাও সবান্ধবে দিমিত্রির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় মুখর। টাকা আছে তাদের, আছে

প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা, খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত তাদেরই হাতধরা। কাজেই শেষ পর্যন্ত রব উঠলো : অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে দিমিত্রিকে—ও-রকম একটি নৃশংস খুনীকে এভাবে ছেড়ে রাখা চলবে না।

আর এই ডামাডোলের মধ্যেই কেটে গেলো সাত দিন।

এদিকে ইয়োহাউজেনদের কাছে দিমিত্রির দেনার টাকা ফেরৎ দেবার শেষদিন এগিয়ে এলো—পরের দিন চোদ্দই; সেদিন যদি আঠারো হাজার রুবল না-নিয়ে তিনি ইয়োহাউজেন ব্রাদার্স-এর আপিশে হাজির হ'তে না-পারেন, তাহ'লে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে আদালতে। অথচ আজও তিনি টাকাটা জোগাড় করতে পারেননি। প্রায় সাত হাজার রুবল তিনি জমা দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে, ভেবেছিলেন বাকি টাকাটা জমা দেবার মেয়াদ একটু বাড়িয়ে দেওয়া হবে—কিন্তু এখন সব যেতে বসেছে তাঁর, মান-সম্ভ্রম, সব—এখন দেউলে ব'লে ঘোষিত না-হ'য়ে তাঁর কোনো উপায় নেই।

আর ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন এটাই চাচ্ছিলেন। হয় দিমিত্রি পুরো টাকাটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জমা দেবেন, নয় দেউলে হ'য়ে পৌর অধিকার সব হারিয়ে বসবেন—এর মাঝামাঝি কোনো মিটমাটের মধ্যে তিনি যাবেন না। গোড়ায় ভেবেছিলেন খুনের মামলাটায় বুঝি কোণঠাশা ক'রে এনেছেন দিমিত্রিকে, কিন্তু এখন যখন দেখলেন যে খুনের রহস্যের কোনো কিনারাই হ'লো না, তখন আস্তিন থেকে বার করলেন তাঁর তুরুপের তাস—এই বিপুল ঋণ। কোনো টাকাই তো নেই দিমিত্রির—এ-তথ্য গোপনে সন্ধান নিয়ে নির্ভুল জেনে নিয়েছেন। যদি এখন তিনি টাকাটা জমা দিতে পারেন, তাহ'লে বুঝতে হবে যে চোরাই টাকা—এবং তাহ'লে উলটো দিক থেকে তাঁর গলায় ফাঁস এঁটে বসবে। না, এই স্লাভদের কোনো দয়া করা চলবে না। শোধ নিতেই হবে কার্ল-এর রক্তপাতের, তাছাড়া দিমিত্রিকে নির্বাচনেও দাঁড়াতে দেয়া হবে না।

পরের দিন সকালবেলাটা কেটে গেলো—ইয়োহাউজেন ব্রাদার্সদের খাতাঞ্চিখানায় দিমিত্রির আবির্ভাব ঘটলো না। বিকেলবেলা, চারটে নাগাদ, পরোয়ানা বার করা হ'লো খাতাঞ্চিখানা থেকে—সেদিন আঠারো হাজার রুবল জমা দিতে না-পারার জন্য পরোয়ানা।

পরোয়ানাটা গিয়ে পড়লো ভ্লাদিমির ইয়ানোফের হাতে। সে তখন ছিলো নিকোলেফ-ভবনে। আর তার ফলেই ভ্লাদিমির জানতে পেলো যে কীভাবে নিকোলেফ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তার বাবার এই বিপুল ঋণ। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে তার একটুও দেরি হ'লো না। তার বাবার মৃত্যুতে কী লোকশান হয়েছে দিমিত্রির, কী ভাবে মুচলেকা লিখে তিনি বন্ধুর ঋণ শোধ করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, সব সে জানতে পেলো। আর অমনি সে এটা বুঝলে যে এক্ষেত্রে তার কর্তব্য কী। মিখায়েল ইয়ানোফ কুড়ি হাজার রুবল গচ্ছিত রেখেছিলেন দিমিত্রির কাছে—ভ্লাদিমিরকে দেবার জন্য। সে-টাকাই তো তাকে পেরনাউতে পৌঁছে দিয়েছেন দিমিত্রি। সে-টাকা থেকে আঠরো হাজার রুবল নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো ইয়োহাউজেন ব্রাদাসদের খাতাঞ্চিখানার উদ্দেশে।

তখন পাঁচটা বাজে; খাতাঞ্চিখানা বন্ধ হবে ছটার সময়; হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে পড়লো ভ্লাদিমির। আর সময় নেই—খাতাঞ্চিখানা বন্ধ হবার আগে তাকে ওখানে গিয়ে পৌঁছুতেই হবে।

কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সে পৌঁছে গেলো; খাতাঞ্চির কাছে যেতেই তিনি তাঁকে ব্যাঙ্কের পরিচালকদের ঘর দেখিয়ে দিলেন। ইয়োহাউজেন ভাইরা নিজেরাই এ-মামলাটার তত্ত্বাবধান করছেন। দুজনেই ঘরে ছিলেন তখন। ভ্লাদিমিরের পাঠানো কার্ড দেখে একজন ব'লে উঠলেন: 'ভ্লাদিমির ইয়ানোফ! নিকোলেফের তরফ থেকে এসেছে দেখা করতে। নিশ্চয় আরো সময় চাইবে।'

'আর এক ঘণ্টাও সময় দেয়া হবে না,' নিষ্ঠুর গলায় ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন বললেন, 'কালকেই আমরা আইনের সাহায্য নেবো।'

ইয়ানোফকে ঘরে ডেকে পাঠানো হ'লো ।

ভ্লাদিমির ঘরে ঢুকেই খুব ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'দিমিত্রি নিকোলেফ আপনাদের কাছে কিছু টাকা ধারেন—আজকেই সে-টাকা শোধ দেবার কথা, আপনারা সেজন্য সমনও পাঠিয়েছেন।'

'তা পাঠিয়েছি।'

'সুদ সমেত টাকার অঙ্ক হচ্ছে আঠারো হাজার রুবল।'

'হ্যাঁ—কিন্তু আমরা আর সময় দিতে পারবো না—'

'সময় আপনাদের কাছে কে চেয়েছে?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে ভ্লাদিমির।

ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন বললেন, 'টাকাটা দুপুর বারোটার মধ্যে দেবার কথা ছিলো...'

'তা তো না। আজকের মধ্যে দেবার কথা ছিলো। আর এখনো তো ছটা বাজেনি। আজকের তারিখ তো শেষ হ'য়ে যায়নি এখনো—অন্তত আমার তো তাই ধারণা।'

বিদ্রূপের ভঙ্গিটা ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনকে রুষ্ট ক'রে তুললো।

'আঠারো হাজার রুবল নিয়ে এসেছেন আপনি?'

'এই যে আপনার টাকা,' ভ্লাদিমির ব্যাঙ্কেনোটের তাড়াটা বাড়িয়ে ধরলো, 'কই, নিকোলেফের মুচলেকাটা কই?'

ইয়োহাউজেনরা যেমন আশ্চর্য তেমনি রুষ্ট হ'য়ে উঠলেন। উত্তর দেবার মতো মেজাজ তাঁদের ছিলো না। এভাবে মুখের গ্রাস পালিয়ে যেতে দেখে তাঁদের পক্ষে তুষ্ট হওয়া অসম্ভব ছিলো। একটা দেরাজের মধ্যে থেকে ছোটো ইয়োহাউজেন গিয়ে মুচলেকাটা বার ক'রে আনলেন।

ভ্লাদিমির মুচলেকাটা পরীক্ষা ক'রে দেখলো ঠিক আছে। নোটের তাড়াটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'গুনে নিন।'

ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের মুখটা কাগজের মতো শাদা হ'য়ে গেছে। কাঁপা হাতে নোটের তাড়াটা তুলে নিয়ে গুনতে লাগলেন। ভ্লাদিমির ঘৃণাভরে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো।

হঠাৎ ফ্রাঙ্কের দুটি চোখ জ্ব'লে উঠলো। হিংস্র একটা আনন্দের ভাব ফুটে উঠলো তাঁর মুখে, 'মঁসিয় ইয়ানোফ, এই নোটগুলো চোরাই...'

'চোরাই!'

'হ্যাঁ। পোখ-এক ব্রীফ-কেস থেকে চুরি করা!'

'অসম্ভব ! পেরনাউতে দিমিত্রি নিকোলেফ আমাকে এ নোটগুলো দিয়েছিলেন। আমার বাবা ওর কাছে কিছু টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন, সেই টাকা....'

'বাস্! তাহ'লে তো সব বোঝাই গেলো! গচ্ছিত টাকাটা তছরুপ ক'রে ভদ্রলোক বিপাকে পড়েছিলেন—তারপর পোখকে খুন ক'রে ...'

ভ্লাদিমিরের গায়ে যেন শপাং পড়লো চাবুক।

'আমাদের খাতাঞ্চিখানায় চোরাই নোটগুলোর নম্বর আছে। এই দেখুন—' ব'লে টেবিলের টানা খুলে একটা কাগজ বার ক'রে দেখালেন ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন, তাতে খুদে-খুদে হরফে নোটের নম্বর টোকা।

ভ্লাদিমিরের মাথাটা যেন ঘুরে গেলো। ওর মাথা আর কাজ করছে না। ...সব গেলো, দিমিত্রির আর বাঁচবার আশা নেই। কিন্তু দিমিত্রি...দিমিত্রি নিকোলেফ...তাঁর পক্ষে কি এ-কাজ সম্ভব? এই নৃশংস ও পৈশাচিক রক্তপাত!

ছুটে বেরিয়ে এলো ভ্লাদিমির, সোজা রাস্তায়। পাগলের মতো ছুট লাগালো সে। তার বুকের মধ্যে রাগি ঝড় গজরাচ্ছে, মাথার মধ্যে ভোঁতা নিঃসাড় কষ্টের ভাব। নিকোলেফ নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করতে পারবেন সবকিছু—নিশ্চয়ই তিনি নির্দোষ—হ্যাঁ, নির্দোষ। নিকোলেফ নিরাপরাধ—তাঁর দ্বারা কোনো অপকর্ম সম্ভব নয়। কিন্তু...এই নোটগুলোই তো পেরনাউতে তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন নিকোলেফ। তবে কি...

বাড়িতে ঢুকে আর একমুহূর্ত দেরি করলো না ইয়োনোফ। সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে, অধ্যাপকের ঘরে—চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে সে হাঁপাচ্ছে, কিছু ভাবতে পারছে না।

দিমিত্রি নিকোলেফ টেবিলের কাছে ব'সে আছেন, শুকনো, বিষণ্ণ, জীর্ণ—দুই হাতে মাথা গুঁজে। পয়ের শব্দ শুনে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। 'কী ব্যাপার ভ্লাদিমির !'

'দিমিত্রি !' ভ্লাদিমিরের গলা কি-রকম আর্ত ও ভাঙা-ভাঙা। 'দিমিত্রি!' খুলে বলো আমাকে, সব খুলে বলো!...আমি কিছুই বুঝতে পারছি না...না না, তা সম্ভব নয়। বাঁচাও নিজেকে...খুলে বলো। ...আমি কি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি?'

'কিন্তু ব্যাপার কী ইয়ানোফ? আবার কি নতুন-কিছু ঘটলো? সাংঘাতিক কিছু? কী আমি খুলে বললো তোমাকে...'

'দিমিত্রি, এক ঘণ্টাও হয়নি, একটা সমন এসেছিলো তোমার নামে...'

'ইয়োহাউজেনদের সমন!...তা এখন তো তুমি জানো আমার দশা! ওদের টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই, আমি একেবারেই নিঃস্ব, দেউলে, কর্পদকশূন্য,...এখন ভেবে দ্যাখো আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে কি না...'

ইয়ানোফ তিক্তস্বরে বললে, 'দিমিত্রি, আমি তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলুম!'

'তুমি...'

'পেরনাউতে তুমি আমাকে যে-টাকা দিয়েছিলে সে-টাকা—ঠিক সেই নোটগুলো নিয়ে গিয়েছিলুম আমি খাতাঞ্চিখানায়...'

'তুমি গিয়েছিলে? কেন, ইয়ানোফ, কেন? মাত্র ঐ কটা টাকাই তো তোমার সম্বল—তোমার বাবা রেখে গিয়েছিলেন তোমার জন্য...ঐ টাকা কটা তুমি এভাবে নষ্ট করলে...'

'দিমিত্রি,' খুব নরমভাবে ভ্লাদিমির বললে, 'যে-নোটগুলো আমি ইয়োহাউজেনদের দিয়েছি, সেই নোটগুলো পোখ-এর ব্রীফ-কেস থেকে চুরি হয়েছিলো। ব্যাঙ্কের কাছে সব নম্বর আছে...'

'ব্যাঙ্কনোট!' যেন প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছেন, এমন আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন নিকোলেফ যে পুরো বাড়ি কেঁপে উঠলো।

ঠিক তক্ষুনি ঘরে এসে ঢুকলো ইল্‌কা আর জাঁ; দেখলো যে ভ্লাদিমির দাঁড়িয়ে আছে বিবর্ণ, দু-হাতে মুখ ঢেকে আর নিকোলেফ যেন প'ড়ে আছেন মাটিতে, হতচেতন, মূর্ছায় নীল।

কী ব্যাপার, কিছু জিগেশ না-ক'রেই ভাইবোনে ছুটে গেলো বাবার দিকে। তাঁকে ধ'রে বসালো তারা, আস্তে-আস্তে শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফেরালো তাঁর। আর জ্ঞান ফিরতেই ভাঙা ফিশফিশে গলায় নিকোলেফ বিড়বিড় ক'রে শুধু বললেন, 'চোরাই টাকা! চোরাই টাকা!'

'বাবা!' চেঁচিয়ে উঠলো ইল্‌কা, 'ব্যাপার কী...'

'ভ্লাদিমির,' অনুনয় ক'রে বললে জাঁ, 'কী হয়েছে বলো তো?'

কোনো রকমে উঠে দাঁড়লেন নিকোলেফ, ভ্লাদিমিরের কাছে গিয়ে ভাঙা গলায় বললেন, 'আমি তোমাকে যে-নোটগুলো দিয়েছিলুম, যে-নোটগুলো তুমি ইয়োহাউজেনদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে, সেই নোটগুলো পোখ-এর ব্রীফ-কেস থেকে চুরি গিয়েছিলো!'

'হ্যাঁ।'

'তাহ'লে আর আশা নেই আমার! সব শেষ...'

ছুটে বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে; উন্মাদের মতো, আর্তের মতো বেরিয়ে পড়লেন তিনি রাস্তায়, মুখে মরীয়া হতাশার ছাপ, চোখদুটো জলন্ত, কোটরে ঢোকা, গাল ভাঙা, চোয়াল বেরিয়ে আছে; আর ফ্যাঁশফেঁশে ছেড়া-ছেড়া গলায় শুধু বলছেন, 'সব শেষ...সব শেষ...'

+

রিগায় তখন রাত্রি নেমেছে, কালো অন্ধকারে ঢাকা সব। নিকোলেফকে দেখা গেছে শহরতলি দিয়ে টলতে-টলতে যেতে। ভ্লাদিমির দৌড়ে এসেছে পিছন পিছন, হতভম্ব ভাবটা কাটতেই; এসেছে ইল্‌কা আর জাঁ-ও। শহর ফেলে এলো তারা পিছনে। সামনে প'ড়ে আছে পেরনাউয়ের রাস্তা, ফাঁকা, অন্ধকার, থমথমে। কেউ কোনো কথা বলছে না...চুপচাপ এগুচ্ছে তিনজনে।

আরো কিছুদুর এগুতেই তারা লাশটা দেখতে পেলে।

প'ড়ে আছে দিমিত্রি নিকোলেফের মৃতদেহ, পাশে প'ড়ে রক্তরাঙা তীক্ষ্ণধার ছুরি...

জাঁ আর ইল্‌কা নুয়ে পড়লো বাবার মৃতদেহের উপরে। ইয়ানোফ গেলো কাছাকাছি বাড়িগুলো থেকে সাহায্য চাইতে। সাহায্যের চেষ্টা অর্থহীন। বেঁচে নেই নিকোলেফ। কিন্তু...

কয়েকজন চাষী স্ট্রেচার নিয়ে এলো। ধারাধরি ক'রে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হ'লো বাড়িতে। এলেন ডাক্তার হামিনে শুধু মৃত্যুর অব্যবহিত কারণটা লিখে দেবার জন্য।

ঠিক যেমনভাবে পোখ-এর হৃৎপিণ্ডে ছুরি ঢুকেছিলো, সজোর ও আমূল, নিকোলেফের হৃৎপিণ্ড ভেদ ক'রে তেমনি ঢুকেছে ছুরি।

যখন দেখলেন সব শেষ হ'য়ে গেছে, যখন দেখলেন কোথাও কোনো আশা নেই, তখন আত্মহত্যা ক'রেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন দিমিত্রি নিকোলেফ।

যেন কোনো রহস্য নাটকের মূক শেষ দৃশ্য, এইভাবে হতবাক, বিষণ্ণ ও স্তম্ভিত পাত্রপাত্রীরা কলের পুতুলের মতো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো।

১৫

কবরখানায়

অবশেষে এতদিনে তবে লিভোনিয়া রহস্যের উপরে যবনিকা পড়লো। কেবল তো খুনের মামলাই ছিলো না এটা, ছিলো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রবিন্দুও—ঝড়ের যেমন থাকে স্থিরকেন্দ্র, সেই রকম। স্লাভদের এই প্রতিনিধি যেহেতু এখন আত্মহত্যা করেছেন, আলেমানরা বলাই বাহুল্য এই নির্বাচনে জিতে যাবে। সাময়িক চাপা পড়বে দ্বন্দ্ব, কিন্তু তবু আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে দু-দলের ভিতরকার বিরোধিতা—সরকারি তত্ত্বাবধানেই হয়তো লিভোনিয়ার এই রুশীকরণ সম্পূর্ণ হবে।

দিমিত্রি নিকোলেফ কেবল আত্মহত্যাই করেননি; এই আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে এটাও প্রমাণ ক'রে দিয়ে গেছেন যে তিনিই চোর, তিনিই আততায়ী—যখন দেখতে পেলেন সব ফাঁস হ'য়ে গেছে, আর রেহাই নেই, তখন আত্মহত্যা না-ক'রে যে তাঁর কোনো উপায় ছিলো না।

অধ্যাপকের অন্ত্যেষ্টি হবার পর ইল্‌কা ও জাঁ বাড়ি ফিরলো। জাঁ বেচারির অবস্থা খুবই কাহিল, কী ক'রে সে গিয়ে মুখ দেখাবে ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ে? আর এখানে—এখানেও তিনজন ছাড়া তাদের কোনো বন্ধু নেই, সহায় নেই। তিনজন, মানে ভ্লাদিমির ইয়ানোফ, ডাক্তার হামিনে ও মঁসিয়ে দ্যলাপোর্ৎ।

সেদিন ভ্লাদিমিরের সঙ্গে ডাক্তার হামিনের কথা হচ্ছিলো। লিভোনিয়া রহস্যের সত্যি কোনো কিনারা হয়েছে ব'লে বিশ্বাস করতে রাজি নয় ইয়ানোফ। দিমিত্রিকে সে খুনী ব'লে ভাবতেই পারে না। যতই কেন না তার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ থাক।

ডাক্তার হামিনে বললেন, 'নিকোলেফ যে চুরি করেছেন, খুন করেছেন, তা আমিও বিশ্বাস করি না ভ্লাদিমির, যদিও তাঁর কাছেই চোরাই নোট পাওয়া গেছে। তাঁর এই আত্মহত্যা—তারও ব্যাখ্যা আছে। চাপে প'ড়ে, নাড়া খেয়ে-খেয়ে, নিশ্চয়ই সাময়িক বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিলো তাঁর। কিন্তু একটা ভয়ংকর তথ্য তোমাকে জানাই ভ্লাদিমির। দিমিত্রি নিজের বুকে যে-ছুরিটা বসিয়েছেন, সেটাই আমূল বিঁধেছিলো পোখ-এর বুকে। যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন এই প্রমাণটা আমরা উড়িয়ে দেবো কী ক'রে?'

'দিমিত্রির কাছে যদি ও-রকম একটা ছোরা থাকতোই, তাহ'লে তার ছেলে-মেয়েরা কোনোদিনও সেটা দেখতে পেতো না, এটা কি সম্ভব? ইল্‌কা আর জাঁ সেই ছোরা চোখেও দ্যাখেনি কোনোদিন। আমি ওদের অনেকবার জিগেশ করেছি...'

'এর যে কী উত্তর হবে, তা আমি জানি না, ভ্লাদিমির। কিন্তু নিকোলেফের কাছে নিশ্চয়ই ছোরাটা ছিলো। দু-দুবার উনি ছোরাটা ব্যবহার করেছেন—পোখকে হত্যা করার সময়, তারপর আত্মহত্যা করতে গিয়ে...'

কী বলবে বুঝতে না-পেরে ভ্লাদিমির মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইলো।

ডাক্তার হামিনে বললেন : 'বেচারি ছেলেমেয়েগুলো ...ওদের যে কী হবে, তা ভগবানই জানেন...'

'ইল্‌কা যখন আমার স্ত্রী হবে, তখন জাঁ কি আমার ছোটো ভাই হবে না?'

গভীর আবেগের সঙ্গে ডাক্তার হামিনে ভ্লাদিমিরের হাত চেপে ধরলেন।

'আপনি কি ভেবেছিলেন আমি ইল্‌কাকে এখন বিয়ে করতে চাইবো না?'

'না, ভ্লাদিমির । সে-কথা আমি কখনো ভাবিনি...কিন্তু ইল্‌কা...সে কি এখন তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে ? ওর তো মনে হ'তে পারে যে ওর বাবার অপরাধের কালো ছায়া সারাক্ষণ ওর উপর ঝুলে থাকবে, তা নিয়ে ও হয়তো তোমাকে ব্যতিগ্রস্ত করতে চাইবে না...'

'তাহ'লে বুঝবো যে আমাকে ও আর ভালোবাসে না!'

'না, ভ্লাদিমির। তাহ'লে বুঝতে হবে যে ও তোমাকে ভালোবাসে ব'লেই এই লজ্জা নিয়ে তোমার কাছে যেতে চায় না!'

+

ডাক্তার হামিনে ঠিকই অনুমান করেছিলেন। বিয়ের প্রস্তাব হ'তেই বিষম আপত্তি করলো ইল্‌কা। তার মুখ শুকনো, চোখে বিষণ্ণতা, যেন কোনো দারুণ পোকা তার ভিতরটা কুরে-কুরে খাচ্ছে। ভ্লাদিমির অনুনয় করলো। নতজানু হ'য়ে বসলো তার কাছে, বললো ইল্‌কা বিয়ে না-করলে তার জীবনটা নষ্ট হ'য়ে যাবে। কিন্তু ইল্‌কা রইলো অবিচল, পাষাণ-প্রতিমা; শুধু তার চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল পড়তে লাগলো। অস্ফুট স্বরে সে শুধু বলতে লাগলো, 'তা হয় না, ভ্লাদিমির, তা হয় না। খুনীর মেয়ে আমি, আমি কী ক'রে বিয়ে করবো তোমাকে...'

দুজনেই ভেঙে পড়লো। ইল্‌কা কান্না চাপতে না-পেরে চ'লে গেলো পাশের ঘরে, ভ্লাদিমির বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। আশাহীন, বিমর্ষ; সব কেমন ফাঁকা ঠেকতে লাগলো তার কাছে। কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালো সে উদ্দেশ্যহীন, ঠিকানাহীন, তারপর চ'লে গেলো ডাক্তার হামিনের কাছে—তার শেষ আশ্রয়।

সব সে খুলে বললো ডাক্তারকে।

শুনে ডাক্তার হামিনে বললেন, 'ভ্লাদিমির, আমি জানতুম এ-রকম হবে। তোমাকে তো আমি বলেছিলুম সেদিন! ইল্‌কাকে আমি এইটুকু বয়েস থেকে চিনি—কিছুতেই ওর মত পালটাবে না, দেখো!'

'ডাক্তার, আপনি আমার শেষ আশাটুকুও কেড়ে নিচ্ছেন,' ভ্লাদিমির যেন প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

'কিন্তু ইল্‌কা যতই কষ্ট পাক,—তুমি তো জানো ও কী-রকম কষ্ট পাচ্ছে—এ-বিয়েতে ও কিছুতেই মত দেবে না। ও সবসময় ভাববে যে ও খুনীর মেয়ে—ওর কোনো অধিকার নেই তোমাকে বিয়ে করার।'

'কিন্তু দিমিত্রি তো খুন করেননি, ডাক্তার! আমি ঠিক জানি তিনি খুন করেননি!'

ডাক্তার হামিনে চুপ করে রইলেন। কী বলবেন তিনি এর উত্তরে! আত্মহত্যা ক'রেই তো নিকোলেফ শেষ প্রমাণটুকু দিয়ে গেছেন যে তিনিই রাতের অন্ধকারের সেই নৃশংস আততায়ী।

ইয়ানোফ শুধু বললে, 'শুনুন ডাক্তার। ভগবান সাক্ষী, ইল্‌কাকে আমি নিজের স্ত্রী ব'লেই জানি। আমি অপেক্ষা করবো...'

'কীসের জন্য ভ্লাদিমির?'

'আমি অপেক্ষা ক'রে থাকবো, কখন ভগবান মুখ তুলে তাকান, সেইজন্য!'

+

কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। অবস্থার কোনোই হেরফের হয়নি এর মধ্যে। আলেমানরা নির্বাচনে জিতে গিয়েছে। ইল্‌কা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করার পর ভ্লাদিমিরের পক্ষে আর সে বাড়িতে থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কাছেই সে বাড়ি ভাড়া করেছে—রোজ যায় ওদের দেখতে। ওদের হাতে টাকাকড়ি বিশেষ নেই। বেঁচে থাকাই ক্রমশ কষ্টকর হ'য়ে উঠছে। রিগা থেকে চ'লে যাবে কি না, সে-কথা ভাবছে। ভ্লাদিমির, বলাই বাহুল্য, সাহায্য করতে চেয়েছিলো, কিন্তু ইল্‌কা কোনো সাহায্য নিতেই চায়নি। পাগলের মতো ভালোবাসে সে ইল্‌কাকে—কিন্তু জেদি, একরোখা, অবিচল ইল্‌কা—সে কখনো টলবে না। কিছুতেই সে বিয়ে করবে না ভ্লাদিমিরকে। ভ্লাদিমির বেচারির চোখের সামনে কোনো আশা নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই—অটল অচল ইচ্ছাশক্তির দেয়ালে মিথ্যাই সে মাথা কুটে মরছে।

পারিবারিক বন্ধুরা ইল্‌কাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ইল্‌কার সেই এক কথা: 'কোনো খুনীর মেয়ে কী ক'রে একজন সৎ লোককে বিয়ে করবে।'

রিগাশুদ্ধু সব্বাই এতদিনে এ কথা জেনে গিয়েছে। ইল্‌কার প্রশংসায় ওরা পঞ্চমুখ, করুণায় বিগলিত—কিন্তু কী করবে তারা? সবই ভগবানের হাত।

এই যখন অবস্থা, তখন ১৭ই সেপ্টেম্বর জাঁ ও ইল্‌কা নিকোলেফের নামে এক চিঠি এসে হাজির। চিঠি লিখেছেন রিগার পোপ*, তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন তারা যেন সেইদিনই বিকেল পাঁচটার সময় রিগার কবরখানায় যায়।

ডাক্তার হার্মিনে ও ভ্লাদিমির ইয়ানোফও ঠিক ও-রকম চিঠি পেয়েছেন। কীসের এই আমন্ত্রণ, সেটা কেউই বুঝতে পারছিলেন না।

এই কবরখানাতেই দিমিত্রি নিকোলেফের মৃতদেহ কবর দেয়া হয়েছে—আত্মহত্যা ব'লে গির্জে তাতে কোনো অংশ নেয়নি, বা কোনো অনুমোদন দেয়নি।

'আপনার কি মনে হয়, ডাক্তার?' ভ্লাদিমির জিগেশ করলে।

'পোপ যখন বলেছেন, তখন আমাদের যাওয়া উচিত। তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, বয়েসও প্রায় ছিয়াত্তর-সাতাত্তর, তিনি নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর কারণ আছে ব'লেই এই আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন।'

'তুমি যাবে তো, ইল্‌কা?' ভ্লাদিমির জিগেশ করলে।

'আমি অনেকবার গেছি ওখানে, বাবার জন্য প্রার্থনা করতে। পোপ আক্রিয়েক বাবার জন্য যদি প্রার্থনা করেন, তাহ'লে ভগবান নিশ্চয়ই তা শুনবেন।'

পাঁচটার সময় কবরখানায় গিয়ে জাঁ আর ইল্‌কা দেখতে পেলে অন্যরা আগেই এসে পৌঁছেছেন। তাঁদের বাবার সমাধির কাছে পোপ ব'সে আছেন নতজানু, দুর্ভাগা লোকটির

---

* রাশিয়ার আদি চার্চ গির্জার পুরোহিতদের তখন পোপ বলতো ।

জন্য প্রার্থনা করছেন তিনি। পায়ের শব্দ শুনে তিনি মাথা তুলে তাকালেন। যখন ভ্লাদিমির আর ইল্‌কা সমাধির কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, তিনি শুধু বললেন, 'ভ্লাদিমির ইয়ানোফ, দেখি তোমার হাত।' তারপর ইল্‌কার দিকে ফিরে বললেন, 'ইল্‌কা নিকোলেফ, তোমার হাত। ' তারপর দুটি হাত তিনি এক ক'রে দিয়ে রাখলেন সেই সমাধিতে। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ভ্লাদিমির ইয়ানোফ আর ইল্‌কা নিকোলেফ, তোমরা ভগবানের সামনে স্বামী-স্ত্রী ব'লে গণ্য হ'লে।'

ইল্‌কা তক্ষুনি হাত সরিয়ে নিতে চাইলো, কিন্তু পোপ বললেন, 'না, ইল্‌কা, হাত সরিয়ো না।'

'আমি...খুনীর মেয়ে...'

'খুনীর নয়, নিরপরাধ এক দুর্ভাগার কন্যা। এমনকী তিনি আত্মহত্যাও করেননি।'

জাঁ তখন আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। 'তাহ'লে খুনী...সে কে ?'

'ভাঙা ক্রুশের সরাইখানার মালিক ক্রোফ।'

১৬

পুনর্বাসন

ফুশফুশ ঝাঁঝরা হ'য়ে গিয়েছিলো ক্রোফের ; আগের দিন হঠাৎ কাশির ধমক উঠেছিলো তার, রক্ত উঠেছিলো কাশির সঙ্গে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারপর মৃত্যু হয়েছিলো।

মরবার আগে সে ডেকে পাঠিয়েছিলো পোপ অক্রিয়েককে, তার স্বীকারোক্তির জন্য : গত তিন মাস তার বিবেক তাকে অবিশ্রাম কুরে-কুরে খেয়েছে, মৃত্যু আসন্ন জেনে সব কথা স্বীকার না ক'রে এই একা লোকটার কোনো সান্ত্বনা ছিলো না। সে যা-যা বলেছিলো, সব হুবহু লিখে নিয়েছিলেন পোপ, তারপর স্বীকারোক্তির নিচে ক্রোফ স্বাক্ষর করেছিলো। এখন তার মৃত্যুর পর তা প্রকাশ করা হ'লো। স্বীকারোক্তির মধ্যে ছিলো ক্রোফের অপরাধের নির্জল স্বীকৃতি, আর দিমিত্রি নিকোলেফের পুনর্বাসন।

+

১৩ই এপ্রিল, সেই ভয়ংকর রাত্রে ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায় পোখ আর নিকোলেফ এসে রাত কাটাতে চেয়েছিলেন।

অনেকদিন ধরেই ক্রোফের ব্যাবসায় লোকসান যাচ্ছিলো। পোখ-এর ঐ পেটমোটা ব্রীফ-কেস দেখেই ব্যাঙ্কের কর্মচারীর টাকা লুঠ করার মৎলব তার মাথায় আসে। অন্য যাত্রীটি বলেছিলেন ভোর চারটেয় তিনি চ'লে যাবেন—কখন তিনি চ'লে যান তার অপেক্ষা করছিলো সে—কারণ সাবধানের মার নেই—অন্য-কারু উপস্থিতিতে চুরি করার বিপদ অনেক। কিন্তু শেষ অব্দি সে আর লোভ শামলাতে পারেনি। রাত যখন দুটো, তখন সে গিয়ে চুপিসাড়ে ঢুকেছিলো পোখ-এর ঘরে, ভেবেছিলো পোখ বুঝি টের পাবে না।

পোখ কিন্তু ঘুমোচ্ছিলো না। ক্রোফের লণ্ঠনের আলো দেখে সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসেছিলো বিছানায়। গোড়ায় কেবল চুরি করাই ইচ্ছে ছিলো তার ; এখন যখন দেখতে পেলে যে সে ধরা প'ড়ে গিয়েছে তখন লাফিয়ে গিয়ে পড়েছিলো বেচারির উপর ; কোমরবন্ধে গোঁজা ছিলো এক সুইডেনের ছোরা—বাঁটশুদ্ধু ছোরাটা বসিয়ে দিয়েছিলো সে হৃৎপিণ্ডে।

তারপর পোখ-এর ব্রীফ-কেস হাৎড়ে দেখেছিলো ; বার ক'রে এনেছিলো ব্যাঙ্ক-নোটগুলো—একশো রুবলের নোট এক-একটা— মোট পনেরো হাজার রুবল ছিলো পোখ-এর ব্রীফকেসে।

কিন্তু তারপরেই ব্রীফ-কেসের খোপে সে একটা চিরকুট দেখতে পেয়েছিলো ; তাতে লেখা : 'ব্যাঙ্কনোটের নম্বরগুলো সব ইয়োহাউজেন ব্রাদার্সের কাছে রয়েছে।' পোখ এমনিতে ছিলো সাবধানী লোক ; যখনি ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি নিয়ে কোথাও যেত নম্বরগুলো টুকে রেখে আসতো। এই দেখে ক্রোফ মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলো। টাকার জন্যে খুন করেছে, এখন এই টাকা চালাতে গেলে যে সে ধরা প'ড়ে যাবে। খুন ক'রে কোনো লাভই তো তার হ'লো না।

তারপরেই মৎলবটা তার মাথায় খেলে গেলো। ভাবলে, খুনের দায়টা অন্য যাত্রীটির ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। বেরিয়ে গেলো সে সরাই থেকে, প্রথম ঘরের জানলার গোবরাটে বাইরে থেকে আঁচড় কেটে দাগ বানালো—যেন জানলা দিয়ে কেউ বেরুতে যাচ্ছিলো বা ঢুকতে যাচ্ছিলো, দৈবাৎ আঁচড় লেগে গিয়েছে। কয়লাগোঁজা হাতুড়ি দিয়ে তারপর দ্বিতীয় ঘরের জানলার খড়খড়ি ভাঙলো, তারপর ফিরে এলো আবার সরাইতে। হাতে অতগুলো টাকা, কিন্তু তার কাছে এদের কোনো দাম নেই। শুধু তাই নয়, এই নোটগুলো এখন তার অপকীর্তির বিপজ্জনক সাক্ষী। রাগে ক্ষোভে সে যেন জ্বলছিলো।

আর এই সময়েই তার মাথায় এলো আরেকটা মৎলব। অন্য যাত্রীটির ঘরে গিয়ে তার পকেটে এই নোটগুলো চালান ক'রে দিয়ে, তার নিজের যা কিছু আছে, সব হাৎড়ে নিয়ে এলে কেমন হয়?

নিকোলেফের সঙ্গে ছিলো কুড়ি হাজার রুবল—ভ্লাদিমির ইয়ানোফকে দেবেন বলে টাকাটা তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন তাঁর পকেট হাৎড়ে টাকাগুলো বার ক'রে আনলে ক্রোফ—এও তো ব্যাঙ্কনোট, কিন্তু নিশ্চিন্ত, এদের নম্বর কারু কাছে টোকা নেই। বার ক'রে নিলে সে পনেরো হাজার রুবল, বদলে রাখলো পোখ-এর ব্রীফ-কেস থেকে চুরি করা টাকাটা, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর পাইনবনের মধ্যে ঢুকে একটা গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে সে টাকাটা আর ছোরাটা লুকিয়ে রাখলো—এত সাবধানে সে কাজটা হাঁশিল করলে যে পরে পুলিশ তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও তার কোনো হদিশ পায়নি।

চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে নিকোলেফ সরাইওলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পেরনাউ-এর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। আর আঁটো হ'য়ে সন্দেহের ফাঁস তাঁর গলায় চেপে বসলো। এদিকে ক্রোফের কাছে র'য়ে গেলো নিকোলেফের নোটগুলো—ইচ্ছে করলেই সে এগুলো চালাতে পারে, বিপদের কোনো ভয়ই তার নেই। চালালেও সে কতগুলো, খুবই সাবধানে অবশ্য, যাতে অত্যন্ত জরুরি ঋণগুলো মেটে।

সারজেন্ট য়েক চিনতে পেরেছিলো নিকোলেফকে, গোড়া থেকেই তার সন্দেহ ছিলো নিকোলেফের উপর। নিকোলেফ যখন তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য বলতে রাজি হননি তখন স্বভাবতই সকলের সন্দেহ পড়েছিলো তাঁর উপর। কিন্তু ভ্লাদিমির ইয়ালোফের নাটকীয় আবির্ভাবের পর থেকেই অবস্থাটা পালটে গেলো। ক্রোফ যখন বুঝতে পারলে যে এবার তার উপরেই সব সন্দেহ এসে পড়ছে, তখন সে বিষম ভয় পেয়ে গেলো। পুলিশের নজরবন্দী সে তখনও, কিন্তু তবু সে নিকোলেফের উপর সন্দেহ চাপাবার আরেকটা ব্যবস্থা করলো। একটা ব্যাঙ্কনোটে রক্ত মাখালে সে, তারপর পোড়ালে তার আদ্ধেকটা, রাত্তিরের অন্ধকারে উঠলো সে সরাইয়ের ছাতে ; নিকোলেফ যে-ঘরটায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে-ঘরের চিমনি দিয়ে নোটটা গলিয়ে ফেলে দিলো নিচে। পরের দিনেই কেরস্টোফরা এলেন তদন্তে —আর নোটটা আবিষ্কৃত হ'লো। আবার অনেকক্ষণ জেরা করা হ'লো নিকোলেফকে, কিন্তু কেরস্টোফ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে নিকোলেফের দ্বারা অমন-কোনো নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্ভব—তাই তিনি তাঁর নামে কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে রাজি হননি।

ক্রোফ তাতে আরো উদ্বিগ্ন ও শঙ্কাতুর হ'য়ে উঠলো। নিকোলেফের সমর্থকেরা যে তাকেই সন্দেহ করছে, এটা বুঝতে পেরে তার মাথায় আবার পোকা কিলবিল করে উঠলো। সে কেবল অপেক্ষা করছিলো কখন নিকোলেফ নম্বরি নোটগুলো না-জেনেশুনে চালাবার চেষ্টা করেন—কারণ তাহ'লে আর তাঁর সমর্থকদের কিছুই বলবার থাকবে না। কিন্তু নিকোলেফ, কই, নোটগুলো তো চালাবারই চেষ্টা করছেন না!

শেষটায় ক্রোফ যখন দেখলে যে তার নামেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হ'তে যাচ্ছে, তখন সে সব বিবেচনাশক্তি হারিয়ে ফেললো। সে যদি ঘূণাক্ষরে জানতো যে চোরাই নোটগুলো গিয়ে ইয়োহাউজেন ভাইদের হাতে পড়েছে, তাহ'লে সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য অমন মরিয়া হ'য়ে উঠতো না।

কিন্তু সে তখনো এ-তথ্য জানতো না। তখনো সে স্বাধীন, রিগা যেতে পারে অনায়াসে ; কতবার তো পুলিশই তাকে রিগা যাবার জন্য এত্তেলা পাঠিয়েছিলো। এলো সে রিগায় এক রাত্তিরে, অধ্যাপকের বাড়ির বাইরে ওঁৎ পেতে রইলো, ইচ্ছে অধ্যাপককে খুন করবে—এমনভাবে খুন করবে যে লোকে দেখে ভাবে যেন নেহাৎই আত্মহত্যা।

দৈব ছিলো তার সহায়। দেখলো নিকোলেফ উন্মত্তের মতো ছুটে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। অনুসরণ করলো সে তাঁকে সন্তর্পণে ; শেষকালে যখন তাঁকে ফাঁকা রাস্তায় পেলো, ছোরা বসিয়ে দিলে তাঁর বুকে—সেই ছোরাটা, যা সে একদিন পোখ-এর বুকে বাঁটশুদ্ধু ঢুকিয়ে দিয়েছিলো।

এবার আর লোকে প্রমাণগুলো অবিশ্বাস করতে পারলো না। অনুমান করলো যে চোরাই নোটগুলো ইয়োহাউজেনদের হাতে গিয়ে পড়তেই ধরা পড়বার ভয়ে নিকোলেফ আত্মহত্যা করেছেন—আসলে তিনিই পোখ-এর নির্মম হত্যাকারী।

হত্যারহস্যের উপর যবনিকা পড়েছে বলেই পুলিশ ধ'রে নিলে। ক্রোফ—এখন সে সন্দেহমুক্ত—নিশ্চিন্তচিত্তে দিন কাটাতে পারে। তার ডবল হত্যাকাণ্ডের জন্য কোনো সাজাই তার হবে না।

কিন্তু বেশিদিন আর সুখভোগ করতে হ'লো না তাকে। যখন রোগের প্রকোপ বাড়লো, বুঝতে পারলো শেষের সেদিন প্রত্যাসন্ন, নরকের ভয়ে ভীত সে সব স্বীকার ক'রে গেলো পোপের কাছে। তার মৃত্যুর পর সব কথা যেন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় এই সে ব'লে গেলো পোপকে—চোরাই টাকা সে বেশি খরচ করেনি; পোপকে বললে তা যেন তার মৃত্যুর পর তিনি তার বৈধ মালিক ভ্লাদিমির ইয়ানোফকে ফিরিয়ে দেন।

দিমিত্রি নিকোলেফের পুনর্বাসন হলো সত্যি, কিন্তু তিনি তা জেনে যেতে পারলেন না। তিনি শয়ান থেকে গেলেন সেই মাটির নিচে, কালো ঠাণ্ডা নিঃসাড় কফিনে, তাঁর মৃণ্ময় দেহ ফিরে গেছে মাটিতেই; যেমনভাবে ক্রোফের মৃতদেহ একদিন মাটিতে মিশে যাবে।

দ্য স্কুল ফর রবিনসন্‌স

১

'নগদ টাকা ফেলুন দিকি,
আস্ত দ্বীপ এক হচ্ছে বিকি !'

'বিক্রি হবে, মশাই ; আস্ত একটা দ্বীপই বিক্রি হবে । সবচেয়ে বেশি দাম যিনি হাঁকবেন, নগদ মূল্যে তাঁর কাছেই বেচা হবে দ্বীপটা,' ঘোষণা করলে ডীন ফেলপর্গ । সে হ'লো নিলেমওলা । নিলেমভবনে গিশগিশে ভিড়–এ রকম অদ্ভুত একটা বিক্রি দেখতে কাতারে-কাতারে লোক এসে হাজির হয়েছে ; হাজির হওয়াই কেবল নয়–শোরগোলেরও শেষ নেই । আর সেই হুলুস্থুল চ্যাঁচামেচির মধ্যে তার গোল পাটাতনটায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় হাঁকছে জিনগ্রাস, ফেলপর্গের শাগরেদ—চীৎকার ছাপিয়েও তার গলা শোনা যাচ্ছে ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণে ।

'নগদ টাকা ফেলুন দিকি–আস্ত দ্বীপই হচ্ছে বিকি !' রিনরিনে গলা শোনা গেলো জিনগ্রাসের । আর তার চীৎকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই ১০ নম্বর স্যাক্রামেনটো স্ট্রিটের নিলেমভবনে ক্রমেই বাড়তে লাগলো লোকসংখ্যা । কেবল যে মারকিন মুলুকের উটা, অরেগন ও ক্যালিফরনিয়ার লোকই এসে এখানে জড়ো হয়েছে, তা-ই নয়–ছ-ভাগের একভাগ লোক আবার ফরাশি । তাছাড়া রয়েছে মেহিকোর লোক, চিনেম্যান, উপকূলের দু-একজন কানুক, এমনকী ট্রিনিটি নদীর তীর থেকে ব্ল্যাক-ফ্লিট, গ্রসভেনট্রেস আর ফ্ল্যাটহেডের দু-একটি ছিটেও সেখানে হাজির ।

ক্যালিফরনিয়ার রাজধানী সান ফ্রানসিসকোতেই নিলেমটা হচ্ছিলো । লিমা, সান তিয়াগো, ভালপারাইসো–এদের হঠিয়ে দিয়ে সান ফ্রানসিসকোই আজকাল খুব জমজমাট শহর হ'য়ে উঠেছে–বলা যায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে জমকালো বন্দর বলতে এখন এটাকেই বোঝায় । তারিখটা হচ্ছে পনেরোই মে । আবহাওয়া এখনো বেশ কনকনে ঠাণ্ডা । মধ্য-ইয়োরোপে মার্চের শেষ দিকে যে-রকম আবহাওয়া থাকে, মেরুস্রোতের জন্যে মে মাসের গোড়ায় সান ফ্রানসিসকোর আবহাওয়া থাকে ঠিক সে-রকম । কিন্তু এই গিশগিশে ভিড়ে ঠাণ্ডা লাগবে কি, বরং হাঁসফাঁস শুরু হ'য়ে গেছে ।

এটা যেন কেউ না-ভাবে যে এত লোক, সবাই জড়ো হয়ছে কেনবার জন্যে । মোটেই না । বরং বলা যায় প্রত্যেকেই এসেছে মজা দেখতে । এমন পাগল কে আছে যে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা আস্ত দ্বীপ কিনে নেবে ? টাকা হয়তো অনেকেরই আছে–কিন্তু সরকারের ভিমরতি হয়েছে ব'লে কি তাদেরও ভিমরতি হবে ? সবচেয়ে কম দাম যেটা ধরা হয়েছে, তা-ই উঠবে কিনা কে জানে । এমন পাগল কেউ নেই ব'লেই নিলেমওলার এত হাঁকডাক, ছড়া কাটা কি অলংকারওলা বাক্য বলা–সবই ব্যর্থ হ'লো । লোকে তার কথা শুনে হাসলে

ঠিকই, কিন্তু কেউ যে কিনতে উৎসুক বা উৎসাহিত বোধ করলে তা কিন্তু মনে হ'লো না !

'বিক্রি হচ্ছে ! শস্তায় বিকিয়ে যাচ্ছে—আস্ত একটা দ্বীপ !' জিনগ্রাস আবার হাঁক পাড়লে ।

'বিকোচ্ছে বটে, কিন্তু কিনছে না কেউ,' উত্তর দিলে এক আইরিশম্যান—তার পকেটে একটা আস্ত দ্বীপের দাম তো দূরের কথা একটা ছোট্ট নুড়ির দামও আছে কিনা সন্দেহ !

নিলেমওলা হাঁকলে, 'শস্তায় বিকোচ্ছে—এক একরের দাম ছ-ডলারও হবে না—'

'তার আটভাগের একভাগ টাকাও ও-জমি থেকে উঠবে কি না সন্দেহ,' বললে এক ভারিক্কি দশাসই চাষী—জমিজমার দামদস্তুর সম্বন্ধে সে বেশ ভালোই ওয়াকিবহাল ।

'দ্বীপটার আয়তন হবে প্রায় চৌষট্টি বর্গমাইল—দুশো পঁচিশ হাজার একর জমি পাবেন দ্বীপে মোটমাট !'

'ভিতরটা কী-রকম সে-জমির ? শক্ত ? না, নড়বোড়ে ?' জিগেশ করলে এক মেহিকান । মদের দোকানের সে বাঁধা খদ্দের—এই মুহূর্তে তারই ভিতটা নড়বোড়ে ঠেকছিলো ।

'সুন্দর গাছপালার ভরা দ্বীপ—ঘাসের জমি, পাহাড়, ঝরনা—কী নেই !'

'টেকসই তো ?' জিগেশ করলে একজন ফরাশি ।

'নিশ্চয়ই । টেকসই তো বটেই !' ফেলপর্গ অনেকদিন নিলেমের ব্যাবসা চালাচ্ছে—ও-সব টীকা-টিপ্পনী-টিটকারিতে আজকাল আর তার ভুরু কোঁচকায় না ।

'কদ্দিন টিকবে ? দু-বছর ?'

'জগৎ যদ্দিন টিকবে, ততদিন !'

'তাই নাকি !'

'চমৎকার দ্বীপ—কোনো আমিষখোর জন্তু নেই—নেই কোনো বুনো জানোয়ার বা সরীসৃপ !'

'পাখি ? পাখি নেই ?' জিগেশ করলে এক ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ।

'পোকা-মাকড় ? না কি তাও নেই ?' ফোড়ন কাটলে অরেকজন ।

'চড়া দাম যিনি হাঁকবেন, তার জন্যেই এই দ্বীপ !' আবার গোড়া থেকে শুরু করলে ডীন ফেলপর্গ । 'আসুন, মশাই, আসুন । পকেটে একটু সাহস আনুন ! প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে আস্ত একটা ঝকঝকে দ্বীপ—মেরামতের কারবার নেই, ঝক্কিঝামেলা নেই, উর্বর, অব্যবহৃত, সম্ভাবনাপূর্ণ ! শস্তায় চ'লে যাচ্ছে—জলের দরে বিকোচ্ছে ! ১,১০০,০০০ ডলার দাম ধরা হয়েছে । এগিয়ে আসুন যিনি কিনবেন ! কে আগে দাম হাঁকবেন, শুনি ? আপনি ? ও, মশাই, আপনি—ওই-যে, যিনি কোনায় ব'সে পোর্সেলেনের মান্দারিনের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছেন ? দ্বীপ মশাই, আস্ত একখানা দ্বীপ—চমৎকার দ্বীপ !'

'দিন না হাত বাড়িয়ে এদিকে, উলটেপালটে একবার দেখি,' যেন কোনো ফুলদানি কিনতে চাচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে বললে একজন ।

আর তক্ষুনি নিলেমভবন হো-হো হাস্যে ফেটে পড়লো, কিন্তু আধ ডলার দামও কেউ হাঁকলে না ।

হাত বাড়িয়ে দ্বীপটাকে যদিও উলটেপালটে দেখতে দেয়া গেলো না, তবু তার মানচিত্র ছিলো, কৌতূহলী ক্রেতার জন্যে । তাছাড়া ক্যালিফরনিয়ার অগুনতি কাগজ—দৈনিক, অর্ধ-

সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিকপত্র ছাড়াও অন্যান্য সাময়িকপত্রে বেশ কয়েক মাস ধ'রেই এই দ্বীপ বিক্রির কথা যাবতীয় তথ্যসমেত বেশ ফলাও ক'রে প্রচারিত হচ্ছিলো। দ্বীপটার নাম স্পেনসার আইল্যাণ্ড ; সান ফ্রানসিসকো উপসাগরের পশ্চিম দক্ষিণ-পশ্চিমে, ক্যালিফরনিয়ার উপকূল থেকে প্রায় ৪৬০ মাইল দূরে দ্বীপটা অবস্থিত ; গ্রীনউইচ থেকে হিশেব করলে দ্বীপটার অবস্থান, ৩২°১৫' উত্তর অক্ষাংশে ও ১৪৫°১৮' পশ্চিম দ্রাঘিমায়। আশপাশে কেবল যে কোনো দ্বীপ বা ডাঙা নেই, তা নয়–কোনো জাহাজই তার পাশ দিয়ে যায় না–না কোনো বাণিজ্যপোত, না কোনো সমরতরী ;–অথচ স্পেনসার আইল্যাণ্ড এমনিতে খুব বেশি দূরে নয়–বলতে গেলে প্রায় মারকিন মুলুকের জলেই অবস্থিত। কিন্তু সেখানকার সমুদ্রে নানারকম পরস্পর-বিরোধী তীব্র স্রোত কতগুলো ভীষণ ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে, যার ফলে সব জাহাজই ওখানকার ফেনিয়ে-ওঠা চরকি জলকে সাবধানে এড়িয়ে যায়। অবশ্য কেউ যদি জাগতিক কোলাহল ও ব্যস্তভাব অপছন্দ করে, তাহ'লে এর চেয়ে নিরিবিলি জায়গা আর পাবে কোথায় ? কোনো স্বতঃপ্রবৃত্ত রবিনসন ক্রুসোর পক্ষে দ্বীপটা অতীব প্রকৃষ্ট স্থান সন্দেহ নেই–তবে তার জন্যে তাকে অবিশ্যি পকেট উজোড় ক'রে টাকা ঢালতে হবে।

কেউ জিগেশ করতে পারেন, হঠাৎ মারকিন যুক্তরাষ্ট্রই বা কেন দ্বীপটা বেচে ফেলতে চাচ্ছে ? খামখেয়াল ? না, কোনো রাষ্ট্রই অতটা খেয়ালখুশি নিয়ে কাজ চালাতে পারে না, তা সে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রই হোক বা অন্য-কিছুই হোক। আসল কথা হ'লো, স্পেনসার আইল্যাণ্ডটা নৌপথের মধ্যে পড়ে না ব'লে অনেকদিন অকেজো ও পতিত প'ড়ে আছে। সেখানে কোনো উপনিবেশ স্থাপন করার কোনো ব্যাবহারিক সুবিধে নেই, সমরবাহিনীর পক্ষেও দ্বীপটা তেমন জরুরি নয়। আর ব্যাবসার দিক থেকেও দ্বীপটায় নৌ-চলাচল করার সুবিধে নেই–আমদানি-রপ্তানির মালের মাশুলই উঠবে না। আর দ্বীপান্তর হিশেবেও বিচার-বিভাগ তাকে কাজে খাটাতে পারবে না, কারণ মূল উপকূল থেকে সেই অর্থে দ্বীপটা বড্ডই দূরে। কাজেই দ্বীপটা সেই জন্যেই প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকেই অব্যবহৃত প'ড়ে ছিলো। কিন্তু মারকিন কংগ্রেসে যেহেতু ব্যাবসাদারদের সংখ্যা কম নেই, তাই তারা এবার দ্বীপটা বেচে দেবারই মৎলব এঁটেছে। শর্ত কেবল একটাই : ক্রেতাকে মারকিন নাগরিক হ'তে হবে। বেচে দেয়া হচ্ছে ব'লে যে নামমাত্র দর চাওয়া হবে, তাও নয়–সবচেয়ে কম দাম ধার্য হয়েছে ১,১০০,০০০ ডলার। জমিজমা কেনাবেচা করে যে-সব প্রতিষ্ঠান, তাদের পক্ষে অবশ্য ও-টাকা কিছুই না, যদি ও-জমি থেকে কিছুমাত্র লাভের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই স্পেনসার আইল্যাণ্ডের পিছনে অত টাকা ঢালার মানেই হ'লো সব টাকা জলে দেয়া–কেননা ও-টাকা উশুল করার কোনো উপায়ই নেই। কাজেই যাদের একটু কাণ্ডজ্ঞান বা সাংসারিক সুবুদ্ধি আছে, তারাই মেরুবলয়ের বরফ-ঢাকা কোনো জমির সঙ্গে এই দ্বীপটার কোনোই ব্যাবহারিক তফাৎ দেখতে পাবে না। কেননা একদিক থেকে টাকার অঙ্কটা বেশ স্ফীতকায়। এ-রকম শখ বজায় রাখার বা খেয়াল মেটাবার জন্যে লোকের অতীব ধনাঢ্য হওয়া চাই, কারণ শতকরা আধ সেন্ট হারেও এ থেকে কিছু উশুল হবার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া পুরো টাকাটা নগদানগদ বার ক'রে দেয়াটা মারকিন মুলুকের ধনকুবেরদের পক্ষেও খুব একটা তাচ্ছিল্য করার মতো ব্যাপার নয়–বিশেষত ও-টাকা ঢালার মানেই হ'লো যখন মস্ত অপব্যয় করা। টাকা ওড়াবার বা জলে ফেলবার আরো অনেক মুখরোচক উপায় আছে।

অথচ কংগ্রেস আবার জেদ ধরে বসেছে এগারোশো হাজার ডলারের এক কানাকড়ি কমেও দ্বীপটা বিক্রি করা হবে না। কাজেই দ্বীপটা যে বিক্রিই হবে না, সেটা একরকম ধ'রেই নেয়া যায়। ও-রকম খ্যাপা লোক জগতে কটা আছে ?

তাছাড়া আরেকটা শর্তও আছে। ও-দ্বীপ যিনি কিনবেন, তিনি কিছুতেই স্পেনসার আইল্যাণ্ডের রাজা ব'লে নিজেকে ঘোষণা করতে পারবেন না, বরং কোনো প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ক'রে তার নির্বাচিত অধ্যক্ষ হ'তে পারেন। মারকিন জলে কোনো রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কংগ্রেস কিছুতেই সহ্য করবে না। আর এই শর্তের জন্য অনেক ক্রোড়পতিই পেছিয়ে গেছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপ ওরফে স্যাণ্ডউইচ আইল্যাণ্ড, মার্কেসাস দ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপের মতো স্পেনসার আইল্যাণ্ডের রাজা হবার গোপন উচ্চাশা যাঁদের ছিলো, এই স্পষ্ট শর্তের পর তাঁদের সব শখ উবে গিয়েছে।

তা, কারণ যা-ই থাক, মোদ্দা ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে জিনগ্রাসের এত হাঁকডাক সত্ত্বেও কিছুক্ষণ কোনো ভাবী ক্রেতারই সাড়া পাওয়া গেলো না। অনর্থক কেবল কালক্ষেপই হচ্ছে, চেঁচিয়ে জিনগ্রাসের গলাই বুঝি ভেঙে গেলো, কিন্তু কোনো উচ্চবাচ্যই হ'লো না ঘরে। বরং নিলেমওয়ালার হাতুড়ির বাড়ির সঙ্গে তাল রেখে কেবল হাস্যরোল বাড়তে লাগলো লোকের মধ্যে, টিটকিরির পরিমাণ বেড়েই গেলো, হুল্লোড় মোটেই কমলো না। একজন কেবল ঘোষণা করলে যে ইস্টাম্বর কাগজের খরচা সমেত সে দু-ডলার দিয়ে দ্বীপটা কিনতে পারে ; শুনে আরেকজন বললে যে ও-দ্বীপটা যাকে গছানো হবে, তার তো ইহকাল পরকাল ঝরঝরে, তাই সরকারেরই উলটে টাকা দেওয়া উচিত।

আর তারই মধ্যে সারাক্ষণ জিনগ্রাস চেঁচিয়ে চলেছে :

'নগদ টাকা ফেলুন দিকি,
আস্ত দ্বীপ এক হচ্ছে বিকি !'*

এবং কুত্রাপি কোনো খদ্দেরের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

মার্চেন্ট স্ট্রিটের এক মনোহারি দোকানের মালিক স্টাম্পি জিগেশ করলে, 'মালভূমি আছে নাকি ওখানে ?'

'আর আগ্নেয়গিরি ? একটাও আগ্নেয়গিরি নেই ?' জিগেশ করলে ওকহার্স্ট, মানগোমেরি স্ট্রিটের শুঁড়িখানার মালিক।

'কোনো আগ্নেয়গিরি নেই। থাকলে কি এত শস্তায় পেতেন ব'লে ভাবছেন ?' উত্তর দিলে ফেলপর্গ।

তক্ষুনি আরেক দফা হাস্যরোল উঠলো সারা ঘরে।

'বিক্রি হচ্ছে, দ্বীপ—আস্ত একটা দ্বীপ। নির্দিষ্ট দামের কেবল এক সেন্ট বেশি বললেই দ্বীপটা আপনার হ'য়ে যাবে,' জিনগ্রাস ওদিকে গলা ফাটিয়ে, ফুশফুশ ছিঁড়ে চেঁচিয়েই চলেছে।

কোথাও কোনো সাড়া নেই !

'কেউ যদি কোনো দাম না-হাঁকেন তো আমরা নিলেম বন্ধ ক'রে দিই। এক দুই !...'

জুল ভের্ন-এর আরো-একটি রোমাঞ্চকর উপন্যাস এমনি একটি আন্তর্জাতিক নিলেমের বিবরণ দিয়ে শুরু হয়েছে, পাঠক প'ড়ে দেখতে পারেন : 'পারচেজ অভ দি নর্থ পোল !'

'বারোশো হাজার ডলার !'

রিভলভারের গুলির মতো শব্দ তিনটে ঘরের মধ্যে ফেটে পড়লো। হতবাক ভিড় তাকিয়ে দেখলে, কে এই দুঃসাহসী !

ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, সান ফ্রানসিসকোর উইলিয়াম ডাবলিউ. কোন্ডেরুপ।

২

টাস্‌কিনার আর কোন্ডেরুপ
পরস্পরের প্রতি বিরূপ।

উইলিয়াম ডাবলিউ. কোন্ডেরুপ হচ্ছেন এমন ব্যক্তি, যিনি তাঁর ডলার গোনেন কোটির অঙ্কে। তাঁর তুলনায় নাকি ওয়েস্টমিনস্টারের ডিউক, নেভাদার সেনেটার জোনস, রথসচাইল্ড, ফানডেরবিল্ট, নর্দাম্বারল্যাণ্ডের ডিউক নিতান্তই মধ্যবিত্ত। কোন্ডেরুপ কথায়-কথায় লক্ষ টাকা বিলিয়ে দেন, সাধারণ লোক যেখানে এক শিলিং খরচা করতেই মাথা চুলকে একবার ভেবে নেয়।

ক্যালিফরনিয়ার অনেকগুলো খনির মালিক কোন্ডেরুপ। প্রচুর কলকারখানা আছে তাঁর, অনেকগুলো জাহাজের মালিক, ইয়োরোপে ও আমেরিকায় নানা প্রতিষ্ঠানে তাঁর টাকা খাটে। তাঁর টাকা গণিতের হিশেবে বাড়ে না, বাড়ে জ্যামিতিক প্রগতিতে। লোকে বলে তাঁর যে কত টাকা আছে, তা নাকি তিনি নিজেই জানেন না। কথাটা অবিশ্যি মোটেই ঠিক নয়। শেষ ডলারটুকুর হিশেব পর্যন্ত তিনি জানেন– কিন্তু তা নিয়ে বাইরে জাঁকও দেখান না, দেমাকও করেন না।

এই মুহূর্তে জগতের নানা স্থনে তাঁর সদাগরি প্রতিষ্ঠানের ২০০০টি শাখা রয়েছে, আমেরিকা ইয়োরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ৮০,০০০ কর্মচারী তাঁর আপিশে কাজ করে, পত্র বিনিময় হয় অন্তত ৩০০,০০০ লোকের সঙ্গে, আর ৫০০টি জাহাজ জলে ভাসে। কেবল ডাকটিকিট আর রেভিনিউ স্টাম্পেই বছরে অন্তত দশ লাখ ডলার তাঁর খরচ হয়। এককথায় কোন্ডেরুপ হচ্ছেন সান ফ্রানসিসকোর গৌরব ও মহিমা।

সেই কোন্ডেরুপ যখন একটা ডাক দিলেন, তখন তাকে ঠাট্টা বা ইয়ার্কি ব'লে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যেই ভিড়ের ভ্যাবাচাকা ভাবটা একটু ক'মে গেলো, অমনি মুহূর্তের মধ্যে হাসিটিটকিরির বদলে একটা সম্মিলিত ও অস্ফুট প্রশংসাসূচক ধ্বনি উঠলো ঘরের মধ্যে। তার পরেই সব আওয়াজ থেমে গেলো, লোকের চোখ গোল-গোল ও বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো, কানগুলো সব হ'য়ে উঠলো খাড়া ও উৎকর্ণ। কারণ কেউ যদি ইয়ার্কি ক'রেও কোন্ডেরুপের উপরে একটা দর হাঁকে, তাহ'লে যে কী কাণ্ড হবে, সেটা ভেবেই সবাই হঠাৎ এমন চুপ ক'রে গেলো। কিন্তু তা কি সম্ভব ? কোন্ডেরুপের উপরে কি কেউ কোনো ডাক দিতে সাহস পাবে ?

নিশ্চয়ই না। বিশেষ ক'রে কোল্ডেরুপের মুখের দিকে তাকালেই এটা বোঝা যেতো যে কোনো জিনিশ কিনবেন ব'লে একবার যদি তিনি মনস্থির ক'রে থাকেন তাহ'লে কারু সাধ্য নেই তাঁকে টলাতে পারে। মস্ত মানুষ কোল্ডেরুপ, দেহের খাঁচাটাই বেশ বড়ো, দশাসই; মস্ত মাথাটি ধড়ের উপর সাবধানে বসানো, কাঁধটা চওড়া, সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঁটোশাঁটো, ইস্পাতের মতো শক্ত। শান্ত ও দৃঢ় তাঁর দৃষ্টি, সহজে সে-দৃষ্টি নত হয় না ; ধূসর তাঁর চুল, সামনের দিকটা বুরুশ-করা, কিন্তু এমন ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া যে মনে হয় বুঝি-বা কোনো অল্পবয়েসী মানুষ। খাড়া সরল নাক, যেন একটা সমকোণী ত্রিভুজের রেখা। গোঁফ নেই, শ্মশ্রুসম্বল–কিন্তু সে-দাড়ি ইয়াঙ্কি কেতায় ছাঁটা, মস্ত জুলপি ; মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁত। বোঝা যায় কোনো বিষম ঝড়ও এই লোকটাকে নোয়াতে পারবে না। নিলেমে কেউ যদি তাঁর উপরে কোনো ডাক দেয় তো তিনি একবার ক'রে মাথা হেলাবেন, আর অমনি দরটা একশো হাজার ডলার ক'রে বেড়ে যাবে। তাঁর মুখের উপর ডাক দেবে, এমন লোক কেউ নেই।

'বারোশো হাজার ডলার–বারোশো হাজার !' জিনগ্রাস হাঁক দিলে, 'চ'লে যাচ্ছে–শস্তায়–বারোশো হাজার ডলার !'

শুঁড়িখানার মালিক ওকহার্স্ট ফিশফিশ ক'রে বললে, 'ওহে, এর উপরে নিরাপদেই আরেকটা হাঁক দিতে পারো–কোল্ডেরুপ কিছুতেই ছেড়ে দেবে না।'

মার্চেণ্ট স্ট্রিটের মনোহারি দোকানের মালিক বললে, 'কোল্ডেরুপ জানে যে কেউ তার উপরে কথা কইতে আর সাহস পাবে না।'

পাশ থেকে অমনি কে যেন প্রায় ধমক বললে, 'শ্ শ্ শ্ ...চুপ।' সবাই কানখাড়া ক'রে আছে রুদ্ধশ্বাসে–কী হয় না-হয়, তার টু শব্দটি কেউ গুলিয়ে ফেলতে চায় না। সকলেরই বুকের মধ্যে ধুকপুক শুরু হ'য়ে গেছে। উইলিয়াম ডাবলিউ. কোল্ডেরুপ অবিশ্যি দিব্যি আছেন–নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার–যেন গোটা ব্যাপারটাতেই তাঁর আর কোনো আর্কষণ নেই। কিন্তু তাঁর আশপাশে যারা ছিলো, তারা সব্বাই দেখলে তাঁর চোখ দুটো যেন গুলিভরা রিভলভারের মতো তৈরি–টু শব্দ হ'লেই ডলার ছুঁড়তে শুরু ক'রে দেবে।

'আর কেউ হাঁকবেন ?' জিগেশ করলে ডীন ফেলপর্গ।

কেউ কোনো কথা বললে না।

'চ'লে যাচ্ছে শস্তায় !' জিনগ্রাস হাঁক দিলে, 'বারোশো হাজার ডলার–এক ! বারোশো হাজার ডলার–দুই !'

ডীন ফেলপর্গ বললে, 'বারোশো হাজার ডলারে আস্ত স্পেনসার আইল্যাণ্ডটাই বিক্রি হ'য়ে যাচ্ছে।...ঠিক জানেন আপনারা, এর উপর আর হাঁকবেন না ? ঠিক ?'

সব্বাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা ক'রে আছে। ঠিক শেষ মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি দাম হাঁকবে নাকি কেউ ? ফেলপর্গ টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়ে হাতির দাঁতের হাতুড়িটা তুলে নিলে, –এক ঘা, দুই ঘা–তারপরেই নিলেম শেষ হ'য়ে যাবে।

হাতুড়িটা আস্তে-আস্তে পড়লো টেবিলে ; টেবিল ছুঁয়েই আবার উঠে পড়লো পরক্ষণে, যেমন ক'রে অসিযুদ্ধের সময় তলোয়ার চলে, তেমনি বিদ্যুদ্বেগে ; তারপর আবার দ্রুতবেগে তা নামতে লাগলো নিচের দিকে।

কিন্তু টেবিলে ঘা দেবার আগেই ভিড়ের মধ্যে তিনটে কথা শোনা গেলো–স্পষ্ট, নির্ভুল ও শান্ত উচ্চারণ :

'তেরোশো হাজার ডলার !'

গোড়ায় লোকে যেন দর শুনেই খাবি খেলে একবার, 'আহ্ !' তার পরেই সকলের সন্তোষ আর ধরে না–যাক ! প্রতিদ্বন্দ্বী একজন তবে দেখা দিয়েছে শেষকালে ! 'আহ্ !' যুদ্ধ তবে একটা বাধলো সত্যিই ! কিন্তু কে সেই বেচাল উজবুক, যে সান ফ্রানসিসকোর কোল্ডেরুপের উপরে কথা বলার সাহস করে ?

লোকটি আর কেউ নয়, স্টকটনের জে. আর. টাসকিনার ।

জে. আর. টাসকিনার যতটা না ধনী, তার চেয়েও বেশি স্থূলকায়–বড্ড বেশি মোটা ভদ্রলোকটি । তাঁর ওজন হবে ৪৯০ পাউণ্ড । শিকাগোতে সে-বার যখন জগতের সবচেয়ে পৃথুল ব্যক্তির নির্বাচন হয়েছিলো, তখন তিনি অল্পের জন্যে যে প্রথম হননি, তার কারণই হ'লো সেদিন তিনি নৈশভোজ শেষ করার সময় পাননি–তাই প্রথম যে হয়েছিলো তাঁর সঙ্গে তাঁর ওজনের মাত্র বারো পাউণ্ড তফাৎ হ'য়ে যায় ।

এই বিরাট স্তম্ভটি উপবিষ্ট হওয়ার জন্যে বিশেষ মাপে বিশেষ ধরনের চেয়ার প্রস্তুত ক'রে নিয়েছেন–ও-সব বৃহদায়তন আশবাব থাকে সান জোয়াকিম-এর স্টকটনে–তাঁর প্রাসাদোপম অট্টালিকায় । স্টকটন হচ্ছে ক্যালিফরনিয়ার একটি নামজাদা নগর–দক্ষিণাঞ্চলের খনিগুলোর স্নায়ুকেন্দ্র–উত্তরের খনিগুলোর স্নায়ুকেন্দ্র স্যাক্রামেনটোর প্রতিদ্বন্দ্বী ।

কেবল যে খনির মালিক ব'লেই টাসকিনারের অগাধ টাকা তা নয়–পেট্রল বেচেই প্রধানত তিনি কুবেরের সম্পত্তি লাভ করেছেন । তা ছাড়া তাশের জুয়োতেও তাঁর বিস্তর আয় হয়–পোকার খেলায় গোটা মারকিন মুলুকে তাঁর জুড়ি নেই ।

কিন্তু অত টাকা থাকলে কী হয়, লোকে তাঁকে মোটেই সম্মান করে না । লোকের ধারণা মানুষ হিশেবে টাসকিনার মোটেই শ্রদ্ধার পাত্র নন–বরং আস্ত একটি রাস্কেল । দয়ামায়া ব'লে কোনো পদার্থই নেই তাঁর শরীরে–কতবার যে তিনি তাঁর প্রিয় রিভলভারটি সশব্দে ব্যবহার করেছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই ।

এই জে. আর. টাসকিনার কোনোদিনই উইলিয়াম ডাবলিউ. কোল্ডেরুপকে পছন্দ করতে পারেননি । প্রথমত অত টাকা আছে ব'লে তাঁকে তিনি খুবই হিংসে করতেন–তাঁর খ্যাতি ও সম্মানও ছিলো তাঁর চক্ষুশূল । তাছাড়া মোটা লোকেরা রোগা লোকদের যে-রকম ঘেন্না বাসে, অপছন্দ করে, কোল্ডেরুপকে সে-রকমই ঘৃণা করতেন টাসকিনার । শুধু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব নিয়েই এর আগেও অনেকবার কোল্ডেরুপকে তিনি উত্ত্যক্ত করেছেন । কোল্ডেরুপ তো এ-ধরনের লোক অনেক ঘেঁটেছেন–সব বারেই অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি উদাসীন ও নির্বিকার-ভাবে টাসকিনারকে জব্দ করেছেন ।

এই তো সেদিন স্যাক্রামেনটোর বিধানসভার নির্বাচনের সময় কোল্ডেরুপ আর টাসকিনারে মস্ত একটা বিরোধ বেধেছিলো । টাসকিনারের সব অপপ্রচার, গালিগালাজ, অর্থব্যয় সত্ত্বেও শেষটায় কোল্ডেরুপই অবশ্য বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন–আর তারই ফলে টাসকিনার এখনও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর মহা খাপ্পা হ'য়ে রয়েছেন । ঘা-টা এখনও পুরোপুরি শুকোয়নি কিনা ।

কেউ জানে না কেমন ক'রে টাসকিনার খবরটা পেয়েছিলেন । অবশ্য তাঁর প্রচুর চর আছে চারদিকে । কিন্তু যেই তিনি খবর পেলেন যে কোন্ডেরুপ স্পেনসার আইল্যাণ্ড কিনে নেবেন ব'লে মনস্থির করেছেন, অমনি কোন্ডেরুপকে জ্বালাতন করবার জন্যে তিনি এসে হাজির হয়েছেন । দ্বীপটি যে কোনো কাজেই লাগবে না, বরং দ্বীপটি কেনবার চেষ্টা করার মানেই হ'লো অহেতুক টাকা ওড়ানো, তা কোন্ডেরুপের সঙ্গে-সঙ্গে টাসকিনারও ভালোই জানতেন । কিন্তু তবু নিলেমের সময় দাম চড়িয়ে দিয়ে কোন্ডেরুপকে তো উত্যক্ত করা হ'লো ।

আর সেইজন্যেই এই কৌতূহলী দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে এই নিরেট ৪৯০ পাউণ্ডকে সশরীরে হাজির হ'তে দেখা গেলো । লোকে অবশ্য তাঁকে দেখে গোড়ায় তাঁর মৎলবটা টের পায়নি । টাসকিনার কেবল অপেক্ষা করছিলেন কোন্ডেরুপ কখন দাম হাঁকেন । নিমীলিত কুৎকুতে নয়নে কোন্ডেরুপের দিকে তাকিয়ে টাসকিনার যখন বুঝতে পারলেন যে দ্বীপটা কুক্ষিগত হ'য়ে গেছে ব'লে কোন্ডেরুপ মোটামুটি নিশ্চিন্ত হ'য়ে গেছেন, তখনই তিনি ফানুশ ফাটালেন :

'তেরোশো হাজার ডলার !'

এবং তক্ষুনি সব লোক চকিতে ঘুরে গিয়ে অবলোকন করলে কে এই অর্বাচীন কুবেরনন্দন ! 'ও : ! মোটা টাসকিনার !' তাঁকে দেখেই অস্ফুট রব উঠলো নিলেমভবনে ।

হ্যাঁ, মোটা টাসকিনারকে মারকিন মুলুকে কে না চেনে । কারটুন-আঁকিয়েদের কল্যাণে তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রতিরূপ বহু খবর-কাগজের পাতাতেও ফূর্তির সঙ্গে নানা সময়ে শোভা পেয়েছে ।

এবার কিন্তু টাসকিনারের ৪৯০ পাউণ্ড কারু কৌতূহল উশকে দেয়নি । লোকে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো অন্য-একটি মহোৎসবের প্রত্যাশায় । এ-যে একেবারে সরাসরি যুদ্ধে নামলে কোন্ডেরুপের বিপক্ষে ! ডলার বনাম ডলারের লড়াই—দুজনেই প্রায় রোদে টাকা শুকোন ! কাজেই প্রথম উত্তেজনার শোরটা কেটে যেতেই ঘরে এমন স্তব্ধতা নামলো যে মাকড়শার জাল বোনার শব্দ বোধহয় অনায়াসেই শোনা যেতো ।

স্তব্ধতা ভাঙলে ডীন ফেলপর্গের আহ্লাদিত গলা : 'শস্তায় চ'লে যাচ্ছে স্পেনসার আইল্যাণ্ড—মাত্র তেরোশো হাজার ডলারে !'

উইলিয়াম ডাবলিউ. কোন্ডেরুপ তখন ধীরেসুস্থে ফিরে দাঁড়িয়ে জে. আর. টাসকিনারের ৪৯০ পাউণ্ড অবলোকন করছেন । লোকে স'রে গিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে তখন জায়গা ক'রে দিয়েছে । সান ফ্রানসিসকোর নামজাদা আর স্টকটনের উচ্চাশা তখন পরস্পরের দিকে নির্বিকার ভঙ্গিতে চোখে-চোখে তাকিয়ে আছেন ।

ওইভাবে তাকিয়ে থেকেই কোন্ডেরুপ বললেন, 'চোদ্দশো হাজার ডলার ।'

চোখ না-নামিয়েই টাসকিনার বললেন, 'পনেরোশো হাজার !'

'ষোলোশো হাজার !'

'সতেরোশো হাজার !'

গ্লাসগোর দুই মাতব্বরের গল্প জানেন ? কারখানার চিমনি কে কত উঁচুতে তুলতে পারে ব'লে তারা একবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলো । এঁরা দুজনেই এখনও শূন্যে চিমনি

তুলছেন–তবে সে-চিমনি আগাগোড়া সোনায় মোড়া ।

কোন্ডেরুপ অবিশ্যি প্রতিবারই দর হাঁকার আগে কয়েক মুহূর্ত সময় নিচ্ছেন–কিন্তু টাসকিনারের হাঁক বোমার মতো ফেটে পড়ছে নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় ।

‘সতেরোশো হাজার ডলার !’ ফেলপর্গ চ্যাঁচালে, ‘এ কি আবার একটা দাম নাকি ? দ্বীপটা খোলামকুচি নাকি যে এত শস্তায় বিক্রি হবে । নাঃ, মশাইরা আরেকটু দর তুলুন !’

‘আঠারোশো হাজার ডলার !’ আস্তে বললেন কোন্ডেরুপ ।

‘উনিশশো হাজার !’ টাসকিনারের হুংকার উঠলো ।

‘কুড়ি লক্ষ ডলার !’ কোন্ডেরুপ এবার যেন না-ভেবেই দুমদাম কথাটা ব’লে ফেললেন । তাঁর মুখটা এতক্ষণে একটু বিবর্ণ দেখাচ্ছে, তবে তিনিও নাছোড়বান্দা, সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন ।

টাসকিনার তো তখন অগ্নিশর্মা । তাঁর মস্ত মুখমণ্ডলের ভাঁটার মতো চোখ দুটো যেন রেলগাড়ির সিগন্যাল–লাল জ্বালিয়ে রেখেছে, কারু ধারে-কাছে ঘেঁষা নিষেধ । কিন্তু ওই লাল লণ্ঠন দেখেই কি মানবেন কোন্ডেরুপ– না কি হুশ-হুশ ক’রে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে তাঁর ইঞ্জিন চালিয়ে দেবেন ?

মোটা-মোটা আঙুল দিয়ে সোনার চেনে ঝোলানো বুকপকেটের ক্রনোমিটারটা নাড়তে-নাড়তে টাসকিনার বললেন, ‘কুড়ি লক্ষ চারশো হাজার ডলার !’ ভাবলেন বুঝি এক লম্ফেই এবার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেরিয়ে যাবেন ।

অত্যন্ত শান্ত গলায় কোন্ডেরুপ বললেন, ‘সাতাশ লক্ষ !’

‘উনত্রিশ লক্ষ !’

‘তিরিশ লক্ষ !’

হ্যাঁ, সান ফ্রানসিসকোর কোন্ডেরুপই ওই শেষ তিরিশ লক্ষ ডলার হেঁকেছেন !

সারা ঘরে হাততালি ফেটে পড়লো–থেমে গেলো, নিলেমওলা হাতুড়ি তুলে টেবিল বাজালে, একবার দু-বার সে দরটা হাঁকলে, তৃতীয়বার হাঁকলেই স্পেনসার আইল্যাণ্ড বিক্রি হ’য়ে যাবে ।

তিরিশ লক্ষ ডলারের ওজন ততক্ষণে ৪৯০ পাউণ্ডকে কুপোকাৎ ক’রে দিয়েছিলো । তবু সেই চিৎপাৎ অবস্থা থেকেই চিঁ-চিঁ রব বেরুলো, ‘পঁয়ত্রিশ লক্ষ ডলার !’

‘চল্লিশ লক্ষ !’ তক্ষুনি হাঁকলেন কোন্ডেরুপ । হাঁকলেন না তো, যেন কুড়ুলের শেষ কোপ দিলেন । টাসকিনার আর পারলেন না । হাতুড়ি বাজতে লাগলো –

এবং চল্লিশ লক্ষ ডলারে সান ফ্রানসিসকোর উইলিয়াম ডাবলিউ. কোন্ডেরুপ প্রশান্ত মহাসাগরের স্পেনসার আইল্যাণ্ড কিনে নিলেন ।

‘এর শোধ আমি নেবোই,’ বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে রুষ্টভাবে তাকিয়ে টাসকিনার চ’লে গেলেন অকসিডেন্টাল হোটেলে ; রাগে-ঘৃণায় তাঁর সর্বাঙ্গ রি-রি ক’রে জ্বলছে ।

কিন্তু তিন-তিরিক্কে ন-বার উঠলো ‘হিপ-হিপ হুরে’ ধ্বনি–আর কানে সেই অভিনন্দন যতক্ষণ ধ’রে বাজলো তার মধ্যেই কোন্ডরুপ ফিরে গেলেন মানগোমেরি স্ট্রিটে । উৎসাহের চোটে মারকিনরা ‘ইয়াঙ্কি ডুডল’ গেয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে ভুলে গিয়েছিলো ।

৩

গডফ্রের জন্য ফিনা অপেক্ষা করবে কিনা !

উইলিয়াম ডাবলিউ. কোল্ডেরুপ মানগোমেরি স্ট্রিটে তাঁর ম্যানশনে ফিরে এসেছেন তখন। মানগোমেরি স্ট্রিট হচ্ছে সান ফ্রানসিসকোর রিজেন্ট স্ট্রিট, ব্রডওয়ে, বুলভার দে ইতালিয়ঁ। রাস্তাটা গেছে শহরের সমান্তরভাবে–শহর যদি হয় কোনো প্রাণী, তো এটা তার ধমনী–সবসময়েই সেখানে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়; অগুনতি ট্রামের ঘর্ঘর ; ঘোড়ায়-টানা খচ্চরে-টানা চার চাকার দু-চাকার গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ ; ফুটপাথ ধ'রে শশব্যস্ত কর্মচঞ্চল মানুষের জুতোর মশমশ ; সরাইখানায় শুঁড়িখানায় সারাক্ষণ লোকের কোলাহল–মানগোমারি স্ট্রিট কখনোই চুপচাপ থাকে না ।

সান ফ্রানসিসকোর নবাবসাহেবের ম্যানশনটার বর্ণনা দেবার কোনো দরকার নেই, আশা করি। এত কোটি-কোটি ডলারের সঙ্গে মানিয়েই বিলাস ও ভোগের ব্যবস্থা–যতটা-না রুচির ছাপ দেখা যায়, তার চেয়েও বেশি পাওয়া যায় আরাম । ব্যাবহারিক সুবিধের দিকে যতটা নজর, বাড়ির সৌন্দর্যের দিকে তার সিকিভাগও নেই । তা আর কী ক'রে হবে ? একেবার সবকিছুই তো আর মানুষের ভাগ্যে জোটে না । পাঠক শুধু এটুকুই জানুন যে লোক এলে যে-ঘরটায় বসতে দেয়া হয়, যে-ঘরটার তুলনা নেই । কোল্ডেরুপ এসে যখন সেই চমকপ্রদ ঝকঝকে ও মস্ত ঘরটায় ঢুকলেন, সে-ঘরে তখন পিয়ানো বাজছিলো ।

'ভালোই হ'লো !' কোল্ডেরুপ বললেন, 'ওরা দুজনেই আছে দেখছি । খাতাঞ্চিকে একটা কথা ব'লে আসি, তারপর একটু আলাপ ক'রে দেখা যাবে এদের সঙ্গে ।'

ব'লে তিনি আপিশ ঘরে গিয়ে স্পেনসার আইল্যাণ্ডের তুচ্ছ ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়ে পুরো ব্যাপারটাকেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন । কতগুলো দলিল-দস্তাবেজ তাঁর ব্যাগে আছে–সেগুলোতে স্ট্যাম্প বসিয়ে মোহর ক'রে দিলেই দ্বীপটা তাঁর হ'য়ে যাবে । এ-বিষয়ে তাঁর দালালকে শুধু পাঁচ-ছ লাইন লিখে জানানো–বাস, সব কাজ শেষ । তারপর কোল্ডেরুপ ওই যুগলের দিকে দৃষ্টি দেবেন–ওদের তাঁর ভালোই লাগে ।

হ্যাঁ, ওরা দুজনেই আছে ড্রয়িংরুমে । মেয়েটি ব'সে আছে পিয়ানোয়, ছেলেটি আধ শোয়া ভঙ্গিতে সোফায় হেলান দিয়ে উদাসীনভাবে শুনছে সেই ঝমঝমে সুর ।

'শুনছো তো ?' মেয়েটি জিগেশ করলে ।

'নিশ্চয়ই ।'

'শুনছো তো, কিন্তু ধরতে পেরেছো কোন সুর ?'

'ধরতে পেরেছি কি না ! ফিনা, এত চমৎকার ক'রে কোনোদিন তুমি "বুড়ো রবিন গ্রে"র সুরটা বাজাওনি ।'

'কিন্তু গডফ্রে, এটা মোটেই "বুড়ো রবিন গ্রে" নয়–এটার নাম হ'লো "সুখী মুহূর্ত ।'

'ওঃ, হ্যাঁ ! মনে পড়েছে !' গডফ্রের গলার উদাসীনতাকে না-চেনার কোনো সুযোগই ছিলো না ।

ফিনা তার দুটি হাত তুলে আনলে, শূন্যে উদ্যত রইলো হাত দুটি, বুঝি আবার পিয়ানোর চাবির উপর নেমে আসে–কিন্তু না, সে একটু ঘুরে শান্ত চুপচাপ গডফ্রের দিকে তাকালে একটুক্ষণের জন্য । গডফ্রে তার চোখের দিকে তাকাতে সাহস পেলে না, অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো ।

ফিনা হলানে হ'লো কোল্ডেরুপের পালিতা কন্যা । মা-বাবা ছিলো না তার–কোল্ডেরুপই তাকে মানুষ করেছেন, শিখিয়েছেন লেখাপড়া, ভাবতে শিখিয়েছেন কোল্ডেরুপের মেয়ে ব'লে, কোল্ডেরুপকে বাবা ব'লে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন । ফিনার বয়েস কম, মাত্র ষোলো, ঠিক সাধারণ অর্থে না-হ'লেও সে রূপসী, সোনালি চুল–আর স্বচ্ছ কালো চোখ দুটি দেখে অবশ্য তাকে ষোলো বছরের মেয়ে ব'লে মনে হয় না, মনে হয়ে আরো-একটু বুঝি-বা পক্ক। কাণ্ডজ্ঞান তার যথেষ্টই হয়েছে, সাংসারিক সুবুদ্ধি এতই বেশি যে প্রায় যেন স্বার্থপর মনে হয়–ঠিক ষোলো বছরের তরুণীরা যে-রকম স্বপ্ন দ্যাখে সচরাচর, তা সে কদাচ দ্যাখেনি । যদি-বা দ্যাখে সে ঘুমিয়ে ; কোনো জাগরস্বপ্নকে সে প্রশ্রয় দেয় না । এখন সে মোটেই ঘুমিয়ে নেই – এবং এখন ঘুমিয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছেও নেই তার।

'গডফ্রে ?' ফিনা ডাক দিলে ।

'বলো !' গডফ্রে তাকে জিগেশ করলে ।

'কোথায় আছো তুমি এখন, জানো তো ?'

'কেন ? তোমার কাছে–এই ঘরে–'

'মোটেই না ! তুমি আমার কাছে নেই গডফ্রে, এই ঘরেও নেই । নিশ্চয়ই অনেক, অনেক দুরে–সমুদ্র পেরিয়েও আরো-দূরে...তাই না ?'

প্রায় যেন কলের পুতুলের মতো ফিনা পিয়ানোর চাবিতে একটা ঝমঝমে বিষণ্ন সুর বাজালে, যার অর্থ কেবল কোল্ডেরুপের এই ভাগ্নেরই কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে ।

গডফ্রে মরগান এই রকমই । কোল্ডেরুপের বোনের ছেলে সে-তারও মা-বাবা ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন, তার পর থেকে এই মাতুলের কাছে মানুষ–ফিনার মতোই । এবং চরকির মতো ব্যাবসার মধ্যে ঘুরলে কী হয়, কোল্ডেরুপের ইচ্ছে হ'লো এই দুটিতে বিয়ে দেন ।

গডফ্রের বয়েস বাইশ পেরিয়েছে । সদ্য পাশ ক'রে বেরিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, হাতে কোনোই কাজকর্ম নেই, কুঁড়েমিতে ঘুণ ধ'রে গেছে দিনগুলোয় । লেখাপড়া শিখে কোনোই লাভ হয়নি তার–কারণ জীবিকার কথা তাকে ভাবতে হয় না ।

উপস্থিত বুদ্ধি আছে গডফ্রের । এমনিতে ভদ্র, শান্ত, আভিজাত্যমণ্ডিত–পোশাক-আশাকের জাঁকজমকে তার বিশ্বাস নেই, দেমাকও নেই কোনোরকম ।

ফিনাকে সে বিয়ে করবে । দুটিতে এমনিতেই নাকি রাজঘোটক, সোনার সঙ্গে সোহাগার মতো মিল–লোকে বলে । তাছাড়া বিয়ের ঘটকালিটা তো করছেন কোল্ডেরুপ স্বয়ং । দুজনেই কোল্ডেরুপের কাছ থেকে অঢেল সম্পদ যৌতুক পাবে । গডফ্রে আর ফিনা পরস্পরকে ভালোবাসে কি না, সে-প্রশ্নই এখানে ওঠে না–কারণ কোল্ডেরুপের ইচ্ছের অন্যথা করবে

কে ? তাছাড়া এই বিয়েটায় কোল্ডেরুপের টাকাও বেহাত হ'য়ে যাবে না, তাঁর আপনজনের মধ্যেই থেকে যাবে। হিশেবেরও সুবিধে কত। জন্ম থেকেই তাদের নামে খাতাঞ্চিখানায় দুটো খাতায় হিশেব লেখা হ'য়ে আসছে–বিয়ের পরে এদের জন্যে একটা যুগ্ম হিশেবের ব্যবস্থা করলেই অনেক হাঙ্গামা ক'মে যায়। কোল্ডেরুপের ইচ্ছে বিয়েটা শিগগিরিই যেন হ'য়ে যায়–কিন্তু এখানেই শেষকালে একটা গোল দেখা দিচ্ছে।

গডফ্রের ইদানীং মনে হচ্ছে তার বয়েস এখনও বিয়ে করার মতো হয়নি। এখনও সে ও-রকম দায়িত্বপূর্ণ কাজের যোগ্য হয়নি। কিন্তু এ-বিষয়ে তার কোনো মতই এযাবৎ চাওয়া হয়নি।

মত যদি কেউ চাইতো, তাহ'লে এ-বিষয়ে অনেক কথাই সে বলতে পারতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা সাঙ্গ হ'তে-না-হ'তেই গডফ্রের সব একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছিলো। একঘেয়ে, আর বিরক্তিকর। পারিপার্শ্বিকের কাছ থেকে কিছুই চাইবার নেই তার–অবশ্য এই কারণেই নেই যে কিছু চাইবার আগেই সব সে সহস্রগুণে পেয়ে যায়। কোনো কাজই নেই তার হাতে। অথচ ছেলেবেলা থেকেই তার ইচ্ছে যে বিশ্বভ্রমণে বেরোয়। জগতের মধ্যে একটা জায়গাই সে কেবল চেনে, সেটা হচ্ছে সান ফ্রানসিসকো–এখানেই তার জন্ম, এবং স্বপ্নে ছাড়া মুহূর্তের জন্যও সে এ-জায়গা ছেড়ে কোথাও যায়নি। দু-তিন বার জগৎ ঘুরে এলে কী এমন ক্ষতি–বিশেষ ক'রে সে যখন মারকিন ? কিন্তু তাতে আখেরে তার ভালোটাই বা কী হবে ? যত দূরেই যাক না কেন, রাস্তায় কি নতুন-কিছু বা অন্য-রকম কিছু শিখতে পাবে ? আর, কোনো তরুণের শিক্ষা শেষ হ'তে কত কোটি মাইল ঘুরে আসা আবশ্যিক ?

অবস্থাটা এখন হচ্ছে এই। এক বছরেরও বেশি সময় ধ'রে গডফ্রে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে–দেশভ্রমণের বদলে পড়ছে ভ্রমণবৃত্তান্ত–পড়ছে না তো, যেন গোগ্রাসে হজম করছে বইগুলো। মার্কো পোলোর সঙ্গে সে গেছে কুবলাই খানের দরবারে, ক্রিস্তোবাল কোলোনের সঙ্গে আবিষ্কার করেছে আমেরিকা, কাপ্তেন কুকের সঙ্গে গেছে প্রশান্ত মহাসাগরে, দ্যুমোঁ দুরবিয়র সঙ্গে পৌঁছেছে অবাচীতে। তাকে না-নিয়েই যে-সব ভ্রমণকারীরা যে-সব জায়গায় গেছেন, সব জায়গায় সে অন্তত একবার ক'রে ঘুরে আসতে চায়। কয়েক বছর ধ'রে বিশ্বভ্রমণের খাতিরে সে মালয়-বোম্বেটেদের কয়েকটা আক্রমণ, অনেকগুলো নৌ-যুদ্ধ, গোটা-কয়েক জাহাজডুবি সহ্য করতেও রাজি আছে। কোনো নির্জন দ্বীপে আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক কি রবিনসন ক্রুসোর মতো অনায়াসে কয়েক বছর সে কাটিয়ে দিতে রাজি ! হ্যাঁ, ক্রুসো, রবিনসন ক্রুসোই সে হ'তে চায় ! ডানিয়েল ডিফো বা ইয়োহান হ্বিস প'ড়েই তার তরুণ কল্পনা এইভাবে উশকে উঠেছে।

আর ঠিক এই সময়ে কিনা তার মামা বিয়ের কথা ভাবছেন ? ফিনা ওরফে ভাবী মিসেস মরগানকে নিয়ে কি আর রবিনসন ক্রুসো হওয়া যাবে ? একাই যেতে হবে তাকে–ফিনাকে ছেড়েই। নয়তো তার এখন বিয়ে করা চলবে না। বিয়ে মানেই তো শেকল! একবার তার এই খেয়াল মিটে যাবার পর বিয়েটা হ'লে ক্ষতি কী ? সে যে চিন-জাপান দূরের কথা, কস্মিনকালে ইয়োরোপেই যায়নি, এতে তার স্ত্রীর কোন লাভটা হ'লো, শুনি?

সেইজন্যেই ফিনার কাছে থেকেও আজকাল গডফ্রে দূরে থাকে, ফিনার কথা শুনতে-

শুনতে বিমনা হ'য়ে পড়ে, সে যখন বাজায় তখন বধির হ'য়ে যায়। এবং ফিনা যেহেতু কাণ্ডজ্ঞান ধরে, সেইজন্যেই শিগগিরই পুরো ব্যাপারটা তার চোখে প'ড়ে গেলো।

অবস্থা দেখে সে যে বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হয়নি, এটা বললে ভুল করা হবে। কিন্তু ব্যাবহারিক বুদ্ধি আছে ব'লেই সে মনে-মনে এটা স্থির করেছে যে গডফ্রে যদি তাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় তো সে বিয়ের আগেই যেন যায়–বিয়ের পরে ওই বাইরের টান তার আর সইবে না।

সেইজন্যেই সে বললে, 'মোটেই না। গডফ্রে, এখন তুমি আমার কাছে নেই–এখন তুমি আছো দূর সমুদ্রে,...অনেক, অনেক দূরে–'

গডফ্রে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালে। ফিনাকে লক্ষ না-ক'রেই পায়চারি করতে শুরু করলে সে, আর তার অন্যমনস্ক তর্জনী পিয়ানোর চাবিতে ঠেকে গেলো। একটা মস্ত তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠলো পিয়ানো থেকে–যেন তার ভাবনারই প্রতিধ্বনি।

ফিনা তার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলো। কিন্তু এ নিয়ে কোনো কথা পাড়ার আগেই দরজা খুলে গেলো।

ঘরে ঢুকলেন কোল্ডেরুপ–যথারীতি নিজের ভাবনাতেই মশগুল। এইমাত্র একটা দায়িত্ব চুকিয়ে এসে আরেকটা কাজে হাত দেবেন ব'লে ভাবছেন।

'তাহ'লে এবারে একটা দিন ঠিক ক'রে ফেললেই হয়,' কোল্ডেরুপ বললেন।

'দিন? কীসের দিন ঠিক করবে, মামা?' গডফ্রে যেন আঁৎকে উঠলো।

'কেন? তোদের বিয়ের তারিখ ঠিক করতে হবে না?' কোল্ডেরুপ রসিকতা করবার চেষ্টা করলেন, 'আমার বিয়ের দিন ঠিক করার কথা বলছি, ভেবেছিলি বুঝি?'

'বিয়ের দিন নয়, বাবা। কবে যাওয়া হবে, তার দিন ঠিক করা হবে, বলো!' বললে ফিনা।

'কবে যাওয়া হবে? মানে?'

'বাঃ রে, গডফ্রের যাবার দিন!' বললে ফিনা, 'বিয়ের আগে ও একটু জগৎটাকে ঘুরে দেখতে চায়!'

'তুই চ'লে যেতে চাচ্ছিস–তুই?' কোল্ডেরুপ এমনভাবে হাত বাড়িয়ে ভাগ্নের দিকে এগিয়ে এলেন যেন সে চ'লে যাবার চেষ্টা করলেই খপ ক'রে তাকে চেপে ধরবেন।

'হ্যাঁ, মামা।'

'কতদিনের জন্য, শুনি?'

'দেড় বছর...দু-বছর...সব নির্ভর করবে–'

'কীসের উপর?'

'যদি তুমি আমাকে যেতে দাও, আর ফিনা আমার জন্য অপেক্ষা করে।'

'তোর জন্যে অপেক্ষা করবে? বিয়ের কথা শুনেই যে ভাগে, তার জন্য অপেক্ষা?'

'গডফ্রেকে তুমি যেতে যাও,' ফিনা ওকালতি করলে, 'আমি ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। আমার বয়েস খুবই কম–কিন্তু গডফ্রে আরো ছেলেমানুষ। ভ্রমণ করলে ওর বয়েস বাড়বে। আমার মনে হয় না তারপর ওর পছন্দ পালটাবে! দেশ-বিদেশ দেখতে

চায়–দেখে আসুক । তারপর যদি ঘরে ফিরে আসতে চায় তো আমি তো থাকবোই ।'

'মানে ?' কোন্ডেরুপ তো হতভম্ব, 'হাতের পাখি ছেড়ে দিতে চাচ্ছিস তুই ?'

'হ্যাঁ, দু-বছরের জন্যে । দু-বছরই তো বললো ।'

'আর ততদিন তুই ওর জন্যে অপেক্ষা করবি ?'

'দু-বছরও যদি ওর জন্যে সবুর করতে না-পারি তো ওকে আমি ভালোবাসি নাকি ?' ব'লে ফিনা গিয়ে আবার বসলো পিয়ানোয় ।

গডফ্রে সংকুচিতভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো, মামা তার মাথাটা ধ'রে আলোর দিকে ফিরিয়ে তাকে একবার ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করলেন । এবং পিয়ানো থেকে বিদায়বেদনা উত্থিত হ'তে লাগলো । কোন্ডেরুপ সোজাসুজি গডফ্রের চোখের দিকে তাকালেন, 'তুই ঠিক যেতে চাচ্ছিস ? সীরিয়াস ?'

'নিশ্চয়ই,' ফিনা পিয়ানো থেকে ব'লে উঠলো ।

'ফিনাকে বিয়ে করবার আগে তুই ভ্রমণ করতে চাস ? ঠিক আছে– তাই যাবি তুই, ভ্রমণেই বেরুবি । কিন্তু যেতে চাস কোথায় ?'

'সবখানে ?'

'কবে যেতে চাস ?'

'তুমি অনুমতি দিলেই বেরিয়ে পড়ি ।'

'ঠিক আছে,' ব'লে ভাগ্নের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে মামা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'তাই ভালো–শুভস্য শীঘ্রম্ ।'

কোন্ডেরুপ গিয়ে পিয়ানোর চাবিতে এমন জোরে চাপ দিলেন যে পিয়ানোটা হঠাৎ ভীষণভাবে কর্কশ ও বেসুরো আর্তনাদ ক'রে উঠলো ।

৪

জাহাজের নাম 'স্বপ্ন'–
ফিরবে সে কি কক্খনো ?

তাঁর নামটা আসলে টি. আর্টলেট, কিন্তু লোকে তাঁকে ডাকতো টার্টলেট হ'লে । টার্টলেট ক্যালিফরনিয়ার নৃত্যের অধ্যাপক । বিয়ে করেননি, বয়েস পঁয়তাল্লিশ । কিন্তু গত প্রায় বারো বছর ধ'রেই এক বয়স্ক মহিলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হ'য়ে আছে—ইত্যাদি যত কথাই বলা যাক না কেন, তাঁকে ঠিক স্পষ্ট চেনা যাবে না–তার চেয়ে বরং তাঁর একটা রেখাচিত্রই আঁকা যাক ।

'তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই, রাত সোয়া তিনটের সময় । এখন তাঁর উচ্চতা পাঁচ ফিট দু-ইঞ্চি, আর প্রস্থ সোয়া দুই ফিট । গত বছরে ছ-পাউণ্ড বেড়ে গিয়ে এখন তাঁর ওজন দাঁড়িয়েছে একশো একান্ন পাউণ্ড দুই আউন্স । মাথার আকার

চৌকো। কপালের কাছে চুল অতি কম, রঙ ধূসর বাদামি, কপাল চওড়া, মুখ ডিমের মতো গোল ছাদের, রঙ ফরশা। চোখের রঙ ধূসর বাদামি, ভুরু আর চোখের পাতার রঙ চেস্টনাট, বাঁকা ভুরুর তলায় চোখগুলো কোটরে-বসা, দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ভালো। নাকটা মাঝারি আকারের, বাঁ-দিকের নাকের বাঁশিটা একটু ফোলানো। গাল ও কপালের দু-পাশ সমতল ও নির্লোম। কানগুলো মস্ত ও চাপা। মুখটা মাঝারি আকারের, কোনো দাঁতই পোকায় কাটা নয়। ঠোঁটদুটো পাৎলা, নাকের তলায় প্রায় রাজকীয় একটি গোঁফ, চিবুক গোল–এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত। স্ফীত গলদেশে একটা ছোট্ট তিল আছে। স্নান করার সময় দেখা যায় তাঁর গায়ের চামড়া শুভ্র ও মসৃণ। জীবনযাত্রা নিয়মবদ্ধ ও শান্তশিষ্ট। স্ফীতকায় নন, নাচেন এবং নাচ শেখান বলেই স্থূলাঙ্গ হ'তে পারেননি তিনি, কিন্তু জন্মাবধি স্বাস্থ্য অটুট রেখেছেন। তাঁর ফুশফুশ ভারি অস্বস্তিপরায়ণ, সেই জন্যে ধূমপানের অভ্যেস করেননি। কফি, মদ, নির্জল সুরা–কিছুই পান করেন না। অর্থাৎ যা-কিছু তাঁর স্নায়ুর পক্ষে পীড়াদায়ক হ'তে পারে, সবই বিষবৎ এড়িয়ে চলেন। হালকা বিয়ার, মেয়েলি সুরা আর জলই কেবল পান করেন সবসময়। এতটা সাবধানি ব'লেই জন্মাবধি তাঁকে কোনো বদ্যি ডাকতে হয়নি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষিপ্র চলে, হাঁটেন দ্রুতবেগে, চরিত্র সহৃদয়, খোলামেলা, কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। অন্যদের জন্যে এতই ভাবেন যে তাঁকে বলা যায় চূড়ান্ত পরার্থপর–যদি ভাবী স্ত্রী কস্মিন্‌কালে কোনো কিছুতে হঠাৎ অসুখী হ'য়ে পড়েন, এইজন্যেই এখনও পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হননি।'

অন্তত কেউ যদি তাঁকে জিগেশ করতো, তাহ'লে নিজের সম্বন্ধে এই তথ্যগুলোই লিপিবদ্ধ করতেন টার্টলেট। সেইজন্যেই এক বিশেষ বয়সের মহিলার কাছে যদিও তিনি বেশ বাঞ্ছিতই ছিলেন, তবু সেই প্রত্যাশিত মিলন এ-যাবৎ ঘ'টে ওঠেনি। অধ্যাপক টার্টলেট এখনও অবিবাহিতই থেকে গেছেন এবং যথারীতি লোকেদের নৃত্য শেখাচ্ছেন।

নৃত্যশিক্ষক হিশেবেই উইলিয়াম ডাবলিউ. কোল্ডেরুপের ম্যানশনে ঢুকেছিলেন টার্টলেট। যত দিন যেতে লাগলো, ততই তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে ত্যাগ করতে লাগলো–এবং শেষটায় সেই ধনাঢ্য প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রের মধ্যে একটি ঘূর্ণ্যমান চাকা হ'য়েই তিনি থেকে গেলেন। কিছু-কিছু বাতিক তাঁর আছে সত্যি, এক কথায় উৎকেন্দ্রিকই বলা যায় তাঁকে, কিন্তু মোটের উপর মানুষটি খুবই সাহসী। সবাই তাঁকে পছন্দ করে। গডফ্রেকে তিনি পছন্দ করেন, ফিনাকেও তিনি পছন্দ করেন, এবং তারাও তাঁকে ভালোই বাসে। জগতে তাঁর উচ্চাশা একটাই–এদের দুজনকে নাচের সব রহস্য শেখাতে হবে, আর সেই জন্যেই এদের পিছন তিনি সহজে ছাড়তে চান না, আঠার মতো জুড়েই থাকেন পিছনে।

এই অধ্যাপক টার্টলেটকেই কোল্ডেরুপ তাঁর ভাগ্নের সহযাত্রী হবার জন্যে বেছে নিলেন। কোল্ডেরুপের ধারণা হয়েছিলো, গডফ্রের ওই চুলবুল ক'রে ওঠার পিছনে টার্টলেটের যৎকিঞ্চিৎ অবদান আছে। সেইজন্যেই তিনি স্থির করেছিলেন যে এরা দুজনে একসঙ্গেই বেরুবে দেশভ্রমণে। আর এ-কথা ঠিক ক'রেই তিনি পরের দিন, মে মাসের ১৬ তারিখে, অধ্যাপক টার্টলেটকে নিজের আপিশে এত্তেলা দিলেন।

কোল্ডেরুপের তলব আসলে অনুরোধই, কিন্তু টার্টলেটের কাছে তা অনড় নির্দেশ। পকেট-বেহালাটা সঙ্গে নিয়ে, সবরকম দুরবস্থার জন্যে তৈরি হ'য়েই, নাচের ভঙ্গিতে টার্টলেট

ম্যানশনের সিঁড়ি বেয়ে হালকা পায়ে উঠে গেলেন । একবার কড়া নেড়ে ভিতরে ঢুকলেন টার্টলেট, শরীরটা অর্ধেক হেলানো, কনুইগুলো কি-রকম গোল হ'য়ে আছে, মুখে হাসির রেখা, এবং আড়াআড়িভাবে দুটি পায়ে ভর দিয়ে তৃতীয় একটা ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন টার্টলেট, গোড়ালি দুটো শূন্যে তোলা—সব ভর আসলে পড়েছে পায়ের পাতাতেই । টার্টলেট ছাড়া অন্য-কোনো লোক এ-রকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না, হুড়মুড় ক'রে আছাড় খেয়ে পড়তো টাল সামলাতে না-পেরে, কিন্তু টার্টলেট দিব্যি লম্বমান হ'য়েই রইলেন ।

'মিস্টার টার্টলেট,' কোল্ডেরুপ বললেন, 'আপনাকে একটা খবর দেবো ব'লে ডেকে পাঠিয়েছিলুম—শুনে আপনার হয়তো তাক লেগে যাবে ।'

'বলুন ।'

'বছর-দেড় বছরের জন্যে আমার ভাগ্নের বিয়েটা স্থগিত রাখতে হচ্ছে । গডফ্রে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে চায়, ইয়োরোপ আমেরিকার সব দেশগুলোয় একবার ক'রে ঢুঁ মারতে চায়—এবং এই আজব খেয়ালটা তাকে নাকি মেটাতেই হবে ।'

'গডফ্রে তার জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করবে—সোনার টুকরো ছেলে—' টার্টলেট শুধু মুখবন্ধ করেছিলেন, কিন্তু কোল্ডেরুপ চট ক'রে তাঁকে থামিয়ে দিলেন, 'সোনার টুকরো ছেলেটি শুধু দেশের কেন, তার নৃত্যশিক্ষকেরও মুখ উজ্জ্বল করবে ।'

টার্টলেট ঠাট্টাটা ঠিক ধরতে পারলেন না, বরং হালকা পায়ে একবার পাক খেয়ে কোমরের দিকটা হেলিয়ে—দেহের বাকি অংশ কেমন ক'রে যেন সটানই রইলো—প্রশংসাটা গ্রহণ করলেন ।

কেল্ডেরুপ ব'লে চললেন, 'আমি ভেবেছিলুম ছাত্রের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'লে আপনার খুবই মন খারাপ করবে ।'

'তা মন খারাপ করবে বৈ কি ! তবে দরকার হ'লে –'

কোল্ডেরুপ তাঁকে থামিয়ে দিলেন । 'দরকার হবে না । আমি ভেবে দেখেছি যে মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে তাঁর প্রিয় ছাত্রকে সরিয়ে দেয়াটা ভারি হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা হবে । সেইজন্যেই ঠিক করেছি মাস্টারমশাইও যাবেন তাঁর প্রিয় ছাত্রের সঙ্গে—দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ালে কেবল যে আমার ভাগ্নেরই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ হবে, তা নয়—তার যে-মাস্টারমশাই তার মধ্যে সদিচ্ছাকে এমনভাবে জাগিয়ে তুলেছেন, তাঁরও যথাযোগ্য সম্মাননা হবে !'

কথাটা শুনতে-শুনতে এই মস্ত শিশুটি নাচের ভঙ্গিটা একটু পালটে নিয়েছিলেন, আর কোল্ডেরুপের কথার শেষদিকটা তাঁকে এমনি হকচকিয়ে দিয়েছিলো যে নাচের মুদ্রায় বেশ একটা গণ্ডগোলও হ'য়ে গেলো । কিন্তু টার্টলেট সেদিকে লক্ষ্যও করলেন না ।

কস্মিনকালেও তিনি ভাবেননি যে একদিন তাঁকে সান ফ্রানসিসকো, তথা ক্যালিফরনিয়া তথা মারকিন মুলুক ত্যাগ ক'রে মস্ত খোলামেলা সমুদ্দুরে বেরিয়ে পড়তে হবে । ভূগোলবিদ্যার চেয়ে মঞ্চসজ্জাতেই যাঁর কায়মনোবাক্যের আগ্রহ চিরকাল বেশি, এবং রাজধানীর দশমাইল দূরের শহরতলিতেই যে কী আছে, তা যিনি কোনোদিনই তাকিয়েও দ্যাখেননি, তাঁর মগজে কোনোদিনই এ-ভাবনা গজায়নি । আর এখন...এখন কিনা...

ছাত্রটিকে যে-অ্যাডভেনচারে তিনি পাঠাতে চাচ্ছিলেন, তার সব ঝক্কি-ঝামেলাই যে এখন তাঁকেও পোয়াতে হবে, এই ভাবনাতেই তিনি বড্ড কাহিল হ'য়ে পড়লেন । তাঁর চেয়েও

নিরেট কোনো মাথা এমন আঘাতে চৌচির হ'য়ে যেতো ; পঁয়ত্রিশ বছর ধ'রে মাংসপেশীর অটুট ও নির্ভরযোগ্য সঞ্চালনের পরেও টার্টলেটের মনে হ'লো তাঁর হাত-পায়ের জোড় খুলে যেতে চাচ্ছে । মুহূর্তের জন্যে তাঁর মুখ থেকে যে-দন্তবিকাশটি অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিলো, তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে-করতে টার্টলেট আমতা-আমতা করলেন, 'মানে...আমি... সম্ভবত...'

'আপনি ওর সঙ্গে যাবেন,' এক কথাতেই কোল্ডেরুপ বুঝিয়ে দিলেন যে এ-বিষয়ে আর-কোনো আলোচনা করতেই তিনি রাজি নন ।

এই প্রস্তাবে গররাজি হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না–টার্টলেট স্বপ্নেও অস্বীকৃত হবার কথা ভাবতে পারলেন না । তিনি তো একটা খেয়ালের পুলিন্দা ছাড়া কিছুই নন এই ধনকুবেরের কাছে–এবং তাঁর খেয়াল অনুযায়ীই এখন তাঁকে লাট্টুর মতো জগতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি ঘুরে মরতে হবে ।'কবে রওনা হবো ?' নাচের মুদ্রা পালটাতে-পালটাতে টার্টলেট জিগেশ করলেন ।

'এক মাসের মধ্যেই ।'

'আর প্রথমে কোথায় যেতে হবে ?'

'নিউ-জিল্যাণ্ডে,' বললেন কোল্ডেরুপ, 'প্রথমে যাবেন প্রশান্ত মহাসাগর ধ'রে নিউ-জিল্যাণ্ডে । শুনেছি যে মাওরিদের কনুই নাকি ভারি শক্ত আর বাইরে বেরিয়ে থাকে, অন্যদের পাঁজরে খোঁচা লাগায়–আপনারা গিয়ে তাদের শেখাতে পারবেন কী ক'রে বেমালুম কনুই ভাঁজ ক'রে রাখলে অন্যদের অসুবিধে হয় না !'

কোল্ডেরুপের মাথা হেলাবার ভঙ্গিতেই বোঝা গেলো যে কথাবার্তা শেষ হ'য়ে গেছে । উত্তেজিতভাবে সেই ধনকুবেরের আপিশঘর থেকে বেরিয়ে এলেন টার্টলেট–জীবনে প্রথমবার তাঁর শিল্পবোধ তিনি বিসর্জন দিলেন, পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে ঘুরপাক খেতে-খেতে বেরিয়ে না-এসে তিনি এই প্রথম গোড়ালির উপর ভর দিয়ে এমনভাবে এগিয়ে এলেন, যাকে মোটেই নাচ বলা চলে না–বলে হাঁটা ।

+

উইলিয়াম ডাবলিউ. কোল্ডেরুপের যাকে বলে একটা নৌবহরই ছিলো : ব্যাবসার জন্যেই জাহাজগুলি কিনেছিলেন তিনি–বেশির ভাগই সদাগরি জাহাজ, কোনোটা বাষ্পে চলে, কলের জাহাজ–কোনটা বা মাস্তুলে পাল তুলে দেয় । সেইজন্যেই ঠিক হয়েছিলো যে গডফ্রে তাঁরই একটা জাহাজে ক'রে সাগর পাড়ি দেবে ।

কোল্ডেরুপের নির্দেশে 'ড্রিম' বা 'স্বপ্ন' ব'লে ২০০ অশ্বশক্তিওলা ৬০০ টনের একটি জাহাজ বিশ্বভ্রমণের জন্য তৈরি হ'লো । জাহাজের কাপ্তেনের নাম টারকট ; বেশ শক্তপোক্ত নোনাধরা নাবিক টারকট–তিনি একবারও যাননি, জগতে হেন সমুদ্র নেই । হারিকেন, টরন্যাডো, সাইক্লোন, টাইফুনের বন্ধু টারকট, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অব্দি তিনি নাবিক। বয়েস পঞ্চাশ, এর মধ্য চল্লিশ বছরই কেটেছে সমুদ্রে । ডাঙায় থাকলেই কেমন তাঁর অস্বস্তি হয় ; সমুদ্রের মধ্যে দোদুল্যমান জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে একবার এ-পায়ে আরেকবার ও-পায়ে ভর সামলাতে-সামলাতে এক হিশেবে টার্টলেটের চেয়েও ভালো নাচিয়ে হ'য়ে পড়েছেন টারকট ।

কাপ্তেন টারকট ছাড়া জাহাজে আছে একজন মেট, একজন এঞ্জিনিয়ার, চারজন বয়লার ঘরের ওস্তাদ, আর বারোজন সেরা মাল্লা—একুনে আঠারোজন লোক। ঘণ্টায় আট মাইলের বেশি যাবার তাড়া না-থাকলে এই 'স্বপ্ন' জাহাজটির তুলনা নেই।

কোনো মাল নেবে না এবারে জাহাজটি, যাতে দরকার হ'লে যে-কোনোখানে 'স্বপ্ন'কে ডুবিয়ে দিলেও কোনো লোকসান না-হয়—ঠিক ছিলো যে-সব জায়গায় কোল্ডেরুপের ব্যাবসা আছে, সে-সব জায়গায় ঘুরে-ঘুরে সে তদারক করবে।

কোল্ডেরুপ আর কাপ্তেন টারকটের মধ্যে গোপনে একাধিকবার নানা পরামর্শ হ'লো—কী-যে কথাবার্তা হ'লো দুজনের মধ্যে, তা কোনো কাকপক্ষীও টের পেলে না, কেবল অষ্টম দিনের আলোচনার পর টারকটকে দেখা গেলো বিড়বিড় ক'রে বকতে, 'এ-রকম কোনো কাজ যদি কস্মিনকালেও আগে ক'রে থাকি তো পাঁচশো হাজার ডেভি জোন্‌স যেন আমাকে পাতালে চুবিয়ে দেয়!'

সবাই জানলে যে 'স্বপ্ন' প্রথমে যাবে নিউ-জিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ডে, অবশ্যি পথে দরকার হ'লে কয়লার জন্যে প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো ডাঙায় বা কোনো চিনে বন্দরে থামা যাবে।

যতক্ষণ-না জাহাজ ছাড়ছে ততক্ষণ কোথায় যাচ্ছে না-যাচ্ছে তাতে গডফ্রের কোনো মাথাব্যথা নেই, আর টার্টলেট তো রোজই সমুদ্রের সহস্র বিপদকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছেন।

যাবার আগে অবিশ্যি গডফ্রে আর ফিনার একটা যুগল ফোটো তোলা হয়েছিলো—বাগ্‌দত্ত তো হাজার হোক, কাজেই অনুপস্থিতির সময় ফোটোই হবে মানুষটির প্রতিনিধি। সেইজন্যেই জুন মাসের গোড়ার দিকে একদিন গডফ্রে আর ফিনা মানগোমেরি স্ট্রিটের ফোটোওলা স্টিফেনসন অ্যাণ্ড কম্পানিতে গিয়ে হাজির হয়েছিলো। ঠিক ছিলো, যুগল ছবি ছাড়াও দুজনের আলাদা ক'রে একা ছবি তোলা হবে—ফিনার ছবি ঝুলবে 'স্বপ্ন' জাহাজে, গডফ্রের কামরায়; গডফ্রের ছবি টাঙানো হবে ফিনার শোবার ঘরে।

টার্টলেটেরও একটা ছবি তোলার চেষ্টা করা হয়েছিলো—কিন্তু নেগেটিভ থেকে দেখা গেলো টার্টলেটের ছবিটা কি-রকম যেন কুয়াশায় ভ'রে গেছে। আসলে ক্যামেরাওলাদের সব কথাবার্তা সত্ত্বেও টার্টলেট যেহেতু মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকেননি, তাই ছবিটাও ন'ড়ে গিয়েছে। কিছুতেই আর টার্টলেটের কোনো স্থিরচিত্র তোলা গেলো না—এবং টার্টলেটের চলচ্চিত্র যা হ'লো, তা আদৌ দ্রষ্টব্যই হ'লো না। ফলে শেষ অব্দি তাঁর কোনো প্রতিরূপ বাঁধিয়ে রাখার আশা জলাঞ্জলি দিতে হ'লো।

৯ই জুন, সব তৈরি। 'স্বপ্ন' জাহাজ যাবার জন্য চাকা ঘোরাচ্ছে। কাগজপত্তর সব তৈরি, মায় বিমা-কম্পানির রশিদ শুদ্ধু।

যাবার দিনে সকাল বেলায় মানগোমেরি স্ট্রিটের প্রাসাদে মস্ত একটা বিদায়কালীন ছোটোহাজরির ব্যবস্থা হয়েছিলো।

টেবিলে গডফ্রেকে বেশ অস্থির আর উত্তেজিতই দেখালো। ফিনাকে অবশ্য দেখালো যথেষ্ট শান্ত—সে যে চিন্তায় ভাবনায় আদৌ ব্যাকুল বোধ করছে, এমন-কোনো লক্ষণই তার মুখে নেই। আর টার্টলেট সমুদ্রের ভয়ে গেলাশ-গেলাশ শ্যামপেন ওড়ালেন: ভয়ে তিনি তাঁর পকেট-বেহালাটা সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছিলেন, শেষকালে লোক পাঠিয়ে সেটা তাঁর

বাড়ি থেকে আনানো হ'লো ।

শেষ বিদায়সম্ভাষণ বলাবলি হ'লো জাহাজের ডেকে, শেষ হাত-ঝাঁকুনি হ'লো জাহাজের সিঁড়িতে, আর তারপরেই এঞ্জিন আওয়াজ ক'রে উঠলো, চাকা দু-তিনটে পাক খেলো, আর শব্দ ক'রে জল ছড়ালো ।

'চলি, ফিনা !'

'এসো, গডফ্রে !'

'ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন,' আওয়াজ দিলেন মাতুল ।

'স্বপ্ন' ছেড়ে দিলে, রুমাল নড়লো জেটি থেকে আর ডেক থেকে । একটু পরেই সান ফ্রানসিসকো উপসাগরের মুখে সুবর্ণদ্বার পেরিয়ে এলো 'স্বপ্ন' । সামনেই প্রশান্ত মহাসাগরের দিগন্ত-ছোঁয়া অকূল চঞ্চল জল খেলা করছে । যেন চিরকালের মতো 'স্বপ্ন'র পিছনে সুবর্ণদ্বারটি বন্ধ হ'য়ে গেলো ।

৫

চেনা নেই, শোনা নেই, এক মহোদয়
কোত্থেকে 'স্বপ্নে' যে হয়েছে উদয় !

শুরু হ'লো তবে সাগর-পাড়ি । স্বীকার করতেই হয় যে, এ-পর্যন্ত কোনো অসুবিধেই হয়নি। অধ্যাপক টার্টলেট অবশ্য দুর্ধর্ষ তার্কিক : 'সব সাগর-পাড়িই যখন-খুশি শুরু ক'রে দেয়া যায় । কীভাবে তা শেষ হয়, এটাই হ'লো সবচেয়ে জরুরি বিষয়,' তাঁর এ-কথার সারবত্তা অনস্বীকার্য ।

গডফ্রের কামরার দুয়ার খুললেই 'স্বপ্ন' জাহাজের ডাইনিং-সেলুন । দিব্যি আরামে-গরমে আছে গডফ্রে, স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকু কম হয়নি জাহাজে । কামরায় যেদিকের দেয়ালে সবচেয়ে আলো পড়ে, সেখানটায় সে ঝুলিয়েছে ফিনার ফোটো । দোলানো বিছানা আছে শোবার জন্যে, ঝকঝকে একটা স্নানঘর তার কামরার লাগোয়া, অনেকগুলো দেরাজ রয়েছে কাপড়চোপড় পোশাক-আশাক রাখার জন্য, লেখাপড়া করার জন্য টেবিল রয়েছে একটা, রয়েছে আরাম কেদারা–বাইশ বছর বয়সী যুবকের এর চেয়ে বেশি আর চাই কী ? এ-রকম ব্যবস্থা থাকলে সে বাইশবার বিশ্বভ্রমণ ক'রে আসতে রাজি । স্বাস্থ্য ভালো, মেজাজ ভালো–তার উপরে এ-সব এবং এত-সব হাতে পেলে এই বয়সে কে আর তত্ত্বচিন্তা করে ?

টার্টলেটের অবিশ্যি মেজাজ তেমন ভালো নেই । গডফ্রের পাশের কামরার কাছেই তাঁর কামরা—বড্ড ছোটো লাগে কামরাটা, বিছানাটা লাগে বড্ড শক্ত, কামরার ছ-বর্গগজ জায়গা তাঁর নাচিয়ে পা ফেলার পক্ষেও যথেষ্ট ঠেকে না ।

একসঙ্গেই বসেন দুজনে খাবার-টেবিলে । আর সঙ্গে বসে কাপ্তেন আর মেট ।

রওনা হবার সময় জুন মাসে আবহাওয়া ছিলো চমৎকার, উত্তরপুব থেকে সুন্দর হাওয়া

বইছিলো। কাপ্তেন টারকট পুরো দমে কল চালিয়ে ও সেইসঙ্গে আবার বড়ো পাল খাটিয়ে দিয়েছিলেন—যাতে জাহাজের গতি বেড়ে যায়। 'স্বপ্ন' মোটেই গড়াচ্ছে না জলের উপর, তরতর ক'রে ঢেউ কেটে এগিয়ে যাচ্ছে রাজহাঁসের মতো হালকা ভাবে। আর সেইজন্যেই কারু সাগর-পীড়া হ'লো না : নাকের ডগা হ'লো না আরক্তিম, চোখদুটি বসলো না কোটরে, কপাল ঠেকলো না তপ্ত, দুই গাল হ'লো না বিবর্ণ। শান্ত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের উপর দিয়ে একটানা এগিয়ে চললো 'স্বপ্ন', আর শিগগিরই মারকিন উপকূল দিগন্তে আড়াল হ'য়ে গেলো।

প্রথম দু-দিন কিছুই ঘটলো না উল্লেখযোগ্য। বেশ তাড়াতাড়িই এগুচ্ছে 'স্বপ্ন'। সাগর-পাড়ির সূচনাটা এত নির্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দ হয়েছিলো যে কাপ্তেন টারকট চেষ্টা ক'রেও মাঝে-মাঝে তাঁর উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারছিলেন না। রোজ যখন সূর্য মধ্যরেখা পেরোয়, তিনি সাবধানে যাবতীয় তথ্য টুকে নেন। তারপর মেটকে নিয়ে ঢুকে পড়েন তাঁর কামরায়—সেখানে গোপনে তাঁদের মধ্যে সারাক্ষণ কী যে ফিশফিশ গুজুর-গুজুর মন্ত্রণা হয়, তা তাঁরাই জানেন, কিন্তু রকম দেখে মনে হয় তাঁরা যেন গভীর কী-একটা উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে। গডফ্রে অবশ্যি এ-সব কিছুই লক্ষ করেনি, কারণ জাহাজ চালাবার ব্যাপারে সে অ-আ-ক-খ-ও জানে না, কিন্তু মাল্লাদের তাতে বেশ কিছুটা আশ্চর্যই হ'তে দেখা গেলো। বিশেষ ক'রে প্রথম সপ্তাহে যখন কোনো ঝামেলাই ছিলো না, তখনও পর-পর কয়েক রাত্তিরে সাবধানে চুপিসাড়ে 'স্বপ্ন'র গতিপথ বদলে ফেলা হ'লো, ও সকালে নতুন উদ্যমে আবার পাড়ি শুরু হ'লো। পাল-তোলা জাহাজ হ'লেও এই বিচিত্র ব্যাপারটির মর্ম হয়তো প্রকৃতির খেয়াল ব'লে অনুধাবন করা যেতো, কিন্তু কোনো কলে-চলা জাহাজের পক্ষে সত্যি ব্যাপারটা ভারি রহস্যময়। মাল্লাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতোই ঠেকলো—অনেক ভেবেচিন্তেও তারা এর কোনো হদিশ পেলে না।

১২ই জুন সকালবেলায় হঠাৎ জাহাজে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো।

কাপ্তেন টারকট, মেট, আর গডফ্রে তখন সবে ছোটোহাজরি সারতে বসেছে, হঠাৎ ডেকে একটা মস্ত শোরগোল উঠলো। পরক্ষণেই সশব্দে খাবার-ঘরের দরজা খুলে উত্তেজিভাবে একজন মাল্লা চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়ালে। চেঁচিয়ে বললে, 'কাপ্তেন টারকট!'

'কী ব্যাপার?' টারকট ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

'এক চিনে—জাহাজে পাওয়া গেছে!'

'চিনে? জাহাজে!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ! সত্যিকার একটা চিনেম্যান—জাহাজের খোলে লুকিয়েছিলো। দৈবাৎ লোকটাকে পাওয়া গেছে!'

'জাহাজের খোলের মধ্যে লুকিয়েছিলো?'

'হ্যাঁ, কাপ্তেন। পাটাতনের তলায়।'

'তাহ'লে ওকে সমুদ্দুরের তলাতেই চালান ক'রে দাও', কাপ্তেন টারকট ব'লে উঠলেন।

মাল্লাটি বললে, 'তাই হবে।'

চিন সাম্রাজ্যের প্রতি ক্যালিফরনিয়ার নন্দনদের যে-বিদ্বেষ আছে, তাতে মাল্লাটির কাছে

হুকুমটা অতি স্বাভাবিকই ঠেকলো। এ-হুকুম মানতে তার একটুও দ্বিধা হবে ব'লে মনে হ'লো না।

কাপ্তেন টারকট অবিশ্যি মেট আর গডফ্রেকে নিয়ে তক্ষুনি সরেজমিন তদন্ত করতে জাহাজের ফোরকাস্‌লের দিকে হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলেন।

এসেই দ্যাখেন হাতকড়া বাঁধা এক চিনেম্যানকে দু-তিনটি খালাশি শক্ত ক'রে পাকড়ে রেখেছে—এবং মাঝে-মাঝে কনুইয়ের দু-একটা গুঁতো দিতেও ছাড়ছে না। চিনের বয়েস হবে পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ, চোখমুখে বুদ্ধির ছাপ আছে, গড়ন ভালো, ক্ষিপ্র চটপটে চেহারা—এখন অবশ্য এই ক-দিন ধ'রে খোলের মধ্যে আলোহাওয়াহীন খুপরিতে অন্ধকারে থেকে-থেকে তাকে বেশ-একটু কাহিল দেখাচ্ছে।

কাপ্তেন টারকট খালাশিদের ইঙ্গিত করলেন তাকে ছেড়ে দিতে।

'কে তুমি ?' জিগেশ করলেন কাপ্তেন।

'সুর্যের ছেলে।'

'নাম কী !'

'সেংভু,' উত্তর দিলে চিনে। চিনে ভাষায় নাকি এর অর্থ : 'যে বাঁচে না।'

'এই জাহাজে তুমি কী করছো ?'

'সাগর-পাড়ি দিতে চাচ্ছিলুম,' ঠাণ্ডা গলায় বললে সেংভু, 'আমি তো কারু কোনো ক্ষতি করিনি।'

'ক্ষতি করিনি !...জাহাজ ছাড়বার সময় তুমি খোলের মধ্যে লুকিয়েছিলে বুঝি ?'

'হ্যাঁ, কাপ্তেন।'

'যাতে আমরা বিনামূল্যে তোমাকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে মারকিন মুলুক থেকে চিনদেশে নিয়ে যাই !'

'যদি দয়া ক'রে নিয়ে যান...'

'আর যদি দয়া ক'রে নিয়ে যেতে না-চাই ? বলি, ওহে হলদে ওরাংওটাং, আমি চাই যে তুমি সাঁৎরেই চিনদেশে চ'লে যাও !'

'চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি,' সেংভু হেসে বললে, 'তবে পথে ডুবে মরবার সম্ভাবনাই বোধহয় বেশি !'

'শোনো, ছোকরা,' কাপ্তেন টারকট একটু রাশভারি রাগি গলাতেই বললেন, 'ভাড়া ফাঁকি দেবার মজাটা তোমাকে আমি টের পাইয়ে দিতে চাই।'

আরেকটু হ'লেই কাপ্তেন টারকট তাকে জলে ছুঁড়ে ফেলতেই বলতেন। অথচ অতটা রাগ করার কোনো কারণই তাঁর ছিলো না। গণ্ডগোল দেখে শেষটায় গডফ্রে চ্যাঁচামেচিতে নাক গলালে, 'ক্যাপটেন, "স্বপ্ন"'র উপর একজন ফালতু চিনেম্যানেই তো ক্যালিফরনিয়ায় একজন চিনে কমলো – আপনার কি মনে হয় না ক্যালিফরনিয়ায় এমনিতেই চিনেদের সংখ্যা বড্ড বেশি !'

'বেশি মানে—ঢের-ঢের বেশি !' বললেন কাপ্তেন টারকট।

'হ্যাঁ, ঢের-ঢের বেশি ! তা এই লোকটা যখন স্বেচ্ছায় তার উপস্থিতি থেকে

ক্যালিফরনিয়াকে রেহাই দিতে চাচ্ছে, তখন তাকে মাফ ক'রে দেয়াই উচিত। আমরা তো ওকে শাংহাইয়ের তীরে নামিয়ে দিতে পারি-খামকা হইচই ক'রে আর কী হবে !'

ক্যালিফরনিয়ায় চিনেদের সংখ্যা বড্ড বেশি, এটা কেবল গডফ্রেরই একার কথা নয়, প্রতিটি মারকিনেরই তাই মনের ভাব। শুধু ক্যালিফরনিয়াতেই চিনেদের সংখ্যা ৫০,০০০; পুরো মারকিন মুলুকে তাদের সংখ্যা ৩০০,০০০,০০০-এরও বেশি। চিনেরা এমনিতে ভারি খাটতে পারে, তাছাড়া তাদের অধ্যবসায়ও প্রচুর। একমুঠো ভাত, এক চুমুক চা আর একগুলি আফিম–বাস, এই দিলেই তাদের দিয়ে যদৃচ্ছা খাটিয়ে নেয়া যায়। মারকিনরা তাদের সঙ্গে যে খুব-একটা সদয় ব্যবহার করে তা নয়–রেড-ইনডিয়ান বা নিগ্রোদের মতোই তারা প্রায়ই লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়–আর সেইজন্যেই তারা দল বেঁধে বস্তিতে বাস করে। সান ফ্রানসিসকোয় তারা থাকে স্যাক্রামেনটো স্ট্রিটে–পুরো রাস্তাটাই চিনেতে গিশগিশ করছে ; সেই টিলে আস্তিনওলা জামা, কানাতোলা টুপি, ডগা-উলটনো জুতা–সব দেখা যায় এই চিনেপট্টিতে ; দেখা যায় চিনে লণ্ঠন, চিনে ঘুড়ি–সব-কিছু। এই চিনেদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার সান ফ্রানসিসকোর ফরাশি থিয়েটারে কাজ করে।

এবং সেংভু হচ্ছে ফরাশি থিয়েটারেরই একজন অভিনেতা। সব মজার ভূমিকাগুলোয় অভিনয় করে সেংভু–অবশ্যি যদি কোনো চিনেকে কোনো প্রহসনের মধ্যে কল্পনা করা যায়; কারণ ক্যালিফরনিয়ার নামজাদা গল্পলিখিয়ে ব্রেট হার্ট লিখেছেন যে তিনি কস্মিনকালেও কোনো চিনেকে হাসতে দ্যাখেননি–এমনকী যখন তারা ফুর্তি করছে কি আমোদ জোগাচ্ছে, তখনও না–তার ফলে চৈনিক অভিনয় দেখলে তিনি বুঝতেই পারেন না কী দেখলেন–প্রহসন, না শোকান্তিক নাটক, না আর-কিছু।

সে যাক গে। মোদ্দা কথাটা হ'লো এই যে সেংভু হ'লো একজন কমেডিয়ান। তা সংবাৎসরিক অভিনয় শেষ হ'য়ে যাবার পর দেশে ফেরবার জন্য ভারি মন-কেমন করছিলো তার–আর সেই জন্যেই সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সে 'স্বপ্ন' জাহাজে উঠে পড়েছিলো। সঙ্গে খাবার-দাবারও নিয়েছিলো সে। হয়তো ভেবেছিলো খোলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সকলের অজানতেই চিনে বন্দরে গিয়ে হাজির হবে। অন্তত প্রাণদণ্ড হবার মতো অপরাধ এটা নয়–ধরা পড়লে জাহাজের কাপ্তেন বড়োজোর কেবল ভাড়ার জন্যে ঝুলোঝুলি টানাহেঁচড়া করতে পারেন।

সেইজন্যেই আসলে গডফ্রে ব্যাপারটার মধ্যে মাথা গলালে। কাপ্তেন টারকট যতটা-না রাগ করেছিলেন, তার চেয়েও বেশি রাগের ভান করছিলেন। তিনি এমন ভঙ্গি করলেন যে যেন নেহাৎ গডফ্রের খাতিরেই তিনি সেংভুর সাজা মকুব ক'রে দিলেন।

সেংভু অবশ্যি আর খোলের মধ্যে গিয়ে লুকোলে না। তবে জাহাজের ডেকেও সে বিশেষ মুখর হ'লো না। মাঝি-মাল্লাদের সে এড়িয়েই চলে, আর নিজের খাবারই চিবোয় দু-বেলা, জাহাজের খাদ্য স্পর্শও করে না ! রোগা মানুষ সেংভু, কাজেই এই অতিরিক্ত ওজন 'স্বপ্ন' জাহাজের প্রায় গায়েই লাগলো না। সে যাচ্ছে বটে, বিনা মাশুলে, তবে কোল্ডেরুপকে তার জন্যে কিছু খরচও করতে হচ্ছে না। আর এই সেংভু-ই কাপ্তেন টারকটের মাথায় এমন-এক ফন্দি জুগিয়ে দিলে যে-মেট ছাড়া যার সত্যিকার কোনো সমঝদার জুটলো না।

'হতভাগা চিনে–মাঝখান থেকে আমাদের ঝামেলায় ফেললো। অবশ্য তার নিজের ঝক্কিটাও নেহাৎ কম নয়।'

'কোন আক্কেলে লোকটা খোলের মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছিলো ?' জিগেশ করলে মেট।

'বিনামুল্যে শাংহাই যাবে ব'লে !' উত্তর দিলেন কাপ্তেন টারকট। 'যত চৈনিক উৎপাত !'

৬

কোল্ডেরুপের ক্ষতি
হ'লো না একতিলও,
যেহেতু 'স্বপ্নে'র
বিমার জোগান ছিলো।

পরের তিন দিনে ক্রমেই ব্যারোমিটার নেমে এলো, একবারও এমনকী তাপমাত্রা বৃদ্ধির কোনো চেষ্টা বা লক্ষণ দেখা গেলো না ; আবহাওয়াও একেক সময় একেক রকম : কখনও বর্ষাবাদল, কখন-বা বিষম হাওয়া, কখনও ঝড়। হাওয়ার তোড় বেশ বেড়ে গেছে, আর দিকও বদল করেছে হাওয়া–দক্ষিণ-পশ্চিমমুখো তার গতি। তাছাড়া ঢেউও ফুলে উঠেছে, মাঝে-মাঝে 'স্বপ্ন'কে ফেনার মাথায় তুলে ধরে, কখনো-বা সবেগে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে আনে। পালগুলো সব ভাঁজ করা, নামানো ; 'স্বপ্ন'কে এখন পুরোপুরি কলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে–এবং পুরোদমেও যাওয়া যাচ্ছে না ; অনর্থক বয়লারের উপর বেশি চাপ দেবার কোনো মানে হয় না।

জাহাজের এই অবিরাম আন্দোলন অবিশ্যি হাসিমুখেই সহ্য করলে গডফ্রে। তার ভাব দেখে বোঝা গেলো যে সমুদ্রকে তার ভালোই লাগছে। কিন্তু সমুদ্র টার্টলেটের চক্ষুশূল, সেই জন্যেই তিনি একেবারে নিস্তেজ ও কাহিল হ'য়ে পড়েছিলেন। নৃত্যশিক্ষকের পা পড়তে লাগলো উলটোপালটা চালে ; কিন্তু নিজের কামরায় যে শুয়ে থাকবেন তারও বা জো কী–জাহাজ যেভাবে আপাদমস্তক দুলছে, তাতে কেমন একটা ভির্মি খাবার দশা। 'হাওয়া ! হাওয়া !' ব'লে নিজের কামরায় তিনি চ্যাঁচাচ্ছিলেন গোড়ায়, শেষকালে সেই-যে ডেকে এসে আশ্রয় নিলেন সেখান থেকে পাদমেকংও আর নড়লেন না। শুধু ঢেউয়ের তোড়ে জাহাজ যখন দোলে, তখন টাল সামলাতে না-পেরে তিনি হুড়মুড় ক'রে চ'লে যান একদিকে, আর জাহাজ যখন ও-কাৎ হয়, তখন দুম ক'রে এসে পড়েন ওদিকে। শেষকালে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন রেলিং, পাকড়ে ধরতে চাইলেন দড়িদড়া–এবং আধুনিক নৃত্যকলার সঙ্গে তাঁর এই অনিচ্ছুক দাপাদাপির কোনো সম্বন্ধই রইলো না !

হায়রে ! একবার যদি বেলুনের মতো হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পায়ের তলার এই আন্দোলন এড়াতে পারতেন ! কোল্ডেরুপের কী খামখেয়াল–শেষকালে তাঁকেই কিনা পাঠালেন এই চর্কিচলা জাহাজে ! দিনে কুড়িবার ক'রে কাপ্তেন টারকটকে তিনি জিগেশ করেন, 'আবহাওয়ার

এই বদখেয়াল কদ্দিন থাকবে ?'

'কী জানি ! ব্যারোমিটারের ভাবগতিক তো সুবিধের নয়,' ভুরু কুঁচকে প্রতিবারই উত্তর দেন কাপ্তেন টারকট ।

'চটপট পৌঁছুতে পারবো তো ডাঙায় ?'

'চটপট, মিস্টার টার্টলেট ? হুম্ !'

'লোকে কি না একে বলে প্রশান্ত মহাসাগর,' বেচারি টার্টলেট শুনেই কাৎরে ওঠেন !

কেবল যে সাগর-পীড়াতেই টার্টলেট কষ্ট পাচ্ছিলেন, তা নয়—এক বিষম জলাতঙ্কও তাঁকে পেয়ে বসেছিলো ! এই পাহাড়প্রমাণ ঢেউগুলো যদি একবার 'স্বপ্ন'কে বেকায়দায় পায়, তাহ'লেই ভরাডুবি !

'না,' ছাত্রের দিকে নির্জীব চোখে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'আর বুঝি ভেসে থাকাও গেলো না !'

'শান্ত হোন !' উত্তর দেয় গডফ্রে, 'জাহাজ বানানো হয় ভাসবার জন্যে—ডুববে কেন ? ভেসে থাকার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে জাহাজের !'

'আমি তোমাকে বলছি, গডফ্রে—কোনো যুক্তিই নেই ভেসে থাকার ?' এই ব'লে টার্টলেট একদম গোড়া থেকেই একটা লাইফ-বেল্ট্ বেঁধে নিয়েছেন । দিবারাত্র সেটা তাঁর কোমরে আঁটো ক'রে বাঁধা থাকে । সমুদ্র মুহূর্তের স্বস্তি দিলেই সেটাকে তিনি আরো আঁটো ক'রে বাঁধবার চেষ্টা করেন বা ফুঁ দিয়ে বেল্ট্টাকে ফোলান । বেল্ট্টা যথেষ্ট স্ফীত হয়েছে, এটা তাঁর কক্খনো মনে হয় না ।

টার্টলেটের এই আতঙ্ককে ক্ষমা করাই উচিত । যারা কক্খনো সাগর-পাড়ি দেয়নি, তাদের পক্ষে ঢেউয়ের এই প্রলয়নাচন সত্যি সহ্য করা ভারি কঠিন ।

আবহাওয়া কিন্তু ক্রমেই খারাপ হ'য়ে পড়তে লাগলো । একটা ভীষণ ঝোড়ো হাওয়ারও আশঙ্কা ক্রমশ প্রবল হ'য়ে আসছে । ইঞ্জিনে যাতে চোট না-লাগে সেইজন্য আদ্ধেক গতিতে চলে 'স্বপ্ন,' আর ঢেউ তার ঝুঁটি ধ'রে অবিরাম ঝাঁকুনি দেয় । চাকাগুলো একেকবার পুরো ডুবে যায় জলে, ঘুরতে-ঘুরতে আবার পরক্ষণে চারপাশে জল ছিটিয়ে ভেসে ওঠে । আর সারাক্ষণই জাহাজের খোলটা শুদ্ধু থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে ।

গডফ্রে একটা জিনিশ লক্ষ করেছিলো, যার কোনো মাথামুণ্ডুই গোড়ায় সে ধরতে পারেনি । দিনের বেলায় জাহাজ যতটা ঝাঁকুনি খায়, যতটা দোলে, রাতে কিন্তু তার সিকির সিকিও না । তাহ'লে সূর্যাস্তের পরেই আবহাওয়া আচমকা ভালো হ'য়ে যায় ?

এই হেঁয়ালিটা তাকে এতটাই ভাবালে যে ২১শে আর ২২শে জুনের মধ্যের রাত্তিরে সে এর ব্যাখ্যাটা খোঁজবার জন্যে যথেষ্ট সচেষ্ট হ'য়ে উঠলো । দিনের বেলায় 'স্বপ্ন' ভয়ংকরভাবে দুলছিলো, হাওয়ার জোর বেড়ে গিয়েছিলো খুব ; লক্ষণ দেখে মনেই হয়নি যে রাত্তিরে অবস্থার কিছু উনিশ-বিশ হবে । কিন্তু রাত্তিরে হঠাৎ যেই সব ঠাণ্ডা ও চুপ হ'য়ে গেলো, তখন গডফ্রে আর থাকতে না-পেরে গরম কাপড়ে নিজেকে আপাদমস্তক মুড়ে নিয়ে ডেকে গিয়ে হাজির হ'লো ।

পাহারার লোকেরা গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, কাপ্তেন টারকট রয়েছেন সিঁড়ির কাছে ।

হাওয়ার তোড় মোটেই কমেনি বটে, কিন্তু ঢেউয়ের দাপাদাপি একটু কম। কিন্তু অবাক হ'য়ে সে দেখলে যে জাহাজের চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠে উলটো দিকে রেখা এঁকে চ'লে যাচ্ছে।

'হাওয়ার গতি বদলেছে কি তাহ'লে ?' বিড়বিড় ক'রে গডফ্রে নিজেকে জিগেশ করলে।

টারকটের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে ডাক দিলে 'কাপ্তেন টারকট !'

কাপ্তেন গোড়ায় তাকে দেখতেই পাননি। হঠাৎ তাকে কাছে আবিষ্কার ক'রে তিনি যেন একটু উত্ত্যক্তই হলেন। 'আপনি, মিস্টার মরগান, আপনি ?–এতরাতে ? এখানে ?'

'হ্যাঁ, কাপ্তেন টারকট। আমি শুধু জিগেশ করতে এসেছি যে–'

'কী ?' প্রায় বোমার মতো টারকটের জিজ্ঞাসা ফেটে পড়লো।

'আমি শুধু জানতে চাচ্ছি যে হাওয়া হঠাৎ দিক বদলেছে কি না ?'

'না, মিস্টার গডফ্রে, না। বরং ঝড়ের সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে উলটে।'

'কিন্তু এখন দেখছি ধোঁয়া জাহাজের পিছন দিকে যাচ্ছে !'

'পিছন দিকে যাচ্ছে...ও-হ্যাঁ !' কাপ্তেন এ-কথা শুনে একটু বিচলিতই হলেন। 'কিন্তু সে-কী আমার দোষ !'

'তার মানে ?'

'জাহাজটাকে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি একটু পেছিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি !'

'বাঃ রে ! তাতে-যে আমাদের অনেক দেরি হ'য়ে যাবে !'

'তা তো যাবেই ! কিন্তু ভোরবেলায় সমুদ্র যদি একটু শান্ত হ'য়ে পড়ে তাহ'লে আবার পশ্চিমমুখোই এগুবো। আপনি বরং নিজের কামরাতে চ'লে গেলেই ভালো করবেন। আমার পরামর্শ শুনুন...একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করুন–নইলে পরে বড্ড কাহিল, বড্ড বেসামাল বোধ করবেন।'

গডফ্রে ঘাড় নেড়ে চ'লে এলো। আসতে-আসতে দেখলো নিচু, ঝোলা মেঘেরা দল বেঁধে হুড়মুড় ক'রে এগুচ্ছে। লক্ষণ ভালো নয় দেখে সে তার কামরায় ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়লো।

পরের দিন সকালবেলায় সত্যিই হাওয়ার জোর অনেকটা ক'মে গেলো–'স্বপ্ন'ও আবার পশ্চিমমুখো এগিয়ে চললো।

এইভাবে আরো আটচল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে চললো দিনের বেলায় পশ্চিমমুখো, রাতের বেলায় পুবমুখো, চলাচল। ব্যারোমিটার ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ উন্নতির লক্ষণ দেখালে, আবহাওয়া বোধহয় শিগগিরই ভালো হ'য়ে যাবে, আর হাওয়া বইবে উত্তুরে।

হ'লোও তাই। পঁচিশে জুন সকালবেলায় আটটা নাগাদ গডফ্রে ডেকে এসে দাঁড়াতেই উত্তর-পুবের খোলা হাওয়া মেঘ তাড়িয়ে নিয়ে গেলো, বেরিয়ে এলো সূর্য, মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে যেন দপদপ ক'রে আগুন জ্বলছে। আর রোদ প'ড়ে গাঢ়-সবুজ সমুদ্রও ঝিকিয়ে উঠেছে। ঢেউয়ের মাথায় শান্ত শাদা ফেনা। নিচু পালগুলো সব এক-এক ক'রে খাটিয়ে

দেয়া হ'লো জাহাজে ।

চোখে দুরবিন এঁটে মেট দাঁড়িয়েছিলো গলুয়ের কাছে ।

গডফ্রে তার কাছে এগিয়ে গেলো । 'কালকের তুলনায় দিনটা আজ অনেক ভালো ঠেকছে ।'

'হ্যাঁ, মিস্টার গডফ্রে,' মেট উত্তর দিলে, 'আমরা এবার শান্ত জলে এসে পড়েছি ।'

'আর "স্বপ্ন"ও ঠিক পথ ধ'রে এগুচ্ছে ?'

'না, এখনও অবশ্য ঠিক পথে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না !'

'এখনও না ?–কেন–'

'কারণ হাওয়ার তোড়ে আমরা অনেকটা উত্তর-পূবদিকে স'রে এসেছি–আগে ঠিক ক'রে জানতে হবে তো কোথায় আছি –'

'কিন্তু দিব্যি তো আলো হয়েছে–দিগন্তও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ।'

'দুপুরবেলায় সূর্য যখন মাথার উপরে আসবে, তখন আমরা ঠিকঠাক বুঝতে পারবো কোথায় আছি । তার পরেই কাপ্তেন জাহাজ চালাবার নির্দেশ দেবেন ।'

'তা কাপ্তেন টারকট কোথায় ?'

'উনি তো চ'লে গেছেন ।'

'চ'লে গেছেন !'

'হ্যাঁ, পাহারা এসে তাঁকে বলেছিলো পূবদিকে নাকি মস্ত সব ঢেউ দেখা যাচ্ছে–বোধহয় ডাঙা আছে কাছে–অথচ মানচিত্রে তার কোনো উল্লেখ নেই । কাজেই স্টীমলঞ্চে ক'রে চারজন মাল্লাকে নিয়ে কাপ্তেন সাহেব সরেজমিন তদন্ত ক'রে আসতে গেছেন ।'

'কতক্ষণ হ'লো গেছেন ?'

'তা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হবে !'

'আমাকে একবার খবর দিলে পারতেন–তাহ'লে আমিও সঙ্গে যেতুম !'

মেট বললে, 'আপনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন, মিস্টার গডফ্রে । কাপ্তেন টারকট আপনাকে আর মিথ্যে জাগাতে চাননি ।'

'কোন দিকে গেছে লঞ্চ ?'

'ওই-যে, ওদিকে–উত্তরপূব দিকে ।'

'দুরবিনে দেখা যাচ্ছে লঞ্চটা ?'

'না, এতক্ষণে অনেক দূর চ'লে গেছে ।'

'তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন তো কাপ্তেন ? না কি দেরি হবে ?'

'বেশি দেরি হবে ব'লে মনে হয় না । কারণ কাপ্তেন এসে নিজে সব হদিশ নেবেন–সূর্যের অবস্থান ইত্যাদি–আর সেজন্যে তাঁকে দুপুরের আগেই ফিরে আসতে হবে ।'

আর-কোনো কথা না ব'লে গডফ্রে গিয়ে গলুইয়ের একেবারে ডগায় গিয়ে একটা দুরবিন হাতে বসলো । কাপ্তেন টারকটের ব্যবহারে সে অবিশ্যি মোটেই অবাক হয়নি । ও-রকম বড়ো-বড়ো ঢেউ কেন উঠছে, ডুবোপাহাড়ের জন্যেই নাকি–এটা আবিষ্কার করা

কাপ্তেনের পক্ষে খুবই জরুরি, কারণ 'স্বপ্ন'র নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা তাঁকেই তো দেখতে হবে, তাঁরই তো সব দায়িত্ব ।

সাড়ে-দশটা নাগাদ দিগন্তে হালকা একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেলো । গডফ্রে বুঝতে পারলে যে সরজেমিন তদন্ত শেষ ক'রে অবশেষে লঞ্চটা জাহাজেই ফিরে আসছে ।

দূরবিনের মধ্যে লঞ্চের আগমন দেখতে গডফ্রের ভারি মজা লাগলো । আস্তে-আস্তে লঞ্চটা যেন নিজেকে মেলে ধরছে, যেন সমুদ্রের উপরেই ধীরে-ধীরে সে গজিয়ে উঠছে, ধোঁয়ার কুণ্ডলী যেন তার মালা ।

চমৎকার একটি ছোট্ট লঞ্চ, প্রচণ্ড তার গতি ; পুরোদমে এগুচ্ছিলো ব'লে একটু পরেই তাকে খালি চোখেই দেখা গেলো । সোয়া-এগারোটা নাগাদ লঞ্চটা এসে ভিড়লো জাহাজের গায়ে, আর কাপ্তেন টারকট লাফিয়ে নেমে পড়লেন 'স্বপ্নে' ।

'কী খবর, কাপ্তেন ?' হাত-ঝাঁকুনি দিতে-দিতে গডফ্রে উৎসুকভাবে জিগেশ করলে ।

'সুপ্রভাত, মিস্টার গডফ্রে ।'

'ওই ঢেউগুলো ?'

'ও-কিছু না । সন্দেহজনক কিছুই তো চোখে পড়লো না । আমাদের লোক বোধহয় ভুল করেছে । তাহ'লেও আমার বেশ অবাক লাগছে ।'

'তাহ'লে আমরা এবার ঠিক পথেই এগুবো ?'

'হ্যাঁ, তবে তার আগে অবস্থানটা একটু জেনে নিতে হবে ।'

এমন সময় মেট এসে জিগেশ করলে, 'লঞ্চটাকে কি জাহাজের মধ্যেই তুলে নেবো ?'

'না,' কাপ্তেন বললেন, 'পরে আবার কাজে লাগতে পারে । বরং এখন জাহাজের সঙ্গে বেঁধে রেখে দাও ।'

কাপ্তেনের নির্দেশ অনুযায়ী গাধাবোটের মতো লঞ্চটাকে জাহাজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হ'লো ।

বারোটার সময় কাপ্তেন সেক্সট্যান্ট কম্পাস নিয়ে সূর্যের অবস্থান নিরূপণ ক'রে জাহাজ কোন দিকে যাবে, তার নির্দেশ দিলেন । তারপর একবার দিগন্তের দিকে তাকিয়ে মেটকে ডেকে নিজের কামরায় চ'লে গিয়ে কী-এক গোপন পরামর্শ শুরু ক'রে দিলেন ।

ভারি চমৎকার ছিলো দিনটা । 'স্বপ্ন' পুরোদমেই এগিয়ে যাচ্ছে । হাওয়ায় তেমন জোর নেই ব'লে আর পাল খাটানো হয়নি ।

গডফ্রের মেজাজ দিব্যি ভালো । সুন্দর আকাশের তলায় সুন্দর সমুদ্র দিয়ে জাহাজে ক'রে পাড়ি দেবার চেয়ে তৃপ্তিকর আর-কিছু নেই । অধ্যাপক টার্টলেটও বেশ সামলে উঠেছেন । তবে লাইফ-বেলটটা কোমর থেকে তিনি হাজার অনুরোধেও খুলতে রাজি হলেন না । মধ্যাহ্নভোজেও তাঁর রুচি ফিরলো না ।

সন্ধেবেলায় কিন্তু ঘন কুয়াশা ছড়িয়ে পড়লো । রাতটা যে এ-রকম ঘুটঘুটে অন্ধকার হবে–অমন ঝকঝকে দিন দেখে তা কিন্তু আন্দাজ করা যায়নি । এ-তল্লাটে অবিশ্যি কোনো ডুবোপাহাড় নেই, তবে আচমকা কোনো-কিছুর সঙ্গে যে-কোনো সময়েই ধাক্কা লাগতে পারে আর কুয়াশাভরা রাতেই তার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি ।

সূর্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গেই জাহাজের লণ্ঠনগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হলো। মাস্তুলে ঝুললো শাদা লণ্ঠন, ডান দিকে সবুজ আলো আর বাঁ-দিকে জ্বলন্ত-লাল।

একটু বিশ্রাম ক'রে নেবার জন্য সব দায়িত্ব মেটের উপর দিয়ে কাপ্তেন টারকটও নিজের কেবিনে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন। কুয়াশা অবশ্যি পুরু হ'য়ে সমুদ্রে বিছিয়ে আছে, তবে 'স্বপ্ন'র কোনো ভয় নেই।

. গডফ্রে গিয়ে শোবামাত্রই ঘুমিয়ে পড়লো। অধ্যাপক টার্টলেটের চোখে অবিশ্যি ঘুম নেই–তিনি কেবল এ-পাশ ও-পাশ করছেন আর থেকে-থেকে মস্ত একেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

হঠাৎ রাত একটা নাগাদ একটা ভীষণ আওয়াজে গডফ্রে ধড়মড় করে তার বিছানায় উঠে বসলো। লাফিয়ে নেমেই সে চটপট পোশাক-আশাক প'রে নিলে, আর পোশাক পরতে-পরতেই শুনতে পেলো ডেকে চীৎকার উঠেছে : 'জাহাজ ডুবে যাচ্ছে! জাহাজ ডুবে যাচ্ছে!'

এক লাফে কামরা থেকে বেরিয়ে আসতেই খাবার ঘরে এক মূর্ছিত ব্যক্তির সঙ্গে তার ধাক্কা লাগলো–ব্যক্তিটি আর-কেউ নয়, নৃত্যশিক্ষক অধ্যাপক টার্টলেট।

জাহাজ শুদ্ধু লোক তখন ডেকে ভিড় ক'রে আছে। মেট আর কাপ্তেন ভীষণ উত্তেজিত।

গডফ্রে গিয়েই হন্তদন্ত হ'য়ে জিগেশ করলে, 'ধাক্কা লাগলো?'

'জানি না! জানি না...এই বিদঘুটে কুয়াশা...,' মেট বললে, 'কিন্তু জাহাজ ডুবে যাচ্ছে!'

'ডুবে যাচ্ছে?'

নিশ্চয়ই কোনো ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা লেগেছে, কারণ সত্যি "স্বপ্ন" ডুবে যাচ্ছে। এর মধ্যেই প্রায় ডেক অব্দি জল উঠে এসেছে। নিচে এতক্ষণ ইঞ্জিনে নিশ্চয়ই জল ঢুকে গেছে।

'জলে–জলে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, মিস্টার মরগান!' কাপ্তেন চেঁচিয়ে বললেন, 'আর একমুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না! জাহাজ ডুবে যাচ্ছে, দেখছেন–শেষকালে জাহাজডুবির ঘূর্ণির টানে প'ড়ে যাবেন!'

'আর টার্টলেট?'

'আমি ওঁকে দেখছি।...ডাঙা থেকে আমরা মাত্র সামান্য দূরে আছি!'

'কিন্তু আপনি?'

'আমাকে একেবারে শেষ পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে...সব লোক নিরাপদে চ'লে যেতে পারলো কিনা, সেটা দেখাই আমার কাজ! ঝাঁপিয়ে পড়ুন...লাফিয়ে পড়ুন!'

গডফ্রে তবু জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইতস্তত করতে লাগলো–কিন্তু জল ততক্ষণে ডেক ছোঁয়-ছোঁয়।

গডফ্রে যে মাছের মতো সাঁৎরাতে পারে, এ-তথ্য কাপ্তেন টারকটের অজানা ছিলো না। তিনি আর বাক্যব্যয় না-ক'রে গডফ্রেকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিলেন।

ভালোই করলেন। আরেকটু দেরি করলে জাহাজ ডুবির দরুন জলে দারুণ ঘূর্ণি জেগে উঠতো, আর সেই ঘূর্ণিজল গডফ্রেকে পাকে-পাকে পেঁচিয়ে ধরতো।

গডফ্রে একটুক্ষণের চেষ্টাতেই ঘূর্ণিজল থেকে দূরে স'রে গেলো। কয়েক মিনিটের

মধ্যেই হতাশ হইচই উঠলো 'স্বপ্ন'য়-শাদা, লাল, সবুজ লণ্ঠনগুলো নিভে গেলো ; আর-কোনো সন্দেহই নেই ! 'স্বপ্ন'র ভরাডুবি হয়েছে, সত্যিই !

গডফ্রে সাঁৎরে গিয়ে উঠলো ডাঙায় । অন্ধকারে তার হাঁক-ডাকের কোনো সাড়াই এলো না । এ কোথায় সে এসে পড়লো ? এ কি কোনো ডুবোপাহাড়ের চুড়ো, না কি কোনো দ্বীপ ? কিছুই বোঝবার জো নেই । এটাও বোঝবার জো নেই জাহাজের অন্য লোকেদের কী হ'লো । হয়তো এই ভরাডুবির হাত থেকে সে একাই রেহাই পেয়েছে !

উৎকণ্ঠায় ভ'রে গিয়ে গডফ্রে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করতে লাগলো ।

৭

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়
চুলকে ওঠে পায়ের তলায়–
নইলে কি কেউ বাইরে বেরোয়,
বাড়ির আরাম ছেড়ে পালায় ?
আত্মারাম যে চমকে ওঠে
সাগর-পাড়ির হাজার ঠ্যালায় ।

দিগন্তে সূর্যের পুনরাবির্ভাবের আগে আরো তিন-তিনটে ঘণ্টা কাটাতে হবে । ঘণ্টা নয় তো, যেন একেকটা শতাব্দী ।

ভাবগতিক খুব-একটা সুখের ঠেকছে না ; তা, গডফ্রেও তো আর শখ ক'রে হাওয়া খেতে বেরোয়নি । অ্যাডভেনচারের খোঁজে বেরিয়ে শেষকালে এমন অবস্থায় এসে পড়লো যে কোনোদিন আর ঘরের আরাম জুটবে কিনা সন্দেহ । কিন্তু মুষড়ে পড়লে বা হাল ছেড়ে দিলে তো আর চলবে না ; –তাই গডফ্রে মনে-মনে সব বিপদ-আপদের সঙ্গে যোঝবার জন্যেই তৈরি হ'য়ে নিলে ।

আপাতত তার অন্তত একটা আশ্রয় আছে । ফেনিল জল পিচকিরির মতো ছিটকে লাগছে ডাঙার গায়ে, তবে তাকে কিছুতেই আর সমুদ্রে টেনে নিয়ে যেতে পারছে না । কিন্তু জোয়ারের সময় কী দশা হবে ? এই পাহাড়ের চুড়োটাই আস্ত ডুবে যাবে না তো ? শুক্লপক্ষের প্রতিপদ –অনেক ভেবে বুঝতে পারলে গডফ্রে–তারই ভরা জোয়ারের সময় জাহাজডুবি হয়েছে–কাজেই শিগ্‌গিরই আর জোয়ারের ভয় নেই । কিন্তু প্রশ্ন একটাই । পাহাড়ের চুড়োটাই কি শুধু জলের মধ্য থেকে জেগে উঠেছে, না কি এটা কোনো মস্ত ডাঙার উপকূল ? কাপ্তেন টারকট কোন ডাঙার খোঁজে লঞ্চ নিয়ে বেরিয়েছিলেন ? সে কি এটাই ? কোন মহাদেশের ডাঙা ? গত কয়েকদিনের ঝড়ে 'স্বপ্ন' যে নিজের পথ থেকে অনেকটাই স'রে গিয়েছিলো তাতে আর সন্দেহ কী ! নিশ্চয়ই জাহাজের অবস্থান ঠিকমতো ধরা যায়নি। কিন্তু কাপ্তেন টারকট তো বললেন সমুদ্রের এ-অঞ্চলে কোনো ডাঙা নেই ! এমনকী নিজে লঞ্চ নিয়ে বেরিয়ে তিনি ডাঙার খোঁজ ক'রে গেছেন–রাতের পাহারার কথা ঠিক কি না যাচাই

ক'রে দেখবার জন্যে। ডাঙা অবিশ্যি সত্যিই আছে– হয়তো লঞ্চ নিয়ে আরেকটু গেলেই তিনি দেখতে পেতেন–যাননি ব'লেই এই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। যাক-গে, অতীতের কথা ভেবে হা-হুতাশ ক'রে আর কী লাভ : গতস্য শোচনা নাস্তি।

এখন যেটা জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন, সেটা হ'লো এই ; এটা যদি কোনো একলা পাহাড়ের চুড়ো হয়, তাহ'লে কাছে-পিঠে কোথাও কোনো ডাঙা আছে কি না। পরে না-হয় বের করা যাবে প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক কোনখানে সে আছে। সকাল হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাকে সর্বাগ্রে এই চুড়ো ছেড়ে চ'লে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। চুড়োটা যেখানে সবচেয়ে বড়ো সেখানেও নিশ্চয়ই কুড়ি বর্গগজের বেশি হবে না। কিন্তু অন্য জায়গার সন্ধান না-পেলে সে এই জায়গা ছেড়ে যাবে কোথায় ? সেই অন্য জায়গা যদি কোথাও না থাকে ? যদি চারদিকেই দিগন্তে আকাশ আর সমুদ্র এক জায়গায় এসে মিলে যায় ?

গডফ্রের সব ভাবনা এখন কেবল এই নিয়েই ! এই কালো রাতের দিকে তাকিয়ে সে দেখবার চেষ্টা করলে আশপাশে কোথাও অধিকতর মিশকালো কোনো বস্তু চোখে পড়ে কি না। নিজেকে সে মিথ্যে প্রবোধ দিতে চায় না। এটা সে ঠিক জানে এ-রকম অবস্থায় হাজারে একজনও বাঁচে কিনা সন্দেহ। আপাতত আর বিশ্বভ্রমণের কথা সে ভাবছে না, বরং মৃত্যুর কথাই তার মনে পড়ছে বার-বার। নির্ভীকভাবে সে দিনের অপেক্ষা করতে লাগলো। দিনের বেলায় বোঝা যাবে তার কপালে কী আছে : মৃত্যু, না জীবন।

পশমি ওয়েস্টকোট আর ভারি জুতোজোড়া ভিজে জবজব করছে এ-সব সে খুলে ফেললে ; যে-কোনো মুহূর্তে যাতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়, তার জন্যে তৈরি থাকতে হবে তো।

কিন্তু জাহাজ ডুবির পর আর-কেউ বাঁচেনি ? 'স্বপ্ন' জাহাজের একজনও সাঁৎরে এখানে এসে ওঠেনি ? তাহ'লে কি ওই জাহাজডুবির ঘূর্ণিতেই সবাই তলিয়ে গিয়েছে। শেষ যাঁর সঙ্গে গডফ্রে কথা বলেছিলো, তিনি হলেন কাপ্তেন টারকট–তিনি তো স্পষ্টই জানিয়েছিলেন যে শেষ মাল্লাটির নিরাপত্তার ব্যবস্থা ক'রে তবেই তিনি জাহাজ ছাড়বেন। জাহাজটা যখন ডুবু-ডুবু তখনই তো কাপ্তেন তাকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলেছিলেন।

কিন্তু অন্যরা ? দুর্ভাগা টার্টলেট, বেচারি সেংভু–তাদের কী দশা হ'লো ? সমুদ্রই কি গিলে খেলো তাদের ? 'স্বপ্ন' জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে কেবল কি সে-ই বেঁচেছে ? আর বাষ্পে-চলা লঞ্চটা ? সেটা কি শেষ পর্যন্ত ল্যাংবোটের মতো জাহাজের সঙ্গেই বাঁধা ছিলো ? কেউ-কেউ তো সেই লঞ্চে ক'রেই ভরাডুবির থেকে বাঁচতে পারতো। না কি 'স্বপ্ন' লঞ্চকে শুদ্ধু টেনে-হিঁচড়ে নিজের সঙ্গে-সঙ্গে পাতালে নিয়ে গেছে ?

এই কালো রাতে কিছু দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু চেঁচিয়ে-মেচিয়ে নিজের গলা তো শোনাতে পারে ? এই স্তব্ধতার মধ্যে তার হাঁকডাকে আপত্তি করবে কে ? বরং তার গলা শুনে অন্য-কেউ হয়তো সাড়া দিয়ে উঠতে পারে !

বারে-বারে সে টেনে-টেনে চেঁচিয়ে ডাকলে অন্ধকারে–জলের উপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে সেই আওয়াজ অনেক দূরে চ'লে গেলো। কিন্তু মিথ্যেই সে গলা ফাটিয়ে ডাক দিলে–কোথাও কারু সাড়া নেই।

আবার সে ডাক দিলে চারদিকে ঘুরে-ফিরে।

উত্তরে স্তব্ধতা যেন আরো নিরেট ভারের মতো চেপে বসলো ।

'একা ! একেবারে একা !' ফিশফিশ ক'রে নিজেকে শোনালে গডফ্রে । শুধু-যে কারু সাড়া সে পায়নি, তা-ই নয়, তার ডাকের কোনো প্রতিধ্বনিও ওঠেনি । আশপাশে যদি কোনো পাহাড়পর্বত থাকতো, তাহ'লে তাদের গায়ে ধাক্কা লেগে তার নিজের কণ্ঠস্বরই ফিরে আসতো । তার মানেই হচ্ছে এই যে পূর্বদিকে হয় উঁচু জমি নেই যে প্রতিধ্বনি হবে, নয়তো আদৌ কোনো ডাঙাই নেই সেদিকে ।

এইসব উৎকণ্ঠার মধ্যেই তিন ঘণ্টা কেটে গেলো । কনকনে ঠাণ্ডায় গডফ্রের হাড়শুদ্ধু কেঁপে উঠছে । ঠাণ্ডায় সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে পাথরের উপর হাঁটতে লাগলো গডফ্রে । অবশেষে মাথার উপরে অন্ধকার একটু ফিকে হ'য়ে গেলো । দিগন্তের সূর্যোদয়েরই অগ্রিম সংকেত এটা ।

যেদিকটায় ডাঙা থাকা সম্ভাবনা, গডফ্রে সেদিকটায় ফিরে তাকালে । যদি ছায়ার মধ্যে অন্তত কালো রেখার মতোও কোনো ডাঙা দেখা যায় ! প্রথম সূর্যের আলোয় কাছে ডাঙা আছে কিনা তা নিশ্চয়ই স্পষ্ট চোখে দেখা যাবে ।

কিন্তু সেই কুয়াশাভরা ঊষাবেলায় কিছুই দেখা গেলো না । সমুদ্রের উপরে ধোঁয়ার মতো কুয়াশার একটা হালকা পর্দা প'ড়ে আছে–তার ফলে এমনকী ভালো ক'রে ঢেউয়ের ওঠানামাই দেখা যায় না ।

কাজেই কেবল কতগুলো বিভ্রম নিয়েই তাকে তুষ্ট হ'তে হ'লো । সত্যি যদি গডফ্রে প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো একলা পাহাড়চূড়ায় এসে আশ্রয় নিয়ে থাকে, তাহ'লে মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী, কেবল একটু যা সময় লাগবে– ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে শেষকালে হয়তো সমুদ্রের তলাতেই তাকে শেষ আশ্রয় নিতে হবে !

অবশেষে কুয়াশা একটু-একটু ক'রে সরতে লাগলো । গডফ্রে দেখতে পেলে অতিকায় সামুদ্রিক জীবের মতো মস্ত কালো গা মেলে কালো পাথরের রেখা উঠে গেছে সমুদ্র থেকে– দীর্ঘ, বন্ধুর, অনিয়মিত কালো পাথরের সারি, অদ্ভুত আকার পাথরগুলোর, পুব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে আছে তারা । গডফ্রে যার উপর এসে আশ্রয় নিয়েছে, সেটা পশ্চিম দিকের একটা মস্ত পাথর । ঢেউয়ের গর্জন ও ভাঙচুরের নমুনা দেখে মনে হচ্ছে সমুদ্র এখানে খুব গভীর ।

একবার তাকিয়েই অবস্থাটা সে টের পেলে : এদিকটায় কোনো নিরাপত্তা নেই । কুয়াশার পর্দা স'রে যেতেই এবার সে অন্য দিকটায় তাকিয়ে দেখলে । ওপাশে আরো পাথর দেখা যাচ্ছে–তাদের আকার আরো মস্ত, আরো উঁচু আর আরো চওড়া । মাঝখান দিয়ে খাড়ি গেছে, ছোটো-ছোটো নোনা জলের ধারে । ওপাশে যদি সত্যি ডাঙা থাকে, তাহ'লে এই জল পেরিয়ে যেতে অবিশ্যি বিশেষ অসুবিধে হবে না । কিন্তু এ-পর্যন্ত উপকূলের কোনো হদিশই পাওয়া গেলো না । ওদিকে যে কোনো শুকনো ডাঙা আছে, এখনও তা বোঝা যাচ্ছে না । কুয়াশা অবিশ্যি ক্রমেই সরছে–আর ধীরে-ধীরে একটা শৈবালে-ভরা বেলাভূমিও উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে তার চোখের সামনে । অবশেষে চোখে পড়লো দীর্ঘ নিচু টিলার সারি, গ্র্যানাইট পাথরে মোড়া–আর এই টিলারাই পুব দিগন্ত আড়াল ক'রে রেখেছে চোখের সামনে থেকে ।

'ডাঙা ! ডাঙা !' গডফ্রের মুখে উল্লাস দেখা দিলো ।

হাঁটু গেড়ে ব'সে সে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানালে প্রথমে ।

সত্যি, ডাঙাই। প্রায় দু-মাইল লম্বা একটা বেলাভূমি প'ড়ে আছে–চঞ্চল জল আছড়ে পড়ছে তীরে। উত্তরে-দক্ষিণে দুটো খাড়াই টিলা–সব শুদ্ধু পাঁচ-ছ মাইল হব দৈর্ঘ্যে। হয়তো মস্ত কোনো অন্তরীপের একপ্রান্ত এটা। কিন্তু তা যদি নাও হয়, তবু এখানে তো সাময়িকভাবে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে।

ডাঙার দিকে এগিয়ে যাবার আগে শেষবারের মতো চারদিকে তাকিয়ে দেখলে গডফ্রে। না, কোথাও 'স্বপ্ন'র কোনো চিহ্ন নেই– না তার লঞ্চকে দেখা যাচ্ছে কোথাও, না-বা তার কোনো যাত্রীকে। শুধু গডফ্রেই বেঁচে আছে একা: একাই তাকে সব বিপদ-আপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে নির্ভীকভাবে, কোনো ভয় পেলে চলবে না।

কিন্তু আসল ডাঙায় যাবার আগে জলের উপরকার ওই বড়ো-বড়ো পাথরগুলো তাকে পেরুতে হবে। কখনও-বা লাফিয়ে, কখনও-বা জলের মধ্য দিয়ে হেঁটেই গডফ্রে এগুতে লাগলো। শ্যাওলাভরা পিছল পাথর, চোখা ধারালো গা একেকটার। এর উপর দিয়ে তার যাত্রা খুব-একটা সহজ হ'লো না, তাছাড়া সময়ও লাগলো অনেক। প্রায় সিকি মাইল পথ এইভাবে পেরুতে হ'লো তাকে। কিন্তু গডফ্রে বেশ ক্ষিপ্র ও উৎসাহী, শেষকালে ওই মূল ডাঙায় গিয়ে পৌঁছে সে হাঁপ ছাড়লে। কিন্তু এখানে তার জন্যে কী অপেক্ষা ক'রে আছে, কে জানে! আশু মৃত্যুর যদি সম্ভাবনা নাও থাকে, তাহ'লেও হয়তো মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর কোনো দুর্দশা তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। তৃষ্ণা, বুভুক্ষা, বসনহীনতা–আরো কত-কী, কে জানে! আত্মরক্ষার কোনো হাতিয়ার নেই, নেই কোনো বন্দুক বা ছোরা–প্রায় আদ্যিকেলে কোনো মানুষের মতোই সে নিঃসম্বল।

বোকা! বোকা! আকাট বোকা সে! বাড়িতে ব'সে-ব'সে ভেবেছে না-জানি রবিনসন ক্রুসোর জীবন কত মনোরম ও কত রোমাঞ্চকর ছিলো! এবার তো ভালো ক'রেই টের পাবে ক্রুসোর ভাগ্য সত্যি-সত্যি কতটা ঈর্ষণীয়! দিব্যি ছিলো সান ফ্রানসিসকোয়, কোল্ডেরুপের প্রাসাদে,–আরামে-গরমে দিব্যি ছিলো। মনে পড়লো কোল্ডেরুপের কথা, ফিনার মুখ, বন্ধুবান্ধবদের গল্পগুজব! আর-কোনোদিনও তাদের সঙ্গে দেখা হবে না!

এই কথা ভাবতেই তার বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন ক'রে উঠলো, জল ভ'রে এলো দুই চোখে।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে গডফ্রে এগুতে লাগলো। পেরিয়ে এলো শ্যাওলা-জমা পিছল পাথর, বালির ঢিবি, উঁচুনিচু জমি। চারদিক বড্ড চুপচাপ–শুধু তার নিজের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কতগুলো গাংচিল পাক খেয়ে-খেয়ে উড়ছে মাথার উপর।

হঠাৎ কী-একটা দেখে গডফ্রে থমকে দাঁড়ালে।

ওই কী প'ড়ে আছে সামনে? কোনো সিন্ধুদানব? হয়তো ঝড় তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে এখানে! বালির ঢিবির ও-পাশে, তিরিশ পাও দূরে হবে না, কী-একটা জন্তু যেন কুঁকড়িমুকড়ি হ'য়ে প'ড়ে আছে।

ছুটে গেলো গডফ্রে তার দিকে।

যত কাছে এগুচ্ছে, তত তার বুকের মধ্যটা টিপ-টিপ করছে। জন্তু তো নয়–মানুষ! প্রায় দশ পা দূরে থাকতে গডফ্রে চমকে ব'লে উঠলো 'টার্টলেট!'

সিন্ধুদানব ব'লে যাকে ভুল করেছিলো, সে আসলে তার নাচের মাস্টার-মশাই–

অধ্যাপক টার্টলেট ।

গডফ্রে তাঁর দিকে ছুটে গেলো । হয়তো এখনও তাঁর হৃৎপিণ্ড বিকল হ'য়ে পড়েনি ।

কাছে গিয়েই আবিষ্কার করলো কোমরে বাঁধা হাওয়া-দিয়ে ফোলানো লাইফ-বেল্টটার জন্যই তাঁকে ও-রকম দেখাচ্ছিলো ।

নিশ্চল প'ড়ে আছেন টার্টলেট । মারা গেছেন নাকি ? গডফ্রে হুড়মুড় ক'রে হাঁটু গেড়ে বসলো তাঁর পাশে, লাইফ-বেল্টটা আলগা ক'রে দিয়ে জোরে-জোরে ডলাই-মলাই করতে লাগলো তাঁর হাত-পা । অবশেষে আধ-খোলা ঠোঁটের ফাঁক থেকে হালকা নিশ্বেস বেরুলো । বুকে হাত দিয়ে দেখলো গডফ্রে । এখনও বুকে শব্দ হচ্ছে ।

গডফ্রে কথা বললে, ডাক দিলে তাঁকে নাম ধ'রে ।

টার্টলেট ঘোরের মধ্যে দু-একবার মাথা নাড়লেন, শুধু একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুলো তাঁর গলা দিয়ে, অসংলগ্নভাবে কী-সব যেন বললেন তিনি অস্ফুট স্বরে ।

গডফ্রে খুব জোরে ঝাঁকিয়ে দিলে তাঁকে ।

আস্তে-আস্তে চোখের পাতা খুললেন টার্টলেট, বাঁ হাত বোলালেন একবার ভুরুর উপর, ডান হাত তুলে পকেট নেড়ে দেখলেন তাঁর সেই দামি পকেট-বেহালাটা যথাস্থানেই আছে ।

'টার্টলেট !' চেঁচিয়ে নাম ধ'রে ডাকলো গডফ্রে ।

টার্টলেট শুধু ঘাড় নাড়লেন ।

'এই-যে আমি–গডফ্রে !'

'গডফ্রে ?' অধ্যাপক জিগেশ করলেন ।

পাশ ফিরে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে চারপাশে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখলেন টার্টলেট, ক্ষীণ একটা হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে, তারপর আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখলেন যে সত্যিই শক্ত নিরেট মাটির উপর পা পড়ছে ! আর তাহ'লে জাহাজের ডেকে তাঁকে টালমাটাল হ'তে হবে না–সত্যিই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি শক্ত অনড় ডাঙার উপর ! ভাবতেই এতদিন পরে আবার তাঁর চোখমুখে স্বাভাবিক জ্যোতি ফিরে এলো । নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে তিনি পকেট-বেহালার তারে ছড় টানলেন : একটা বিষণ্ন ঝমঝম সুর বেজে উঠলো বেহালায় ।

৮

চাইলেই ক্রুসো কিছু পেতো না যে হেসে-হেসে
দুঃখের সঙ্গে তা জানা গেলো অবশেষে ।

ছাত্র ও মাস্টারমশাই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো ।

'গডফ্রে !'

'টার্টলেট !'

'শেষকালে তাহ'লে বন্দরে এসে পৌঁছেছি !' যথেষ্ট সাগর-পাড়ির পর কারু যে-রকম দশা হয়, টার্টলেটেরও মনের ভাব সে-রকম । না হ'লে এটাকে তিনি বন্দর পৌঁছোনো বলেন ! গডফ্রে এ-কথায় কোনো আপত্তি করলে না, শুধু বললে, 'আপনার লাইফ-বেল্‌টটা খুলে নিন । ওটা জড়িয়ে থাকলে চলাফেরায় ভারি অসুবিধে হবে ! আর আপনার বেহালাটা রেখে, আসুন, চার-পাশটা একবার ঘুরে দেখি !'

'তাই চলো,' বললেন অধ্যাপক টার্টলেট, 'আর তুমি যদি কিছু মনে না-করো, গডফ্রে, তো চলো প্রথম যে রেস্তোরাঁটা চোখে পড়বে, তাতেই ঢুকে পড়ি । খিদেয় আমার নাড়িভুঁড়ি শুদ্ধু হজম হ'য়ে যাচ্ছে—ডজনখানেক স্যাণ্ডুইচ আর দু-এক গেলাশ পানীয় নইলে আর পায়ের উপর দাঁড়াতে পারবো না ।'

'চলুন, তবে প্রথম রেস্তোরাঁটাতেই যাই,' ঘাড় নেড়ে বললে গডফ্রে, 'আর প্রথমটা পছন্দ না-হ'লে শেষ রেস্তোরাঁতে গিয়ে ঢুকে পড়তেও আমার আপত্তি নেই ।'

'রেস্তোরাঁ থেকেই কাউকে কিছু বখশিশ দিয়ে তার-আপিশে পাঠিয়ে দেয়া যাবে, তোমার মাতুলকে একটা তারবার্তা পাঠানো সবচেয়ে দরকার । উনি নিশ্চয়ই মানগোমেরি স্ট্রিটে ফিরে যাবার রাহাখরচ পাঠাতে ইতস্তত করবেন না । আমি তো একেবারে কপর্দক-শূন্য ।'

'হ্যাঁ, তাই ভালো । প্রথম টেলিগ্রাম আপিশেই পাঠাবো কাউকে । বললে গডফ্রে, আর এ-দেশে যদি টেলিগ্রাম আপিশ না-থাকে তো প্রথম ডাকঘরেই না-হয় লোক পাঠাবো । আসুন, টার্টলেট চলুন, এবার এগোই ।'

টার্টলেট লাইফ-বেল্‌টটা খুলে নিয়ে কাঁধে ঝোলালেন, তারপর তীরের বালির ঢিবিগুলো পেরিয়ে গেলেন গডফ্রের সঙ্গে । গডফ্রে তখন হাঁটতে-হাঁটতে ভাবছে যে হয়তো 'স্বপ্ন'র আরোহীদের মধ্যে আরো-কেউ জাহাজ-ডুবির হাত থেকে বেঁচেছে ও এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে । এতক্ষণে তার মনে বেশ আশা জেগে উঠলো ।

মিনিট পনেরো পরে তারা উপকূলের খাড়িগুলো পেরিয়ে একটা ষাট-সত্তর ফিট উঁচু বালির ঢিবির উপরে এসে দাঁড়ালে । এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে । এতক্ষণ টিলাগুলোর আড়ালে পুব দিগন্তটা ঢাকা প'ড়ে ছিলো, এবার তাও দেখা গেলো । দু-তিন মাইল দূরে আরো-একসার টিলা উঠছে—তার ওপাশে কী আছে, তা আর দেখা যায় না । উত্তরদিকে উপকূল অনেকটা অন্তরীপের মতো সরু হ'য়ে এসেছে—তার ওপাশে আরো-কোনো

অন্তরীপ আছে কিনা তা অবিশ্যি নজরে পড়লো না। দক্ষিণদিকে একটা ঝরনা গড়িয়ে এসে বেলাভূমিতে পড়েছে, তার পরেই সমুদ্র। যদি এই ডাঙা কোনো উপদ্বীপ হয়, তাহ'লে এর লাগোয়া দেশ থাকতে পারে কেবল উত্তরে বা উত্তর-পূবে।

জায়গাটা কিন্তু রুক্ষ বা ঊষর নয়। সবুজ তৃণভূমির মধ্য দিয়ে-দিয়ে গেছে ছোটো-ছোটো জলের ধারা–দুর থেকে দেখায় যেন চৌখুপি-কাটা সবুজ জামা বা শতরঞ্জ খেলার ছক। তৃণভূমির পরে যেন উঁচু, ঘন, গহন জঙ্গল, একেবারে পাহাড় পর্যন্ত গেছে মস্ত-মস্ত গাছগুলো।

কিন্তু কোথাও কোনো ঘর-বাড়ি, এমনকী কুঁড়েঘর অব্দি দেখা গেলো না। কী এটা? শহর, না গ্রাম, না ছোটো-কোনো গঞ্জ–তা বোঝবার কোনো উপায় নেই। কোথাও কোনো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে না গাছপালার আড়াল থেকে, যা থেকে জনপদের আঁচ পাওয়া যেতো। না দেখা গেলো চিমনি, না বা কোনো হাওয়া-কল। এমনকী কোনো ভাঙাচোরা ঘর, বাড়ি, অ্যাজুপা বা পাহারা-কামরাও নজরে পড়লো না। যদি এই অজ্ঞাত ভূখণ্ডে মানুষজন থেকে থাকে, তবে তারা হয়তো ট্রগলোডাইটদের মতো মাটির তলাতেই আস্তানা গেড়েছে, কেননা কোনো রাস্তাঘাটের চিহ্ন কোথাও নেই, এমনকী পায়ে-চলা সরু পথের পর্যন্ত কোনো হদিশ মিললো না। মনে হ'লো কস্মিনকালেও বুঝি কোনো জন-মনুষ্যের পা পড়েনি এখানে।

টার্টলেট পায়ের ডগার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, 'কই, কোনো শহর তো দেখতে পাচ্ছি না!'

'তার কারণ হয়তো এই যে এদিকটায় কোনো শহরই নেই।'

'কিন্তু গ্রাম? এখানে কি গ্রাম-শহর কিচ্ছু নেই।'

'তাহ'লে এ আমরা কোথায় এসে পড়েছি?'

'তা তো আমি জানিনে।'

'কী? তুমি জানো না! কিন্তু, গডফ্রে, তাহ'লে তো আমাদের এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হয়। কোথায় এসে পড়েছি, সেটা না-জানলে চলবে কী ক'রে?'

'কিন্তু বলবে কে? কাকেই বা আপনি জিগেশ করবেন!'

'তাহ'লে? তাহ'লে আমাদের কী হবে?'

'কী আর হবে? আমরা না-হয় গোটা-দুই রবিনসন ক্রুসো হ'য়ে পড়বো।'

এ-কথা শুনেই নাচের মাস্টারমশাই তিড়িং ক'রে এমন-এক লাফ দিলেন, সার্কাসের কোনো ক্লাউনই যার ধারে-কাছে যেতে পারতো না।

গোটা-দুই রবিনসন ক্রুসো? তাঁরা! তিনি একজন ক্রুসো? সেলকার্কের সেই বংশধর, হুয়ান ফেরনানদেথ দ্বীপে যাকে অনেক বছর কাটাতে হয়েছিলো। ডানিয়েল ডিফো* আর

---

*ডিফোর 'রবিনসন ক্রুসো' আর ইয়োহান হ্বিস-এর 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' উপন্যাস দুটি জুল ভের্নকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিলো। তাই সুযোগ পেলেই নিজের রচনায় এদের কথা তিনি উল্লেখ করতেন; এমনকী তাঁর একাধিক উপন্যাস ওই দুটি উপন্যাসের ছায়া নিয়ে গ'ড়ে উঠেছিলো। তার মধ্যে 'মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড, 'অ্যাড্রিফ্‌ট্‌ ইন দি প্যাসিফিক', 'আলবাট্রস' ইত্যাদির নাম বিশেষ স্মর্ণীয়। 'আলবাট্রস'-এ আবার দে হ্বিস-এর রবিনসন পরিবারের কথাই তিনি বর্ণনা করেছেন। আর সেটাকে তিনি বলেছেন 'দি ফাইনাল অ্যাডভেনচার্স অভ সুইস ফ্যামিলি রবিনসন'।

ইয়োহান দে হ্বিস-এর অদ্ভুতকর্মা মানুষদের কথা কতবার তাঁরা বইতে পড়েছেন ! আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দেশের লোক–সবকিছু থেকে অনেক দূরে কোনো নির্জন দ্বীপে বুনো জানোয়ার, বর্বর জংলি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হাজারো অসুবিধের সঙ্গে লড়াই ক'রে যে-মানুষেরা অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্রপাতি এমনকী বসনভূষণ ছাড়াই এককেটা পরিত্যক্ত বা নির্জন দ্বীপে দিব্যি দিন কাটিয়েছিলো, তাদের মতো এখানে তাঁদেরও এখন দিন কাটাতে হবে–সহায় নেই, সম্বল নেই, কিছু নেই ! না, অসম্ভব ! ভয়ে টার্টলেটের হাত পা একেবারে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে চাইলো। 'না, না, গডফ্রে, ও-রকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না। ও-রকম দশা কল্পনা করতেও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তুমি রসিকতা করতে চাচ্ছো, তাই না ?'

'কিছু ভাববেন না আপনি', গডফ্রে তাঁকে অভয় দিলে, 'কিন্তু এক্ষুনি কতগুলো কাজ করা চাই আমাদের। এমনি আড্ডা দিলে চলবে না।'

অন্তত রাতের জন্যে একটা আশ্রয় বের করতে হবে তাদের গোড়ায়–গুহা, গহ্বর বা নিদেন একটা গর্ত। তারপরে জোগাড় করতে হবে কিছু খাদ্য–জ্বলন্ত জঠরকে কিছুটা শান্তি দিতে হবে তো।

টার্টলেট তো সব দুরবস্থা আঁচ ক'রে প্রায় ভিমিঁই খান বুঝি। গডফ্রে অবশ্য বেশ উৎসাহের সঙ্গেই অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

'কোনো লোকজন তো চোখে পড়ছে না। কিন্তু জন্তুজানোয়ার আছে কি না, তাও বুঝতে পারছি না,' বললে গডফ্রে।

শুধু কয়েক ঝাঁক পাখি দেখা যাচ্ছে বেলাভূমিতে : গাংচিল, শঙ্খচিল, বুনো হাঁস, বালিহাঁসের মতো এক ধরনের জলের পাখি : তাদের ডানা ঝাপটানি, লম্বা একটানা ডাক ইত্যাদি ছাড়া আর-কিছু নেই।

পাখি থাকলেই পাখির বাসাও থাকে, আর যেখানে পাখির বাসা থাকে সেখানে পাখির ডিমও সুলভ–গডফ্রে চট ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছে গেলো। পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে বাসা বেঁধেছে পাখিরা। আরো-একটু এগুতেই দেখতে পেলে ছোটো-ছোটো জলের ধারে সারস আর তিতিরও রয়েছে দাঁড়িয়ে।

পাখি তো যথেষ্টই আছে, কিন্তু বন্দুক ছাড়া তাদের শিকার করা যাবে কী ক'রে ? তার চেয়ে বরং পক্ষীডিম্বের খোঁজ করাই ভালো। কিন্তু ডিম না-হয় জুটলো, তাকে রান্না করবে কী ক'রে ? কেমন ক'রেই বা আগুন জ্বালবে তারা ?

কিন্তু এ-সব প্রশ্নের সমাধান না-ক'রেই তারা ডিমের খোঁজে পাখিদের দিকে এগিয়ে গেলো। আর এগুতেই পেলো এক বিস্ময়কর পারিতোষিক। বেলাভূমিতে শুকনো শ্যাওলার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা-বারো মুরগি আর দু-তিনটে মোরগ–মারকিন কুঁকড়ো সন্দেহ নেই, তাদের দেখেই তারা কঁকর-কো ক'রে সম্ভাষণ জানালে। তার কাছেই তৃণভূমির উপর দেখা গেলো পাঁচ-ছটা ভেড়া, কতগুলো ছাগল, তার গোটা-বারো অ্যাগুটি। তক্ষুনি গডফ্রের মাথায় তড়িৎবেগে একটা ভাবনা খেলে গেলো : এই কুঁকড়ো ও নিরীহ চারপেয়ে জীবরা নিশ্চয়ই 'স্বপ্ন'র সম্পত্তি। জাহাজটা যখন ডুবে যাচ্ছিলো, তখন তারা নিশ্চয়ই সাঁৎরে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ভালোই হ'লো : দ্বীপে যদি অনেক দিন থাকতে হয় তাহ'লে এক কুঁকড়োনিবাস ও খোঁয়াড় তৈরি করতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না। গল্পের বইতে তো ক্রুসোরা

খুব সহজেই পশুপালন পদ্ধতিতে রপ্ত হ'য়ে গিয়েছিলো । আপাতত অবশ্য সেই সুখস্বপ্ন বর্জন ক'রে ডিম্ব সংগ্রহে লিপ্ত হওয়াই ভালো । একটুক্ষণের চেষ্টাতেই তারা অনেক বালিহাঁসের ডিম জোগাড় ক'রে ফেললে । তার পরেই টার্টলেট দুম ক'রে জিগেশ ক'রে বসলেন, 'এখন আগুন পাবে কোথায় ?'

এটাই হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন । দুজনে পকেট উলটে দেখলে তাদের পকেটে কী আছে । অধ্যাপকের পকেট প্রায় ফাঁকাই : কেবল পকেট-বেহালার জন্যে কতগুলো তার আর রজন ছাড়া আর-কিছু নেই । গডফ্রের পকেট থেকে অবশ্য বেরুলো চামড়ায় মোড়া একটা ছুরি–ধারালো ফলা ছাড়া তাতে আর রয়েছে একটা আংটা, ছোট্ট করাতের দাঁতওলা আরেকটা ফলা ও কর্ক-স্ক্রু । এটা অবশ্যি খুবই কাজে লাগবে এখানে । কিন্তু আগুন জ্বালবার মতো কিছু নেই ।

তাহ'লে দুটো শুকনো কাঠ ঘ'ষে-ঘ'ষে আদিম মানুষের মতো আগুন জ্বালবার চেষ্টা করা ছাড়া আর-কিছুই তাদের করণীয় নেই । পলিনেশিয়ার আদিবাসীরা অবশ্যি কাঠ ঘ'ষেই আগুন জ্বালে । কিন্তু তারা কি পারবে ?

একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে দুজনে দুটো শুকনো হালকা ডাল তুলে ঘষতে লাগলো; কিন্তু ঘেমে নেয়ে গেলেও আগুনের একটা ছোট্ট ফুলকিও বার করা গেলো না ।

টার্টলেট তো রেগেই তিনটে হ'য়ে উঠলেন । গডফ্রে যখন দেখলে যে কিছুতেই আর আগুন জ্বালানো যাবে না, কিন্তু জঠর জ্বলছে দাউ-দাউ, তখন কাঁচা ডিমই খেয়ে ফেলবে ব'লে ঠিক করলে । টার্টলেট অবিশ্যি তাকে কাঁচা ডিম খেতে দেখে গোড়ায় ঠিক ক'রে উঠতে পারলেন না তিনিও তা-ই খাবেন কিনা, কিন্তু শেষটায় জঠর-জ্বালা এমন হ'য়ে উঠলো যে তখনকার মতো কাঁচা ডিম খেয়েই তিনিও ক্ষুধাকে ধামাচাপা দিলেন ।

এই আদিম মধ্যাহ্নভোজের পরে দুজনে বেরুলো আশ্রয়ের খোঁজে । গুহা, গহ্বর কিংবা গর্ত–যা-খুশি হ'লেই চলবে, তারা ভেবেছিলো । কিন্তু পেলে তো ? হাঁটতে-হাঁটতে একেবারে বনের কাছে এসে পড়লো দুজনে–তবু কোথাও মাথা গোঁজবার কোনো আস্তানা পাওয়া গেলো না । সারা রাস্তা টার্টলেট আর-কোনো কথাই বললেন না, গম্ভীর ও বিরস বদনে গডফ্রের সঙ্গে-সঙ্গে চললেন । কোথাও জনমানবের চুলের ডগাও দেখা যাচ্ছে না–টাকও না । চারদিকে অদ্ভুত-ভারি একটা স্তব্ধতা । কস্মিনকালেও যে এখানে কোনো মানুষের পায়ের ছাপ পড়েছিলো, তা মনে হয় না ।

বনের যেখানে শুরু, সেখানে কয়েকটা মস্ত গাছ জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে–মূল বন থেকে একটু আলাদা । সেই গাছগুলোর কোটরেও হয়তো আশ্রয় নেয়া যাবে । গডফ্রে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলো, কিন্তু কোথাও সে-রকম কোনো কোটর দেখা গেলো না ।

ওদিকে বেলা প'ড়ে আসছে, রাত ক'রে এলো । পেটের মধ্যে আবার আগুন জ্ব'লে উঠেছে । আবার কতগুলো ডিম গলাধঃকরণ ক'রে ক্লান্তিতে-অবসাদে শেষকালে তারা গাছের তলাতেই সটান লম্বালম্বি শুয়ে পড়লো । শোবামাত্রই ঘুম । রাতের মধ্যে সে-ঘুম আর তাদের ভাঙলো না ।

৯

জাহাজডুবি ঘটলে পরে
লোকজনেরা যে-কাজ করে ।

উত্তেজনায় আর অবসাদে দুজনেই এমনি কাহিল হ'য়ে পড়েছিলো যে শোবামাত্র দুজনেই এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়লো, যেন তারা গাছতলায় শোয়নি, আছে মানগেমেরি স্ট্রিটের আরামে।

সকালবেলায় তাদের ঘুম ভাঙলো মোরগের ডাকে । গডফ্রে অবশ্যি ঘুম ভাঙবামাত্রই বুঝতে পারলে কোথায় আছে, কিন্তু টার্টলেটকে হালফিলের অবস্থা বুঝতে বেশ ক'রে চোখ রগড়ে সজাগ হ'য়ে নিতে হ'লো । এবং জেগেই তাঁর প্রথম কথা হ'লো এই : 'আমাদের ছোটোহাজরিটাও কি কালকের নৈশভোজের মতো বিতিকিচ্ছিরি হবে নাকি ?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে,' উত্তর দিলে গডফ্রে । 'তবে আশা করি সন্ধে নাগাদ অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হবে ।'

অধ্যাপক টার্টলেট বিশ্রী-একটা মুখভঙ্গি করলেন । এতকাল ঘুম ভাঙবামাত্র পেয়েছেন ধোঁয়া-ওঠা সোনালি চা আর পুরু-পুরু স্যাণ্ডুইচ । আর এখন কিনা নিজের ছোটোহাজরি নিজেকেই জোগাড় ক'রে নিতে হবে ! তাও আবার ও-রকম বদখৎ কাঁচা খাদ্য !

গডফ্রে দেখলো যে দেরি করার কোনো মানে হয় না । সব দায়িত্ব এসে তারই উপর বর্তেছে : কিছুতেই তার মাস্টারমশাইয়ের উপর কোনো-কিছুর জন্য নির্ভর করা যাবে না । অধ্যাপকের মাথায় নতুন-নতুন নাচের পরিকল্পনা জাগে বটে, কিন্তু কোনো ব্যাবহারিক জিনিশ বা সাংসারিক সুবুদ্ধি তাঁর কাছ থেকে আশা করাই অন্যায় । একবার মুহূর্তের জন্য বাগ্‌দত্তার কথা তার মনে প'ড়ে গেলো ; মনে প'ড়ে গেলো মামা কোল্ডেরুপের কথাও । কিন্তু তক্ষুনি তাদের কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সে কাঁচা ডিম গলাধঃকরণের ব্যবস্থায় লেগে গেলো । বললে, 'অন্তত কিছু না-খাওয়ার চেয়ে তো এগুলো ভালো ।'

টার্টলেট গোমড়া মুখে কেবল বললেন, 'কিছুই-না ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই যথেষ্ট নয় ।'

গডফ্রে ঠিক করলে আরো-একটু ভালো ক'রে সন্ধান চালাতে হবে—কোথাও কোনো আশ্রয় মেলে কিনা । আর এই ডাঙাটা যে প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক কোনখানে, তাও জেনে নিতে হবে । এই বেলাভূমির যে-দিকটায় লোকজন থাকে, সেখানটায় গেলে হয়তো ফেরবার ব্যবস্থা করা যাবে—কোনো জাহাজও পেয়ে যেতে পারে বন্দরে, কিংবা সমুদ্রের কোনো চলন্ত জাহাজকে থামিয়েও সাহায্য চাইতে পারে ।

এইজন্যে দ্বিতীয় টিলার সারির উপরে ওঠাই সমীচীন ব'লে সে সাব্যস্ত করলে । ঘণ্টা দু-একের মধ্যেই ওই টিলাগুলোর কাছে গিয়ে পৌঁছনো যাবে, তারপর টিলার উপর ওঠে চারপাশে তাকিয়ে দেখলে পরিস্থিতিটা কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হবে । ছোটোহাজরির পরে তা-ই করবে ব'লে সে সিদ্ধান্ত নিলে । চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে সে ।

কুঁকড়ো-পরিবার তখন ঘাসের জমির আশপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে–আর নিরীহ চারপেয়েগুলো একবার বনের মধ্যে যাচ্ছে আর তক্ষুনি আবার বন থেকে বেরিয়ে আসছে, যেন ভারি এক মজার খেলা পেয়ে গিয়েছে ।

কুঁকড়ো ও চারপেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যাবার মৎলব ছিলো না গডফ্রের কিন্তু তারা যাতে হারিয়ে না-যায় বা নাগালের বাইরে চ'লে না-যায়, সেইজন্যে একটা পাহারার ব্যবস্থা করা দরকার । টার্টলেটই বরং তাদের দায়িত্ব নিয়ে এখানে থাকুন, আর সে গিয়ে আশপাশ থেকে একটা সরেজমিন তদন্ত ক'রে আসুক ।

টার্টলেট কয়েক ঘণ্টার জন্য একা ব'সে-ব'সে পশুপক্ষীর পাহারা দিতে রাজি হলেন । একটা ছোট্ট আপত্তি অবশ্যি তুলেছিলেন গোড়ায়, 'যদি তুমি হারিয়ে যাও, গডফ্রে ?'

'মিথ্যে অত ভয় পাবেন না,' গডফ্রে বললে, 'কেবল তো এই বনটুকু পেরুবো–আর আপনিও তো এখান থেকে কোথাও নড়ছেন না–কাজেই হারিয়ে যাবার কোনো ভয়ই নেই ।'

'তোমার মামাকে তার পাঠাতে ভুলো না কিন্তু–আর কয়েকশো ডলারও চেয়ে পাঠিয়ো ।'

'টিলিগ্রাম কিংবা চিঠি–দুইই সমান !' যতক্ষণ-না সে বার করতে পারছে ঠিক কোনখানে এসে পড়েছে, ততক্ষণ আর টার্টলেটের বিভ্রম ভেঙে কী লাভ–এই সে ভাবলে।

তারপর অধ্যাপকের সঙ্গে যথারীতি হাত-ঝাঁকুনি ক'রে বিদায় নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো । মস্ত ঘন বন–ডালপালার ফাঁক দিয়ে রোদ কক্খনো ঢুকতেই পায় না ।

কোনো পায়ে-চলা-পথ চোখে পড়লো না । তবে মাটিতে অবিশ্যি দেখা গেলো জীবজন্তুর চলাফেরার দাগ । দু-তিনবার আশপাশে ক্ষিপ্র চলার ভঙ্গি দেখে অনুমান করলে যে হরিণ বা ওয়াপিটি গেলো বুঝি–কিন্তু কোনো হিংস্র বুনো জন্তুর সাড়া পাওয়া গেলো না–নেকড়ে বা জাগুয়ার, কিছুই নেই ব'লেই মনে হ'লো ।

জঙ্গলের দোতলায়, অর্থাৎ গাছপালার ডালে, অগুনতি পাখির বাসা । বুনো পায়রা, বনমোরগ, ঘুঘু–নানারকমের পাখি দেখতে পেলে গডফ্রে । কিন্তু পাখিগুলো এমন-কোনো বিশেষ জাতের নয়, যা দেখে জায়গাটার অক্ষাংশ অনুমান করা যেতে পারে । গাছপালার বেলাতেও তাই–ক্যালিফরনিয়া, নিউ-মেক্সিকো ইত্যাদি জায়গায় যে-ধরনের গাছপালা গজায়, এই বনের গাছগুলোও সেই জাতের । মেপল, বার্চ, ওক, চার-পাঁচ রকমের ম্যাগনোলিয়া, দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় যে-রকম সিন্ধুসরল গাছ গজায় যে-সব, জলপাই, চেস্টনাট–সব গাছই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের, এবং তার চেনা । গাছপালার তলা দিয়ে যেতে অবশ্যি তার অসুবিধে হচ্ছিলো না, কেননা মাঝে-মাঝেই গাছপালার ফাঁক দিয়ে গোল, চৌকো, তিনকোনা রোদের টুকরো এসে পড়ছিলো, আর সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো ।

এঁকেবেঁকে গাছপালাগুলোর তলা দিয়ে পথ ক'রে-ক'রে এগুতে লাগলো গডফ্রে । অজানা অচেনা জঙ্গল ব'লে তার যে খুব সাবধানে চলাফেরা করা উচিত এ-কথা কিন্তু তার একবারও মাথায় এলো না । কেবল বন পেরিয়ে ওই টিলাগুলোয় পৌঁছুতে পারলেই সে খুশি–আর-কিছুই সে চায় না । কেননা আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বোঝা যাবে কপালে কী আছে । এক ঘণ্টার মধ্যেই সে জেনে নেবে কাছে-পিঠে কোনো জনপদে পৌঁছুবার সুযোগ

হবে কিনা ।

সতেরো দিন ধ'রে 'স্বপ্ন' যে-রাস্তা ধ'রে গেছে, তাতে চিনদেশ বা জাপানের কাছাকাছি এসে পড়ার কথা । তাছাড়া সূর্য যেহেতু সবসময়েই দক্ষিণে ছিলো, তাতেই ভালো ক'রে বোঝা যায় যে বিষুবরেখা তারা মোটেই পেরোয়নি ।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই পাঁচ মাইল পথ পেরিয়ে এলো গডফ্রে । কোনো সোজা রাস্তা ছিলো না ব'লে মাঝে-মাঝে তাকে ঘুরে আসতে হয়েছে—না-হ'লে তাকে আরো কম দুরত্ব পেরুতে হ'তো ।

গাছপালাগুলো ক্রমেই ফাঁক-ফাঁক হ'য়ে আসছে—ছোটো-ছোটো একেকটা দল বেঁধে যেন গাছগুলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার কাণ্ডকারখানা দেখছে । মস্ত ডালপালার ফাঁক দিয়ে বেশ আলো এসে পড়ছে এখন । একটু ঢালু পেরিয়েই জমিটা গিয়ে সোজা উৎরাইয়ে পৌঁছুলো ।

বেশ ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেও গডফ্রে তার তাড়া কমালে না । উৎরাই না-হ'লে সে ছুটতো হয়তো । চার-পাঁচশো ফিট উঁচু টিলাগুলো দাঁড়িয়ে আছে কাছেই—একটা জায়গায় একটা তেকোনা চুড়ো চোখে পড়লো । ওই চুড়োতেই সে উঠবে ব'লে ঠিক করলো ।

'উঠে কী দেখবো ? শহর ? গ্রাম ? মরুভূমি ? পরিত্যক্ত সবুজ বন ?'

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে টিলা বেয়ে উঠতে লাগলো গডফ্রে । বুক ঢিপ-ঢিপ করছে । এতই রুদ্ধশ্বাস যে হাঁপ ছাড়তেও পারছে না । চুড়োয় পৌঁছে যদি মূর্ছিত হ'য়ে পড়তেও হয়, তবু সে রাজি—তবু পথে সে কিছুতেই জিরিয়ে নেবে না ।

আর-তো মাত্র কয়েক মিনিট, তার পরেই পৌঁছে যাবে চুড়োয় । উৎরাইটা এমনিতে বেশ দুর্গম—প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোন ক'রে জমি উঠে গেছে । গাছপালা ঝোপঝাড় ধ'রে-ধ'রে সে নিজেকে একরকম টেনেই তুলতে লাগলো উপরে ।

শেষ চেষ্টা ক'রে সে কোনোমতে উঠলো চুড়োয় । হাঁটুর জোড়া যেন খুলে আসতে চাচ্ছে, এত সে ক্লান্ত । কিন্তু কী দেখতে পারে সে সামনে ? বুকে ভর দিয়ে সে তাকালে পুব দিগন্তে ।

দিগন্তে সমুদ্র ছাড়া আর-কিছু নেই—দূরে গিয়ে আকাশের গায়ে গোল রেখা এঁকে জল মিশে গেছে ; সেখানে সমুদ্র আর আকাশকে আর আলাদা ক'রে চেনবার জো নেই ।

ফিরে তাকালে গডফ্রে । সমুদ্র ! চারপাশেই সমুদ্রের ফেনিল চঞ্চল জল খেলা করছে—উত্তরে, দক্ষিণে, পুবে, পশ্চিমে, সবদিকেই শুধু নীলিমা আর নীলিমা—আকাশের নীল আর সাগরের নীলে মেশামেশি । ডাঙার চারপাশে মস্ত এক মহাসমুদ্র !

'দ্বীপ ! একটা দ্বীপ তাহ'লে এটা !'

কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে-সঙ্গে গডফ্রে অনুভব করলে যেন তার বুকটা মুচড়ে গেলো । তারা যে একটা দ্বীপে এসে পড়েছে এ-কথাটা একবারও তার মাথায় খেলেনি। তার মনে হ'লো সে যেন ঘুমের মধ্যে একটা নোঙরহীন হালভাঙা নৌকোয় ক'রে ভেসে বেড়াচ্ছিলো—হঠাৎ জেগে উঠে আবিষ্কার করেছে যে শুধু নোঙরই নয়, তার হালভাঙা নৌকোয় কোনো দাঁড় বা পালও নেই ।

কিন্তু একটু পরেই গডফ্রে নিজেকে সামলে নিলে । পরিস্থিতির মুখোমুখি নির্ভীকভাবে

দাঁড়ানো ছাড়া আর উপায় কী ? যদি বাইরে থেকে সাহায্য না-আসে, তাহ'লে তাকেই চোখ-কান খোলা রেখে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ক'রে নিতে হবে ।

দ্বীপটা কত বড়ো, গোড়ায় তা-ই সে আন্দাজ ক'রে নেবার চেষ্টা করলে । উত্তরে-দক্ষিণে কুড়ি মাইল হবে দ্বীপটা, আর পুবে-পশ্চিমে বারো মাইল মতো । দ্বীপের ঠিক মাঝখানটায় ওই বনটা, যেটা সে পেরিয়ে এলো । বাকি সমস্তটাই ঘাসের জমি, ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা গাছপালা বা পাথুরে বেলাভূমিতে ভরা । দু-একটা ঝরনা বা ছোটো জলের ধারা ব'য়ে গেছে দ্বীপের মধ্যে দিয়ে—এতই ছোটো যে জেলে ডিঙির চাইতে বড়ো-কোনো নৌকো ও-জল দিয়ে চলবে ব'লে মনে হয় না ।

কিন্তু দ্বীপটার নাম কী ? কোথায়ই বা তার অবস্থান ? কোনো দ্বীপপুঞ্জের একটা, না কি প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো একলা জনহীন দ্বীপ ? কিছুই বোঝা গেলো না । কিন্তু এটা ঠিক যে ছোটো কি বড়ো, উঁচু কি নিচু, আর-কোনো ডাঙাই দিগন্তে দেখা যাচ্ছে না।

গডফ্রে উঠে দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকালে । আকাশ আর সমুদ্র যে-বর্তুলরেখা এঁকে দিগন্তে মিশে গিয়েছে, কিছুই সেখানে দেখা যাচ্ছে না । আশপাশে সত্যিই যদি আর-কোনো দ্বীপ থেকে থাকে, তাহ'লে সেটা যে নেহাৎ কাছে নেই, এটা ঠিক ।

'স্বপ্ন' তো সতেরো দিন ধ'রে একটানা দক্ষিণ-পশ্চিমেই চলেছে—আর সতেরো দিনে সে যেতে পারে ১৫০ থেকে ১৮০ মাইল—তাতে অন্তত পঞ্চাশ ডিগ্রি সে পেরিয়ে এসেছে। অথচ তবু সে যে বিষুবরেখা পেরোয়নি, তাতে কোনো সন্দহ নেই । দ্বীপের অবস্থান তাহ'লে ১৬০ থেকে ১৭০ ডিগ্রি পশ্চিমদ্রাঘিমার মধ্যে । কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের এদিকটায় তো স্যাণ্ডুইচ দ্বীপপুঞ্জ বা হাওয়াই দ্বীপমালা ছাড়া আর-কিছু নেই । অবশ্য ভূগোল বইতে উল্লেখ নেই এমন অনেক ছোটো-ছোটো অজ্ঞাত দ্বীপও যে থাকতে পারে, তা অনস্বীকার্য । বিশেষ ক'রে মানচিত্রে চিনদেশের আশপাশে অনেকগুলো ছোটো ফুটকি দেখেছিলো ব'লে গডফ্রের মনে পড়লো, যাদের নাম সে কক্‌খনো লক্ষ ক'রে দ্যাখেনি ।

'যাক গে,' নিজেকে সে বললে, 'দ্বীপটার নাম যখন জানিনে, তখন এটাকে এখন থেকে ফিনা আইল্যাণ্ড ব'লেই ডাকবো । ফিনা তো আমাকে বিশ্বভ্রমণে বেরুতে দিতে চায়নি—দেখা যাক, তার নাম কপাল ফেরায় কি না—হয়তো ওর নাম করায় চট ক'রে সব দুর্গতি কেটে যাবে ।'

যেদিকটায় সে এখনও যায়নি, সেদিকটায় সত্যি কেউ থাকে কি না, সেটা এবার তাকে ভালো ক'রে জেনে নিতে হবে । চুড়ো থেকে অবিশ্যি কোথাও কোনো বসতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না ।

দ্বীপটা যদি পরিত্যক্তই হয়, তাহ'লে সমুদ্রও তাই—কারণ সমুদ্রেও কোনো জাহাজের চিহ্ন মাত্র নেই । হয়তো এখানকার সমুদ্র দিয়ে কোনো জাহাজই যায় না ।

এবার তাকে ফিরে যেতে হবে টার্টলেটের কাছে ; চুড়ো থেকে নামতে যাবে এমন সময় তার নজর পড়লো উত্তরদিকে তৃণভূমির কাছে কতগুলো মস্ত গাছের দিকে, গাছগুলো জড়াজড়ি করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে । গাছগুলো অতিকায়—অত ঢ্যাঙা গাছ গডফ্রে কস্মিনকালেও দ্যাখেনি ।

'হয়তো ওখানে গিয়েই আমাদের আশ্রয় নেয়া উচিত, বিশেষত, দূর থেকে যখন মনে

হচ্ছে যে গাছগুলোর কাছ দিয়ে একটা ঝরনা ব'য়ে যাচ্ছে,' ভাবলে গডফ্রে। 'কিন্তু কাল এ-বিষয়টায় নজর দেয়া যাবে।'

দ্বীপটার দক্ষিণদিক একটু অন্য রকম। বেলাভূমি হলুদ, কোথাও–কোথাও অদ্ভুত-কিম্ভূত একেকটা উঁচু পাথর, তারপরেই তৃণভূমি আর বন। কিন্তু তার চেয়েও সে অবাক হ'লো–চমকেই গেলো বলা যায়–যখন দেখলো যে ওই উঁচু পাথরগুলোর আড়াল থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো-কালো ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে।

'তাহ'লে কি জাহাজের আরো-কেউ উদ্ধার পেয়েছে?' ভাবলে সে। 'কিন্তু না, তা তো সম্ভব নয়। একদিনের মধ্যেই উপসাগরের কাছ থেকে অত দূরে তারা চ'লে যাবে কী ক'রে? জেলেদের গ্রাম আছে নাকি ওখানে–নাকি জংলিরা থাকে?'

খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে গডফ্রে। ধোঁয়াই তো? নাকি কোনো গরম বাষ্প? কী, সেটা ভালো ক'রে বোঝবার আগেই কিন্তু সেই ধূম্রকুণ্ডলী মিলিয়ে গেলো–তার আর কোনোই চিহ্ন রইলো না।

মিথ্যেই সে আশা করেছিলো। সবই হয়তো তার চোখের ভুল। আরো-একবার ভালো ক'রে সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে গডফ্রে ঢালু বেয়ে নামতে লাগলো। একটু পরেই বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো সে।

বন থেকে বেরিয়ে এলো ঘণ্টাখানেক বাদে। বেরিয়েই দ্যাখে দ্বিপদ ও চতুষ্পদ বাহিনী: টার্টলেট ও তাঁর জিম্মাদারির পশুপক্ষী।

এতক্ষণ কী করছিলেন টার্টলেট? সারাক্ষণ দুটো শুকনো কাঠ ঘ'ষে-ঘ'ষে আগুন জ্বালবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে চলছিলেন।

গডফ্রেকে দেখেই দূর থেকে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী হ'লো? টেলিগ্রাম আপিশে গিয়েছিলে?'

'তার-আপিশ এখনও খোলেনি,' তাঁকে বিশদ ক'রে দুর্গতির কথা খুলে বলবার সাহস পেলে না গডফ্রে।

'আর ডাকঘর?'

'তাও বন্ধ। কিন্তু আসুন, কিছু খেয়ে নিই। খিদেয় আমার পেট চোঁ চোঁ করছে। খাওয়া-দাওয়ার পর না-হয় কথা হবে।'

এবারও সেই পক্ষীডিম্বেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হ'লো। খেতে-খেতে গডফ্রে অবিশ্যি তারিফ ক'রে দু-একবার বললে, 'আহ্! চমৎকার!' কিন্তু টার্টলেট সারাক্ষণ গোমড়া মুখে ডিমগুলো গলাধঃকরণ করতে করতে বিড়বিড় ক'রে নিজের ভাগ্যকে আর বড়োলোকদের খামখেয়ালকে অভিশাপ দিতে লাগলেন।

১০

পড়েছেন তো-রবিনসন ক্রুসো
নানান দুর্বিপাকে প'ড়েও
হারাননি তাঁর হুঁশও ।

বেশ বেলা হয়েছে । সেইজন্যেই গডফ্রে ঠিক করেছিলো আজ নয়, কালকের দিন অব্দি নতুন আস্তানায় গিয়ে আশ্রয় নেবার ব্যাপারটা স্থগিত রাখবে । কিন্তু টার্টলেট যখন নাছোড়বান্দার মতো লেগে থেকে অনুসন্ধানের ফলাফল জানতে চাইলেন, তখন তাকে শেষ পর্যন্ত বলতেই হ'লো যে তারা যেখানে এসে এখন আশ্রয় নিয়েছে সেটা আসলে একটা দ্বীপ, ফিনা আইল্যাণ্ড । এবং এই মুহূর্তে মারকিন মুলুকে ফিরে যাবার কথা না-ভেবে এখানেই কোনোরকমে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করাই তাদের পক্ষে সমীচীন ।

'দ্বীপ ! এটা একটা দ্বীপ ?' শুনেই টার্টলেটের হ'য়ে গেছে ।

'হ্যাঁ । এটা একটা দ্বীপ !'

'যার চারপাশেই সমুদ্র ?'

'নিশ্চয়ই-তা নইলে আর দ্বীপ হবে কী ক'রে ?'

'কোন দ্বীপ এটা তাহ'লে ?'

'বলেছিই তো আপনাকে-ফিনা আইল্যাণ্ড । বুঝতেই তো পারছেন কেন এই নাম দিয়েছি ।'

'না তো-কিছুই বুঝতে পারছি না,' মুখ বেঁকিয়ে বললেন টার্টলেট, 'তাছাড়া ফিনার সঙ্গে দ্বীপটার কোনো মিলই নেই । মিস্ ফিনার চারপাশে ডাঙা রয়েছে, জল নয় ।'

এই বিষণ্ণ মন্তব্যের পর তিনি রাতটা যাতে যথাসম্ভব আরামে কাটে তারই চেষ্টায় ব্যস্ত হ'য়ে গড়লেন । গডফ্রে চ'লে গেলো সমুদ্রের তীরে, বেলাভূমিতে : কেননা আবার কিছু পক্ষীডিম্ব সংগ্রহ করে আনা জরুরি । ফিরে এলো ক্লান্ত ও অবসন্ন । এসেই গাছতলায় টান হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে ঘুম লাগালে । টার্টলেট তখনও পুরোপুরি ধাতস্থ হননি ব'লেই অনেকক্ষণ সময় দর্শনচিন্তাতেই কাটিয়ে দিলেন । পরের দিন ঘুম ভাঙলো কুঁকড়োর ডাকে ।

উঠেই চটপট ছোটোহাজরি সেরে নিলে দুজনে-সেই কাঁচা ডিমেই । কেবল ঝরনার জলের বদলে আজ একটা ছাগল পাকড়ে তার দুধ খেয়ে নেয়া গেলো ।

ছোটোহাজরি শেষ হ'তেই গডফ্রে বললে, 'চলুন, বেরিয়ে পড়ি ।'

চললো দুজনে সমুদ্রতীর ধ'রেই । সঙ্গে তাড়িয়ে নিয়ে চললো কুঁকড়ো পরিবার ও পোষা চারপেয়েগুলোকে । গডফ্রের ইচ্ছে ছিলো দ্বীপের উত্তরদিকটায় একবার তদন্ত ক'রে আসে । উত্তরদিকে কাল সে কতগুলো মস্ত গাছ দেখেছিলো, যাদের ওপাশে তার আর চোখ যায়নি । 'স্বপ্ন'র আরো-কোনো আরোহী হয়তো দ্বীপের ওদিকটাতেই সাঁৎরে গিয়ে উঠেছে-কিংবা হয়তো তাদের মৃতদেহ গিয়ে ঠেকেছে উত্তর তীরে-কারণ জাহাজডুবির ছত্রিশ ঘণ্টা পর তাদের কাউক জ্যান্ত দেখবার আশা করা দুরাশা ।

বালির উপর দিয়ে চলতে লাগলো তারা । কখনও ঢিবি পেরুতে হয়, কখনও দু-একটা ছোটো-বড়ো পাথরের চাঁই । মাঝে-মাঝে সমুদ্রে শ্যাওলার শুকনো স্তূপ প'ড়ে আছে:

হয়তো কখনও কোনো মস্ত জোয়ারে জল অ্যাদ্দুর অবধি পৌঁছেছিলো, এ-সব তারই নিদর্শন।

আস্তে-আস্তে বেলাভূমি পেরিয়ে এলো তারা সদলবলে। গডফ্রে যাচ্ছে আগে-আগে পথ দেখিয়ে ; যদিও পথটা তার মোটেই চেনা নয়, তবু সে-ই হচ্ছে বাহিনীর নেতা : পিছন-পিছন আসছেন টার্টলেট, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে হাত-পা নেড়ে সেই পোষা পশুপক্ষীকে তাড়িয়ে। হঠাৎ কতগুলো গাছের ডালে ঝলমলে কতগুলো গোল ফল ঝুলে থাকতে দেখে গডফ্রে থমকে দাঁড়ালে। দেখেই সে এদের চিনতে পেরেছে : ক্যালিফরনিয়ার কোনো-কোনো অংশে রেড-ইনডিয়ানরা এই ফলগুলো খায়–এদের তারা বলে 'ম্যানজানিলা'।

'যাক,' গডফ্রে স্বস্তির নিশ্বেস ফেললে, 'শেষকালে ওই একঘেয়ে ডিমগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেলো।'

'কেন ? এই ফলগুলো লোকে খায় না কি ?' টার্টলেট যথারীতি তাঁর মুখ বেঁকালেন।

'চেখে দেখলেই বুঝতে পারবেন,' ব'লে গডফ্রে ওই ফলগুলো পেড়ে নিতে শুরু ক'রে দিলে।

টার্টলেট একটু ইতস্তত ক'রে একটা ম্যানজানিলা চেখে দেখলেন ; মন্দ লাগলো না। আসলে এগুলো বুনো আপেল, একটু অম্ল স্বাদ–কিন্তু ওই কাঁচা-ডিম-খাওয়া মুখে তাই ঠেকলো অতি সুস্বাদু।

কয়েকটা ফল খেয়ে নিয়ে আবার তাদের কুচকাওয়াজ শুরু হ'লো। বালির ঢিবিগুলো শেষ হ'য়ে গেলো একটু পরেই ; বেলে মাটির পর এবার শুরু হয়েছে তৃণভূমি, আর পাশ দিয়ে গেছে একটা ছোটো স্রোতস্বিনী। আরেকটু এগুতেই সেই অতিকায় গাছগুলোর পাত্তা মিললো। প্রায় চার ঘণ্টা লাগলো তাদের এখানে পৌঁছুতে, প্রায় ন-মাইল পথ হেঁটেছে তারা এতক্ষণে। দুপুর গড়িয়ে গেছে। কিন্তু তবু সব সত্ত্বেও গাছগুলোর আশপাশটা দেখে তারা অনেকটা আশ্বস্ত হ'লো।

মস্ত একটা প্রেইরির ধারে, আশপাশের ম্যানজানিলা ঝোপের লাগোয়া, অর্ধবৃত্তাকারভাবে উঠেছে অতিকায় গাছগুলো। গাছগুলো বিশাল, তলায় নরম ঘাসের সবুজ আস্তর, পাশেই গেছে সেই ছোটো জলের ধারা এবং তার পাশে ইতস্তত পাথর-ছড়ানো দীর্ঘ বেলাভূমি, সেখানে সমুদ্রের শুকনো শ্যাওলা প'ড়ে আছে।

এই মস্ত গাছগুলো এক ধরনের দেবদারু, লাতিন ভাষায় যাকে বলে 'সেকুউইয়া গিগানতেয়া'। তারই মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড়ো সেটা গডফ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তার গুঁড়িতে চার-পাঁচ ফুট চওড়া একটা ফোকর, উচ্চতায় ফোকরটা দশ ফুট ; আর তার কোটরের মধ্যে ঢুকে পড়তে কোনো অসুবিধে হবারই কথা নয়।

'কোনো গুহা বা গহ্বরের সন্ধান না-মিললে ভাবনা নেই,' বললে গডফ্রে, 'এই তো একটা রেডিমেড আস্তানা রয়েছে। কাঠের বাড়ি কিংবা একটা কেল্লাই বলতে পারেন এটাকে। প্রকৃতি ঠাকরুনের নিজের হাতে গড়া। চলুন, টার্টলেট, ভিতরটায় গিয়ে একবার দেখা যাক।'

ব'লে গডফ্রে তার মাস্টারমশাইকে পাকড়ে ধ'রে সেই সেকুউইয়ার মধ্যে টেনে নিয়ে গেলো।

কোটরটার মেঝেয় যত রাজ্যের লতাপাতা উদ্ভিদ্ শুকিয়ে আছে–সব শুদ্ধু প্রায় কুড়ি

ফুট হবে মেঝের পরিধি। ছাদটা যে কত উঁচুতে, সেটা অবিশ্যি অন্ধকারে ঠিক ঠাওরানো গেলো না। এই বাকলের দেয়াল ভেদ ক'রে কোনোদিনই বোধহয় এর মধ্যে রোদ ঢোকেনি। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বা বৃষ্টির ছাঁট ভিতরে ঢোকার ভয়ও নেই। আমাদের এই নবীন ক্রুসো দুজন অন্তত প্রকৃতির খামখেয়ালের সঙ্গে যোঝবার সুযোগ পাবে এর মধ্যে থেকে। কোনো গুহাই যেমন এ-রকম শুকনো খটখটে হ'তে পারতো না, তেমনি এত শক্ত বা দৃঢ়ও হ'তে পারতো না। এমনকী মানুষের গড়া কাঠের বাড়িও এমন সুদৃঢ় হ'তো কিনা খুবই সন্দেহ।

'কী বলেন, টার্টলেট ? প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া বাড়ি দেখতে কী-রকম লাগছে ? এখন থেকে এটাই আমাদের বাড়ি হ'লো কিন্তু।'

'কিন্তু চিমনি কই ?' টার্টলেট আপত্তি তুললেন।

'চিমনির প্রশ্ন তোলবার আগে,' গডফ্রে উত্তর দিলে, 'আগুন তো জ্বালি—আগুন জ্বললে পর চিমনির কথা ভাবা যাবে !'

গডফ্রের কথার যুক্তি এতই অকাট্য ও দুর্ভেদ্য যে এমনকী টার্টলেট শুদ্ধু চুপ ক'রে যেতে বাধ্য হলেন।

কোটরটার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে গডফ্রে আশপাশটা একবার অবলোকন ক'রে এলো। প্রেইরির পাশেই এই দেবদারুদের জটলা, এ-দৃশ্য আগেই দেখেছে গডফ্রে ; ঘাসের জমির মধ্য দিয়ে গেছে ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনী, যেটা একটা সতেজ শ্যামলিমা দিয়েছে পুরো তল্লাটটাকে, গজিয়েছে নানা ধরনের ঝোপঝাড় ও গাছ ; মার্টল ঝোপ, ম্যানজানিলার ঝাড়, আরো কত-কী। আরেকটু গিয়েই জমি ক্রমশ উঁচু হ'য়ে গিয়েছে—সেখানে রয়েছে ওক, বীচ, সিকামোর, কাঁটাঝোপ ; আর প্রেইরির ওপাশে আরো অনেক ঝোপঝাড় দেখা গেলো দূর থেকে। গডফ্রে ঠিক করলে কাল সেদিকটায় গিয়ে দেখে আসবে।

মোটমাট, চারপাশটা দেখে সে বেশ তুষ্টই হ'লো। আর সে যতটা-না তুষ্ট হ'লো, তার চেয়েও বেশি পরিতোষ দেখা গেলো গৃহপালিত জন্তুগুলোর : ওই প্রেইরি দেখে তাদের ফুর্তি যেন আর ধরে না। আর কুঁকড়ো-পরিবারও জলের ধারে যথেষ্ট পোকামাকড় পেয়ে মহা আহ্লাদে তখন খুঁটে-খুঁটে খেতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

গডফ্রে আবার তার নতুন আস্তানার কাছে ফিরে এলো। যে-গাছটায় তারা আশ্রয় নেবে ব'লে ঠিক করেছে, সেটাকে আরো ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো সে। গাছটার উপরে চড়তে বেশ কষ্ট হবে—সবচেয়ে নিচু ডালপালাগুলোও বেশ উপরে, আর গাছের গায়ে এমন কোনো খাঁজ নেই, যাতে পা দিয়ে ডাল ধ'রে ঝুলে পড়া যায়। যদি পুরো গাছটাই ভিতরে-ভিতরে ফোঁপরা হয়ে থাকে, তবে হয়তো গাছে চড়ার পক্ষে অনেকটা সুবিধে হবে। বিপদ-আপদ দেখা দিলে গাছের উপরে গিয়ে ঘন ডালপালার আড়ালে আশ্রয় নিলে নিচে থেকে কারু সাধ্য নেই তাদের উপস্থিতি টের পায়।

কিন্তু সে-বিষয়ে পরে নজর দেয়া যাবে।

সব তদন্ত যখন তার শেষ হ'লো, সূর্য তখন দিগন্তে ঢ'লে পড়েছে। গৃহপ্রবেশের ব্যাপারটা কালকেই পুরোদস্তুর করা যাবে। আজ বরং কোটরের মধ্য গিয়ে টান হ'য়ে শুয়ে পড়াই ভালো।

রাতের ভোজটা ভালোই হ'লো : বুনো আপেল, কাঁচা ডিম, আর ছাগলের দুধ।

ভূরিভোজ শেষ ক'রে শুয়ে-পড়ার আগে গডফ্রে অবিশ্যি মস্ত গাছটার একটা নাম দিলে–'উইল-ট্রি' : উইলিয়াম ডাবলিউ. কোল্ডেরুপের কথা মনে ক'রেই এই নামটা দিলে গডফ্রে, আর টার্টলেটও নামকরণের ব্যাপারে কোনো আপত্তি তুললেন না ।

এই ক-দিনেই গডফ্রে একেবারে বদলে গিয়েছে । আর সেই হালকা চপল, খামখেয়ালি, নিশ্চিন্ত যুবকের পাত্তা নেই, তার বদলে এ যে একেবারে নতুন মানুষ : বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথায় নানান সব ফন্দি ও উদ্ভাবনাশক্তি আনাগোনা করে, কখনও হাল ছেড়ে দেয় না, নির্ভর করতে পারে নিজের উপর, কাণ্ডজ্ঞান হারায় না, সব দায়িত্বও সে নিজের কাঁধে তুলে নিতে মোটেই দ্বিধা করেনি । 'স্বপ্ন' জাহাজটার সলিলসমাধি একদিক থেকে ভালোই করলো বলতে হয়–নইলে নিজের ভিতরকার এই ক্ষমতাগুলোর সন্ধান সে পেতো কী করে ? চিনতো কী ক'রে নিজেকে–নিজের আসল স্বরূপকে ?

এতদিন তার মধ্যে যে-দিকগুলো ঘুমিয়েছিলো, এই বিপদে-আপদে সেগুলো সব একসঙ্গে জেগে উঠে কোলাহল তুলে দিয়েছে । দুর্গতি আর দুর্দশার কাছে কিছুতেই সে হার মানবে না, এই তার পণ । তার মধ্যে যে এ-রকম তীব্র জেদ ছিলো, তাই বা মানগোমেরি স্ট্রিটের দুলালটিকে দেখে কে ভাবতে পেরেছিলো । যদি কোনোদিনও জ্যান্ত ফিরতে পারে এ-দ্বীপ থেকে, তাহ'লে এই দিনগুলোকে সে কক্‌খনো ভুলবে না–এরাই তাকে চিনিয়ে দিয়েছে আসলে সে কী-রকম মানুষ ।

সকাল হ'তেই গডফ্রে উঠে পড়েছে । উদ্দেশ্য : কোটরের মধ্যেটায় সব গোছগাছ করে ভালোভাবে আশ্রয় নেয় । খাদ্য, এবং সর্বোপরি আগুনের প্রশ্নটাই এখন সবচেয়ে জরুরি । তারপর দু-একটা ছোটোখাটো টুকিটাকি হাতিয়ার তৈরি ক'রে নিতে হবে, কাপড়-চোপড়ের প্রশ্নটাও ভুলে যাওয়া চলবে না ।

টার্টলেট অবিশ্যি তখনও শুয়ে-শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন । অন্ধকারে তাঁকে দেখা যায় না বটে কোটরের মধ্যে, তবে তার নাসিকার অবিরাম গর্জন কানে আসে । পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও, এত দুর্গতির মধ্যে প'ড়েও, বেচারার কোনো চারিত্রিক বদল হয়নি । এই দুরবস্থায় তাঁর মতো সঙ্গী কোনো দিক থেকেই খুব-একটা লোভনীয় নয়, বরং মাঝের থেকে তিনি কেবল ঝামেলাই বাড়াবেন । কিন্তু তবু তো একজন সঙ্গী, চেনা মানুষ । তাঁর সঙ্গে তো অন্তত দুটো কথা ক'য়ে বাঁচা যাবে । রবিনসন ক্রুসোর তোতাপাখির চেয়ে অধ্যাপক টার্টলেট যে অনেক ভালো, তাতে গডফ্রের সন্দেহ নেই ।

তবে আজ, উনত্রিশে জুন সকালবেলায়, গডফ্রের বরং একা কাজ শুরু করতে পেরে ভালোই লাগলো । প্রথমে সব কটা দেবদারু গাছকে অত্যন্ত ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করতে হবে । বাইরে হয়তো কোনো নতুন মুখরোচক ফলের গাছ চোখে প'ড়ে যেতে পারে । নতুন ফল দেখে এবং চেখে অধ্যাপক টার্টলেট নিশ্চয়ই খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠবেন । তাই টার্টলেটকে তাঁর স্বপ্নের হাতে ছেড়ে দিয়েই গডফ্রে লাফিয়ে কোটর থেকে নেমে পড়লো ।

হালকা কুয়াশা পড়েছে বাইরে : সমুদ্র আর বেলাভূমি তখনও কুয়াশা ঢাকা, কেবল পুবদিকে আর উত্তরদিকে–একটু-একটু ক'রে আলো হচ্ছে । সকালবেলাটা এমনিতে যেন জ্যোতির্ময় হ'য়ে দেখা দিয়েছে । একটা ডাল ভেঙে ছড়ি বানিয়ে নিয়ে গডফ্রে বেলাভূমি

ধ'রে রওনা হ'য়ে পড়লো ।

ঝিনুক, পাখির ডিম আর বুনো আপেলে বেলাভূমিতেই ছোটোহাজরি সেরে নিলে গডফ্রে । তারপর ছোটো স্রোতস্বিনীটার ডান তীর ধ'রে বেলাভূমির দক্ষিণ-পুবদিকে এগিয়ে যেতে লাগলো । এদিকটাতেই সে কাল দূর থেকে নানা ধরনের ঝোপঝাড় দেখেছিলো ।

মাইল দু-এক পেরিয়ে এলো গডফ্রে । ছোটো নদীর জলে নানারকম জলের পাখি খেলা করছে ; মাথার উপর গাংচিল ঘুরছে পাক খেয়ে-খেয়ে ; পাখির ডাকে সারা পথ মুখর হ'য়ে আছে । যখন পর-পর দুটো মাছরাঙাকে সে নদী থেকে খপ ক'রে ছোটো-ছোটো ঝকঝকে রুপোলি মাছ তুলে নিতে দেখলে, তখন গডফ্রে একটু ভালো ক'রে জলের দিকে তাকালে । নানা ধরনের মাছ খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে জলে ; নদী এখানে মাত্র চার-পাঁচ গজ চওড়া । দেখে-শুনে বুঝতে পারলে যে মৎস্য শিকারে তাকে মোটেই বেগ পেতে হবে না, কিন্তু মাছগুলো তারা রান্না করবে কী ক'রে ? এই রান্নার প্রশ্নটাই সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দেখা যাচ্ছে । ঘুরে-ফিরে এই আগুনের কথাই ওঠে বারে-বারে ।

এগুতে-এগুতে দু-ধরনের উদ্ভিদ দেখে গডফ্রের ফূর্তি গিয়ে অসীমে পৌঁছুলো । একধারে সে এক ধরনের যব দেখতে পেলে, প্রায় যেন একটা ছোটো খেত । কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও রান্নার প্রশ্নটাই সব আগে জেগে উঠলো । আরেক ধরনের ফল রেড-ইনডিয়ানদের ভারি প্রিয়, বেশ মুখরোচক, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ।

এই আবিষ্কারগুলো ক'রে সে বেশ তুষ্ট চিত্তে ফিরে চললো । এতই তার মন ভালো লাগছিলো, কাউকে এদের কথা না-বললে তার যেন ঠিক স্বস্তি হবে না ।

উইল-ট্রির কাছে এসে সে দেখলে টার্টলেট ততক্ষণে উঠে পড়েছেন—ছোটোহাজরি সারতে ব্যস্ত । গডফ্রেকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন । গডফ্রে তাঁকে খুলে বললে সকালবেলায় কোন-কোন মহার্ঘ জিনিশ সে আবিষ্কার করেছে ।

সব শুনে টার্টলেট বললেন, 'কিন্তু আগুন ? আগুন জ্বালবে কী ক'রে ?' সবকিছুতেই বাগড়া দেয়া টার্টলেটের এক মস্ত বদভ্যেস ।

'এখনও জানি না বটে, তবে শিগগিরই একটা-না-একটা উপায় বার ক'রে ফেলবো,' উত্তর দিলে গডফ্রে ।

শুনে মুখ বেঁকিয়ে টার্টলেট বললেন 'ভগবান তোমার সহায় হোন, গডফ্রে, কিন্তু আমি তো ভরসার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না । তুমি কক্‌খনো ভেবেছিলে, গডফ্রে, আগুন এত দুর্লভ—এমন তপস্যার ফল—সাধনার ধন ? কত লোক তো জুতোয় কাঠি ঘ'ষেই আগুন জ্বালে জগতে ! মানগোমেরি স্ট্রিটে তোমার বাড়ি থেকে বেরুলেই তিন পা যাবার আগেই কাউকে-না-কাউকে দেখবে, মুখে চুরুট জ্বলছে, নাক-মুখ দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্ছে চিমনির মতো, যাকে বলতে না-বলতেই হাসিমুখে দেশলাই জ্বেলে তোমার মুখের চুরুটটাও জ্বালিয়ে দেবে । আর–হা হতোস্মি–এখানে কি না –'

'এখানে আমরা সান ফ্রানসিসকোয় ব'সে নেই, টার্টলেট–মানগোমেরি স্ট্রিটেও নেই। এখানে হাজার পা বাড়ালেও সদয় কারু দেখা পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ !'

'কিন্তু রুটিমাংস খেতে গেলে কি রাঁধতেই হবে ? রান্না না-ক'রে কি খেতে পারবো না ? প্রকৃতি আমাদের তো এমনভাবেও তৈরি করতে পারতো যে বেঁচে থাকার জন্যে কিছুই

খেতে হয় না ।'

'একদিন হয়তো কিছু না-খেয়েই লোকে বেঁচে থাকবে,' হাসলো গডফ্রে ।

'তোমার তা-ই মনে হয় ?'

'আমাদের বৈজ্ঞানিকরা তো শুনি এ-বিষয়ে নাকি দিনরাত্তির গবেষণা করছেন ।'

'তাও কি সম্ভব ? আর কীভাবেই বা তারা গবেষণা চালায় ? কিছুই না-খাইয়ে জীবজন্তুকে জিইয়ে রাখে কী ক'রে ?'

'আমরা যখন কিছু খাই, তখন তার অনেকটা হজম ক'রে ফেলি আর বাকিটা দেহ থেকে বার ক'রে দিই ; তার অনেকটা দেহের মধ্যে তাপের জোগান দেয়–আর ঘাম হ'য়ে খানিকটা বেরিয়ে যায় । কিন্তু রসায়ন যদি এমন কোনো-কিছু বার করতে পারে যা খেতে হয় না, বরং শ্বাস-প্রশ্বাসেই যা থেকে পুষ্টি ইত্যাদি পেয়ে যাওয়া যায়, তাহ'লে খাবার ঝামেলাটাই বাতিল ক'রে দেয়া যাবে । হাওয়া থেকেই তখন আমরা পুষ্টি পাবো, দেহের মধ্যে তাপের জোগান হবে । ঘ্রাণেন আদ্ধেক ভোজন করেন এখন–তখন পুরোটাই দিব্যি নিশ্বেসে ভোজন করবেন ।' গডফ্রে জানালে ।

'আহা ! এই আবিষ্কারটা আগে হ'য়ে গেলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যেতো !' টার্টলেট দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, 'তাহ'লে এক্ষুনি দিব্যি ডজনখানেক স্যাণ্ডুইচ আর মাংসের বড়া এক নিশ্বেসে ভোজন করা যেতে ।' ব'লেই অধ্যাপক টার্টলেট বৈজ্ঞানিকদের এই হাওয়া-নির্ভর গবেষণার স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে রইলেন ।

ঘোর কাটলো গডফ্রের ডাকে । গডফ্রেই তাঁকে চ্যাঁচামেচি ক'রে ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন থেকে বর্তমানের দুর্গতির মধ্যে নিয়ে এলো । উইল-ট্রির মধ্যটায় ঠিকভাবে আশ্রয় নেবার জন্যে গডফ্রে ভারি ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে । ভালোভাবে থাকবার একটা ব্যবস্থা বা উপায় করতে না-পারলে কোনো কাজই যে ঠিকভাবে করা যাবে না, এটা সে জানে ।

প্রথমে কোটরটার মেঝেটা সাফ করতে হবে; ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হবে সব জঞ্জাল । ভিতরটায় লতাপাতা ঘাস শুকিয়ে-শুকিয়ে এমন হ'য়ে আছে যে প্রায় হাঁটু অব্দি ডুবে যায় । এই আবর্জনাগুলো বার ক'রে না-দিলে শোয়া-বসার ভারি অসুবিধে হবে তাদের । দু-ঘণ্টা ধ'রে খাটলেও কাজটা মনঃপূতভাবে শেষ করা যাবে কি না সন্দেহ ।

মেঝেটা বেশ কঠিন আর সুদৃঢ়–মোটা-মোটা শেকড়ে তৈরি । বন্ধুর বটে, কিন্তু নিরেট ও শক্ত । দুটো কোনা বাছা হ'লো বিছানা পাতার জন্যে–বিছানা, মানে শুকনো নরম ঘাস-পাতা । আর আশবাবপত্র–অর্থাৎ বেঞ্চি, টুল, টেবিল ইত্যাদি–বানাতে হয়তো তেমন-একটা অসুবিধে হবে না, কারণ গডফ্রের বহুমুখী ছুরিকাঁটা একটা চমৎকার ব্যাপার, একাধারে করাৎ,ও তুরপুন–উপরন্তু ছুরি তো বটেই । আবহাওয়া খারাপ হ'লে দুজনকে তো কোটরের মধ্যে সারা সময় কাটিয়ে দিতে হবে : কাজ করতে বা খেতে এখানে কোনো অসুবিধেই হবে না । দিনের আলো যে একেবারে ঢুকবে না, তা নয়–কারণ কোটরের মুখটা তো বেশ বড়োই । পরে, যদি এই মুখটা নিরাপত্তার জন্য বন্ধ ক'রে দিতে হয়, তখন না-হয় গডফ্রে তার ছুরি দিয়ে গাছটার বাকল চিরে ইচ্ছেমতে দুটো ঘুলঘুলি তৈরি ক'রে নেবে ।

কোটরটা যে কত উঁচু অব্দি গেছে, আলো ছাড়া তা বোঝবার জো নেই । একটা প্রায় বারো ফিট লম্বা ডাল দিয়ে নানাভাবে চেষ্টা করেও সে কিছুতেই ছাদটার নাগাল পেলে

না। নিশ্চয়ই ছাদটা আরো অনেক উঁচু। অবশ্য আপাতত ছাদের কথা না-ভাবলেও চলবে, পরে না-হয় দেখা যাবে কোটরটার ভিতরে বেয়ে-বেয়ে একেবারে গাছের মগডাল নাগাদ উঠে যাওয়া যায় কি না।

সূর্য ডুবে গেলো, কিন্তু তবু তাদের কাজ পুরোপুরি শেষ হ'লো না। দুজনেই বড্ড ক্লান্ত ও অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিলো ; খেয়ে-দেয়ে দুজনেই সে-রাতে শুয়ে পড়লো।

পরের কয়েকটা দিন দেখতে না-দেখতে নানান কাজে কেটে গেলো। ঘরের তদারকি ছাড়াও খাদ্যসংগ্রহেই কেটে গেলো অনেকটা সময়। তারপর ওই স্রোতস্বিনীর জলে কাপড়-চোপড় ধুয়ে তারা শুকিয়ে নিলে। কাপড়-চোপড় মানে দুটো শার্ট, দুটো রুমাল, দু-জোড়া মোজা। কাজকর্ম করার সময় শুধু পাৎলুন আর ওয়েস্টকোটই থাকে তাদের পরনে, কারণ, বাপরে, দিনের বেলায় যা গরম পড়ে।

তেসরা জুলাই পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি ছাড়াই দিব্যি খটখটে শুকনো ঝলমলে দিন পেলে তারা। আর ততদিনে নতুন বাড়িতে বেশ ভালো লাগতে শুরু করেছে তাদের ; যে-অবস্থায় তারা দ্বীপে এসে উঠেছিলো, তার সঙ্গে তুলনা করলে উইল-ট্রির কোটর তো প্রায় মানগোমেরি স্ট্রিটের ম্যানশনেরই খুদে-একটা সংস্করণ।

তবু গডফ্রে রোজই একবার ক'রে সমুদ্রের কাছে গিয়ে চেয়ে-চেয়ে দ্যাখে কোথাও কোনো জাহাজের পাল বা ধোঁয়া দেখা যায় কিনা।

কিন্তু ফেনিল নীল অসীম জল ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না।

প্রশান্ত মহাসাগরের এদিকটায় কখনও জাহাজ চলে না। জাহাজ তো দূরের কথা, কোনো জেলে ডিঙি অব্দি এদিককার সমুদ্রে ঢুঁ মারে না। ফিনা আইল্যাণ্ড সম্ভবত সব সদাগরি রাস্তার বাইরেই অবস্থিত। কেবল ভগবান ভরসা : যদি তাঁর দয়ায় কোনো জাহাজ পথ ভুল ক'রে এদিকে আসে : ভগবানই তো দুর্বলের সহায়।

এদিকে যখনই দুজনে অবসর পায়, তক্ষুনি দুম ক'রে আগুনের কথা উঠে পড়ে। শেষটায় গডফ্রে একদিন কোত্থেকে একটা চকমকি কুড়িয়ে পেয়ে ছুরির ইস্পাতের ফলায় ঠুকে-ঠুকে ফুলকি তোলবার চেষ্টা করতে লাগলো। ফুলকি যে ওঠে না, তা নয় ; নীল একেকটা উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু মুহূর্তমাত্র আয়ু তাদের। শুকনো ঘাস-পাতা অব্দি কিছুতেই পৌঁছোয় না, তার আগেই দপ ক'রে নিভে যায়। গডফ্রে আর টার্টলেট প্রায় মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। এখন আর আগুন ছাড়া তাদের চলবে না। শুধু ফলমূল, কাঁচা ঝিনুক খেয়ে-খেয়ে অরুচি ও বিরক্তি ধ'রে গেছে। দু-বেলা এই খাদ্যতালিকার দিকে তাকালেই পেটের মধ্যেটা মুচড়িয়ে পাক দিয়ে ওঠে। উইল-ট্রির আশপাশে ছাগল-ভেড়া মুরগি-পাখি দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায়, টার্টলেট তাদের দ্যাখেন, আর তাঁর জঠরের মধ্যে বুভুক্ষা জ্ব'লে ওঠে দাউ-দাউ। পারলে চোখ দিয়েই তাদের তিনি ঝলশে নিতেন।

নাঃ ! এ ভাবে আর চলে না—কিছুতেই না !

কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য এলো তাদের—এতই অপ্রত্যাশিত যে প্রায় দৈবের দয়াই তাকে বলা যায়।

এক রাত্তিরে হঠাৎ আচম্বিতে মেঘ ক'রে এলো, তার পরেই উঠলো ঝড়। সারা দিন বিকট গুমোট গরম গিয়েছিলো : সেটাই ছিলো ঝড়ের পূর্বাভাস।

রাত্রির একটা নাগাদ গুম-গুম শব্দে গডফ্রে আর টার্টলেটের ঘুম ভেঙে গেলো। বাজের শব্দ। দূর থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসছে। তারপরেই চারপাশটা এককেবার বিদ্যুতের ঝলসানিতে আলো হ'য়ে যায়, আর কড়-কড় কড়াৎ ক'রে কানে তালা ধরিয়ে বাজ ফেটে পড়ে। তখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি, কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে বর্ষণ শুরু হ'তে পারে।

আকাশের অবস্থা দেখবার জন্যে গডফ্রে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলো।

যেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, অমনি সেই অতিকায় দেবদারুগুলোর মগডালে ঘন পাতায় যেন দেয়ালি জ্ব'লে উঠছে, যেন কোনো আকাশ-প্রদীপ। জ্বলন্ত আকাশের গায়ে সেই ডালপালা যেন কোনো চিনে লণ্ঠনের ছায়ার খেলা।

আচম্বিতে সেই তুমুল তাণ্ডবের মধ্যে সমস্ত কিছু যেন ধাঁধিয়ে গেলো আলোয়। পরক্ষণেই গ'র্জে উঠলো বাজ, আর উইল-ট্রি যেন বৈদ্যুতিক ঝাঁকুনিতে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো।

গডফ্রে সেই ধাক্কায় মাটিতে প'ড়ে গিয়েছিলো। সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দ্যাখে আগুন-বৃষ্টির মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে। বাজ প'ড়ে পাশের গাছটায় আগুন ধ'রে গেছে আর জ্বলন্ত পাতা ও ডালপালা ঝ'রে পড়ছে তার গায়ে।

গডফ্রে চেঁচিয়ে উঠলো: 'আগুন! আগুন!'

'আগুন!' কোটরের মধ্য থেকে টার্টলেট ব'লে উঠলেন, 'জয়, ভগবানের জয়!'

তক্ষুনি দুজনে কয়েকটা জ্বলন্ত ডালপালা কুড়িয়ে নিলে। পাশেই শুকনো ডালপালা স্তূপ করা ছিলো: সেই জ্বলন্ত মশাল থেকে তারা তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। আশ্চর্য! পাশের গাছটায় বাজ পড়লো–কিন্তু উইল-ট্রির গায়ে আঁচড়টুকুও লাগেনি।

তারা আগুন জ্বালিয়ে যেই কোটরের অন্ধকারে ফিরে এলো, অমনি শুরু হ'লো মুষল ধারে বৃষ্টি। যে-গাছটার উপরে আগুন ধরেছিলো, সেটা তক্ষুনি জলের ছাঁটে নিভে গেলো। তারা শুয়ে-শুয়ে কেবল ভাবতে লাগলো তাদের জ্বালানো আগুনের দশা কী হ'লো।

১১

ভেবেছিলো গডফ্রে তো: 'নেই কুছ পরোয়া'–
পেঁচিয়ে পাকিয়ে যেই ওঠে কালো ধোঁয়া।

যা চেয়েছিলো, এই আচম্বিত ঝড় তাই দিয়ে গেলো। ভাগ্যিশ প্রমেথেউসের মতো গডফ্রে আর টার্টলেটকে আগুন আনতে আকাশে উড়তে হয়নি! টার্টলেট বললেন, 'আকাশ দেখছি বড্ড সদয়। বিদ্যুতের ঝলসানির সঙ্গেই আমাদের জন্য আগুন পাঠিয়ে দিলো।'

এবার এই আগুনকে জিইয়ে রাখার দায়িত্ব তাদের!

'না! কিছুতেই এই আগুনকে নিভে যেতে দেয়া চলবে না!'

'যতক্ষণ আগুনকে কাঠকুটো খাওয়ানো যাবে, ততক্ষণ অন্তত সে-ভয় নেই।'

টার্টলেটের পরিতোষ ক্রমেই ছোটো-ছোটো উল্লসিত আওয়াজে পরিস্ফুট হচ্ছে ।

'হ্যাঁ, কিন্তু সমানে আগুনের কুণ্ডে কাঠ গুঁজবে কে ?'

'কেন, আমি ? দরকার হ'লে দিনরাত্রি ঠায় ব'সে থেকে আমি পাহারা দেবো ।' এবং সূর্যোদয় অব্দি সত্যি-সত্যিই টার্টলেট তা-ই করলেন ।

দেবদারুগুলোর তলায় অজস্র শুকনো কাঠকুটো ও লতাপাতা স্তূপ হ'য়ে ছিলো । সকালের মধ্যেই গডফ্রে আর টার্টলেট আগুনের পাশেই আরেকটা শুকনো জ্বালানির স্তূপ জড়ো ক'রে সমানে আগুনের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করলেন । একটা মস্ত দেবদারুর তলায় মোটা-মোটা শেকড়ের মাঝে সরু এক চিলতে জমিতে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে আগুনের শিখা–অধ্যাপক টার্টলেটের চেয়েও ভালো নাচ জানে তারা । টার্টলেটের ফুশফুশ তো প্রায় যায়-যায়–ফুঁ দিয়ে-দিয়ে তিনি এমন করলেন । অথচ ফুঁ দেবার দরকার মোটেই ছিলো না । কুণ্ডলী পাকিয়ে-পাকিয়ে ধূসর ধোঁয়া উঠছে উপরের ঘন ডালপালার দিকে, যেন টার্টলেটের সধূম উল্লাস ।

আগুনের পাশে ব'সে কেবল হাত-পা সেঁকবে ব'লেই তারা এমনভাবে আগুনের কামনা করেনি । তার চেয়েও জরুরি ও মুখরোচক কাজে তারা আগুনকে খাটাতে চাচ্ছিলো। এতদিনে ওই কাঁচা ডিম ও কাঁচা ঝিনুক ভক্ষণ করার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেলো: সেদ্ধ ক'রে, বা কেবল ঝলসে নিলেই তাদের স্বাদ অনেকগুণ বেড়ে যাবে । সকালটা সেইজন্যেই ফুর্তিতে রন্ধনকর্মে কেটে গেলো ।

'দুটো-একটা কুক্কুটও ভক্ষণ করা যেতে পারে,' টার্টলেটের গলায় ফুর্তি আর ধরে না, 'অ্যাগুটির হ্যাম, ভেড়ার ঠ্যাং, ছাগলের মাংস, কি অন্য-আরো পক্ষীমাংসে বা টাটকা মাছে দিনগুলো বেশ ভালোই কাটবে ব'লে মনে হচ্ছে !'

'উঁহু-উঁহু !' গডফ্রে বাধা দিলে, 'অত তাড়া নয় । উপোশ ভাঙছি ব'লে আকণ্ঠ গিলে বদ হজম বাঁধাবার কোনো দরকার নেই । তাছাড়া আমাদের ভাঁড়ারের দিকেও নজর রাখতে হ'বে, টার্টলেট । বরং গোটা দুই মুরগিই আপাতত যথেষ্ট, তাছাড়া এবার ওই যব দিয়ে রুটিও বানিয়ে নেয়া চলবে ।'

আর এই প্রস্তাবের ফলে দুই নিরীহ মুরগির প্রাণ গেলো । মুরগিগুলোকে জবাই ক'রে, পালক ছাড়িয়ে নিয়ে, কাঠিতে বিঁধে সহর্ষ আগুনের আঁচে ঝলসে নিলেন টার্টলেট । আর গডফ্রেও ততক্ষণে যবের রুটি বানাবার কাজে তন্ময় হ'য়ে আছে । ফিনা আইল্যাণ্ডের প্রথম সত্যিকার ছোটোহাজরি, তাই আর-সব কাজ রইলো স্থগিত ।

সারা দিনটা নানা কাজে কেটে গেলো । অতি সযত্নে আগুনকে জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হ'লো সর্বাগ্রে, বিশেষ ক'রে রাতের জন্যে পাশেই জ্বালানি স্তূপ ক'রে রাখা হ'লো । টার্টলেট অবিশ্যি ছাই ও অঙ্গার সাফ ক'রে মাঝে-মাঝেই আগুনকে উশকে দিচ্ছিলেন । সারা রাত ধ'রে তিনি তা-ই করলেন : একেকবার আগুন নিভু-নিভু হ'য়ে আসে, আর বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি এসে আগুনকে উশকে দিয়ে যান । গডফ্রে অবিশ্যি সারাদিনের খাটুনি ও উত্তেজনার ফলে সারাক্ষণ প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোচ্ছিলো ।

হঠাৎ উইল-ট্রির ভিতরটায় ঠাণ্ডা খোলা হাওয়ার স্পর্শে গডফ্রের ঘুম ভেঙে গেলো। সে বুঝতে পারলে যে উইল-ট্রি ডালপালাগুলো যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানে নিশ্চয়ই

আরেকটা ফোকর আছে–পুরো গাছটাই আসলে হয়তো ফোঁপরা । কিন্তু এখানে আশ্রয় নিতে হ'লে ও ভালোভাবে থাকতে হ'লে উপরের মুখটা বন্ধ ক'রে দিতে হবে–না হ'লে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না ।

'কিন্তু ব্যাপারটা ভারি আশ্চর্য ঠেকছে,' আপন মনেই বললে গডফ্রে, 'গত কয়েকদিন তো এ-রকমভাবে হাওয়া ঢোকেনি । তাহ'লে কি বাজ প'ড়েই নতুন আরেকটা মুখ তৈরি হয়েছে ?'

ব্যাপারটা ভালো ক'রে বোঝবার জন্যে সে বাইরে থেকে গাছের ডালপালাগুলো পর্যবেক্ষণ করবে ব'লে ঠিক করলে ।

খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করার পরেই ব্যাপারটা টের পাওয়া গেলো ।

বাজের চিহ্ন গাছের গায়ে সুস্পষ্ট । মগডাল থেকে শেকড় অবধি বাজ নেমে গেছে —একটা দিকের বাকল একেবারে ঝলশে চিরে গিয়েছে ।

বিদ্যুৎ যদি একবার গাছটার মধ্যে ঢুকতে পেতো তাহ'লে আর তাদের দেখতে হ'তো না—জীবন্ত ঝলশে যেতো তারা । একেবারে কান ঘেঁষে মৃত্যুদূত গেছে, সন্দেহ নেই ।

'নাঃ এ তো ভালো কথা নয় । ঝড়ের সময় দেখছি গাছের তলায় কিছুতেই আশ্রয় নেয়া যাবে না,' গডফ্রে ভাবলে, 'কিন্তু যারা অন্য-কোথাও মাথা গুঁজতে পারে, শুধু তাদের পক্ষেই বাছাই-করা মানায় । আমরা যারা গাছের কোটরে আশ্রয় নিয়েছি, আমরা এ-ক্ষেত্রে কী করতে পারি ? হুম, দেখা যাক, কী হয় ।'

তারপর সেই দীর্ঘ বিদ্যুৎজ্বালার রেখা ভালো ক'রে লক্ষ ক'রে গডফ্রে ভাবলে : 'এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে যেখান দিয়ে বাজ পড়েছে গাছটা সেখানটায় একেবারে ঝলসে ফেটে চিরে গিয়েছে । আর যেহেতু তার ফলেই ভিতরে হাওয়া ঢুকে যাচ্ছে, তার মানেই হ'লো গাছটা নিশ্চয়ই আগাগোড়া ফোঁপরা, কেবল বাকলের জোরেই এতকাল বেঁচে আছে ! কিন্তু ব্যাপারটা একটু বিশেষভাবে তদন্ত ক'রে দেখা যাক ।'

কতগুলো পাইনের ডাল জড়ো ক'রে গডফ্রে মশালের মতো জ্বালিয়ে নিলে । তারপর সেই মশাল হাতে নিয়ে সে আবার কোটরের মধ্যে ঢুকে পড়লো । তক্ষুনি কোটরের মধ্যেটা আলো হ'য়ে উঠলো : উইল-ট্রির ভিতরটা তার চোখের সামনে স্পষ্ট উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো মুহূর্তে । মাটি থেকে প্রায় পনেরো ফিট উঁচুতে বন্ধুর একটা ছাত দেখা গেলো । মশালটা আরো উপরে তুলে ধ'রে গডফ্রে দেখতে পেলে সেই ছাদের মধ্যে একটা জায়গায় একটা ছোটো ফোকর দেখা যাচ্ছে—ততদূর অব্দি আলো পৌঁছোয় না ব'লে সেটা ছায়ায় ঢাকা। না, আর-কোনো সন্দেহ নেই । গাছটা একেবারে মগডাল অবধিই ফোঁপরা । সে-ক্ষেত্রে ওই অসমান খাঁজগুলোয় পা দিয়ে সহজে না-হ'লেও একটু কষ্ট ক'রেও একেবারে ওই ফোকর অবধি চ'লে-যাওয়া যাবে ।

গডফ্রে যেহেতু ভবিষ্যতের ভাবনায় বেজায় উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছিলো, সেই জন্যেই ঠিক করলে যে আর কালবিলম্ব না-ক'রেই ব্যাপারটা ভালো ক'রে তদন্ত করে দেখবে ।

দুটো কাজ সে করতে পারে । এক : যে-ফাঁক দিয়ে হাওয়া বা বৃষ্টি আসছে, সেটা খুব ভালো ক'রে আটকে দিলে কোটরটা বেশ বাসযোগ্য ক'রে তোলা যাবে । দুই : বুনো জানোয়ার বা জংলিদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে উপরের মগডালে গিয়ে আশ্রয়

নেয়া সম্ভব কিনা, সেটা যাচিয়ে দেখা জরুরি। চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কী। যদি দ্যাখে যে ওই সরু ফোকর দিয়ে উঠতে বিষম কষ্ট হচ্ছে, তখন না-হয় নেমে পড়া যাবে।

নিচে দুই শেকড়ের মাঝখানে ভালো ক'রে মশালটাকে আটকে রেখে গডফ্রে খাঁজগুলোয় পা দিয়ে উপরে বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করলে। ক্ষিপ্র সে, হালকা ও সবল–তরুণ মারকিনদের মতো নানা ধরনের ব্যায়ামে সে অভ্যস্ত। কাজেই পুরো ব্যাপারটা তার কাছে খেলার মতো ঠেকলো। শিগগিরই সে ওই সরু ফোকরটার কাছে এসে পৌঁছুলো : এখন থেকে চিমনি-ঝাড়ুদারের মতো সে কেবল হাঁটুর ঠেলায় ও দেয়ালে পিঠ লাগিয়েই উঠতে পারবে। যেটা সবচেয়ে ভয়ের কথা তা হ'লো : যদি এইভাবেও শেষ অবধি ওঠা না-যায় ?

গডফ্রে নাছোড়বান্দার মতো লেগেই রইলো। যেখানেই পা রাখবার মতো কোনো খাঁজ পাচ্ছে, সেখানেই একটু থেমে সে হাঁপ ছেড়ে নিচ্ছে। তিন মিনিটের মধ্যেই প্রায় ষাট ফুট সে বেয়ে উঠেছে, আর কেবল কুড়ি-পঁচিশ ফুট উঠলেই চলবে।

সত্যি-বলতে, এক্ষুনি নাকে-মুখে জোরালো হাওয়ার ঝাপটা টের পাচ্ছে সে। প্রায় লোলুপের মতো সে নাকমুখ দিয়ে টাটকা হাওয়া টেনে নিচ্ছে ফুশফুশে, কারণ কোটরের মধ্যেটায় বাতাস খুব-একটা টাটকা কখনোই থাকে না।

মিনিটখানেক জিরিয়ে নিয়ে গা থেকে কাঠের গুঁড়ো ঝেড়ে গডফ্রে আবার দেয়ালে ঘষটে-ঘষটে বেয়ে উঠতে লাগলো–এখানটায় ফোকরটা ক্রমে-ক্রমে খুবই সরু হ'য়ে আসছে।

কিন্তু হঠাৎ খোলা হাওয়া ঝাপটা মারলে মুখে, আর তারপরেই গডফ্রে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে ফোকরের মধ্য থেকে বার ক'রে নিয়ে এলো। ঘন পাতায় ঢাকা মগডাল–নিচে থেকে সে নিশ্চয়ই পাতার আড়ালে ঢাকা প'ড়ে গেছে–পশুপক্ষী যেমন ক'রে লতায়-পাতায় মিশে থাকে বনের মধ্যে।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলে সে। তখনও সে হাঁপাচ্ছে ; কিন্তু যেহেতু দ্বীপের অনেকটাই তার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ছে, সেইজন্য এই কষ্ট বা ক্লান্তিটা তার গায়ে লাগলো না।

আর তারপরেই আচম্বিতে দ্বীপের এক জায়গায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে সে বিস্ময়ে যেন সেই মগডালেই সেঁটে গেলো।

দূরে, বেলাভূমিতে, একটা জায়গা থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে। সেখানে কোনো গাছপালাও নেই, যে, বাজ প'ড়ে গাছে আগুন লেগে যাবে। তাছাড়া যদি সেভাবেও আগুন লাগতো, বৃষ্টির জলে তা-কি একেবারেই নিভে যেতো না ? দ্বীপে যেহেতু তারা দুজন ছাড়া আর-কেউ নেই, তখন তাদের মতো আর কেই বা প্রকৃতিদত্ত অগ্নিশিখাকে জিইয়ে রাখবে ?

হতচকিত ভাবটা কেটে যেতেই গডফ্রে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসতে লাগলো। উপরে উঠতে যতটা সময় লেগেছিলো, নামতে কিন্তু মোটেই তত সময় লাগলো না। আসলে ওই রহস্যময় ধোঁয়া দেখেই তার তাড়াটা আরো বেড়ে গিয়েছিলো। ব্যাপারটার সন্ধান নেয়া আশু কর্তব্য। সেই জন্যেই তার আর কোনো তর সইলো না। কোন জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছিলো, মনে-মনে তার একটা আন্দাজ ক'রে নিয়েছিলো সে।

গাছের ডালে দাঁড়িয়ে গডফ্রে যে-ধোঁয়া দেখেছিলো, মাটিতে নেমে কিন্তু তার কোনো

চিহ্নই দেখতে পেলে না। আরেক দিনও সে দ্বীপে এ-রকম রহস্যময় ধোঁয়া দেখেছিলো: সেদিন ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছিলো এই দেবদারুগুলোর পাশ থেকেই। আজ কিন্তু সে বেশ ভালো ক'রেই আঁচ ক'রে নিয়েছে কোত্থেকে ধোঁয়া উঠেছে–তাই হনহন ক'রে সেখানে এসে পৌঁছতে তার খুব-একটা দেরি হ'লো না।

বেলাভূমিতে পৌঁছেই গডফ্রে তার তদন্ত শুরু ক'রে দিলে। তীরের এদিকটায় সে সবগুলো কোনাখামচি খুঁজে দেখলে–কোত্থাও বাদ দিলে না। আশপাশে কোনো লোক আছে কি না জানবার জন্যে চেঁচিয়ে সে ডাকলে বারে-বারে; কারু সাড়া নেই। বেলাভূমিতে কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। এই নতুন-জ্বলা আগুনের কোনো হদিশই সে পেলে না কোথাও! এমনকী কোত্থাও কোনো ছাইভস্মও দেখা গেলো না। নেই এমন কী কোনো ভস্মাবশেষই।

'কিন্তু অসম্ভব! আমার মোটেই কোনো ভুল হয়নি। নিজের চোখকে আমি অবিশ্বাস করবো কী ক'রে! ধোঁয়া যে উঠেছিলো, তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর তাছাড়া–'

কিছুতেই সেই কুণ্ডলিত ধোঁয়াকে গডফ্রে দৃষ্টিবিভ্রম ব'লে ভাবতে রাজি হ'লো না। তবে এমনও হ'তে পারে যে এদিকটায় কোনো গেইসার আছে, কোনো উষ্ণ প্রস্রবণ–কোথায় আছে তা সে এখনও খুঁজে বার করতে পারেনি বটে, তবে তার উষ্ণ বাষ্পস্রোতই সে হয়তো দেখে থাকবে।

দ্বীপে এ-পর্যন্ত এ-রকম কোনো কূপ বা উষ্ণ প্রস্রবণ সে দ্যাখেনি বটে, কিন্তু তা যে একেবারেই নেই, এ-কথাও সে জোর ক'রে বলতে পারে না। পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে যে-ধোঁয়া উঠেছিলো, তা হয়তো সেই অজ্ঞাত প্রস্রবণেরই চিহ্ন।

হতাশভাবে গডফ্রে বেলাভূমি ছেড়ে উইল-ট্রি দিকে ফিরে এলো। ফেরবার সময় সে চারপাশে আগের চেয়েও ভালোভাবে তাকাতে-তাকাতে এলো। তাকে দেখেই দু-একটা হরিণছানা ও ওয়াপিটি চমকে উঠে ছুটে পালিয়ে গেলো। কিন্তু না-পালালেও গডফ্রে আপাতত তাদের শিকার করতো না হয়তো। এ-নিয়ে সে মোটেই ভাবছিলো না।

প্রায় চার ঘণ্টা পরে উইল-ট্রির কাছে ফিরে এলো গডফ্রে। অধ্যাপক টার্টলেট তখন ব'সে-ব'সে তাঁর পকেট-বেহালায় টুংটাং আওয়াজ তুলছেন, আর মাঝে-মাঝে কাঠ গুঁজে দিয়ে তাঁর সেই পরম প্রিয় চঞ্চল আগুনকে উশকে দিচ্ছেন।

১২

সন্দেহ নেই, অতি তাজ্জব !
তবু সত্যটা এই—
জরুরি যা-কিছু চাচ্ছিলো, সব
মিলেছে সিন্দুকেই ।

বিশেষ কোনো-মহৎ কর্ম সমাধা ক'রে ফেলার কোনো সাধু সংকল্প নেই গডফ্রের ; সে কেবল ব্যাবহারিক বুদ্ধি খাটিয়ে কাণ্ডজ্ঞানের সাহায্যে ভবিষ্যৎ দিনগুলো নিরাপদ ও অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত ক'রে তুলতে পারলেই খুশি । দ্বীপে যদি থাকতেই হয়, দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যাবার যদি কোনোই উপায় না-থাকে, তাহ'লে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে, এখানে যতটা সম্ভব আরামে থাকা যায়, তারই ব্যবস্থা করা । তারপর যদি কখনো দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যাবার সুযোগ এসে উপস্থিত হয়, তাহ'লে তো অতি উত্তম । কিন্তু যতদিন সে-সুযোগ না-পাওয়া যায় ততদিন দ্বীপটাকেই বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা উচিত ।

কাজেই, কালবিলম্ব না-ক'রেই, গডফ্রে উইল-ট্রির ভিতরটাকেই মোটামুটি আরামপ্রদ ক'রে তোলবার কাজে লেগে পড়লো । ভিতরটা যাতে সবসময়েই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, সেদিকটায় খেয়াল রাখা দরকার । শুকনো ঘাসের বিছানাগুলোও মাঝে-মাঝেই বদলে ফেলা উচিত । গডফ্রে তার ছুরির সাহায্যে কোটরের ঠিক মাঝখানটায় চেঁছে-চেঁছে একটা টেবিল বসিয়েছে, আসলে গাছের একটা মোটা শেকড়কে চেঁছেই টেবিলটা তৈরি করা গেছে, খুব-একটা বেগ পেতে হয়নি । কতগুলো স্থূলকায় কাণ্ড চেঁছে-চেঁছে বানিয়েছে টুল—আরাম কেদারা হয়নি বটে, কিন্তু উপবেশন করার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট । আবহাওয়া খারাপ থাকলে, যখন বাইরে গিয়ে বসা সম্ভব হবে না, তখন আর হাঁটুর উপর রেখে তাদের খাবার খেতে হবে না ।

বসন-সমস্যার সমাধান অবশ্য এখনও হয়নি । এখন অবিশ্যি গরম আছে, তাই অর্ধনগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়ানো যায় । কিন্তু ঠাণ্ডার দিনে কী হবে ? তাছাড়া পাৎলুন, ওয়েস্টকোট, আর হালকা শার্টের দশাও বিশেষ ভালো নয় । যখন সব একেবারে ছিঁড়ে যাবে তখন তারা কী পরবে ? তাহ'লে কি গাছের ছাল আর ছাগল-ভেড়ার চামড়াই তাদের সম্বল হবে ? গতিক যে-রকম দেখা যাচ্ছে, তাতে তো ভবিষ্যতের ছবি সে-রকমই আদিম ও বর্বর । আপাতত অবিশ্যি গডফ্রে ও টার্টলেট তাদের কাপড়-চোপড় প্রায়ই ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়—তাদের ধোবিয়ানার তদারক করেন অধ্যাপক টার্টলেট স্বয়ং ।

গডফ্রেই হচ্ছে খাদ্যসচিব—এবং প্রধানমন্ত্রী । যে-সব শেকড় সুস্বাদু, সে-সব জোগাড় করা, ম্যানজানিলা পেড়ে আনা—এতেই তার রোজকার কয়েক ঘণ্টা সময় কেটে যায় । মাঝে-মাঝে মাছ ধরতে গেলেও অনেকক্ষণ লেগে যায়—বিশেষ ক'রে মৎস্য-শিকারের উপায় তাদের একেবারেই আদিম—না আছে কোনো বঁড়শি, না-বা কোনো সূক্ষ্ম শক্ত জাল । কিন্তু মাঝে-মাঝে যখন উইল-ট্রির খাবার-টেবিলে ঝলসানো এক-আধখানা মুখরোচক মাছ

আবির্ভূত হয়, তখন সব খাটুনিই সার্থক লাগে ।

কিন্তু কোনো হাঁড়ি-কুড়ি না-থাকায় ঠিকমতো রান্নাই করা যায় না । শুধু ঝলসানো মাছ-মাংস ছাড়া আর-কিছুই জোটে না–একঘেয়ে ঠেকে, মুখে অরুচি ধ'রে যায়, কিন্তু হাঁড়ি-কুড়ি না-পাওয়া গেলে আর কীই-বা করা যাবে ।

তাছাড়া গডফ্রের কি কাজের অন্ত আছে ? দেবদারু গাছগুলোর মধ্যে আরেকটা গাছ সে আবিষ্কার করেছে, যার একটা কোটর আছে–অত বড়ো নয়, আর ও-রকম মসৃণও নয়–তবে একটা কোটর তো বটে । সেখানে গডফ্রে কুঁকড়ো-পরিবারের গৃহ-সমস্যার সমাধান করেছে । মুরগিরাও ক্রমে-ক্রমে সেই কোটরে থাকতে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ছে । সেখানে তারা ডিম পাড়ে, শুকনো ঘাসের স্তূপে ডিম লুকিয়ে রেখে তা দেয়, আর তাইতে কুঁকড়ো-পরিবারের ছানাপোনার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে । রোজ সন্ধ্যাবেলা মুরগিদের ওই কোটরে উঠিয়ে কোটরের মুখটা বাইরে থেকে সে আটকে দেয়, যাতে বাজপাখি বা শিকারি প্যাঁচা ছোঁ মারতে না-পারে ।

অ্যাগুটি, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির জন্য আপাতত অবিশ্যি খোঁয়াড় তৈরি করার কোনোই তাড়া নেই । আবহাওয়া খারাপ হ'য়ে গেলে সেদিকটায় নজর দেয়া যাবে । এখন তো তারা দিব্যি সুখে আছে । প্রেইরিতে চ'রে বেড়িয়ে-বেড়িয়ে দিব্যি নধরকান্তি হয়েছে এককেজনের; দ্বীপে আসার পর সংখ্যাবৃদ্ধিও হয়েছে কিছুটা–আর তারা যত অল্পই দুধ পাক বাচ্চা চারপেয়েগুলোও চটপট বেশ তাগড়াই হ'য়ে উঠছে ।

এত-সব প্রাণী উইল-ট্রির চারপাশটা সবসময়েই বেশ সরগরম রাখে । ইচ্ছেমতো চ'রে বেড়ায় এই গৃহপালিত জীবগুলো–আর রোদ কড়া হ'লে দেবদারু বীথিকার ছায়ায় এসে বিশ্রাম করে । ফিনা আইল্যাণ্ডে কোনো হিংস্র জীবজন্তু আছে ব'লে এখনও টের পাওয়া যায়নি। থাকলে কি আর অন্তত ছাগল-ভেড়ার উপর তাদের উপদ্রব হ'তো না ? এইভাবেই দিন চলছিলো। সবদিক বিবেচনা করে বলা যায় যে বেশ সুখেই তাদের দিন কাটছিলো। হঠাৎ ২৯শে জুলাই একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটলো । ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত বটে, কিন্তু তার ফলে তাদের অবস্থার অনেক বদল হ'লো এবং বেশ ভালোই হ'লো ।

ঝিনুক, পাখির ডিম আর মাছের খোঁজে গডফ্রে সকালবেলায় ড্রিম বে-র কাছে গিয়েছিলো সেদিন । রোজই দ্বীপের এককে দিকে সে গিয়ে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে আসে । সেদিন সে গিয়েছিলো এমন-একটা দিকে, যে-দিকে সে আগে কখনও আসেনি ।

একেবারে উত্তর বিন্দুতেই সে চ'লে এলো হাঁটতে-হাঁটতে । সমুদ্রের ধারটাতেই একটা বালির ঢিবি, তার পাশেই সমুদ্রের উদ্ভিদের স্তূপ, আর তার পাশে একটা অদ্ভুত অতিকায় পাথর যেন কোনো জন্তুর মতো গুঁড়ি মেরে ব'সে সমুদ্র পাহারা দিচ্ছে ।

পাথরটা যেন মন্ত্র জানে, যেন তাকে টান দিলে । তাড়াহুড়ো ক'রে এগিয়ে গিয়েই দ্যাখে আসলে সেটা পাথর নয়–একটা মস্ত সিন্দুক, অদ্ভুতভাবে সেটা বালির মধ্যে ব'সে গিয়েছে–ফলে দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন পাথরে-গড়া একটা জ্যামিতিক জন্তু !

'স্বপ্ন' জাহাজেরই কি সম্পত্তি এটা ? ভেসে এসে তীরে ঠেকেছে ? জাহাজডুবির পর থেকেই এই বালির চড়াতেই প'ড়ে আছে সিন্দুকটা ? ভাঁটার টানে ভেসে যায়নি ? না কি ইদানীং আবার একটা জাহাজডুবি হয়েছে এদিকে, আর এটাই তারই নিদর্শন ? সে

যাই হোক, সিন্দুকটা যে দৈবের একটা অমূল্য উপহার তাতে সন্দেহ নেই ।

বাইরে থেকে ঘুরে-ঘুরে সিন্দুকটাকে নিরীক্ষণ করলে গডফ্রে । না, কোথাও কোনো নাম-ঠিকানা লেখা নেই । আশ্চর্য ! দেখে মনে হচ্ছে মারকিন কারিগরের তৈরি সিন্দুক, কিন্তু মারকিন ছুতোররা তো সিন্দুকের গায়ে ধাতুর পাতে নিজেদের নাম খোদাই ক'রে দেয় ! হয়তো ভিতরে ডালার গায়ে নাম লেখা কিংবা হয়তো ভিতরে কোনো কাগজপত্তর দেখে সব হদিশ পাওয়া যাবে । সিন্দুকের ডালাটা আঁটো ক'রে লাগানো, প্রায় শীলমোহর করা । ভালোই হ'লো : ভিতরে জল ঢুকে সব জিনিশপত্র নষ্ট হ'য়ে যায়নি । ভারি শক্ত কাঠের সিন্দুক এটা, উপরে চামড়ার আস্তরন, সবগুলো কোনায় তামার পুরু পাত লাগানো, তাছাড়া অনেকগুলো তামার পাত দিয়ে-দিয়ে সিন্দুকের কাঠকে আরো-মজবুত, আরো-টেকসই ক'রে তোলা হয়েছে ।

সিন্দুকের মধ্যে কী আছে দেখবার জন্যে গডফ্রে ভারি অধীর হ'য়ে উঠেছিলো । কিন্তু ডালাটা জখম না-ক'রে শুধু তালাটা ভেঙে ফেলে সিন্দুকটাকে খোলবার চেষ্টা করতে হবে । ড্রিম-বে-র শেষ প্রান্ত থেকে সিন্দুকটাকে উইল-ট্রি অবধি ব'য়ে নিয়ে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না–একবার ধাক্কা দিয়ে নড়াবার চেষ্টা ক'রেই গডফ্রে বুঝে ফেলেছে সিন্দুকটা কী-রকম ভারি ।

'এখানেই সিন্দুকটাকে খালি করতে হবে আমাদের,' আপন মনেই বললে গডফ্রে, 'ভিতরকার সবকিছু নিয়ে যাবার জন্যে যতবার দরকার ততবারই এখানে আসতে হবে আমাদের ।'

সোজা কথা নয় । দেবদারুবীথিকা থেকে জায়গাটা অন্তত চার মাইল দূরে । কাজেই কেবল যে অনেক সময়ই লাগবে তা-ই নয়, প্রচুর পরিশ্রমও করতে হবে । সময়ের অবশ্য অকুলোন হবে না–হাতে অঢল সময় আছে । আর পরিশ্রম ? তা তো করতেই হবে ।

কিন্তু কী আছে এই সিন্দুকটায় ? উইল-ট্রিতে ফিরে যাবার আগে গডফ্রে একবার সিন্দুকটার ডালা খোলবার চেষ্টা করলে । চামড়ার আস্তরনটা খুলে মস্ত ভারি তালাটাকে সে নিরীক্ষণ করলে কিছুক্ষণ । খোলে কী ক'রে সে তালাটা ? ভাঙেই বা কী ক'রে ? নাঃ কাজটা খুব সহজ হবে না ।

আশপাশে তাকিয়ে সে একটা ভারি পাথর তুলে নিলে । এটাই তার হাতুড়ি । তালাটার গায়ে পাথরটা দিয়ে ক'ষে খুব ক'রে বাড়ি মারলে একটা । কাজটা যে অতটা সহজ হবে, তা সে ভাবেনি । বাড়ি কষানো মাত্র তালাটা খুলে গেলো । হয় তালাটা আদৌ চাবি দিয়ে লাগানো ছিলো না, নয়তো বলতে হয় যে প্রথম ঘাটাই মোক্ষম হয়েছে, ঠিক যেন কামারের একমাত্র ঘা । সিন্দুকের ডালাটা তুলতে গিয়ে উত্তেজনায় গডফ্রের বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগলো ।

বেশ সহজেই ডালাটা উঠে গেলো । অবশ্য এমনিতে ডালা না-খুললে গডফ্রে শেষটায় ডালাটাকে জখম করতেও ছাড়তো না । আগাগোড়া দস্তার পাত দিয়ে সিন্দুকটার ভিতরটা মোড়া, আর সেইজন্যেই সমুদ্রের জল ভিতরে ঢুকতে পারেনি । ভিতরে যা-কিছু আছে, যত মোলায়েম ভঙ্গুর কি পলকাই হোক না-কেন, সব সেইজন্যেই একেবারে ঝকঝকে চকচকে ও নতুন র'য়ে গেছে ।

ভিতরে তাকাবামাত্র গডফ্রের হৃৎপিণ্ড যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। কিছুতেই সে আর তার ফুর্তি চেপে রাখতে পারলে না। সিন্দুকটা যে কোনো সাংসারিক সুবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান-ওলা যাত্রীর ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। যা-যা জিনিশ লাগে লোকের আজকাল, এই বিজ্ঞান-নির্ভর সভ্যতার যুগে, সব সেখানে স্তূপ হ'য়ে আছে।

যত রাজ্যের কাপড়–শার্ট, কামিজ, টেবিলঢাকনা, বিছানাচাদর, জানলার পর্দা–কিছু বাকি নেই : আছে পশমে বোনা আঁটো গেঞ্জি, পশমে বোনা মোজা, সুতির মোজা, পাৎলুন, মখমলের পাৎলুন, হাতে-বোনা ওয়েস্টকোট ; এবং সর্বোপরি দু-জোড়া ভারি শক্ত জুতো, শিকারের জুতো, শোলার টুপি।

তারপর রয়েছে রান্নাবান্নার বাসনকোশন ও জিনিশপত্র ; একটা লোহার কড়া যার অভাবে তারা রোজ হাহুতাশ করছিলো, কেৎলি, কফির পাত্র, চায়ের কেৎলি, কাঁটা-চামচে, ছুরি ; এছাড়া আছে আয়না, চিরুনি, তিনটে পাত্র ভর্তি প্রায় পনেরো পাঁইট ব্র্যাণ্ডি, কয়েক পাউণ্ড ক'রে ভালো চা ও কফি।

তারপরে রয়েছে কতগুলো জরুরি হাতিয়ার : করাৎ, তুরপুন, কিছু পেরেক আর আংটা, শাবল, কোদাল, কুড়ুল ইত্যাদি-ইত্যাদি।

এই শেষ নয়। কতগুলো অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে–চামড়ার খাপে ঢোকানো দুটি মস্ত ভোজালি, একটা দোনলা ও দুটো একনলা বন্দুক, তিনটে ছ-ঘড়া রিভলভার, প্রায় বারো পাউণ্ড কার্তুজ ও গুলি, কয়েকশো বুলেট। অস্ত্রশস্ত্রগুলো সবই ইংরেজ কম্পানির তৈরি। তাছাড়া রয়েছে ছোটো-একটা জরুরি ওষুধের বাক্স, একটা দূরবিন, একটা কম্পাস ও একটা ক্রনোমিটার। ইংরেজি ভাষায় লেখা কতগুলো বই, কয়েক দিস্তে কাগজ, কলম পেনসিল কালি, একটা পঞ্জিকা, নিউ-ইয়র্কে ছাপা একটা বাইবেল এবং একটি 'সচিত্র রন্ধনপ্রণালী'।

সন্দেহ নেই, এই সিন্দুক দৈবের সবচেয়ে তাজ্জব ও মূল্যবান উপহার : ঠিক যা-যা তাদের কাজে লাগবে, সব যেন ভেবেচিন্তে মৎলব ক'রে এখানে কেউ জড়ো ক'রে রেখে গেছে।

গডফ্রে তার ফুর্তি চেপে রাখবে কী ক'রে, ভেবেই পেলে না। সে যদি আগে থেকে জানতো যে জাহাজডুবি হবে, এবং তারপরে একটা নির্জন দ্বীপে এসে উঠবে–তাহ'লেও সে কিছুতেই সব জিনিশ আগে ভেবে-চিন্তে এভাবে একটা বাক্সবন্দী করতে পারতো না। ভগবানের করুণায় সে একেবারে যেন বিগলিত হ'য়ে গেলো : কিছুতেই আর কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা সে খুঁজে পেলে না।

গডফ্রে তার এই কোষাগারের সব জিনিশ এক-এক ক'রে বালির উপর নামিয়ে রাখলে। প্রত্যেকটা জিনিশ সে হাতে তুলে-তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে, কিন্তু একটা ছোট্ট চিরকুটও পেলে না যেখান থেকে সে এই সিন্দুকের মালিকের নাম বা জাহাজের নাম জানতে পারে। আশপাশে কোনো সাম্প্রতিক জাহাজডুবির কোনো চিহ্নই নেই। হয়তো অনেক দিন ধ'রে জলে ভেসে-ভেসে শেষটায় জোয়ারের সময় সিন্দুকটা এসে এখানে বালির চড়ায় ঠেকেছে।

ফিনা আইল্যাণ্ডের দুই বাসিন্দার এখন আর কোনো-কিছুরই অভাব রইলো না। কপাল বলে একেই।

তক্ষুনি-তক্ষুনি সব জিনিশ উইল-ট্রিতে নিয়ে যাবার কথা গডফ্রে ভুলেও ভাবলে না। সব-কিছু গিয়ে উইল-ট্রিতে তুলতে বার-কয়েক আসা-যাওয়া করতে হবে এখানে । কিন্তু তাই ব'লে দেরি করলে চলবে না । আবহাওয়া খারাপ হবার আগেই সব কাজ চুকিয়ে ফেলতে হবে তাদের । একটা বন্দুক, একটা রিভলভার, কিছু গুলি ও কার্তুজ, একটা ভোজালি, দুরবিন, লোহার কড়া—এই ক-টা জিনিশ বাইরে রেখে বাকি সব জিনিশ সে সিন্দুকটায় আবার তুলে রাখলে । এই জিনিশগুলো সে এক্ষুনি—প্রথমবারেই—ব'য়ে নিয়ে যাবে ।

সিন্দুকের ডালাটা ভালো ক'রে এঁটে গডফ্রে ফুর্তির চোটে হনহন ক'রে পা চালিয়ে দিলে ।

একঘন্টা পরে টার্টলেটের কাছ থেকে সে-যে কী সাদর সম্ভাষণ ও আপ্যায়ন পেলে, তা আর কী বলবো ! বিশেষ ক'রে লোহার কড়াটা দেখেই নৃত্যশিক্ষক চিল্লাচিল্লিওলা একটা লাফানে নাচ নাচলেন, তারপর তাঁর পকেট-বেহালায় দারুণ সব ফুর্তির সুর তুললেন ।

তখন মাত্র বেলা দুপুর । গডফ্রে ঠিক করলে মধ্যাহ্নভোজের পরেই আবার তার কোষাগারে যাবে । সিন্দুকভর্তি জিনিশ এই উইল-ট্রিতে এনে হাজির না-করা অব্দি তার আর কোনো স্বস্তি নেই ।

টার্টলেট এই প্রথম কোনো বাদ-প্রতিবাদ না ক'রে তক্ষুনি যাবার জন্য একপায়ে ভর দিয়ে নাচতে লাগলেন । আর তাঁকে আগুন পাহারা দিতে হবে না, সিন্দুকে অনেক বারুদ আছে । এখন থেকে ইচ্ছেমতো আগুন জ্বালিয়ে নেয়া যাবে । তবে যাবার আগে লোহার কড়ায় টার্টলেট মাংসের সুরুয়া চাপিয়ে দিয়ে গেলেন । আগুনের আঁচে কড়া-ভর্তি জল আপনা থেকেই দিব্য স্বর্গীয় সুরুয়ায় পরিণত হ'য়ে যাবে, যাবার আগেই এই কথাই তিনি বিশদ ক'রে বোঝালেন গডফ্রেকে ।

সিন্দুকটার মধ্যে স্তূপ-করা জিনিশ দেখে টার্টলেটের ফুর্তি আর ধরে না । পঞ্চমুখে তিনি একেকটা জিনিশের প্রশংসা করলেন আর পরম আহ্লাদের সঙ্গে জিনিশগুলোর উপর হাত বুলোলেন । এবার তারা সব অস্ত্রশস্ত্র, গুলিবারুদ, কাপড়চোপড় নিয়ে এলো উইল-ট্রিতে ।

বেশ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো দুজনে । মাংসের সুরুয়া আর স্টু-করা অ্যাগুটি তক্ষুনি তাদের চাঙ্গা ক'রে তুললো । 'সচিত্র রন্ধনপ্রণালী' আর কে চায় ? এই তো যথেষ্ট সুখাদ্য, দিব্য মুখরোচক ।

পরের দিনে ভোরবেলাতেই দুজনে বেরিয়ে পড়লো । আরো তিনবার যেতে হ'লো তাদের । শেষকালে সিন্দুক খালি ক'রে সব তারা নিয়ে এসে তুললো উইল-ট্রির কোটরে ।

পয়লা আগস্ট খালি সিন্দুকটাকেই দুজনে মিলে ব'য়ে নিয়ে এলো—সেটাও উইল-ট্রির মধ্যে জায়গা পেলে । এখন থেকে এই সিন্দুকটাই হ'লো তাদের ওয়ার্ডরোব, ওরফে কাপড়চোপড় রাখার বাক্স ।

টার্টলেটের চোখে এর মধ্যেই ভবিষ্যৎ দিব্যি গোলাপি ঠেকছিলো । সেইজন্যেই সন্ধেবেলায় তাঁর পকেট-বেহালা হাতে তাঁর ছাত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর যেন মানগোমেরি স্ট্রিটেই আছেন এমনি ভঙ্গিতে বললেন, 'এবার, গডফ্রে, তোমার নৃত্যর্চচা আবার শুরু করো । আজ তোমাকে একটা নতুন নাচ শেখাবো ।'

১৩

গডফ্রে দ্যাখে রুদ্ধশ্বাসে
দূর সাগরে জাহাজ ভাসে !

ভবিষ্যৎ এখন আর ততটা বিমর্ষ বা তমসাবৃত নয়, অথচ তবু গডফ্রের মনে আর স্বস্তি নেই। ফিনা আইল্যাণ্ড থেকে কী ক'রে পাততাড়ি গোটানো যায়, এই চিন্তাতেই সে সারাক্ষণ অস্থির। টার্টলেট অবিশ্যি আজকাল খুবই নিশ্চিন্ত, কিন্তু গডফ্রে রোজই ভাবে গাছ কেটে-কেটে একটা ভেলা বানিয়ে ভেসে পড়লে কেমন হয়।

আগের চেয়ে কাজ এখন ঢের কম। যেহেতু সারাক্ষণ ব'সে-ব'সে আর আগুন পাহারা দিতে হয় না, তাই টার্টলেটও ছুটি পেয়ে গেছেন—তিনি সারাদিন ধ'রে কেবল যবের রুটি বানান আর রান্নাবান্নার তদারকি করেন, আর সময়-নেই অসময়-নেই পকেট-বেহালায় টুংটাং তোলেন। আর গডফ্রে এখন থেকে রোজ কুঁকড়ো-পরিবার ও গৃহপালিত জীবগুলোর তদারকি করে। বন্দুক থাকায় আজকাল আর পোষা প্রাণীগুলোকে বধ করতে হয় না : ফিনা আইল্যাণ্ডের হরিণ বা ওয়াপিটিরাই আজকাল কাবাব কি স্টু হিশেবে সুখাদ্যে রূপান্তরিত হ'য়ে উইল-ট্রির খাবার-টেবিলে এসে হাজির হয়।

সিন্দুকে অনেক পেরেক আর গজাল ছিলো, করাত আর তুরপুনও ছিলো। তাদের সাহায্যে উইল-ট্রির দেয়ালে অনেকগুলো তাক বানানো গেছে : রান্নাবান্নার বাসনকোশন সে-সব তাকেই থাকে। বাকি রসদপত্র সব দেয়ালের গায়ে খোপ ক'রে-ক'রে তুলে রাখা হয়েছে। তাছাড়া কতগুলো আংটা লাগানো হয়েছে, অস্ত্রশস্ত্রগুলো তাতেই ঝোলে। মোটমাট, উইল-ট্রির ভিতরটা আজকাল বেশ ভদ্রস্থ হয়েছে—বেশ ফিটফাট থাকে সবসময়।

কোটরের মুখে একটা দরজা বসাবার কথা ভাবছিলো গডফ্রে। নইলে নিশাচর আর রাতজাগাদের উৎপাতে রাতে ভালো করে ঘুমোনোই যায় না। করাত দিয়ে কাঠ চেরাই করা নেহাৎ সহজ কাজ নয়। তার চেয়ে গাছের মোটা-মোটা বাকল জুড়েই সে বেশ শক্ত একটা কবাট তৈরি ক'রে ফেললে, ঠিক উইল-ট্রির কোটরটার মুখের মাপমতো। পাল্লাটা লাগিয়েই সে থামলে না, কোটরের মধ্যে দুটো ছোটো জানলাও সে বানিয়ে নিলে—জানলা না-ব'লে তাদের অবিশ্যি ঘুলঘুলি বলাই ভালো। আলো-হাওয়ার ভাবনা নেই, ওই ঘুলঘুলি দিয়েই ভিতরে দিব্যি আলো-হাওয়া আসতে পারবে। রাত্তিরে খিল এঁটে দিলে তো উইল-ট্রি একেবারে মস্ত একটা কেল্লাই হ'য়ে যায় যেন। শীতের লম্বা রাতগুলোয় আলো পাবে কোত্থেকে, সেটা গডফ্রে এখনো ভেবে বার করতে পারেনি। শেষকালে হয়তো ভেড়ার চর্বি জমিয়ে-জমিয়ে লম্ফ তৈরি করতে হবে তাকে। কিন্তু সে-ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে।

উইল-ট্রির মধ্যে একটা চিমনিও বানাতে হবে। আবহাওয়া যতদিন ভালো আছে, ততদিন না-হয় বাইরেই তারা রান্নাবান্না সারলে, কিন্তু বর্ষাবাদলার দিনে ? কিংবা শীতকালে, যখন ঠাণ্ডায় হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে, তখন ? উইল-ট্রির মধ্যেই তখন আগুন জ্বালতে হবে, কিন্তু তার ধোঁয়া বেরুবার একটা রাস্তা চাই তো।

আরেকটা জরুরি কাজ অবশ্য সে চুকিয়ে ফেলেছিলো। ছোটো নদীটার দুই পাড় থেকেই যাতে সহজে এই দেবদারুবীথিকায় আসা যায়, সেইজন্যে সে ডাঙা ডালপালা বেঁধে-বেঁধে ছোট্ট একটা সাঁকো বানিয়ে নিয়েছিলো। তার ফলে আজকাল চট ক'রেই উত্তর তীরে চ'লে যাওয়া যায়–মাইল দু-এক কম ঘুরলেই চলে।

কিন্তু তবু থেকে-থেকেই যখন-তখন গডফ্রের মনে দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যাবার ইচ্ছেটা হানা দেয়, আর সে ভারি ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। ফিনা আইল্যাণ্ডের আশপাশ দিয়ে যে কোনো জাহাজ যায় না, এটা সে অ্যাদ্দিনে মর্মান্তিকভাবেই টের পেয়ে গিয়েছে। যদি-বা দৈবাৎ কোনো জাহাজ দ্বীপের পাশ দিয়ে যায়, তাহ'লেও তারা দ্বীপটা সম্বন্ধে আদৌ কোনো কৌতূহল পোষণ করবে না। প্রশান্ত মহাসাগরে এমন কত অজানা-অচেনা ছোটো-ছোটো দ্বীপ আছে, জাহাজগুলো অনেক সময়েই তাদের দিকে কোনো নজর দেয় না। কিন্তু যদি জাহাজগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কোনো ব্যবস্থা করা যায়? যদি তাদের জানানো যায় যে এই দ্বীপে মানুষ থাকে, জাহাজডুবির পর নাজেহাল বেচারি মানুষ?

সেইজন্যে গডফ্রে দ্বীপের উত্তর অন্তরীপের শেষ মাথায় একটা মস্ত খুঁটি পুঁতে দিলে, আর তার মাথায় টাঙিয়ে দিলে একটা নিশেন। নিশেন অবিশ্যি নয়, একটা কাপড়। যেহেতু খটখটে রোদের দিন ছাড়া শাদা কাপড় সহজে কারু নজরে পড়বে না, সেইজন্যে কাপড়টাকে সে একরকম উদ্ভিদের রস দিয়ে টকটকে লালরঙে রাঙিয়ে দিয়েছে।

এইভাবে দিব্যি পনেরোই অগস্ট অবধি চ'লে গেলো। গত কয়েক সপ্তাহ ধ'রে আকাশ বেশ পরিষ্কার আছে: দু-একদিন রাতে অবশ্য বিষম ঝড় উঠেছিলো, কিন্তু এ-সব জায়গায় ঝড় যেমন আচম্বিতে আসে, তেমনি আচম্বিতে চ'লে যায়, অনেকক্ষণ ধ'রে ভোগায় না।

গডফ্রে আজকাল রোজ শিকারে যায়: পাখি বা হরিণ বা ওয়াপিটি শিকার ক'রে বেশ হৃষ্টমনে ফিরে আসে। কিন্তু শিকারে বেরিয়েও সে চোখকান সজাগ রাখে। দ্বীপটার একটা স্পষ্ট ছক সে মনে-মনে খাড়া করে নিতে চাচ্ছে ব'লেই একেক দিন একেক দিকে শিকারে যায়।

দ্বীপের মাঝখানকার বনে গিয়েছিলো একদিন। একদিন উঠেছিলো টিলার উপর। আরেক দিন গিয়েছিলো নদীর পাড় ধ'রে-ধ'রে তার উৎস কোথায়, খুঁজতে। ফিনা আইল্যাণ্ডে কোনো হিংস্র বন্য জন্তু নেই–এটা সে ইতিমধ্যেই নিশ্চিত ও নিশ্চিন্তমনে বুঝে নিয়েছে। এটাও এক মস্ত সৌভাগ্য বলতেই হয়। যদি নিত্য ও-সব হিংস্র জন্তুর আক্রমণের ভয়ে তাদের দিন কাটাতে হ'তো, তাহ'লে সব কাজকর্ম শিকেয় উঠতো। এমনকী উইল-ট্রির দুর্গও তাদের হাত থেকে খুব একটা নিরাপদ হ'তো না।

বন্দুকের শব্দ শুনেও যখন কোনো জংলি বা জাহাজ-ডোবা নাবিক এসে হাজির হয়নি, তখন এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে দ্বীপে আর-কোনো মানুষ থাকে না। কিন্তু তবু দ্বীপে গডফ্রে যে দু-দু-বার রহস্যময় ধোঁয়া দেখেছিলো, তার কথা একবারও ভুলতে পারছিলো না। সেই কুণ্ডলাকৃতি ধোঁয়ার কথা ভাবলেই তার কি-রকম বিমূঢ় ও হতভম্ব লাগে।

অথচ দ্বীপের কোথাও সে আগুনের কোনো চিহ্নই আবিষ্কার করতে পারেনি। ফিনা আইল্যাণ্ড যেহেতু অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্টি হয়নি, তখন এখানে উষ্ণ প্রস্রবণ থাকারও সম্ভাবনা নেই। শেষটায় গডফ্রে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে তার চোখের ভুল ব'লেই ভাবতে বাধ্য হ'লো।

তাছাড়া আর তো কখনও কোথাও কোনো ধোঁয়ার কুণ্ডলী তার চোখে পড়েনি। টিলার চুড়োয় উঠে বা উইল-ট্রির মগডালে উঠেও সে কোনোদিকে সন্দেহজনক কিছু পায়নি দেখতে। শেষটায় সে ওই ধোঁয়ার কথা একেবারে ভুলেই গেলো।

বেশ দিন কাটছিলো, কাজে-কর্মে, চিন্তায়-ভাবনায় ; টার্টলেট বেহালা বাজান, নাচের মহড়া দেন ; গডফ্রে শিকারে বেরোয়, দরকারি কাজগুলো সারে। কিন্তু ১৩ই সেপ্টেম্বর এমন-একটা ঘটনা ঘটলো নির্জন দ্বীপে আশ্রয়-নেয়া যে-কোনো জাহাজ-ডোবা লোক যাকে নিষ্ঠুরতম ও চরমতম প্রতারণা ও পরিহাস ব'লে গণ্য করতে বাধ্য।

আর-কোনোদিনই গডফ্রে সেই রহস্যময় ও প্রহেলিকাভরা ধোঁয়া দ্বীপে দ্যাখেনি–কিন্তু ১৩ই সেপ্টেম্বর বেলা তিনটের সময় ধোঁয়ার একটা লম্বা রেখা দেখে তার তার উৎসটা আবিষ্কার করতে তার একটুও দেরি হ'লো না।

ফ্ল্যাগ-পয়েন্ট অবধি সে গিয়েছিলো সেদিন। যেখানে সে নিশেন পুঁতেছিলো, তারই নাম সে দিয়েছিলো ফ্ল্যাগ-পয়েন্ট। চোখে দুরবিন এঁটে দিগন্তের দিকে সে তাকিয়েছিলো, হঠাৎ দেখলে পশ্চিমা বাতাসে দিগন্ত থেকে ধোঁয়া ভেসে আসছে।

দেখবামাত্র তার হৃৎপিণ্ডটা ধবক করে লাফিয়ে উঠলো।

'জাহাজ ! একটা জাহাজ !'

কলে-চলা জাহাজটা কি ফিনা আইল্যাণ্ডের পাশ দিয়ে যাবে ? যদি যায়, তাহ'লে কত কাছে দিয়ে যাবে ? এই পৎপৎ নিশেনটা দেখা যাবে জাহাজ থেকে ? সংকেতটা তারা টের পাবে ? না কি জাহাজটা উত্তর-পশ্চিম বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তেই মিলিয়ে যাবে ? সমুদ্রের এ-ধারটা কি আদৌ সে মাড়াবে না ?

এই দোটানা গডফ্রেকে দু-ঘন্টা ধ'রে ছিঁড়তে লাগলো।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমশ দীর্ঘ ও বড়ো হচ্ছে। বেলা চারটে নাগাদ সমুদ্র আর আকাশের মিলনরেখায় দেখা গেলো তার মস্ত চোঙ, একটা কালো ফুটকির মতো।

কলে-চলা বড়ো জাহাজ একটা। উত্তর-পুবদিক ধ'রে এগুচ্ছে। আর তা-ই যদি হয়, তবে ফিনা আইল্যাণ্ড যে তার পথে পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

গডফ্রে গোড়ায় ভাবলে দৌড়ে গিয়ে উইল-ট্রিতে টার্টলেটকে খবর দিয়ে আসে। কিন্তু কী লাভ তাতে ? একজন লোক সংকেত করলেও যা, দুজনে মিলে চ্যাচামেচি করলেও তা-ই–ফল একই। চোখে দুরবিন এঁটে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো, যেন মুহূর্তে তার চলৎশক্তি হারিয়ে গেছে।

জাহাজটা কিন্তু সমানে এগিয়ে আসছে। এভাবে এগুলে ঠিক অন্তরীপের কাছে পৌঁছুবে। পাঁচটা নাগাদ পুরো জাহাজটাই গডফ্রের চোখে ভেসে উঠলো–এমন কী গলুইয়ের গায়ে কী রঙ মাখা, তা অবধি গডফ্রে স্পষ্ট দেখতে পেলে। নিশেনটার রঙও তার মোটেই অগোচর রইলো না। জাহাজটা মারকিন।

'আমি যদি অ্যাদ্দুর থেকে জাহাজটার নিশেন দেখতে পারি, তাহ'লে তারা কি আমার নিশেনটা দেখতে পাচ্ছে না ! হাওয়ায় দিব্যি পৎপৎ উড়ছে আমার নিশেন–দুরবিনে তো তা স্পষ্ট দেখতে পাবার কথা। নিশেনটা নামিয়ে বারে-বারে নেড়ে-নেড়ে সংকেত করবো নাকি? বোঝাবো ওদের, যে আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই ? হ্যাঁ, তা-ই ভালো।

এক্ষুনি–আর-একটুও সময় নষ্ট করা চলবে না ।'

গডফ্রে উঠে চ'লে গেলো অন্তরীপের ঠিক ডগায় । অনবরত দোলাতে লাগলো নিশেনটা । তারপর নিশেনটাকে সে খুঁটির গায়ে আদ্ধেক নামিয়ে রাখলে । নাবিকরা সাহায্য চাইতে হ'লে তা-ই করে সবসময় ।

জাহাজটা তীর থেকে আর-মাত্র মাইল তিনেক দূরে—কিন্তু কই, তার নিশেন তো তেমনি মাস্তুলের ডগায় পৎপৎ ক'রে উড়ছে । গডফ্রের সংকেতের কোনো সাড়াই তো দিচ্ছে না! হতাশায় গডফ্রে প্রায় ভেঙে পড়লো । নিশ্চয়ই তার সংকেত জাহাজের চোখে পড়েনি ! কিন্তু আর তো নজরে পড়বেও না ! সাড়ে ছটা বাজে, সন্ধে হ'লো ব'লে ।

জাহাজটা ফিনা আইল্যাণ্ডের অন্তরীপ থেকে যখন মাত্র দু-মাইল দূরে, ঠিক তখন সূর্য ডুবে গেলো । সন্ধ্যার ছায়ায় গডফ্রের সব চেষ্টাই নিস্ফল হ'য়ে যাবে, আর তাকে জাহাজের লোকরা দেখতে পাবে না । গডফ্রে আবার নিশেনটা সমানে নাড়াতে লাগলো । না, কোনো সাড়া নেই ।

তখন সে হাতের বন্দুকটা তুলে দু-তিনটে ফাঁকা আওয়াজ করলে । কিন্তু দূরত্ব তখনও অনেক, তাছাড়া হাওয়াও অন্য দিকে বইছে । জাহাজ থেকে বন্দুকের আওয়াজ শোনাই যাবে না !

ক্রমে রাত ক'রে এলো । স্টিমারটা ঢাকা প'ড়ে গেলো অন্ধকারে । আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জাহাজটা নির্বিকারভাবে ফিনা আইল্যাণ্ড পাশ কাটিয়ে চ'লে যাবে ।

কী করবে কিছুই ঠিক করতে না-পেরে গডফ্রে শেষটায় কিছু শুকনো ডালপালা জড়ো ক'রে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে ।

কিন্তু উত্তরে জাহাজ থেকে কোনো আগুনই জ্বললো না । অন্ধকারে কালো ভূতের মতো জাহাজটা ভেসে যাচ্ছে, কেবল দূর থেকে ঝাপশাভাবে ভেসে আসছে তার ইঞ্জিনের একটানা আওয়াজ ।

বিষণ্ণ বদনে উইল-ট্রিতে ফিরে এলো গডফ্রে । আর-কোনোদিনও তার এমন ব্যর্থ লাগেনি নিজেকে–এত ব্যর্থ, এত পরিত্যক্ত, এত বিমর্ষ লাগলো তার যে টার্টলেটকে সে কোনো কথা বলতেই পারলে না ।

১৪

জংলিরা সব চড়াও দ্বীপে—
সামলে চলো পা টিপে-টিপে ।

না, এ-রকম ভীষণ চোট আর কক্খনো খায়নি গডফ্রে । এই যে অপ্রত্যাশিত সুযোগটি তার হাতছাড়া হ'য়ে গেলো, আর কোনোদিনই কি তাকে সে পাবে ? যে-রকম উদাসীনভাবে জাহাজটি দ্বীপের পাশ দিয়ে চলে গেলো, একবারও এমনকী দ্বীপের দৃক্পাত মাত্র না-ক'রেই; তাতেই বোঝা যায় যে প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত দ্বীপগুলোর প্রতি সব জাহাজেরই এই মনোভাব । জাহাজ ভেড়াবার মতো কোনো জায়গাই নেই দ্বীপে, কাজেই তাকিয়ে দেখেই বা তারা কী করতো ?

ভারি বিমর্ষ ও বিরস কাটলো রাতটা । যেন মস্ত কামান গ'র্জে-গ'র্জে উঠছে সমুদ্রে, আর তারই আওয়াজে বারে-বারে চমকে তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে ! কিংবা তার মনে হচ্ছে তার জ্বালানো ওই মস্ত আগুন কি অন্ধকারে জাহাজের চোখে পড়েনি ? তাহ'লে কি কামান গর্জিয়েই তারা শেষকালে সাড়া দিতে চাচ্ছে ?

উৎকর্ণ হ'য়ে রইলো গডফ্রে । শরীরে প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে সে যেন রাতের আওয়াজগুলোকে শুনতে চাচ্ছে । না, সবই তার অতি-উত্তেজিত মগজের সৃষ্টি, সবই শ্রুতিবিভ্রম । আস্তে-আস্তে যখন দীর্ঘ দুঃস্বপ্নে ছেঁড়া রাতটা শেষ হ'য়ে গেলো, ততক্ষণে সেই চলন্ত জাহাজটি তার কাছে ঠিক স্বপ্নের মতো ঠেকতে শুরু করেছে—দীর্ঘ একটি স্বপ্ন, কাল বিকেল তিনটের সময় সে এই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলো ।

কিন্তু না, ফিনা আইল্যাণ্ডের দু-মাইলের মধ্যে দিয়ে যে একটা কলে-চলা জাহাজ গেছে এ-বিষয়ে তার সন্দেহ নেই ; আর জাহাজটি যে দ্বীপে নোঙরই ফ্যালেনি, এই তথ্যও মর্মান্তিকভাবেই সে অনুধাবন করেছে ; করতে বাধ্য হয়েছে ।

সবটাই যেন দৈবের এক মস্ত প্রতারণা । এই বঞ্চনার কথা টার্টলেটকে ব'লেই বা কী লাভ ? গডফ্রে এ-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্যই করলে না । তাছাড়া টার্টলেটের হালকা মন চব্বিশ ঘণ্টা পরেকার কোনো-কিছুই দেখতে পারে না । দ্বীপ থেকে যে চ'লে যাবার কোনো সুযোগ আসতে পারে এ-কথাটা আজকাল তিনি মোটেই ভাবেন না । সান ফ্রানসিসকোর স্মৃতি ক্রমেই তাঁর মন থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে । তাঁর তো কোনো ফিনা হলানি নেই ফিরে যাবার জন্যে, নেই কোনো মাতুল উইলিয়াম । জগতের এই শেষ প্রান্তে যদি তিনি নিয়মিত নাচ শেখাতে পারেন, তাহ'লেই তিনি খুশি ।

চারটে নাগাদ অধ্যাপক টার্টলেট ফ্ল্যাগ-পয়েন্টের কাছে রোজকার মতো ঝিনুক আর পাখির ডিম জোগাড় করতে গিয়েছিলেন, হঠাৎ গডফ্রে দেখলে তিনি হাঁপাতে-হাঁপাতে প্রাণপণে ছুটে আসছেন উইল-ট্রির দিকে, একটা পাও নাচের তালে পড়ছে না । মাথার চুলগুলো খাড়াখাড়া, চোখমুখে আতঙ্ক, একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাবার সাহসটুকু পর্যন্ত তাঁর হচ্ছে না ।

গডফ্রে একটু ভয়ই পেলে । সে ছুটে এসে চেঁচিয়ে জিগেস করলে : 'কী ব্যাপার ?'

'ওইখানে ! ওইখানে !' উত্তরদিকের গাছপালার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন টার্টলেট ।

'কিন্তু ওখানে কী ?'

'একটা ক্যানু !'

'ক্যানু ?'

'হ্যাঁ । জংলিরা...ক্যানু ভর্তি জংলিরা এসে চড়াও হয়েছে ! নরখাদকই হবে বা হয়তো !'

টার্টলেট যে-দিকটায় আঙুল তুলে দেখাচ্ছিলেন, গডফ্রে সেদিকে তাকিয়ে দেখলে । ছোটো একটা ডিঙি ভেসে আসছে, তীর থেকে আধমাইল দূরে হবে হয়তো, ফ্ল্যাগ-পয়েন্ট পেরিয়েই দ্বীপে এসে ভিড়বে হয়তো ।

'তা নরখাদক হ'তে যাবে কেন ?' টার্টলেটের দিকে ফিরে গডফ্রে জিগেস করলে।

'কারণ ক্রুসো-দ্বীপগুলোয় একদিন-না-একদিন নরখাদকরা এসে চড়াও হয় !'

'কোনো সদাগরি জাহাজের নৌকো নয়তো ?'

'জাহাজের নৌকো ?'

'হ্যাঁ । কাল বিকেলেই তো এই দ্বীপের পাশ দিয়ে একটা কলে-চলা জাহাজ গেছে–হয়তো তারই নৌকো !'

'আর তুমি এ-সম্বন্ধে টু শব্দটিও করোনি ?'

'ব'লে কী লাভ হ'তো ?' উলটে জিগেস করলে গডফ্রে, 'তাছাড়া আমি ভেবেছিলুম জাহাজটা হয়তো চ'লেই গেছে ! কিন্তু নৌকোটা হয়তো সেই জাহাজ থেকেই আসছে ! আসুন, ভালো ক'রে দেখি ।'

উইল-ট্রির কাছে গিয়ে গডফ্রে তার দূরবিনটা নিয়ে এলো ।

একটু ভালো করে লক্ষ ক'রেই তারও গলায় আতঙ্ক ফুটে উঠলো, 'জংলি ! সত্যি, জংলিরাই !' তার অবশ হাত থেকে দূরবিনটা খ'সে প'ড়ে গেলো ।

টার্টলেটের মনে হ'লো তাঁর হাঁটুর জোড়া খুলে যাচ্ছে,পা দুটি বিবশ হ'য়ে আসছে । গডফ্রের কথাটা শোনবামাত্র আবার তাঁর গায়ের লোম খাড়া হ'য়ে উঠেছে ।

গডফ্রে ভুল দ্যাখেনি । ডিঙিটায় জংলিরাই আছে–এবং এই দ্বীপের দিকেই তারা আসছে । পলিনেশিয়ার ক্যানুর মতো দেখতে, বাঁশের ডগায় একটা মস্ত পাল খাটানো । ডিঙিটার গড়ন দেখেই গডফ্রে বুঝতে পেরেছে যে ফিনা আইল্যাণ্ড মালয়েশিয়ার বেশি দূরে হবে না । কিন্তু ডিঙিটায় মালয়ের লোকেরা নেই–অর্ধনগ্ন কালো কতগুলো মানুষ ব'সে দাঁড় টানছে, তাদের সংখ্যা হবে দশ কিংবা বারো ।

জংলিরা যদি তাদের দেখে ফ্যালে, তাহ'লেই সর্বনাশ । খুঁটির ডগায় নিশেন উড়িয়েছে ব'লে এখন বড্ড অনুতাপ হ'লো গডফ্রের । নিশেনটা জাহাজ থেকে কেউ দ্যাখেনি বটে, কিন্তু এখন এই জংলিদের চোখে তা ঠিকই পড়বে । কিন্তু, হায়রে, এখন আর নিশেন খুলে নেবারও কোনো অবসর নেই !

ভারি ঝামেলা হ'লো, সত্যি ! হয়তো দ্বীপে কেউ থাকে না ভেবেই জংলিরা আসছিলো; 'স্বপ্ন' ডুবে যাবার আগে সত্যিই তো দ্বীপটা ছিলো পরিত্যক্ত ও জনমানবহীন । এখন খুঁটির ডগায় নিশেন উড়ছে দেখেই তারা টের পেয়ে যাবে যে দ্বীপে লোক থাকে । একবার যদি জংলিরা দ্বীপে নামে তো ওরা তাদের হাত থেকে রেহাই পাবে কী ক'রে ? ফ্যালফ্যাল ক'রে ক্যানুটার দিকে তাকিয়ে রইলো গডফ্রে । কী যে সে করবে, কিছুই ঠিক করতে পারছে না । জংলিরা দ্বীপে নেমে কী করে না-করে, হয়তো সেটা লক্ষ করাই তার আশু কর্তব্য। পরে অবস্থা বুঝে সব ব্যবস্থা করা যাবে ।

চোখে আবার দুরবিনটা এঁটে নিলে সে । অন্তরীপকে পাশ কাটিয়ে ক্যানুটা দ্বীপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে–উইল-ট্রির কাছ দিয়ে যে ছোটো নদীটা গেছে, সোজা তার দিকেই এগুচ্ছে ক্যানুটা ।

জংলিরা যদি নদীর মধ্যে ঢুকে পড়ে, তাহ'লে দেবদারুবীথিকায় এসে পৌঁছুতেও তাদের মোটেই দেরি হবে না । গডফ্রে আর টার্টলেট হুড়মুড় ক'রে উইল-ট্রির দিকে ছুটলো । হঠাৎ যাতে এসে জংলিরা চড়াও না-হ'তে পারে, গোড়ায় তারই ব্যবস্থা করতে হবে । যাতে ওদের ঠেকানো যায়, সেইজন্যেই তাদের তৈরি হ'তে হবে এখন । অন্তত গডফ্রে তা-ই ভেবেছিলো। টার্টলেটের ভাবনা কিন্তু একেবারে উলটো মোড় নিলে ।

'হায়রে !' আর্তনাদ করতে লাগলেন টার্টলেট, 'এটাই হচ্ছে নিয়তির লিখন ! কপালের লেখা খণ্ডাবে কে ? দ্বীপে জংলিদের কোনো ক্যানু এসে ঠেকবে না, আর তুমি দিব্যি একজন রবিনসন ক্রুসো হ'য়ে যাবে, তা তো আর হয় না ! নরখাদকেরা আসবেই–একদিন-না-একদিন! মাত্র তিন মাস হ'লো দ্বীপে এসে উঠেছি আমরা–আর তার মধ্যেই তারা এসে হাজির ! সত্যি ডানিয়েল ডিফো বা ইয়োহোন হ্বিস–কেউই খুব-একটা রঙ চড়ায়নি !'

উইল-ট্রির কাছে ফিরে এসেই গডফ্রে প্রথমে দেবদারুর তলাকার আগুনের কুণ্ডটা নিভিয়ে দিলে । অঙ্গার, ছাই, সব সে ঝেঁটিয়ে সাফ ক'রে দিলে, যাতে আশপাশে তার কোনো চিহ্নই না-থাকে । সন্ধ্যা আসন্ন ব'লে কুঁকড়ো-পরিবারকে আগেই তাদের কোটরে ওঠানো হয়েছিলো–কোটরের মুখটা এবার ডালপালা লতাপাতা দিয়ে যথাসম্ভব ঢেকে দেয় হ'লো, যাতে বাইরে থেকে দেখে টের পাওয়া না-যায় । অন্য জীবগুলোকে প্রেইরির দিকে হাঁকিয়ে দেয়া হ'লো : তাদের জন্যে যে কোনো খোঁয়াড় নেই, এটাই ভারি দুঃখের । সব টুকিটাকি জিনিশপত্র উইল-ট্রিতে নিয়ে আসা হ'লো–বাইরে এমন-কিছুই রইলো না যা দেখে মানুষের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় । তারপর গডফ্রে আর টার্টলেট নিজেরা কোটরের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে ভালো ক'রে কবাটটা এঁটে দিলে । ভগ্যিশ কবাটটা দেবদারুর বাকলেই তৈরি ছিলো–তাই সেটাকে বাইরে থেকে চেনবার উপায় ছিলো না । ঘুলঘুলি দুটোরও উপর পাল্লা টেনে দেয়া হ'লো । তারপর সব আলো নিভিয়ে দিয়ে দুজনে মিশকালো নিরেট অন্ধকারে চুপচাপ ব'সে রইলো । রাতটা যেন আরো দীর্ঘ ও ভয়ংকর, শেষ হ'তেই চাচ্ছিলো না, একেকটা ঘণ্টাকে কে যেন টেনে লম্বা ক'রে দিয়েছে । বাইরের ক্ষীণতম আওয়াজটুকু পর্যন্ত তারা উৎকর্ণ হ'য়ে শুনলো । ওই কোথায় মড়মড় ক'রে উঠলো একটা শুকনো খটখটে ডাল, হাওয়া এসে ঝাপটা দিলো ডালপাতায়, কোথাও একটা রাতজাগা পাখি ডুকরে কেঁদে উঠলো–আর প্রত্যেকটা আওয়াজেই তারা থেকে-থেকে চমকে উঠলো, আঁৎকে উঠলো ।

একবার মনে হ'লো গাছতলায় কারা যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে । যেন উইল-ট্রির চারপাশে কেউ চক্কর দিয়ে দেখছে । গডফ্রে একবার ঘুলঘুলির পাল্লা একটু ফাঁক ক'রে বাইরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে ।

কেউ নেই ! কেবল অন্ধকারের মধ্যে সমুদ্রের খোলা হাওয়া ব'য়ে যাচ্ছে হা-হা ।

কিন্তু শেষটায় সত্যিই শোনা গেলো পায়ের শব্দ । এবার আর গডফ্রের কান তাকে ঠকাতে পারলে না । ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে—কেউ না, একটা ছাগল ফিরে এসেছে প্রেইরি থেকে, গাছতলায় এসে আশ্রয় নিচ্ছে ।

জংলিরা যদি এই দেবদারুর বাড়ি দেখে ফ্যালে তো গডফ্রে যে কী করবে তা সে এর মধ্যেই ঠিক ক'রে ফেলেছিলো । টার্টলেটকে টেনে সে চিমনি বেয়ে উপরে উঠে যাবে মগডালে, সেখান থেকে জংলিদের আরো ভালো ক'রে ঠেকানো যাবে । বন্দুক-রিভলভার আছে তাদের, গুলিবারুদও মোটেই কম নেই—জনা বারো জংলির সঙ্গে যুঝতে মোটেই তেমন বেগ পেতে হবে না । জংলিদের সঙ্গে যদি তীর-ধনুক থেকেও থাকে, তবু আগ্নেয়াস্ত্রর সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ । আর ডাল ধ'রে ঝুলে-ঝুলে মগডালে পৌঁছুতে চাইলেও জংলিরা বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না, কারণ গডফ্রে অনেকবার বাইরে থেকে গাছটায় চড়বার চেষ্টা ক'রে দেখেছে, মোটেই কোনো সুবিধে করতে পারেনি ।

ফন্দিটা অবশ্য সে ভেঙে বলেনি টার্টলেটকে । বেচারি সেই-যে ক্যানুটা দেখার পর থেকে আতঙ্কে মুখে কুলুপ এঁটে ব'সেছিলেন, এখনও তেমনি ব'সে আছেন—চুপচাপ, ভীত, সন্ত্রস্ত ও বাক্‌শক্তিরহিত । এর পরে যদি শোনেন যে কখনো পাখির মতো গাছের ডালে গিয়ে আশ্রয় নিতে হ'তে পারে, তাহ'লে তিনি আরো কাবু'ও নিস্তেজ হ'য়ে পড়বেন । ভাববার কোনো অবসর না-দিয়েই তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে উপরে তুলে নিয়ে যাবে ব'লে গডফ্রে স্থির করেছিলো ।

রাতটা এমনি আশা-নিরাশার দোটানায় কেটে গেলো । কেউ তাদের আক্রমণ করলে না । জংলিরা দেবদারুবীথিকার ধারে-কাছেই ঘেঁষেনি । হয়তো দ্বীপে ঢোকবার আগে দিনের আলোয় সব ভালো ক'রে দেখেশুনে নিতে চায় ।

'তা-ই নিশ্চয়ই তাদের মৎলব,' বললে গডফ্রে, 'নিশেনটা দেখে তো টের পেয়েছে যে দ্বীপে লোক থাকে ! কতজন থাকে, তা যেহেতু জানে না, তাই সাবধানে রয়েছে । এটা কী ক'রে জানবে যে মাত্র দুজন জাহাজডোবা লোকের সঙ্গে তাদের বুঝতে হবে ? না, দিন না-হ'লে তারা কিছুই করবে না—যদি দ্বীপে তারা নামতে চায় তো তা সেই দিনের বেলায় ।'

'যদি দিনের বেলা তারা চ'লে যায়?' টার্টলেট বললেন ।

'চ'লে যাবে ? কেন ? অত কষ্ট ক'রে মাত্র এক রাত্তিরের জন্যে এই ফিনা আইল্যান্ডে তারা আসবে কেন তবে ?'

'তা জানি না । আমি একটা সম্ভাবনার কথা বলছিলুম ।'

'কাল সকালে ওরা যদি উইল-ট্রির কাছে না-আসে তো আমরাই বেরুবো ওদের সন্ধানে ।'

'আমরা ?'

'হ্যাঁ ! আমরা ! আমাদের দুজনের মধ্যে একবারও ছাড়াছাড়ি হ'লে চলবে না—কখন কী হয়, কে জানে ! হয়তো জঙ্গলে গিয়েই আমাদের আশ্রয় নিতে হবে—যতদিন জংলিরা দ্বীপে থাকে, ততদিন হয়তো বনে-জঙ্গলেই লুকিয়ে থাকতে হবে আমাদের । না, টার্টলেট ! আমরা দুজনে একসঙ্গেই থাকবো !'

'শ্ শ্ শ্...চুপ !' ফিশফিশ ক'রে বললেন টার্টলেট, 'বাইরে কিসের শব্দ হ'লো না ?'

গডফ্রে আবার ঘুলঘুলি ফাঁক ক'রে বাইরে তাকিয়ে দেখলে । 'না ! সন্দেহজনক কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না ! ওই ছাগল-ভেড়াগুলো ফিরে আসছে প্রেইরি থেকে !'

'হয়তো ভীষণ তাড়া খেয়েছে ?'

'তাহ'লে তাড়া খেয়েও তারা দেখছি ভারি শান্ত থাকে ! আমার ধারণা বাইরে হিম পড়ছে ব'লে তারা গাছতলায় আশ্রয় নিতে এসেছে ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন টার্টলেট । 'তোমার মামাবাড়িতে—মানগোমেরি স্ট্রিটে—কিন্তু এ-সব কিছুই হ'তে পারতো না ।'

অত দুঃখের মধ্যেও হাসি চাপতে ভারি কষ্ট হ'লো গডফ্রের । 'এক্ষুনি সকাল হ'য়ে যাবে । আর একঘণ্টার মধ্যে যদি জংলিদের দেখা না-পাই তো আমরাই উইল-ট্রি ছেড়ে বেরুবো—সোজা দ্বীপের উত্তরদিকে চ'লে যাবো । আপনি অন্তত একটা বন্দুক সঙ্গে নিতে পারবেন তো , টার্টলেট ?'

'কী ? ব'য়ে নিতে হবে বন্দুক ? তা পারবো ।'

'যেদিকটায় গুলি ছুঁড়তে বলবো, সেদিকটায় টিপ ক'রে গুলি ছুঁড়তে পারবেন তো ?'

'জানি না ! কক্খনো তো বন্দুক ছুঁড়িনি । তুমি ঠিক জেনো, গডফ্রে, আমার বন্দুকের গুলি কক্খনো চাঁদমারিতে পৌঁছুবে না !'

'কে জানে ! হয়তো বন্দুকের আওয়াজ শুনেই জংলিরা ভয় পেয়ে চম্পট দেবে !'

এক ঘণ্টা পরেই চারদিক আলো হ'য়ে উঠলো । সাবধানে ঘুলঘুলির ঢাকা খুলে বাইরে তাকালে গডফ্রে ।

দক্ষিণদিকে তো অস্বাভাবিক কিছুই দেখা যাচ্ছে না । ছাগল-ভেড়াগুলি দিব্যি নিশ্চিন্তে চ'রে বেড়াচ্ছে, তাদের মধ্যে ভয়ের কোনো লক্ষণই নেই । উত্তরদিকের ঘুলঘুলির ঢাকা খুলে তাকাতেই একেবারে সমুদ্রতীর পর্যন্ত চোখে প'ড়ে গেলো । এমনকী ফ্ল্যাগ-পয়েন্ট অব্দি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে । কিন্তু নদীর মুখটায় কাল যেখানে তারা জংলিদের ডিঙি দেখেছিলো, সেখানে এখন আর-কিছুই দেখা যাচ্ছে না । সব বেশ শান্ত চুপচাপ প'ড়ে আছে ।

দুরবিনটা চোখে এঁটে গডফ্রে আবার ফ্ল্যাগ-পয়েন্টের দিকে তাকালে । কিচ্ছু নেই। হয়তো তাহ'লে টার্টলেটের ধারণাই ঠিক । জংলিরা হয়তো এখানে কেবল রাতটাই কাটাতে এসেছিলো ! কিন্তু কেন ?

অনেক ভেবেও গডফ্রে এই ধাঁধার কোনো উত্তর বার করতে পারলে না ।

১৫

বুক ধুকপুক । বুক টিপ-টিপ ।
বন্দুক তুলে ঠিক করো টিপ ।
বুক টিপটিপ । বুক ধুকপুক ।
ঘোড়া টেপো : ছোঁড়ো গাদা বন্দুক ।

কিন্তু হঠাৎ গডফ্রে এমনি একটা বিস্ময়ের ধ্বনি করলে যে টার্টলেট একেবারে আঁৎকে লাফিয়ে উঠলেন । দ্বীপে লোক থাকে, এটা যে জংলিরা টের পেয়েছে, তাতে আর-কোনো সন্দেহ নেই । কারণ ফ্ল্যাগ-পয়েন্টের খুঁটির উপরে নিশেনটা আর নেই—নিশ্চয়ই জংলিরা সেটা নামিয়ে নিয়েছে । তাহ'লে আর দেরি করা যায় না । জংলিরা এখনো দ্বীপে আছে কিনা জানবার জন্যে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া উচিত ।

'চলুন, বেরিয়ে পড়ি !'

'বেরিয়ে পড়বো ! কিন্তু—' টার্টলেট আমতা-আমতা করলেন ।

'তাহ'লে আপনি এখানেই থাকুন ।'

'তুমি যদি থাকো, গডফ্রে, তাহ'লেই—'

'না, একাই থাকুন !'

'একা ! ককখনো না !'

'তাহ'লে চ'লে আসুন ।'

টার্টলেট যখন বুঝতে পারলেন যে গডফ্রের সংকল্পের আর-কোনো নড়চড় হবে না, তখন তার সঙ্গে যাবেন ব'লেই ঠিক করলেন । একা-একা উইল-ট্রিতে প'ড়ে থাকবার সাহস তাঁর নেই ।

বেরুবার আগে গডফ্রে অবশ্য তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললে যে আগ্নেয়াস্ত্রগুলোয় গুলি ভরা আছে—ঘোড়া টিপলেই হ'লো : 'গুড়ুম !' টার্টলেট নিলেন একটা বন্দুক, গডফ্রে আরেকটা । কোমরবন্ধে একটা ভোজালিও ঝোলালেন টার্টলেট, আর ঝোলালেন কার্তুজের থলি । একবার ভাবলেন বেহালাটাও সঙ্গে নেন—গানের সুরে যদি জংলিদের মন ভেজে ! কিন্তু গডফ্রে বহু কষ্টে তাঁকে নিবারণ করলে ।

সকাল তখন ছ-টা : দেবদারুগুলোর ডগায় প্রথম সূর্যের আলো ঝিলিক দিচ্ছে ।গডফ্রে সাবধানে দরজাটা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালে । একবার চারপাশে ভালো ক'রে তাকালে সে-সব স্তব্ধ, চুপচাপ । ছাগল, ভেড়াগুলো প্রেইরিতেই ফিরে গেছে, দিব্যি চ'রে বেড়াচ্ছে, ঘাস খাচ্ছে । এটা মোটেই মনে হ'লো না যে তাদের বিন্দুমাত্র অস্বস্তি হচ্ছে ।

টার্টলেটকেও বেরিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলে গডফ্রে । বন্দুক কাঁধে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলেন টার্টলেট : একটু ইতস্তত ক'রে তিনিও শেষটায় বেরিয়ে এলেন বাইরে ।

গডফ্রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে—দেবদারুর বাকলটা যাতে মিশে যায়, বাইরে থেকে দেখে যাতে সহজে বোঝা না-যায় এটা একটা দরজা, সেদিকটায় সে ভালো ক'রে লক্ষ

রাখলে । পায়ের ছাপ যাতে কারু চোখে না-পড়ে সেইজন্যে তারপর গাছের তলায় কিছু ডালপালা ছড়িয়ে রেখে দিলে । তারপর সে এগিয়ে চললো নদীর দিকে । উদ্দেশ্য : নদীর পাড় ধ'রে-ধ'রে একেবারে মোহানা অব্দি যাবে । টার্টলেটও ভয়ে-ভয়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন–একেকবার পা ফেলার আগে একটু থমকে চারদিক তিনি নিরীক্ষণ করেন, তারপর একা প'ড়ে থাকার ভয়ে আবার এগিয়ে যান ।

নদীর ধারের গাছগুলোর কাছে এসে গডফ্রে চোখে দুরবিন এঁটে দ্বীপের উত্তর-পুব কোণে ফ্ল্যাগ-পয়েন্টের দিকে তাকালে । কোথাও কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই–কোত্থাও নেই । কোনো ধোঁয়ার রেখাও দেখা যাচ্ছে না ।

অন্তরীপের ধারটায় কেউ নেই বটে, কিন্তু সেখানে যে টাটকা কতগুলো পায়ের ছাপ দেখা যাবে, সে-বিষয়ে গডফ্রের সন্দেহ ছিলো না । খুঁটিটায় সত্যিই নিশেনটা আর নেই। জংলিরা যদি সত্যিই দ্বীপ ছেড়ে-চ'লে গিয়ে থাকে, তবে লাল কাপড়টা দেখে আর লোভ সামলাতে পারেনি, যাবার আগে সেটাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে ।

পশ্চিমদিকের তীরটাও ফাঁকা প'ড়ে আছে–কোনো ছোটো-বড়ো ডিঙিই সমুদ্রে দেখা যাচ্ছে না । এক হ'তে পারে জংলিরা তীরের পাথরগুলোর আড়ালে ক্যানুটা এমনভাবে লুকিয়ে ভিড়িয়েছে যে দূর থেকে দেখে বোঝবার জো নেই ।

কিন্তু জংলিরা দ্বীপে আছে কি না, সেটা ঠিকঠাক না-জানলেই বা চলবে কী ক'রে ? সেটা বোঝবার জন্যেই তো তাকে যেতে হবে সেখানে, আগের দিন রাত্রে জংলিরা যেখানে নৌকো ভিড়িয়েছিলো–অর্থাৎ নদীর ঠিক মোহানায় গিয়ে তাকে খোঁজখবর করতে হবে ।

নদীর পাড়ে মাঝে-মাঝে দু-একটা ক'রে গাছ জটলা পাকাচ্ছে–কোথাও-বা ঝোপঝাড় রয়েছে । তার আড়াল দিয়ে-দিয়েই এগুবে ব'লে ঠিক করলে গডফ্রে । হয়তো জংলিরা ক্যানুতেই ব'সে-ব'সে জিরুচ্ছে । অতখানি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে তারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে–অত সকালে হয়তো ঘুম থেকেই ওঠেনি । সে-ক্ষেত্রে উলটে তাদের উপরেই আচমকা চড়াও হওয়া যায় কি না, সেটাও বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে ।

সেইজন্যেও তাদের তাড়াতাড়ি করা উচিত । এ-সব ক্ষেত্রে সাধারণত গোড়ার দিকে যে-সুবিধেটা পাওয়া যায়, তা-ই ফলাফল ঠিক ক'রে দেয় । বন্দুকগুলো ভালো ক'রে দেখে-শুনে নিলে গডফ্রে, রিভলভারগুলিতেও গুলি ভরা আছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখলে । তারপর নদীর বাম তীর ধ'রে তারা মোহানার উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়লো । চারদিকে সব শান্ত হ'য়ে আছে । মাথার উপরে জলের পাখিরা পাক খেয়ে-খেয়ে উড়ছে, গাছের ডালে-ডালে পাখির ছানারা কিচির-মিচির করছে, কোথাও কোনো বিপদের চিহ্নমাত্র নেই ।

পা টিপে-টিপে এগুচ্ছে গডফ্রে ; পিছনে টার্টলেট পা টিপে চলতে গিয়ে মাঝে-মাঝে জুতোর আওয়াজ ক'রে ফেলছেন । গাছপালার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে এগুচ্ছে ব'লে ধরা প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম–তবে টার্টলেট আরেকটু আস্তে চললেই পারেন । ও-রকম একজন সহকারী নিয়ে এসেছে ব'লে এর মধ্যেই তার আপশোশ হচ্ছিলো । টার্টলেট যে বিপদের সময় কতটা সাহায্য করবেন, সে-বিষয়ে তার আর সন্দেহ ছিলো না । উলটে একটা মস্ত দায়িত্ব চাপলো কাঁধে–বেচারিকে বাঁচাবার দায়িত্ব । তাঁকে উইল-ট্রিতে রেখে এলেই বরং ভালো হ'তো ।

যাক গে, এখন আর পস্তাবার মানে হয় না। একঘণ্টায় তারা মাত্র একমাইল এগিয়েছে। এর মধ্যে সন্দেহজনক কিছুই তাদের নজরে পড়েনি। কিন্তু এখানে এসে নদীর তীর ফাঁকা হ'য়ে গিয়েছে—কোনো তীরেই শ'খানেক গজ পর্যন্ত কোনো গাছপালা নেই। নাঃ, আর গাছের আড়াল দিয়ে এগুবার উপায় নেই। গডফ্রে থেমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে নদীর দু-পাড়ের প্রেইরিগুলো ভালো ক'রে লক্ষ ক'রে দেখতে লাগলো।

এখনও তো আশঙ্কার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জংলিদের কোনো পাত্তাই নেই এখনও। হয়তো দ্বীপে লোক আছে জেনে তারাও খুব সাবধান হ'য়ে গেছে—গডফ্রেদের মতো তারাও হয়তো পা টিপে-টিপেই এগিয়ে আসছে। তারাও হয়তো গডফ্রেদের মতো তীরের গাছপালা-গুলোকেই আড়াল হিশেবে ব্যবহার করছে।

টার্টলেটের অবিশ্যি এতক্ষণে ভয় ভেঙেছে। জংলিদের নিয়ে তিনি দু-একটা রসিকতা করারও চেষ্টা করছেন। কোথাও কিছু না-দেখেই এই হাম্বড়া ভাব জেগেছে তাঁর। গডফ্রে কিন্তু উলটে উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লো। ফাঁকা জায়গাটা অতি সাবধানে পেরিয়ে সে আবার গাছপালার আড়ালে এসে পড়লো। আরো-একঘণ্টা পরে সমুদ্রের ধারে এসে পড়লো তারা। এদিকটায় নদীর তীরে কোনো বড়ো গাছ নেই—শুধু ছোটো-ছোটো কতগুলো গাছ ছড়িয়ে আছে। আড়াল চাইলে এখন আর হামাগুড়ি দিয়ে এগুনো ছাড়া কোনো উপায় নেই। গডফ্রে নিজে হামাগুড়ি দিতে শুরু ক'রে দিলে—টার্টলেটকেও সেভাবেই এগুতে বললে সে।

'আর-তো জংলিরা নেই কোথাও!' টার্টলেট গডফ্রের পরামর্শে রাজি হ'তে পারলেন না, 'তারা তো সব এতক্ষণে কেটে পড়েছে!'

'আছে!' চাপা গলায় গডফ্রে ব'লে উঠলো, 'এখানেই আছে তারা—আশপাশে কোনোখানে ওৎ পেতে ব'সে আছে নিশ্চয়ই। নিচু হ'য়ে পড়ুন, টার্টলেট, নুয়ে পড়ুন। বন্দুক বাগিয়ে ধরুন, আমি বললেই তবে গুলি ছুঁড়বেন, তার আগে কিন্তু নয়।'

গডফ্রে এমন তীব্র সুরে কথাগুলো বলেছিলো যে ভয়ে টার্টলেটের হাঁটুর জোড় যেন খুলে গেলো। আর বাক্যব্যয় না-ক'রে তিনি তক্ষুনি হাঁটু মুড়ে ব'সে পড়লেন।

ভালোই করলেন ব'সে প'ড়ে। কারণ গডফ্রে অকারণে তাঁকে ও-রকম ভয় দেখায়নি। যেখানে তারা ও-রকম গুঁড়ি মেরে বসেছিলো সেখান থেকে কতগুলো মস্ত পাথরের জন্যে সমুদ্র বা নদীর মোহানা স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু সেই পাথরগুলোর আড়াল থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে যে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে, সেটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

গডফ্রে সটান লম্বালম্বি শুয়ে পড়েছে ঘাসের উপর, বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল চেপে।

'আগে দু-বার তো এ-রকমই ধোঁয়া দেখেছিলুম। তাহ'লে কি দ্বীপের উত্তরে-দক্ষিণে আরো দু-বার নেমেছিলো জংলিরা, আর তাদেরই জ্বালানো আগুন থেকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠেছিলো? কিন্তু না, তা তো সম্ভব নয়। কারণ কোথাও তো পোড়া কাঠ, অঙ্গার বা ছাইভস্ম দেখতে পাইনি। যাক, এবার আশাকরি এই হেঁয়ালিটার সমাধান হবে।'

এ-কথা ভাবতে-ভাবতেই বুকে-হেঁটে এগুচ্ছিলো গডফ্রে—টার্টলেটও যতটা পারেন সেইভাবেই তাকে অনুসরণ করছিলেন। একটু পরেই তারা নদীর বাঁকে পৌঁছুলো। এখান থেকে নদীর চারপাশে সে ভালো ক'রেই খেয়াল রাখতে পারবে।

অনেক কষ্টে সে তার নিঃশব্দ চমকটা গিলে ফেললে! টার্টলেটের কাঁধে হাত দিয়ে

তাঁকে আর এগুতে বারণ ক'রে দিলে সে। আর এগুবার কোনো মানে হয় না! যা দেখবার জন্যে সে এদিকটায় এসেছে, সব বেশ স্পষ্টভাবেই তার চোখের সামনে উন্মোচিত হ'য়ে আছে।

তীরের পাথরগুলোর উপর প্রচুর কাঠকুঠো জড়ো ক'রে মস্ত একটা আগুন জ্বালানো হয়েছে, আর ধোঁয়ার একটা চাঁদোয়া ঘুরে-ঘুরে উঠে যাচ্ছে আকাশে। আর আগুনের চারপাশে ব'সে আছে কালকের সেই জংলিরা। একটা মস্ত পাথরের গায়ে তাদের নৌকোটা বেঁধে রাখা—ঢেউ এলে নৌকোটা একটু-একটু ক'রে দুলে উঠছে।

দুরবিন ছাড়াই সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো গডফ্রে। ঐ আগুনের কুণ্ডের চেয়ে সে এমনকী দুশো গজও দূরে বোধকরি নেই। কাঠকুঠো পোড়বার শব্দ পর্যন্ত কানে আসছে। শুনে দেখলে যে আপাতত কোনো ভয় নেই—জংলিরা সব্বাই আগুনের পাশেই ব'সে আছে। বারোজনের মধ্যে দশজনে আগুনে কাঠ গুঁজে দিচ্ছে—এগারো নম্বরটি বোধহয় তাদের সর্দার, সে কেবল পায়চারি করছে আর ফিরে-ফিরে দ্বীপের ভিতর দিকে তাকাচ্ছে। তার কাঁধের লাল কাপড়টা দেখেই গডফ্রে চিনতে পারলে। আর বারো নম্বর জংলিটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে একটা খুঁটির গায়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

বেচারির অদৃষ্টে যে কী আছে, গডফ্রে তা তক্ষুনি স্পষ্ট বুঝতে পারলে। তারই জন্যে তৈরি হচ্ছে আগুনের কুণ্ড! তাকে জ্যান্ত ঝলসে মারা হবে! এদের নরখাদক হিশেবে বর্ণনা ক'রে টার্টলেট কাল মোটেই ভুল করেননি।

সব রবিনসন ক্রুসোই দেখা যাচ্ছে একইরকম: যেন একটা আরেকটার নকল! ডানিয়েল ডিফোর নায়কও তো এমনি এক অবস্থাতেই পড়েছিলো। ফ্রাইডেকে তো ক্রুসো জংলিদের হাত থেকেই রক্ষা করেছিলো। গডফ্রে বুঝতে পারলে যে তাদেরও এই লোকটাকে উদ্ধার করতে হবে—যে-খেলার যে-নিয়ম।

না, জ্যান্ত কাউকে ঝলশে মরতে দিতে সে পারবে না। তাদের সঙ্গে দুটো দো-নলা বন্দুক আছে—চারটে গুলি—দুটো রিভলভারে রয়েছে বারোটা গুলি—বাস, এই এগারোজন বর্বরের জন্যে তাই যথেষ্ট। বন্দুকের আওয়াজ শুনলেই তারা ঠিক ভির্মি খাবে। মনে-মনে এ-সব ঠিক ক'রে সে ওলিম্পুসের মহারাজা জেউস বা জুপিটারের হাতের বাজের মতো অপেক্ষা করতে লাগলো।

অবিশ্যি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো না।

মিনিট কুড়ি গেছে কি না—গেছে, জংলিদের সর্দার আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে—তারপর হাত বাড়িয়ে সে পেছমোড়া ক'রে বাঁধা বন্দীকে দেখিয়ে ইঙ্গিত করলে। জংলিরা যেন এতক্ষণ তারই ইশারার অপেক্ষা করছিলো।

অন্তত গডফ্রে অপেক্ষা করছিলো সেইজন্যেই। তক্ষুনি সে উঠে দাঁড়ালে। টার্টলেটও ব্যাপার কী না-বুঝেই উঠে দাঁড়ালেন। গডফ্রের মৎলব যে কী, তা তিনি কিছুই জানেন না।

গডফ্রে ভেবেছিলো তাকে দেখেই জংলিদের মধ্যে সাড়া প'ড়ে যাবে। হয় তারা ছুটে গিয়ে আশ্রয় নেবে তাদের ক্যানুতে নয়তো তাদের দিকে রে-রে ক'রে ছুটে আসবে।

তারা সে-সব কিছুই করলে না। কোনো পাত্তাই দিলে না তারা গডফ্রেকে। শুধু সর্দার

কী-একটা ইশারা করতেই তিনজন জংলি বন্দীর দিকে এগিয়ে গেলো, আর বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে টেনে হিঁচড়ে আগুনের দিকে নিয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগলো। বন্দীটি অবশ্যি খুব সহজে ঝলশে মরবে ব'লে মনে হ'লো না। এক ধাক্কায় সে তিনজনকে ঠেলে ফেলে দিলে—কিন্তু একা সে অত জনের সঙ্গে পারবে কী ক'রে ? একটু পরেই তাকে কাবু ক'রে ফেললে সব্বাই, আর সর্দার এগিয়ে গেলো একটা পাথরের কুড়ুল হাতে—মাথাটা বুঝি ফাটিয়েই দেয় ?

চীৎকার ক'রে উঠলো গডফ্রে। বন্দুক গর্জালো : 'গুড়ুম !' আর সর্দার জংলি ছিটকে পড়লো মাটিতে—খুব-একটা মোক্ষম জায়গায় গুলি বিঁধেছে বোধহয়।

বন্দুকের আওয়াজ শুনেই জংলিরা হতভম্ব হ'য়ে গেলো। জীবনে বোধহয় কখনোই তারা কোনো বন্দুকের শব্দ শোনেনি। ফিরে তাকিয়ে গডফ্রেকে দেখেই তারা বন্দীকে ছেড়ে দিলে।

বন্দী আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করলে না। প্রাণপণে ছুটলো তার অপ্রত্যাশিত উদ্ধারকর্তার দিকে।

ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় আরেকটা বন্দুক গর্জে উঠলো : 'গুড়ুম্ !'

টার্টলেট চক্ষু বুজেই গুলি ছুঁড়ে দিয়েছেন। ভয়ে তাঁর বুক টিপটিপ করছিলো, বুক ধুকপুক করছিলো, চোখ বুজেই ঘোড়ায় চাপ দিতেই গুলি ছুটে গিয়েছে, আর বন্দুকের কুঁদো তাঁর কাঁধে এমন-এক উলটো ধাক্কা মেরেছে যে একবার পাক খেয়েই তিনি চিৎপটাং হ'য়ে প'ড়ে গিয়ে কাৎরাতে শুরু ক'রে দিয়েছেন।

কিন্তু কী তাগ ! চোখ বুজে গুলি করেছেন, কিন্তু আরেকটা জংলি ঘুরপাক খেয়ে পড়েছে তার সর্দারের পাশে।

তাতেই কাজ হ'লো ! জংলিরা বোধহয় ভাবলে যে দ্বীপে হয়তো অনেক লোক থাকে আর তারা সব্বাই এসেই চড়াও হয়েছে, কিংবা হয়তো বন্দুকের কাণ্ডকলাপ দেখেই তারা একেবারে বোমকে গিয়েছিলো—মোটমাট, জখম সঙ্গীদের ব'য়ে নিয়ে তক্ষুনি গিয়ে তারা পড়ি-মরি ক'রে উঠলো ক্যানুতে—আর হুড়মুড় ক'রে দাঁড় টেনে ক্যানুটা ছেড়ে দিলো।

ভালোই হ'লো। জয়ের গর্ব টার্টলেটেরই সবচেয়ে বেশি—জীবনের প্রথম গুলিই চাঁদমারিতে বিঁধেছে ! বন্দুকের বাঁটের গুঁতো লেগে কাঁধে যে-ব্যথা হয়েছিলো, সে-কথা ভুলে গিয়ে তিনি উদ্বাহু হ'য়ে নৃত্য ক'রে উঠলেন।

ইতিমধ্যে বন্দীটি তার উদ্ধারকর্তাদের কাছে এসে হাজির হয়েছে। একবার কেবল বন্দুকের ঝিলিক দেখে ভয় পেয়ে সে আঁৎকে উঠেছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই সেই দুই শ্বেতাঙ্গর কাছে এসে কৃতজ্ঞতায় মাটিতে লম্বালম্বি শুয়ে প'ড়ে মাটিতে চুমু খেয়ে গডফ্রের পায়ে মাথা রাখলে।

দেখে মনে হ'লো এমনকী পলিনেশিয়ার জংলিরা শুদ্ধু ডানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুসো' প'ড়ে ফেলেছে।

১৬

সভ্যজগৎ ছাড়াও সব
বর্বরদের দ্বীপও
আদ্যোপান্ত পাঠ করেছে
শ্রী ডানিয়েল ডিফো ।

সাষ্টাঙ্গে শুয়ে-থাকা বেচারিটিকে টেনে তুললো গডফ্রে । মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে ভালো ক'রে । লোকটার বয়েস পঁয়ত্রিশ হবে, পরনে কেবল একটা নেংটি । মাথার আকার ও চেহারা দেখে মালুম হ'লো লোকটি সম্ভবত কাফ্রি—ঠিক পলিনেশিয়ার মানুষ ব'লে মনে হ'লো না তাকে, বরং মনে হ'লো আফ্রিকার লোক ।

সুদান কিংবা আবিসিনিয়ার মানুষ । সে যখন এসে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের জংলিদের হাতে পড়েছে, তখন এটা অনুমান করা যেতে পারে যে সম্ভবত সে ইংরেজি কিংবা গডফ্রের জানা ইয়োরোপীয় ভাষাগুলোর দু-একটি শব্দ বুঝতে পারে । কিন্তু একটু পরেই বোঝা গেলো যে সে এমন-এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে, যার কোনো শব্দই গডফ্রে জানে না । হয়তো আদিবাসীদের ভাষাতেই সে কথা বলছে—গডফ্রে তার টু শব্দটিও বুঝতে পারলে না । গডফ্রে তক্ষুনি তাকে ইংরেজিতে নানা প্রশ্ন করলে, কিন্তু কোনো উত্তরই পেলে না তার কথার । তখন সে তাকে আকারে-ইঙ্গিতে তার নাম জিগেশ করলে । কাফ্রি লোকটা বেশ বুদ্ধিমান, তাছাড়া দেখে-শুনে তাকে ভালো মানুষ ব'লেই মনে হয় । অনেক চেষ্টার পর সে যখন বুঝলে গডফ্রে কী জানতে চাচ্ছে, তখন কেবল একটা কথাই বললে : ''কারেফিনোতু !'

'কারেফিনোতু !' টার্টলেট ব'লে উঠলেন, 'শুনলে একবার নামটা ? আমি কিন্তু বলি ওকে বুধবার ব'লে ডাকা হোক—কারণ আজ হ'লো একটা বুধবার—ক্রুসো দ্বীপগুলোর ধরনই তাই : ক্রুশো শুক্কুরবারে পেয়েছিলেন ফ্রাইডেকে, তাই তার ওই নাম হয়েছিলো । ওকে কি আমাদের কারেফিনোতু নামে ডাকা উচিত ?'

'তা-ই যদি ওর নাম হয়, তাহ'লে ওকে ওই নামে ডাকতে আপত্তি কী ?' ব'লে সে নিজের বুকে হাত দিয়ে নিজের নাম বললে 'গডফ্রে !'

কারেফিনোতু অনেক চেষ্টা করলে গডফ্রে কথাটা উচ্চারণ করতে—গডফ্রে নিজেই অনেকবার উচ্চারণ ক'রে শোনালে, কিন্তু সে কিছুতেই নামটাকে উচ্চারণ করতে পারলে না । তখন সে টার্টলেটের দিকে ফিরে তাকালে, যেন তাঁর নামটা সে জানতে চাচ্ছে ।

'টার্টলেট,' নাচের মাস্টারমশাই মধুর কণ্ঠে বললেন ।

'টার্টলেট !' কারেফিনোতু ফিরে উচ্চারণ করলে । তার বাগ্‌যন্ত্রে এই নামটা বেশ সহজেই খাপ খেয়ে গেলো । দেখে টার্টলেট বেশ আহ্লাদিতই বোধ করলেন ।

গডফ্রে তখন কারেফিনোতুর বুদ্ধিকে কিছু কাজে খাটাবার চেষ্টা করলে । আকারে-ইঙ্গিতে এটাই সে তাকে বোঝালে যে সে এই দ্বীপটার নাম জানতে চাচ্ছে । হাত বাড়িয়ে

সে বন-জঙ্গল, প্রেইরি, টিলা-পাহাড়, বেলাভূমি দেখিয়ে চোখের ভঙ্গি করে প্রশ্ন করলে। প্রথমটায় কারেফিনোতু বুঝতে পারেনি গডফ্রে কী জানতে চাচ্ছে। তাই আবারও তাকে ইঙ্গিতে সব দেখাতে হ'লো গডফ্রেকে। তার ভাবভঙ্গি হুবহু নকল করলে কারেফিনোতু, তারপর বললে, 'আরনেকা !'

'আরনেকা ?' আবার গডফ্রে মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে জিগেশ করলে।

'আরনেকা,' আবার উত্তর দিলে কাফ্রি।

নামটা জেনে কোনোই লাভ হ'লো না গডফ্রের। দ্বীপটার ভৌগোলিক নাম কী, তাও জানা গেলো না—প্রশান্ত মহাসাগরের কোনখানে যে দ্বীপটা অবস্থিত, সে-তথ্যটাও অজ্ঞাত থেকে গেলো। অন্তত সে-তো এ-রকম কোনো নাম কস্মিনকালে কোথাও শুনেছে ব'লেও মনে করতে পারলো না। হয়তো এটা জংলিদের দেয়া নাম—ভৌগোলিকদের মোটেই জানা নেই।

কারেফিনোতু কিন্তু ভালো ক'রেই তার ত্রাণকর্তাদের লক্ষ করছিলো। বিশেষ ক'রে তাদের বন্দুক ও রিভলভার তাকে খুবই অবাক করে দিয়েছিলো, কিছুতেই সে আর বন্দুকের উপব থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলো না। গডফ্রে সহজেই তার কৌতূহলের কারণটা বুঝে ফেললে। কারেফিনোতু যে কোনোকালে আগুনঝরানো হাতিয়ার দ্যাখেনি, তাতে সন্দেহ নেই। সে নিশ্চয়ই ভাবছে যে এই লোহার নলগুলো থেকেই বাজ ফেটে বেরিয়েছিলো, আর তাকে মুক্তি দিয়েছিলো।

গডফ্রে তাকে বন্দুকের ক্ষমতা ভালো ক'রে বোঝাবার জন্যেই একটা উড়ন্ত বালিহাঁস তাগ ক'রে গুলি ছুঁড়লো। বেশ উঁচু দিয়েই উড়ে যাচ্ছিলো বালিহাঁসটা—কিন্তু গুলির শব্দ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা কাতর আর্তনাদ ক'রে রক্তাপ্লুত হাঁসটা মাটিতে আছড়ে পড়লো।

'গুড়ুম !' আওয়াজ শুনেই কারেফিনোতু তিড়িং ক'রে মস্ত লাফ দিয়েছিলো। কিন্তু যেই দেখলে যে ডানাভাঙা বালিহাঁসটা ঘাসের উপর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে অমনি সে ছুটে গিয়ে বেশ খানিকটা স্তম্ভিতভাবেই তাকে চেপে ধরলো ও গডফ্রেদের কাছে নিয়ে এলো !

টার্টলেটের ভারি ইচ্ছে করলো যে জাঁক দেখিয়ে বলেন ভাগবান তাঁদের বজ্রপাতের ক্ষমতা দিয়েছেন। নদীর ধারে গাছের ডালে বসেছিলো একটা মাছরাঙা, তাকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বন্দুক উঁচিয়ে ধরলেন। কিন্তু গুলি করার আগেই গডফ্রে তাঁকে বাধা দিলে : 'না, না, গুলি করবেন না !'

'কেন ?'

'ধরুন দৈবাৎ আপনার তাগ ফশকালো, মাছরাঙাটার গায়ে আঁচড়ও লাগলো না—তখন আমরা ওর চোখে বেশ নিচে নেমে যাবো না ?'

'কিন্তু তাগ ফশকাবেই বা কেন ? আমি বুঝি যুদ্ধের সময় জীবনে প্রথমবার গুলি ছুঁড়েই একটা জংলিকে জখম করিনি ?'

'করেছেন যে তাতে আর সন্দেহ কী। সে-তো ধপাশ ক'রে প'ড়েই গিয়েছিলো। কিন্তু আমার পরামর্শ নিন, টার্টলেট। ভালো চান তো খামকা এভাবে ভাগ্যকে আর চটিয়ে দেবেন না।'

টার্টলেট একটু অপ্রসন্নই হলেন, কিন্তু আর-কোনো কথা না-ব'লে বন্দুকটা কাঁধে ফেললেন ।

তারপর কারেফিনোতুকে নিয়ে দুজনে উইল-ট্রিতে ফিরে এলো ।

ফিনা আইল্যাণ্ডের নতুন অতিথি তো দেবদারুর কোটরে বসবাস করার রাজসিক ব্যবস্থা দেখে তাজ্জব হ'য়ে গেলো । প্রথমে তাকে সব যন্ত্রপাতি বাসনকোশন জিনিশপত্র ব্যবহার ক'রে দেখাতে হ'লো এগুলো কোনটা কোন কাজে লাগে । একেকটা জিনিশ দেখে তার তাক-লেগে-যাওয়া থেকে বোঝা গেলো যে সে এতকাল খুব-একটা উন্নত ধরনের মানুষের সঙ্গে বসবাস করেনি । কারণ আগুনের ব্যবহারটাই সে জানতো না । জ্বলন্ত কাঠের উপর চাপিয়ে দিলেও লোহার কড়াটাতে কেন যে আগুন ধ'রে যাচ্ছে না, এটা বুঝতে-না পেরে সে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো । একটা আরশিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে তো তার চক্ষু ছানাবড়া । সে নিজে একবার ফিরে দাঁড়ালে, তারপর আরশিটার পিছনে উঁকি মেরে দেখলে কেউ লুকিয়ে আছে কি না–এতটাই সে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো ।

'মানুষ তো নয়, বনমানুষ !' কাণ্ড দেখে মন্তব্য করলেন টার্টলেট ।

'মোটেই নয়, টার্টলেট । যেহেতু ও আরশিটার পিছনে উঁকি মেরে দেখেছে, তাতেই বোঝা যায় যে ওর মাথা আছে–যুক্তি খাটাতে পারে,' বললে গডফ্রে ।

'না-হয় বনমানুষ নয় । কিন্তু ও যে আমাদের কোন কাজে আসবে, তা তো জানিনে ।'

'আমি ঠিক জানি, ও আমাদের অনেক কাজে আসবে ।'

শুধু একটা ব্যাপারেই কারেফিনোতু তক্ষুনি তার ক্ষমতা দেখিয়ে দিলে । তার সামনে ছোটোহাজরি ধরতেই সে এমন গোগ্রাসে সব খেয়ে ফেললে যে বোঝা গেলো তার জঠরে রীতিমতো অগ্নিকাণ্ড হচ্ছিলো ।

'দিব্যি খেতে পারে দেখিছি । সাবধান, গডফ্রে ! লক্ষ রেখো । ও হয়তো নরখাদক আসলে,' টার্টলেট বললেন ।

'তাহ'লে ওর সে-অভ্যেস ছাড়াতে হবে–'

'পারবে না ছাড়াতে । শুনেছি তো মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে কেউ কক্‌খনো ভোলে না ।'

ওরা কথা বললেই কারেফিনোতুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে । তার সামনে কী বলা হচ্ছে, তার মর্ম সে বোধহয় ভালোই বুঝতে পারে । কারণ তক্ষুনি সে তড়বড় ক'রে কী-যে ব'লে যায়, তা ওরা আর ধরতে পারে না । কিন্তু কথায় পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান না-হ'লেও সে-যে তাদের নতুন সঙ্গী, তা তো অনস্বীকার্য । হয়তো তাকে অনেক কাজে লাগানো যাবে ।

বেশ লম্বাচওড়া সে, সরল ও বুদ্ধিমান, কোনো কাজই তাকে দু-বার দেখিয়ে দিতে হয় না । একবার কিছু করতে দেখেই সে চট ক'রে শিখে নেয় । এইভাবেই গডফ্রে তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে লাগলো । প্রথমে সে কাজটা ক'রে দেখায়, তারপর কারেফিনোতুকে তা করতে ইঙ্গিত করে । গৃহপালিত জীবগুলোর যত্ন নেয়া, ফলমূল জোগাড় করা, ভেড়া বা অ্যাগুটি কেটে মাংস টুকরো করা, ম্যানজানিলা আপেল নিংড়ে রস বার করা–এ-সব

কাজ তাকে একবার বৈ দু-বার ক'রে দেখাতে হ'লো না ।

টার্টলেট যা-ই ভাবুন না কেন, গডফ্রে কিন্তু তাকে মোটেই অবিশ্বাস করেনি । তাকে আশ্রয় দিয়ে একবারও তার আপশোশ হয়নি । কেবল একটা চিন্তাই তাকে পীড়িত করছিলো : জংলিরা তো এখন ফিনা আইল্যাণ্ড চিনে গিয়েছে—যদি আবার কোনোদিন সদলবলে এসে চড়াও হয় !

গোড়া থেকেই উইল-ট্রির মধ্যে কারেফিনোতুর শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, কিন্তু বৃষ্টি না-পড়লে সে বাইরেই শুয়ে থাকতে পছন্দ করতো—যেন সে উইল-ট্রিকে পাহারা দিচ্ছে ।

দ্বীপে আসবার দিন পনেরোর মধ্যে গডফ্রের সঙ্গে সে অনেকবারই শিকারেও বেরিয়েছে ; বন্দুকের গুলিতে অনেক দূরের জন্তুগুলো দুমদাম জখম হ'য়ে যাচ্ছে দেখে কিছুতেই আর তার বিস্ময় কমতে চায় না । আস্তে-আস্তে অবশ্য আগ্নেয়াস্ত্রর ব্যবহার সম্বন্ধে সে অভ্যস্ত হ'য়ে এলো ।

গডফ্রে ক্রমেই এই কাফ্রির প্রতি আসক্ত হ'য়ে পড়ছিলো । কেবল একটা কাজেই কারেফিনোতু তেমন সুবিধে ক'রে উঠতে পারছিলো না—সেটা হ'লো ইংরেজি ভাষা শেখা । কিছুতেই সে সহজ-সরল শব্দ পর্যন্ত ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না । গডফ্রে অবশ্য তাকে শেখাবার চেষ্টা করতে ক্রটি করে না—বেশ যত্ন নিয়েই তাকে ভাষা শেখায় ।

এরই মধ্যে কারেফিনোতু একদিন বেলাভূমিতে একটা কাছিমের আস্তানা আবিষ্কার ক'রে বসলো—শুধু আবিষ্কার নয়, কাছিমগুলোকে সে এমন চক্ষের পলকে চিৎ ক'রে কাবু ক'রে ফ্যালে যে তার ক্ষিপ্রতায় গডফ্রে তো রীতিমতো মুগ্ধ । অনেকগুলো কাছিম শিকার ক'রে তারা শীতকালের জন্য সঞ্চয় ক'রে রাখলে । দ্বীপে যে শিগগিরই ঠাণ্ডা পড়বে তাতে সন্দেহ নেই—কারণ অক্টোবর মাস শুরু হ'য়ে গেছে, আবহাওয়ায় এর মধ্যেই একটু-একটু বদল দেখা দিচ্ছে ।

সেই দু-চার দিন কারেফিনোতুর কাছিমশিকারের কল্যাণে তাদের জীবনে যা একটু নতুনত্ব এসেছিলো, নয়তো সেই একইরকম নিত্য কর্মের অবিশ্রাম পুনরাবৃত্তিতে, দুঃসহ একঘেয়েমিতে, দিন কেটে যাচ্ছে । রোজ রুটিনমাফিক কতগুলো কাজ করতে হয় । শেষকালে শীতকালে যখন উইল-ট্রির মধ্যেই সারাদিন বন্দী হ'য়ে কাটাতে হবে, তখন যে কী-রকম বিচ্ছিরি আর একঘেয়ে লাগবে, তা ভাবলেই গডফ্রের ভারি মন খারাপ হ'য়ে যায় ।

এমনিতে অবিশ্যি রোজই সে দ্বীপের নানাদিক ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে আসে । আর সময় পেলেই বন্দুক বাগিয়ে বেরিয়ে পড়ে শিকারে । সাধারণত কারেফিনোতু তখন সঙ্গে যায় : টার্টলেট থেকে যান উইল-ট্রির তদারকিতেই । শিকারি হবার কোনো গুণই নেই টার্টলেটের, যদিও তাঁর জীবনের প্রথম গুলিটা যাকে বলে একবারেই 'ষাঁড়ের চক্ষু' ফুঁড়ে বেরিয়েছিলো ।

এমনি একদিন শিকারে বেরিয়ে এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যাতে উইল-ট্রির নিরাপত্তাই নষ্ট হ'য়ে যাবার জোগাড় ।

গডফ্রে আর কারেফিনোতু টিলাগুলোর নিচে দ্বীপের ঠিক মাঝখানকার জঙ্গলটায় গিয়েছিলো শিকারে । সকাল থেকে ঘুরে বেড়িয়ে দূর থেকে দু-তিনটে হরিণকে ছুটে যেতে দেখেছে তারা—হরিণগুলো এতদূর দিয়ে যাচ্ছিলো যে তাগমাফিক গুলি করার বিশেষ সুবিধে

ছিলো না।

তাছাড়া একদিক থেকে শিকার যে কিছু করতেই হবে, তেমন-কিছু বাধ্যবাধকতাও ছিলো না, কেননা উইল-ট্রিতে আপাতত খাবারের কোনো ভাবনাই নেই। কাজেই খালি হাতে শিকার থেকে ফিরলেও গডফ্রের কিছু এসে-যেতো না। বরং অহেতুক জীবহত্যার চাইতে মাঝে-মাঝে খালি হাতে ফিরতে তার ভালোই লাগতো।

বেলা তখন তিনটে হবে। বনের মধ্যেই তারা দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়েছে। মধ্যাহ্নভোজের পরেও কোনো শিকার জোটেনি তাদের। উইল-ট্রিতে ফিরে আসবে ব'লেই ঠিক করেছে, এমন সময় হঠাৎ কারেফিনোতু বিষম আঁৎকে উঠলো। সোজা লাফিয়ে এসে পড়লো সে গডফ্রের ঘাড়ে, তার কাঁধ চেপে ধ'রে হুড়মুড় ছুটে চললো উইল-ট্রি দিকে–ততক্ষণে তারা বন থেকে প্রায় ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছে। প্রায় কুড়ি গজ ছুটে গিয়ে থামলো কারেফিনোতু। হতভম্ব গডফ্রে কোনোরকমে হাঁপ ছেড়ে তার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালে। কারেফিনোতু মুখে কোনো সাড়া না-দিয়ে ভীতভাবে আঙুল তুলে গজ পঞ্চাশেক দূরের একটা জানোয়ারকে দেখিয়ে দিলে।

গডফ্রে তাকিয়ে দ্যাখে মস্ত-একটা ভালুক, গাছের ডাল জড়িয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাদের দেখে মাথা দোলাচ্ছে–যেন এক্ষুনি তাদের তাড়া ক'রে আসবে। তক্ষুনি, কোনো-কিছু চিন্তা না-ক'রেই, গডফ্রে তার দোনলা তুলে গুলি ক'রে বসলো!

গুলি হয়তো লেগেওছিলো ভালুকটার বুকে, কারণ সে তক্ষুনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কিন্তু মরেছে কি না কে জানে। দেরি করারও অবসর নেই। ও-রকম দুর্ধর্ষ হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করার দুঃসাহস না-থাকাই ভালো। ক্যালিফরনিয়ার জঙ্গলে এমনকী পেশাদার শিকারিরাও ভালুকদের খেপিয়ে দিতে সাহস পায় না।

কারেফিনোতু আর দৃক্‌পাতও করলো না। গডফ্রের হাতটা চেপে ধ'রে সোজা উইল-ট্রির দিকে ছুটলো। খামকা অতিরিক্ত ঝুঁকি নেবার যে কোনো মানে হয় না গডফ্রেও তা বুঝতে পারলে–তাই সে কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রেই তার সঙ্গে-সঙ্গে জোর কদমে ছুটে চললো।

১৭

ঋক্ষ কেবল একাই নন, ব্যাঘ্র অধিকন্তু!
সয় না অত ধকল!
যত রাজ্যের হিংস্র জন্তু
দ্বীপ করেছে দখল!

ফিনা আইল্যাণ্ডে ও-রকম একটা হিংস্র জন্তু দেখে গডফ্রে এতই আঁৎকে উঠেছিলো যে তার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গিয়েছিলো। তাই সে দুম ক'রে গুলি চালিয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু ভালুকটা অক্কা পেলে কিনা সেদিকে আর লক্ষ করার তার সাহস হয়নি। গোড়ায় ভেবেছিলো

টার্টলেটের কাছে ঘটনাটা চেপেই যাবে, কিন্তু শেষটায় নানা কথা বিবেচনা ক'রে সেটা সে আর সমীচীন বোধ করলে না। কিন্তু ব'লে ফেলেই তার মনে হ'লো বোধকরি একটা মস্ত ভুলই ক'রে ফেলেছে।

'ভল্লুক!' টার্টলেট একেবারে আঁৎকে উঠলেন, 'অ্যাঁ, ভল্লুক! কিন্তু অ্যাদ্দিন তো দ্বীপে একটাও ভল্লুক ছিলো না? একটাই যদি দেখা যায়, তো অনেকগুলোর মুখোমুখি পড়তেও অবাক হবার কী আছে? আরো অনেক হিংস্র জন্তু তো দেখা যেতে পারে–জাগুয়ার, নেকড়ে, বাঘ, হায়েনা, সিংহ, পাইথন?'

এমন সভয়ে টার্টলেট চারপাশে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলেন যে মনে হ'লো যেন একটা মস্ত চিড়িয়াখানার খাঁচা খুলেই যত রাজ্যের জানোয়ার এসে দ্বীপে চড়াও হয়েছে।

অত চেল্লাচিল্লি করার কিছু হয়নি–এ-কথাটাই গডফ্রে তাঁকে বোঝাতে চাইলে। এটা ঠিক যে দ্বীপে সে একটা ভালুক দেখেছে। কেন-যে আগে এতবার দ্বীপের যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়েও তার মুখোমুখি পড়েনি, এটা সত্যি ভারি দুর্বোধ্য ও আশ্চর্য। কিন্তু তা থেকে এটাও ধ'রে নেয়া যায় না যে যত রাজ্যের হিংস্র জন্তু দ্বীপের মধ্যে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। তবে এখন থেকে যে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে এবং কখনোই যে নিরস্ত্র থাকা চলবে না, এটা মনে রাখতে হবে।

কিন্তু টার্টলেট কিছুতেই আর অভয় পেলেন না। ভয়ে তাঁর একেবার ভির্মি খাবার দশা। অবশেষে অ্যাদ্দিনে দেশে ফেরবার জন্যে একটা প্রচণ্ড ব্যাকুলতা অনুভব করলেন তিনি! আতঙ্কে তিনি প্রায় আধমরা হ'য়েই পড়লেন। 'ঢের হয়েছে–যথেষ্ট জানোয়ারের পাল্লায় পড়েছি, আর নয়–যথেষ্ট! এখন আমি চ'লে যেতে চাই,' কেবল এই কথাই বারে-বারে বলতে লাগলেন তিনি। কিন্তু বেচারি! যাবেন কী ক'রে? সে-ক্ষমতা কই তাঁর?

গডফ্রেদের এখন থেকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। কেবল যে বেলাভূমি বা প্রেইরি থেকেই আক্রমণ আসতে পারে তা নয়–এই দেবদারুবীথিকাও মোটেই নিরাপদ নয়। আচমকা আক্রান্ত হ'য়ে যাতে ভ্যাবাচাকা না-খায়, সেইজন্যে এখন থেকেই তৈরি থাকতে হবে। প্রথমত উইল-ট্রির দরজাটাকে আরো-শক্ত, আরো-মজবুত করতে হবে–যাতে বুনো জানোয়ারের থাবা ঠেকাতে পারে। আর গৃহপালিত জন্তুগুলির জন্যেও একটা শক্ত খোঁয়াড় বানাতে হবে, অন্তত রাত্তিরে যাতে তারা ওই খোঁয়াড়ে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু বললেই তো আর ও-রকম একটা খোঁয়াড় চট ক'রে বানিয়ে নেয়া যায় না। আপাতত দেবদারু-তলার ডালপালা দিয়ে একটা বেড়া তৈরি ক'রেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হ'লো: বেড়াটা খুব শক্তও হ'লো না, কিংবা তেমন উঁচুও হ'লো না, অনায়াসেই কোনো ভালুক বা গোবাঘা বেড়াটা উলটে ভেঙে ফেলে বা লাফিয়ে ডিঙিয়ে এসে চড়াও হ'তে পারে।

আকারে-ইঙ্গিতে অনেক বারণ করা সত্ত্বেও কারেফিনোতু কিন্তু কোনো বাধাই মানলে না–আগের মতোই রাতে সে বাইরে শোয়। একদিক থেকে ভালোই: আক্রমণের কোনো সম্ভবনা দেখলেই সে আগে থেকে সাবধান ক'রে দিতে পারবে। কিন্তু তাতে কাফ্রি বেচারির প্রাণের ভয়ও আছে; কিন্তু ওভাবে পাহারা দিয়েই সে বোধ করি তার ত্রাণকর্তাদের ঋণ শেষ করতে চাচ্ছিলো।

কিন্তু একটা সপ্তাহ কেটে গেলো নির্বিঘ্নে, সেই দুর্ধর্ষ বন্য জন্তুদের কোনো আবির্ভাবই

হ'লো না। গডফ্রে অবশ্য আজকাল উইল-ট্রির আশপাশেই থাকে—খুব-একটা বেশি দূরে যায় না, বনের ধারটা তো পারতপক্ষে একেবারেই মাড়ায় না। ছাগল-ভেড়াগুলো অবশ্য কাছের প্রেইরিটায় চ'রে বেড়ায়, কিন্তু কিছুতেই তাদের চোখের আড়াল হ'তে দেয় না কারেফিনোতু—সে-ই আজকাল তাদের রাখাল। তার সঙ্গে অবিশ্যি বন্দুক থাকে না—কী ক'রে যে বন্দুক চালায়, সেটা সে এখনও ধরতে পারেনি—তবে তার কোমরে গোঁজা থাকে একটা ধারালো ভোজালি আর হাতে থাকে একটা কুড়ুল। এই দুটো অস্ত্রই অবশ্য তার কাছে যথেষ্ট—তা দিয়েই সে এমন কী বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি লড়তেও পেছ-পা হবে না।

এই ক-দিনে কোনো বুনো জানোয়ারের দেখা না-পেয়ে গডফ্রের আবার আস্থা ফিরে এসেছিলো। সে আবার শিকারে বেরুতে লাগলো, তবে খুব-একটা দূরে অবিশ্যি যাবার সাহস তার হয় না। মাঝে-মাঝে কারেফিনোতু তার সঙ্গে যায়। টার্টলেট তো কিছুতেই খোলা জায়গায় পা দেন না, সারাক্ষণই উইল-ট্রি খোঁদলে সশস্ত্র হ'য়ে ব'সে থাকেন। মাঝে-মাঝে যখন কারেফিনোতু উইল-ট্রিতেই থেকে যায়, তখন টার্টলেট তাকে ইংরেজি শেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষকালে দেখলেন সবটাই পণ্ডশ্রম : বেচারির আড়ষ্ট জিহ্বায় কোনো কথাই স্পষ্ট উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। তখন টার্টলেট ঠিক করলেন কারেফিনোতুর ভাষাই শিখে নেবেন। গডফ্রে অবিশ্যি বারণ করলে : ও-ভাষা শিখে কী-ই বা লাভ হবে ? কিন্তু টার্টলেট নাছোড়বান্দা। হাত দিয়ে এককেটা ক'রে জিনিশ দেখান, আর কারেফিনোতুকে তার নাম বলতে ইঙ্গিত করেন। এভাবে দিন পনেরোর মধ্যেই তিনি পলিনেশিয়ার জংলিদের ভাষা বেশ শড়গড় করে ফেললেন—পনেরোটা কথাই শিখে ফেললেন তিনি। আগুনকে পলিনেশিয়ার ভাষায় বলে 'বিরসি', আকাশকে 'আরাদোরে', সমুদ্রকে 'মেরভিরা', গাছকে 'ডোউরা'—ইত্যাদি কথাগুলো শিখে তাঁর কী জাঁক—যেন পলিনেশিয়ার ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে এক্কেবারে ডবোল প্রমোশন পেয়ে গেছেন।

ফলে তিনিও উলটে কারেফিনোতুকে এবার থেকে নাচ শেখাতে লাগলেন : ইওরোপের ভাষা তার রপ্ত হয়নি বটে, কিন্তু ইওরোপীয় নাচই না-হয় সে শিখুক। কাণ্ড দেখে গডফ্রে তো কিছুতেই হাসি চাপতে পারে না। কারেফিনোতু তো দাপাদাপি ক'রে ঘেমে-নেয়েই অস্থির, কিন্তু একেবারে প্রাথমিক মুদ্রাগুলো পর্যন্ত তার রপ্ত হতে চায় না। ভারি ইচ্ছে তার নাচ শিখতে, কিন্তু কাঁধের হাড় তার শক্ত, বুকটা হাজার চেষ্টাতেও কিছুতেই সামনে এগিয়ে আসে না, হাঁটুগুলোকে ঠিকমতো কায়দা করতে পারে না। টার্টলেট তবুও প্রায় প্রচণ্ডভাবেই শেখাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কারেফিনোতু বেচারির উৎসাহ যথেষ্ট, কিন্তু হ'লে কী-হবে, কিছুতেই সে আর ঠিকমতো পা ফেলতে পারে না।

'ওরে, দ্যাখ-দ্যাখ, গণ্ডমূর্খ !' টার্টলেট নিজেই নেচে দেখান, 'পাটা বাড়িয়ে দে—আরো; দুটো গোড়ালি কাছে নিয়ে আয়। ওরে আহাম্মক, হাঁটু দুটো ফাঁক কর ; কাঁধ পেছিয়ে নে, বোকা। মাথাটা সোজা করে রাখ—কনুই দুটো বাঁকিয়ে নে।'

'কী আশ্চর্য ! আপনি তো ওকে অসম্ভব কাজ করতে বলছেন,' গডফ্রে হো-হো ক'রে হেসে ওঠে।

'বুদ্ধিমান লোকের কাছে আবার অসম্ভব কী ?'

'কিন্তু ওর শরীরের গড়নটাই অন্যরকম। হাড়গুলোও কত শক্ত, সেটা একবার ভেবে

দেখুন ।'

'কিন্তু ওকে শিখতেই হবে । একদিন তো ওকে লোকের ড্রয়িংরুমে যেতে হবে–তাই না ? সেখানে তো আর অসভ্যতা করলে চলবে না !'

'কিন্তু টার্টলেট, কস্মিনকালেও কোনো ড্রয়িংরুমে গিয়ে হাজির হবার সুযোগ ওর হবে না !'

'অ্যাঁ ! তা তুমি কেমন ক'রে জানলে ?' টার্টলেট তেড়ে আসেন, 'তুমি কি হাত গুনতে পারো না কি ? আগে থেকেই ব'লে দিতে পারো ভবিষ্যতে কী হবে না-হবে ?'

টার্টলেটের সঙ্গে ঠিকমতো কোনো আলোচনাই সম্ভব হয় না, কারণ সব তর্কই তিনি এই কথা ব'লে থামিয়ে দেন । শুধু যে থামিয়েই দেন, তা নয়, তারপরেই, তাঁর পকেট-বেহালায় টুংটাং তুলতে থাকেন । আর কারেফিনোতু যেহেতু তাঁদের আলোচনার কোনো সারমর্মই বুঝতে পারে না, সেইজন্যে সেই বেহালার সুরে তাল মিলিয়ে তিড়িং-তিড়িং ক'রে লাফিয়ে পলিনেশিয়ার নাচ শুরু ক'রে দেয় ।

ইদানীং শিকারে বেরিয়ে গডফ্রে বুনো জানোয়ারদের কোনো চিহ্ন না-দেখে একটু-একটু ক'রে সাহস ফিরে পাচ্ছিলো । নদীর ধারে এমনকী জানোয়ারদের পায়ের ছাপ পর্যন্ত দেখা যায় না । রাত্তিরে কোনো রাগি গর্জন বা সন্দেহজনক আওয়াজ ওঠে না । আর গৃহপালিত জীবগুলোর হাবভাবেও কোনো চাঞ্চল্য বা আতঙ্কের ছাপ নেই ।

গডফ্রে ভারি আশ্চর্য হ'য়ে গেলো । 'তাজ্জব ব্যাপার দেখছি ! কিন্তু আমি তো কোনো ভুল করিনি ! কারেফিনোতুরও কোনো ভুল হয়নি–একটা ভালুককেই তো সে দেখিয়েছিলো আঙুল তুলে ! আমি যে একটা ভালুককেই গুলি করেছি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ! ধ'রেই না-হয় নিলুম যে আমি তাকে বধ করেছি–কিন্তু সেটাই কি হিংস্র জানোয়ারদের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলো নাকি ?'

পুরো ব্যাপারটা সত্যি হেঁয়ালি ঠেকছে ! তাছাড়া গডফ্রে যদি ভালুকটাকে বধ ক'রেই থাকে, তবে তো তার মৃতদেহটা গাছতলায় প'ড়ে থাকার কথা ! কিন্তু, আশ্চর্য, সেখানটায় তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও কোনো জন্তুর মৃতদেহ তারা দেখতে পায়নি ! এক হ'তে পারে যে জন্তুটা ভীষণভাবে জখম হ'য়ে সেখান থেকে চ'লে গিয়ে অন্য-কোনো জায়গায় গিয়ে ধপ ক'রে প'ড়ে গিয়েছে ! কিন্তু তাহ'লে তো গাছতলায় রক্তের দাগ থাকার কথা–কিন্তু একফোঁটাও রক্তের দাগ নেই কোথাও ! হেঁয়ালিটার কোনো সমাধান না-পেলেও সাবধানে থাকাই ভালো – আগেভাগেই সাবধান থেকে কেউ কক্‌খনো বোকামি করেনি ।

নভেম্বর মাসও শুরু হ'লো, দ্বীপে বর্ষাও শুরু হ'লো । দ্বীপটা যে কোন দ্রাঘিমায়, তা তাদের জানা নেই । কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা একটানা ঠাণ্ডা বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম । পরে হয়তো কনকনে ঠাণ্ডার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই একটানা কয়েকদিন ধ'রে বৃষ্টি পড়বে আর তাদের দশা অতীব কাহিল হ'য়ে যাবে । এক্ষুনি উইল-ট্রির মধ্যে একটা চুল্লির ব্যবস্থা করা উচিত। তাতে যে কেবল হাত-পা সেঁকাই যাবে, তা-ই নয়, বর্ষাবাদলার দিনে রান্নাও চড়ানো যাবে। কিন্তু, প্রশ্ন হ'লো, ধোঁয়া তাড়ানো যাবে কী ক'রে ?

লম্বা একটা বাঁশ কেটে তার গিঁটগুলো চেঁছে নিলে অবিশ্যি দিব্যি একটা নল তৈরি হ'য়ে যাবে । এ-কাজে সবচেয়ে সাহায্য করলে কারেফিনোতু । অনেক হ্যাঙামা ক'রে অবিশ্যি

ব্যাপারটা তাকে বিশদ ক'রে বোঝাতে হ'লো–কিন্তু একবার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতেই সে চটপট বাঁশের মধ্যকার গিঁটগুলো ছাড়িয়ে দিলে। একবার সেটাকে বসিয়ে আগুন জ্বেলে পরীক্ষা ক'রে দেখলো গডফ্রে : দিব্যি হয়েছে, একটুও ধোঁয়া হ'লো না উইল-ট্রির মধ্যে, সব ধোঁয়া বাঁশের নল দিয়ে বেরিয়ে গেলো। কেবল একটা দিকে খেয়াল রাখতে হবে–বাঁশে যাতে কিছুতেই আগুন ধ'রে না-যায়।

তাড়াহুড়ো ক'রে চিমনিটা বসিয়ে ভালোই করেছিলো ওরা। কারণ নভেম্বরের ৩ তারিখ থেকে ১০ তারিখ অব্দি একটানা মুষলধারে বৃষ্টি পড়লো। এই অবস্থায় বাইরে আগুন জ্বালানোও অসম্ভব হ'তো। এ-কদিন সারাক্ষণই উইল-ট্রির মধ্যেই তারা কাটিয়ে দিলে। কিন্তু অসুবিধে হ'লো একটা বিষয়ে : যতটা যব সংগ্রহ করে রেখেছিলো তাতে টান প'ড়ে গেলো। গডফ্রে তখন ১০ তারিখে জানালে যে আবহাওয়া একটু ভালো হ'লেই সে আর কারেফিনোতু গিয়ে বেশকিছু পরিমাণ যব জোগাড় করে নিয়ে আসবে। টার্টলেটকেও সে আসতে বলেছিলো–কিন্তু টার্টলেট জলে-কাদায় বেরুতে রাজি হলেন না।

১০ তারিখের সন্ধেবেলায় পশ্চিমা হাওয়া ভারি নিচু ঝোলা মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো, আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেলো, আর ঠিক সূর্যাস্তের সময় একটুক্ষণ সূর্যকেও দেখা গেলো আকাশে। আশা করা যায়, পরদিন সকালেই বৃষ্টি ধ'রে যাবে ও সূর্য উঠবে। এই শুকনো দিনটাকে কাজে খাটানোই সবচেয়ে ভালো। গডফ্রে ঠিক করলে পরদিনই সে বেরিয়ে পড়বে।

সন্ধের পর তারা খেয়ে-দেয়ে উঠলো। আকাশ পরিষ্কার, বৃষ্টি নেই–মেঘ নেই, দু-একটা ঝকঝকে তারা দেখা যাচ্ছে আজ রাতে। কারেফিনোতু বললে আজ রাত্রে আবার সে বাইরে গিয়ে শোবে। গডফ্রে তাকে অনেক বোঝালে–বুনো জানোয়ারের ভয় না-হয় তার নেই, খামকা স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় সারারাত বাইরে কাটাবার মানে হয় না। কিন্তু কারেফিনোতু নাছোড়বান্দা, শেষকালে তাদের রাজি হ'তেই হ'লো।

সকালবেলাটা দেখা দিলো জ্যোতির্ময় হ'য়ে। সময় নষ্ট না-ক'রে গডফ্রে আর কারেফিনোতু সশস্ত্র হ'য়ে কাঁধে দুটো মস্ত থলি ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লো। উদ্দেশ্য : নদীর তীর ধ'রে যবের খেতে যাবে।

পৌঁছেও গেলো একঘণ্টার মধ্যে বেশ নির্বিঘ্নেই। চটপট তারা থলিগুলোকে ভ'রে নিলে, তবে চটপট করা মানেই তিন-চার ঘণ্টার কাজ। এগারোটা নাগাদ তারা থলি দুটো কাঁধে ঝুলিয়ে ফিরে আসবে ব'লে রওনা হ'লো। পাশাপাশি হাঁটছে দুজনে, বেশ সাবধানে চারপাশে তাকাতে-তাকাতে যাচ্ছে–দুজনের মধ্যে কথা চলে না ব'লেই ভালো ক'রে চারপাশে লক্ষ রাখতে পারছে। নদী যেখানে মোড় বেঁকেছে, যেখানে কতগুলো গাছ জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কী দেখে গডফ্রে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। এবার সে-ই আঙুল তুলে দেখালো গাছতলায় : একটা আমিষখোর ভীষণ জন্তু–চোখ হিংস্র ক্ষুধায় জ্বলন্ত!

'বাঘ! সাবধান!' চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো গডফ্রে। এ-কথা ভুলেই গেলো যে কারেফিনোতু তার ভাষা বোঝে না।

গডফ্রের ভুল হয়নি। সত্যিই একটা মস্ত বাঘ, পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে–এক্ষুনি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ততক্ষণে গডফ্রের কাঁধ থেকে থলিটা খ'সে পড়েছে, হাতে উঠেছে গুলিভরা বন্দুক। মুহূর্তমাত্র দেরি না-ক'রে দ্রুত তাগ ক'রেই সে ঘোড়া টিপে দিলে।

এবারে আর-কোনো সন্দেহ নেই। গুলি খেয়ে বাঘটা একটা পাক খেয়েই প'ড়ে গেলো। প'ড়ে গেলো বটে, কিন্তু মরলো কি না কে জানে। জখম বাঘ সাংঘাতিক জানোয়ার: হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে এক্ষুনি। গডফ্রে আবার গুলি করবে ব'লে বন্দুক তুললো।

কিন্তু গডফ্রে হা-হা ক'রে বাধা দেবার আগেই খাপ-খোলা ভোজালি হাতে কারেফিনোতু ছুটে গিয়েছে সামনে। গডফ্রে হাঁক পেড়ে তাকে ফিরতে বললো। কিন্তু কারেফিনোতু তার ডাকে দৃক্‌পাতও করলে না। বাধ্য হ'য়ে গডফ্রেও ছুটে গেলো পিছন-পিছন।

নদীর পাড়ে গিয়ে দ্যাখে কারেফিনোতু বাঘটার সঙ্গে যুঝছে। এক হাতে তার গলাটা পাকড়ে ধ'রে কারেফিনোতু সজোরে তার ছোরাটা তার বুকে আমূল বসিয়ে দিলে।

বাঘটা গড়িয়ে পড়লো নদীতে। বৃষ্টির জলে নদীর চেহারাই পালটে গিয়েছে: জল ছুটেছে ঘুরে-ঘুরে, ভীষণ স্রোত। বাঘটার শরীর কেবল একবার পাক খেলে সেই জলের ঘূর্ণিতে, তারপরেই স্রোত তাকে টেনে নিয়ে চললো সমুদ্রের দিকে।

বাঘ! ভল্লুক! কে জানে এই দ্বীপে আরো-কত হিংস্র জন্তু আছে! ফিনা আইল্যাণ্ডকে তারা যতটা নিরাপদ ভেবেছিলো, আসলে তা নয়, এটা তো আজ স্পষ্টই বোঝা গেলো।

কারেফিনোতুর কাছে গিয়ে গডফ্রে দ্যাখে বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ের ফলে তার বিশাল কাফ্রি শরীরের কয়েক জায়গায় রক্তভরা আঁচড়!

ভবিষ্যতের কথা ভেবে অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে দুজনে আবার উইল-ট্রির পথ ধরলো।

সামান্যই জখম হয়েছে কারেফিনোতু, কিন্তু তবু তো বাঘের আঁচড়! অথচ সে তাতে মোটেই পাত্তা দিলে না।

১৮

যতই করে চেষ্টা
পায় না কোনো-কিছুর হদিশ, সব ভণ্ডুল শেষটা।
এই দ্বীপে আর নয়—
নিত্য ভূতের নৃত্য দেখে কার সাহসে কুলোয়?

টার্টলেট যখন জানতে পেলেন যে দ্বীপে কেবল ভালুকই নেই, বাঘও আছে, তখন তাঁর প্রলাপ-বিলাপ প্রবল আকার ধারণ করলে। এখন তো আর কোটরের মধ্য থেকে কিছুতেই তিনি এক পাও বাড়াবেন না! আর আমিষখোর জন্তুগুলোও যে শেষ অব্দি উইল-ট্রি অবধি এসে ধাওয়া করবে, তাতেও তাঁর সন্দেহ নেই! না, কোথাও আর নিরাপত্তা নেই! হ'তো যদি একটা পাথরের দুর্গ, তাহ'লে না-হয় কথা ছিলো! কিন্তু দেবদারুর কোটর আবার কোনো নিরাপদ আশ্রয় নাকি? না, না, আর নয়—এক্ষুনি এই দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে, এক্ষুনি!

'যেতে তো আমিও চাই,' শান্ত গলায় বললে গডফ্রে ।

সত্যি-বলতে ফিনা আইল্যাণ্ডে ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে অ্যাদ্দিন যে-ভাবেই কাটুক না-কেন এখন আর অবস্থা সে-রকম নেই । প্রতি মুহূর্তে বন্যজন্তুর আক্রমণের প্রতীক্ষায় ভয়ে-ভয়ে ব'সে-থাকা মোটেই কোনো আনন্দদায়ক অনুভূতি নয় ।

'কিন্তু,' গডফ্রে সেই থেকে কেবল একটা কথাই হাতুড়ির অবিরাম বাড়ির মতো ব'লে চলেছে, 'আশ্চর্য ! এই চার মাসে একটাও বুনো জানোয়ার চোখে পড়লো না—অথচ এই পনেরো দিনে বাঘ-ভালুকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো ! তাজ্জব কাণ্ড !'

সত্যি, ব্যাপারটা ভারি দুর্বোধ্য। যেন একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা !

একেকটা সমস্যা দেখা দেয়, আর গডফ্রে সাহসের সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় তাদের মুখোমুখি হয় । এবারও সে ভেঙে পড়লো না । জন্তুরা যদি দল বেঁধে দ্বীপে এসে দেখাই দেয়, তাহ'লে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে না-থেকে তাদের মুখোমুখি হবার জন্যে তৈরি হওয়াই ভালো ।

কিন্তু করবেই বা কী ?

না-হয় বন-জঙ্গলের ধারকাছই মাড়ালো না বা সমুদ্রের ধারে গেলো না । না-হয় অস্ত্রশস্ত্র বিনা এক পাও বাড়ালো না কোথাও । কিন্তু তারপর ? তারা যদি নিজেই এসে চড়াও হয় ?

'গত দু-বার ভাগ্য আমাদের সহায় ছিলো,' গডফ্রে কেবলই বলে, 'কিন্তু আর তো দৈব ও-রকম সহায় নাও থাকতে পারে !'

কেবল যদি বাইরে বেরুনো বন্ধ রাখলেই চলতো, তাহ'লেও না-হয় কথা ছিলো । কিন্তু উইল-ট্রিকেও রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে । কুঁকড়ো-পরিবারের কথা বা গৃহপালিত চারপেয়েগুলোর কথাও ভুলে গেলে চলবে না ।

টার্টলেটের প্রস্তাবেই রাজি হ'লো গডফ্রে । টার্টলেট বলেছিলেন দেবদারুগুলোকে খুঁটি হিশেবে ব্যবহার ক'রে একটা বেড়া দেয়া হোক । তাতে অন্তত আচম্বিতে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচা যাবে । কিন্তু সেও তো আর চাট্টিখানি কথা নয়—যথেষ্ট খাটুনি আছে ।

কিন্তু খাটুনির ভয়ে পেছিয়ে যাবার লোক গডফ্রে নয় ; অন্তত আজকাল সে আর পরিশ্রমকে ভয় পায় না । তাছাড়া অন্তত এই ব্যাপারটায় টার্টলেটও 'সশরীরে' সাহায্য করবেন ব'লে কথা দিলেন । আর, কারেফিনোতু তো আছেই ।

তক্ষুনি তারা কাজে লেগে গেলো ।

উইল-ট্রি থেকে মাইলখানেক দূরে নদীর ধারে ছিলো একটা পাইনের ঝাড় । তার ডালপালা কেটে জুড়ে দিতে পারলে বেশ শক্ত একটা বেড়া তৈরি হয়ে যাবে । ১২ই নভেম্বর সকালবেলায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনজনেই পাইন বনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো ।

তিন কাঠুরের আর মুহূর্তও হাঁপ ছাড়ার জো ছিলো না । কখন কোন দিক থেকে জন্তুগুলো হাজির হয় কে জানে । কাজেই যত শিগগির সম্ভব কাজটা সেরে ফেলতে হবে। সঙ্গে খাবার নিয়ে এসেছিলো তারা যাতে সারাদিন কাজ করতে পারে ।

কিন্তু কাজটা মোটেই একদিনের নয় । ১৭ তারিখ অবধি রোজ সকালে তারা খাবার-দাবার নিয়ে বেরিয়ে যায়, সন্ধের সময় উইল-ট্রিতে ফিরে আসে । ওদিকে রোজই আকাশে একটু-একটু মেঘ জমছে । কখনও-কখনও বৃষ্টিও পড়ে, তারপরেই আবার রোদ ওঠে । বৃষ্টির সময় তিন জনে গাছতলাতেই আশ্রয় নেয়—বৃষ্টি থামলেই আবার নতুন উদ্যমে কাজ

শুরু ক'রে দেয় । এমনকী অনভ্যস্ত টার্টলেট অব্দি যৎপরোনাস্তি কুঠার চালালেন ।

১৮ তারিখে কাটা গাছগুলো উইল-ট্রিতে আনবার ব্যবস্থা করতে হ'লো তাদের । এই ক-দিন বেশ নিরুপদ্রবেই কেটেছে । নদীর ধারে কোনো বিকট গর্জন ওঠেনি বা কোনো বিষম আবির্ভাব ঘটেনি । তাতেও তারা একটু অবাক না-হয়ে পারলে না । তাহ'লে কি কেবল একটা বাঘ আর একটা ভালুকই ছিলো দ্বীপে ? কিন্তু না, তা-ই বা কী ক'রে হয় ? তা কি কখনও সম্ভব না কি ? কিন্তু এই হেঁয়ালির উত্তর খুঁজে বার করার চেষ্টা না-ক'রে গাছগুলো উইল-ট্রিতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হয় ।

কাজটা মোটেই সহজ নয়–বিস্তর পরিশ্রমসাপেক্ষ । কিন্তু গডফ্রে ভেবে-ভেবে একটা ফন্দি বার ক'রে ফেললে । নদীর স্রোতকে কাজে লাগালে কেমন হয় ? সাম্প্রতিক বর্ষায় নদীর ভোলটাই পালটে গেছে । স্রোত আছে, তাছাড়া জলের ধারাও এখন আর তেমন সরু নয় । ভেলা বেঁধে কাঠগুলো এখান থেকে ভাসিয়ে দিলো–আর উইল-ট্রির কাছে যেখানে গডফ্রে সাঁকো বেঁধেছিলো, সেখানে ভেলাটা থামিয়ে নিলো । সেখান থেকে উইল-ট্রির কাছে গাছগুলোক ব'য়ে নিয়ে যেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না ।

একাধিক ভেলা বেঁধে গাছগুলোকে নিয়ে আসতে-আসতে আরো সপ্তাহখানেক কেটে গেলো । অবশেষে ২৬শে-নভেম্বর তারা প্রথম বেড়া বাঁধলে : দু-ফিট গভীর ক'রে-ক'রে খুঁটি পুঁতে খুঁটিগুলোয় আড়াআড়ি কয়েকটা ক'রে রেলিং বসিয়ে দেয়া হ'লো ।

'একবার বেড়াটা তৈরি হ'য়ে গেলে আর ভয় নেই,' টার্টলেটকে একটু আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলে গডফ্রে ।

'একেবারে মানগোমেরি স্ট্রিটে না-পৌঁছুনো অব্দি ভয় সবসময়েই থাকবে,' বিরস বদনে উত্তর দিনের টার্টলেট । এবং এই মোক্ষম মন্তব্যের কোনো জবাব দেবার ক্ষমতা গডফ্রের ছিলো না ।

বেড়া বাঁধা শেষ হ'লো চারদিনের দিন–এবার একটা শক্ত দরজা বসিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত । কিন্তু ইতিমধ্যে ২৭শে নভেম্বর সকালে এমন-একটা দুর্বোধ্য ঘটনা ঘটলো যে ফিনা আইল্যাণ্ডের প্রহেলিকা আরো জটিল ঠেকতে লাগলো ।

গডফ্রে তখন বেড়ার কাজে ব্যস্ত, বেলা তখন আটটা । হঠাৎ কারেফিনোতু খুব অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে উঠলো । খুব গুরুতর ব্যাপার না-হ'লে যে কারেফিনোতু তাকে ডাকতো না, এটা গডফ্রে জানতো । কারেফিনোতু তখন উইল-ট্রির মগডালে উঠে ছাত বানাচ্ছিলো–যাতে ছাতের ফুটো দিয়ে ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা না-ঢোকে । গডফ্রে তার দুরবিনটা নিয়ে ভিতর থেকে ফোঁপরা গাছটা বেয়ে-বেয়ে উপরে উঠে গেলো ।

গডফ্রে উপরে উঠতেই কারেফিনোতু আঙুল তুলে উত্তর-পুব দিকটা দেখালে । দেখেই গডফ্রে আবাক । দ্যাখে, পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কালো ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে ।

'আবার !' গডফ্রে এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলো চোখে দুরবিন এঁটে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সেদিকে । না, তার ভুল হয়নি । সত্যি মাইল পাঁচেক দূরে, দ্বীপের অন্য প্রান্ত থেকে ধোঁয়া উঠছে–এবং বেশ বড়োশড়ো একটা অগ্নিকুণ্ড থেকেই যে ধোঁয়া উঠছে, তাতেও সন্দেহ নেই–কেননা অত ধোঁয়া কোনো সাধারণ আগুন থেকে উঠতে পারতো না । কারেফিনোতুকে দেখেও বোঝা গেলো যে সেও ভীষণ অবাক হ'য়ে গেছে । কারণ সমুদ্রে এর মধ্যে কোনো

জাহাজই দ্যাখেনি তারা । কোনো জাহাজ যে হঠাৎ এসে তীরে ভিড়েছে, তাও নয় ।

'হুম্ ! ওই ধোঁয়া কোন্ আগুন থেকে উঠেছে, এবার সেটা আমাকে জানতেই হবে !' গডফ্রে ব'লে উঠলো । তারপর আঙুল দিয়ে ধোঁয়া ও গাছতলাটা দেখিয়ে কারেফিনোতুকে সে ইঙ্গিতে বোঝালে যে সে এক্ষুনি ওই ধোঁয়ার উৎস আবিষ্কার করতে বেরিয়ে পড়বে ।

কারেফিনোতু সহজেই তার মনের ভাব ধরতে পারলে । তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেলো যে এটা তারও পরিকল্পনা ।

গডফ্রে ভাবছিলো, 'সত্যি যদি কোনো মানুষ ওখানে থেকে থাকে, তাহ'লে সে-যে কে, এটা জানা খুবই জরুরি । কখনই বা সে দ্বীপে আসে, আর লুকিয়েই বা থাকে কেন ? আমাদের নিরাপত্তার জন্যেই এটা জানা দরকার ।'

তক্ষুনি তারা গাছ থেকে নেমে পড়লো । চটপট টার্টলেটকে সব কথা খুলে বললে গডফ্রে । তারপর টার্টলেট রইলেন উইল-ট্রির পাহারায়–আর গডফ্রে ও কারেফিনোতু অস্ত্রশস্ত্র খাবারদাবার নিয়ে চটপট বেরিয়ে পড়লো ।

সাঁকো পেরিয়ে নদীর ডান তীরে গিয়ে প্রেইরি দিয়েই চললো তারা–এটাই শর্টকাট হবে । দ্বিতীয়বার অনুসন্ধানের সময় গডফ্রে যেখানে গিয়েছিলো, আজকে কিন্তু তার চেয়ে আরো-একটু পুবদিকে স'রে ধোঁয়া উঠছে ।

একদিকে যেমন বিষম তাড়া ছিলো, তেমনি অন্যদিকে আবার জন্তুদের ভয়ে এগুতে হচ্ছিলো সাবধানে । পথে অবশ্য ভয়ের কিছুই ঘটলো না । বারোটা নাগাদ বেলাভূমির প্রথম সার পাথরগুলোর কাছে গিয়ে পৌঁছুলো তারা–মাঝখানে তারা এক জায়গায় চটপট মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিয়েছিলো । তখনও বেশ ধোঁয়া উঠছে । আরো প্রায় সিকিমাইল যেতে হবে তাদের ।

গিয়ে কী দেখবে, জানে না । কে জানে কোন্ বিপদ ওৎ পেতে আছে । কাজেই সাবধানতার সীমা ছিলো না । অথচ তরও সইছে না । হনহন ক'রে তারা এগিয়ে চললো ।

কিন্তু দু-মিনিট পরেই হঠাৎ ধোঁয়ার রেখা মিলিয়ে গেলো । যেন চট ক'রে কেউ আগুন নিভিয়ে দিয়েছে ।

গডফ্রে অবশ্য জায়গাটা ঠিক চিনে রেখেছিলো । পিরামিডের মতো মস্ত একটা তিনকোনা পাথরের আড়াল থেকে ধোঁয়াটা উঠেছিলো–চিনতে অসুবিধে হবার কথা নয় ।

পাথরটা যখন আর পঞ্চাশ পা দূরে, তখন তারা কৌতূহল চাপতে পারলে না–ছুটে গিয়ে হাজির হলো দুজনে ।

কেউ নেই !

কিন্তু আধপোড়া কাঠ আর ছাইভস্ম প'ড়ে আছে । স্পষ্ট প্রমাণ—সত্যিই এখানে কেউ আগুন জ্বেলেছিলো ।

'কেউ একজন ছিলো এখানে–একটু আগেও ছিলো । কে ছিলো, তা আমাদের জানতেই হবে !' ব'লে গডফ্রে গলা ফাটিয়ে হাঁক দিলে ।

কারু সাড়া নেই ।

কারেফিনোতুও একটা ভীষণ চীৎকার করলে । কিন্তু কারু দেখা মিললো না !

আশপাশের পাথরগুলোর আড়ালে গিয়ে তারা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলো । বেলাভূমির কোনো গুহা, গহ্বর, গর্তে টুঁ মারতে তারা বাকি রাখলে না ।

কিন্তু কেউ নেই–কাউকেই তারা পেলে না । এমনকী সরু ছোট্ট ফাটলগুলো পর্যন্ত তারা খুঁজে দেখলো । কারু পাত্তা নেই–জাহাজ-ডোবা নাবিক, জংলি বা আদিবাসী–কেউ না ।

'কিন্তু এবার তো আর-কোনো সন্দেহই নেই,' গডফ্রে ব'লে উঠলো, 'এ-তো আর উষ্ণ প্রস্রবণের ধোঁয়া নয়–কাঠকুটোর আগুন । আর আগুন তো কক্‌খনো আপনা-আপনি দাউ-দাউ করে জ্ব'লে ওঠে না ।'

গোরু খোঁজাই সার হ'লো–কারু চুলের ডগাটিও তারা আবিষ্কার করতে পারলে না । শেষটায় দুটো নাগাদ ক্লান্ত, ব্যর্থ ও হতভম্ব হ'য়ে দুজনে উইল-ট্রির রাস্তা ধরলে ।

গডফ্রে বিষম ভাবিত হ'য়ে পড়েছিলো । ভুতুড়ে দ্বীপ না কি ? না কি দ্বীপটাকে কেউ জাদু করেছে ? আগুনের পুনরাবির্ভাব, রহস্যময় বন্য জন্তুর উপস্থিতি–সব কী-রকম প্রহেলিকার মতো ঠেকছে !

হঠাৎ কারেফিনোতুর এক ধাক্কায় ছিটকে এক পাশে স'রে গেলো গডফ্রে । আরেকটু হ'লেই পড়তো চিৎপটাং মাটিতে !

'সাপ ! বাঘ-ভালুকের পরে শেষকালে সাপও এসে হাজির,' কেন অমন প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে, একবার তাকিয়েই সেটা বুঝে নিতে দেরি হয়নি গডফ্রের । আরেকটু হ'লেই সাপটার ছোবল পড়তো !

সাপটা পরক্ষণেই ঝমঝম শব্দ ক'রে সাঁৎ ক'রে চ'লে গেলো ।

কিন্তু কারেফিনোতুর কুড়ুলটা র‍্যাট্‌ল সাপের চেয়েও ক্ষিপ্র–দু-টুকরো হ'য়ে সাপের শরীরটা এঁকেবেঁকে পেঁচিয়ে যেতে লাগলো । গডফ্রের মনে হ'লো ঠিক এ-রকম একটা প্রহেলিকাই বুঝি দ্বীপটাকে পেঁচিয়ে রেখেছে ।

ভাববার অবসর আর মিললো না । আরো-কতগুলো সাপ দেখা গেলো ঘাসের মধ্যে ।

'দৌড়োও, দৌড়োও,' কারেফিনোতুকে ছুটতে ইঙ্গিত করলে গডফ্রে । কি-রকম যেন অলুক্ষুণে আশঙ্কায় তার মন ভ'রে গিয়েছে । হঠাৎ এত সাপ এলো কোত্থেকে এই দ্বীপে ? আরো-কোনো অজানা বিপদ ওৎ পেতে নেই তো তাদের জন্যে ?

ছিলো ঠিকই । এবং বেশ গুরুতর বিপদ ।

নদীর ধারে এসে শোনে উইল-ট্রির কাছ থেকে আর্তনাদ উঠছে একটানা ! গলার স্বর চিনতে মোটেই দেরি হ'লো না ।

'এ-যে টার্টলেটের গলা ! তাকে আবার কী আক্রমণ করলো । শিগগির কারেফিনোতু, শিগগির !' উত্তেজনায় গডফ্রের গলা দিয়ে কথা বেরুতে চাচ্ছে না ।

সাঁকোয় উঠেই দেখা গেলো দশ-বারো গজ দূরে টার্টলেট প্রাণের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন, আর তাঁর পিছন-পিছন হা ক'রে ছুটছে এক মস্ত কুমির–নদী থেকে সেটা উঠে এসেছে ডাঙায় । ভয়ে টার্টলেট এতই দিশেহারা হ'য়ে গেছেন যে ডান-বাম ক'রে যে এঁকেবেঁকে ছুটবেন, তাও পারছেন না–সোজা ছুটছেন সরল রেখায়–আর তাতে কুমিরের কবলে পড়বার সম্ভাবনাটা আরো বেড়েই যাচ্ছে । হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়লেন টার্টলেট,

কিছুতেই টাল সামলাতে পারলেন না । আর তাঁর রক্ষে নেই ।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো গডফ্রে । এই বিষম বিপদের সামনে প'ড়েও সে মাথা ঠাণ্ডা রাখলে । বন্দুকটা তুলে সে সাবধানে কুমিরটাকে তাগ করলে । কুমিরটা দুম ক'রে লাফিয়ে উঠে একপাশে ছিটকে গিয়ে পড়লো । কারেফিনোতু ততক্ষণে ছুটে গিয়ে টার্টলেটকে কাঁধেই তুলে নিয়েছে অবলীলাক্রমে ।

মস্ত ফাঁড়া গেছে টার্টলেটের–বিষম ফাঁড়া !

সন্ধে তখন ছ-টা, সূর্য তখনও ঠিক ডোবেনি ।

পরক্ষণেই গডফ্রে তার সঙ্গীদের নিয়ে উইল-ট্রিতে পৌঁছুলো ।

সেই সন্ধেটায় আর-কোনো কথা নেই–ঘুরে-ফিরে কেবল এই বাঘ-ভালুক-কুমির-সাপের কথাই চললো । আর ওই রহস্যময় আগুনই বা কে জ্বালে বারে-বারে ? ফিনা আইল্যাণ্ডের বাসিন্দাদের কপালে আরো-কী দুর্ভোগ আছে কে জানে ? কত-যে নিঝুম নির্ঘুম দীর্ঘ রাত কাটবে, তাই বা কে বলবে ?

টার্টলেট সেই থেকে সারাক্ষণ কেবল গানের ধুয়োর মতো ব'লেই চলেছেন–'আর নয় ! আমাকে এ-দ্বীপ থেকে নিয়ে চলো ! আমি মানগোমেরি স্ট্রিটে ফিরে যেতে চাই । আমি আর এ-দ্বীপে থাকতে চাই না ! চাই না !'

যেন কোনো প্রহেলিকা সিরিজ–একটার পর একটা যা-সব এবং যে-সব কাণ্ড হচ্ছে দ্বীপে ! গডফ্রে যেন কিছুতেই আর-কোনো থই পাচ্ছে না !

১৯

মাত্র একটা রাত–
তার মধ্যেই সব তছনছ,
সমস্ত চিৎপাত ।

অবশেষে এলো শীত ।

প্রশান্ত মহাসাগরের এ-সব অঞ্চলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে । প্রথম কয়েক দিনের হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডাতেই ভাবী কনকনে দিনগুলোর খানিকটা পূর্বাভাস পাওয়া গেলো । উইল-ট্রির মধ্যে চুল্লি বসাবার পরিকল্পনাটা দারুণ হয়েছিলো । তাছাড়া এর মধ্যেই চারপাশে বেড়া বাঁধা হ'য়ে গেছে, একটা শক্ত গাঁথুনির দরজাও বসানো হয়েছে ।

পরের ছ-সপ্তাহ ধ'রে, অর্থাৎ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত, এমন অনেক দিন গেলো যখন ঘর থেকে এক পাও বেরুনো গেলো না । প্রথমে কয়েকদিন ভীষণ ঝড় উঠেছিলো: সেকী দারুণ ঝড়, দেবদারুগুলোর শিকড়শুদ্ধু থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছিলো, যেন একেবারেই বুঝি উপড়ে যাবে ! ভাঙা ডালপালা প'ড়ে ছিলো সবখানে : তাণ্ডব-ঝড়ের নিদর্শন। ভালোই হ'লো : জ্বালানির সমস্যাটা তাতে অনেকখানি মিটে গেলো ।

সিন্দুক থেকে বেরুলো পশমি কাপড় । শিকারে বেরুনো বন্ধ হ'য়ে গেলো । আর এমন বরফ পড়লো যে গডফ্রের মনে হ'লো তারা বুঝি সুমেরু মহাসাগরেই এসে পড়েছে। মেরু-হাওয়া ব'য়ে যায় ব'লে উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে ঠাণ্ডা দেশগুলোর অন্যতম । সেখানে শীতকাল থাকে এমনকী এপ্রিল পর্যন্ত । আগে থেকেই সেখানে ঠাণ্ডার সঙ্গে লড়বার জন্যে তৈরি হ'তে হয় । এখানকার ঠাণ্ডার বহর দেখে গডফ্রের মনে হ'লো আসলে সে যা ভেবেছিলো, তা বুঝি ঠিক নয়–ফিনা আইল্যাণ্ড সম্ভবত আরো-উঁচু দ্রাঘিমায় অবস্থিত ।

আর সেই জন্যেই উইল-ট্রির ভিতরটা যাতে আরো আরামপ্রদ ক'রে তোলা যায়, সেদিকে নজর দেয়াটা জরুরি হ'য়ে পড়লো । ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির জন্যে কষ্ট নেহাৎ কম হচ্ছিলো না । আবহাওয়া যে অতটা খারাপ হ'য়ে যাবে, তা তারা ধরতে পারেনি । জমিয়ে-রাখা কাছিমের মাংসে ক্রমশ টান পড়তে লাগলো, কাজেই কয়েকটি ছাগল-ভেড়া বধ করতে হ'লো তাদের ।

এদিকে আবার মাঝখানে দিন-পনেরো ভীষণ জ্বরে ভুগে উঠলো গডফ্রে । সেই ছোটো ওষুধের বাক্সটা না-থাকলে এই জ্বর তার সহজে ছাড়তো কিনা সন্দেহ । টার্টলেট ঠিক সেবা-শুশ্রূষায় পটু নন, সারাক্ষণ তাকে দেখাশুনো করলে কারেফিনোতু । জ্বরের মধ্যে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকেছে সে সারাক্ষণ । ফিনার নাম ধ'রে ডেকেছে বারে-বারে, মামার কথাও বলেছে বার-বার ! এই ক-মাসে রবিনসন ক্রুসো হবার শখ তার কেটে গিয়েছে। ছিলো ছেলেমানুষ, উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ-প্রিয়, বাস্তব জগতের দিকে কক্‌খনো ফিরেও তাকায়নি। কিন্তু এই কয়েক মাসে তার স্বপ্ন ও কল্পনা দুইই প্রচণ্ড চোট খেয়েছে ।

দুর্ভোগে ভরা ডিসেম্বর কেটে গেলো এইভাবেই । বড়োদিনের সময় গডফ্রের শরীর একটু-একটু ক'রে সেরে উঠতে লাগলো । টার্টলেট অবিশ্যি কক্‌খনো রোগে ভোগেননি। কিন্তু কী তাঁর বিলাপ সারাক্ষণ ! সমস্ত সময় কী ফোঁশ-ফোঁশ হাহুতাশ ! এমনকী আজকাল আর কক্‌খনো পকেট-বেহালাতেও ছড় টানেন না তিনি ।

কেবল-যে বন্য জন্তুদের পুনরাবির্ভাবের ভয়েই গডফ্রে ঘাবড়ে ছিলো, তা নয় । জংলিদের ফিরে-আসার সম্ভাবনাটাও নেহাৎ কম নেই । বেড়া দিয়ে জানোয়ারদের না-হয় একটু ঠেকানো যাবে, কিন্তু জংলিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই বেড়া মোটেই যথেষ্ট নয় । তখন হয়তো উইল-ট্রির মগডালে চ'ড়েই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে । ভিতর থেকে বেয়ে-বেয়ে ওঠা অবিশ্যি তেমন কঠিন হবে না–কিন্তু ঝামেলা তো বটে ! কাজটা সহজ করবার জন্যে কারেফিনোতুর সাহায্যে সে গাছটার মধ্যে সিঁড়ির মতো ধাপে-ধাপে খাঁজ কেটে রেখে দিলে ।

সিঁড়িটা তৈরি হ'য়ে গেলে একটু তদারক ক'রে সন্তুষ্ট চিত্তে গডফ্রে বললে, 'যাক ! নিচের বাড়িটা হ'লো শহুরে, আর গাছের উপরকার আশ্রয়টা হ'লো আমাদের গ্রীষ্মাবাস !'

'সে-ক্ষেত্রে মানগোমেরি স্ট্রিটের মণিকোঠাই আমার ঢের বেশি পছন্দ,' তৎক্ষণাৎ মন্তব্য করলেন টার্টলেট ।

বড়োদিন এলো । মারকিন মুলুকে বড়োদিনের সময় জাঁকজমকের অন্ত থাকে না । উইল-ট্রিতেও ভুরিভোজ হলো । টার্টলেটের নৃত্য বা বেহালাবাদনও ছিলো । কিন্তু তবু ঠাণ্ডা, বৃষ্টিভেজা, বরফ-ঢাকা নববর্ষের দিনগুলো তাদের মোটেই আশাপ্রদ ঠেকলো না । 'স্বপ্ন'

জাহাজের যাত্রী দুজন ছ-মাস হ'লো এই দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছে–এই ছ-মাস ধ'রে জগতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই তাদের নেই। যে-ভাবে নতুন বছর শুরু হ'লো, তাতে বোঝা গেলো তাদের কপালে আরো দুর্ভোগ আছে। ১৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত দ্বীপে একটানা তুষারঝুরি ঝরলো। একটা বিষম ঠাণ্ডা ভেজা রাত নামলো দ্বীপে ১৮ তারিখে, কুয়াশায় চারদিক আবছা হ'য়ে আছে। টার্টলেট আর কারেফিনোতু বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছে, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। মশালের আলোর সামনে ব'সে গডফ্রে তার বাইবেলের পাতা ওলটাচ্ছে, এমন সময় দূরে কিসের একটা আওয়াজ হ'লো।

আওয়াজ নয়, গর্জন। ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে সেই গর্জন। আর সন্দেহ নেই–ভুল হবার কোনো জো নেই। অবশেষে বুনো জানোয়ারদের আবির্ভাব হ'লো। শোনা গেলো বাঘের গলার চাপা রাগি তীব্র গররর্ গর্জন, হায়েনার হা-হা, চিতার চীৎকার, সিংহের সর্বনেশে ডাক–সব মিলে সে-এক ভয়াবহ ও দুর্ধর্ষ ঐকতান!

গডফ্রে, টার্টলেট আর কারেফিনোতু ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো। উদ্বেগে উত্তেজনায় তাদের মুখে আর কোনো কথা সরছে না। হঠাৎ এত ধরনের এতগুলো জন্তুর গর্জন শুনে এমনকী কারেফিনোতু শুদ্ধু ভয় পেয়ে গিয়েছে–আর ভয়ের চেয়েও বেশি হচ্ছে তার বিস্ময়।

সাংঘাতিক দুটি দীর্ঘ ঘণ্টা গেলো। তিনজনেই প্রায় একপায়ে খাড়া–উৎকর্ণ ও প্রস্তুত। গর্জনগুলো শোনা যাচ্ছে একেবারে যেন কানের পাশে, এত কাছে। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ গর্জন থেমে গেলো। যেন জন্তুগুলো ঘুরে-ঘুরে অচেনা জায়গাটা ভালো ক'রে দেখে নিচ্ছে। তাহ'লে উইল-ট্রি বুঝি এ-যাত্রা বেঁচেই গেলো!

'বাঁচুক, না-বাঁচুক, আমাদের সামনে একটাই পথ খোলা,' বললে গডফ্রে, 'সব কটাকে না-মারতে পারলে এই দ্বীপে আর-কক্‌খনো আমরা নিরাপদ আর নিশ্চিন্ত হ'তে পারবো না।'

মাঝরাতের একটু পরেই সেই রাগি গর্জন আবার উইল-ট্রির কাছে ফিরে এলো!

নিজের ছায়ার চেয়েও তারা সত্যি! কিন্তু কোত্থেকে এলো এই বাঘ সিংহ? তারা নিশ্চয়ই হঠাৎ এসে এই দ্বীপে হাজির হয়নি: গডফ্রেরা দ্বীপে পা দেবার আগে থেকেই নিশ্চয়ই তারা দ্বীপে ছিলো! অত বার গডফ্রে একা-একা সারা দিন ধ'রে দ্বীপটায় ঘুরে বেড়িয়েছে, বনে-জঙ্গলে টুঁ মেরেছে–কিন্তু একবারও তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। ভারি আশ্চর্য! কোথায় তারা লুকিয়েছিলো এত কাল? কোথায় তাদের সেই রহস্যময় ডেরা, যেটা আজকে এতগুলো ভীষণ জীব উগরে দিলো? আর এটাও আশ্চর্য: বাঘ, চিতা, নেকড়ে, হায়েনা, সিংহ–সব কি না একসঙ্গেই এসে হাজির!

কারেফিনোতু যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিলো না। চুল্লির কম্পিত আলোয় দেখা গেলো তার মুখে জগতের বিস্ময় জেগে উঠেছে! টার্টলেট তো সেই থেকে এক কোনায় বসে-ব'সে বিলাপ করছেন আর কাৎরাচ্ছেন। আর গডফ্রে একটা বিষম বিপদের ভয়ে একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠেছে, যেন আগে থেকেই সে টের পেয়ে গেছে একটা সাংঘাতিক আক্রমণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী। এদিকে ছাগল-ভেড়াগুলো ভীষণ উত্তেজিতভাবে ডাকছে–তারা সব্বাই এসে উইল-ট্রির তলায় ভিড় ক'রে দাঁড়াতে চাচ্ছে!

'বেড়ার দরজাটা খুলতেই হবে!' ব'লে উঠলো গডফ্রে।

কারেফিনোতু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। গডফ্রে কী বলতে চাচ্ছে, তা বোঝবার জন্যে তাকে ভাষা জানতে হ'লো না।

গিয়ে দরজা খুলতেই হুড়মুড় ক'রে আতঙ্কগ্রস্ত জীবেরা বেড়ার মধ্যে ঢুকে পড়লো। কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজার ও-পাশে অন্ধকারে দেখা গেলো একজোড়া জ্বলন্ত চক্ষু!

আর এমনকী বেড়া বন্ধ করারও সময় নেই!

গডফ্রের উপর লাফিয়ে প'ড়ে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে সরিয়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতে মাত্র এক পলক সময় লাগলো কারেফিনোতুর!

গর্জন শুনে তখন বোঝা গেলো তিন-চারটে জন্তু লাফিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

ভীষণ সেই গর্জনের সঙ্গে ভীত কাতর প্রাণীদের আর্তনাদ মিলে জায়গাটা যেন ভৌতিক ও ভয়ংকর হ'য়ে উঠলো। গৃহপালিত জীবগুলো যেন ফাঁদে পড়েছে—বেড়ার বাইরে পালিয়ে যাবারও উপায় নেই—একেবারে সরাসরি যেন বলি দেয়া হ'লো ওদের।

গডফ্রে আর কারেফিনোতু তখন উইল-ট্রির মধ্য থেকে ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরে অন্ধকারে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছে!

বাঘ, না সিংহ—কে জানে! কিন্তু নিরীহ ছাগল-ভেড়ার নিধন শুরু হ'য়ে গেছে তখন। রক্তারক্তি, আর্তনাদ, চাপা গর্জন অন্ধকারকে যেন আরো-ছমছমে ক'রে দিলে।

টার্টলেট ভয়ে-ভয়ে অন্ধ হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছিলেন। ঘুলঘুলি দিয়ে ধুমধাড়াক্কা গুলিই চালিয়ে দিতেন নির্ঘাৎ, কিন্তু গডফ্রে বাধা দিলে। 'অন্ধকারে মাঝখান থেকে গুলিটা নষ্ট হবে—তাগ ফসকাবে, গায়ে লাগবে না—গুলিটাই বেমক্কা বাজে-খরচ হবে। এখন আর একটা গুলিও নষ্ট করা চলবে না—দিনের আলোর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

ঠিকই বলেছিলো গডফ্রে। অন্ধকারে গুলি চালালে বুনো জানোয়ারের গায়ে না-লেগে পোষা জীবগুলোর গায়েও লেগে যেতে পারে—পোষা জীবদের সংখ্যা যেহেতু অনেক বেশি, সেইজন্যে সে-সম্ভাবনাটাই প্রবলতর। এখন আর তাদের রক্ষা করা অসম্ভব। হয়তো আকণ্ঠ ভোজন ক'রে সূর্য ওঠার আগেই বুনো জানোয়ারগুলো চম্পট দেবে। পরের বার আক্রমণ করলে কী করতে হবে, সেটাই এখন বিবেচ্য। হয়তো অন্ধকারের মধ্যে একবার যদি তারা টের পায় যে এখানে মানুষ আছে, তাহ'লে হয়তো উইল-ট্রিকেই বেমক্কা আক্রমণ ক'রে বসবে!

টার্টলেটের মাথায় তখন কোনো কথা ঢুকলে তো! ভয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপছেন, আর চোখ বুজেই বন্দুক বাগিয়ে ধরছেন! শেষটায় গডফ্রে বন্দুকটা তাঁর হাত থেকে কেড়েই নিলে। টার্টলেট তখন বিছানায় গিয়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে রইলেন। চোখ বুজে হয়তো ভাববার চেষ্টা করলেন এ-সব তাণ্ডব তাঁর দুঃস্বপ্নের মধ্যেই ঘটছে—মোটেই বাস্তব নয়।

বাইরে ইতিমধ্যে রক্তের গন্ধে-গন্ধে আরো-কতগুলো আমিষখোর এসে জুটেছে। দাপাদাপি ক'রে তারা ছুটে বেড়াচ্ছে চারদিকে, উইল-ট্রির চারপাশে চক্কর দিচ্ছে, আর রাগি গর্জনে বারে-বারে রাতটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে! ছাগল-ভেড়া বধ ক'রেই তাদের পরিতোষ হয়নি, তারা আরো রক্ত-মাংস চায়।

গডফ্রেরা একেবারে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হ'য়ে রইলো । হয়তো নড়াচড়ার আওয়াজ পেলে জন্তুগুলো উইল-ট্রিকেই আক্রমণ ক'রে বসবে ! ঠিক এমন সময় একটা আচম্বিত দুর্ভাগা গুলি তাদের উপস্থিতি ফাঁস ক'রে দিলে ।

টার্টলেট যে কখন দুঃস্বপ্নের ঘোরে উঠে ব'সে রিভলভার তুলে নিয়েছিলেন, গডফ্রে তা লক্ষ করেনি । তাই সে কোনো বাধা দেবার আগেই, চোখ বুজেই দুমদাম গুলি চালিয়ে দিয়েছেন টার্টলেট ! উইল-ট্রির দরজা ফুঁড়ে গুলিটা চ'লে গেলো ।

'বেওকুফ ! আহাম্মক !' ব'লে গডফ্রে তার নাচের মাস্টারমশাইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আর কারেফিনোতু তক্ষুনি তাঁর হাত থেকে রিভলভারটা জোর ক'রে কেড়ে নিলে ।

কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হ'য়ে গেছে । গুলির শব্দ হবামাত্র গর্জনটা আরো প্রচণ্ড ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলো । উইল-ট্রির গায়ে নখের আঁচড় হ'লো হিংস্রভাবে । দরজায় পড়লো প্রচণ্ড থাবা ! ওই প্রবল আক্রমণ সইতে পারে, দরজাটা মোটেই ততটা শক্ত নয় ।

'আর নয়–এবার প্রতিবোধ করতেই হবে !' চেঁচিয়ে বললে গডফ্রে । বন্দুক কার্তুজের থলি তুলে নিয়ে সে তৈরি হ'য়ে নিলে । গিয়ে দাঁড়ালে একটা ঘুলঘুলির কাছে ।

কারেফিনোতুও ততক্ষণে আরেকটা বন্দুক তুলে নিয়ে অন্য ঘুলঘুলটার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে । এর আগে কখনোই সে বন্দুক ব্যবহার করেনি !

কী সর্বনাশ ! কিন্তু তখন আর সেদিকে নজর দেবার সময় নেই ।

গ'র্জে-গ'র্জে উঠতে লাগলো বন্দুক ! ঝিলিক তুলে গুলি ছুটছে, শব্দ হচ্ছে কানে-তালা-লাগানো : 'গুড়ুম ! ! গুড়ুম !' সেই সঙ্গে উঠছে রাগি ও আহত গর্জন ! সিংহ আর বাঘ, হায়েনা আর চিতা–সংখ্যায় অন্তত বিশ-পঁচিশটা হবে ! আর তাদের গর্জন শুনে দূর থেকে আরো জানোয়ার ছুটে আসছে । যেন কেউ একটা আস্ত পশুশালারই দরজা খুলে দিয়েছে–আর চাপা রাগে গরজাতে-গরজাতে জন্তুগুলো বেরিয়ে পড়েছে সবেগে !

টার্টলেট কী করছেন না-করছেন, তখন আর সেদিকে নজর দেবার সময় নেই । গডফ্রে আর কারেফিনোতু প্রাণপণে মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে, সাবধানে তাগ ক'রে একেবারে নিশ্চিত না-হ'য়ে কিছুতেই গুলি ছুঁড়ছে না । ঠিক যখন বন্দুকের সামনে দেখা দেয় মস্ত মিশকালো ছায়া ও ভাঁটার মতো জ্বলন্ত চক্ষু, তক্ষুনি ঝিলিক দিয়ে ওঠে বন্দুক, আওয়াজ হয় গুড়ুম আর আহত রুষ্ট চীৎকার জানিয়ে দেয় যে গুলি বিঁধেছে ।

হাঁপ ছাড়ার ফুরশৎ পাওয়া গেলো মিনিট কুড়ি পরে । জন্তুগুলো কি সাময়িকভাবে চম্পট দিয়েছে ? ফিরে আসবে দিনের বেলায় ? আক্রমণ করবে নতুন তেজে ? কোনো প্রশ্নেরই কোনো উত্তর নেই । কিন্তু গডফ্রে আর কারেফিনোতু কিছুতেই আর ঘুলঘুলির কাছ থেকে নড়লো না । সবচেয়ে আশ্চর্য কারেফিনোতুর কাণ্ড ! এই প্রথম সে বন্দুক চালাচ্ছে–কিন্তু, শাবাশ, কী তার টিপ–তার একটা গুলিও বোধহয় ফসকায়নি !

রাত দুটো নাগাদ আবার এলো আক্রমণ । এবার আগের চেয়েও অনেক প্রচণ্ড ও তীব্র । যেন তাণ্ডব শুরু হ'য়ে গেছে । উইল-ট্রির ভিতরটা পর্যন্ত আর নিরাপদ নয় । নতুন ক'রে উইল-ট্রির আশপাশ থেকে উঠছে বুনো জন্তুদের গর্জন । কিন্তু ঘুলঘুলি থেকে কোনো জন্তুকেই দেখা যাচ্ছে না ব'লে তারা গুলি করতেও পারছে না । ঘুলঘুলি দুটো পরস্পরের বিপরীত দিকে এমনভাবে বসানো যে সেখান থেকে সব দিক ভালো দেখা যায় না । এবার

আবার জন্তুরা দরজায় থাবা আছড়াচ্ছে ! পাল্লাটা কাঁপছে–ভেঙে পড়লো ব'লে ! আর রক্ষে নেই ! দরজাটা ভেঙে পড়লে জন্তুরা তাদের টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলবে !

'উঠে পড়ো উপরে–একেবারে গাছের মগডালে !' চেঁচিয়ে গডফ্রে ব'লে উঠলো । ভাগ্যিশ, সিঁড়িটা বানিয়ে রেখেছিলো ! বন্দুক আর বিভলভার, গুলি আর কার্তুজ নিয়ে গডফ্রে আর কারেফিনোতু তৈরি হ'য়ে দাঁড়ালে ।

'উঠুন ! উঠুন !' টার্টলেটকে তাড়া দিলে গডফ্রে ।

কিন্তু তাড়া দেবার দরকার ছিলো না । ঠকঠক ক'রে কাঁপতে-কাঁপতে টার্টলেট ততক্ষণে একেবারে মগডালে গিয়ে উঠে বসেছেন ।

গডফ্রে আর কারেফিনোতু তিরিশ ফিটও ওঠেনি তখন–উইল-ট্রির দরজা ভেঙে পড়লো। এবার গর্জন উঠছে কোটরের মধ্য থেকে ! আরেকটু দেরি হ'লেই গিয়েছিলো–আর দেখতে হ'তো না ! চটপট তারা উপরে উঠে পড়লো ।

ডালপালার আড়াল থেকে তাদের স্বাগত জানালে এক বিষম ভীত চীৎকার । টার্টলেট ভেবেছেন বুঝি-বা বাঘেরাই গাছে উঠে পড়েছে–তাই পরিত্রাহি চ্যাচাচ্ছেন । এমনভাবে ডাল ধ'রে ঝুলছেন যে, যে-কোনো মুহূর্তে নিচে প'ড়ে যেতে পারেন । কারেফিনোতু গিয়ে তাঁকে টেনে তুললো–একটা ডালে বেশ ভালো ক'রে ব'সে টার্টলেট এবার কোমরবন্ধ দিয়ে নিজেকে ক'ষে বেঁধে ফেললেন ।

গডফ্রে আর কারেফিনোতু বসলো ছাতে ওঠার ফোকরটার মুখে–যাতে পর-পর নিচে গুলি করা যায় । যদি জন্তুগুলো উপরে ওঠবার চেষ্টা করে শুধু তখনই তারা গুলি চালাবে ।

নিচে কী কাণ্ড হচ্ছে, তা একবার নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করলে গডফ্রে । কিন্তু রাতটা আবার বড্ড অন্ধকার ! তবে নিচে জন্তুদের গর্জন মোটেই থামছে না–বোঝা গেলো যে বাঘ-সিংহরা খুব চটপট জায়গাটা ছেড়ে চ'লে যাবে না ।

চুপচাপ ব'সে-ব'সে সেই গর্জনই তারা শুনতে লাগলো ।

হঠাৎ চারটে নাগাদ গাছের তলায় দাউদাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠলো । দরজা-জানলা দিয়ে পরের মুহূর্তে আগুন ঢুকে পড়লো কোটরের মধ্যে–তারপরেই ছাতের ফোকর দিয়ে ধোঁয়া উঠতে লাগলো ।

'এ আবার কী কাণ্ড ?' গডফ্রে অবাক হ'য়ে জিগেশ করলে ।

কাণ্ড আর-কিছুই নয়–ঘরের মধ্যে সব লণ্ডভণ্ড করতে গিয়ে জন্তুরা চুল্লির আগুনটা চারদিকে ছিটিয়েছে–আর তাই থেকেই এই মস্ত দেবদারুতে আগুন ধ'রে গিয়েছে ! পাথর বসিয়ে-বসিয়ে তারা চুল্লিটা তৈরি করেছিলো, তাই এতদিন কোনো অগ্নিকাণ্ড হয়নি । কিন্তু জন্তুরা ঘরে শিকার না-পেয়ে ভিতরকার সব জিনিশ নিশ্চয়ই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছত্রখান করে দিয়েছে–আর শুকনো গাছটার গায়ে তক্ষুনি আগুন ধ'রে গেছে ।

এ-তো আরো শোচনীয় অবস্থা হলো তাদের ! আগুনের শিখা লোলুপভাবে গাছটাকে ঘিরে নাচছে, চারদিক আলো হ'য়ে গেছে, আর সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে উইল-ট্রিকে লক্ষ্য করে জন্তুদের লম্ফঝম্প । হঠাৎ সমস্ত-কিছু কাঁপিয়ে একটা মস্ত বিস্ফোরণের শব্দে আস্ত গাছটা থরথর করে কেঁপে উঠলো ! উইল-ট্রির মধ্যে বাক্সভর্তি যে-গুলিবারুদ ছিলো, তাই ফেটে পড়েছে, আর কোটরের মুখ দিয়ে প্রায় কামানের গোলার মতো বেরিয়ে পড়েছে ।

আরেকটু হ'লেই গডফ্রে আর কারেফিনোতু ওই প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে টাল সামলাতে না-পেরে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়তো। ভাগ্যিশ, টার্টলেট কোমরবন্ধ দিয়ে নিজেকে একটা ডালের সঙ্গে শক্ত ক'রে বেঁধে নিয়েছিলেন, না-হ'লে তাঁর অবস্থাও হ'তো শোচনীয়!

কিন্তু সেই কামাননিনাদে ফল হ'লো। বিস্ফোরণের ফলে জন্তুরা কেউ-কেউ ভীষণভাবে জখম হ'য়ে পড়লো, অন্যরা ভয়ে অস্থির হ'য়ে পড়ি-মরি করে সে-তল্লাট ছেড়ে চম্পট দিলে। কিন্তু সেই সঙ্গে আগুনের প্রতাপও বেড়ে গেলো : দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে—আস্ত গাছটাই বুঝি পুড়ে যাবে। দাবানলের চেয়েও ভীষণ এই আগুন!

উইল-ট্রির ভিতরটা লকলকে হাজার জিহ্বায় চাটছে আগুন। মরা কাঠ শব্দ ক'রে ফাটছে। একটা লম্বা শিখা বুঝি ছাতের ফোকরটাই ছুঁয়ে ফ্যালে! একটা মস্ত দেওয়ালির জৌলুশ ঝলশে উঠেছে যেন দ্বীপে—শুধু দেবদারুতলাই আলো হ'য়ে ওঠেনি, ফ্ল্যাগ-পয়েন্ট থেকে স্বপ্ন-সাগরের দক্ষিণবিন্দু অব্দি আলোয় ভ'রে গিয়েছে।

পরক্ষণেই আগুন পৌঁছুলো একেবারে গডফ্রেদের কাছে। আগুনের সঙ্গে তারা যুঝবে কী ক'রে? তবে কি তাদের জীবন্ত ঝলসে মরতে হবে এখানে? লাফিয়ে পড়বে নিচে? কিন্তু অত উঁচু থেকে লাফ দিলে তো হাড়গোড় ভেঙে দ হ'য়ে যাবে! কী করবে তবে তারা?

ধোঁয়ায় চারদিক ভ'রে গেছে, নিশ্বেস নিতে কষ্ট হয়। আগুনের আঁচ গায়ে লাগছে, সারা গা যেন ঝলসে যাচ্ছে।

এমন সময় প্রচণ্ড শব্দ উঠলো মড়মড়ে। উইল-ট্রির শেকড়শুদ্ধু পুড়ে গিয়েছে, আর তার ফলেই আস্ত গাছটা ভেঙে পড়লো।

কিন্তু মাটিতে পড়লো না। বীথিকার অন্য দেবদারুগুলোর গায়ে ঠেকে গেলো গাছটা—মাটি থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাঁকানো একটা দোলনার মতো উইল-ট্রির মগডাল শূন্যে ঝুলে রইলো।

গাছটাকে পড়তে দেখে গডফ্রেরা ভেবেছিলো, আর বুঝি রক্ষা নেই! কিন্তু এই অবস্থায় হঠাৎ গডফ্রে শুনতে পেলে, কে যেন ইংরেজিতে ব'লে উঠলো : 'উনিশে জানুয়ারি!'

কে বললো এ-কথা?

কে আবার? কারেফিনোতু! হ্যাঁ, কারেফিনোতুই ইংরেজিতে কথা কটা ব'লে উঠেছে। যে-কথা এতকাল উচ্চারণ করা তো দূরের কথা, ঠিকমতো সে বুঝতেই পারতো না!

'কী বললে? কী বললে তুমি?' গডফ্রে হতভম্ব হ'য়ে গেলো!

'বলছি যে,' কারেফিনোতু বললে, 'আজকেই আপনার মামা কোল্ডেরুপের এখানে পৌঁছুবার কথা, মিস্টার মরগান। আজ যদি উনি এখানে এসে না-পৌঁছোন তো আর দেখতে হবে না—আমাদের সবাইকে তাহ'লে মরতে হবে।'

২০

এ কোন দেশি হেঁয়ালি ?
সব কি তবে সত্যি-সত্যি
উইল-মামার খেয়াল-ই ?

ঠিক তক্ষুনি উইল-ট্রির কাছেই কতগুলো বন্দুকের আওয়াজ উঠলো ।

আর সেই মুহূর্তেই, বলা নেই কওয়া নেই, আকাশ ভেঙে শুরু হ'লো মুষলধারে বর্ষণ! কে যেন আকাশে একটা মস্ত চৌবাচ্চা উপুড় ক'রে দিয়েছে, আর বৃষ্টির জলে তক্ষুনি উইল-ট্রির আগুন নিভে গেলো ।

এই হেঁয়ালির কী ব্যাখ্যা দেবে গডফ্রে ! কারেফিনোতু খাশ মারকিন উচ্চারণে ইংরেজি বলেছে, শুধু তা-ই নয়, নাম ধ'রে ডেকেছে তাকে, আরো বলেছে যে আজকেই উইল-মামা নাকি দ্বীপে এসে পৌছুবেন ! এবং তারই কথায় সায় দিয়েই যেন গ'র্জে উঠেছে বন্দুক !

সে কি আতঙ্কে-ভয়ে শেষটায় পাগল হ'য়ে গিয়েছে ? কিন্তু এই দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মাথমুণ্ডু বোঝবার আগেই গাছপালার ফাঁক দিয়ে হন্তদন্ত হ'য়ে একদল নাবিককে ছুটে আসতে দেখা গেলো ।

গডফ্রে আর কারেফিনোতু হুড়মুড় ক'রে নেমে পড়লো গাছ থেকে ।

মাটিতে পা দেবামাত্র গডফ্রে যে-দুটি গলা শুনলে, তাদের তার স্বপ্নেও চিনতে ভুল হবার কথা নয় ।

'কী-হে ভাগ্নে ? কী খবর ?'

'গডফ্রে !'–

'উইল-মামা ? তুমি ! ফিনা ? তুমি !' গডফ্রে একেবারে স্তম্ভিত ।

ততক্ষণে কাপ্তেন টারকটের নির্দেশে দুটি মাল্লা উইল-ট্রিতে উঠে পড়েছে । যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে তারা টুশটুশে মাকাল ফলের মতো টার্টলেটকে গাছ থেকে পেড়ে আনলে। ততক্ষণে নিচে হেঁয়ালিটার সমাধান হচ্ছে ।

'তুমি ! উইল-মামা ?'

'হ্যাঁ, আমি !'

'ফিনা আইল্যাণ্ডের কথা তুমি জানতে পেলে কী ক'রে ?'

'ফিনা আইল্যাণ্ড ?' উইলিয়াম ডাবলিউ. কোল্ডেরুপ বললেন,'বলা উচিত স্পেনসার আইল্যাণ্ড ! তা, সেটা কী একটা কঠিন কাজ ? ছ-মাস আগেই দ্বীপটা আমি কিনে নিয়েছি কি না–'

'স্পেনসার আইল্যাণ্ড !'

'তুমি দ্বীপটাকে ফিনা আইল্যাণ্ড ব'লে নাম দিয়েছিলে, গডফ্রে ?' ফিনা হলানির মধুর জিজ্ঞাসা শোনা গেলো ।

'নতুন নামটাই ভালো—ওই নামেই আমরা দ্বীপটাকে ডাকবো,' মামা বললেন, 'তবে ভূগোলের পণ্ডিতদের কাছে দ্বীপটার নাম স্পেনসার আইল্যাণ্ড—সান ফ্রানসিসকো থেকে মাত্র তিন দিনের পথ। আমি ভেবেছিলুম রবিনসন ক্রুসোর শাগরেদি করার জন্য এই দ্বীপটা তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে!'

'অ্যাঁ? কী বললে তুমি, মামা? ক্রুসোর শাগরেদি?' গডফ্রে বললে, 'তা ঠিকই করেছো। এই দুর্ভোগ আমার প্রাপ্য ছিলো। কিন্তু মামা, "স্বপ্ন"র জাহাজডুবি?'

'অভিনয়, ও একটা মিথ্যে অভিনয়,' কোল্ডেরুপের অমন ফূর্তিবাজ চেহারা গডফ্রে আগে কক্‌খনো দ্যাখেনি, "'স্বপ্ন'টাকে আদ্ধেক ডোবাবার ভান করেছিলেন কাপ্তেন টারকট—আমারই নির্দেশ ছিলো। তোমরা ভেবেছিলে বুঝি সত্যিই জাহাজটা ডুবে গেছে! টারকট যেই দেখলেন যে তোমরা বেশ বহাল তবিয়তেই দ্বীপে গিয়ে উঠেছো, অমনি তিনি জাহাজটা থেকে জল ছেঁচে ফেলে পুরোদমে চালিয়ে দেন—সোজা সান ফ্রানসিসকো চ'লে আসেন তিন দিনেই। কাপ্তেন টারকটই এই নির্দিষ্ট তারিখে আমাদের স্পেনসার আইল্যাণ্ডে নিয়ে এসেছেন।'

'তাহ'লে মাল্লারা কেউ মরেনি?'

'না। কেবল সেই-যে চিনে জাহাজের খোলে লুকিয়েছিলো, তার আর কোনো পাত্তা পরে পাওয়া যায়নি!'

'কিন্তু জংলিদের ক্যানু?'

'সেও অভিনয়। ক্যানুটা আমারই বানানো।'

'আর জংলিরা?'

'সেও নকল। ভাগ্যিশ তোমাদের গুলি ওদের লাগিনি।'

'কিন্তু কারেফিনোতু?'

'সেও অভিনয়। কারেফিনোতু হ'লো আসলে আমার অতিবিশ্বস্ত জাপ ব্রাস—দেখতে পাচ্ছি ক্রুসোর শুক্কুরবারের ভূমিকায় সে চমৎকার অভিনয় করেছে!'

'হ্যাঁ!' গডফ্রে সায় দিলে, 'উনি দু-বার আমায় প্রাণে বাঁচিয়েছেন। একবার এক ভালুকের হাত থেকে, আরেকবার এক বাঘের হাত থেকে।'

'দুটোই নকল! কোনোটাই জ্যান্ত নয়।' হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন উইল-মামা, দুটোর মধ্যেই খড় পোরা। জাপ ব্রাস ও তার সঙ্গীদের সঙ্গেই ও-দুটোর দ্বীপে অবতীর্ণ হয়।'

'কিন্তু বাঘ-ভালুকের তো থাব্বা-টাবা নড়ছিলো!'

'ভিতরে স্প্রিং-বসানো পুতুল কিনা, তাই। দু-বারই জাপ ব্রাস আগে গিয়ে ওগুলোকে রাস্তায় রেখে দিয়ে আসে। সবই বানানো ব্যাপার!'

'অ্যাঁ! সবগুলোই বানানো?'

'বাঃ রে! তোমরা দিব্যি ফূর্তিতে দিন কাটাচ্ছিলে দ্বীপে—একটু-আধটু উত্তেজনা না-হ'লে মানাবে কেন ক্রুসোদের?'

এবারে গডফ্রেও আর হাসি চাপতে পারলে না। 'কিন্তু তুমি যদি আমাদের জন্য সবই মসৃণ ও সহজ করতে চাওনি তাহ'লে সিন্দুক ভর্তি সব জরুরি জিনিশ রেখে গিয়েছিলে

কেন ?'

'সিন্দুকভর্তি জরুরি জিনিশ !' কোল্ডেরুপ তো অবাক ! 'কোন্ সিন্দুক ! আমি তো কোনো সিন্দুক পাঠাইনি তোমাদের জন্যে–নিশ্চয়ই দৈবাৎ–'

বলতে-বলতে উইল-মামা ফিনার দিকে ফিরে তাকালেন, অমনি ফিনা মাথা নুইয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো ।

'হুম্ ! এই ব্যাপার ! সিন্দুক ! তাহ'লে ফিনার নিশ্চয়ই কোনো শাগরেদ–'

উইল-মামা কাপ্তেন টারকটের দিকে ফিরে তাকালেন ।

টারকট হেসে বললেন, 'কী করবো, বলুন, মিস্টার কোল্ডেরুপ ? আপনাকে না-হয় অনেক ব্যাপারে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারি । কিন্তু মিস ফিনা–তাঁকে সামলানো বড্ড কঠিন ছিলো আমার পক্ষে । চারমাস আগে আপনি যখন আমাকে দ্বীপের খবরাখবর নিতে পাঠান, তখন ওই সিন্দুক–'

'ফিনা ! তোমার এই কাণ্ড !' গডফ্রে তার দিকে তাকালে ।

'কাপ্তেন টারকট ! আপনি যে বলেছিলেন সব কথা গোপন রাখবেন,' ফিনা কিন্তু লজ্জায় একেবারে আরক্তিম ।

উইল-মামা রাগ করতে গিয়েও তার দশা দেখে হেসে ফেললেন ।

সব কথা শুনে গডফ্রেও আর হাসি চাপতে পারেনি । কিন্তু টার্টলেট এবার আর সামলাতে পারলেন না, বললেন, 'আপনি কি বলতে চান, মিস্টার কোল্ডেরুপ যে, যে-কুমিরটা আমাকে তাড়া করেছিলো, সেটাও কাগজের তৈরি আর স্প্রিং-এ চলা ?'

'কুমির !'

'হ্যাঁ, মিস্টার কোল্ডেরুপ,' কারেফিনোতু ওরফে জাপ ব্রাস বললে, 'একটা আস্ত জ্যান্ত কুমির ! সেটা কিন্তু আমি সঙ্গে নিয়ে আসিনি !'

তখন গডফ্রে হিংস্র জন্তুদের আক্রমণের কথা সব খুলে বললে । শুনে কোল্ডেরুপ বেশ শঙ্কিতই হ'য়ে পড়লেন । এ-কথা তো তাঁর জানা ছিলো না । অনেকদিন ধ'রেই সব্বাই জানে যে স্পনসার আইল্যাণ্ডে এমনকী ছোট্ট কোনো আমিষখোর জন্তুও থাকে না । তাঁর দলিলে এ-কথা স্পষ্ট লেখা আছে । দ্বীপটা কেনবার সময় তিনি তন্নতন্ন ক'রে দলিলটা পড়েছেন !

তাছাড়া দ্বীপের মধ্যে রহস্যময় ধোঁয়াই বা বারে-বারে উঠছিলো কেন, তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন না । অভিনয়ের প্রযোজক হিশেবে সব তাহ'লে তিনি ঠিকমতো চালাতে পারেননি । তাহ'লে সত্যিই কোনো রহস্য আছে দ্বীপে !

টার্টলেট অবশ্য অভিনয়কেও অভিনয় ব'লে মানতে নারাজ । না-হ'লে জীবনের প্রথম গুলি তো লক্ষ্যে বিঁধেছিলো, এ-কথা ব'লে তিনি জাঁক করবেন কী ক'রে ?

উইল-মামা কিন্তু দ্বীপের রহস্যটা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না । সত্যিকার জ্যান্ত হিংস্র জানোয়ার কোত্থেকে এলো দ্বীপে ? আর ওই ধোঁয়া ? হেঁয়ালির উত্তরটা বার করতে না-পেরে আপাতত তিনি ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন ; গডফ্রেকে জিগেস করলেন, 'গডফ্রে ! তুমি তো চিরকাল দ্বীপকে ভালোবেসে এসেছো ! শুনে নিশ্চয়ই খুশি হবে যে এ-দ্বীপটা আমি তোমাকেই দিয়ে দিয়েছি । এখন এ-দ্বীপ নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো।

ইচ্ছে হ'লে রবিনসন ক্রুসো হ'য়ে সারা জীবনই এই দ্বীপে তুমি কাটিয়ে দিতে পারো—আমি কোনো আপত্তি করবো না ।'

'রবিনসন ক্রুসো হবো ? আমি !' গডফ্রে ব'লে উঠলো : 'সারা জীবন ! কক্‌খনো না ।'

'তাহ'লে চ'লে এসো সান ফ্রানসিসকোয় । আমি তোমাদের বিয়ে দিতে চাই শিগগিরই। তাহ'লে কালকেই আমরা রওনা হ'য়ে পড়বো তো ?'

এই প্রস্তাবে গডফ্রে তক্ষুনি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে ।

তারপরে সে সবাইকে দ্বীপটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলো ।

বুনো জানোয়ারদের আক্রমণে উইল-ট্রির আশপাশে আর-কিছুই আস্ত নেই । পোষা জীবগুলো সব ছিন্নভিন্ন প'ড়ে আছে—আস্ত জায়গাটা লণ্ডভণ্ড । কোল্ডেরুপরা সময়মতো না-এলে এই ক্রুসোদের অবস্থা বেশ কাহিল হ'য়ে পড়তো ।

'উইল-মামা !' গডফ্রে বললে, 'দ্বীপটার নাম দিয়েছিলুম ফিনার নামে, কিন্তু আমাদের বাড়ির নাম দিয়েছিলুম উইল-ট্রি !'

'চমৎকার ! গাছটার বীজ নিয়ে যেতে হবে—সান ফ্রানসিসকোয় আমার বাগানে পুঁতে দেবো 'খন ।'

রাস্তায় দু-একবার যে-বুনো জানোয়াররা সামনে পড়লো না, তা নয় । কিন্তু অতজন লোককে একসঙ্গে দেখে জানোয়াগুলো আর আক্রমণ করার কথা ভাবলে না—নিজরাই ঝোপে-ঝাড়ে কেটে পড়লো । কিন্তু জন্তুগুলো যে কী ক'রে এই দ্বীপে এসে হাজির হয়েছে, সেই ধাঁধাটার আর সমাধান হ'লো না ।

রাতটা সবাই 'স্বপ্ন' জাহাজেই কাটিয়ে দিলে ।

পরদিন, অর্থাৎ ২০শে জানুয়ারি, সকালে 'স্বপ্ন' ছেড়ে দিলো । আটটা নাগাদ গডফ্রে দেখলে দিগন্তে স্পেনসার, ওরফে ফিনা আইল্যাণ্ড মিলিয়ে গেলো । বেশ কষ্টই হচ্ছিলো তার দ্বীপ ছেড়ে যেতে । এই দ্বীপেই সে জীবনের কাছ থেকে প্রথম পাঠ নিয়েছে । ফিনা আইল্যাণ্ড এই ছ-মাসে তাকে যা শিখিয়েছে, তা সে আর কক্‌খনো ভুলবে না !

বেশ তাড়াতাড়ি সান ফ্রানসিসকোয় ফিরে এলো 'স্বপ্ন' । আগের মতো আর দিনে-রাতে দুই সময়ে দুই দিকে যাবার চেষ্টা করলে না ব'লেই ২৩শে জানুয়ারি 'স্বপ্ন' এসে সান ফ্রানসিসকোর জেটিতে ভিড়লো ।

জাহাজ ভিড়তেই—তাজ্জব কাণ্ড ! দেখা গেলো দ্বিতীয় বার জাহাজের খোল থেকে লুকিয়ে-থাকা সেংভু বেরিয়ে এলো ।

কোল্ডেরুপের কাছে গিয়ে সেংভু বললে, 'আশা করি মিস্টার কোল্ডেরুপ আমায় ক্ষমা করবেন । প্রথমবার যখন "স্বপ্ন"'র খোলে গিয়ে লুকিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম সে বুঝি শাংহাই যাবে ! কিন্তু এবার "স্বপ্ন" থেকে নেমে যাচ্ছি আবার সান ফ্রানসিসকোতেই !'

তাকে দেখেই সবাই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো । কী বলবে, না-বলবে, বুঝতে পারছিলো না ।

অবশেষে কোল্ডেরুপ জিগেস করলেন, 'এই ছ-মাস নিশ্চয়ই তুমি "স্বপ্ন"'র খোলের মধ্যেই লুকিয়ে থাকোনি ?'

'না,' সেংভু উত্তর দিলে।

'তাহ'লে কোথায় ছিলে তুমি ?'

'কেন ? দ্বীপে !'

'তুমি ? দ্বীপে ছিলে ?' গডফ্রের আর বিস্ময়ের শেষ নেই।

'হ্যাঁ !'

'তুমিই তাহ'লে আগুন জ্বালতে দ্বীপে ?'

'বেঁচে থাকতে হলে লোককে তো আগুন জ্বালতেই হবে !'

'তুমি কখনো আমাদের কাছে আসোনি কেন ? তাহ'লে তো আমরা এক সঙ্গেই থাকতে পারতুম।

সেংভু বেশ শান্তভাবেই বললে, 'চিনেরা একা থাকতেই ভালোবাসে। একাই একজন চিনে যথেষ্ট–তার আর কাউকে কখনো দরকার হয় না।'

'আবার তুমি জাহাজে উঠলে কী ক'রে ?'

'১৯শে জানুয়ারি রাত্রে–সাঁৎরে জাহাজে এসে উঠেছিলুম,' ব'লে নুয়ে সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে সেংভু সব হতভম্বদের সামনে থেকে চ'লে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে জেটিতে নেমেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলো।

'ও-ই হচ্ছে সত্যিকার ক্রুসো হবার যোগ্য লোক।' বললেন উইল-মামা, 'পারবে ওর মতো থাকতে একা-একা একটা দ্বীপে !'

'যাক !' গডফ্রে বললো, 'একটা ব্যাপারের হদিশ মিললো। ধোঁয়ার রহস্যটা বোঝা গেলো অবশেষে–সেংভুই না-হয় আগুন জ্বেলেছিল ! কিন্তু জানোয়ারগুলো ? তারা যে কী ক'রে দ্বীপে গিয়ে উঠলো, তা বোধহয় আর-কোনোদিনও আমরা জানতে পারবো না।'

'আর আমার কুমির !' টার্টলেট মরা কুমিরটাকে ফেরবার সময় জাহাজে নিয়ে তুলেছিলেন, 'কুমিররহস্যই বা ভেদ করবে কে ?'

উইল-মামা বেশ একটু লজ্জা পেলেন। কিন্তু এই রহস্য ভেদ করা তাঁরও কর্ম নয়।

+

কয়েকদিন পরে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে গডফ্রে আর ফিনার বিয়ে হ'লো। বিয়ের পরে টার্টলেট একদিন তাঁর ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের মামাকে নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন। তাঁর বৈঠকখানায় ঢুকেই তো সকলের চক্ষুস্থির ! ওই মরা কুমিরটাকে তিনি 'স্টাফ' করিয়েছেন–দূর থেকে তবু একেবারে জ্যান্তই দেখাচ্ছে। কড়িকাঠ থেকে কুমিরটা তিনি ঝুলিয়ে দিয়েছেন ঘরের মধ্যে–থাবা ছড়ানো, হা-খোলা এই বৃহৎ কুমিরটি তাঁর বৈঠকখানার অলংকার।

কথা প্রসঙ্গে টার্টলেট বললেন, 'জানেন, মিস্টার কোল্ডেরুপ, এই কুমিরটা কোত্থেকে এসেছিলো ?'

'না।'

'কিন্তু তার গলার কাছে একটা লেবেল সাঁটা ছিলো।'

'লেবেল ছিলো ?'

'হ্যাঁ। এই-যে সেটা,' ব'লে একটা চামড়ার টুকরো বাড়িয়ে ধরলেন টার্টলেট।

সবাই অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখলে, লেবেলটায় লেখা :

'হামবুর্গের হাগনেবেক কম্পানি প্রেরিত

শ্রীযুক্ত জে. আর. টাসকিনার

বরাবরেষু–

স্টকটন, আমেরিকা ।'

লেবেলটা প'ড়েই কোল্ডেরুপ হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন । এবার তিনি সব বুঝতে পেরেছেন ।

নিলেমে হেরে গিয়ে তাঁর চিরশত্রু টার্সকিনার এক জাহাজভর্তি নানা হিংস্র জন্তু আনিয়েছেন পৃথিবীর নানা চিড়িয়াখানা থেকে–তারপর জন্তুগুলোকে গিয়ে স্পেনসার আইল্যাণ্ডে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন । এখন তাঁর শত্রু ঠ্যালা সামলান । প্রতিদ্বন্দ্বীকে জব্দ করতে গিয়ে বিস্তর খরচ করতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু তাতেও তিনি পেছ্-পা হননি ।

'চমৎকার !' কোল্ডেরুপ ব'লে উঠলেন, 'আমার মাথায় কক্খনো এই ফন্দি খেলতো না ।'

'কিন্তু ও-সব জন্তুর জন্যে যে দ্বীপটায় গিয়ে আর থাকাই যাবে না,' বললে ফিনা ।

'ব'য়ে গেলো ! শেষ সিংহটা একেবারে শেষ বাঘটা খেয়ে না-ফেলা অব্দি আমরা না-হয় অপেক্ষাই ক'রে থাকবো,' বললেন উইল-মামা ।

'তারপরে ফিনা যাবে তো আমার সঙ্গে দ্বীপটায়–কিছুদিন গিয়ে থেকে আসবো,' জিগেশ করলে গডফ্রে ।

'তোমার সঙ্গে থাকলে, স্বামীমশাই, আমি কোত্থাও যেতে ভয় পাই না,' ফুরফুরে গলায় ফিনা মরগান ব'লে উঠলো ।

ট্রিবুলেশন্‌স অভ এ চাইনিজ জেণ্টলম্যান

১

জ্যোৎস্না রাতের প্রথম প্রহর

ব'সে ছিলো ছয় জনে : সান্ধ্য ভোজ চলেছে ; মারবেল পাথরের চেয়ারের হাতলে কনুই ঠেকিয়ে পদ্মমূলের টুকরো ঠোকরাতে-ঠোকরাতে বললো একজন, 'যা-ই বলো, বেঁচে থাকার মধ্যেও কিন্তু দিব্য সুখ আছে ।'

'তা আছে বৈকি, তবে দুঃখও অনেক,' হাঙরের ডানা গলায় বেঁধে গিয়ে কাশছিলো একজন, অনেক কষ্টে কাশির দমকের হাত থেকে রেহাই পেয়ে সে বললো ।

'তাহ'লে দার্শনিক হ'য়ে যাও,' এদের মধ্যে একজন ছিলো বয়স্ক, কঠোর রিম-ওলা মস্ত চশমা তার চোখে ; সে উপদেশ দিলে, 'তাহ'লে দার্শনিকের মতো কোনো উচ্চবাচ্য না-ক'রে জীবন যা দেয়, তা-ই গ্রহণ করো ; আজ কেশে-কেশে তোমার দমবন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, কাল এই সোমরসের মতো দেখবে কোথায় উধাও হ'য়ে গেছে সেই অস্বাচ্ছন্দ্য । জীবন এই রকমই !' ব'লে সে আস্ত এক পাত্রভর্তি মদ ঢেলে দিলো গলায় ।

'আমার কথা যদি বলো,' চতুর্থ একজন মন্তব্য করলে সুচিন্তিত, 'আমার তো বেঁচে থাকতে দিব্যি লাগে—বিশেষ ক'রে যদি প্রচুর টাকাকড়ি থাকে, আর যদি কোনো কাজ-কারবার করতে না-হয়।'

'উঁহু, ঠিক তার উলটো,' পঞ্চমজন তার মত ব্যক্ত করলে, 'সত্যিকার সুখ কিন্তু হাড়ভাঙা খাটুনি আর দিবারাত্রি অধ্যয়নের মধ্যেই ; সুখ পেতে হ'লে তোমাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে ।'

'আর শেষকালে এই পরম দিব্যজ্ঞান লাভ হবে যে কিছুই তোমার জানা নেই ।'

'তা এই বোধ থেকেই কি বোধির জন্ম হয় না ? এটাই তো সূচনা —'

'এই যদি সূচনা হয় তো শেষ কোনখানে ?'

'বোধির আবার শেষ কী ? জ্ঞানের আবার কোনো সীমা আছে নাকি ?' চশমাধারী জানালো, 'তবে তোমার যদি যৎসামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকে তাহ'লেই তৃপ্তি আর সন্তোষের অভাব থাকবে না ।'

'আর এ-বিষয়ে আমাদের গৃহকর্তার অভিমত কী ? জীবনকে তাঁর কী মনে হয় ? সুখসমৃদ্ধির আনন্দমেলা, না দুঃখকষ্টের জ্বরজ্বালা ?' গৃহস্বামী যথারীতি টেবিলের মাথায় বসেছিলো, তাকে উদ্দেশ ক'রে প্রথম ব্যক্তি এই প্রশ্ন রাখলো এবার ।

গৃহকর্তা এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলো ; একটু যেন আনমনা, এ-সব অহেতুক তর্কে তার যেন মন নেই, তরমুজের বিচি ঠোকরাতে-ঠোকরাতে সে যেন অন্য কোনো কথা ভাবছিলো এতক্ষণ । এবার সোজাসুজি তাকেই জিগেশ করায় সে কেবল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে

একটি আওয়াজই বের করলো মুখ দিয়ে : 'ফুঃ !'

এখন, 'ফুঃ' শব্দটা সব ভাষারই অন্যতম মূল্যবান সম্পত্তি ; এমনিতে ছোট্ট একখানা এক-অক্ষুরে শব্দ হ'লে কী হবে, তার থেকে অনেক রকম অর্থ বের করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে এটা যেন তাঁর পাঁচ জন অতিথির মধ্যে কোনো তুমুল তর্ক শুরু ক'রে দেয়ার সংকেত হিশেবে কাজ করলো ; প্রত্যেকেই অত্যন্ত উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠে নিজের-নিজের মতের সপক্ষে প্রচুর বাকতাল্লা শুরু ক'রে দিলো, আর মাঝে-মাঝে প্রত্যেকেই একটু থেমে গিয়ে এ-বিষয়ে তাদের গৃহকর্তার মত কী জানতে চাইলো ।

গৃহকর্তা অবিশ্যি বেশ-কিছুক্ষণ আর-কোনো বাক্যব্যয় করা থেকে বিরত রইলো । কিন্তু অবশেষে সে এই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হ'লো যে বেঁচে-থাকা সম্বন্ধে তার কোনো বক্তব্য নেই : জীবন তার কাছে আমোদের প্রস্রবণ নয়, দুঃখের নির্ঝরও নয়—সুখদুঃখের কোনো অনুভূতিই জীবন তাকে দেয় না ; জীবনকে তার কাছে কোনো অতিতুচ্ছ প্রতিষ্ঠান ব'লে মনে হয় ; জীবনকে হাজার নিংড়েও কোনো তীব্র আনন্দের অনুভূতি ভোগ করা যাবে ব'লে তার নাকি মনে হয় না ।

শুনে শ্রোতাদের মধ্য থেকে সমস্বরে বিস্ময়ের ধ্বনি উত্থিত হ'লো ।

'শোনো, ওর কথা শোনো একবার !' বললো একজন ।

'কোনো পদ্মপাতাও জীবনে যার আরাম নষ্ট করেনি, তার মুখের কথা শোনো তোমরা,' আরেকজন বললে ।

'আর এত অল্প বয়েস তার, এখনো—'

'শুধু যে তরুণ তা নয়, দিব্য আছে—সুস্থ, ধনী, স্বাস্থ্যবান—'

'ঐশ্বর্যের যার কোনো পরিমাণ নেই—'

'বোধহয় একটু বেশি ধনী, আর তাইতেই এই গণ্ডগোল ।'

এবংবিধ মন্তব্যও গৃহকর্তার ভাবলেশহীন মুখে স্মিত হাসির কোনো ঝাপশা রেখাও ফুটিয়ে তুলতে পারলো না । কেবল অসহায় ভঙ্গি ক'রে কাঁধ ঝাঁকালো সে একবার ; ভঙ্গিটা তার এ-রকম, যেন জীবনখাতার পাতার দিকে চোখ চেয়ে দেখারও মেজাজ নেই তার, যেন কোনো তাড়াও নেই পাতা উলটে হুড়মুড় ক'রে বিষয়টা দেখে নেবার ।

বয়েস তার একত্রিশ । নিখুঁত তার স্বাস্থ্য, অজস্র তার বিত্তসম্পদ ; রুচি বা সংস্কৃতির অভাব থেকে যে তার মন নিঃসাড় হ'য়ে গেছে তা নয় ; আর যদি মেধা আর বুদ্ধির কথা ওঠে তো বলতে হয় যে সে সাধারণ লোকের চেয়ে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বেই সে স্থান পাবে । এই মরলোকের যাবতীয় জীবদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী মানুষ না-হবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ তার নেই ।

এই হৈ-চৈ এর মধ্যে তখন দার্শনিকের গম্ভীর গলা শোনা গেলো, যেন কোনো প্রাচীন কোরাসের মধ্যে দলনেতার গলা বেজে উঠেছে : 'শোনো হে ছোকরা, নিজেকে যদি তোমার সুখী ব'লে মনে না-হয় তো এটা জেনে নাও যে এতকাল তোমার সুখের চরিত্র ছিলো নেতিমূলক ; স্বাস্থ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য— এ-সব ভোগ করার জন্য এক-আধবার তাদের থেকে বঞ্চিত হওয়াও ভালো । কিন্তু তোমার আবার কখনো একফোঁটাও অসুখ করেনি ; দুর্ভাগ্য কাকে বলে তা তুমি জানো না ; সেই জন্যেই আবারও বলছি, কোন বিপুল আশীর্বাদ তুমি

লাভ করছো, তা অনুধাবন করার কোনো ক্ষমতা তোমার নেই ।' দামি জাতের ঝলমলে শ্যাম্পেন ঢেলে গেলাশ ভ'রে নিলে সে, তারপর গেলাশটা তুলে ধ'রে বললে, 'বন্ধুগণ, এসো, আমরা কামনা করি, "অচিরেই যেন আমাদের গৃহস্বামী কোনো দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েন— তাঁর ঝলমলে জীবনে শিগগিরই যেন কোনো গভীর ছায়াপাত ঘটে ।" '

অভ্যাগতদের হাতের গেলাশগুলি নিঃশেষ হ'য়ে গেলো । গৃহকর্তা কেবল সামান্য মাথা হেলিয়ে তাদের কামনাকে স্বীকৃতি দিলে, তারপর আবার তার স্বাভাবিক নির্বেদে তলিয়ে গেলো ।

এবার হয়তো কেউ জিগেশ করতে পারেন এই বাণীবিনিময় হচ্ছিলো কোথায়—সে কি পারীতে, লণ্ডনে, হ্বীন-এ, না কি সেণ্টপিটার্সবুর্গে ? ইওরোপের কোনো রেস্তোরাঁয় ব'সে, না কি নতুন মহাদেশ আমেরিকার কোনো হোটেলে গিয়ে এরা উৎফুল্লভাবে পানাহার সমাধা করছিলো ? একটা জিনিশ অবশ্য নিশ্চিত আন্দাজ করা যাচ্ছে ; এরা কেউই ফরাশি নয়, কারণ এতাবৎকাল কেউই রাজনীতি নিয়ে কোনো কথা উচ্চারণ করেনি ।

কুঠুরিটা মস্তও নয়, আবার একেবারে ছোটোও নয়, মাঝারি মাপের—কিন্তু চমৎকার সাজানো । নীল আর কমলা রঙের জানলার কাচের মধ্য দিয়ে অস্ত সূর্যের রশ্মিগুলি ঝিলিক দিচ্ছে ; তিন দিক থেকে যাতে আলো-বাতাস আসতে পারে, কুলুঙ্গিওলা তেমনি কতগুলো বিশেষ জানলা আছে ঘরটিতে ; সন্ধ্যাবাতাসে কুলুঙ্গির ফুলের ঝালরগুলিতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে, আর ঝাড়লণ্ঠনের ভিতর থেকে হালকা আলোর রেখা বেরিয়ে এসে দিনের শেষ আলোর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে । জানলার উপর কাচের পরদার গায়ে কোনো অতিকায় ও আশ্চর্য জগতের নানান দৃশ্য আঁকা—ভাস্কর্যের নানা নিদর্শনেতে সেই অসম্ভব জগতেরই আভাস পাওয়া যায় । রেশমি কাপড়ের ঝালর ঝুলছে উপর থেকে, দেয়ালে দ্বিতল-সব আয়না বসানো । কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে একটি টানা পাখা, আর অলংকৃত সেই মশলিনের পাখা ছন্দোময়ভাবে দুলে-দুলে ভ্যাঁপশা, বুকে-চেপে-বসা, গরমকে হঠিয়ে দেবার চেষ্টা করছে ।

টেবিলটি আয়তাকার, কালো লাক্ষার তৈরি ; কোনো টেবিল-ঢাকনি নেই টেবিলের উপর ; পোর্সেলেন আর রুপোর বাসন-কোশনের স্পষ্ট প্রতিভাস দেখা যায় টেবিলের গায়ে, যেন টেবিলটা কোনো মস্ত স্ফটিক দিয়ে তৈরি ।

ন্যাপকিনের বদলে প্রত্যেককে নানা রকম ছবি-আঁকা পাৎলা চৌকো-চৌকো কাগজের টুকরো দেয়া হয়েছে । টেবিলের চারপাশে গোল ক'রে বসানো সব কালো মারবেল পাথরের চেয়ার ; কুশান-বসানো অন্য-সব লাউন্‌জের চেয়ে এখানকার আবহাওয়ায় এ-সব চেয়ারই বেশি আরামপ্রদ ।

শান্ত একদল তরুণী দাঁড়িয়ে আছে আদেশের অপেক্ষায় ; কালো খোঁপায় তারা গুঁজেছে লিলি আর চন্দ্রমল্লিকা ; সোনার বালা আর চুড়ি প'রে আছে তারা হাতে ; নরম তাদের কাজ করার ভঙ্গি, স্মিতমুখে চটপট তারা থালা বা রেকাবি সরিয়ে ফ্যালে একহাতেই, যাতে আর-কেউ পাখা নেড়ে হাওয়া করতে পারে অতিথিদের ।

পুরো ভোজসভাটাই যেমনভাবে সমাধা হ'লো তার চেয়ে সুন্দরভাবে আর কিছুতেই অতিথি-সংবর্ধনা করা যেতে পারে না । সরাইখানার মালিক বোধহয় জানতো যে সে অভিজাত ভোজনরসিকদের আপ্যায়ন করতে যাচ্ছে, তাই খাদ্যতালিকার নানা সুখাদ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে

সে আজ এমনকী নিজের পূর্ব-খ্যাতিকেও ম্লান ক'রে গেছে ।

প্রথমে সে পরিবেষণ করলে চিনির পিঠে, ক্যাভিয়ের, একরকম ডিমের খাদ্য, ফড়িংভাজা, শুকনো ফল, আর নিং-পো ঝিনুক । তারপরে ক্ষণিক বিরতি দিয়ে একটু পরে-পরে পরিবেষণ করা হ'লো ঘিয়ে-সেদ্ধ হাঁস-পায়রার ডিম, ডিমের কুসুমে ভাজা সোয়ালো, মিষ্টি চাটনি-মাখানো তিমি মাছের কলজে, টাটকা জলের ব্যাঙাচি, ভাজা কাঁকড়ার দাঁড়া, চড়ুই পাখির দু-নম্বর পাকস্থলি, রশুনঠাশা ভেড়ার চোখ, দুধে-চোবানো মুলোর সঙ্গে খুবানির শাঁস, সিরাপে-ডোবানো বাঁশের মূল, আর মিষ্টি সালাদ । সব শেষে পরিবেষণ করা হ'লো সিঙাপুরের আনারস, চিনেবাদাম, নুন-মাখা কাজুবাদাম, রসে ভরা পক্ক আম, কোয়াংতুঙের কমলা । আর সেই সঙ্গে পানীয় ছিলো বিয়ার, শাও-শিগনের সোমরস, আর রাশি-রাশি শ্যাম্পেন । ফল-মিষ্টির পরে ভাত এলো, অতিথিরা ছোটো-ছোটো সরু-সরু কাঠের চামচে বা চপস্টিক দিয়ে তা মুখে তুললো ।

ভোজপর্ব সমাধা হ'তে তিন ঘণ্টা লাগলো । অবশেষে খাদ্যসম্ভার শেষ হ'লো ; ইওরোপীয় ভোজসভার মতোই, অপর্যাপ্ত, গোলাপজল পরিবেষণ করা হ'লো কুলকুচো করার জন্য, তারপর পরিচারিকারা ভাপ-ওঠা গরম জলে চোবানো ন্যাপকিন নিয়ে এলো, আর অতিথিরা পরম পরিতোষের সঙ্গে ওই তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিলো ।

এর পরে আরাম ক'রে হেলান দিয়ে ব'সে সবাই গীতবাদ্য উপভোগ করতে বসলো । ঘরে ঢুকলো একদল সুন্দরী তরুণী, সুন্দর ক'রে সাজা, পরিচ্ছন্ন ও রুচিমণ্ডিত—এরাই গাইবে আর বাজাবে । তাদের গীতবাদ্যে অবশ্য কোনো সমতান বা সুরলালিত্য ছিলো না ; কিছু চীৎকার, স্ফুট-অস্ফুট আওয়াজ, গলাফাটা চ্যাঁচামেচি—তাতে না-আছে ছন্দ, না-বা আছে তাল—এই নাকি তাদের সংগীত ! বাদ্যযন্ত্রগুলি এই সমতানেরই যোগ্য সংগত : তার-ছেঁড়া তম্বুরা, বেসুরো বেহালা, সাপের চামড়া-ঢাকা কর্কশ গিটার, তীক্ষ্ণ বাঁশি—কোনোটার থেকেই কোনো সুরেলা আওয়াজ বেরুলো না ।

তরুণীদের ঘরে নিয়ে এসেছিলো একটি লোক, সে-ই এই লাস্যময় জলশার নেতা ; গৃহকর্তার হাতে প্রথমেই সে একটি প্রোগ্রাম তুলে দিয়েছিলো, আর গৃহকর্তা তাকে যথেচ্ছ প্রমোদ বিতরণের অনুমতি দিলে প্রথমেই সে তার অর্কেস্ট্রাকে 'দশ ফুলের তোড়া' সুরটি বাজাতে বলেছিলো—হালফিলের ফ্যাশান অনুযায়ী সেটাই তখন সবচেয়ে প্রিয় সুর । সেটা শেষ হ'লে আরো কতগুলি ওই জাতেরই হালফ্যাশানের গান শোনালে তারা, অবশেষে তাদের জলশা শেষ হ'লে—আগেই তাদের প্রচুর অর্থ দেয়া হয়েছিলো—শ্রোতৃগণ সোৎসাহে করতালি দিয়ে বিদায় জানালে তাদের, আর তারা, অন্য শ্রোতাদের কাছ থেকে আরো হাততালি পাবার আশায়, একে-একে প্রস্থান করলো ।

জলশা শেষ হ'য়ে যেতেই আসন ছেড়ে উঠলো অতিথিরা, তারপর পরস্পরের মধ্যে কিছু ভদ্রতাবিনিময়ের পর আরেকটা টেবিলে গিয়ে বসলো । আধডজন ঢাকনি-বসানো পেয়ালা ছিলো এই টেবিলে—প্রত্যেকটি পেয়ালাতেই বোধিসত্ত্বের প্রতিচ্ছবি আঁকা—তাঁর সেই কিংবদন্তির চাকার উপর দাঁড়িয়ে আছেন এই বৌদ্ধ ভিক্ষু । পেয়ালা-ভর্তি ফোটানো জল ; এবার প্রত্যেককেই চা-পাতা দেয়া হ'লো ; যে-যার পেয়ালায় চা-পাতা দিয়ে, চিনি ছাড়াই, সেই চায়ের জল ঢোকে-ঢোকে গলাধঃকরণ ক'রে নিলে । এ কি যে-সে চা ! সরাসরি গিব,

গিব অ্যাণ্ড কম্পানির গুদোম থেকে আনানো—ভেজাল মেশানো চা—এ-কথা বলার কোনো সুযোগই নেই ; চায়ের রাজা বলা যায় একে ; বিশুদ্ধ, বহিঃপ্রভাবহীন এই চা-পাতা—সদ্যফোটা দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ি তুলে নেয় দস্তানা-পরা বালক-ভৃত্যেরা, আর একটি কুঁড়ি ফুটলেই সে-গাছ ম'রে যায় ব'লে এই চা অতি দুর্লভ সামগ্রী ব'লে গণ্য হয় ।

তার সুগন্ধ আর স্বাদ দেখলে যে-কোনো লোকই অভিভূত হ'য়ে যেতো, কিন্তু এরা সবাই শমঝদার ভোক্তা, আস্তে এক-একটা চুমুক দেয়, সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে স্বাদ নেয় তার, আস্তে ঢোক গেলে, তারপর আবার একটা চুমুক দেয় । এরা সবাই সম্ভ্রান্তবংশের পুরুষ, আভিজাত্যমণ্ডিত ; পরনে মূল্যবান 'হুন-শাওল' বা পাৎলা শার্ট, 'মা-কোয়ালা' বা ছোট্ট শিরো-বসন, 'হাওলট' বা পাশে বোতাম-লাগানো লম্বা ঢোলা কামিজ । পায়ে হলদে চটি, আর পাৎলা মোজা, মোজার উপর থেকে উঠে গেছে রেশমি আঁটো পাজামা, কোমরের কাছে জরির কাজ-করা রেশমি কোমরবন্ধ দিয়ে বাঁধা ; আর তা থেকে ঝুলছে সুন্দর কাজ-করা নানা বর্ণ ঝালর ; বুকের উপর তারা লাগিয়েছে সূক্ষ্ম কাজ-করা রেশমের উদর-বসন ।

এই বর্ণনার পরে এই কথা বলা নিশ্চয়ই বাহুল্য যে এরা সেই দেশেরই বাসিন্দে যেখানে প্রতি বছর চা-বাগান থেকে সুগন্ধি পাতা তোলার উৎসব হয় । তাদের কাছে ভোজসভার খাদ্য-তালিকায় হাঙরের কানকো, তিমিমাছের কলজে, ভাজা ফড়িং বা টাটকা-জলের ব্যাঙাচি কোনো নতুন সুখাদ্য নয়, এমনকী যে-রুচিসম্মত আভিজাত্যের সঙ্গে এ-সব পরিবেষণ করা হয়েছে, তাও এদের কাছে নতুন-কিছু নয় । কিন্তু খাদ্যের রেকাবি বা ভোজসভার কোনো উপকরণেই যারা এতক্ষণ কোনো বিস্ময় প্রকাশ করেনি, গৃহস্বামী যখন বললো যে তাদের কাছে তার কিছু বক্তব্য আছে, তারাই তখন অতিমাত্রায় বিস্মিত ও উচ্চকিত হ'য়ে উঠলো ।

পেয়ালাগুলো আবার চায়ে ভরা হ'লো । নিজের পেয়ালাটা মুখে তুলে টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে, শূন্যের দিকে তাকিয়ে গৃহকর্তা তার বক্তব্য শুরু করলে : 'আমার কথা শুনে তোমরা হেসো না, কিন্তু এবার আমি আমার জীবনে একটা নতুন উপাদান আনতে চাচ্ছি । তার ফল ভালো হবে কি মন্দ হবে জানি না, শুধু ভবিষ্যৎই এ-বিষয়ে কিছু বলতে পারে । সান্নিধ্য দিয়ে তোমরা আজকের যে-সান্ধ্যভোজকে অনুগৃহীত করেছো, কুমার হিশেবে এটাই আমার শেষ আমন্ত্রণ ! আর পক্ষকালের মধ্যেই আমি বিয়ে করবো !'

'বিবাহিত আর সুখী ! নরকুলের সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি !' অভ্যাগতদের মধ্যে যে-আশাবাদী ছিলো, সে ব'লে উঠলো, 'দ্যাখো, বন্ধু, সমস্ত লক্ষণই তোমার সৌভাগ্য ইঙ্গিত করছে,' আঙুল তুলে দেখালো সে কেমন ক'রে ঝাড়লণ্ঠনের পাণ্ডুর আলোয় সব কী-রকম মোলায়েম দেখাচ্ছে, দেখালো বাঁকা জানলার কুলুঙ্গিতে ম্যাগপাইরা কেমন কিচির-মিচির করছে, আর কেমন লম্বমানভাবে চা-পাতাগুলো ভাসছে চায়ের পেয়ালায় ।

পরক্ষণেই সমস্বরে অভিনন্দন জানালো সবাই ; গৃহকর্তা কিন্তু অবিচল ও শান্তভাবে সব অভিনন্দন গ্রহণ করলে । এই কথাটা তার মাথায় ঢুকলো না যে মহিলাটির পরিচয় দেয়া উচিত তার, আর অন্য-কেউ তার সেই আনমনা ভাব ভাঙাবার সাহস পেলে না । কেবল দার্শনিক ব্যক্তিটিই এদের এই অভিনন্দনের ঐকতানে যোগ দেয়নি ; সে চুপচাপ ব'সে ছিলো দু-হাত ভাঁজ ক'রে ; চোখ দুটি তার আধবোজা ; ঠোঁটের ফাঁকে ব্যঙ্গের স্মিত ছোপ ; যেন বিনামূল্যে এ-রকম অভিনন্দন জ্ঞাপনের বিরুদ্ধে তার কোনো বক্তব্য আছে ।

গৃহকর্তা তার দিকে তাকালো একটু, তারপর নিজের আসন ছেড়ে উঠে তার দিকে এগুতে-এগুতে বললে, 'তোমার কি মনে হয় আমার বয়েস খুব বেশি ? বিয়ে-করা উচিত নয় ?' এতক্ষণ তার কথায় কোনো আবেগের ছাপ দেখা যায়নি, কিন্তু এবার তার গলা একটু কেঁপে গেলো ।

'না ।'

'তাহ'লে কি বিয়ে-করার পক্ষে খুব কম বয়েস ?'

'না ।'

'কোনো ভুল করছি নাকি তাহ'লে ?'

'সম্ভবত করছো ।'

'জানো, আমাকে সুখী করার মতো সব গুণই মেয়েটির আছে ?'

'খুব সত্যি ।'

'তাহ'লে মুশকিলটা কিসের ?'

'মুশকিলটা তোমার নিজের মধ্যে !'

'আমি কি কোনো দিনই সুখী হবো না ?'

'অসুখী হওয়া কাকে বলে তা না-জানা পর্যন্ত কোনোদিনই হবে না ।'

'কিন্তু আমি যে দুর্ভাগ্যের চৌহদ্দির বাইরে—'

'তাহ'লে তোমার আর-কোনো উদ্ধার নেই ।'

'বাজে কথা ! সব বাজে কথা !' এদের মধ্যে সব চেয়ে যার বয়েস কম, সে তীব্র স্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠলো । 'ওই দার্শনিকের কথাগুলি সব তত্ত্বকথার গ্যাঁড়াকল ! ওর মাথায় সারাক্ষণ সব তত্ত্বকথা ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর কী সব তত্ত্বকথা—সব বাজে বস্তাপচা ! বন্ধু হে, বিয়েটা ক'রেই ফ্যালো ; যত তাড়াতাড়ি পারো বিয়ে করো । আমি নিজেই করতুম অ্যাদ্দিনে, কিন্তু একবার একজনের কাছে একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেলেছিলুম, তাতেই আটকাচ্ছে ! আমরা তোমার স্বাস্থ্য পান করবো । তোমার সুখ-সৌভাগ্য যেন কোনোদিনই না-ফুরোয় !'

'আমি কেবল আমার আশাটাই ব্যক্ত করতে পারি,' দার্শনিকের প্রত্যুত্তর এলো, 'যেন কোনো দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে অবশেষে ওর কাছে সুখ আসে ।'

গৃহকর্তার স্বাস্থ্য পান করলো তারা ; তারপর অতিথিরা আসন ছেড়ে উঠে ঘুষি মারার ভঙ্গিতে হাত মুঠো ক'রে মুষ্টিবদ্ধ হাত কপালে তুলে মাথা নুইয়ে অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলে ।

কুঠুরিটির বর্ণনা, অদ্ভুত ভোজ্যতালিকা, আর অতিথিদের বসনভূষণ ও বিদায়গ্রহণের ভঙ্গি থেকে এটা নিশ্চয়ই চট ক'রে বোঝা যাবে যে এখানে যে-চৈনিকদের কথা বলা হচ্ছে, তারা ঠিক সাধারণ সেইসব চৈনিক নয়, কাগজের পরদা বা পুরোনো পোর্সেলেনের বাসন-কোশন থেকে যারা হঠাৎ বেরিয়ে আসতে পারে । বরং এরা আধুনিক চিন-সাম্রাজ্যের লোক-ইওরোপের সান্নিধ্যে এসে শিক্ষা, ভ্রমণ ও ভাব-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে যারা প্রতীচীর সভ্যতার নানা আদবকায়দা গ্রহণ ক'রে নিয়েছে । আসলে কোয়াংতুঙের মুক্তোনদীর এক প্রমোদতরীর সেলুনে বসেছিলো তারা এতক্ষণ—বজরাটার মালিক বিত্তশালী কিন-ফো ; দার্শনিক ওয়াং-

এর সঙ্গে হরিহরভাব—অচ্ছেদ্য তাদের বন্ধুতা ; এতক্ষণ তারা দুজনে তাদের ছেলেবেলার চারবন্ধুকে আপ্যায়ন করছিলো ; তাদের একজন হ'লো পাও-শেন, চতুর্থ শ্রেণীর এক মান্দারিন, তার গাঢ়-নীল বল থেকেই তা বোঝা যায় ; আরেকজনের নাম ইন-পাং অ্যাপোথেকারি স্ট্রিটের এক ধনী রেশম-বিক্রেতা সে ; তৃতীয়জনের নাম টিম, ফুর্তিবাজ, হাসিখুশি, আমোদ-প্রমোদই তার সর্বস্ব ; আর চতুর্থজনের নাম হো-ওয়াল—কবি ও সাহিত্যিক।

এই ভাবেই চতুর্থ চাঁদের সপ্তবিংশতি দিবসের পাঁচ প্রহরের প্রথমটি কেটে গেলো, আর সন্ধ্যা ঢ'লে পড়লো দ্বিতীয় প্রহরে—রোমান্টিক চিনে রাত্রির দ্বিতীয় যামে।

২

কে, কী, কবে, কোথায়

কোয়াংতুঙে এই বিদায়ভোজের ব্যবস্থা করার বিশেষ কারণ ছিলো কিন-ফোর। তার বাল্য ও কৈশোর কেটেছিলো কোয়াংতুঙের রাজধানীতে, আর সে ছিলো ধনী আর হাত-খোলা, ফলে তার বন্ধুসংখ্যা নেহাৎ কম ছিলো না। তার ইচ্ছে ছিলো চ'লে যাবার আগে বন্ধুদের সে শুভেচ্ছা জানায়। কিন্তু জীবন তার বন্ধুদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় চ'লে গেছে তারা জীবিকার সন্ধানে ; থাকার মধ্যে ছিলো কেবল এই চার জন, যারা তার এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে। কিনফো-র বাড়ি আসলে শাংহাই ; কোয়াংতুঙে সে এসেছিলো হাওয়া বদলাতে—মাত্র কয়েক দিনের জন্য ; সেই রাতেই স্টিমবোটে ক'রে তার বেরিয়ে পড়ার কথা—এই স্টিমবোট সব বড়ো-বড়ো বন্দরেই থামে—কয়েক দিন ঘুরে অবশেষে নিজের আস্তানায় সে ফিরে যাবে, এই ছিলো তার পরিকল্পনা।

স্বভাবতই দার্শনিক ওয়াং-ও তার সঙ্গী হয়েছিলো ; তাকে বলা যায় কিনফোর মাস্টারমশাই, ক্বচিৎ সে তার ছাত্রকে একা রেখে বেরোয়। টিম যখন তাকে 'তত্ত্বকথার গ্যাঁড়াকল' বলেছিলো তখন সে বলতে গেলে চাঁদমারিতেই তীর বিঁধিয়ে দিয়েছিলো ; কারণ সুযোগ পেলে ওয়াং কিছুতেই পণ্ডিতিয়ানা দেখাতে ছাড়ে না—বড়ো-বড়ো আপ্তবাক্য আওড়ায় সর্বদা, যদিও এ-কথাটা বলা ভালো যে শান্ত গম্ভীর ও বিমনা কিন-ফোর উপর তার প্রভাব দেখা যায় যৎসামান্যই।

কিন-ফো অত্যন্ত সুপুরুষ ; উত্তরের চিনে সে, তাতারদের সঙ্গে কোনোদিনই তাদের রক্ত মিশে যায়নি। তার বাবা-মার ধমনীতে একফোঁটাও তাতার রক্ত ছিলো না, যেটা দক্ষিণে একেবারেই কল্পনাতীত—দক্ষিণের লোকেরা ধনীগরিব নির্বিশেষে মাঞ্চুদের সঙ্গে দো-আঁশলা হ'য়ে গিয়েছিলো। কিন-ফো লম্বা ও সুগঠিত ; গাত্রবর্ণ পীত নয়, বরং গৌর ; চোখের উপর ভুরুযুগল যেন সমান্তরালভাবে বসানো, যদিও কপালের কাছে গিয়ে একটু উপর দিকে তাকিয়েছে ; খাড়া নাক, অর্থাৎ তাকে দেখে প্রাচী ও প্রতীচীর সবাই সুপুরুষ বলতে বাধ্য

হবে । মাথাটি তার ঠিক একেবারে ঘাড়ের উপর বসানো—গ্রীবা যাকে বলে তা যেন প্রায় নেই, আর এটাই বোঝায় যে সে আসলে চৈনিক ; চকচকে কালো চুলের বেণী সাপের মতো প'ড়ে আছে তার পিঠে । আধাবৃত্তের আকারে সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা দেখা যায় তার ঠোঁটের উপর, যেন কোনো স্বরলিপির মধ্যে শমের ইঙ্গিত । আঙুলে বড়ো-বড়ো নখ, প্রায় আধ ইঞ্চি বড়ো হবে : তাকে যে নিজের হাতে কোনো কাজই করতে হয় না, নখগুলো আসলে তারই সাক্ষী ; যদিও তার চেহারা দেখেই এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সে যাকে বলে মস্ত বড়োলোক ।

তার জন্ম হয়েছিলো পেইচিঙে । পেইচিঙে জন্ম হ'লে গর্বের আর সীমা থাকে না কারু, লোকে বলে যে 'উপর থেকে' এসেছে । ছ-বছর বয়েস পর্যন্ত পেইচিঙেই ছিলো কিন-ফো, তারপর তাদের পরিবার শাংহাই চ'লে আসে ।

তার বাবা চুং-হৌ উত্তরের অভিজাতদের একজন, এবং স্বদেশীদের অনেকের মতোই বণিকবৃত্তিতে তাঁর প্রবণতা ও ক্ষমতা ছিলো প্রচুর । জীবনের প্রথম ভাগে তাঁর দেশের এমন-কোনো মূল্যবান সামগ্রী ছিলো না, যা তাঁর ব্যাবসার অন্তর্ভূত ছিলো না : সোয়াচৌ-এর কাগজ, সু-চুর রেশম, ফরমোজার চিনি, হান-কৌ আর ফু-চৌ-এর চা, হোনান-এর লোহা, ইয়েনান-এর তামা আর পিতল—সব ছিলো তাঁর বাণিজ্যের সামগ্রী । তাঁর প্রধান কারখানা বা 'কং' ছিলো শাংহাইতে, কিন্তু নানকিং, তিয়েনসিন, মাকাও আর হংকং-এও তাঁর শাখা-প্রতিষ্ঠান ছিলো । ইংরেজদের জাহাজে ক'রে তাঁর মাল সরবরাহ করা হ'তো, লিয়ঁতে রেশমের আর কলকাতায় আফিমের দর কত সে-খবর তাঁর কাছে রোজ তারবার্তায় যেতো ; অন্যান্য চিনে বণিকের সঙ্গে তাঁর নানা দিক থেকে তফাৎ ছিলো ; মান্দারিনের প্রভাব বা সরকারের চাপ এড়িয়ে তিনি বাষ্প ও বিদ্যুতের সাহায্য গ্রহণ করতে কশুর করেননি—কারণ তাঁর মনে হয়েছিলো এ-কালে বাষ্প আর বিদ্যুৎই প্রগতির বাহক ।

চুং-হৌ-এর ব্যাবসা এত ভালো চলেছিলো যে কেবল যে চিন সাম্রাজ্যের মধ্যেই তা সীমিত ছিলো, তা নয় ; শাংহাই, মাকাউ আর হংকং-এর ফরাশি, ইংরেজ, পোর্তুগিজ ও মার্কিন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর লেনদেন চলতো—আর যখন ছেলে কিন-ফোর জন্ম হ'লো, তখন তিনি ৪০০,০০০ ডলারের মালিক । পরে আমেরিকায় কুলি চালান দেবার ভার নিয়ে এই অর্থকে তিনি তিন-ডবল ক'রে তুলেছিলেন।

এ-কথাটা তর্কাতীত যে চিনের লোকসংখ্যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই—এত বড়ো দেশ, কিন্তু তাতেও কুলোয় না ; ৩৬০,০০০,০০০-এর চেয়ে কম হবে না লোকসংখ্যা : সারা জগতের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ । যদিও জগতের কাছে কোনো চিনের কামনা অতি সামান্য, তবু তাকে তো বেঁচে থাকতে হবে ; আর চিনদেশে প্রচুর ধান ও অন্যান্য নানা শস্য ফললেও তা লোকের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ; বিশাল জনসমষ্টিকে ফালতু ব'লে মনে হয় ; আর এই অতিরিক্ত লোকজনের সংখ্যা কমাবার উপায় বের করেছিলো ইংরেজ আর ফরাশিরা—চিনের প্রাচীর পেরিয়ে সারা জগতে তাদের ছড়িয়ে দেবার 'নৈতিক দায়িত্ব' নিয়েছিলো যেন তারা । দেশত্যাগের হিড়িক যখন পূর্ণবেগে এলো সব চেয়ে বেশি লোক গিয়েছিলো উত্তর আমেরিকায়, বিশেষ ক'রে ক্যালিফরনিয়া অঞ্চলে ; আর এত লোক সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলো যে আমেরিকার কংগ্রেস এই 'পীত মড়কে'র হাত থেকে

নিজেদের বাঁচাবার জন্য কতগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করতে বাধ্য হয়েছিলো ; কিন্তু শিগগিরই এই তথ্যটি আবিষ্কার হ'লো যে ৫০,০০০,০০০ লোকের মহাপ্রস্থানে চিন সাম্রাজ্যের যদিও বিশেষ-কিছু এসে যায় না, কিন্তু আমেরিকার মাটিতে ওই মোঙ্গোল বসতি শ্বেতাঙ্গদের রক্ত ও গাত্রবর্ণের বিশুদ্ধতা ধ্বংস ক'রে দেবে ।

কিন্তু তবু হাজার বিধিনিষেধ সত্ত্বেও চৈনিক অনুপ্রবেশ রোধ করা গেলো না । সব কাজেই কুলি লাগে, আর চৈনিক কুলি অল্পেতেই খুশি : রোজ একমুঠো ভাত, এক পেয়ালা চা আর খানিকটে তামাক পেলেই তুষ্ট ; তাছাড়া ক্যালিফরনিয়া, অরেগন, ভারজিনিয়া, সল্ট-লেকে তারা খুব কাজে এলো, শুধু তাই নয় মজুরদের পারিশ্রমিকও যথেষ্ট কমিয়ে দিলো । তাদের যাতায়াতের সুবিধের জন্য কম্পানি বসলো ; চিনে বসলো পাঁচটা, আর সান ফ্রান্সিসকোয় একটা । সেই সঙ্গে আরেকটা—তিং-তোং নামে একটা ছোটো প্রতিষ্ঠানেরও জন্ম হ'লো, তাদের দায়িত্ব হ'লো এদের আবার ফিরিয়ে আনা ।

এই তিং-তোং না-হ'লে কিছুতেই চলতো না । চিনেরা যদিও আমেরিকায় ভাগ্যান্বেষণে যেতে এক পায়ে খাড়া ছিলো, তবু এটা তারা চাইতো যে দৈবাৎ ওই বিদেশ-বিভুঁয়ে ম'রে গেলে তাদের মৃতদেহ যেন স্বদেশে এনে সৎকার করা হয় । চুক্তির মধ্যে এই কথাটা না-থাকলে কেউ ছেড়ে এক পা বাড়াতে চাইতো না ; আর তাই তিং-তোং নামে মৃত্যু-প্রতিষ্ঠানের জন্ম হ'লো, যাদের কাজ ছিলো ক্যালিফরনিয়া থেকে রাশি-রাশি মৃতদেহ এনে শাংহাই, হংকং আর তিয়েনসিনে পৌঁছে দেয়া ।

এই নতুন প্রতিষ্ঠানের অর্থলাভের দিকটা প্রথম যাদের চোখে পড়েছিলো তাদের মধ্যে উৎসাহী চুং-হৌ একজন । বিপুল উদ্যমে এই ব্যাবসায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি : ১৮৬৭ সালে যখন তাঁর মৃত্যু হ'লো তখন তিনি কোয়াং-তুং-এর তিং-তোং কম্পানিরই কেবল ডিরেক্টার নন, সান ফ্রান্সিসকোর তিং-তোং-এরও একজন পরিচালক হ'য়ে বসেছেন ।

চুং-হৌয়ের ব্যাবসাবুদ্ধি এত প্রখর ছিলো যে তাঁর মৃত্যুর পর কিন-ফো আবিষ্কার করলে যে ক্যালিফরনিয়ার সেনট্রাল ব্যাংকে তার নামে ৮০০,০০০ ডলার খাটছে । কিন-ফোর ব্যাবসাবুদ্ধি এটুকু ছিলো যে ওই টাকা ছোঁবার চেষ্টা সে করেনি । তার বয়স তখন মাত্র উনিশ, মা-বাবা কেউই বেঁচে নেই—শুধু যে একেবারে একা হ'য়ে পড়তো তা নয়, ব'খেও যেতো হয়তো, যদি-না তার অচ্ছেদ্য বন্ধু আর গুরু ওয়াং থাকতো । শাংহাই-এ তাদের বাড়িতে সতেরো বছর ধ'রে বাস করেছে ওয়াং ; পিতাপুত্র দুজনেরই বন্ধু ও মন্ত্রণাদাতা সে ; কোত্থেকে যে তার অভ্যুদয়, আর তার পূর্ব পরিচয়ই বা কী, তা বোধহয় চুং-হৌ আর কিন-ফোই কেবল বলতে পারতো, কিন্তু এমনকী তারাও এ-বিষয়ে কদাচ টুঁ শব্দ করেনি । বোধকরি সেই জন্যেই পরদা তুলে তার অতীতের দিকে উঁকি দেয়া ভালো হবে ।

চিনদেশে এটা সবাই ধ'রে নেয় যে কোনো পুনরুত্থিত আত্মা বহু সহস্র লোকের হৃৎপিণ্ডে অনেক বছর ধ'রে বেঁচে থাকে । নামজাদা মিং রাজবংশ তিনশো বছর ধ'রে নানা আন্দোলনের মধ্যেও টিকে ছিলো ; অবশেষে সপ্তদশ শতকে—১৬৪৪ সালে—রাজবংশের তদানীন্তন প্রতিভূ যখন আবিষ্কার করলেন যে তিনি শত্রুপক্ষের সঙ্গে একা এঁটে-ওঠার মতো বল ধরেন না, তখন তাতার সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন । তাতার সুলতান সুযোগ পেয়ে তক্ষুনি তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন, বিপ্লব প্রশমিত হ'লো, কিন্তু সেই দুর্বল মিং

রাজকে সরিয়ে দিয়ে এই সুযোগে তিনি স্বীয় পুত্র চুন-চিকে চিন সম্রাটের সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন।

সেই থেকে বহিরাগতদের হাতেই সব ক্ষমতা ; মাঞ্চুরাজেরাই তারপর থেকে চৈনিক সিংহাসনে বসেছেন একের পর এক। ধীরে-ধীরে নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে দুই জাতির রক্ত মিশে গেলো, বিশুদ্ধ চৈনিক রক্তের স্থান নিলে দো-আঁশলা নতুন এক জাতি ; কিন্তু উত্তরের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈনিক আর তাতারদের কিছুতেই আর মিশ্রণ ঘটলো না—বরং আরো স্পষ্ট ও দৃঢ় হ'লো বিভেদ ; এমনকী অদ্যাবধি কোনো-কোনো প্রদেশে অপসৃত মিং রাজবংশের অনুগত পরিবার দেখা যাবে।

আর এদেরই একজন ছিলেন কিন-ফোর বাবা। বংশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তিনি ; তাতারশক্তির বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ উত্থিত হ'লে তিনি নিশ্চয়ই কায়মনোবাক্যে তাকে সমর্থন করতেন। কিন-ফোও বাবার রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলো।

১৮৬০ সালে সম্রাট ছিলেন ৎসিয়েনফোং ; ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি ; সেই বছরই ২৫শে অক্টোবর পেইচিং চুক্তির দ্বারা সেই যুদ্ধের অবসান হয়। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত তিনশো বছর ধ'রে শাসককুলকে সব সময়ই প্রচণ্ড অভ্যুত্থানের ভয়ে-ভয়ে কাটাতে হয়েছে। চ্যাং-মৌ বা তাই-পিং বিদ্রোহীরা ১৮৫৩ সালে নানকিং দখল করেছিলো, তারও দু-বছর পরে অধিকার করেছিলো শাংহাই। ৎসিয়েনফোং-এর মৃত্যুর পর তাঁর তরুণ পুত্র প্রথমেই তাই-পিং বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হয়েছিলেন ; বড়োলাট লি আর ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল গরডনের সাহায্য ছাড়া যুবরাজ কং সিংহাসনে আরোহণ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তাতারদের জাতশত্রু তাই-পিংদের উদ্দেশ্য ছিলো ৎসিং রাজবংশকে উৎপাটিত ক'রে মিং রাজবংশের পুন:প্রতিষ্ঠা। অত্যন্ত সবল ছিলো তাই-পিঙেরা; চারটে বাহিনী ছিলো তাদের ; প্রথম বাহিনী ছিলো কালো নিশেনের দল : যাবতীয় গুপ্তহত্যার ভার ছিলো তাদের উপর ; দ্বিতীয় বাহিনীকে বলা হ'তো লালঝাণ্ডা বাহিনী : বিষয়-সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে ছারখার ক'রে ফেলার দায়িত্ব নিয়েছিলো তারা ; পীত পতাকার বাহিনীর কাজ ছিলো লুঠতরাজ ও দস্যুবৃত্তি ; আর চতুর্থ বাহিনীর পতাকা ছিলো শ্বেতবর্ণ, অন্য তিনটে বাহিনীর যথাযোগ্য পরিচালনার দায়িত্ব ছিলো তাদের। কিয়াং-সু প্রদেশে তাদের সামরিক প্রস্তুতি চলতো, শাংহাইয়ের নিকটবর্তী সু-চু আর কিয়াহিং ছিলো বিদ্রোহীদের দখলে ; তুমুল যুদ্ধের পরেই সম্রাটের ফৌজ তা পুনরুদ্ধার করতে পারে। ১৮৬০ সালের ১৮ আগস্ট এমনকী শাংহাই শুদ্ধু আক্রান্ত হয় ; ঠিক সেই মুহূর্তে আরো উত্তরে সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাশি বাহিনী জেনারেল গ্রান্ট ও মাঁতোবাঁর নেতৃত্বে পাই-হো নদীর কেল্লায় ঝটিকা আক্রমণ চালিয়েছিলো। চুং-হৌ তখন শাংহাই থাকতেন ; চৈনিক এঞ্জিনিয়াররা সু-চৌ নদীর উপর যে চমৎকার সেতু নির্মাণ করেছিলো তার পাশেই ছিলো তাঁর বাড়ি। বলাই বাহুল্য, বিদ্রোহীদের প্রতি গোপন মমতা ছিলো তাঁর।

১৮ তারিখে সন্ধেবেলায় ঠিক যখন বিদ্রোহীরা শহর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, চুং-হৌ-এর বাড়ির দরজা সশব্দে খুলে যায় এবং একটি উদ্‌ভ্রান্ত পলাতক এসে গৃহস্বামীর পায়ে আছড়ে পড়ে। অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই তার কাছে ; চুং-হৌ যদি তাকে সম্রাটের বাহিনীর কাছে

সমর্পণ করতেন, তাহ'লে তক্ষুনি তার প্রাণদণ্ড হ'তো। কিন্তু কোনো তাই-পিংকে বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে ধরিয়ে দেবার কথা চুং-হৌ স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে ভূলুণ্ঠিত আগন্তুকের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাকে আমি মোটেই চিনি না। কোত্থেকে এসেছো বা এতকাল কী করতে, সে-সবও আমি জানতে চাই না। আমার অতিথি ব'লে গণ্য করতে পারো তুমি নিজেকে। এখানে তোমার কোনো ভয় নেই।'

পলাতক ব্যক্তিটি তখন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, যেন একবিন্দু শক্তি নেই তার দেহে। ভাঙা-ভাঙা কথায় সে তার কৃতজ্ঞতা বর্ষণ শুরু করেছিলো, কিন্তু চুং-হৌ তাকে বাধা দিয়ে জিগেশ করেছিলেন, 'কী নাম তোমার।'

'ওয়াং,' উত্তর এলো।

'বাস, তাহ'লেই হবে! আর-কিছু আমি জানতে চাই না।'

কেউ যদি জানতে পারতো যে চুং হৌ এইভাবে ওয়াং-এর প্রাণ বাঁচিয়েছেন তাহ'লে তাঁরও কোনো রেহাই ছিলো না। চুং হৌ এ-কথা জানতেন, কিন্তু তবু ওয়াংকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিলেন না।

এর পর কিছুকালের মধ্যেই বিপ্লবীরা নির্মূল হ'য়ে গেলো; ১৮৬৪ সালে সম্রাটের বাহিনী নানকিং অবরোধ করলে তাই পিং সম্রাট বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

সেই-যে ওয়াং তার আশ্রয়দাতার বাড়িতে থেকে গেলো, তারপর আর-কোথাও গেলো না; আর কেউ তাকে তার অতীত জীবন নিয়েও কোনো প্রশ্ন করলো না। শোনা যায়, বিদ্রোহীরা নাকি অত্যন্ত নৃশংস ছিলো, নিষ্ঠুরতায় তাদের কোনো জুড়ি ছিলো না; তাই ওয়াং যে কোন পতাকার দলের লোক এটা স্পষ্ট ক'রে না-জানাই বোধকরি সবচেয়ে ভালো—তাহ'লে অন্তত এই আশা পোষণ করা যেতে পারে যে সে ছিলো শ্বেতপতাকার দলের পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম।

তা সত্য যা-ই হোক না কেন, এটা ঠিক যে এ-রকম বাড়িতে আশ্রয় পাওয়াটা ওয়াং-এর সৌভাগ্যের নজির, আর সেও উদ্ধারকর্তাদের বদান্যতার যথা সম্ভব প্রতিদান দেবার চেষ্ট করেছে সবসময়। মিশুক, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী—বন্ধু হিশেবে তার তুলনা হয় না; তাই পিতার মৃত্যুর পর কিন-ফো তাকে নিজের অচ্ছেদ্য বন্ধু ব'লেই গ্রহণ করেছে। পঞ্চান্ন বছর বয়সী এই নীতিবিদ ও কাঠের দাঁড়ের চশমা-পরা দার্শনিকের মধ্যে অতীতের তাই-পিংকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর: চৈনিকসুলভ একজোড়া গোঁফ আছে তার, হালকা রঙের ঢোলা আলখাল্লা পরনে, ভাবেভঙ্গিতে কেমন ঢিলেঢালা গোছের, মাথায় সূক্ষ্মকাজ করা ফারের টুপি; সব মিলিয়ে তাকে পণ্ডিত ব'লে মান্য না ক'রে যেন উপায় নেই—চিনে বর্ণমালার আশি হাজার অক্ষরই যেন তার নখদর্পণে, তাকে দেখলে এটাই মনে হয়; পেইচিঙের যে-প্রধান ফটক দিয়ে 'স্বর্গনন্দন'দের যাবার অধিকার, সেও যেন তাদেরই একজন। হয়তো চুং-হৌর শাদাশিধে ও সদয় সান্নিধ্যে এসে সেই কঠোর বিদ্রোহীটি একেবারে হারিয়ে গেছে, তার বদলে জন্ম নিয়েছে অতীব শান্ত, ভব্য, ধীরস্থির একজন প্রাজ্ঞ দার্শনিক।

সেদিন সন্ধেবেলায় ভোজসভা শেষ হ'য়ে গেলে কিন-ফো আর ওয়াং দুজনে মিলে শাংহাইতে ফিরে যাবার স্টিমারে ওঠবার জন্যে জেটির দিকে এগিয়ে গেলো। কিন-ফোকে

বড্ড চুপচাপ ও বিমনা দেখাচ্ছে ; ওয়াং আশপাশে উপরে-নিচে তাকিয়ে দেখছে ; কখনো তার চোখে জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে চাঁদের টুকরো, কখনো তারা ঝিকিয়ে উঠছে তার চোখের তারায় ; চিরশুদ্ধতার তোরণ পেরিয়ে এলো দুজনে চুপচাপ, পেরিয়ে এলো চির আনন্দের তোরণ, আস্তে চ'লে এলো পাঁচশো দেবতার প্যাগোডার ছায়া ঢাকা পথ দিয়ে ।

'পার্‌মা'টি তখন এঞ্জিন গরম ক'রে নিচ্ছে—রওনা হবে এক্ষুনি, চোঙ দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে গলগল ক'রে । কিন-ফো আর ওয়াং তাদের জন্য নির্দিষ্ট-করা ক্যাবিনে গিয়ে ঢুকলো—দুজনের দুটি আলাদা ক্যাবিন—তক্ষুনি পার্ল রিভারের জল কেটে চলতে শুরু করলো স্টিমার, রোজ যার চঞ্চল স্রোতে জল্লাদের কুঠারে প্রাণ-হারানো লোকেদের মড়া ভেসে যায় । ফরাশিদের কামানের গোলায় ভেঙে-যাওয়া উপকূল পেরিয়ে এলো স্টিমার, চট ক'রে পেরিয়ে এলো নব গল্পের প্যাগোডা, পেরিয়ে গেলো জারডিন পয়েন্ট ; ছোটো-ছোটো দ্বীপ আর তীরের মস্ত জাহাজগুলির মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে-ক'রে সে রাতে একশো মাইল অতিক্রম ক'রে এলো স্টিমার, উষাকালে পেরিয়ে এলো 'বাঘের মুখ', আর সকালবেলার কুয়াশার মধ্য দিয়ে স্টিমারটির দিকে তাকিয়ে রইলো হংকং-এর ভিক্টরিয়ার ঝাপসা চুড়ো ।

পথে কোনো অসুবিধাই হ'লো না ; কিন-ফো আর ওয়াং যথাসময়ে কিয়াংনান প্রদেশের উপকূলে শাংহাইতে এসে নামলো ।

৩

শাংহাই

চিনে ভাষায় এই মর্মে একটা প্রবাদ আছে : 'যখন তলোয়ারে মরচে ধ'রে যায় আর কুড়ুল চকচক করে, যখন জেলখানায় কেউ থাকে না আর গোলাবাড়ি থৈ-থৈ করে, যখন মন্দিরের সিঁড়ি লোকের পায়ের চাপে জীর্ণ হ'য়ে যায় আর আদালতের উঠোনে আগাছা গজায়, যখন ডাক্তাররা পায়ে হেঁটে বেরোয় আর রুটিওলা যায় ঘোড়ার পিঠে, তখন বুঝবে যে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।' এই প্রবচনে কতটা সত্য আছে কে জানে—কিন্তু এটা ঠিক যে অন্য দেশের বেলায় এই বিবরণ খাটলেও চিনের বেলায় মোটেই খাপ খায় না । চিনে বরং তলোয়ারের ফলাই ঝকমক করে সবসময়, আর কুড়ুল বা কোদালে জং ধ'রে থাকে; জেলখানায় লোক আঁটে না, কিন্তু গোলাবাড়ি প'ড়ে থাকে শূন্য ; উপোশ ক'রে মরে রুটিওলাই, ডাক্তার নয় ; আর প্যাগোডায় হয়তো কতিপয় ধর্মভীরুর ভিড় লেগে থাকে, কিন্তু আদালতে কখনো অপরাধীর সংখ্যা কম থাকে না ।

১,৩০০,০০০ বর্গমাইল বড়ো যে-দেশের দৈর্ঘ্য ১৪০০ মাইলেরও বেশি, আর প্রস্থ ৯০০ থেকে ১৩০০ মাইলের মধ্যে, যে-দেশে আঠারোটা মস্ত প্রদেশ রয়েছে, আর রয়েছে মোঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, তিব্বত, টংকিং, কোরিয়া আর লু-চু দ্বীপ প্রভৃতি কতগুলি করদ রাজ্য, সে-দেশের শাসনব্যবস্থায় যে প্রচুর ত্রুটি থাকবে, তাতে বিচিত্র কী । বিদেশিদের কাছে এই

অরাজক অবস্থা তো দিবালোকের মতোই স্বচ্ছ—এবং সম্প্রতি চিনেরাও এ-বিষয়ে ওয়াকিবহাল হ'তে শুরু করছে। সম্রাট তো 'ঈশ্বরের পুত্র', জনগণের পিতৃপ্রতিম, জমকালো প্রাসাদে একা থাকেন যিনি, ক্বচিৎ যাঁর দর্শন মেলে, যাঁর মুখের কথাই আইন, জীবন্মৃত্যুর উপর যাঁর ক্ষমতা চূড়ান্ত, জন্মসূত্রেই এই বিপুল রাজকর যাঁর প্রাপ্য, যাঁর চরণধূলির তলায় সব মস্তকই নত হয়—তিনি —কেবল তিনিই হয়তো এই ধারণা করতে পারেন যে তাঁর রাজ্যে সুখশান্তির অভাব নেই ; তাঁর চোখ ফোটাবার যাবতীয় চেষ্টাই হয়তো ব্যর্থ হ'তে বাধ্য ; যিনি 'দেবপুত্র' তাঁর কি কখনো ভুল হ'তে পারে, না কি তাঁর পক্ষে ভুল করা কোনো কালে সম্ভব ?

কিন-ফো অবশ্য অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে চিনেদের কর্তৃত্বে বাস করার চেয়ে ইওরোপীয় আধিপত্য স্বীকার ক'রে নেয়া অনেক ভালো ; ঠিক শাংহাইতে সে থাকে না, বরং শাংহাইর যে-অংশে ইংরেজরা স্বতন্ত্র শাসনকাজ চালায় সেই জায়গাতেই সে নিজের বাড়ি করেছে।

আসল শাংহাই-র অবস্থান ওয়াং-পো ব'লে একটা ছোটো নদীর বাম তীরে ; ঠিক সমকোণ ক'রে এই নদী গিয়ে পড়েছে ইয়াং-সি-কিয়াং বা নীল নদীতে, তারপর পীত সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। শহরটি ডিম্বাকৃতি, উত্তরে দক্ষিণে বিস্তৃত, চারপাশে উঁচু প্রাচীর, আর প্রাচীর পেরিয়ে গেলে পড়া যায় শহরতলিতে—শহরতলিতে যাবার রাস্তা পাঁচটি। সরু নোংরা গলিগুলির দশা শান-বাঁধানো পায়ে-চলার পথের চেয়ে কিঞ্চিৎ ভালো ; কুলুঙ্গির মতো ছোটো-ছোটো একেকটা দোকান, লোককে আকর্ষণ করার জন্য মালপত্তর সাজিয়ে রাখার কোনো বালাই নেই, দোকানদারেরা অনেক সময়েই খালি গায়ে ব'সে থেকে বেচাকেনা চালায় ; ঘোড়ার গাড়ি বা পাল্কি তো দূরের কথা, ঘোড়সোয়ারের দেখাই মেলে কদাচিৎ ; এলোমেলো কতগুলি বৌদ্ধ মন্দির আর বিদেশী গির্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ; আমোদ-প্রমোদের জায়গা বলতে আছে একটি 'চা-বাগান', একটা স্যাঁতসেঁতে কুচকাওয়াজের মাঠ—আগে নাকি এখানে ধান হ'তো, তাই জায়গাটা অমন ভ্যাঁপশা আর ভিজে-ভিজে। এই হচ্ছে শহরটির বৈশিষ্ট্য; সব শুনে মনে হ'তে পারে লোকে এখানে থাকে কী ক'রে, কিন্তু তবু এখানে অন্তত ২০০,০০০ লোকের বাস, আর বাণিজ্যকেন্দ্র হিশেবে তার গুরুত্বও অবহেলা করার মতো নয়।

বস্তুত নানকিং-এর চুক্তির পর শাংহাইতেই প্রথম ইওরোপীয়রা অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিলো, এমনকী তাদের কুঠি তৈরিরও অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। শহর ও শহরতলির বাইরে বার্ষিক শুল্কের বিনিময়ে তিন টুকরো জমি দেয়া হয়েছিলো ইংরেজ, ফরাশি আর মার্কিনদের—আর এই শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা সেখানে দু-হাজারের কম ছিলো না।

এদের মধ্যে ফরাশিদের পাওয়া জমিটুকুই যে সবচেয়ে বাজে, এ-কথা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। শহরের উত্তরভাগে ইয়ং-কিং-পাং নদী পর্যন্ত যে-জমিটুকু আছে তারই মালিক ছিলো ফরাশিরা ; ইংরেজদের এলাকা নদীর ওপারে ; ল্যাজারিস্ট আর জেসুয়িটরা গির্জে বানিয়েছে এখানে, আর সেই সূত্রে শহর থেকে চারমাইল দূরে ৎসিকাভের কলেজ খোলা হয়েছে, যেখান থেকে পাশ ক'রে চিনেরা ডিগ্রি নেয়। বসতিটা অবশ্য এতই ছোটো যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না ; ১৮৬১ সালে দশটি বাণিজ্যিক কুঠি

প্রতিষ্টিত হয়েছিলো এখানে—এখন মাত্র তিনটিই কোনোক্রমে টিঁকে আছে । এমনকী একটা ব্যাঙ্ক ছিলো আগে, সেটাও এখন ইংরেজ বসতিতে গিয়ে ব্যাবসা ফেঁদেছে ।

মার্কিন বসতিটা বরং উয়ো-সুং নদীর ধারে, ঠিক যেখানে সমকোণ ক'রে ওয়াং-পো বেঁকেছে ; সু-চু খাল সেটাকে ইংরেজ বসতি থেকে আলাদা ক'রে রেখেছে, খালের উপরে রয়েছে একটা কাঠের সাঁকো । মার্কিন বসতির প্রধান দুই অট্টালিকা হ'লো হোটেল অ্যাস্টর আর মিশন চার্চ । এখানে অবশ্য ছোটোখাটো একটা ডক রয়েছে, মেরামতের জন্য প্রায়ই এখানে মার্কিন ও ইওরোপীয় জাহাজ আসে ।

বসতি তিনটির মধ্যে সবচেয়ে উন্নতিশীল যেটি তার মালিক ইংরেজরা । নদীর ধারে-ধারে বারান্দা আর বাগানওলা সুন্দর বাংলো তুলেছে তারা ; ধনী সদাগরদের বাড়ি এ-সব ; একটা বাড়ি ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্কের ; ডেন্ট, জারডিন আর রাসেলদের প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে ; আর রয়েছে ইংরেজদের ক্লাব, নাট্যশালা, টেনিস-কোর্ট, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, গ্রন্থাগার—সব মিলিয়ে লোকে যাকে বলে 'আদর্শ বসতি' । বেশ সুশৃঙ্খল সাজানো-গোছানো জায়গাটা, মঁসিয় লিয়ঁ রুসে যার মধ্যে ইংরেজ চরিত্রের গৃহিণীপনা খুঁজে পেয়েছেন ।

কেউ যদি হঠাৎ ইয়াং-সি-কিয়াং নদী দিয়ে এখানে ভেলা ভাসিয়ে আসে, তাহ'লে তাকিয়ে দেখবে একই হাওয়ার কেমন পৎপৎ ক'রে উড়ছে চারটি পতাকা : তেরঙা ফরাশি নিশেন, ইউনিয়ন জ্যাক, তারা আর ডোরা-আঁকা মার্কিন নিশেন, আর সবুজ ঝাণ্ডায় হলদে ক্রুশ—চিন সম্রাটের পতাকা ।

শাংহাইয়ের জমি সমতল, গাছপালা বিশেষ নেই ; সরু পাথুরে রাস্তা, সমকোণ ক'রে পায়ে-চলার পথগুলি একে অন্যকে কাটাকুটি ক'রে গেছে ; মস্ত সব জলাধার—ধানখেতে জলসেচের আধার এরা ; অসংখ্য খাল কেটে একেবারে মাঠ পর্যন্ত জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে—অনেকটা হল্যাণ্ডে যে-রকম । আস্ত দৃশ্যটা দেখে মনে হবে ফ্রেমছাড়া একটা সবুজ ল্যাণ্ডস্কেপ বুঝি ।

দুপুরবেলায় শাংহাইর পুবদিকের শহরতলিতে স্টিমার এসে জেটিতে ভিড়তেই কিন-ফো আর ওয়াং নেমে পড়লো । চারদিকে প্রচণ্ড ভিড় আর হৈ-চৈ । নদীতে জাঙ্কের সংখ্যা হবে কয়েকশো, তাছাড়া আছে প্রমোদতরী, গণ্ডোলার মতো দেখতে শাম্পান, ভেলা—যেন একটা ভাসমান নগরী । নগরীই বটে, কারণ অন্তত ৩০,০০০ লোক বাস করে এ-সব ডিঙিতে আর শাম্পানে—এরা সবাই নিচুতলার মানুষ : এদের মধ্যে সবচেয়ে যে ধনী সেও কোনোদিন ভুলেও মান্দারিন হবার স্বপ্ন দ্যাখে না । জেটিতেও, নদীর মতোই, পিঁপড়ের সারির মতো লোকের বাস ; কত ধরনের যে লোক কে জানে—সদাগর, কমলাওলা, ফিরিওলা, নানা দেশের মাঝি-মাল্লা, ভিস্তিওলা, ভাবীকথক আর জ্যোতিষী, বৌদ্ধ ভিক্ষু, ক্যাথলিক পাদ্রি, সেপাই-শাস্ত্রী, কোতোয়ালির লোক, দোভাষি, ইওরোপীয় ব্যাবসাদারদের দালাল—কেই বা নেই !

আস্তে ভিড়ের মধ্য দিয়ে এগোতে লাগলো দুই বন্ধু । কিন-ফোর হাতে শৌখিন হাত-পাখা ; উদাসীন অবহেলার ভঙ্গি তার, তারসঙ্গে এই ভিড়ের যেন কোনো যোগই নেই । ওয়াং তার ছাতা খুলে মাথায় দিয়েছে, ছাতার হলদে কাপড়ে কালো-কালো দৈত্যদানোর মূর্তি-আঁকা ; হেঁটে যেতে-যেতে সে কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে আশপাশের সব কিছু লক্ষ করতে

ভুলছে না। পূর্ব তোরণ পেরিয়ে আসার পর হঠাৎ তার চোখে পড়লো দশবারোটা বাঁশের খাঁচা : আগের দিন যে-সব অপরাধীর মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের ছিন্নশিরে খাঁচাগুলো ভর্তি।

'শিরশ্ছেদ না-ক'রে যদি তাদের মাথায় একফোঁটা জ্ঞান ঢুকিয়ে দিতো,' বিড়বিড় ক'রে বললো সে আপন মনে।

এ-কথা কিন-ফোর কানে পৌঁছোয়নি ; পৌঁছোলে হয়তো কোনো প্রাক্তন তাই-পিং-এর মুখে এ-কথা শুনে অবাক হ'য়ে যেতো।

জেটি ছেড়ে, প্রাচীরের পাশ দিয়ে ঘুরে, তারা ফরাশি বসতির কাছে এসে পড়লো। লম্বা নীল আলখালা-পরা একটি লোক ফাঁপা একটা মোষের শিঙে ছড়ির ঘা দিয়ে লোক জড়ো করার চেষ্টা করছে—হঠাৎ তারা দেখতে পেলে।

'দ্যাখো-দ্যাখো', ওয়াং চেঁচিয়ে উঠলো, 'একটা সিয়েন-চেং!'

'তো কী?' জিগেশ করলো কিন-ফো।

'কেন, ভালোই তো হ'লো। তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছো—লোকটা তোমার ভবিষ্যৎ ব'লে দেবে!' উত্তর দিলে দার্শনিক।

নিজের ভবিষ্যৎ জানার কোনো গরজ ছিলো না কিন-ফোর। তবু ওয়াং-এর কথায় সে থেমে দাঁড়ালো।

'সিয়েন-চেং' বলে ভাবীকথক বা গণকদের, কয়েক সাপেকের বিনিময়ে তারা ব'লে দেয় ভবিষ্যতের গর্তে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। চৌষট্টিটা তাশের একটা প্যাকেট থাকে তার কাছে, আর থাকে ছোট্ট খাঁচায় একটি পাখির ছানা : সুতো দিয়ে বোতামের গর্তের সঙ্গে বাঁধা থাকে খাঁচাটা, আর তাশের প্যাকেটের মধ্যে থাকে দেবতা, মানুষ আর জন্তুজানোয়ারের ছবি। চিনেরা এমনিতেই বড্ড কুসংস্কারে ভোগে, কত যে অলক্ষণ কুলক্ষণ দেখতে পায় তারা চারপাশে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই, কিন্তু কোনো সিয়েন-চেংকে দেখলে তো আর কথাই নেই, একবারে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।

ওয়াং-এর ইঙ্গিতে লোকটা মাটির উপর এক টুকরো কাপড় বিছিয়ে দিয়ে পাখির খাঁচাটা তার উপর রাখলে। তারপর তার তাশের প্যাকেট বার ক'রে ভালো ক'রে ফেটিয়ে নিলে, নানাভাবে শাফল করলে, তারপর ওই কাপড়ের উপর এক-এক ক'রে তাশগুলো উলটো ক'রে বিছিয়ে দিলে। খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে তারপর সে একটু স'রে গেলো, যাতে পাখিটা বেরিয়ে আসে। আস্তে তিড়িং একটা লাফ দিয়ে বেরুলো পাখির ছানা, একটা তাশ তুলে ধরলো ঠোঁটের ভাঁজে, তারপর আবার লাফিয়ে খাঁচায় ঢুকে গেলো। দু-একটা গমের দানা বখশিশ দেয়া হ'লো পাখিটাকে। তারপর চিৎ ক'রে ফেলা হ'লো তাশটা। তাশটায়, দেখা গেলো, একটি মনুষ্যমূর্তি আঁকা আর উত্তরের সরকারের ভাষা 'কুনান-রুনা'য় ছোট্ট একটি নীতিবাক্য লেখা তার তলায়। 'কুনান-রুনা' জানে কেবল শিক্ষিত লোকেরা, সাধারণ লোকের কাছে এ-ভাষা ক্লাসিকাল গ্রিক ভাষার মতোই কঠিন। তাশটি তুলে নিয়ে সিয়েন-চেং এবার সরকারিভাবে দেখালো তাদের, তারপর জগৎ-জোড়া ভাবীকথকরা যে-মস্ত গল্প ফেঁদে মক্কেলকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে, তারই অবতারণা করলে : ভীষণ একটা বিপদ ঘনাচ্ছে, বিষম বিপত্তি যাকে বলে—তারপর দশ হাজার বছর ধ'রে সুখ শান্তি সন্তোষ।

'তা খুব-একটা খারাপ নয়, কী বলো !' কিন-ফো অমায়িকভাবে মন্তব্য করলে, 'এক-আধটা বিপত্তি আর তেমন কী !' একটা তায়েল ছুঁড়ে দিলে সে শাদা কাপড়ের উপর । ক্ষুধার্ত কুকুর যেমন ক'রে হাড়ের টুকরোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ভাবীকথকটি ঠিক যেন তেমনি ভাবে ওই রজত মুদ্রাটি আঁকড়ে ধরলো : কার মুখ দেখে সে উঠেছিলো কে জানে, আস্ত একটা রুপোর ঝিলিক তো আর রোজ চোখে পড়ে না ।

আবার দু-বন্ধু নিজেদের গন্তব্যপথে অগ্রসর হ'লো । ফরাশি বসতির কাছে এগিয়ে এলো তারা । ওয়াং তখন মনে-মনে ভাবছে, 'কী আশ্চর্য, আমি যা বলেছিলুম তার সঙ্গে এই ভাবীকথন কেমন অদ্ভুত মিলে গেলো !' এদিকে কিন-ফোর দৃঢ় বিশ্বাস যে সত্যিকার কোনো বিপত্তিতে সে পড়তেই পারে না । ফরাশি দূতাবাস পেরিয়ে গেলো তারা, পেরিয়ে এলো ইয়াং-কিং-পাঙের সরু কাঠের সাঁকোটা, ইংরেজ বসতিতে ঢুকে পড়লো তারপর, ইওরোপীয়দের প্রধান জাহাজঘাটা পর্যন্ত হেঁটে গেলো ।

জাহাজঘাটায় পৌঁছুতেই বেলা বারোটার ঘণ্টা পড়লো—চিনেরা বারোটার পর আর লেনদেন করে না, সেদিনকার মতো ব্যাবসায় ইতি পড়ে সেখানেই । হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে বিকিকিনির হৈ-চৈ আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলো, যেন কোনো জাদুকাঠির ছোঁয়ায় ইংরেজ বসতির শোরগোল থেমে গিয়ে সব স্তব্ধ ও চুপচাপ হ'য়ে গেলো ।

বন্দরে তখন সবেমাত্র কয়েকটা জাহাজ ঢুকেছে—বেশির ভাগ জাহাজেরই মাস্তুলে উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক । শতকরা নব্বুইটা জাহাজই বোধহয় আফিমে ভর্তি : শতকরা তিনশো টাকা লাভ ক'রে ইংল্যাণ্ড চিনকে এই ভীষণ নেশা সরবরাহ করে ।—চৈনিক সরকার মিথ্যেই এই আফিম রপ্তানি বন্ধ করতে চেয়েছে, কিন্তু ইংরেজেদের কিছুতেই হঠাতে পারেনি ; বরং ১৮৪১ সালের যুদ্ধ আর নানকিংয়ের চুক্তির ফলে ইংরেজরা অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছে ; পেইচিঙের শাসনদপ্তর যদিও এটা ঘোষণা করেছে যে কোনো চিনেকে যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আফিম রপ্তানির কাজে লিপ্ত দেখা যায় তা'হ'লে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তবু একটা-না-একটা আইনের ফাঁক বের ক'রে লোকে সহজেই শাস্তি এড়িয়ে যায় । জনরব যে শাংহাই-এর মান্দারিন রাজ্যপাল নাকি কোনো-কিছু লক্ষ না ক'রে চোখ বুজে থাকেন ব'লে প্রতি বছরই তাঁর নামে নির্দিষ্ট বেতন ছাড়া আরো কয়েক হাজার পাউণ্ড ব্যাঙ্কে জমা পড়ে ।

এটা অবশ্য এখানে বলা উচিত যে কিন-ফো বা ওয়াং দুজনের কেউই কোনোদিনও চণ্ডু টেনে দ্যাখেনি; আর ঘণ্টাখানেক পরে তারা দুজনে যে চমৎকার বাড়িটিতে এসে পৌঁছুলো তার অন্দরমহলে ওই ভীষণ বিষের একটি তোলাও কোনোদিন ঢোকেনি ।

'ভয় না-দেখিয়ে দেশের লোককে বরং শেখানো উচিত !'

ওয়াং কেবলই এ-কথা বলে ; আগেকার দিনের তাই-পিং আদর্শকে ভুলে গিয়ে সে আরো বলে : 'জানি বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, কিন্তু দর্শনচর্চা তার চেয়ে ঢের ভালো !'

৪

কিন-ফোর আলস্য

সমান্তর কতগুলো দালানের সারি পরস্পরকে সমকোণে ভেদ ক'রে গেছে : ইয়ামেন নামের বিলাসভবনগুলি দেখতে এ-রকম। এমনিতে অবশ্য সম্রাটই স্বয়ং সবগুলি ইয়ামেনের মালিক : ধনী মান্দারিন ছাড়া আর-কারু সেখানে থাকার অধিকার নেই ; কিন্তু যাদের বিস্তর টাকাকড়ি আছে, তাদেরও অবশ্যি এখানে থাকতে বাধা নেই। কিন-ফো ঠিক এমনি একটি বিলাসভবনেই বাস করে।

ভবনটির চারপাশে, বাগান আর উঠোন ঘিরে মস্ত একটা দেয়ালতোলা : কিন-ফো আর ওয়াং তারই প্রধান ফটক পেরিয়ে ঢুকলো। কোনো মান্দারিন ম্যাজিস্ট্রেট ইয়ামেনে থাকলে, ছবি-আঁকা সুসজ্জিত দেউড়িতে মস্ত একটা ঢাক থাকতো ; দিনে-রাতে যে-কোনো সময়ে যে-কোনো লোক নালিশ জানাতে আসতে পারে এখানে ; এসেই প্রথমে তাকে ঢাকে কাঠি দিয়ে তার আগমন-বার্তা ঘোষণা করতে হবে ; কিন্তু যেহেতু এটা কোনো সরকারি চাকুরের ভবন নয়, সেই জন্য দেউড়িতে সেই ঢাকের বদলে এখন রয়েছে মস্ত সব পোর্সেলেনের জ্বালা, পথচারীদের জন্য সর্দার খানশামা একটু পরে-পরে এসে তা ঠাণ্ডা চায়ে ভর্তি ক'রে দিয়ে যায় : কিন-ফোর এই বদান্যতার জন্য পাড়া-পড়শিরা তাকে বরং বেশ পছন্দই করে !

প্রভুর আগমন-বার্তা শুনে বাড়িশুদ্ধু লোক এই দেউড়িতে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো : পরিচারক, খানশামা, বাজার-সরকার, কোচোয়ান, ঘড়িবাবু, বাবুর্চি, মালি—সবাই প্রধান গোমস্তার নেতৃত্বে এসে দাঁড়ালো দেউড়িতে, তাদের পিছনে রইলো দশ-বারোটি কুলি, মাস-মাইনের কাজ করে তারা, অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজই ক'রে থাকে তারা, কঠিন এবং পরিশ্রমসাধ্য, মাটি কোপায়, ঘর ঝাঁট দেয় বা ওই জাতীয় অন্য-সব কাজ করে।

প্রধান গোমস্তা ওরফে নায়েব প্রভুকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলো, কিন্তু কিন-ফো তাচ্ছিল্যভরে হাত নেড়ে তাকে পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতে-যেতে জিগেশ করলো : 'সুনকে দেখছিনে তো ? সে কোথায় ?'

ওয়াং হেসে ফেললো। 'সুনের কারবারই ওই রকম ! ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় যদি ওকে দেখা যাবে তাহ'লে ও আর সুন হবে কী ক'রে ?'

কিন-ফো আবার জিগেশ করলে, 'সুন কোথায় !'

নায়েব কেবল জানালে যে তা বলা খুবই মুশকিল—শুধু সে-ই নয়, অন্য-কেউই বোধহয় জানে না সুনের কী হয়েছে, বা সে কোনখানে রয়েছে।

সুন হ'লো কিন-ফোর খাশ ভৃত্য, শুধু তারই বিশেষ তদারকির জন্যে নিযুক্ত—কিছুতেই তাকে ছেড়ে-থাকার কথা কিন-ফো ভাবতে পারে না। তাই ব'লে ভৃত্য হিশেবে সুন কিন্তু আদৌ সেরা জাতের নয়। বরং একটা কাজ করতে গিয়ে সে আরেকটা ক'রে আসে, একখানা দিলে তিনখানা ক'রে আনে, তিনখানা দিলে একখানা রাখে—বাকিগুলোর কোনো হদিশই

জানে না ; যেমন কাজে তেমনি কথায়—কিছুই তার ঠিক থাকে না, কখনো না । লোভীর একশেষ, ভিতুর হদ্দ, ভীষণ পেটুক : পরদায় কি চায়ের পেয়ালায় চিনেদের যেমন আঁকা হয়, হুবহু তারই এক জ্যান্ত সংস্করণ । এমনিতে অবশ্য তাকে বিশ্বাসীই বলতে হয়, আর তার বিশেষ-একটা মূল্যও আছে ; শুধু সে-ই তার প্রভুকে নানা কাজে-কর্মে উশকে দিতে পারে । দিনের মধ্যে অন্তত বারো বার কিন-ফো সুনের উপর রেগে চ্যাঁচামেচি শুরু ক'রে দেয়—সুন অবিশ্যি সব গালাগাল এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বার ক'রে দেয়—কিন্তু তার ফলে অন্তত সাময়িকভাবেও যে কিন-ফো তার অনীহা ও ঔদাসীন্য থেকে জেগে ওঠে, এটাই যা মস্ত লাভ ।

মাঝে-মাঝে বিবেক যখন চাড়া-দিয়ে ওঠে, তখন চিনে ভৃত্যরা প্রভুর কাছে এসে মাথা পেতে দাঁড়ায় শাস্তি নিতে : আর দিনের মধ্যে কয়েকবার সাজা নিতে না-এলে সুনের বোধহয় কোনো খাদ্যই হজম হ'তো না । প্রভুও এ-সব ক্ষেত্রে ভৃত্যকে যে ছেড়ে কথা কইতেন, তা নয় ; ভৃত্যের পিঠে কয়েক ঘা চাবুক কশানো তো কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিরই শামিল ; কিন্তু যে-শাস্তিটাকে সুন সবচেয়ে ভয় পেতো তা চাবুক নয় ; বরং তার সাধের বেণীর এক-আধ ইঞ্চি খোয়া গেলেই সে একেবারে কেঁচো । অপরাধের মাত্রা প্রবল হ'লেই কিন-ফো কাঁচি দিয়ে তার বেণী কেটে নিতো ।

কোনো চিনের কাছে বেণীর চাইতে গৌরবের আর কিছুই নেই । বেশী খোয়াবার জ্বালা কি মরলেও কমে !

ছার এই জীবন, শত ধিক একে—যদি বেণীই খোয়া গেলো ! চার বছর আগে সুন যখন প্রথম কিন-ফোর কাছে এসে চাকরি নেয়, আহা, তখন তার বেণী কী মস্তই না ছিলো—লম্বায় চার ফুট তো হবেই নিদেন ; কিন্তু এক-বছরে এত বার সে গুরুতর অপরাধ ক'রে ফেলেছে যে এখন বেচারির বেণী কিছুতেই দু-ফুটের বড়ো নয় ; যদি এই হারে তার বেণী ছোটো হ'তে শুরু করে—কী সর্বনাশ—তাহ'লে অল্প দিনেই তো তার মাথায় চকচকে ঝকঝকে টাক প'ড়ে যাবে !

দেউড়ি পেরিয়ে বাড়ি ঢুকলো কিন-ফো, বাগানও পেরিয়ে এলো—পিছনে সসম্ভ্রমে ভৃত্যরা তাকে অনুসরণ করলে । টেরাকোটা-করা মাটির টব—তাতেই গাছ পোঁতা ; সবগুলি গাছই কেটে-ছেঁটে কিম্ভূত মূর্তি বানানো হয়েছে—অদ্ভুত সব জন্তুজানোয়ারের চেহারা গাছগুলোর । বাগানের মাঝখানে ছোট্ট একটা ঝিল, তাতে লাল-নীল-সোনালি মাছ খেলা ক'রে বেড়ায় ; শ্যাওলা আর লাল পদ্মের পাতায় জল দেখা যায় না ; পাশেই একটা দেয়ালের গায়ে ঝকঝকে রঙে কিংবদন্তির কোনো ভীষণ প্রাণীর মূর্তি আঁকা ; সেটা পেরিয়ে গেলে পর মূল বাড়ির দুয়ার চোখে পড়ে ।

মূল বাড়িটা দোতলা : মারবেল পাথরের সিঁড়ি ধাপে-ধাপে উঠে গেছে একতলার উঁচু বারান্দার দিকে । বেতের তৈরি পরদা ঝোলে উপরে, দরজায় আর জানলায়—যাতে গরমে বেশি কষ্ট পেতে না-হয় । বাড়িটার ছাত সমতল—আশপাশের পলেস্তরা-খশা ইটকাঠের বাড়ির কার্নিশ আর আঁকাবাঁকা টালির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না ।

যে-কটা ঘরে কিন-ফো আর ওয়াং থাকে, সেগুলো ছাড়া ভিতরের বাকি ঘরগুলো মস্ত হলঘরের মতো—ঘরগুলিতে মস্ত সব দেরাজ আর আর সিন্দুক, তাদের কবাটের উপর

কত রকম যে ছবি আঁকা : একটাতে হয়তো ফলে-ফুলে ভরা কোনো বাগানের ছবি, অন্যটায় হয়তো নানা প্রবচন আর আপ্তবাক্য খোদাই-করা—যা দেখে ধর্মভীরুরা তুষ্ট হয় । বসার ব্যবস্থা আছে যত্র-তত্র—কোনোটা টেরাকোটা, কোনোটা পোর্সেলেনের—কাঠ বা মারবেলও বাদ যায়নি—কিন্তু তাই ব'লে প্রতীচীর মতো কুশান-দেয়া সোফা-সেটও কম নেই । নানা রকম লণ্ঠন ঝুলছে কড়িকাঠ থেকে, চিনে-জাপানি, কোথাও রঙিন ঝালর পরানো—কোথাও-বা ইস্পাহানিদের ঝাড়লণ্ঠন থেকে রেশমি ঝাপ্পা নেমে এসেছে নিচে । এক ধরনের আশবাবের তো বোধকরি লেখাজোখা নেই—তা হ'লো 'চা-কি'—বা ছোট্ট চায়ের টেবিল—হাত বাড়ালেই যাতে একটা 'চা-কি' মেলে, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা ।

যে-সব টুকিটাকি জিনিশ দিয়ে ঘর সাজানো, তা-ই দেখেই হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাবে । হাতির দাঁত, মুক্তো, মিনে-করা ব্রন্‌জ—কত-টুকিটাকি যে ছড়িয়ে আছে কে জানে । কতরকম ধূপতি, পান্না-বসানো সোনার গন্ধদানি, তেফলা কাচের ফুলদানি ; সব মিঙ আর ৎসিং রাজবংশের স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে ; আছে আরো দুর্লভ সামগ্রী—ইয়েন যুগের পোর্সেলেনের জিনিশ, হলদে-গোলাপি রঙের স্বচ্ছ এনামেলের শৌখিনতা—যা বানাবার কৌশল একালের লোকের কাছে অফুরান রহস্য ব'লে ঠেকে । চারপাশে চোখ চেয়ে দেখুন একবার, তাহ'লেই বুঝতে পারবেন বিলাস কাকে বলে : প্রাচীকে এ-বিষয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে প্রতীচীও—আরাম, সৌন্দর্য, জাঁকজমক, কিছুরই কোনো অভাব নেই এখানে ।

মানুষটা কিন-ফো বেশ উদার ও প্রগতিশীল—যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে ; পশ্চিমের সভ্যতার দিকে সে নাক উঁচু ক'রে বাঁকা চোখে তাকায় না, নতুন-কোনো আবিষ্কারকে বাধা দিতে সে হচ্ছে শেষ ব্যক্তি । বিজ্ঞানের যে-কোনো প্রকাশকেই সে সমর্থন করে ; বৈদ্যুতিক তার কেটে ফেলে দেয় যে-সব বর্বর, তাদের সঙ্গে তার কোনো সংস্রব নেই ; সেই সব গোঁড়া প্রাচীনপন্থী মান্দারিন—যারা শাংহাই আর হংকং-এর মধ্যে জলের তলায় টেলিগ্রামের লাইন বসাতে দেয়নি—তাদের প্রতিও তার কোনো অনুরাগ নেই । বরং ফরাশি কারিগরদের পরিচালনায় ফু-চুতে ডক বানাতে যে-দল সরকারকে চাপ দিয়েছিলো, সরাসরি সমর্থন করেছিলো, কিন-ফো তাদেরই একজন । তিয়েন-ৎসিন আর শাংহাইয়ের মধ্যে যে চায়না স্টিমশিপ কম্পানি জাহাজ চালায়, তার অনেক শেয়ার কিনেছে সে ; সিঙ্গাপুর থেকে দ্রুতগামী জাহাজে ক'রে চারদিনে যারা পশ্চিমের সঙ্গে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করতে চায়, তাদের নতুন উদ্যমে সে প্রচুর টাকা ঢেলেছে ।

এমন-কোনো আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবদান নেই, যা সে নিজের বাড়িতে ব্যবহার করে না । টেলিফোন বসিয়েছে সে বাড়িতে, যাতে ইয়ামেনের সব অংশের সঙ্গেই সর্বদা যোগাযোগ রাখতে পারে ; প্রত্যেক কোঠায় বসিয়েছে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ; ঠাণ্ডার দিনে যখন তার চুল্লিতে গ্যাস জ্বলে, তখন তার দেশের অন্যলোকেরা লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে শীতে কাঁপে ; আর আজকাল সে নিজের হাতে কিছু লেখার পরিশ্রম করতে চায় না—ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লেখার দরকার হ'লে কেবল এডিসনের নতুন আবিষ্কার ফোনোগ্রাফের সাহায্য নেয় ।

সব সত্ত্বেও কিন্তু কিন-ফো মোটেই সুখী নয় ; — মরলোকে কেউ ভোগ-বিলাসের জন্য যা-কিছু কামনা করে, সব সে জোগাড় করতে পারে মুখের কথা খশালেই—এত তার

ঐশ্বর্য—কিন্তু তবু ওয়াং তার ছাত্রকে সেই দর্শনশাস্ত্রে দীক্ষা দিতে পারেনি, যা মানুষকে সুখী করে। তার ওই জাড্য, ওই বিপুল নির্বেদ থেকে সুনের উজবুক ক্রিয়াকলাপ মাঝে-মাঝে তাকে জাগিয়ে তোলে, এটা সত্যি ; কিন্তু তবু কোথায় যেন মস্ত একটা ফাঁক থেকে গেছে, যার ফলে কোনোকিছুতেই তার মন ওঠে না, সব-কিছুতেই কেমন একটা অরুচির ভাব লেগেই আছে।

মস্ত একটা হলঘরে এসে ঢুকলো সে ; যে-কোনো ঘরে ঢোকা যায় এ-ঘর থেকে; কিন্তু সুনের কোনো দেখা নেই। কারণটা এবার স্পষ্ট অনুমান করা যায় ; নিশ্চয়ই সুন কোনো গর্হিত কাজ ক'রে ফেলেছে, আর তাই লুকিয়ে আছে, কিছুতেই দেখা দিতে চাচ্ছে না ; যাতে অন্তত আরো কিছুক্ষণ সাধের বেণীটিকে প্রভুর হাত থেকে নিরাপদ রাখতে পারে !

অধীর হ'য়ে কিন-ফো হাঁক পাড়লে : 'সুন ! সুন !'

ওয়াংও গলা মেলালো : 'সুন !'

এই হাঁকডাক সুনের কানে পৌঁছুলো কিনা কে জানে—তবে সে যে তার গোপন জায়গা থেকে একচুলও নড়লো না তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'নাঃ, লোকটা সংশোধনের অতীত,' ওয়াং বললে, 'কোনো দর্শনই তাকে মানুষ করতে পারবে না !'

কিন-ফো রেগে মাটিতে পা-ঠুকে নায়েবকে ডাক দিলে। 'যাও, সুনকে খুঁজে বার করো—এক্ষুনি আমার কাছ পাঠিয়ে দাও ওকে।'

বাড়িশুদ্ধু লোক চঞ্চল হ'য়ে উঠলো : নিরুদ্দেশ ভৃত্যটির সন্ধান চাই !

ওয়াং যখন দেখলো যে ঘরে সে আর কিন-ফো ছাড়া আর-কেউ নেই, তখন সুযোগ পেয়ে পণ্ডিতিয়ানা জাহির করলে : 'এবার বিশ্রাম করা উচিত শ্রান্ত পথিকের : আক্কেল অন্তত তাই বলে।'

'হ্যাঁ, না-হ'লে হয়তো আক্কেলসেলামি দিতে হবে,' কিন-ফো উত্তর দিলে।

যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকলো তখন।

একটা নরম কৌচের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে কিন-ফো সাত-পাঁচ ভাবতে শুরু করলো। আর, স্বভাবতই, যাকে সে বিয়ে করবে ব'লে স্থির করেছে, সেই সুন্দরী ও অভিজাত তরুণীটির কথা ভাবতে শুরু করলো সে একটু পরেই। তরুণীটি থাকে পেইচিঙে। সেখানে গিয়েই মেয়েটির সঙ্গে মেলবার কথা কিন-ফোর। সে যে শিগগিরই পেইচিং যাবে, এ-কথা মেয়েটিকে জানাবে কিনা, এবার তা-ই ভাবতে বসলো কিন-ফো। তার বিরহে সে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে, এমনি একটা ভঙ্গি করাই হয়তো ভালো ; তাছাড়া সত্যি তো তার ভালোবাসা আন্তরিক ও অকৃত্রিম। অন্তত ওয়াং-এর মতো যুক্তিশীলের তো এ-বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। আর হয়তো তাকে বিয়ে ক'রেই সে জীবনে প্রথমবার সুখী হবে—এতদিনে হয়তো জানতে পারবে সুখ কাকে বলে, বেঁচে-থাকার আনন্দ কী।

আস্তে-আস্তে তার চোখের পাতা বুজে এলো ; ঝাপশা ও অস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো তার ভাবনা ; বুঝি ঘুমেই ঢুলে পড়তো, কিন্তু এমন সময় তার ডান হাতের চেটোয় কে যেন আলতো শুড়শুড়ি দিলে ; চট ক'রে হাত মুঠো ক'রে বুঝতে পেলো যে, মুঠোর মধ্যে একটা ছড়ি চ'লে এসেছে। কী ব্যাপার বুঝতে তার মোটেই দেরি হ'লো না। তার প্রিয় ভৃত্যেরই

কীর্তি এটা, পা টিপে-টিপে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার হাতে একটা ছড়ি গুঁজে দিয়েছে ; এবার সুনের মোলায়েম গলা শোনা গেলো ; 'হুজুর যখন ইচ্ছে করবেন —'

ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো কিন-ফো, ছড়ি তুলে মারতে গেলো সুনকে । অমনি সুন ঘরের দামি পারস্য গালিচায় উপুড় হ'য়ে পড়লো । বাঁ হাত দিয়ে মাটিতে ভর রেখে ডান হাতে একটা চিঠি বাড়িয়ে ধরলো : 'আপনার চিঠি—আপনার নামেই এসেছে !'

'রাস্কেল ! কোথায় ছিলি তুই এতক্ষণ !'

'আই-আই-ইয়া !' সুন আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'বিকেলের আগে আপনি ফিরবেন ব'লে ভাবিনি ! মারুন আমাকে, ক'ষে পিট্টি দিন—মাথা পেতে নেবো আমি সব—হুজুর যখন ইচ্ছে করবেন —'

কিন-ফো রেগে ছড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিতেই সুনের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো ।

'বল, কেন তুই পিট্টি খেতে চাচ্ছিস ? কী করেছিস তুই — এক্ষুনি বল —'

সুনের যেন দম ফুরিয়ে গেছে । 'এই চিঠিটা —'

'চিঠি তো বুঝলাম, কিন্তু হয়েছে কী,' —ব'লে কিন-ফো তার হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিলো ।

'মনেই ছিলো না এটার কথা । কোয়াংতুং যাবার আগে আপনাকে এটা দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলুম ।'

'এক সপ্তাহ আগে এসেছে । তবে রে বেআক্কেলে—আয়, এদিকে আয় !'

সুন প্রায় কেঁদেই ফ্যালে । 'আমি তো একটা কাঁকড়া মাত্র—তায় আবার একটাও দাঁড়া নেই !'

'আয় বলছি !' কিন-ফো প্রচণ্ড ধমক দেয় ।

'আই-আই-ইয়া !' সুন কেঁদে ফ্যালে ।

এই 'আই-আই-ইয়া' হ'লো চরম হতাশার অভিব্যক্তি ! কিন-ফো ততক্ষণে বেচারি সুনের বেণী টেনে ধরেছে, এবার পাশ থেকে একটা ছোট্ট কাঁচি তুলে নিয়ে কচ ক'রে বেণীর ডগা কেটে ফেললো ।

কাঁকড়াটি অবশ্যি পরক্ষণেই তার দাঁড়া দিয়ে গালিচার উপর থেকে চুলের গোছা তুলে নিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো । তেইশ ইঞ্চি ছিলো বেণীটা এ-ঘরে ঢোকবার আগে—হায়রে, আর মাত্র বাইশ ইঞ্চি রইলো !

আবার কৌচে এলিয়ে পড়লো কিন-ফো । সুন চ'লে যেতেই তার সব উত্তেজনা কেটে গেছে । সুনের দায়িত্বহীনতায় বড্ড চ'টে গিয়েছিলো সে ; চিঠিটা সম্বন্ধে এমনিতে তার কোনো কৌতূহলই ছিলো না । কোনো চিঠি নিয়ে বিচলিত হবার আবার কী আছে ?

আবার ঢুলুনি এলো তার ; চেষ্টা ক'রে চোখ খুলে আনমনাভাবে সে হাতের লেফাফাটার দিকে তাকালো একবার । বড্ড পুরু ঠেকছে খামটা, টিকিটের রঙ লাল আর বাদামি—দুই আর ছয় সেন্ট ক'রে দাম, মার্কিন চিঠি, বোঝা যাচ্ছে ।

'লিখেছে নিশ্চয়ই আমার সান ফ্রান্সিসকোর সংবাদদাতা !' খামটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সোফার ওপাশে ! 'হয়তো ক্যালিফরনিয়ার সেনট্রাল ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর চড়েছে

—লাভের অঙ্ক হয়তো মোটা হয়েছে, তা-ই সে জানিয়েছে ! তা হোক গে—এতে আমার কিছু এসে-যায় না !' কিন্তু মনে-মনে এ-কথা ভাবলেও আপনা থেকেই একটু পরে হাতটা গিয়ে পড়লো আবার চিঠির উপর । খামটা খুলে নিয়ে প্রথমে সে নিচের দস্তখৎটা দেখে নিলে ।

'যা ভেবেছিলুম !' আপন মনেই বললে সে, 'আমেরিকার এজেন্টেরই চিঠি দেখছি ! তা এ-চিঠি কাল পড়লেও চলবে ।'

চিঠিটা আবার সে সরিয়ে রাখতে যাচ্ছিলো, কিন্তু এমন সময় হঠাৎ 'দায়িতা' কথাটায় তার চোখ আটকে গেলো । দ্বিতীয় পাতার উপরে বড়ো-বড়ো ক'রে কথাটা লেখা—তলায় দাগ দিয়ে আরো জোর দেয়া হয়েছে কথাটায়, দেখে তার কৌতূহল অস্বাভাবিক রকম উশকে উঠলো : পুরো চিঠিটাই সে প'ড়ে ফেললে এবার । পড়তে-পড়তে একবার কেবল মুহূর্তের জন্য তার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিলো, কিন্তু চিঠিটা শেষ করার আগেই তার ঠোঁটের ভাঁজে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠলো আবার ।

সোফা থেকে উঠে সে গিয়ে টেলিফোনের সামনে দাঁড়ালো, ওয়াংকে টেলিফোনে ডাকবে ভেবে রীসিভার তুললো মুখের সামনে, কিন্তু পরক্ষণেই কী ভেবে আবার রীসিভার নামিয়ে রেখে ফিরে এসে শুয়ে পড়লো সোফায় । তারপর অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের ভাবে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ব'লে উঠলো : 'ফুঃ !' পরক্ষণেই আবার বিড়বিড় ক'রে নিজের মনে বললে, 'আমার কাছে না-হয় এর কোনো দাম নেই—কিন্তু ওর কাছে ? ওর কাছে তো ওটা হেলাফেলার কিছু নয় ।'

আবার সে উঠে পড়লো সোফা থেকে ; ছোট্ট একটা গালার টেবিলের উপর চৌকোনো একটা বাক্স ছিলো কারুকাজ-করা—কাছে গিয়ে বাক্সটা খুলতে গিয়ে ও থেমে গেলো সে, নিজের মনেই বললো, 'শেষ চিঠিতে ও কী লিখেছিলো আমাকে ?'

বাক্সের ডালা না-খুলে সে বরং তার পাশের একটা স্প্রিঙে চাপ দিলে, অমনি নারীকণ্ঠের মৃদু মর্মর শোনা গেলো ঘরের মধ্যে : 'ভাই আমার ! কেমন লাগে তোমার আমাকে ? প্রথমবার চাঁদের মাইহোয়া ফুলের চেয়েও সুন্দর ? দ্বিতীয়ার চাঁদের আলোয় ফুলে-ওঠা খুবানির চেয়েও মিষ্টি ? তৃতীয়ার চাঁদের জ্যোৎস্নার ঝলমল-করা পীচ ফলের চেয়েও মধুর ? লাগে না কি ? তোমার জন্যে দশ হাজার ভালোবাসা রইলো ।'

'বেচারা !' দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে কিন-ফো । বাক্সের ডালা খুলে কতগুলো ফুটকি-বসানো টিনের পাতটা তুলে ফেলে নতুন আরেকটা টিনের চাক্তি বসালে সে । এই বাণী-মাধুরী বহন ক'রে এনেছে ফোনোগ্রাফ, যা কিনা এডিসন সবেমাত্র এই সেদিন আবিষ্কার করেছেন ।

এবার কিন-ফো নিজে এই রহস্যময় ছোট্ট কলটির উপর ঝুঁকে পড়লো । কথা বলতে গিয়ে সে যেন তখনো কিছুক্ষণ ধ'রে সেই স্বচ্ছ, নরম নারীকণ্ঠের মৃদু মর্মর শুনতে পাচ্ছিলো—কিন্তু তার চোখে-মুখে কোনো ভাবই ফুটলো না —না দুঃখের, না আনন্দের । কথা তার অল্পই ছিলো । কথা শেষ হ'তেই সে কলটা থামিয়ে দিলে ; তারপর তুলে নিলে সেই টিনের চাক্তি, যার উপর ছোট্ট একটা সূঁচ তার কথা গেঁথে রেখে গেছে ; চাক্তিটা একটা খামে পুরে সে ডানদিক থেকে ঠিকানা লিখলো :

মাদাম লা-ও
চা-কোআ অ্যাভিনিউ
পেইচিং

বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় চাপ দিতে না-দিতেই একটি ভৃত্য এসে ঘরে ঢুকলো। তক্ষুনি কিন-ফো তার চিঠি ডাকঘরে পাঠিয়ে দিলে!

ঘণ্টাখানেক কেটে গেলো। আবার গিয়ে শুয়ে পড়লো কিন-ফো। বেতের তৈরি চু-ফু-দজন বা ঠাণ্ডা বালিশে হাত রেখে শুয়ে পড়তেই চট ক'রে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

৫

দুঃসংবাদ

'এখনো আমার কোনো চিঠি আসেনি, বুড়ি-মা?'

'না, মাদাম, এখনো তো এলো না।'

পেইচিঙের চা-কোআ অ্যাভিনিউতে নিজের ঘরে ব'সে সেদিন অন্তত দশবার এই প্রশ্ন করেছে সুন্দরী লা-ও, আর তার বুড়ি দাসী নান তাকে প্রতিবারই এই উত্তর দিয়েছে; নান তার দাসী হ'লে কী হয়, লা-ও তাকে চিনে প্রথা অনুযায়ী 'বুড়ি মা' ব'লে ডাকে।

লা-ওর বয়স যখন ছিলো আঠারো, তখন ডবল বয়সী এক পণ্ডিতের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিলো; সে-কো-ৎসোয়ান-চো নামে এক কোষগ্রন্থ সংকলন করছিলেন তিনি; বিয়ের তিন বছর পরেই তাঁর যখন মৃত্যু হ'লো, লা-ও একেবারে একা হ'য়ে পড়লো।

তার কিছুদিন পরেই কী-জন্য যেন কিন-ফো এসেছিলো পেইচিঙে; ওয়াং-এর সঙ্গে তরুণী লা-ওর আলাপ ছিলো আগেই, এবার তার বন্ধু ও ছাত্রের সঙ্গে লা-ওর পরিচয় করিয়ে দিলে সে; ভালো লাগলে তাকে বিয়েও করতে পারে, এই কথাও বললে সে তার ছাত্রকে। কিন-ফোর তাতে কোনো দ্বিরুক্তি বা অসম্মতি দেখা গেলো না; তরুণীটিরও যে এতে বিশেষ অনীহা ছিলো, তাও নয়; ফলে অচিরেই, দার্শনিকের ঘটকালির দরুন, ঠিক হ'লো যে পেইচিং থেকে ফিরে কিন-ফো শাংহাইতে যথোচিত ব্যবস্থা করলে পর ধুমধাম ক'রে বিয়েটা হ'য়ে যাবে।

চিন সাম্রাজ্যে বিধবাবিবাহ খুব-একটা হয় না; এমন নয় যে বিধবাদের বিয়ে-করার ইচ্ছে থাকে না, বরং পুরুষরাই সহজে বিধবাবিবাহে রাজি হয় না। কিন-ফো অবশ্য সেই গড্ডলিকাপ্রবাহের অন্তর্ভুত নয়—তাই এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে তার একটুও দ্বিধা দেখা গেলো না। লা-ও শুধু বুদ্ধিমতীই নয়, উচ্চশিক্ষিতাও; এই-যে যুবকটি তার স্বামী হ'তে চলেছে, কোনো-কিছুতেই যার আগ্রহ নেই, বা রুচি নেই, তাকে কী ক'রে সুখী করবে এটাই তার এখন একমাত্র ভাবনা।

পুনর্বিবাহের ফলে অবশ্য সাধ্বীদের সদ্‌গতি তার হবে না; স্বামীর মৃত্যুর পরে যারা

মৃতস্বামীর স্মৃতি বুকে ক'রে দুঃখে কষ্টে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়, সম্রাটেরা মাঝে-মাঝে চিনদেশে তার নামে 'পাই-লু' বা স্মৃতিস্তম্ভ রচনা ক'রে দেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সুং তার স্বামীর সমাধি ছেড়ে মুহূর্তের জন্যও নড়েনি ব'লে তার নামে এ-রকম এক স্মৃতিফলক রচনা করা হয়েছিলো ; কুং-কিয়াং নামে আরেকজন স্ত্রীলোক তাঁর দুঃখের প্রতীক হিশেবে হাত কেটে ফেলে ছিলো ; ইয়েন-ৎচিয়াং নামে আরেকজন আরো গভীরভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছিলো নিজেকে—তাদেরও সম্রাটের বদান্যতা কখনো ভোলোনি। লা-ও অবশ্য এই স্মৃতিস্তম্ভের লোভ ত্যাগ করেই পুনর্বিবাহে সম্মতি দিয়েছে। পণ্ডিত স্বামীর মৃত্যুর পর তার যে খুব সচ্ছল দিন চলে তা নয়—তবে কোনো কষ্ট হয় না, অনায়াসেই দিন কেটে যায়। চা-কোআ অ্যাভিনিউর বাড়িটা তেমন জমকালো নয়, বুড়ি নান ছাড়া আর-কোনো দাস-দাসীও নেই। এই তরুণী বিধবার প্রিয় ঘর হ'লো যে-ঘরে ব'সে সে সাজগোজ করে। দু-মাস আগেও এ-ঘরের আশবাবপত্র ছিলো নিতান্তই শাদাশিদে—কিন্তু গত দুমাস ধ'রে শাংহাই থেকে রোজ দামি-দামি উপহার আসছে। সম্প্রতি এসেছে প্রাচীন চৈনিক চিত্রকলার কতকগুলি ঝলমলে নিদর্শন ; দেয়ালে টাঙিয়েছে লা-ও সে-সব ; তাদের মধ্যে একটা ছবি হ'লো ওয়ান-ৎসে-নেন-এর—চিত্রশিল্পের যে-কোনো শমঝদারই এই প্রাচীন শিল্পীর তুলির টান ও রঙের পোঁচ দেখে মুগ্ধ না-হ'য়ে পারবে না। আধুনিক চৈনিক চিত্রকলায় যে সবুজ ঘোড়া, বেগনি কুকুর, উজ্জ্বল নীল গাছের বিশ্রী ছড়াছড়ি, ওয়ান-ৎসে নেন-এর যাবতীয় চিত্রকর্মেই তার সুস্নিগ্ধ বিরোধিতা। পাশেই গালার টেবিলে মস্ত প্রজাপতির পাখার মতো প'ড়ে আছে সোয়াটোর শিল্পবিদ্যালয়ের শৌখিন হাতপাখা। পোর্সেলেনের ফুলদানি ভরা আরব্য কাগজের ফুল : কাছে থেকে খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে এ-সব জাপানি লিলি বা চন্দ্রমল্লিকা নয় ; জানলায় ঝুলছে বেতের পরদা যার ফলে ঘরের মধ্যে বেশি গরম ঢুকতে পায় না ; এমনি আরো-কত ছোটোখাটো শৌখিন জিনিশের মধ্যে যে প্রবাসী প্রেমিকের ভালোবাসার ছাপ লুকিয়ে আছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

লা-ও কেবল লাবণ্যময়ীই নয়, সুন্দরীও—তার রূপের প্রতিভাস এমনকী ইওরোপীয়দেরও মুগ্ধ করবে। গাত্রবর্ণ স্নিগ্ধ গৌর, মোঙ্গোলদের মতো পীতবর্ণ নয় ; কালো তার চোখের পাতা, দীর্ঘ, ঘন, কালো তার চুল, সবুজ পাথর বসানো চুলের কাঁটা দিয়ে পীচ-ফুল গোঁজা খোঁপায় ; মুক্তোর মতো শাদা ছোটো-ছোটো দাঁত ; তুলির সূক্ষ্ম টানে চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে আঁকা যেন তার ভুরু। কোনো প্রসাধন সে ব্যবহার করে না—এমনকী মধু-মেশানো এস্পানি পাউডার পর্যন্ত না ; রঙ মেখে আরক্ত করে না অধর ; চোখে শুর্মা দিয়ে দীঘল করে না কখনো ; গালে-চিবুকে কোথাও ব্যবহার করে না রুজ, চিনদেশে যার জন্য কি না বছরে দশ মিলিয়ন সাপেক খরচ হয়। লা-ওর কোনো সম্বন্ধই নেই প্রসাধনের সঙ্গে। ক্বচিৎ যখন বাড়ি থেকে বেড়াতে বেরোয়, তখন প্রসাধনের কথা সে ভাবেই না একেবারে, কারণ সে জানে যে এতে তার কিছু এসে যায় না—চিনে মহিলারা যেমন লোকসমক্ষে বেরুবার সময় নিজেদের নানাভাবে জাহির করতে চান, লা-ও কখনোই সেই গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসতে চায়নি।

পোশাকও তার খুব শাদাশিধে—কিন্তু রুচি ও আভিজাত্যের ছাপ থেকে যায় যেন কোথায়। কুচি-দেয়া ঘাঘরার উপরে লম্বা জামা পরে সে, চারপাশে লেসের কাজ করা ;

কোমরে জড়ায় জরির ফিতে ; খাটো পাজামার নিচে পরে নানকিং রেশমের পাৎলা মোজা, দামি পাথর আর মুক্তো বসানো চপ্পল থাকে পায়ে। নরম স্পর্শভীরু তার হাত দুটি ; গোলাপি নখের উপর থাকে রুপোর ছোট্ট অঙ্গুলিত্রাণ '।

পা দুটি তার স্বভাবতই ছোটো। চিনদেশে অবশ্য সাত শতাব্দী ধ'রে মেয়েদের পায়ের আকার সুন্দর ক'রে তোলবার জন্য একটা বর্বর প্রথা চ'লে আসছে: কোনো রাজকন্যা হয়তো একদা খুঁড়িয়ে হাঁটতো আর তার অসুখ সারাবার জন্য হয়তো প্রথম এই উপায় প্রয়োগ করা হয়—কিন্তু পরে বোধহয় কতিপয় অত্যুৎসাহী পতিদেবতার জন্য এটা একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে যায় ; পদ্ধতিটা খুবই সহজ : পায়ের পাতা ভাঁজ ক'রে পট্টি বেঁধে রাখতে হয়, যাতে গোড়ালিতে কখনো চাপ পড়ে না ; কিন্তু এর ফল হয় বিষম ক্ষতিকর, কারণ শেষটায় এমনকী হাঁটা-চলার ক্ষমতাও চ'লে যায় ; এই প্রথা অবিশ্যি ক্রমেই উঠে যাচ্ছে ; আজকাল হয়তো প্রতি দশজনে মাত্র তিনজন চিনেরমণী দেখা যাবে, ছেলেবেলায় যাদের এই ভীষণ সৌন্দর্যচর্চার বলি হ'তে হয়েছিলো।

'যাও না, বুড়ি-মা, আবার গিয়ে দেখে এসো,' আরেকবার বললে লা-ও।

নান বললে, 'কী হবে গিয়ে ?'

'সে-কথা তোমার ভাবতে হবে না। তোমাকে যা বলছি তা-ই করো। গিয়ে খোঁজ ক'রে এসো একবার : আমি ঠিক জানি আজ আমার নামে একটা চিঠি আসবে।'

বুড়ি নান গজ-গজ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সময় কাটাবার জন্য লা-ও একটা শেলাই তুলে নিলে হাতে ; কিন-ফোর জন্য সম্প্রতি একটা কাজ-করা চটি বানাচ্ছে সে। চিনদেশে সবাই শেলাই জানে, কাপড়ের উপর সুন্দর কাজ তুলতে পারে। কিন্তু একটু পরেই আবার সে কাজটা নামিয়ে রাখলো। উঠে গিয়ে ছোট্ট একটা বনবনের বাক্স থেকে কয়েকটা তরমুজের বিচি বের ক'রে নিয়ে তার ছোটো দাঁতে খুঁটতে লাগলো। তাও যখন ভালো লাগলো না, হাতে তুলে নিয়ে একটি বই, বিবাহেচ্ছু তরুণীদের প্রতি নানা নির্দেশ আছে বইটিতে, নাম 'নুশুন'। অন্যমনস্কভাবে উপদেশগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে গেলো সে : 'বসন্তের মতো ঊষাকালই হচ্ছে কাজ করার সেরা সময়। . . . রাত থাকতেই উঠবে ঘুম থেকে শুয়ে কাটালে চলবে না। . . . তুঁতগাছ, শনখেত —সবকিছুরই যত্ন নেবে। . . . . . নিজের কাপড় বুনতে ভুলবে না—তা সে সুতিই হোক আর রেশমেরই হোক। . . . স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ হ'লো অবিশ্রাম পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা।'

কিন্তু পড়তেও আর ভালো লাগলো না ; কতগুলো হরফই কেবল চোখে পড়ছে তার—মন প'ড়ে আছে অন্যখানে ; বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে।

'কোথায় আছে ও এখন ?' নিজের সঙ্গেই সে বলাবলি করতে লাগলো, 'নিশ্চয়ই কোয়াংতুং থেকে ফিরে এসেছে এতক্ষণে ; কবে আসবে ও এখানে ? কোয়ানাইন—তুমি ওর চলাফেরায় দৃষ্টি রেখো—দেখো, যেন ও কোনো বিপদে না-পড়ে।'

কলের পুতুলের মতো তার চোখ গিয়ে পড়লো একটা টেবিলক্লথের উপর ; মোজেইক-এর মতো টুকরো টুকরো কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি টেবিল-ঢাকাটা, আর তার উপরে এক কাচ্চাবাচ্চা-সমেত রাজহাঁস আঁকা : পাতিব্রত্যের প্রতীক এই ছবি।

একটা ফুলদানির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে—চোখ বুজে ফুলদানি থেকে একটা তোড়া তুলে নিলো ।

'হায়রে !' ভাঙা গলায় সে ব'লে উঠলো, 'ভাগ্য দেখছি বিরূপ আমার প্রতি ! উইলোর ফুল তোলা উচিত ছিলো আমার : বসন্তের প্রতীক ; তার বদলে কিনা হাতে উঠে এলো হলদে চন্দ্রমল্লিকা : হেমন্তের ইঙ্গিত—বিদায়ের, অবসানের প্রতীক !'

এই অলুক্ষুণে ইঙ্গিতটা সে ভুলে যেতে চাইলো ব'লেই তার ছোট্ট সারেঙিটা তুলে নিয়ে 'পাণিগ্রহণের গান' বাজাতে শুরু করলে, কিন্তু গানের বাণী গলায় এলো না ঠিক মতো ; আর চেষ্টা না-ক'রে সারেঙিটা সে নামিয়ে রাখলে ।

আবার বললে আপন মনে, 'এমন তো কখনো হয় না—কোনো দিনই তো ওর চিঠি আসতে এত দেরি হয় না । কী সুন্দর ওর চিঠিগুলো—কী মিষ্টি ; ও যা লিখে পাঠায় শুধু যে তাই, তা নয়, ওর কথাগুলোও কী মিষ্টি, আর বারে-বারে শোনা যায় সেই গলা,'- —আপনা থেকেই তার চোখ গিয়ে পড়লো কিন-ফোর গ্রামোফোনের উপর । গালার টেবিলে বসানো চৌকো বাক্সটাই লা-ওর গ্রামোফোন ; শাংহাইতে কিন-ফো যা ব্যবহার করেছিলো হুবহু তারই মতো দেখতে । এর ফলে বারে-বারে পরস্পরের গলা শুনতে পারে তারা । কিন্তু কয়েকদিন ধ'রে—হায়রে—লা-ওর গ্রামোফোন কোনো কথা বলছে না—চুপ ক'রে প'ড়ে আছে ।

বুড়ি নান এসে ঢুকলো ঘরে ।

'এই নাও তোমার চিঠি,' ব'লে সে যেমন দুমদাম ক'রে এসেছিলো, তেমনি দুমদাম ক'রে চ'লে গেলো ।

খামটার উপর শাংহাই-র ডাকঘরের ছাপ ; কিন্তু বাইরেটা তাকিয়ে দেখার তর সইছে না তখন লা-ওর ; ঝলমলে মুখে স্মিত হেসে সে খামের মুখটা ছিঁড়ে নিলে ; সাধারণ কোনো চিঠি বেরোলো না খাম থেকে—ফুটকি বসানো গোল একটা টিনের চাক্তি বেরিয়ে এলো শুধু—গ্রামোফোনে চাপিয়ে না-দিলে এই ফুটকিগুলো এইভাবেই বোবা আর স্তব্ধ হ'য়েই থাকবে ; আর ততক্ষণ সেই আশ্চর্যসুন্দর ঈষৎবিষণ্ন স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যাবে না কিছুতেই ।

'চিঠি তো নয়, চিঠির চেয়েও বেশি !' লা-ও চেঁচিয়ে উঠলো যেন, 'ওকে কথা বলতে শুনতে পাবো আমি —'

অসীম যত্নের সঙ্গে সন্তর্পণে ওই চাক্তিটা বসিয়ে দিলো গ্রামোফোনের চাক্তিতে, তারপর যেই ওটা ঘুরতে শোনা গেলো, অমনি ঘরের মধ্যে ঝমঝম ক'রে উঠলো তার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর :

'লা-ও, বোন আমার ! আমার শেষ কপর্দকটুকু পর্যন্ত হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো, একেবার নিঃস্ব হ'য়ে পড়েছি আমি এখন : হেমন্তের হাওয়ায় যেমন ক'রে ঝরা পাতা উড়ে যায়, তেমনি আজ আমার সর্বস্ব হারিয়ে গিয়েছে । আমার দুঃখের, আমার কৃচ্ছ্রতার সাথী আমি করতে পারি না তোমাকে । ভুলে যাও তুমি, চিরতরে ভুলে যাও যে হতভাগ্য আর হতাশ একজনকে তুমি জানতে, যার নাম ছিলো : কিন-ফো ।'

হায়রে, তার সব প্রত্যাশায় এ কী মর্মান্তিক আঘাত এসে লাগলো ! আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠলো তার হৃদয় : তীব্র-এক বেদনায় ভ'রে গেলো তার পেয়ালা, কী তিক্ত ও বিষাক্ত

এই বেদনা। তবে কি কিন-ফো তাকে ত্যাগ করলো ? তবে কি সে ভেবেছিলো যে শুধু ঐশ্বর্যেই মুগ্ধ হবে লা-ও—ঐশ্বর্যেই সুখী হবে, তৃপ্তি পাবে ! সুতো-ছিঁড়ে যায় ঘুড়ির মতো আস্তে ঘুরে-ঘুরে মাটিতে নেমে এলো লা-ও !

নানকে ডাকা হ'লো তক্ষুনি। কিন্তু নান এলো ধীরে-সুস্থে হেলেদুলে। এসে, তার দশা দেখে, বিরক্তি ও হতাশা ভরে কাঁধ ঝাঁকালো শুধু একবার, তার পর বাড়ির কর্ত্রীকে ধরাধরি ক'রে তার 'হ্যাং'-এ শুইয়ে দিলো। কৃত্রিম উপায়ে গরম-করা বিছানাকেই 'হ্যাং' বলে চিনেরা। কিন্তু লা-ওর কাছে সেই উষ্ণ কোমল শয্যা ঠেকলো কনকনে পাষাণশয্যার মতো—সেই রাত্রির দীর্ঘ পাঁচটি প্রহর কাটলো বিধুর, করুণ ও তন্দ্রাহীন।

৬

বিমা-কম্পানি সেণ্টেনারিয়ান

পরের দিন সকালবেলায় কিন-ফো একাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। জীবন সম্বন্ধে তার আগ্রহহীনতার কিন্তু মোটেই কোনো ব্যত্যয় হয়নি। তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নদীর ডান তীর ধ'রে খানিকটা গেলেই পড়ে একটা কাঠের সাঁকো— মার্কিন আর ইংরাজ বসতির মধ্যে এই সাঁকোটাই যোগাযোগ রক্ষা ক'রে আছে। সাঁকো পেরিয়ে গিয়ে মিশন চার্চ, আর তার খানিক পরেই মার্কিন দূতাবাস; কিন-ফো মিশন চার্চ পেরিয়ে গিয়ে একটা সুন্দর বাড়িতে ঢুকে পড়লো—মার্কিন দূতাবাস অব্দি আর গেলো না।

বাড়িটির ফটকেই মস্ত পিতল ফলকে লেখা :

দি সেণ্টেনারিয়ান
ফায়ার অ্যাণ্ড লাইফ ইনশিওরেন্স কম্পানি
মূলধন : ২০,০০০,০০০ ডলার
প্রধান প্রতিনিধি : উইলিঅম. জে. বিড়ুল্‌ফ

কোথাও না-থেমে কিন-ফো সোজা বারান্দা পেরিয়ে একটা হলঘরে গিয়ে ঢুকলো, তারপর সেখান থেকে ভিতরের আরেকটা ঘরের সুয়িং দরজা খুলে সোজা একটা আপিশঘরে ঢুকে পড়লো; ছোটো পিল্পে-বসানো খাড়া একটা বুক সমান উঁচু রেলিং দিয়ে আপিশটা দুটো ঘরে ভাগ করা। কতগুলো বাক্স, মোটা ধাতুনির্মিত আংটা লাগানো কতগুলো মস্ত হিশেবের খাতা, একটা মার্কিন সিন্দুক, দুটো-তিনটে টেবিলে কর্মরত কয়েকজন কেরানি, আর স্বয়ং উইলিঅম জে. বিড়ুল্‌ফের জন্য অজস্র খুপরি আর দেরাজওলা একটা টেবিল—এইসব আশবাব দিয়েই ঘরটা সাজানো; দেখে ঠিক য়ু সুঙের কোনো প্রতিষ্ঠান ব'লে মনে হয় না, বরং নিউ-ইয়র্কের ব্রডওয়ে হ'লে বোধহয় আরো মানাতো।

উইলিঅম জে. বিড়ুল্‌ফ একটা নামজাদা আগুন ও জীবনবিমা কম্পানির সমগ্র চিনদেশের প্রধান প্রতিনিধি—কম্পানির হেড আপিশ হচ্ছে শিকাগোয়। *সেণ্টেনারিয়ান*—

শতবর্ষ যাদের পরমায়ু—কম্পানির নামটা এমন লাগসই হয়েছে যে জনপ্রিয়তার বুঝি সেটাই সবচেয়ে বড়ো কারণ। জগতের সব দেশেই এই কম্পানির প্রতিনিধি ও শাখা রয়েছে— আর কম্পানির বিধিসংহিতা অত্যন্ত উদার ও উদ্দীপক ব'লে ব্যাবসা ক্রমশ ফেঁপেই উঠছে। এমনকী চিনেম্যানরা শুদ্ধু এই বিমাব্যবস্থায় বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছে, যার ফলে এই ধরনের বহু কম্পানি আজকাল ক'রে খাচ্ছে। আগুনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অনেকেই বাড়ি-বিমা ক'রে ফেলেছে এর মধ্যে; জীবনবিমাও আজকাল নেহাৎ কম হচ্ছে না। সেন্টেনারিয়ানের প্রতীকচিহ্ন যে-ঢালটি, হরদম আজকাল আশপাশের বাড়ির গায়ে তা চোখে পড়ে—এমনকী কিন-ফোর মতো বড়োলোকের পাড়ার ইয়ামেনগুলোতেও প্রায়ই ওই ছোট্ট প্রতীকচিহ্নটি দেখা যায়। অগ্নিবিমা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম বহু আগেই সম্পন্ন করেছিলো কিন-ফো, কাজেই আজ হন্তদন্ত হ'য়ে সে যে আপিশে এসে উইলিঅম জে. বিডুল্‌ফের খোঁজ করছে, তা নিশ্চয়ই ওজন্যে নয়।

বিডুল্‌ফ ভিতরেই ছিলেন; এখানে দিন-রাত্রি ফোটো তোলা হয়, এই বিজ্ঞপ্তি আঁটা দোকানের ফোটোগ্রাফারের মতো চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি লোকের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছেন। বয়েস বোধহয় পঞ্চাশ হবে তাঁর, মার্কিন কেতার দাড়ি-গোঁফমণ্ডিত মুখমণ্ডল; পরেন নিখুঁত মিশকালো পোশাক, গলায় ধবধবে শাদা গলবন্ধ। বিনীতভাবে তিনি জিগেশ করলেন, 'জানতে পারি কি কার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করলাম?'

উত্তরে হ'লো, 'একেবারে অচেনা বোধ করি নই। আমি শাংহাই-র কিন-ফো।'

'আরে! তা-ই তো! সত্যি তো! শাংহাইর মিস্টার কিন-ফো—আমাদেরই তো মক্কেল। পলিসি নাম্বার ২৭,২০০। যদি আপনার আরো-কোনো কাজে লাগতে পারি তো নিজেকে ধন্য মনে করবো—'

'ধন্যবাদ,' কিন-ফো বললো, 'আপনার সঙ্গে গোপনে দু-একটি কথা আছে।'

'গোপনে? নিশ্চয়ই, আসুন—'

তক্ষুনি মক্কেলকে ভারি দরজাওলা পরদাঢাকা একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'লো: এখানে ব'সে কেউ যদি রাজদ্রোহের শলাপরামর্শও করে তবু কারু সে-কথা শোনবার উপায় নেই, এমনকী সবচেয়ে ধূর্ত 'তি-পাও'কেও এখানে আড়ি পাততে গিয়ে ব্যর্থ হ'তে হবে। কিন-ফো ইংরেজি জানে; বিডুল্‌ফের চিনে ভাষা রপ্ত আছে: ফলে কথা বলতে গিয়ে কোনো অসুবিধেতেই পড়তে হ'লো না তাদের।

বিডুল্‌ফের ইঙ্গিতে গ্যাসচুল্লির ধারে পাতা মস্ত একটা দোলনা-চেয়ারে গিয়ে বসলো কিন-ফো—আর তক্ষুনি কাজের কথা পাড়লো।

'এক্ষুনি আমি সেন্টেনারিয়ানে একটি জীবনবিমা করতে চাই।'

'আপনার কাজে লাগতে পেরে খুবই খুশি হলুম। যৎসামান্য যা প্রাথমিক কাজ আছে তা এক্ষুনি চুকে যাবে—তারপর কেবল পলিসিতে আমাদের দুজনকে দস্তখৎ করতে হবে। আশা করি আপনি অনেক দিন বেঁচে থাকতে চান।'

'অনেক দিন বেঁচে থাকতে চাই? তার মানে?' কিন-ফো বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো, 'আমার ধারণা ছিলো লোকে হঠাৎ একদিন অল্প বয়েসে ম'রে যেতে পারে এই ভয়েই জীবনবিমা ক'রে থাকে।'

'না, না, ঠিক তার উলটো ; আমাদের কম্পানিতে জীবনবিমা করার মানে হ'লো নতুন পরমায়ু পাওয়া : আমাদের মক্কেলরা একশো বছর বাঁচতে বাধ্য । শতবর্ষ পরমায়ু পাওয়ার সবচেয়ে বড়ো গ্যারান্টিই হ'লো সেন্টেনারিয়ানে জীবনবীমা করা ।'

বিড়ুল্‌ফের কথাগুলো ঠাট্টা কিনা বোঝবার জন্য কিন-ফো মুখ তুলে তাকালো তার দিকে : কিন্তু না, জজসাহেবের মতোই গম্ভীর আর সীরিয়াস বিড়ুল্‌ফ । তার মুখ-চোখের ভঙ্গি দেখে প্রচুর সন্তোষলাভ ক'রে কিন-ফো আবার কাজের কথায় এলো : 'আমি দু-লক্ষ ডলারের জীবনবিমা করতে চাই ।'

এত-বড়ো অঙ্কের জীবনবিমা এর আগে কেউ করেনি ; কিন্তু এ-কথা শুনে বিড়ুল্‌ফের মুখের ভাবে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য বা পরিবর্তন দেখা দিলো না । একটুও অবাক না-হ'য়ে বিড়ুলফ 'দু-লক্ষ ডলার' কথাটা পুনরাবৃত্তি ক'রে নির্বিকারভাবে তাঁর নোটবইতে টুকে নিলেন ।

'কত ক'রে প্রিমিয়াম দিতে হবে এই জন্য ?' কিন-ফো জিগেশ করলো ।

বিড়ুল্‌ফ একটু হাসলেন : একটু ইতস্তত ক'রে শেষে ব'লেই ফেললেন তিনি : 'এটা জানেন নিশ্চয়ই যে আপনি যাদের এই বিমার ওয়ারিশান ক'রে যাবেন, তাদের হাতে আপনার মৃত্যু হ'লে তারা এই প্রিমিয়াম থেকে এক কানাকড়িও ফিরে পাবে না ।'

'হ্যাঁ, তা আমার জানা আছে ।'

বিড়ুলফ আবারও জিগেশ করলেন, 'জানতে পারি কি কী ধরনের বিপদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আপনি বিমা করতে চাচ্ছেন ?

'সবরকম বিপদের হাত থেকেই, বলা বাহুল্য,' তক্ষুনি জানালো কিন-ফো ।

'বেশ,' এবার বিড়ুল্‌ফ ধীরে-ধীরে স্পষ্ট করলেন, 'চিন সাম্রাজ্যের বাইরে কি ভিতরে, জলে কিংবা স্থলে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে কি আদালতের বিচারে কি রণক্ষেত্রে—যেখানেই মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিক না কেন, সর্বত্র সবকিছুর বিরুদ্ধে আমরা ইনশিওর ক'রে থাকি । কিন্তু আপনি তো বুঝতেই পারছেন একেক ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার অত্যন্ত বেশি থাকে—কারণ সব বিপদ তো আর সমান নয়—কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বেশ চড়া প্রিমিয়ামই দিতে হয় ।'

'যা লাগবে তা-ই দেবো,' কিন-ফো বললে, 'একটা আশঙ্কার কথা আপনার ওই ফর্দতে নেই ; সেন্টেনারিয়ান আত্মহত্যার বিরুদ্ধেও ইনশিওর করে কিনা, তা আপনি বলেননি ।'

'করে বৈকি, নিশ্চয়ই করে,' অত্যন্ত পরিতোষের সঙ্গে হাত কচলাতে-কচলাতে বিড়ুল্‌ফ বললেন, 'আমাদের সবচেয়ে বেশি লাভ হয় ওতেই । আমাদের মক্কেলদের মধ্যে যাঁরা আত্মহত্যার বিরুদ্ধে ইনশিওর করেন, তারাই কিন্তু জগতে সবচেয়ে বেশি দিন বাঁচেন । তবু, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এ-ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার অসম্ভব চড়া হ'য়ে থাকে ।'

'প্রিমিয়ামের হার কোনো বাধাই নয় । জীবনবিমা করার বিশেষ কারণ আছে আমার । যা লাগবে তা-ই আমাকে দিতে হবে বৈকি ।

'বেশ, তাহ'লে তো ভালোই,' ব'লে বিড়ুল্‌ফ তাঁর নোটবইতে আরো কতগুলি তথ্য টুকে নিলেন । 'আমার ভুল হ'লে শুধরে দেবেন : আপনি জলে-ডুবে-মরা, আত্মহত্যা, দ্বন্দ্বযুদ্ধে মৃত্যু—এ-সবের বিরুদ্ধে বিমা করতে চান—'

স্বভাববিরুদ্ধ অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে কিন-ফো বাধা দিলে, 'সব-কিছুর বিরুদ্ধে বিমা করতে চাই, সব-কিছুর বিরুদ্ধে !'

বিডুল্‌ফ আবারও তার এই মহৎ উদ্দেশ্যের কথা শুনে সাধুবাদ জানালেন : 'বেশ। তাহ'লে তো কথাই নেই —'

'কত প্রিমিয়াম দিতে হবে, এটাই এবার বলুন ।'

'আমাদের প্রিমিয়ামের হার একেবারে অঙ্ক ক'ষে নির্ভুলভাবে বের করা আছে । আমাদের কম্পানির গর্বই এটা যে হিশেবে আমাদের কোনো ভুল হয় না—কম্পানির শক্ত খুঁটিই এটা । আগের মতো দ্যপারসিয়োর তালিকার উপর আর নির্ভর করতে হয় না আমাদের ।'

'দ্যপারসিয়ো ? তা আবার কী ?' কিন-ফো কিঞ্চিৎ অধীর হ'লো ।

'আপনি জানেন না ?' বিডুল্‌ফের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, 'দ্যপারসিয়ো ছিলেন একজন নামজাদা নিবন্ধক—বিমার কিস্তির হার সম্বন্ধে মস্ত বিশেষজ্ঞ—অবশ্য অনেকদিন আগে জন্মেছিলেন তিনি—সত্যি-বলতে, এখন আর বেঁচে নেই । তৎকালে বিমার কিস্তির হার সম্বন্ধে যে-সুবিপুল সারণি বা নির্ঘণ্ট তিনি তৈরি করেছিলেন, ইওরোপের বিভিন্ন কম্পানিতে এখনো সেটাই ব্যবহৃত হয় । তখন লোকের পরমায়ু এখনকার চেয়ে অনেক কম ছিলো । আমরা কিন্তু এখন লোকের আয়ুর হার বেড়ে গেছে ধ'রে নিয়েই নতুন সারণি তৈরি করেছি—তার ফলে আমাদের মক্কেলরা অনেক বেশি সুবিধে পান ; তাঁরা যে শুধু অনেক দিন বেঁচেই থাকেন তা নয়, তাঁদের প্রিমিয়ামও দিতে হয় অনেক কম ।'

'আমাকে কী হারে প্রিমিয়াম দিতে হবে, সেটা বলতে বললে আপনাকে কি মুশকিলে ফেলা হবে ?' সেণ্টেনারিয়ানের তারিফ শুনতে-শুনতে কিন-ফো বিরক্ত হ'য়ে উঠছিলো : বিডুল্‌ফ যে প্রশংসার পুনরাবৃত্তি না-ক'রেই তাকে সহজে মুক্তি দেবেন, এটা তার মনে হচ্ছিলো না ।

'বিমার কিস্তির হার বলবার আগে আপনাকে একটু বিরক্ত করবো । আপনার এখন বয়স কত, সেটা একটু জানা দরকার ।'

'একুত্রিশ ।' কিন-ফো জানালে ।

'একুত্রিশ ?' বিডুল্‌ফ তক্ষুনি জানালেন, 'একুত্রিশ বছর বয়সে অন্য কম্পানিতে আপনাকে শতকরা ২.৮৩ হিশেবে প্রিমিয়াম দিতে হবে—কিন্তু সেণ্টেনারিয়ানে লাগবে মাত্র ২.৭২ হিশেবে । দেখলেন তো, আমাদের কাছে এসে আপনার কত লাভ হ'লো । আচ্ছা দেখি : দু-লক্ষ ডলারের জন্য আপনাকে বার্ষিক ৫৪০০ ডলার প্রিমিয়াম দিতে হবে ।'

'কিন্তু তা নিশ্চয়ই ও-সব সাধারণ আশঙ্কার জন্য,'—কিন-ফো বাধা দিয়ে জিগেশ করলে ।

'হ্যাঁ,' বিডুল্‌ফ সায় দিলেন ।

'কিন্তু সমস্ত আশঙ্কার বিরুদ্ধে, প্রতিটি বিপদের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে, আত্মহত্যার আশঙ্কার বিরুদ্ধে, বিমা করলে কত পড়বে ?' কিন-ফো জানতে চাইলো ।

'তা ঠিক—সেক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার অন্য—' ব'লে বিডুল্‌ফ তাঁর নোট বইয়ের পাতা উলটে একেবারে শেষ পাতায় চ'লে গিয়ে এক ছাপা তালিকা বার করলেন । এক নজর

চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি মুখ তুলে আস্তে-আস্তে বললেন, 'এ-ক্ষেত্রে আমরা বোধহয় শতকরা পঁচিশ—এই হারের কমে পারবো না ।'

'তার মানে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার ডলার প্রিমিয়াম দিতে হবে,' কিন-ফো বিশদ করতে চাইলো ।

'ঠিক তাই ।'

'কীভাবে দিতে হবে টাকাটা ?' মক্কেল জানতে চাইলো ।

'বছরে একবারে থোক টাকাটাও দিতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে মাসিক কিস্তিতেও দিতে পারেন ।'

'তাহ'লে প্রথম দু-মাসের প্রিমিয়াম হিশেবে কত টাকা দিতে হবে ?'

'আগাম দিলে দু-মাসের জন্য দিতে হবে ৮,৩৩৩ ডলার । এখন—অর্থাৎ এপ্রিলের শেষে দিলে—৩০শে জুন তার মেয়াদ ফুরোবে ।'

পকেট থেকে নোটের তাড়া বের ক'রে কিন-ফো তক্ষুনি সব চুকিয়ে দিতে চাইলো ।

'একটু ক্ষমা করতে হবে,' বিডুল্‌ফ বললেন 'পলিসি চালু করার আগে আরেকটা ছোট্ট ব্যাপারে একটু নিয়মরক্ষা ক'রে নিতে হবে ।'

'তাই নাকি ? তা সেটা কী, শুনি ।' কিন-ফো জিগেশ করলো ।

'আমাদের ডাক্তার গিয়ে আপনাকে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবেন । আপনার এমন-কোনো অসুখ আছে কি না যার ফলে হঠাৎ একদিন আপনি দুম ক'রে ম'রে যেতে পারেন, এ-বিষয়ে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন দিতে হবে তাঁকে ।'

'কিন্তু,' কিন-ফো বাধা দিলো, 'আমি যখন যাবতীয়, অসুখবিসুখ, বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা, আত্মহত্যার বিরুদ্ধেই বিমা করছি, তখন এই ডাক্তারি পরীক্ষার প্রহসন আর কেন ?'

বিডুল্‌ফ আকর্ণ হাসলেন । 'এমনও তো হ'তে পারে যে এখুনি আপনার হয়তো এমন-কোনো অসুখ রয়েছে যার ফলে দু-মাসেই আপনাকে অক্কা পেতে হ'লো—তখন তো আমাদের দু-লক্ষ ডলার ডাহা লোকশান দিতে হবে !'

'কিন্তু আত্মহত্যার সম্ভাবনাই যখন র'য়ে গেছে তখন অসুখ-বিশুখে আর বেশি কী ক্ষতি হবে,' কিন-ফো একেবারে নাছোড়বান্দা ।

মক্কেলের হাতটি নিজের করতলে গ্রহণ ক'রে আস্তে চাপ দিয়ে বিডুল্‌ফ বললেন, 'আপনাকে কি আগেই বলিনি যে আমাদের কাছে যাঁরা আত্মহত্যার বিরুদ্ধে বিমা করেন, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি দিন বাঁচেন ? অবশ্য এই সঙ্গে আরেকটা তথ্যও আপনাকে জানাই : আমাদেব এখানে বিমা করলে সেন্টেনারিয়ান সবসময় গোপনে আপনার সব-কিছুতেই কড়া নজর রাখবে । তাছাড়া কিন-ফোর মতো মস্ত ধনী যে কোনোকালে আত্মহত্যার কথা ভাবতে পারেন, সেই সম্ভাবনা কি সুদূরপরাহত নয় ?'

'কিংবা এমনও তো হ'তে পারে যে এ-কথাটা অত্যন্ত বেশি ক'রে ভাবছে ব'লেই জীবন-বিমা করার কথা উদিত হয়েছে তার মনে ।' কিন-ফো উত্তর দিলে ।

'উঁহু, মোটেই তা নয়,' বিডুল্‌ফও পালটা জবাব দিলেন, 'সেন্টেনারিয়ানে বিমা করার অর্থই হ'লো দীর্ঘজীবী হওয়া—শেষকালটা সুখে কাটানো ।'

যুক্তিতর্কে বিডুল্‌ফকে যে কাৎ করা যাবে না, কিন-ফো তা স্পষ্ট বুঝতে পারলে ।

বিড়ুল্ফ জিগেশ করলেন, 'এই দু-লক্ষ ডলারের ওয়ারিশান কাকে ক'রে যাবেন আপনি ?

'এ-কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছিলুম,' কিন-ফো উত্তর দিলে, 'আমি চাই যে আমার মৃত্যুর পর আমার প্রিয় বন্ধু ওয়াং পাক পঞ্চাশ হাজার ডলার, বাকি দেড় লক্ষ ডলার পান পেইচিঙের মাদাম লা-ও।'

বিড়ুল্ফ তাঁর নোটবইতে নির্দেশগুলো টুকে নিলেন, তারপর জানতে চাইলেন মাদাম লা-ওর সঠিক বয়স এখন কত।

'মাদাম লা-ওর একুশ।' কিন-ফো জানালো।

বিড়ুল্ফের চোখের তারায় কৌতুক ঝলমল ক'রে উঠলো, 'এ-টাকা পেতে-পেতে তিনি থুরথুরে বুড়ি হ'য়ে যাবেন। ...আর আপনার বন্ধু ওয়াং—তাঁর বয়েস—'

'পঞ্চান্ন—'

'আপনার দার্শনিক বন্ধুর হাতে এ-টাকা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই তো দেখছি না।'

'দেখাই যাবে,' কিন-ফো দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'আপনি যদি একশো বছর বাঁচেন, তাহ'লে এখন যার বয়েস পঞ্চান্ন, সে আপনার মৃত্যুর পর টাকা পাবে ব'লে আশা ক'রে থাকলে বোকামি করবে।'

কিন-ফো কোনো কথা না-ব'লে ভদ্রতার যাবতীয় অভিব্যক্তি সমেত মাথা নুইয়ে তাঁকে অভিবাদন ক'রে আপিশ থেকে বেরিয়ে এলো।

পরদিন সেন্টেনারিয়ানের ডাক্তার তাঁর বাড়ি এলেন। তিনি সে-প্রতিবেদন পাঠালেন কম্পানিকে, তার ভাষা ছিলো এই রকম : 'শরীরের গঠন লোহার, পেশীগুলো যেন ইস্পাত, আর ফুশফুশ যেন অর্গানের হাপর।'

কাজেই কিং-ফোর বিমার আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করার কোনা কারণই উঠলো না। যথাকালে পলিসিতে নামসই করলো তারা। লা-ও আর ওয়াং আবশ্য—বলাই বাহুল্য—এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানতে পেলো না। পলিসিতে যে তাদেরই ওয়ারিশান করা হয়েছে, এ-কথা জানার কোনো উপায় তাদের ছিলো না : কেবল যদি নানারকম জটিল ও অভাবিত পরিস্থিতি দেখা দেয়, তাহ'লেই হয়তো কোনোদিন এ-সম্বন্ধে তারা জানতে পারবে।

৭

মৃত্যুর উদ্যোগ

ভবিষ্যৎকে গোলাপি দেখে জে. উইলিঅম বিড়ুল্ফ যতই কেন-না খুশি হ'য়ে উঠুন, সেন্টেনারিয়ানের সামনে যে অচিরেই দু-লক্ষ ডলার হারাবার বিষম ফাঁড়া খাঁড়ার মতো ঝুলছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন-ফো যে অবশেষে নিজের নিরুৎসুক জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে চাচ্ছে, এ-বিষয়ে আর-কোনো ভুল নেই। এত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও এতকাল

যখন বেঁচে-থাকা সম্বন্ধে তার কোনো উৎসাহ বা মোহ ছিলো না, তখন এই ভীষণ দারিদ্রের মধ্যে জীবনকে টেনে লম্বা করার ইচ্ছে যে তার থাকবে না, অন্তত তা যে নেই, এটা তো অত্যন্ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ।

যে চিঠিটা সুন-এর জন্য অনেক দেরি ক'রে তার হাতে এসে পড়েছিলো, তাতে এই সংবাদ ছিলো যে ক্যালিফরনিয়ার সেনট্রাল ব্যাঙ্ক হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই সমস্ত লেনদেন বন্ধ ক'রে দিয়েছে । অথচ কিন-ফোর সব টাকাই ছিলো এই ব্যাঙ্কে ; একেবারে লবি মহল থেকে সংগৃহীত এই সংবাদ : অচিরেই খবরের কাগজে এই নিয়ে তুমুল শোরগোল উত্থিত হবে । কিন-ফো যে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত, এ-কথা তখন আর কারুই জানতে বাকি থাকবে না । ওই ব্যাঙ্কের বাইরে আর-কোথাও তার কোনো-এক কপর্দকও নেই ; শাংহাইর বাড়িটা অবশ্য বেচে দেয়া যায়, কিন্তু তাতে এমন টাকা পাওয়া যাবে না, যাতে তার পোশাতে পারে, যাতে তার কোনোক্রমে দিন গুজরান হয় । হাতে যৎসামান্য যে-টাকা ছিলো, তাই দিয়েই বিমার কিস্তি দিয়েছে সে ; অবশ্য তিয়েনৎসিন জাহাজ কম্পানিতে তার কিছু শেয়ার আছে—কিন্তু তাতে তার সমস্ত দায়দায়িত্ব আদৌ মিটবে না ।

এ-রকম পরিস্থিতি উত্থিত হ'লে কোনো ইংরেজ বা ফরাশি হয়তো চাকরি-বাকরি করার কথা ভাবতো : খেটে খাবে না-হয়,তাতে আর-কী ! কিন্তু এ-সব ব্যাপারে ধনাঢ্য চিনেদের মতামত ভিন্ন : বরং, চাকরি-বাকরি করার চেয়ে,আত্মহত্যা করা ভালো ; পরিত্রাণের এটাই সেরা উপায় ব'লে তাদের মনে হয় । অন্তত এক্ষেত্রে কিন-ফো যে সত্যিকার চিনেম্যান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।

এমনিতে চিনেদের সাহস বা বীরত্বের পরিচয় পাবার জো নেই ; ছাই-চাপা থাকে যেন তা ; কিন্তু গোপনে তার বিকাশ হয় অদ্ভুতভাবে । মৃত্যুকে তারা যেন ধর্তব্যেই আনে না ; এ-সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন । অসুখ-বিশুখে তারা কখনো কাতর হয় না ; মাথার উপর মৃত্যু ঝোঝুল্যমান জেনেও কোনো পাষণ্ড ভয় পায় না — নির্ভীকভাবে জল্লাদের সম্মুখীন হয় । মৃত্যুদণ্ড দেখে-দেখে, অপরাধীদের অসহ্য নিগ্রহ ও নির্যাতন দেখে-দেখে, সব চিনেম্যানই যেন কোনো খেদ ছাড়াই মৃত্যুর মুখোমুখি হ'তে পারে ।

কাজেই তাদের আলাপ-আলোচনায় কথায়-বার্তায় প্রায়ই যে মৃত্যুর কথা ওঠে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই । ও-দেশে সবাই পূর্বপুরুষদের পুজো করে, সার্বজনীন প্রথা এটা ; কুঁড়েঘর থেকে রাজপ্রাসাদ—সবখানেই অন্তত একটা ঠাকুরঘর থাকবেই—সেখানে বাড়ির মৃত পরিজনদের নানা স্মৃতিচিহ্ন জমানো থাকে, আর মৃতদের সম্মানে প্রতি বছর দ্বিতীয় মাসে একটা ক'রে উৎসবও হয়। নবজাতকের জন্য দোলনা আর বিয়ের পোশাক-আশাক যে-দোকানে বেচে, সেখানেই আবার পাওয়া যায় মৃতের জন্য কফিন : 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' — এক দোকানেই সব চাহিদা মিটে যায় । সত্যি-বলতে আগে থেকে কফিন কিনে রেখে দেয়া আধুনিক চিনে বেশ আভিজাত্যের লক্ষণ ; কফিন না-থাকলে বাড়িঘর যেন ফাঁকা ঠেকে চিনেদের কাছে : এমনকী কখনো আবার ছেলে তার বাবাকে শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন রূপে কফিন কিনে উপহার দেয় ; বাড়ির ঠাকুরঘরে রাখা হয় কফিনটা—বছর-বছর রং করা হয় কফিনটাকে, নানারকম কারুকাজ করা হয় ওই মেহগিনির কাঠের গায়ে, আর কখনো আবার এমনও হয় যে নশ্বর দেহের জীর্ণবিশেষ সমেত আস্ত কফিনটাই গোর না-দিয়ে ওই

ঠাকুরঘরে সযত্নে রক্ষা করা হ'লো। এককথায় চিনেদের ধর্মভাবনার মূল ভিত্তিই হ'লো মৃতের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন : এটা বলতেই হয় যে তার ফলেই তাদের কুলগৌরবের ধারা ও সংগতি অব্যাহত থাকে।

কিন-ফো এমনিতে খুব ঠাণ্ডা, কিছুতেই উত্তেজিত হয় না ; তাই একটুও কাতর না-হ'য়েই সে অনায়াসে মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে। কেবল যে-দুজনের প্রতি তার একটু স্নেহ ছিলো তাদের জন্য তো টাকাকড়ির ব্যবস্থা ক'রেই দিলো : এবার আর মরতে বাধা কোথায় ? আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে সে মনে-মনে, কিন্তু একবারও তার এটা মনে হচ্ছে না যে আত্মহত্যা করাটা অন্যায় বা অপরাধ ব'লে গণ্য হ'তে পারে — এই বোধই তার ছিলো না — বরং তার দৃঢ় বিশ্বাসই ছিলো এই-যে সে সম্পূর্ণ আইনসংগত কাজই করতে যাচ্ছে। এখন আর-কোনো দ্বিধা নেই তার মনে, সম্পূর্ণ মনস্থির ক'রে ফেলেছে সে : এখন আর কারু ক্ষমতা নেই — এমনকী ওয়াং-এরও না—তাকে এই সংকল্প থেকে টলায়। ওয়াং অবশ্য কোনো সন্দেহই করেনি যে কিন-ফোর মনে এই আছে—সুনও তার হুজুরের হাবভাবে এমন-কিছু লক্ষ করেনি যাতে প্রভুর পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আঁচ পেতে পারে—কেবল একটা বিষয়ে তার একটু খটকা লেগেছিলো : তার ভুলচুকের জন্য কিন-ফো আজকাল আর তাকে মোটেই বকা-ঝকা করে না : মাঝে-মাঝে তার যে বকুনি বা মারটার প্রাপ্য হয়নি তা নয় — তবু সব দোষ সত্ত্বেও তার সাধের বরাহপুচ্ছ বা বেণীটি যে দিব্য বেঁচে যাচ্ছে —এতেই সে খুশি।

একটা কথা চিনে ভাষায় খুব শোনা যায় : 'বাঁচতে চাও তো কোয়ংতুঙে, আর মরতে হ'লে লাই-চু।' এর অর্থ অবশ্যি খুবই সরল : ফুর্তি আর ভোগবিলাসের জন্য যা একটা লোকের লাগতে পারে, কোয়াংতুঙে তার সবই মেলে — আর লাই-চু হ'লো কফিনের ব্যাবসার রাজধানী। অনেক দিন আগেই কিন-ফো লাই-চু থেকে একটা চমৎকার কফিন এনে রেখেছিলো। কফিনটা শাংহাইতে পৌঁছোলো কেউই তা দেখে মোটেই অবাক হয়নি : সযত্নে একটা ঘরে রেখে দেয়া হয়েছিলো ওটা : মাঝে-মাঝে মোম মাখিয়ে তার যত্নও নেয়া হ'তো বেশ ; কিন-ফোর কবে মৃত্যু হবে, কবে সেটা কাজে লাগবে—সেইজন্যে অ্যাদ্দিন আগে থেকেই প্রস্তুতি। কফিন-কেনার সময় কিন-ফো অবশ্য একটা শ্বেত মোরগও কিনেছিলো : ভূতপ্রেত যাতে কিন-ফোকে না-পেয়ে এই মোরগটার আত্মাতেই ভর করতে পারে।

কেবল কফিন কিনেই অবশ্য তুষ্ট হয়নি কিন-ফো। তার অন্ত্যেষ্টির সময় কী-কী করা হবে না-হবে, সে-সম্বন্ধে সে বিশদ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলো : ইহলোকের কোনো ব্যাপারেই তার কোনো রুচি না-থাকলে কী হবে, পরলোক সম্বন্ধে সে কিন্তু মোটেই উদাসীন ছিলো না। পাৎলা, খড় থেকে বানানো এক রকম দামি কাগজে সে তার যাবতীয় নির্দেশ লিখে রেখেছিলো : শাংহাই-র ইয়ামেনটা ওই তরুণী বিধবাকে দেবার পর ওয়াংকে যেন তাই পিং সম্রাটের বিখ্যাত তৈলচিত্রটি দেয়া হয়—সেন্টেনারিয়ানের টাকাকড়ি ছাড়াও ও-সব তারা পাবে ; কীভাবে তাকে কবর দেয়া হবে, সে-বিষয়ে সমস্ত কথা সে লিখে গিয়েছিলো তারপর। যেহেতু তার কোনো আত্মীয় নেই, সেইজন্য তার শবযাত্রার মিছিলের পুরোভাগে যেন থাকে তার বন্ধুরা — সবাইকেই অবশ্য ধবধবে শাদা চৈনিক শোকবস্ত্র প'রে আসতে হবে। গোরস্থান অব্দি রাস্তার দু-পাশে—শহরতলি দিয়ে যখন মিছিল যাবে—দুইসারে থাকবে দাসদাসীরা—

তাদের হাতে থাকবে টাঙি, নীল ছাতা বা রেশমি পর্দা—কারু-বা হাতে থাকাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কর্মসূচি-লেখা মস্ত সব প্ল্যাকার্ড ; তাদের পরনে নাকি থাকবে কালো আলখাল্লা, শাদা ঝাপ্পা, আর লাল টুপি । পুরোবর্তী বন্ধুবর্গের পরে কাঁসর বাজাতে-বাজাতে যাবে আপাদমস্তক রক্তিমবসন পরা এক কুলুজিরক্ষক—তার পরে থাকবে কিন-ফোর একটি প্রমাণমাপের ছবি—তার চারপাশে ঝলমলে কাজ করা থাকবে । তারপর থাকবে আরেকদল বন্ধু — তাদের কাজ হবে একটু পরে-পরে মূর্ছিত হ'য়ে-পড়া, আর সেইজন্যেই একদল লোক কয়েকটা কুশান নিয়ে যাবে সঙ্গে — সংজ্ঞা হারালে যাতে শোয়ানো যায় তাদের । তারপর যাবে আরেকদল তরুণ, সোনালি-নীল চাঁদোয়া থাকবে রোদবৃষ্টির হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য —আর তাদের কাজ হবে টুকরো-টুকরো শাদা কাগজ ছড়িয়ে দেয়া— কাগজগুলোর মধ্যে ছোট ফুটো থাকবে একটা ক'রে — যাতে ওই ফুটো দিয়ে ভূতপ্রেত অপদেবতা সব চ'লে যায় — না-হ'লে তারাও তো সেই মিছিলে যোগ দিয়ে বসবে কিনা ।

এর পরে আসবে অত্যন্ত সুন্দর ক'রে সাজানো কফিন-বওয়া গাড়ি । আসলে অবশ্য গাড়ি নয় —মস্ত একটা পাল্কিতেই বসানো থাকবে কফিনটা — চারপাশে থাকবে সোনালি ড্যাগন আঁকা বেগনি রঙের রেশমি পরদা, পঞ্চাশজন বেয়ারা ব'য়ে নিয়ে যাবে সেই পাল্কি । আর তার দু-পাশে থাকবে দুইসারে পুরোহিত —ধূসর, লাল, আর হলদে রঙের আস্তিনছাড়া কামিজ থাকবে তাদের পরনে । সমস্বরে সুর ক'রে মন্ত্র আওড়াবে তারা, আর একেকটা মন্ত্র শেষ হ'লে তুমুলভাবে বেজে উঠবে কাঁসর-ঘণ্টা, শিঙা ও ক্ল্যারিয়োনেট । সব শেষে যাবে শোকাকুল ঘোড়ার গাড়ির সারি — কেচোয়ান ও জিনশুদ্ধু শাদা রঙের হবে—যাতে শোকের প্রকাশ সম্বন্ধে কোনো সংশয় না-থাকে ।

কিন-ফো এটা ভালো ক'রেই জানতো যে তার অন্ত্যেষ্টির জন্য এই যে নির্দেশ সে দিয়ে যাচ্ছে তা যথাযথ পালন করতেই তার অবশিষ্ট সম্পত্তি নিঃশেষ হ'য়ে যাবে—কিন্তু তবু এটা একটা ভাবলে ভুল করা হবে যে সে খুব-একটা অদ্ভুত কাজ-করেছে—চিনেরা একে মোটেই কোনো অসাধারণ বাতিক ব'লে ভাববে না। কোয়াংতুং বা ক্যান্টন, শাংহাই কি পেইচিং—সর্বত্রই প্রায় রোজই এমনি শবযাত্রার মিছিল বেরোয় : মৃতকে সম্মান দেখাবার জন্য এটুকুই যদি না-করা গেলো তবে আর চৈনিকজন্ম সার্থক হবে কী ক'রে ?

কিন-ফো ঠিক করেছিলো পয়লা মে তারিখে সে ইহলোক থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করবে । এই স্থির করতে-করতে বেলা প'ড়ে গেলো ; বিকেলবেলায় অবশেষে ল-ওর কাছ থেকে একটি চিঠি এসে হাজির । বিগতপতি এই তরুণী তার যথাসর্বস্ব—তার পরিমাণ অবশ্য খুব-বেশি নয়— দিয়ে দিচ্ছে তাকে ; প্রতিবাদ ক'রে সে জানিয়েছে যে কিন-ফোর সম্পত্তির প্রতি তার একটুও লোভ ছিলো না কখনও, এখনো নেই ; তার ভালোবাসা অপরিবর্তিতই আছে—আর তা-ই থেকে যাবে চিরকাল ; অল্প আয় তো হয়েছে কী — তাতেই তাদের তুষ্ট ও সুখী হ'তে বাধা কোথায় ?

কিন্তু কিন-ফো তার সংকল্প থেকে নড়বার পাত্র নয় । 'আমার মৃত্যুর যাবতীয় ফসল সে ভোগ করুক, এটাই আমি চাই,' আপন মনেই সে ঠিক করলো ।

কীভাবে যে আত্মহত্যা করবে, সেটাই এখনো ঠিক করা বাকি র'য়ে গেছে । এই বিষয়েই মনোনিবেশ করলে সে এবার । আশা করলো হয়তো শেষকালে জীবদ্দশায় কোনো আবেগ

বা আকুলতার স্বাদ না-জুটলেও মৃত্যুর মুহূর্তে চরম কোনো উত্তেজনা ভোগ ক'রে যেতে পারবে।

ইয়ামেনের চৌহদ্দির মধ্যে ছিলো চারটে ছোটো কিন্তু আশ্চর্যসুন্দর পটমণ্ডপ : এত সুন্দর চন্দ্রাতপ-সংবলিত মণ্ডপ বানাতে কেবল চৈনিক শিল্পীরাই পারে। মণ্ডপগুলির নাম কিন্তু খুব অর্থময় : সুখসন্তোষের মণ্ডপ বলা হ'তো একটাকে — কিন-ফো পারতপক্ষে কোনো দিন সেখানে যেতে চাইতো না ; আরেকটার নাম ছিলো সৌভাগ্যের প্রেক্ষাগৃহ—কিন-ফোর সেটাকে চিরকাল জঘন্য ঠেকতো —বমি পেতো যেন ওখানে যাবার কথা ভাবলেই ; আরেকটির নাম ছিলো প্রমোদবিতান—যার সম্বন্ধে তার মনে কোনো আকর্ষণই ছিলো না; চতুর্থটির নাম ছিলো দীর্ঘপ্রাণের বনভবন !

কিন-ফো কেবল এটুকুই ঠিক করেছিলো যে সে-রাতে সে দীর্ঘপ্রাণের বনভবনেই রাত্রিবাস করবে, পরদিন প্রাতঃকালে সবাই আবিষ্কার করবে যে চিরনিদ্রার অসীম সুখে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে সে। তবু আরেকটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাকি থেকে গেলো তার — মরবে কী ক'রে ? জাপানিদের মতো পেট চিরে ফেলবে, হারাকিরি করবে ? মান্দারিনদের মতো রেশমি সুতো দিয়ে ফাঁস দেবে নাকি নিজেকে ? না কি সুগন্ধি হামামের জলে শুয়ে থাকবে হাতের ধমনী কেটে ফেলে—অতীতের রোমক নাগরিকরা যেমন করতো ; নানাভাবে আলোচনা করার পর কোনোটাকেই তার গ্রহণযোগ্য মনে হ'লো না ; সবগুলোই কেমন অমানুষিক ও নৃশংস ঠেকলো তার কাছে ; দাস-দাসীদের কাছে প্রতিটি পদ্ধতিই হয়তো অরুচিকর ঠেকবে। আফিমের কয়েকটি দানা আর তার সঙ্গে আরো নিশ্চিত ও সূক্ষ্ম কোনো বিষ মিশিয়ে নেয়াই বোধহয় সবচেয়ে ভালো : কোনো ব্যথা নেই, কষ্ট নেই—মুহূর্তে চ'লে যাবে সে ইহলোকের সব বন্ধনের বাইরে। হ্যাঁ, বিষ-মেশানো আফিমই সবচেয়ে ভালো। এবার মারণাস্ত্র নির্বাচন করতে তার আর দেরি হ'লো না।

সূর্য যত পশ্চিমে ঢ'লে পড়লো তত সে অনুভব করলো যে আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র তার পরমায়ু — আর ততই শেষবার শাংহাইয়ের রাস্তায় বেড়াতে বেরুবার ইচ্ছা করতে লাগলো তার—ওয়াং-পো নদীর তীর ধ'রে এতকাল সে তার উদাসীন দিনগুলোয় অর্থহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে—আজ শেষবার ছলোছলো জলকল্লোল শোনবার ভারি ইচ্ছা করলো তার। সারা দিনে আজ একবারও ওয়াং-এর সঙ্গে দেখা হয়নি—ইয়ামেনের কোথাও তার দার্শনিক বন্ধু ও উপদেষ্টাকে দেখতে পায়নি কিন-ফো।

আস্তে-আস্তে সে ছাড়িয়ে এলো ইংরেজ বসতি। প্রণালীর উপরকার সাঁকো পেরিয়ে ঢুকে পড়লো ফরাশি অঞ্চলে ; যতক্ষণ-মা চৈনিক বন্দরে এসে পৌঁছুলো, ততক্ষণ ধ'রে জেটি ধ'রে সে এগিয়েই চললো, তারপর শহরের দক্ষিণ শহরতলির রোমান ক্যাথলিক গির্জে পর্যন্ত এসে ডান দিকে মোড় বেঁকে সে লউঙ-হো প্যাগোডার রাস্তা ধরলো।

এখানে কোনো বসতি নেই, সামনে খোলা প্রান্তর, মস্ত এক জলাভূমি চ'লে গেছে সামনে, অনেক দূরে—মিন উপত্যকার অরণ্যদেশ পর্যন্ত। আসলে এটা ধানখেতই—কেবল মাঝে-মাঝে খাল কেটে সেচের জল নিয়ে-আসা হয়েছে সমুদ্র থেকে ; আর দূরে-দূরে আছে কিছু জীর্ণ খোড়োবাড়ি, হলুদ মাটি-লেপা মেঝে সে-সব বাড়ির—আশপাশে জলের তলা থেকে ধানের চারা মুখ তুলে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। এই সরু গলি দিয়ে লোক আসতে

দেখে চারপাশের পশুপক্ষীরা চট ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে : কতগুলো কুকুর ডেকে উঠলো ঘেউ-ঘেউ, শাদা ছাগলগুলো হুড়মুড় ক'রে স'রে গেলো দূরে—হাঁস-মুরগিগুলোও কোলাহল ক'রে ছিটকে চ'লে যেতে দেরি করলো না ।

ধানখেত হ'লে কী হবে, কোনো আগন্তুকের কাছে এই জলা জায়গাটা বিশ্রী ঠেকবে। চিনদেশের সব শহরের বাইরেই যে-মস্ত প্রান্তরগুলো প'ড়ে থাকে সব কেমন যেন গোরস্থানের মতো ফাঁকা দেখায় । আর এখানে তো আশপাশে সত্যিই কত-যে কফিন এলোমেলো প'ড়ে আছে তার ঠিক নেই । কোথাও মাটির ঢিবি দেখে বোঝা যায় যে গোর দেবার জন্য মাটি কাটা হয়েছে— পিরামিডের মতো ওই মাটির ঢিবিগুলো উঠে গেছে উপরে —একটার চেয়ে আরেকটা বেশি উঁচু — যেন কোনো জাহাজ মেরামতের কারখানায় উঁচু মাচান । শোনা যায় যে তাতার শাসকরা নাকি কাউকে গোর দেয়া নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছে —সত্যি-মিথ্যে কে জানে, কিন্তু এটা ঠিক যে একটার গায়ে আরেকটা কফিন দিয়ে-দিয়ে মাচান মতো ক'রে ফেলে রাখা হয়েছে এখানে : কোনো কফিনের গায়ে চিনে দারুশিল্পীর চমৎকার কাজের নমুনা দেখা যায়—কোনো কফিনের গায়ে আবার কোনো কারুকাজই নেই । কোনো-কোনো কফিন ঝকমকে ও আনকোরা, কতগুলো কফিনের কাঠ আবার প'চে গিয়েছে: যেন ঘুণাক্ষরে তাদের ধ্বংসের কাহিনী লেখা ; কালক্রমে হয়তো সত্যিই এদের একদিন গোর দেয়া হবে — এখানে প'ড়ে প'ড়ে সেই অনাগত দিনেরই প্রতীক্ষা করছে তারা ।

এই অদ্ভুত দৃশ্য অবশ্য কিন-ফোর আদৌ অচেনা নয় ; সে এ-সবের দিকে তাকিয়েও দেখলো না একবারও ; তাকালে ইওরোপীয় পোশাকপরা লোক দুটি কিছুতেই তার নজর এড়িয়ে যেতো না । ইয়ামেন থেকে তাকে কেবল চোখে-চোখে রাখা ছাড়া আর-কোনো উদ্দেশ্য বোধহয় তাদের নেই : কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে প'রো রাস্তা তারা তারই মতো কখনো দ্রুত কখনো আস্তে হেঁটে চ'লে এসেছে । মাঝে-মাঝে নিজেদের মধ্যে কী-সব বলাবলি করেছে তারা কে জানে : স্পষ্ট বোঝা যায় তার উপর নজর রাখার জন্যই গোয়েন্দা হিশেবে তারা নিযুক্ত হয়েছে । দুজনেরই বয়েস ত্রিশের নিচে, দুজনেই স্বাস্থ্যবান ও ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, বেশ শক্ত-সমর্থ ; কিছুতেই যাতে কিন-ফো তাদের চোখের আড়াল না-হয়, সে-সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক রয়েছে সবসময় । প্রায় মাইল তিনেক যাবার পর কিন-ফো যখন পিছন ফিরলো, তখন গন্ধ-পাওয়া ডালকুত্তোর মতো তারাও তক্ষুনি ফিরে দাঁড়ালো ।

রাস্তায় কয়েকটি জীর্ণ-শীর্ণ-হতশ্রী ভিখিরিকে দেখে কিন-ফো তাদের কিছু-কিছু ভিক্ষে দিতে ভোলেনি ; এবার একটু এগিয়ে সে রাস্তায় কয়েকটি খ্রিষ্টান চিনে রমণীকে দেখতে পেলো : ফরাশি মিশনারি রমণীদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছে তারা, পিঠে তাদের বাস্কেট—রাস্তায় কোনো অনাথ শিশু দেখতে পেলে তাদের তুলে নিয়ে অনাথআশ্রমে পৌঁছে দেয়াই তাদের কাজ । লোকে কিন্তু তাদের 'ন্যাকাড়া-কুড়ুনি' ব'লে ডাকে : আর সত্যি-বলতে রাস্তা থেকে তারা যা কুড়িয়ে নেয় তা কেবল ন্যাকড়ার ফালি ছাড়া বোধহয় আর-কিছু নয় । কিন-ফো তাদের হাতে মানিব্যাগ উপুড় ক'রে দিলে । পাছু-নেয়া গোয়েন্দা দুটি অবাক হ'য়ে একটু মুখ চাওয়াচায়ি করলে : চিনেদের স্বভাবে তো এত বদান্যতা নেই ! মাথা খারাপ না-হ'লে তো কোনো চিনেম্যান কিছুতেই এমন কাজ করবে না !

কিন-ফো যখন জেটির কাছে ফিরে এলো, তখন অন্ধকার ক'রে এসেছে ; কিন্তু জলে যাদের বাস, যারা শাম্পানে কি নৌকোয় থাকে, তাদের কর্মচাঞ্চল্যের কিন্তু অবসান হয়নি তখনো। চারপাশে শোরগোল শোনা যাচ্ছে, তারই মধ্যে হাওয়য় ভেসে আসছে গানের কলি ; কেউ গান গাইছে বোধহয়। কিন-ফো একটু থমকে দাঁড়ালো। পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার আগে শেষ গানটা শুনে গেলে মন্দ হয় না !

ওয়াং পো নদীর কালো জলের মধ্যে দিয়ে শাম্পান বাইতে-বাইতে একটি তরুণ তঙ্কাদিরি গান ধরেছে একা গলায় :

'কুসুমে সাজাই আনমনা ছোটো ভেলা,
ধীরে প'ড়ে আসে বেলা।
স্তুতি ক'রে বলি নীল দেবতাকে,
এখনো কি ঘরে ফেরাবে না তাকে —
ব্যাকুল হৃদয় খুঁজে ফেরে যাকে ?
কবে সে আসবে ? কাল ?'

'কাল ?' কিন-ফো মনে-মনে ভাবলো, 'কাল এমন সময়ে আমি কোথায় থাকবো ?'

'জানি না সে-কোন ঘন বরিষনে সে যে
গেছে কোনকালে সেজে।
চিনের দেয়াল পেরিয়ে কোথায়
গেছে সে, কে জানে ! গোপন ব্যথায়
ভয়ে কেঁদে মরি : বোঝে না কি তাও ?
আসবে না তবে কাল ?

কতকাল হ'লো কোন দূরে চ'লে গেছে —
জানি না আছে কি বেঁচে ?
কেন সোনা চেয়ে দূরে আছো প'ড়ে ?
বসন্ত যায়, দুই পাখি ওড়ে,*
গোধুলিলগন অফুরান ঝ'রে
প'ড়ে যায়।—এসো কাল !'

ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেলো গানের সুর। কিন-ফোর মনে অদ্ভুত সব ভাবনা জেগে উঠলো। টাকাকড়িই যে পৃথিবীর সব-কিছু নয় তা সে মানে—কিন্তু টাকাকড়ি ছাড়া পৃথিবীতে বেঁচে-থাকারও কোনো মানে হয় না, তার এই মত তবু পালটালো না।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরে এলো সে। সেই গলদঘর্ম গোয়েন্দা দুটি অবশেষে

---

* দুই পাখি—কিংবদন্তির দুই ফিনিক্স পাখি—চিনদেশে পরিণয়ের প্রতিভাস।

তার উপর আর নজর রাখতে অক্ষম হ'লো । কিন-ফো নীরবে, সকলের অলক্ষিতে, দীর্ঘপ্রাণের বনভবনের দিকে এগিয়ে গেলো; দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে প'ড়েই চট ক'রে আবার দরজা বন্ধ ক'রে দিলো সে । অন্ধকারে ঢাকা ছোট্ট ঘর, কোথাও আলোর লেশমাত্র নেই ; দেশলাই জ্বালিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে মেঝের উপরকার কাচের লণ্ঠনটা জ্বেলে দিলো সে । হাতের কাছেই নিরেট সবুজ পাথরের একটা টেবিল প'ড়ে আছে ; তার উপর রয়েছে এক বাক্স আফিং আর মারাত্মক কয়েক জাতের বিষ ।

কয়েকদানা আফিং তুলে নিয়ে একটা লাল রঙের মাটির পাইপে ভ'রে নিয়ে সে ধূমপানের জন্য প্রস্তুত হ'লো । 'আর-কোনোদিন জাগবো না এই ঘুম থেকে,' বললো সে ।

কিন্তু হঠাৎ সে পাইপটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো । 'গোল্লায় যাক সব,' চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'কোনো অনুভূতিই হচ্ছে না আমার — কোনো তীব্র স্বাদ ছাড়া মরা চলবে না —সেই স্বাদ মৃত্যুভয়েরই হোক কি অন্যকিছুরই হোক । এভাবে কোনো কিছু বোধ না-ক'রেই নিঃসাড়ে ম'রে যাবো ? তা হ'তেই পারে না !' দীর্ঘপ্রাণের বনভবনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সে বাইরে । দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো ওয়াং-এর ঘরের দিকে ।

৮

যে-চুক্তিটা ইয়ার্কি নয়

ওয়াং তখনো অবশ্য শুয়ে পড়েনি ; একটা সোফায় হেলান দিয়ে ব'সে 'পেইচিং হরকরা'র শেষ সংখ্যাটা পড়ছিলো ; তাতার সুলতানের স্তুতি পড়তে-পড়তে বারে-বারে ভুরু কুঁচকে যাচ্ছিলো তার ।

কিন-ফো যেন ফেটে পড়লো ঘরের মধ্যে ; নিজেকে একটা আরাম-কেদারায় ছুঁড়ে দিয়ে সে ব'লে উঠলো, 'ওয়াং, আমার একটা উপকার করতে হবে তোমায় !'

আস্তে-আস্তে কাগজটা নামিয়ে রাখলো দার্শনিকপ্রবর । 'তুমি বললে একটা কেন, হাজারটা উপকার করার চেষ্টা করবো ।'

'না-না, অত দরকার নেই—আপাতত একটা হ'লেই যথেষ্ট । আমি যা বলি, দয়া ক'রে —তা-ই করো ; বাকি নশো নিরানব্বুইটা উপচীকির্ষা থেকে তোমায় আমি মুক্তি দেবো । এটা অবশ্য আগেই ব'লে রাখছি যে তার পরে কিন্তু তুমি আমার কাছে থেকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা কিছুই পাবে না !'

'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন-ফো,' ওয়াং বললো, 'একটু বিশদ ক'রে বোঝাবে ?'

'প্রথমে তোমাকে জানাই যে,' গম্ভীর গলায় বললো কিন-ফো, 'আমি আমার শেষ কপর্দকটুকুও হারিয়ে বসেছি—একেবারে শেষ হ'য়ে গেছি আমি, নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত !'

'সত্যি ?' ওয়াং এমনভাবে কথাটা বললো যে এ-কথা শুনে সে যে আদৌ বিচলিত

হয়েছে তা মোটেই বোধ হ'লো না—বরং তার গলার স্বর শুনে উলটো ধারণাটাই হ'তে পারে ।

'হ্যাঁ, সত্যি । সুন যে-চিঠিটা দিতে ভুলে গিয়েছিলো, তার কথা মনে আছে তোমার ? ওই চিঠিতেই এ-খবর ছিলো যে ক্যালিফরনিয়ার ব্যাঙ্ক লাল বাতি জ্বেলেছে । আমার কাছে তার অর্থ কী,বুঝতে পারছো তো—একেবারে শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত হারিয়ে-বসা ! এই ইয়ামেন, আর খুচরো হাজার খানেক ডলার কেবল আছে এই মুহূর্তে—ধারদেনা শোধ করতেই তা চ'লে যাবে—মাস-দুই চালাবার মতো সংগতিও আমার নেই ।'

'তাহ'লে,' ওয়াং বললে, 'ধনকুবের কিন-ফোর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে না এখন ?'

'না—এখন কিন-ফো একটি পথের ভিখিরি মাত্র ; কিন্তু ধনী-নির্ধন—এ-সব বিশেষণে এখন আর-কিছু এসে-যায় না । দারিদ্রকে আমি মোটেই ভয় করিনি ।'

'ঠিক বলেছো,' সোফা ছেড়ে উঠলো ওয়াং, 'যোগ্য কথা শুনতে পেলাম তোমার কাছে : আমার তাহ'লে উৎফুল্ল হবার মতো কিছু ফল হয়েছে । এতদিন কেবল একটা গাছ-পাথরের সঙ্গে তোমার তুলনা চলতো—এবার তুমি বাঁচতে শিখবে । কনফুসিয়ুস কী বলেছেন মনে ক'রে দ্যাখো । যত দুঃখ আমরা চাই, তত আমরা কোনোদিনই পাই না । নিশ্চয়ই নুন সুচুন-এর সেই কথাগুলো তোমার মনে আছে—সেই-যে : "জীবনে উত্থান-পতন থাকবেই ; ভাগ্যের চাকা বিরাম জানে না, অবিশ্রাম তার ঘূর্ণন ; দখিন হাওয়া থাকে অল্প দিনই ; কিন্তু ধনী বা নির্ধন যা-ই হও না কেন, তুমি তোমার কর্তব্য ক'রে যাও ।" বৎস কিন-ফো, আমাদের এক্ষুনি পথে বেরিয়ে পড়তে হয় তবে : রুটি রোজগারের ধান্দায় বেরুতে হয় এবার তাহ'লে—'

দার্শনিকের ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হ'লো সে বুঝি সেই মুহূর্তেই এই বিলাসভবন থেকে বেরিয়ে যাবে ।

'ধীরে, বন্ধু ধীরে—এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই ,' বললে কিন-ফো, 'দারিদ্রকে আমি ভয় করি না—এ-কথার অর্থ এই নয় যে আমি দারিদ্রকে সহ্য করতে যাচ্ছি—আমার উদ্দেশ্য মোটেই তা নয় ।'

'তার মানে ? তোমার উদ্দেশ্য কী তাহ'লে ?'

'ম'রে-যাওয়া—'

'ম'রে-যাওয়া !' দার্শনিকের কণ্ঠস্বর ঘৃণায় তীব্র হ'য়ে উঠলো, 'এটা তুমি নিশ্চয়ই ভালো ক'রেই জানো যে যারা সত্যি-সত্যি আত্মহত্যা করতে চায়, তারা আগে থেকে ঢাক পিটিয়ে বেড়ায় না : বরং সবসময় তাদের ইচ্ছেটাকে গোপন রাখার চেষ্টাই তারা করে ।'

কিন-ফো অত্যন্ত শান্ত গলায় বললে, 'আমি যে এখনো বেঁচে আছি, তা নেহাৎই দৈবের দয়া !'

'কী বলতে চাচ্ছো তুমি ?'

'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যখন দেখলুম সেই মুহূর্তেও কোনো তীব্র অনুভূতি হচ্ছে না,' ওয়াং-এর কথা গ্রাহ্য না-ক'রেই কিন-ফো ব'লে চললো, 'ঠিক তখনই আমি যে-বিষ খেতে যাচ্ছিলুম, তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তোমার কাছে এসেছি !'

'হুম, বুঝলুম। তখন বুঝি ভাবলে দুজনে একসঙ্গে মরাই ভালো,' হেসে বললো ওয়াং।

'মোটেই তা নয়। তুমি বেঁচে থাকো, আমি তা-ই চাই, ওয়াং।'

'কেন? আমার বাঁচা উচিত কেন?' দার্শনিক জিগেশ করলো।

'আমাকে খুন করার জন্য,' বললো কিন-ফো, 'তোমার কাছ থেকে এই অনুগ্রহটা ভিক্ষে করতেই আমি এসেছি।'

একেবারে আঁৎকে দেয়ার মতো প্রস্তাব; কিন্তু ওয়াং যে এ-কথা শুনে বিন্দুমাত্র অবাক হয়েছে, তা কিন্তু মোটেই মনে হ'লো না।

কিন-ফো সাগ্রহে অধীরভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলো—হঠাৎ তার মনে হ'লো ওয়াং-এর চোখের তারা যেন মুহূর্তের জন্য ঝিকিয়ে উঠলো। অতীতের সেই তাই-পিং তবে জেগে উঠলো নাকি তার রক্তে? এই দীর্ঘ আঠারো বছরের ব্যবধানও অতীতের সেই রক্ততৃষাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি? সেই ভুলে-যাওয়া আদিম আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ কি নতুন ক'রে আবার জ্বালিয়ে দিলো তাকে—রক্তে রাঙাবার জন্য জন্য হাতদুটি তার আবার নিশপিশ ক'রে উঠেছে কি—তার আশ্রয়দাতার সন্তানের রক্তেই কি সে নতুন ক'রে তার পিপাসা মেটাতে চায়?

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তার চোখ থেকে সেই স্ফুলিঙ্গ নিভে গেলো। আরো গম্ভীর, আরো প্রশান্ত হ'য়ে এলো তার চোখমুখ। আস্তে গিয়ে আবার সে সোফাটিতে ব'সে পড়ে চিন্তিত স্বরে বললে, 'এই উপকারটিই তবে প্রার্থনা করতে এসেছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ, তাই। বধ করো তুমি আমাকে—তার আগে তোমাকে জানিয়ে যাই যে তুমি আমাদের ঋণ বহুগুণে শোধ করেছো, ওয়াং—তোমাকে কোনো পাপ স্পর্শ করবে না!'

'এ-কথা তুমি ভেবে বলছো, কিন-ফো? জানো, এ-কথার অর্থ কী?' জানতে চাইলো ওয়াং।

'খুব ভালো ক'রেই জানি।' বললো কিন-ফো, 'তুমি তো জানো যে ষষ্ঠ মাসের আঠাশ তারিখে অর্থাৎ পঁচিশে জুন আমার একুত্রিশ বছর পূর্ণ হবে। তার আগেই আমি মরতে চাই—আর তোমার হাতেই আমার মৃত্যু হবে—এই মর্মে একটা চুক্তি ক'রে নিতে চাই আমি।'

'আমার হাতে? কবে? কোথায়? কীভাবে?' ওয়াং জিগেশ করলো তাকে।

'কবে, কোথায়, কীভাবে—এ-সব বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। এ-সব আমি জানতেই চাই না। ব'সে কি দাঁড়িয়ে, ঘুমিয়ে কি জেগে, দিনে বা রাতে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, ছোরা বসিয়ে কি বিষ খাইয়ে—এ-সব প্রশ্নের উত্তর তুমি খুঁজো, এ-সব জিজ্ঞাসার সমাধান তুমি কোরো। আমি শুধু বলতে চাই যে ওই তারিখের মধ্যেই যেন আমি তোমার হাতে মরি। কেবল একটা শর্ত আমি দিতে চাই—আমি যেন তা আগে থেকে টের না-পাই। এইভাবেই তাহ'লে পরবর্তী পঞ্চান্ন দিন আমি কোনো-কিছুর প্রত্যাশায় কাটাতে পারবো—প্রতি মুহূর্তে ভাববো তবে—ওই বুঝি আমার মৃত্যু এলো—ওই বুঝি সব শেষ হ'য়ে যায়!''

কিন-ফো আগাগোড়া এমন উত্তেজিতভাবে কথা ব'লে যাচ্ছিলো, যে তা তার স্বভাবের সঙ্গে মোটেই মেলে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অস্বাভাবিক আবেগ তার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান

ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি। তার জীবনবিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পাঁচ দিন আগেই সে নিজের আয়ুর সীমা টেনে দিতে চেয়েছে। কারণ এটা সে এই হঠাৎ-আসা বাঁধভাঙা আবেগ সত্ত্বেও জানে যে ওই বিমার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেবার মতো সংগতি তার মোটেই নেই।

দার্শনিক ব'সে-ব'সে চুপটি ক'রে তার সব কথা শুনলো, মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখলো তাকে—আর অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইলো ঘরের দেয়ালে ঝুলে-থাকা তাই-পিং সম্রাটের ছবিটার দিকে; এটা সে স্বপ্নেও জানে না যে কিন-ফো তার ইষ্টিপত্রে তাকেই এই ছবিটা দিয়ে গেছে।

'আমার বক্তব্য শুনলে তো,' একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে কিন-ফো, 'তোমার কোনো আপত্তি নেই নিশ্চয়ই এই শর্তে—আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমার নিশ্চয়ই কিছু বলার নেই? আমাকে হত্যা করতে রাজি আছো আশা করি?'

ব্যস্ত হ'য়ে সম্মতির ইঙ্গিত করলে ওয়াং। বিদ্রোহের সেই রক্তরাঙা দিনগুলোতেও এর চেয়েও কত ভীষণ কাজ তাকে যে করতে হয়েছে, হয়তো সে-সব কথাই এখন তার মনে প'ড়ে যাচ্ছে হঠাৎ। কিন্তু কিন-ফোর প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব না-দিয়ে সে উলটো আরেকটা প্রশ্ন করলো, 'তুমি ঠিক জানো যে বুড়ো বয়েস পর্যন্ত দিব্যি বেঁচে থাকার ইচ্ছে তোমার আর নেই।'

'তোমাকে বলি, ওয়াং, আমার সংকল্প আর বদলাবে না। থুরথুরে বুড়ো বড়োলোক হওয়াটাই মন্দের একশেষ—গরিব বুড়োমানুষ তো আরো অসহ্য।'

'আর পেইচিঙের সেই সুন্দরীটি? তার কথা ভেবেছো? না কি তাকে একেবারে ভুলে গিয়েছো তুমি? এই প্রবাদটা জানো না—"উইলোর সঙ্গে উইলোর, ফুলের সঙ্গে ফুলের, আর হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ হ'লে শত বসন্তের হাওয়া দেয়"?'

কিন-ফো একটু তাচ্ছিল্যভরে কাঁধ ঝাঁকালো। 'সেই শত বসন্তের হাওয়ার আগে যে একশোটা শীতকালের কনকনে হাওয়া ব'য়ে যাবে!' চুপ ক'রে কী যেন ভাবলো সে তারপর, বললো, 'না, লা-ও আমাকে বিয়ে ক'রে ভীষণ হতাশ হ'য়ে পড়বে। আশাভঙ্গের বেদনা ছাড়াও দুঃখে-বিষাদে ভ'রে যাবে সে। আমার মৃত্যুতে বরং সে কিছু টাকাকড়ি পাবে। আর তুমিও পাবে, ওয়াং — তোমার কথাও আমি ভুলিনি। তোমার জন্যে পঞ্চাশ হাজার ডলার রেখে গেছি আমি।'

'কোনো-কিছুই তো আর বাকি রাখোনি, সব-কিছুই যে ভেবে ঠিক ক'রে রেখেছো দেখছি,' দার্শনিক বললো, 'আমাকে তো কোনো আপত্তিই তুলতে দিচ্ছো না!'

'উঁহু, এখনো একটা বাধা থেকে গেছে,' কিন-ফো উত্তর দিলে, 'তুমি সে-কথা একেবারেই তুললে না দেখে আমি খুব অবাক হচ্ছি। আমাকে খুন করবে ব'লে যে রাজি হ'লে, তারপরে যে পুলিশ তোমায় খুনী ব'লে খুঁজে বেড়াবে—'

'বোকা আর ডরপোকেরাই শুধু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে,' ওয়াং অর্থপূর্ণ মন্তব্য করলে, 'আমি ওই ঝুঁকি নিতে রাজি আছি।'

'তবু আমি আগে থেকেই তোমাকে রক্ষাকবচ দিয়ে যাই,' কিন-ফো বললে, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়—এই মর্মে একটা চিরকুট লিখে দিয়ে যাবো তোমাকে। সেটা দিয়ে তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারবে।'

শান্তভাবে টেবিলের কাছে গিয়ে একটা কাগজে বড়ো-বড়ো হরফে খশখশ ক'রে লিখে দিলে সে :

'বেঁচে-থাকাটা এতই বিরক্তি আর অরুচি জাগাচ্ছিলো যে আমি নিজে থেকেই মৃত্যু প্রার্থনা ক'রে নিয়েছি । — কিন-ফো ।'

৯

উৎকণ্ঠা

নতুন মক্কেলের উপর নজর রাখবার জন্যে উইলিঅম জে. বিডুল্‌ফ যে-দুজন গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিলেন, সেন্টেনারিয়ানের আপিশে ব'সে পরদিন সকালে তাদের সঙ্গেই তাঁর কথা হচ্ছিলো ।

ক্রেগ বলছিলো, 'কাল সন্ধেবেলা তাকে অনেকক্ষণ অনুসরণ করেছিলুম — বেড়াতে শহর থেকে দূরে গিয়েছিলো সে ।'

ফ্রাই বললে, 'আর, তাকে দেখে কখনোই এটা মনে হয়নি যে সে আত্মহত্যা করতে চাচ্ছে—'

'তার পিছন-পিছন আবার তার ইয়ামেনেই ফিরে এসেছিলুম আমরা,' ক্রেগ জানালো ।

'কিন্তু,' ফ্রাই সেই সঙ্গে যোগ ক'রে দিলো, 'বাড়ির ভিতরে যাবার কোনো সুযোগ ছিলো না আমাদের ।'

'আজ সকালবেলা সে কেমন আছে ?' বিডুল্‌ফ জিগেশ করলেন ।

'পালিকাও-র সাঁকোটার মতোই দিব্যি শক্তসমর্থ,' একযোগে ব'লে উঠলো দুজনে ।

আসলে ক্রেগ আর ফ্রাই তুতো ভাই । সত্যিকার আমেরিকান বলতে যা বোঝায় দুজনেই তার সেরা নজির । শ্যামদেশীয় যমজ হ'লেও বুঝি তাদের স্বভাব চরিত্রের এত মিল দেখা যেতো না । তাদের চিন্তাধারা এক, মেধা অভিন্ন, অভিপ্রায়েও কোনো অমিল নেই—মনে হয় তাদের উদরও বুঝি একটাই । পরস্পরের হাতে-পায়েও বুঝি দুজনেরই সমান অধিকার রয়েছে । কথা বলার সময় একজনে কোনো বাক্য শুরু করলে, আরেকজনে সেটা শেষ করে ।

'না, বাড়ির ভিতরে ঢোকার কোনো সুযোগ সত্যি তোমাদের ছিলো না,' বিডুল্‌ফ মন্তব্য করলেন ।

গোয়েন্দা দুজন ঘোষণা করলো যে সেটা কখনোই তাদের পক্ষে সম্ভব হবে ব'লে মনে হয় না ।

'কিন্তু তবু বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই হবে তোমাদের—যে-ক'রেই হোক এ-কাজটা হাঁশিল করতে হবে,' বিডুল্‌ফ বলতে লাগলেন, 'কম্পানি কিছুতেই দু-লাখ ডলার হারানোর ক্ষতি সহ্য করতে পারবে না । এই দু-মাস কিন-ফোর উপর কড়া নজর রাখতে হবে

তোমাদের—যদি আরেক কিস্তির টাকাটা দেয়, তাহ'লে তো আরো বেশি দিন তাকে চোখে-চোখে রাখতে হবে ।'

'বাড়িতে একটা চাকর আছে,' ফ্রাই শুরু করলো ।

ক্রেগ শেষ করলো, 'বোধকরি বাড়ির ভিতর কী হয়-না-হয় তার হদিশ সে বাৎলাতে পারবে ।'

'বেশ, তাহ'লে তাকেই পাকড়াও করো,' বিড়ুল্‌ফ উত্তর করলেন, 'চিনেম্যানরা যে-সব জিনিশ ভালোবাসে, সেই সব ভেট দিয়ে চুটিয়ে আড্ডা দাও তার সঙ্গে : সুরা, টাকা, চণ্ডু—দরকার হ'লে সব-কিছু উৎকোচ দিতে হবে ; তাহ'লেই দেখবে চটপট তোমাদের কাজ হাঁশিল হ'য়ে যাবে ।'

পরিকল্পনা অনুযায়ী গোয়েন্দা দুজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুনের সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেললো : এক গেলাশ মার্কিন সুরা বা যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমুদ্রা—কোনোটাতেই সুনের আদৌ কোনো অনীহা ছিলো না ।

জেরা ক'রে-ক'রে তার তার পেট থেকে অনেক কথাই বের ক'রে নেয়া গেলো । তার প্রভুর হাব-ভাবে ইদানীং কোনো পরিবর্তন চোখে পড়েছে কি ? না, তেমন-কোনো পরিবর্তন ঠিক দেখা যায়নি, তবে আজকাল সুনকে তিনি একটু বেশি লাই দিচ্ছেন । মারাত্মক অস্তর-টস্তর থাকে কি তাঁর কাছে ? না, অস্ত্রশস্ত্র কিছুই তাঁর কাছে থাকে না । বেঁচে থাকেন কেমন ক'রে ? অত্যন্ত শাদশিধে খাদ্য গ্রহণ ক'রে । ঘুম থেকে ওঠেন ক-টার সময়? ভোর পাঁচটায় । সুন তাঁর কাজে যোগ দেবার পর থেকেই দেখেছে যে রাতে নটা-দশটার বেশি তিনি কখনোই জেগে থাকেন না । সবসময়েই কি গোমড়া মুখে ব'সে-ব'সে ভাবেন ? দেখে কি মনে হয় যে বেঁচে আর ভালো লাগছে না ? না কি হতাশ অবসাদে আচ্ছন্ন থাকেন সবসময় ? না, যদিও কোনোকালেই খুব ধুম-ধাম হৈচৈ আমোদ-আহ্লাদ খুব-একটা পছন্দ করতেন না, তাই ব'লে মুখকালো ক'রে ব'সেও থাকতেন না ; সত্যি-বলতে, দু-তিন দিন ধ'রে তাঁকে বরং আগের চেয়ে ঢের বেশি প্রফুল্লই দেখা যাচ্ছে । তাঁর কাছে কি কোনো বিষের পুরিয়া আছে ? হঠাৎ একদিন বিষ খেয়ে বসবেন ব'লে কি মনে হয় ? উঁহু, অন্তত সুনের তো তা সম্ভব ঠেকছে না ; সত্যি-বলতে আজই সকালে সুন গিয়ে কিন-ফোর কথায় ওয়াং-পো নদীর জলে একগাদা আফিমের গুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে—কিন-ফোর নাকি মনে হয় তা থেকে আচমকা কোনো বিপদ-আপদ হ'তে পারে ।

বিড়ুল্‌ফের আশঙ্কা জাগাতে পারে, এমন-কোনো তথ্যই পাওয়া গেলো না এই জেরা থেকে । ধনীর দুলাল কিন-ফোকে এমন পরিতৃপ্ত ও প্রফুল্ল দেখা যায়নি কোনো দিন । তবু ক্রেগ আর ফ্রাই তাদের কর্তব্যকর্মে ঢিলে দেয়ার কথা ভাবতে পারলে না ; একটুও আলস্য করলো না তারা পাহারা—তাদের গোয়েন্দাগিরির সব মান-সম্ভ্রম তো আর ধুলোয় লুটোবার ঝুঁকি নেয়া যায় না—আগের চেয়েও তীক্ষ্ণ চোখে ও দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তারা কিন-ফোর উপর নজর রাখতে লাগলো ; একটা মাছিও যাতে তাদের নজর এড়িয়ে গ'লে যেতে না-পারে সে বিষয়ে সাবধানতার কোনো কমতি ছিলো না তাদের ; সব শুনে-টুনে এটা তারা ধ'রেই নিয়েছিলো যে নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করার মৎলব কিন-ফোর নেই, তাই কিন-ফো বাড়ি থেকে বেরোলেই তারা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তার পাছু নেয় ; তাছাড়া

সুনের সঙ্গে আরো চুটিয়ে বন্ধুতা করলে তারা, আর এমন হাতখোলা ও দরাজদিল বন্ধু পেয়ে সুনের মুখের কুলুপ খুলে গেলো ।

আর কিন-ফো নিজে ? যেই সে ঠিক করছে যে আর বেশিদিন বেঁচে থাকবে না, অমনি যেন জীবনের জন্য মমতা গজাতে আরম্ভ করেছে তার মধ্যে । কী-হয় কী-হয় এই উৎকণ্ঠা, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা, অনিশ্চিতি আর সন্দেহ—সব মিলিয়ে তার মধ্যে এমন রোমাঞ্চ আর এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হ'তে লাগলো, যার স্বাদ সে আগে কোনো দিনই পায়নি । মাথার উপর সে নিজেই ঝুলিয়ে দিয়েছে দামোক্লেসের খড়্গ—সেই অনিবার্য কুঠার যে কখন বিদ্যুৎগতিতে নেমে আসে তার কোনো স্থিরতা নেই ব'লেই প্রতিটি মুহূর্ত এখন তার পরম উত্তেজনায় কেটে যায় ।

সে-রাতে ওই চুক্তি ক'রে নেয়ার পর থেকে কিন-ফো আর ওয়াং-এর মধ্যে আর-কোনো কথা হয়নি ; বস্তুত তাদের মধ্যে আর দেখাই হয়নি ; হয়তো দার্শনিক ওয়াং আজকাল বেশির ভাগ সময়ই বাড়ি থাকে না, আর নয়তো নিজের ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে-ব'সে সে ভাবে কেমন ক'রে কিন-ফোকে বধ করা যায়—হয়তো তাই-পিং বিদ্রোহীদের দলে থাকার সময় নরহত্যার যে-সব পদ্ধতি সে জেনেছিলো তা-ই মনে-মনে বিচার ক'রে দেখছে কিন-ফোর বেলায় তার কোনটা প্রয়োগ করা যায় । ওয়াং কী ক'রে সময় কাটাচ্ছে আজকাল, এ-সম্বন্ধে অনেকে রকম অনুমানই শুধু করতে পারে কিন-ফো ; কিন্তু ওই অনুমান করতে গিয়েই নতুন আরেকটি চেতনার সঙ্গে পরিচয় হলো কিন-ফোর, তার নাম কৌতূহল ; কিন্তু কৌতূহল তাকে আর এক মুহূর্তেরও স্বস্তি দিচ্ছে না ।

এখন কেবল খাবারটেবিলেই দেখা হয় দুজনের—কিন্তু কথাবার্তা হয় খুবই সাধারণ বিষয়ে । তাছাড়া ওয়াংকে আজকাল কেমন চাপা আর বিষণ্ন ঠেকে, কথাবার্তা খুব কম বলে ; চোখ কেমন যেন উদাস ও শূন্য থাকে—তার চশমার মস্ত কাচগুলোও তা গোপন রাখতে পারে না ; আগে বেশ খেতে পারতো সে ; এখন যেন কিছুই আর মুখে রোচে না ; কোনো সুখাদ্য বা মূল্যবান মদ্য তার আহারে রুচি দিতে পারে না । ওদিকে কিন-ফো আজকাল প্রতিটি খাবারই তারিয়ে-তারিয়ে খায় । অসম্ভব খিদে পায় তার আজকাল, রোজ সে যে কেবল প্রচুর খাচ্ছে তা-ই নয়, হজমও ক'রে ফেলছে অনায়াসে । এটা অন্তত বোঝা যাচ্ছে ওয়াং আর যা-ই করুক তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে তাকে মারতে চায় না ।

যে-অদ্ভুত কর্মের ভার পড়েছে ওয়াং-এর উপর, তা সম্পন্ন করার সব সুযোগই তার আছে : কিন-ফোর শোবার ঘরের দরজা আজকাল হাট করা থাকে ; দিন-রাতে যখন খুশি অনায়াসে সে-ঘরে ঢুকতে পারে ওয়াং, ঘুমন্ত বা জাগ্রত—যে-কোনো মুহূর্তেই সে ছোরা বসাতে পারে তাকে । এভাবে যদি ওয়াং তাকে আক্রমণ করে, তাহ'লে যা-যা হ'তে পারে, সব ভেবে দেখেছে কিন-ফো : ভগবান করুন ওয়াং-এর হাত যেন ফসকায় না, ছোরাটা যেন সোজা তার বুকে ব'সে যায় । কিন্তু ভাবনাটায় কিন-ফা দু-এক দিনেই এত অভ্যস্ত হ'য়ে গেলো যে শেষকালে কয়েকদিন পরেই সে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলো ; রাতের বেলা শোবামাত্র গাঢ় ঘুমে ঢ'লে পড়ে, সকালে যখন ওঠে তখন বেশ ঝরঝরে আর হালকা লাগে নিজেকে ।

মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলো ওয়াং, এতকাল কত যত্ন-আত্তি পেয়েছে সে-এখানে ; হয়তো সেই জন্যেই এই বাড়ির ভিতর রক্তপাত করতে তার হাত উঠছে না—কিছুদিন পরে অন্তত এই রকমই মনে হ'লো কিন-ফোর । ফলে এই মুশকিল আসান করার জন্য, আর তাকে সব দিক দিয়ে সুযোগ ক'রে-দেবার জন্য কিন-ফো রোজ একা শহর ছাড়িয়ে দূরে-দূরে বেড়াতে যেতে লাগলো—যে সব রাস্তায় লোক চলাচল কম, সে রাস্তাগুলোই বেছে নেয় সে সবসময় । গভীর রাত অব্দি শহরের সবচেয়ে কুখ্যাত পল্লিতে সে সময় কাটায় । রোজ-রোজ সে-সব পাড়ায় রক্তপাত হয়, ছুরি-ছোরা চলে—কিন্তু ওয়াংকে সবরকম সুযোগ দেয়া চাই তো ! অন্ধকারে সরু গলি দিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে শেষরাত অব্দি —মাতাল আর নেশাখোরেরা টলতে-টলতে চ'লে যায় তার আশপাশ দিয়ে, ধাক্কা দেয় কখনো, নেশার ঘোরে প্রলাপ বকে — শেষে ভোর হ'য়ে আসে ; দূরে মিষ্টিওলাদের ঘুন্টি আর হাঁক শোনা যায় : 'মান-তৌ মান-তৌ !' কিন্তু সব ফিয়ার লেন থেকেই দিব্যি বহাল তবিয়তে ফিরে আসে সে ; এটা সে এখনো টের পায়নি যে যতই উড়নচণ্ডি তার চলা-ফেরা হোক না কেন, ক্রেগ আর ফ্রাই এই দুই মাসতুতো ভাইয়ের কড়া নজর সে মুহূর্তের জন্যও এড়িয়ে যেতে পারে না ।

এই ভাবেই যদি দিন কাটতে থাকে, তাহ'লে—কিন-ফো মনে-মনে ভীত হ'য়ে উঠলো—শেষকালে তার ওই নিস্পৃহ ও নিঃসাড় দিনগুলো না আবার ফিরে আসে ! এখনি তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে অথচ একবারও ওই আসন্ন মৃত্যুর কথা মনে পড়ছে না ।

মে মাসের বারো তারিখে অবিশ্যি এমন-একটা ঘটনা ঘটলো, যা তার কল্পনাকে আবার উশকে দিয়ে গেলো । ওয়াং-এর ঘরের দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো কিন-ফো । হঠাৎ ভিতরে চোখ প'ড়ে যায় তার, তাকিয়ে দ্যাখে একটা মস্ত ধারালো ছুরি হাতে নিয়ে ওয়াং আঙুল বুলিয়ে তার ধারটা কেমন আছে পরীক্ষা ক'রে দেখছে ; দেখেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো থমকে গেলো কিন-ফো : তাকিয়ে দেখলো একটা গাঢ় বেগনি রঙের অত্যন্ত সন্দেহজনক বোতলে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিলো ওয়াং ; তারপর টেনে তুলে শূন্যে সেটাকে উঁচিয়ে ধরলো—আর তার মুখের ভাব বদলে গিয়ে কেমন যেন ভয়ংকর হ'য়ে উঠলো, যেন তার শরীরের সব রক্ত চোখে উঠে এসেছে ।

ওয়াং যাতে টের না-পায় যে সে সবই দেখতে পেয়েছে, এই ভেবে কিন-ফো তাড়াতাড়ি পা টিপে-টিপে চ'লে গেলো । 'হুম্ ! এই ব্যাপার তাহ'লে ! তা ভালোই হলো ! খাশা ! তোফা ! চমৎকার !'

সারা দিন আর কিন-ফো ঘর ছেড়ে একবারও বেরুলো না ; কিন্তু ওয়াং আর কিছুতেই আবির্ভূত হ'লো না । রাত এলো, কিন-ফো শুয়ে পড়লো চটপট ; সকাল হ'য়ে এলো —কিন্তু তখনও দিব্য বহালতবিয়তে বেঁচে আছে সে । কিঞ্চিৎ রুষ্টই হ'লো কিন-ফো । ব্যাপারটা বড্ড বিরক্তিকর হ'য়ে উঠছে না ? খামকাই এতটা উত্তেজিত হয়েছিলো সে— এখন তার সব অনুভূতিই নষ্ট হ'য়ে যেতে বসেছে ! আস্ত একটি লেটলতিফ এই ওয়াং, গড়িমশি ক'রেই দশটা দিন কাটিয়ে দিলে ! হচ্ছে হবে ক'রে সময় কাটাতে পারছে সে কী ক'রে ? নিশ্চয়ই শাংহাইয়ের ভোগ-বিলাস তাকে একেবারে দুর্বল ক'রে দিয়ে গেছে

—বুকের পাটা ব'লে কিছুই আর নেই তার ।

ওয়াং এদিকে আরো শুকিয়ে যেতে লাগলো । সবসময়েই মুখ কালো হ'য়ে আছে তার, কেমন যেন বিষণ্ণ আর করুণ হ'য়ে আছে—কেবল ছটফট করে, এক মুহূর্তও যেন স্বস্তি পায় না । অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ায় সে ইয়ামেনে ; লাই-চু থেকে দামি কফিনটা এনে যে-ঘরে রাখা হয়েছে, বারে-বারে সেই ঘরটায় গিয়ে ঢুকে পড়ে । ইতিমধ্যেই সুনের কাছ থেকে কিন-ফো জেনে গিয়েছে যে ওয়াং নাকি সেই কফিনটার ধুলো ঝেড়ে সাফসুফ ক'রে রঙ করার হুকুম দিয়েছে । ফিশফিশ ক'রে সুন জানালো, 'আপনার আরামের জন্য সব সাফসুফ ক'রে রাখছেন তিনি । আপনার যাতে কোনো নষ্ট না-হয়, সেদিকে তাঁর কড়া নজর ।'

আরো তিনটি দিন কেটে গেলো, কিন্তু কোনোকিছুই ঘটলো না । তাহ'লে কি ওয়াং একেবারে শেষ দিনে বুকে ছুরি বসাবার কথা ভাবছে ? যতক্ষণ-না পুরো সময় উৎরোচ্ছে, ততক্ষণ কিছু করার মতলব তাহ'লে তার নেই ? তা-ই যদি হয়, তাহ'লে তো এই মৃত্যুতে মোটেই কোনো বিস্ময় রইবে না ।

পনেরো তারিখে আরেকটা অর্থপূর্ণ খবর কানে এলো কিন-ফোর । গত রাতটা তার অদ্ভুত ছটফটানির মধ্যে কেটেছে ; সকালে, ছটার সময়, একটা ভারি বিশ্রী মন-খারাপ-করা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে তার : স্বপ্নে দেখেছে নরকের অধীশ্বর যুবরাজ ইয়েন তাকে ডেকে ভীষণ হুকুম দিচ্ছেন যে চিন সাম্রাজ্যের আকাশে দ্বাদশ সহস্রতম চাঁদ না-ওঠা পর্যন্ত সে যেন যুবরাজের ধারে কাছে না-ঘেঁষে । তার মানে আরো একশো বছর বেঁচে থাকতে হবে তাকে, আরো *এ ক শো টি ব ছ র* ! নাঃ, তার সংকল্পে বাধা দেবার জন্যেই যেন সবাই এখন একযোগে ষড়যন্ত্র করছে । ফলে সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলো, মেজাজ তখন তেরিয়া হ'য়ে আছে । সুন যখন সকালে তাকে পোশাক-আশাক পরাতে এলো, তখন তো সে জগতের উপর রেগে টং হ'য়ে আছে !

'বেরিয়ে যা ঘর থেকে—মেরে তাড়াবার আগে বেরিয়ে যা, রাস্কেল !'

এ-ক-দিন সদয় ব্যবহার পেয়ে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলো সুন ; হঠাৎ এই সম্ভাষণ শুনে সে একেবারে আঁৎকে উঠলো । কিন্তু একটা জরুরি খবর পৌঁছে দিতে হবে ব'লে তার আর পশ্চাদপসরণ করা হ'লো না ।

'বেরিয়ে যা বলছি,' হুংকার দিয়ে উঠলো কিন-ফো ।

'আমি কেবল বলতে চাচ্ছিলুম যে—' সুন শুরু করলো ।

'বেরো, স্কাউনড্রেল কোথাকার !' কিন-ফোর গর্জন ।

'যে ওয়াং—' সুন তবু বলবার চেষ্টা করলো ।

'ওয়াং ! হুঁ, তা ওয়াং কী করেছে ?' কিন-ফো তার বেণী ধ'রে টান দিলো সজোরে ।

বেণীটা উদ্ধার করার জন্য কত রকম কায়দা করলো সুন—যত চোট বুঝি তার বেণীর উপর দিয়েই যায়, এই ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠলো সে ; কিন্তু কিন-ফোর বারংবার প্রশ্নের উত্তরে শেষকালে তাকে বলতেই হ'লো : 'আপনার কফিনটা দীর্ঘপ্রাণের বনভবনে নিয়ে যেতে বলেছেন তিনি !'

হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে কিন-ফোর সারা মুখ ভ'রে গেলো । 'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, সেই হুকুমই তো দিয়েছেন' ।

'নে, এই দশটা তায়েল নে । যা, দেখে আয়—ওর হুকুম যেন চটপট পালন করা হয় ।'

সুনের আর বিস্ময়ের সীমা রইলো না ; তায়েল দশটা কুড়িয়ে নিয়ে সে হুড়মুড় ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো । কর্তার যে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, এ-বিষয়ে তার একটুও সন্দেহ নেই । ভাগ্যিশ, পাগলামিটা এমন বদান্যতাতেই সীমাবদ্ধ ।

এবার কিন-ফো একেবারে নিঃসন্দেহ হ'লো । অবশেষে যে দীর্ঘপ্রতীক্ষিত সংকটকাল আসন্ন, ওয়াং-এর এই হুকুমই তার স্পষ্ট প্রমাণ ! কিন-ফো নিজে যেখানটায় আত্মহত্যা করতে চাচ্ছিলো, ওয়াং যে তাকে সেখানেই বধ করার সংকল্প করেছে, এ-সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় রইলো না । ঈশ ! কী আস্তে যে কাটলো দিনটা—এত বড়ো দিন বোধহয় কোনোদিন আর আসেনি । ঘড়ির কাঁটাগুলো অবধি যেন কুঁড়ের বাদশা হ'য়ে গেছে—নড়তেই চায় না মোটে । কিন্তু তবু একসময় ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'লো, রাত নেমে এলো ইয়ামেনের উপর ।

দীর্ঘপ্রাণের বনভবনেই রাত কাটাবার সংকল্প করেছিলো কিন-ফো । ঢোকবার সময় সে স্থির জানতো যে আর সে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে না ভিতর থেকে । একটা নরম সোফায় শুয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো । আশপাশে কেউ কোথাও নেই ; সব কেবল স্তব্ধ, চুপচাপ ও থমথমে ; সাত-পাঁচ, কত এলোমেলো কথা মনে প'ড়ে যেতে লাগলো তার ; অতীতকে এখন কোন দূর স্বপ্নের মতো মনে হ'লো তার—তেমনি অবাস্তব ও তেমনি ঠুনকো পলকা ; মনে প'ড়ে গেলো কী ভীষণ নির্বেদ আর নিস্পৃহা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো এতকাল ; সম্পদের চেয়ে দারিদ্রই বা ভালো হ'লো কোথায় ? মনে প'ড়ে গেলো লা-ওকে ; তার স্মৃতির ভিতর সে-ই শুধু ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল ; এখনও তার ভালোবাসার কথা মনে প'ড়ে বুকটা কেমন ক'রে উঠলো, নিশ্বাস দ্রুত এলো ; কিন্তু না — তার দুর্দশায় ওই দেবীকে সে টেনে আনতে চায় না ।

রাত নিঃঝুম হ'য়ে এসেছে ; সমস্ত প্রকৃতি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে—কি চেতন কি অচেতন—কেউ কোথাও জেগে নেই । কিন-ফো উৎকর্ণ হ'য়ে শোনবার চেষ্টা করলো । তার চোখ দুটো যেন অন্ধকার ভেদ করে তন্নতন্ন ক'রে কাকে খুঁজতে চাচ্ছে । কতবার যে মনে হ'লো কেউ বুঝি দরজার কুলুপ খোলবার চেষ্টা করছে । আতঙ্ক আর কামনায় মেশানো সে-এক ভীষণ অনুভূতি ! ঘুমিয়ে পড়ছে না কেন সে ? তার সুপ্তির মধ্যেই না-হয় তাই-পিং-এর সর্বনেশে আবির্ভাব হোক !

কিন্তু আস্তে-আস্তে সকাল হ'য়ে এলো । তখন সূর্য ওঠেনি, কেবল পুবদিকটায় একটু শাদা ছোপ দিয়েছে, এমন সময় হঠাৎ সশব্দে বনভবনের দরজা খুলে গেলো । 'সময় হ'লো তবে এতক্ষণে !' ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো কিন-ফো ! যেন একটা ছিন্ন প্রায় মুহূর্তের বৃন্তে থরথর করছে তার সমস্ত জীবন !

কিন্তু এ তো ওয়াং নয় ! এ যে সুন ! তার হাতে একটা চিঠি, আর চিঠির গায়ে বড়ো-বড়ো ক'রে লেখা : 'জরুরি !' 'এক ফোঁটাও দেরি না-করে নিয়ে এসেছি,' প্রভুকে জানালো সুন ।

কিন-ফো চিঠিটা একরকম ছিনিয়েই নিলে তার হাত থেকে। সান ফ্রান্সিসকোর ডাকঘরের ছাপ খামের উপর। খাম খুলে চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিতেই সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো তার কাছে। ক্ষিপ্তের মতো ছুটে বেরুলো কিন-ফো ঘর থেকে, ডাক দিলো : 'ওয়াং, ওয়াং!'

তীরের মতো ছুটে গেলো সে দার্শনিকের কোঠায়, পরমুহূর্তেই আবার বেরিয়ে এলো তেমনি সবেগে ; তখনো সে গলা ফাটিয়ে ডাক দিচ্ছে : 'ওয়াং, ওয়াং, ওয়াং!'

কিন্তু ওয়াংকে কোথাও পাওয়া গেলো না। তার বিছানা দেখে বোঝা গেলো রাতে কেউ তাতে শোয়নি। ডেকে তোলা হ'লো সব লোকজনকে। তন্নতন্ন ক'রে খোঁজা হ'লো গোটা ইয়ামেন : ওয়াং-এর কোনো চিহ্নই পাওয়া গেলো না—অত বড়ো মানুষটা যেন হাওয়ায় উবে গিয়েছে—ঠিক কর্পূরের মতো যেন। ওয়াং যে এখান থেকে পিঠটান দিয়েছে, তাতে আর-কোনো সন্দেহই নেই এখন!

১০

কড়া পাহারা

'সব ধাপ্পা, জানেন বিডুল্‌ফ, বিলকুল ধাপ্পাবাজি!' সান ফ্রান্সিসকোর চিঠিটা পাবার পরেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেন্টেনারিয়ানের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কিন-ফো ; উত্তেজিতভাবে হাত-পা নেড়ে সে আবার বললে, 'মার্কিন ব্যাবসাদারির একটা কারদানি ছাড়া আরকিছুই নয় এই ব্যাপারটা!'

'তা যা-ই বলুন, তারা যে খুবই চালাক, এটা তো মানবেন,' অত্যন্ত মোলায়েমভাবে জানালেন বিডুল্‌ফ, 'সবাই বিশ্বাস ক'রে বসেছিলো তো—তাদের চাল তো সফল হয়েছে।'

'অন্তত আমার লোক যে বিশ্বাস করেছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' বললে কিন-ফো, 'কিন্তু এই চিঠিতে সে জানাচ্ছে হঠাৎ সব লেনদেন বন্ধ ক'রে দেয়াটা ছিলো নাকি ব্যাবসারই একটা চাল। —হুড়মুড় ক'রে শেয়ারের দর শতকরা আশি টাকা প'ড়ে যায়—কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার সব কাজকারবার শুরু হয়েছে। ব্যাঙ্ক নিজেই সব শেয়ার কম দামে কিনে নিয়েছে —; এ-সম্বন্ধে তদন্ত হ'তেই দেখা গেলো যে সব উত্তর তাদের মুখাগ্রে। বাকি অংশিদারদের এবার তারা শতকরা পৌনে দুশো ক'রে মুনাফা দেবে। এই চিঠি না-পেলে আমি তো ধ'রে ব'সে রইতুম যে একেবারে দেউলে হ'য়ে গেছি।'

'হুম,' বিডুল্‌ফ বললেন, 'আর দেউলে হ'য়ে গেছেন ভেবেই বুঝি আত্মহত্যার সংকল্প নিয়েছিলেন?'

'অনেকটা তাই—তবে, না ব্যাপারটা ঠিক তা ছিলো না। যে-কোনো মুহূর্তে খুন হ'য়ে যাবো ব'লেই প্রত্যাশা করেছিলুম আমি।'

'তা আত্মহত্যাই করুন, আর খুনই হোন—মোদ্দা ব্যাপারটা আমাদের কাছে সমান : কড়কড়ে দু-লাখ ডলার লোকশান দিতে হ'তো আমাদের। আপনি যে এখনো বেঁচে আছেন, এইজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই,' ব'লে খাঁটি মার্কিন কেতায় বিডুল্‌ফ কিন-ফোর করমর্দন করলেন।

ম্যানেজারের কাছে এ-বার সব কথাই খুলে বললো মক্কেলটি। একটি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তাকে হত্যা করার জন্য সে যে এক বন্ধুর সঙ্গে চুক্তি করেছে, খুনের জন্য বন্ধুটি যাতে কোনো শাস্তি না-পায় এইজন্য সে যে একটি অভয়পত্র লিখে দিয়েছে—এ-সব কোনো কথাই কিন-ফো আর গোপন করলো না।

'কিন্তু বিষম ব্যাপারটা এই-যে,' কিন-ফো জানালো, 'চুক্তিটা বহালই আছে এখনো। চুক্তি অনুযায়ী আমাকে খুন করতেই হবে তাকে—আর সে যে মোটেই তার কথার কোনো খেলাপ করবে না, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই সে যে আমাকে খুন করবে — তাতে আমার কোনো সন্দেহই নেই।'

'তা এই ভাড়াটে আততায়ীটি কি সত্যি আপনার বন্ধু?' বিডুল্‌ফ জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। শুধু তা-ই নয়, আমার মৃত্যুর পর সে পঞ্চাশ হাজার ডলার পাবে।'

'হুম! হ্যাঁ, এবার বুঝলাম। বন্ধুটি নিশ্চয়ই দার্শনিক ওয়াং—আপনার বিমায় যাঁর নাম আছে। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই এমন বিষম কাজ করার মতো লোক নন?'

কিন-ফো আরেকটু হ'লে ব'লেই ফেলতো যে—'আপনি ভুল ভেবেছেন, বিডুল্‌ফ; আসলে সে একজন তাই-পিং—এর আগে সে এমন-সব দুষ্কর্ম করেছে যে তার শিকাররা সবাই যদি সেন্টেনারিয়ানের মক্কেল হ'তো, তবে কোনকালেই কম্পানিকে লাল বাতি জ্বেলে পাততাড়ি গুটোতে হ'তো —' কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে শামলালো কিন-ফো—না, ওয়াংকে সে কিছুতেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারবে না। ওই তাই-পিং বিক্ষোভের রক্তরাঙা দিনগুলোর পর আঠারো বছর কেটে গেছে—কিন্তু তবু এখনো কেউ যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পায় যে ওয়াং ওই তাই-পিংদের একজন ছিলো, তাহ'লে শাসকগোষ্ঠীর রোষ থেকে তার আর নিষ্কৃতি নেই। সে যে ওয়াং-এর কৃতকর্মের নজির থেকে জানে ওয়াং যেমন ক'রেই হোক চুক্তির সব নির্দেশ পালন করবে, এ-কথা সে সেইজন্যেই জোর দিয়ে বলতে চাচ্ছিলো না।

একটু ভেবে বিডুল্‌ফ আবার বললেন, 'তাহ'লে আর কী, একটা খুব সোজা রাস্তা খোলা আছে আপনার কাছে—ওয়াংএর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন, গিয়ে বলুন যে চুক্তিটা আপনি বাতিল ক'রে দিতে চাচ্ছেন এখন : সব বুঝিয়ে-শুঝিয়ে তার কাছ থেকে ওই অভয়পত্রটা ফেরৎ নিয়ে নিন।'

'ও-কথা বলাই, খুব সহজ,' কিন-ফো উত্তর দিলে, 'মুশকিল হচ্ছে এই-যে ওয়াং নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে, ওর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না —কোথায় গেছে কেউ জানে না।'

'হায়-হায়!' বিডুল্‌ফ আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'তাহ'লে তো বিষম ব্যাপার!' এতক্ষণে তাঁকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখালো।

কেউই কোনো কথা বললো না কিছুক্ষণ।

'ধ'রে নিচ্ছি যে এখন আর আপনি খুন হ'তে চান না,' নিস্তব্ধতা ভেঙে বিডুল্‌ফ বললেন।

'ঠিক তার উলটো — কেন চাইবো মরতে ? ওই সাময়িক ব্যাঙ্কবিপর্যয়ের ফলে আমার সম্পত্তি প্রায় ডবোল হ'য়ে গেছে—আমার বাঁচার ইচ্ছেও তেমনি দ্বিগুণ হয়েছে এখন। শিগগিরই বিয়ে করতে চাই।'

'বটেই তো !' অমায়িকভাবে হাসলেন বিডুল্‌ফ।

'কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন ওয়াং-এর কোনো খোঁজ না-পাওয়া অব্দি আমি মোটেই নিরাপদ নই। অন্তত যতদিন আমার জীবনবিমার মেয়াদ না-ফুরোয়, ততদিন তো বটেই।'

মৃদু গলায় মন্তব্য করলেন বিডুল্‌ফ, 'ততদিন আমাদের আপিশও মোটেই নিরাপদ নয়।'

'পঁচিশে জুন অব্দি আমার জীবন মারাত্মক বিপদের মধ্যে প'ড়ে থাকবে,' কিন-ফো জানালো।

'হ্যাঁ, পঁচিশে জুন পর্যন্ত যত ঝক্কি যত ঝামেলা সব সেন্টেনারিয়ানকেই ভোগ করতে হবে,' দুই হাত মুঠো ক'রে পিছনে নিয়ে আস্তে-আস্তে পায়চারি শুরু করলেন বিডুল্‌ফ।

'শুনুন, কী করতে হবে আমাদের,' একটু ভেবে তিনি বললেন, 'যে ক'রেই হোক আপনার ওই দার্শনিক বন্ধুকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে—এমনকি যদি তিনি মাটির তলায় গিয়ে লুকিয়ে থাকেন, তবু —'

'যেন খুঁজে বার করতে পারেন, এই কামনা করি,' কিন-ফো উত্তর দিলে।

'আর ইতোমধ্যে আপনাকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের—আপনাকে আত্মহত্যার হাত থেকে যেভাবে বাঁচিয়েছি, সেইরকম একটা-কিছু—'

কিন-ফো চমকে উঠলো, 'তার মানে ? আপনি কী বলছেন, আমি তো তা কিছুই বুঝতে পারছি না !'

'কেন, যেদিন থেকে আপনি জীবনবিমা করলেন, সেদিন থেকেই তো আমার দুটি লোক আপনাকে সবসময় নজরবন্দী ক'রে রেখেছে। ছায়ার মতো আপনার পিছন-পিছন গেছে তারা সবসময়, কী করেন না-করেন—সব লক্ষ করেছে !'

'আর আমি তা একবারও টের পাইনি !'

'আপনারও যদি গোয়েন্দাগিরিতে ওদের মতো দক্ষতা থাকতো, তাহ'লেই হয়তো টের পেতেন—কিন্তু ওরা খুব সাবধানি লোক। ওরা যে এখন এই আপিশ অবধি আপনাকে অনুসরণ ক'রে এসেছে, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আপনাকে ভিতরে ঢুকতে দেখেছে ওরা—কখন বেরোন এখান থেকে, বেরিয়ে কোথায় যান, সব খোঁজখবর নেবার জন্য নিশ্চয়ই এখন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।'

'এও কি সম্ভব ?' যেন নিজেকেই জিগেশ করলে কিন-ফো।

'ক্রেগ ! ফ্রাই !' কণ্ঠস্বর একটুও না-চড়িয়েই বিডুল্‌ফ হাঁক পাড়লেন।

ঘরে এসে ঢুকলো দুজনে।

'আপনার অনুমতি পেলে এদের হাতে আমি এখন একটা নতুন কাজের ভার দিতে

চাই। এতক্ষণ এরা আপনাকে আপনার নিজের হাত থেকেই রক্ষা ক'রে আসছিলো—আপনি যাতে আত্মহত্যা ক'রে না-বসেন, সেদিকে কড়া নজর রেখেছিলো এরা ; এবার থেকে এরা আপনাকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবে—এমনভাবে এরা আপনাকে পাহারা দেবে যে ওয়াং আপনার গায়ে আঁচড়টিও কাটতে পারবে না।'

এই ব্যবস্থা মেনে না-নিয়ে কোনো উপায় ছিলো না কিন-ফোর, কোনো বিকল্প না। কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রেই গোয়েন্দা দুজন নতুন কাজের ভার নিয়ে নিলো।

এখন তাদের সামনে আশু কর্তব্য কী, এবার তা-ই ঠিক করতে হয়। বিডুল্‌ফের মতে সামনে এখন নাকি দুটো রাস্তাই কেবল খোলা আছে ; এক. হয় কিন-ফো এখন রোজ চব্বিশ ঘণ্টা তার বাড়িতেই থাকবে ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের পাহারায়—খেয়াল রাখবে যাতে কারু অলক্ষিতে ওয়াং বাড়িতে ঢুকতে না-পারে : আর নয়তো ওয়াংকে তারা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে—ওই ভয়ংকর দলিলটা ওয়াং-এর কাছ থেকে উদ্ধার না-করা পর্যন্ত আর-কোনো দিকেই নজর দেবে না।

'তাহ'লে ওয়াংকেই খুঁজে বার করার ব্যবস্থা করুন,' কিন-ফো বললে, 'কনফুসিয়ুসের এই চেলাটির কাছে ইয়ামেনের সব অন্ধিসন্ধি ফাঁকফোকর জানা—ইচ্ছে করলেই সে অনায়াসে সকলের অগোচরে ভিতরে ঢুকে পড়তে পারবে।'

'হ্যাঁ, সম্ভব হ'লে ওয়াংকে তো খুঁজে বার করবো বটেই,' বিডুল্‌ফ সম্মতি দিলেন, 'কিন্তু আপনাকেও মোটেই চোখের আড়াল করা চলবে না।'

'ওয়াং-এর কোনো অনিষ্ট করবেন না তো আপনারা,' কিন-ফো আবেদন করলো।

'জীবিত বা মৃত—হিড়হিড় ক'রে টেনে আনতে হবে তাকে,' বললে ক্রেগ।

'জ্যান্ত বা মড়া—তাকে খুঁজে বার করতেই হবে,' ফ্রাই প্রতিধ্বনি তুললো।

'মৃতদেহ এনে আর কী লাভ—হয় জীবিত—নয়তো নয়,' কিন-ফো আবার আবেদন করলো।

কর্মসূচি স্থির হ'য়ে গেলে বিডুল্‌ফের কাছ থেকে বিদায় নিলো কিন-ফো ; বাড়ি ফেরবার সময় তাকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক দেহরক্ষী দুজনকেই সঙ্গে নিতে হ'লো।

সুন যখন আবিষ্কার করলে যে ক্রেগ আর ফ্রাই এখন থেকে ইয়ামেনের মধ্যেই থাকবে, তখন তার আর খেদের সীমা থাকলো না। আর-কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না তাকে : তার মানে ওই রজত-মুদ্রাগুলি আর তার বরাতে নেই। আর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো কিন-ফোও এদিকে পূর্ণোদ্যমে আবার তার আলস্য আর ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য কাঁচি ব্যবহার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে ! বেচারা সুন ! তখনও যদি সে জানতে পেতো ভবিষ্যৎ তার জন্য কী তুলে রেখেছে শিকেয় !

বাড়ি ফিরেই কিন-ফো প্রথমে পেইচিঙে একটি 'ফোনোগ্রাম' পাঠাবার উদ্যোগ করলে। সে যে হৃত সম্পদ আবার ফিরে পেয়েছে এ-কথা জানাতে সে একটুও দেরি করলো না। আবার সেই প্রিয় কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে লা-ও তার আনন্দ যে কোথায় রাখে ভেবেই পেলো না। ফোনোগ্রামের মূল বার্তা সম্বন্ধে তার কোনো আকর্ষণ ছিলো না—যে-কণ্ঠস্বর চিরকালের মতো স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লে ভেবেছিলো আবার তার ধ্বনিস্পন্দন কানে যেতেই সে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠলো। কিন-ফো জানিয়েছে যে সপ্তম চাঁদ দিগন্তের কোলে ঢ'লে

পড়বার আগেই সে গিয়ে লা-ওর পাশে দাঁড়াবে—আর-কোনো দিনও মুহূর্তের জন্য তার পাপ ছেড়ে যাবে না তারপর ; কিন্তু তার আগে লা-ওকে দেখতে যাবার উপায় নেই তার, কারণ দ্বিতীয়বার লা-ওকে বিধবা করতে চায় না সে ।

চিঠির শেষ কথাগুলোর অবশ্য কোনো মর্মোদ্ধার করতে পারলো না লা-ও । কিন্তু তার ভালোবাসার ধন সে যে আবার ফিরে পাবে, আর কখনো যে তাকে তার হারাতে হবে না—এই কথা জেনেই সে সেদিন পিকিং-এর সবচেয়ে সুখী তরুণী হ'য়ে উঠলো ।

কিন-ফোর সমস্ত জীবন এরমধ্যেই আদ্যোপান্ত বদলে গেছে । তার রূপান্তর, যাকে বলে, এখন অতি সম্পূর্ণ । হৃত সম্পদ ফিরে পেতেই তার জীবনদর্শনই বদলে গিয়েছে একেবারে : এই সেদিন কোয়াংতুঙে সে তার যে বন্ধুদের ভোজসভায় আপ্যায়িত করেছিলো, তারা যদি তাদের সেই নিস্পৃহ ও নিরুত্তাপ বন্ধুকে এখন দেখতে পেতো, তাহ'লে কিছুতেই চিনতে পারতো না । আর ওয়াং ? সে হয়তো কিন-ফোকে দেখে নিজের কাণ্ডজ্ঞান ও পঞ্চেন্দ্রিয়কেই অবিশ্বাস করতে শুরু ক'রে দিতো ।

ওয়াং-এর কোনো চিহ্নই কোনো হদিশই পাওয়া যায়নি এখনো । সবগুলি বিদেশী বসতি, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, উপকণ্ঠ ও শহরতলি তন্নতন্ন ক'রে খোঁজা হ'লো—শাংহাইয়ের সব কোনাখামচিতে সন্ধান করা হ'লো—তার পাত্তা পাবার জন্য অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সব 'তি-পাও' বা গুপ্তচর লাগানো হ'লো—কিন্তু কিছুই ফল হ'লো না—কোনো সূত্র, বা ইঙ্গিত বা চিহ্নই পাওয়া গেলো না তার ।

ক্রেগ আর ফ্রাই ক্রমেই কি-রকম অস্থির হ'য়ে উঠলো ; সব দেখেশুনে বড্ড অস্বস্তি লাগছে তাদের ; ফলে তারা আঠার মতো লেগে রইলো কিন-ফোর সঙ্গে—তার সঙ্গে শোয়, পারলে এক কাপড়ই বুঝি পরে ; সেদ্ধ ডিম ছাড়া আর-কিছু খেতে নিষেধ করলো তারা কিন-ফোকে—সেদ্ধতে নাকি বিষ মেশাবার উপায় থাকে না, তারা বোঝাতে চেষ্টা করলো কিন-ফোকে। এত সব বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে কিন-ফোর সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ ক'রে উঠলো । এ তো সেণ্টেনারিয়েনের লোহার সিন্দুকে বন্দী হ'য়ে থাকার শামিল—তাহ'লে এই দু-মাস সেখানে থাকলেই হয়—প্রত্যুত্তরে এই কথাই সে বললো তাদের ।

কম্পানির স্বার্থের কথা বিবেচনা ক'রে বিড়ুল্ফ অবশ্য একবার বলেছিলেন যে কিস্তির টাকা ফিরিয়ে দিয়ে না-হয় বিমার পলিসিটা বাতিল করে ফেলা হোক । কিন-ফো কিন্তু সে-প্রস্তাবে কিছুতেই কর্ণপাত করলো না । একবার যখন চুক্তি হয়েছে, তখন তার সমস্ত ফলাফলও ভোগ করতে হবে—বেগতিক দেখে তা আর খারিজ করা চলবে না । তাকে একটুও টলাতে না-পেরে বিড়ুল্ফ শেষটায় হাল ছেড়ে দিলেন ; তবে তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বললেন যে যে-কম্পানির প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে তিনি গর্ব অনুভব করেন, কিন-ফো যে সেখানেই বিমা করেছে, এটা তার মস্ত সৌভাগ্যেরই লক্ষণ ।

১১

বদনামের ঢক্কানাদ

যখন কয়েক দিন চ'লে গেলো, অথচ ওয়াং-এর কোনো সন্ধানই পাওয়া গেলো না, কিন-ফো তখন উপর চাপিয়ে-দেয়া এই নিষ্কর্ম বন্দীদশায় অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। বিডুল্‌ফ নিজেও কিঞ্চিৎ উদ্বেগ ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন । প্রথমটায় যদিও ভেবেছিলেন যে ওয়াং নিশ্চয়ই ওই ভীষণ কর্মটি কদাচ সম্পন্ন করবে না, তবু এখন ক্রমে-ক্রমে তাঁর বিশ্বাস হ'তে লাগলো যে চিনদেশে এমনকী মার্কিন মুলুকের চেয়েও অনেক তাজ্জব ব্যাপার অনেক অদ্ভুত ঘটনা অনায়াসে ঘ'টে যায় ; শেষকালে কিন-ফোর মতেই সায় দিলেন তিনি : ওয়াং-এর এই রহস্যময় অজ্ঞাতবাস আসলে তার মারাত্মক পুনরাবির্ভাবেরই পূর্বাভাস ; আকস্মিক বজ্রাঘাতের মতো অবতীর্ণ হ'য়ে হঠাৎ সেই চরম আঘাতটি হেনেই সেণ্টেনারিয়ানের আপিশে গিয়ে সে তার প্রাপ্য অর্থ দাবি করতে চাইবে বোধহয় ।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, সব ভাবে বা কোনো বিশেষভাবে—যেমন ক'রেই হোক তার এই ফন্দিকে ব্যর্থ করতে হবে, হ'বেই—ভাবলেন বিডুল্‌ফ । কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন তিনি । শুধু-যে 'পেইচিং হরকরা,' 'ৎচিং-পাও' ও হংকং আর শাংহাইয়ের সব খবরের কাগজেই যে বারবার বিজ্ঞাপন দিলেন তিনি তা নয়, ইওরোপ আমেরিকারও সব কাগজে তার ক'রে বিজ্ঞাপন পাঠালেন তিনি । প্রথম বিজ্ঞাপনটির পাঠ ছিলো এ-রকম : 'শাংহাই-নিবাসী কিন-ফোর সঙ্গে ওয়াং-এর যে-চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিলো, কিন-ফো যেহেতু এখন একশো বছর বাঁচতে চান, সেহেতু তা এতদ্দ্বারা খারিজ করা হ'লো ।'

এই বিজ্ঞাপনটির পরেই বেরুলো আরেকটি ঘোষণা :

'দু-হাজার ডলার পুরস্কার

এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা যাচ্ছে যে শাংহাই-নিবাসী ওয়াং-এর বর্তমান গতিবিধি ও বাসস্থান সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যিনি খবর দিতে পারবেন, তাঁকে তেরোশো তায়েল বা দু-হাজার ডলার পুরস্কার হিশেবে দেয়া হবে ।—

উইলিঅম জে. বিডুলফ্

সেণ্টেনারিয়ান ইনশিওরেন্স কম্পানি, শাংহাই !'

চুক্তি সম্পাদন করবার মাত্র অল্প কয়েক সপ্তাহ বাকি আছে ব'লে ওয়াং-এর পক্ষে কোনো দূর দেশে চ'লে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ; আশপাশে কোথাও সে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে, এটাই বোধকরি বেশি সম্ভাব্য—সুযোগ পেলেই ঘাঁটি থেকে বেরিয়েই শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে । কিন্তু বিডুল্‌ফ তাই ব'লে কোনো সম্ভাবনাকেই বাজিয়ে না-দেখে ছেড়ে দেবার পাত্তর নন ।

বিজ্ঞাপনগুলো ক্রমেই চারদিকে চাঞ্চল্য আর সাড়া তুলতে লাগলো। একদিন সকালে একটা বিজ্ঞাপন বেরুলো, যার উপরে বড়ো-বড়ো হরফে ছাপা :

'ওয়াং ! ওয়াং ! ওয়াং !'

আর ঠিক তার পরের বিজ্ঞাপনের উপর ছাপা হ'লো :

'কিন-ফো ! কিন-ফো ! কিন-ফো !'

আর তার ফলে এই হ'লো যে অচিরেই ওয়াং আর কিন-ফো চিন-মুলুকে দুটি বিষম কুখ্যাত নামে পরিণত হ'য়ে গেলো।

'ওয়াং কোথায় হে ?'

'ওয়াং-এর মৎলবটা কী বলো তো ?'

'কোনো পাত্তা পেলে ওয়াং-এর ?'

কারু সঙ্গে দেখা হ'লেই এই হাস্যকর কথা ছাড়া আর-কিছু শোনা যায় না। শেষকালে এমনকী ছোটোদের মধ্যেও উত্তেজনাটা ছড়িয়ে পড়লো, রাস্তায় ছুটোছুটি করতে করতে তারা শোর তুললো : 'ওয়াংকে কে দেখেছে, জানিস ?'

কিন-ফোর নামও কম কুখাত হয়নি তাই ব'লে। একশো বছর বাঁচতে চায়, কথাটা প্রকাশ্যে ঘোষিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে লোকের টিটকিরির পাত্র হ'য়ে উঠলো। বিশ বছর ধ'রে রাজার হাতিশাল-আলো-ক'রে-থাকা হস্তী শাবকটির নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটলো অবশেষে—লোকে বললো ; রাজকীয় পীতবসনের নতুন আরেক দাবিদার গজালো তাহ'লে ; মান্দারিন কি ব্যাবসাদার, ভবঘুরে কি নৌ-নিবাসী—সকলেই কিন-ফোর নাম ক'রে ঠাট্টা করতে শুরু ক'রে দিলো। 'উইলো বনের হাওয়া' গানের এক লালিকা বা টিটকিরি তৈরি হ'লো তার নামে, 'শতবর্ষের বুড়ো' নামে হাসির গানটা এত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠলো যে তিন সাপেক দামে গানটা বেচে গীতিকারটি দু-দিনেই বড়োলোক হ'য়ে গেলো। চিনমুলুকের লোকেরা এমনিতেই আমোদ-আহ্লাদ খুব ভালোবাসে ; ঠাট্টা টিটকিরিতে তাদের কখনো অরুচি জাগে না ; ঠাট্টা করার সুযোগ পেলে এমনকী কারু ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও মন্তব্য করতে ছাড়ে না : কিন্তু এই বিজ্ঞাপনগুলো তাদের যেমন হাসির খোরাক জোগালো তার আর কোনো তুলনাই হয় না।

এই হৈ-চৈ আর চাঞ্চল্য দেখে অবশ্য বিড়ুলফ অত্যন্ত তুষ্ট হলেন ; তাঁর সব অভিপ্রায়ই এতে সার্থক হ'লো। অবশ্য ওয়াং-এর উপর তার প্রতিক্রিয়া কী হ'লো তা কেউ জানে না, কিন্তু বেচারা কিন-ফোর কাছে এই কুখ্যাতি অর্জন রীতিমতো অপ্রীতিকর ও বিরক্তিজনক হ'য়ে উঠলো। রাস্তা দিয়ে হাঁটা-চলাই মুশকিল হ'য়ে উঠলো তার পক্ষে : তাকে রাস্তায় দেখলেই বেকার আড্ডাখোরেরা চারপাশে ভিড় ক'রে ; এমনকী শহর ছাড়িয়ে শহরতলির রাস্তা দিয়ে অনেকদূরে চ'লে গেলেও ওই ভিড়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না ; শেষকালে বিরক্ত হ'য়ে যখন ইয়ামেনে ফিরে আসে, তখন একপাল লোক তার পিছু-পিছু এসে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে নানা রকম মন্তব্য হানে। রোজ সকালে তুলকালাম শোরগোল ক'রে তার উদ্দেশে হাঁক পাড়ে শাংহাইবাসীরা : তারা স্বচক্ষে দেখে যেতে চায়

যে রাতের অন্ধকারে কফিনে যাবার দশা হয়নি তার ; রোজ খবরের কাগজে তার খবর বেরোয়, রাজাবাদশাদের স্বাস্থ্যপত্রের মতো ; লোকের মনোযোগ এড়িয়ে কোনো-কিছু করার অবস্থা তার আর রইলো না । এই অসহনীয় পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না । কারু যদি একটা মুহূর্তও নিজস্ব ও ব্যক্তিগত না-থাকে, তাহ'লে বেঁচে-থাকাই দুর্বহ হ'য়ে দাঁড়ায় । একুশ তারিখে সকাল বেলায় তাই সে হন্তদন্ত হ'য়ে বিডুল্ফের আপিশে গিয়ে হাজির হ'লো ; গিয়েই কোনো ভূমিকা না-ক'রে মূল কথাটি পেড়ে বসলো সে—এই মুহূর্তে সে শাংহাই ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে ।

কম্পানির স্বার্থের কথা ভেবে-ভেবে বিডুল্ফের তখন চোখে ঘুম নেই ; কিন-ফোর সংকল্প শুনে তাঁর চোখ কপালে উঠলো । এতে যে সে কী মহাবিপদের সম্মুখীন হবে, এটাই তিনি তাকে ভালো ক'রে বোঝাতে চাইলেন ।

'বিপদে পড়তে হয় পড়বো—তার আর কী করবেন ?' বললে কিন-ফো, 'কিন্তু আমি এই ঝুঁকি নেবোই—আপনি না-হয় আরো সাবধান হবার ব্যবস্থা করুন ।'

'কিন্তু একবার ভেবে দেখুন,' বিডুল্ফ আবেদন করলেন ।

কিন-ফো বাধা দিয়ে বললে, 'আমি যাবোই !'

'কোথায় ?'

'জানি না । যে-দিকে দু-চোখ যায় ।'

'কোথায় উঠবেন ? থামবেন কোথায় ?'

'কোত্থাও না ।'

'ফিরবেন কবে ?'

'আর ফিরবোই না ।'

'কিন্তু যদি ওয়াংকে খুঁজে বের করতে পারি আমরা ?'

'গোল্লায় যাক ওয়াং !'

'কিন্তু আপনার চুক্তির কথাটা একবার ভেবে দেখুন !'

'যেমন এক আকাট উজবুক ছিলুম, আস্ত বোকা ছিলুম, তাই এই ফল ভোগ করছি এখন !'

'কিন্তু এখনো হয়তো ওয়াংকে পাকড়াও করতে পারবো আমরা ।'

'জাহান্নামে যাক ও !'

ভিতরে-ভিতরে কিন-ফো যে তীব্রভাবে চাচ্ছিলো ওয়াং ধরা পড়ুক, এটা স্বীকার ক'রে নেয়াই ভালো । তার জীবন যে অন্য লোকের মর্জির উপর সূক্ষ্ম তন্তুতে ঝুলে-ঝুলে দোল খাচ্ছে, এই জ্ঞানটাই এখন তার চিরযন্ত্রণার মূল কারণ । যুদ্ধ-বিগ্রহের অরাজক অবস্থার চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থা এটা—আরো একমাস এমনি ভয়ংকর উৎকণ্ঠায় কাটাতে হবে ভাবলেই তার সর্বাঙ্গে হিম হ'য়ে আসে, বুকের রক্ত জল হ'য়ে যায় ।

'সত্যি যেতে চান আপনি ?' আবার গোড়া থেকে শুরু করলেন বিডুল্ফ ।

'আপনাকে তো বলেইছি আমি,' বললে কিন-ফো ।

'ক্রেগ আর ফ্রাইকেও যে আপনার সঙ্গে যেতে হবে, তা জানেন নিশ্চয়ই ?'

'সে আপনার মর্জি ! আমি কেবল এটুকু জানিয়ে দিচ্ছি যে ওদের খুব হন্তদন্ত হ'য়ে

ছুটে বেড়াবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে ।'

'যেতে তাদের হবেই,' আবারও জানালেন বিডুল্‌ফ, 'আপনি বললেই তারা তৈরি হ'য়ে নেবে ।'

ইয়ামেনে ফিরে এসেই কিন-ফো যাত্রার জন্য তোড়জোড় শুরু ক'রে দিলো । সুন যখন শুনলো যে তাকেও প্রভুর সঙ্গে এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরুতে হবে, তখন তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো ; কুঁড়েমি করার চেয়ে ভালো জিনিশ কিছু আছে ? হন্তদন্ত হ'য়ে ছোটাছুটি করার চেয়ে জঘন্য বোধ হয় আর-কিছু নেই—অতন্ত সুনের সুচিন্তিত অভিমত ছিলো তা-ই । কিন্তু সাধের সেই শূকরপুচ্ছ বা বেণীটির প্রতি মমতা তার কিঞ্চিৎ বেশি ছিলো ব'লেই বেচারি কোনো প্রতিবাদ বা গাঁইগুঁই করার সুযোগ পেলে না ।

একটু পরেই খাঁটি মার্কিন ক্ষিপ্রতার নজির হিশেবে যাত্রার জন্য তৈরি হ'য়ে ক্রেগ আর ফ্রাই এসে হাজির ।

'কোন দিকে —' শুরু করলো ক্রেগ ।

'যেতে হবে আমাদের ?' শেষ করলো ফ্রাই ।

'প্রথমে তো নানকিং, তারপর সেখান থেকে গোল্লায়,' একটু যেন তীক্ষ্ণভাবেই ব'লে উঠলো কিন-ফো ।

শুনে গোয়েন্দাযুগল পরস্পরের মধ্যে অর্থপূর্ণ হাস্য বিনিময় করলো । পরে যখন জানলো যে সন্ধের আগে কিন-ফোর পক্ষে আর রওনা হওয়া হবে না, তখন দুজনে বিডুল্‌ফের সঙ্গে কিঞ্চিৎ শলাপরামর্শ ক'রে আসতে গেলো ; তা ছাড়া চৈনিক পোশাক প'রে নেবারও মৎলব ছিলো তাদের—মার্কিন পোশাক বড্ড সহজে চোখে প'ড়ে যায় । গেলো, আর এলো—হাতে ব্যাগ, কোমরে রিভলভার গুঁজে একেবারে যেন উড়তে-উড়তে ফিরে এলো দুজনে ।

তখন সন্ধে হ'য়ে আসছে, ছোট্ট দলটি বেরিয়ে পড়লো । যতদুর সম্ভব লোকের চোখ এড়িয়ে মার্কিন বসতির বন্দরটায় গিয়ে হাজির হ'লো তারা । শাংহাই থেকে নানকিং পর্যন্ত স্টিমারে যাবে তারা ; আবহাওয়া ভালো থাকলে এটুকু পথ যেতে তাহ'লে বারো ঘণ্টাও লাগবে না ।

কিন্তু বেশিক্ষণ না-লাগলে কী হয়, ক্রেগ আর ফ্রাই কোনো সামান্য বিষয়কেও অবহেলা করতে রাজি নয় : তাদের জিম্মায় যে-চৈনিক যুবকটি রয়েছে, তার গায়ে যাতে আঁচড়টিও না-লাগে, সেই জন্য সব যাচিয়ে-বাজিয়ে না-দেখে কিছুতেই তুষ্ট হয় না । জাহাজের অন্য যাত্রীদের সবাইকে ভালো ক'রে খুঁটিয়ে দেখা তারা কর্তব্য ব'লে মনে করলো । শাংহাইতে অনেক দিন আছে ব'লে ওয়াং-এর সৌম্য অমায়িক মূর্তি তাদের অচেনা ছিলো না ; যতক্ষণ-না তারা নিশ্চিত হ'লো যে ওয়াং ছদ্মবেশে এসে এই জাহাজে ওঠেনি, ততক্ষণ তারা নিশ্চিন্ত হ'লো না । ওয়াং সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'য়ে তারা কিন-ফোর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার উপর কড়া নজর দিলো । কিন-ফো হেলান দিয়ে দাঁড়ালে যাতে ভেঙে প'ড়ে না-যায়, সেইজন্য রেলিংগুলো কেমন শক্ত, তা তারা পরখ ক'রে দেখলো । পাটাতনের প্রত্যেকটা কাঠ যাচিয়ে নিলো তারা, যাতে কিন-ফো চলতে গেলে দুম ক'রে ভেঙে না-যায় ; এঞ্জিনের কাছে তো তাকে কিছুতেই যেতে দিলো না তারা, কখন বয়লার ফেটে যায় তার ঠিক কী ! রাতের

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ডেকে এসে দাঁড়ালে তারা গজগজ করতে লাগলো—ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখ করলেই হয়েছে ! তার কামরার ঘুলঘুলিগুলো ভালো ক'রে আঁটা আছে কিনা দেখে নিলো তারা এক-এক ক'রে । নিজেরাই তার চা-জলখাবার ব'য়ে নিয়ে গেলো, যাতে কেউ তাতে বিষ মেশাতে না-পারে । আর সর্বময় প্রভুর কর্মে অবহেলা করার দরুন সুনকে একযোগে তারা ধমকাতে লাগলো । শেষকালে জামাকাপড় না-ছেড়েই, কোমরে লাইফ-বেল্ট বেঁধে দরজার কাছে শুয়ে রইলো তারা, যাতে ধাক্কা লেগে, বয়লার ফেটে বা অন্য-কোনো কারণে জাহাজ চুরমার হ'য়ে গেলে কিন-ফোর জলে-ডুবে-মরার সম্ভাবনা হ'লে তারা সেই দৈব অভিপ্রায়ে বাদ সাধতে পারে ।

নির্বিঘ্নেই অবশ্য নানকিং পৌঁছুলো তারা । এমন-কিছুই ঘটলো না, যাতে তাদের এত সাবধানতার সত্যিকার কোনো পরীক্ষা হয় । উয়ো-সুং পেরিয়ে এলো জাহাজ চট ক'রে ; ইয়াং-ৎসিকিয়াং বা নীল মোহানায় ঢুকে পড়লো নির্বিঘ্নে ; ৎসিং-সিং দ্বীপ পেরিয়ে, ও-সুং আর লাং-চানের আলো দূরে ফেলে রেখে পরদিন প্রাতঃকালে সেই প্রাচীন নগরের জেটিতে গিয়ে ভিড়লো জাহাজ ।

কিন-ফো যে শাংহাই ছেড়ে প্রথমেই নানকিংয়ের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলো, তার পিছনে একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিলো । এককালে এই পুরোনো নগর ছিলা ৎচাং-মাও বিদ্রোহের প্রধান ঘাঁটি ; এখনো হয়তো সেখানে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত কেউ-কেউ গোপন ঘাঁটি বানিয়ে ব'সে আছে ; কে জানে ওয়াং হয়তো শাংহাই ছেড়ে নানকিঙেই চ'লে আসার কথা ভেবেছিলো । নগরীর অতীত ইতিহাস যেন রক্তে দোলা জাগায় । এখানেই প্রাক্তন শিক্ষক রং-সিঔ-ৎসিন তাই-পিংদের নেতৃত্ব দিয়ে মাঞ্চু শাসকদের দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করেছিলেন : এখানেই ১৮৬৪ সালে শত্রুপক্ষের হাতে পড়ার ভয়ে বিষ খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন ; এখানেই মহাশান্তির নব যুগ ঘোষিত হয়েছিলো একদা, পরে যেখান থেকে রং-সিঔ-ৎসিনের ছেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতার শাসকরা পরে যাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে শিরশ্ছেদ করেছিলো । আর তাঁর সেই অস্থিচূর্ণ যে কবর থেকে তুলে এনে শেয়াল-কুকুরের মধ্যে শ্মশানে-মশানে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো—সে তো এখানেই । অর্থাৎ নানকিং কি আসলে তার ভগ্নস্তূপের মধ্যে ওয়াং-এর শত-সহস্র বিপ্লবী বন্ধুদের লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেনি—তিন দিন সবল প্রতিরোধ করার পর ঠাণ্ডা মাথায় তাতাররা যাদের নির্দয়ভাবে নিধন করেছিলো ? এটা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক—কিন-ফো মনেমনে আলোচনা করলো—যে, ওয়াং প্রথমে এখানেই এসে আশ্রয় নিতে চাইবে । ঘরে ফেরার প্রবল আকৃতি যদি হঠাৎ তাকে ছিঁড়ে খেতে থাকে, তাহ'লে এখানে কি সে অতীতের লুপ্ত ধূসর বিধুর সুগন্ধ নিতে চাইবে না বুক ভ'রে ? তার ওই রক্তরাঙা প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য এই অতীতের স্মৃতি ও চিরপরিচিত পরিবেশের মধ্যে ফিরে এসেই কি সে শক্তি ও প্রেরণা লাভ করার চেষ্টা করবে না, যাতে একদিন সাহসে বুক বেঁধে বজ্রের মতো শাংহাইতে নেমে পড়তে পারে ?

কিন্তু অন্য-কোথাও যাবার আগে প্রথমে নানকিং-এ আসাটা আরো-একটা কারণে ভালো হ'লো । এখানেই যদি ওয়াং-এর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহ'লে তো কথাই নেই, অত্যন্ত ভালো হবে ; তক্ষুনি সব মুশকিলই আসান হ'য়ে যাবে । কিন্তু তা না-হ'লে কিন-ফো বরং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ক্রমাগত ঘুরেই বেড়াবে, যাতে নির্দিষ্ট সময়টা অতিক্রম

ক'রে নির্ভয় হ'য়ে যাওয়া যায় ।

ডাঙায় নেমেই কিন-ফো তার দলবল নিয়ে শহরের অর্ধ-পরিত্যক্ত অঞ্চলের এক হোটেলে গিয়ে উঠলো । হোটেলটার আশপাশে প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নস্তূপ প'ড়ে আছে—বন্য বিমর্ষ ও ভয়াবহ ।

'আগে থেকে তোমাদের একটা কথা ব'লে নিই,' অনুচরদের বললে সে একসময়, 'এটা মনে রেখো যে-এখন আমি ছদ্মনামে ঘুরে বেড়াচ্ছি ; কোনো কারণেই কেউ আমাকে কিন-ফো ব'লে ডাকতে পারবে না । এখন থেকে আমার নাম কি-নান ।'

'তাই হবে', সুন জানালো ।

'কি-নান,' ক্রেগ আর ফ্রাই নামটা ভাগাভাগি ক'রে পুনরাবৃত্তি ক'রে নিলো একবার ।

ইদানীং লোকজন তাকে যেভাবে জ্বালাতন করেছে, তাতে সে যে উত্যক্ত হ'য়ে তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সব দিকেই নজর দেবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই । সে যে আসলে নানকিঙের রাস্তায় ওয়াং-এর দেখা পাবে ব'লে প্রত্যাশা করছে, ঘুণাক্ষরেও এ-কথা সে কারু কাছে প্রকাশ করলো না । এটা সে বুঝেছিলো যে একবার যদি ক্রেগ আর ফ্রাই এ-কথা জানতে পারে তাহ'লে নতুন ক'রে আরো হাজারো বাধা-নিষেধের মধ্যে তাকে হাঁপিয়ে উঠতে হবে । ওই গোয়েন্দা দুজনের চোখে সে যেন সামান্য একটা মালের বস্তা ছাড়া আর-কিছু নয় — যে ক'রেই হোক সব বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা ক'রে নিরাপদে এই মাল যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হবে—তাদের উপর যেন এই দায়িত্ব বর্তেছে, অন্তত এটাই তাদের ভাবভঙ্গি ।

শহরে ঘুরে বেড়াতেই সারা দিন কেটে গেলো তাদের । উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূব থেকে পশ্চিমে—ভগ্নপ্রায় ও মুমূর্ষু শহরটাকে তারা আদ্যোপান্ত দেখে নিলো প্রথমে ; তার হতশ্রী জীর্ণদশায় সেই প্রাচীন জাঁকজমক ও সমৃদ্ধির কিছুই আর নেই এখন । কিন-ফো তাড়াতাড়ি হাঁটলো সারাক্ষণ ; কথা বললো খুব কম, সবসময় চোখকান খোলা রেখে কেবল যে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখতে-দেখতেই গেলো তা নয়, পথচারীদের ভাবভঙ্গি চলনবলন লক্ষ করতেও সে ভুললো না ।

কিন্তু যে-অতিচেনা মুখটিকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো তাকে কোথাও দেখা গেলো না । খালে-বিলে নৌকোয়-শাম্পানে যারা থাকে, তাদের মধ্যে যেমন ওয়াং-এর কোনো হদিশ নেই, তেমনি অন্ধকারে গলিঘিঁজিতেও সেই পলাতক মানুষটির চিহ্ন পাওয়া গেলো না । কিন-ফো যেন আশ্চর্য-কোনো বর্ম প'রে এসেছে যার ফলে ক্লান্তি বা অবসাদ তাকে স্পর্শই করতে পারছে না । সুন বেচারা সারাক্ষণ ভারি ও অনিচ্ছুক পায়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে তাকে অনুসরণ করলো । আর ক্রেগ আর ফ্রাই যদিও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো, তবু তারা কোনো দ্বিরুক্তি না-করেই তার সঙ্গে-সঙ্গে গেলো । এককালে যেখানে রাজবাড়ি ছিলো, এখন সেখানে তারা দেখলো কেবল মারবেল পাথরের ভাঙা বাহিরবাড়ি আর আধ-পোড়া দেয়াল । দেখতে পেলো ক্যাথলিক মিশনারিদের ইয়ামেন—১৮৭০ সালের অভ্যুত্থানের সময় আরেকটু হ'লেই তাতার-বাহিনীর হাতে তাদের মরতে হ'তো । এককালে এখানে পোর্সেলেনের যে-তোরণটা ছিলো, এখন সেই পোর্সেলেনের চিরস্থায়ী ইট দিয়ে কামানের কারখানা বানানো হয়েছে : তাও তারা পেরিয়ে গেলো ; তারপর অনেক ঘোরাঘুরির পর তারা নগরীর পূর্বতোরণ পেরিয়ে

গ্রামাঞ্চলে এসে পৌঁছুলো ।

এখানে এসে কিন-ফোকে একবার থমকে গিয়ে চারপাশে তাকাতে হ'লো । শহর পেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে মস্ত এক শান বাঁধা রাস্তায় এসে পড়েছে তারা—দু-পাশে গ্র্যানাইট পাথরের মস্ত সব মূর্তি চ'লে গেছে সারি-সারি—সব জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি—অতিকায় হস্তীমুখ, বন্য মহিষ, উটের পাল, ভীষণ ড্র্যাগন—কিছুই ভাস্করদের কল্পনাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি । এই পথ ধ'রে এগুতে-এগুতে দূরে সে দেখতে পেলো ছোট্ট একটা মন্দির—মস্ত একটা টিলা উঠে গেছে তার পিছনে—টিলা না-ব'লে পাহাড় বলাই বোধকরি সংগত । পাহাড়টা আসলে গোরস্থান । সমাধিটা আসলে পুরোহিতরাজ রং-ও-র, পাঁচশো বছর আগে যিনি বৈদেশিক জোয়ালের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন । কিন-ফো তার মনোভাব আর চেপে রাখতে পারলে না । আবার নররক্তে হাত রাঙাবার আগে ওয়াং কি এই পুণ্য সমাধিতে তীর্থভ্রমণে না-এসে পারবে ? কিন-ফোর মনে হ'লো এক্ষুনি বুঝি ওই ভগ্ন ও বনাকীর্ণ সমাধি ফুঁড়ে বেরিয়ে ওয়াং তার সামনে এসে দাঁড়াবে ।

কিন্তু না—কেউ কোনোখানে নেই ; বিজন মন্দিরটি খাঁ-খাঁ করছে : ওই অতিকায় পাথরের মূর্তিগুলোই শুধু মন্দিরের দ্বারী হিশেবে দাঁড়িয়ে আছে দু-পায়ে, আশপাশে জীবন্ত কোনো জনপ্রাণীর চিহ্নও দেখা যায় না ।

ফিরে আসবে ব'লে ভাবছিলো কিন-ফো, হঠাৎ মন্দিরের দরজায় কী-সব লেখা আছে দেখে থমকে দাঁড়ালো ; সাগ্রহে এগিয়ে গিয়ে দ্যাখে কে যেন কতগুলি কথা খোদাই ক'রে গেছে এখানে—একেবারে টাটকা এই লেখা, যেন এইমাত্র কেউ এই হরফগুলো খোদাই ক'রে গেছে : ও, ক, ফ, ।

আর-কোনো সন্দেহই নেই । ওয়াং আর কিন-ফো, এই দুই নামের আদ্যক্ষর না-হ'য়ে যায় না ! 'এখানে এসেছিলো ওয়াং ? হয়তো এখনো আশপাশে কোথাও আছে,' মনে-মনে বললো সে । উৎকণ্ঠায় ভ'রে গিয়ে রুদ্ধশ্বাসে চারপাশে খুঁজে দেখলো সে, কিন্তু তার সব সন্ধানই ব্যর্থ হলো । শেষকালে ফিরে-আসা ছাড়া তাদের কোনো গত্যন্তর রইলো না । আর তার পরেই হঠাৎ যেন বিষম অবসাদে ভ'রে গেলো সে । গোয়েন্দা দুজনও অবশেষে হোটেলে ফিরে যেতে পেয়ে খুশি হ'য়ে উঠলো ।

পরদিন সকালেই তারা নান-কিং ছেড়ে চ'লে গেলো ।

১২

পথে বেরুবার নানান ফ্যাচাং

ঘোড়ায় জিন-দিয়ে-আসা অচেনা লোকটিকে যদি সব চিনেরই প্রহেলিকা ঠেকতো, তাহ'লে তেমন দোষ দেয়া যেতো না । কাল কোথায় যাবে আজ যে জানে না, এমন ভ্রমণকারী সহজেই বিস্ময় ও সন্দেহ জাগিয়ে তোলে । হোটেলে গিয়ে ওঠে, কিন্তু ঘণ্টা কয়েকের বেশি

থাকে না। রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসে, কিন্তু তড়িঘড়ি কিছু গিলেই বেরিয়ে পড়ে। খরচ করে দু-হাতে, কিন্তু সবসময়েই লক্ষ রাখে যাতে এত টাকার বদলে তাড়াতাড়ি পথ চলতে পারে সে।

স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে ব্যাবসা দেখতে বেরোয়নি ; কিংবা কোনো জরুরি কাজের ভার নিয়ে বেরিয়ে-পড়া মান্দারিনও সে নয় ; প্রত্নতাত্ত্বিকও নয় যে পুরোনো মন্দির থেকে প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ বের ক'রে দেখতে চায় ; এমনও নয় যে ডিগ্রিলাভের জন্য ব্যস্ত কোনো প্যাগোডা-শিক্ষার্থী সে ; বৌদ্ধ শ্রমণও নয় যে বোধিদ্রুমের শিকড়ের টুকরো যে-সব পূজাবেদীতে রয়েছে ঘুরে-ঘুরে তা দেখতে বেরিয়েছে ; কিংবা পাঁচ পাহাড়ের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া তীর্থযাত্রী ব'লেও তাকে মনে হয় না। অদ্ভুত এই লোকটা, এই কি-নান--আগাগোড়াই তার কেমন যেন রহস্যে ছাওয়া।

সেণ্টেনারিয়ানের এই মক্কেলটির যেন সবসময়েই শশব্যস্ত ভাবে ঘুরেবেড়ানো ছাড়া আর-কোনো অভিপ্রায় নেই। সদাসতর্ক ক্রেগ আর ফ্রাই, আর তিতবিরক্ত ও অবসন্ন সুনকে নিয়ে সে হুড়মুড় ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে : উদ্দেশ্য তার দুটি এবং পরস্পরবিরোধী : যেমন সে ওয়াং এর হাত থেকে রেহাই পেতে চাচ্ছে, তেমনি আবার অনাবিষ্কৃত সেই মানুষটিকে সে খুঁজেও বের করতে চাচ্ছে। একদিকে যেমন তার এই উভয়সংকট থেকে সে উদ্ধার পেতে চায়, তেমনি আবার সবসময় ঘোড়ায় জিন দিয়ে থেকে ওই সমুদ্যত দুর্বিপাক থেকেও রক্ষা পাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে তার : ঝোপের পাখির চেয়ে উড়ে-যাওয়া পাখিকে মারা বেশি কঠিন ব'লেই সে কোথাও স্থির হ'য়ে থাকতে চায় না।

নানকিং থেকে দ্রুতগামী একটি মার্কিন জাহাজে ক'রে নীল নদী দিয়ে এগিয়ে ইয়াং-ৎসি-কিয়াং হান-কিয়াং-এর মোহানায় হান-কৌ পৌঁছুলো তারা, আর সেই ভাসমান সরাইখানায় ক'রে সেখানে পৌঁছুতে সময় লাগলো মোটে ষাট ঘণ্টা। এই রাস্তাতেই চোখে পড়ে স্রোতের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটি আশ্চর্য ও অতিকায় পাথর, যার উপরে বৌদ্ধমন্দিরে ভিক্ষু ও শ্রমণদের যাতায়াতের কোনো বিরাম নেই। লোকে এই আশ্চর্য পাথরটিকে 'ছোট্ট অনাথ' ব'লে ডাকে : এটাকে দেখে মুগ্ধ হওয়া দূরে থাক, তারা এমনকী এটার দিকে একবার তাকালোই না।

অবশেষে হান-কৌতে কিন-ফো অর্ধেক দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে রাজি হ'লো। প্রাচীন তাই-পিং বিভীষিকার চিহ্ন হিশেবে প'ড়ে আছে ধ্বংসস্তূপ, চারদিকে ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি পথঘাটের ছড়াছড়ি ; কিন্তু ওয়াং-এর কোনো খোঁজই কোথাও পাওয়া গেলো না—না পাওয়া গেলো হাং-ইয়াং-ফোর সংলগ্ন ডানতীরের ব্যাবসাকেন্দ্রে, না-বা তাকে পাওয়া গেলো হৌ-পে প্রদেশের রাজধানী, বামতীরের উয়ো-চাং-ফোতে। নানকিং-এর সমাধিভবনে কিন-ফো সেই-যে রহস্যময় কতগুলি অক্ষর দেখেছিলো, তারও কোনো পুনরাবৃত্তি কোথাও দেখা গেলো না।

ক্রেগ আর ফ্রাই যদি ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে চিনের এ-সব অঞ্চলের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের তথ্য লিপিবদ্ধ করতে চাইতো, তাহ'লে তাদের অত্যন্ত নিরাশ হ'তে হ'তো। কারণ কোনো জায়গাতেই তারা ততক্ষণ থাকতো না, যতক্ষণে ভালো ক'রে সব দেখা-শোনা যায়। এটা অবশ্য বলা উচিত যে বাচাল বা অতিভাষী

নয় ব'লে তাদের কৌতূহল কম ছিলো। নিজেদের মধ্যেই তারা কম কথা বলতো, কিন্তু বেশি কথা বলার দরকারও তাদের তেমন ছিলো না। দুজনের চিন্তার ভঙ্গিই একেবারে একরকম, ফলে তাদের সব কথাবার্তাই শেষ পর্যন্ত কোনো-একজনের স্বগতোক্তি ব'লে মনে হ'তো। এ-অঞ্চলের ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিলো না ; চওড়া রাস্তা, সুন্দর বাড়ি-ঘর, কি ইওরোপীয় বসতির ছায়াঘেরা পথঘাট—কোনো-কিছুকেই তারা তারিফ করতো না ; বেশির ভাগ চিনে শহরেই যে শহরের ঠিক মাঝখানটাকে মরা, আর আশপাশকে জ্যান্ত ব'লে মনে হয়—এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যটির দিকেও নজর দেবার মতো অবস্থা তাদের ছিলো না।

লাও-হো-কৌ পর্যন্ত আরো একশো মাইল পর্যন্ত নাব্য হান-কিয়াং ; জাহাজটি সেই উদ্দেশে রওনা হবার উপক্রম করলো, কিন-ফোও অমনি বাকি পথটুকু চ'লে যাবে ব'লে ঠিক ক'রে নিলো। তার দুই দেহরক্ষীও এই সিদ্ধান্তে বেশ খুশি হ'য়ে উঠলো, তার কারণ এই যে ডাঙার চেয়ে জলপথে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা অনেক কম—আর জাহাজে গেলে তাদের পক্ষে আরো কড়া নজর রাখার সুবিধে হয়। সুন তো তাদের চেয়েও বেশি খুশি। তার মেজাজের সঙ্গে জাহাজের জীবন দিব্যি খাপ খায়। অন্তত, হাঁটতে তো হবে না, তাছাড়া কাজ-কর্মেরও দরকার হয় না জাহাজে—কারণ ক্রেগ আর ফ্রাই তার প্রভুর যাবতীয় ফাই-ফরমাশ খেটে দেয়—নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিরেট করবার জন্য। জাহাজের একটা ছোট্ট কামরায় আরাম ক'রে প'ড়ে-প'ড়ে নাক ডাকায় সে সারাদিন, আর ঠিক কেমন ক'রে যেন খাবার সময়গুলোতে জেগে যায় : সুখাদ্যকে তারিফ করার মতো আভিজাত্য ও সুরুচি তার আছে। দু-এক দিন সাধারণ খাদ্য-তালিকায় ছোটোখাটো কিছু পরিবর্তন দেখে বোঝা গেলো তারা আরো উত্তরে এসে পৌঁছেছে। ভাতের বদলে খামিরহীন রুটির মতো গম খেতে হ'লো তাদের—গরম-গরম খেলে বেশ ভালোই লাগে তা। খাঁটি দক্ষিণীরা অবশ্যি কাঠের চামচে দিয়ে ভাত খাওয়ার অভ্যেস ভুলতে পারে না ব'লে সহজে তাদের এই নতুন খাদ্য মুখে রুচতে চায় না। সময় মতো তাকে চা আর ভাত জুগিয়ো, তাহ'লেই দেখবে দক্ষিণীর সন্তোষের শেষ নেই : জাহাজের ভালো রান্নার চেয়ে তার ওই অভ্যস্ত খাদ্য বেশি ভালো লাগে।

আসলে তারা এবার গম-প্রধান অঞ্চলে এসে প্রবেশ করেছে; এখানকার মাটি শুকনো, দিগন্তে দেখা যায় মিং রাজাদের তৈরি কালো-কালো দুর্গ-ওলা গিরিশ্রেণী। কৃত্রিম পাড়ের স্বাভাবিক খাতের মধ্য দিয়ে ব'য়ে যায় জলস্রোত—নদী ক্রমশ চওড়া কিন্তু ঘোলাটে হ'য়ে আসে।

ইউয়েন-লো-ফুর বন্দরে শুল্ক বিভাগের পাশে কয়েক ঘণ্টা থেমে রইলো জাহাজ ; জ্বালানির ব্যবস্থা হয় এখান থেকে — তাইতেই এত সময় নেয়; কিন-ফো কিন্তু তীরে নামলো না। কেন নামবে সে তীরে ? এখানে তার দেখবার কিছু নেই ; তার একমাত্র উদ্দেশ্য এখন হ'লো বিশাল চিন-দেশের মাঝখানে একেবারে হারিয়ে-যাওয়া, যেখানে সে যদি দৈবাৎ ওয়াং-এর মুখোমুখি না-পড়ে তো ওয়াং-এর পক্ষে তাকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে।

ইউয়েন-লো-ফুর পরে নদীর দুইপাশে মুখোমুখি দুটো শহর আছে। তার একটা ফান-ৎচেং—মস্ত শহর, লোকসংখ্যা প্রচুর ; অন্যটা সিয়াং-ইয়াং-ফু— সদর শহর, কর্তাব্যক্তিরাও

থাকেন বটে, কিন্তু কেমন যেন মরা ব'লে মনে হয় একে। এখানে এসেই নদী উত্তরে মোড় বেঁকেছে লাও-হো-কৌর দিকে—তার পরের অঞ্চল আর নাব্য নয়।

এখান থেকে ভ্রমণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা চেহারা নিলে। নদীর সেই 'মসৃণসুন্দর প্রবহমানতা'র বদলে এবার বন্ধুর ও বনাকীর্ণ পথ দিয়ে যেতে হ'লো তাদের; দিব্যি ভেসে যাচ্ছিলো জাহাজে ক'রে এতকাল, এখন আদিম যানবাহনের জন্য পদে-পদে ধাক্কা ও ঝাঁকুনি লাগলো। সুন বেচারার প্রায় যা-দশা। জাহাজের এই আরামের পর এই রাস্তা তার কাছে সর্বনাশের নামান্তর ব'লে মনে হ'লো। এই পথ দিয়েই ধুঁকতে-ধুঁকতে চলতে হবে তাকে, অবসাদ আর গালাগাল ছাড়া আর-কিছুই জুটবে না বরাতে।

সত্যি-বলতে কিন-ফোর দুর্দান্ত ভ্রমণপথের সঙ্গী হওয়াটা কারু পক্ষেই মোটেই ঈর্ষণীয় নয়। কোথাও থামা চলবে না, এই একটা কথা সে মনে-মনে জেনে নিয়েছে; ব্যস, আর কোনো সুবিধে-অসুবিধে বাধা-বিপত্তির কথা সে ধর্তব্যেই আনে না। শহর থেকে শহরে গেলো সে হুড়মুড় ক'রে, পেরিয়ে এলো প্রদেশের পর প্রদেশ। কখনো তার গাড়ি হ'লো খচ্চরে-টানা চাকা-বসানো ছাত-খোলা এক বাক্স, উপরে একটা ক্যানভাসের ঢাকা নামেই আছে, তাতে রোদবৃষ্টি কিছুই আটকায় না; অন্য সময়ে তার যান হ'লো খচ্চরে-টানা চেয়ার—দুটি বাঁশের উপর ঝোলানো ক্যানভাসের চাদরে তাকে চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকতে হ'লো, আর সমুদ্রে টাইফুন উঠলে জাহাজ যেমন এ-কাৎ ও-কাৎ হয় তেমনিভাবে তাকে নিয়ে যেন লোফালুফি খেললো খচ্চরগুলি। ক্রেগ আর ফ্রাই দুটো হাড়জিরজিরে গাধার পিঠে চ'ড়ে—তার গতি আবার এমন যে খচ্চরে-টানা চেয়ারের চেয়ে কম যন্ত্রণাদায়ক নয়—দু-পাশ দিয়ে গেলো রাজার দেহরক্ষীর মতো। আর সুন পিছনে এলো গোঙাতে-গোঙাতে গজরাতে-গজরাতে পায়ে হেঁটে—যখনই মনে হয় যে এত জোরে হাঁটলে ম'রে যাবে তখনই গলায় ব্রাণ্ডির বোতল উপুড় ক'রে খানিকটা সান্ত্বনা নেয়—আর অবশ্য তার টলটলায়মান অবস্থার জন্য কেবল রাস্তাকেই দোষ দিলে ভুল হবে।

পরে অবশ্য খচ্চর আর গাধা দুইই বাতিল ক'রে দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে কিন-ফো তার অবসন্ন সঙ্গীদের নিয়ে প্রাচীন তাং রাজাদের রাজধানী সিন-গান-ফুতে ঢুকলো। পথে অবশ্য প্রচুর ফাঁকা সবুজের নামগন্ধহীন প্রান্তর পেরুতে হ'লো, সুদূর শেন-শি প্রদেশের এই নগরে প্রবেশ করার আগে তাদের কষ্ট ও ক্লান্তি অবশ্য সহ্যের সীমা ছুঁয়ে ফেললো। তার একটা কারণ ছিলো গরম—একে মে মাস, তায় জায়গাটার অক্ষরেখা দক্ষিণ স্পেনের মতো — গায়ে প্রায় ফোশকা পড়ার দাখিল। মেঘের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে হলুদ ধুলো ওড়ে বড়ো রাস্তায়, সব ঢেকে যায় কুয়াশার মতো, পা থেকে মাথা অব্দি ধুলোয় ভ'রে যায় পথিকদের। লু-ওঠা অঞ্চল এটা; ভূতাত্ত্বিক সংস্থান কেবল উত্তর-চিনের দ্বারাই সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত—লিয়ঁ রুসে বলেছেন, 'এখানে না আছে মাটি, না বা পাথর—বরং বলা ভালো নিরেট আর শক্ত হবার আগে পাথরের দশা যে-রকম হয়, সেই হবু-পাথরেই দেশটা গড়া।' তাছাড়া প্রাণের ভয়ও এখানে তুষ্ট করার মতো নয়; পুলিশও গুণ্ডাবদমাশদের ছুরির ভয়ে থরথর কাঁপে; রাতে এ-সব জায়গায় বড়ো শহরেরও কেউ বাড়ি ছেড়ে এক পা বেরোয় না, কারণ পুলিশ সব ভার যেন গুণ্ডাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। ফলে রাস্তায়-ঘাটে যে নিরাপত্তার নামগন্ধও নেই, এটা বোধহয় উল্লেখ না-করলেও চলে। বার কয়েক ওই ধুলোর ঝড় ফুঁড়ে কয়েকদল

সন্দেহ-জাগানো লোকের আবির্ভাব হয়েছিলো ; কী কু-মৎলব ছিলো কে জানে, কিন্তু ক্রেগ আর ফ্রাই-এর কোমর-বন্ধে রিভলভার দেখে তারা তেমন-কিছু না-ক'রেই স'রে পড়েছে। তবু চারদিক দেখে শুনে ক্রেগ রীতিমতো উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছিলো ; দস্যুই মারুক আর ওয়াংই মারুক—কিন-ফো প্রাণ হারালে সেণ্টেনারিয়ানের হাল সেই একই হবে । কিন-ফোও যে একেবারে ভয় পায়নি, তা নয়, নিজের নিরাপত্তার জন্য তার দুশ্চিন্তার আর শেষ ছিলো না ; জীবন সম্বন্ধে তার সব ধারণা আগাগোড়া বদলে গেছে, ফলে সে যেন জীবনকে আঁকড়ে ধ'রে বেঁচে থাকতে চাচ্ছে এখন । তার দশা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে গিয়েই সে যেন এখন মরো-মরো—যুক্তির বালাই না-রেখে ক্রেগ আর ফ্রাই অন্তত তা-ই ভাবলে ।

সিংনানফুতে ওয়াং-এর সঙ্গে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই । কোনো তাই-পিং এখানে মাথা গোঁজার কথা ভাবতেই পারবে না । বিপ্লবের সময় তারা কখনোই এখানকার প্রকাণ্ড মাঞ্চু কেল্লাটির মস্ত দেয়াল বেয়ে উঠতে পারেনি । যদি অবশ্য এমন হয় যে দার্শনিকপ্রবর অবশেষে পুরাতাত্ত্বিক কৌতূহলে এখানকার রহস্যময় শিলালিপিগুলি দেখতে এসেছে—এখানকার জাদুঘরে শিলালিপির সংখ্যা এত যে লোক জাদুঘরটাকে 'প্রস্তরফলকের অরণ্য' ব'লে ডাকে—এসে থাকলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা ; না-হ'লে অন্তত এই অঞ্চলটি সে সর্বাবস্থাতেই এড়িয়ে যেতে চাইবে ।

মধ্য-এশিয়া, তিব্বত, মোঙ্গোলিয়া আর চিন—এই চারদেশের মধ্যে বাণিজ্য চালায় ব'লে শহরটির নানা দিক দিয়ে গুরুত্ব রয়েছে । ব্যাবসার জমজমাট অবস্থা দেখে অন্য লোক হ'লে হয়তো কিছুদিন এখানে থেকে যেতো, কিন্তু কিন-ফো পৌঁছুনো মাত্রই আবার যাবার জন্য পা বাড়ালো । উত্তর দিকেই এগুতে লাগলো সে, হোয়ে-হো নদীর অধিত্যকা দিয়ে সেই হলুদ নদীর স্রোত ধ'রে এগুলো তারা : শুকনো খটখটে ডাঙার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে নদী । কায়ো-লিন-সিয়েন আর নিং-তং-সিয়েন পেরিয়ে পৌঁছুলো হোয়-চুতে, ১৮৬০ সালে যেখানে মুসলমানরা এক ভীষণ রক্তরাঙা দাঙ্গাহ্যাঙামার সৃষ্টি করেছিলো । রাস্তা তারপরে আরো-ক্লান্তিকর হ'য়ে উঠলো ; কখনো-বা নৌকোয় কখনো-বা হেঁটে শেষকালে তারা হোয়ে-হো আর হোয়াংহো নদীর মোহানায় অবস্থিত তং-কোনানের দুর্গে এসে পৌঁছুলো ।

হোয়াং-হো হ'লো সুবিখ্যাত হলুদ নদী । উত্তর থেকে বেরিয়ে পূর্বাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে এসে সে অবশেষে পীত সমুদ্রে পড়েছে। পীত সমুদ্র অবশ্য তেমনি পীতবর্ণ, যেমন কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণসাগর, বা যেমন আরক্ত লোহিত সাগর । হলুদ যেহেতু রাজবর্ণ ব'লে সম্মানিত, সেইজন্য নাম শুনে মনে হয় এই নদী বোধ করি স্বর্গ থেকেই বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু এর আরেক নাম 'চিনের দুর্দশা' । প্রতি বছর এর জলস্রোত স্ফীত হ'য়ে যে-তাণ্ডব চালিয়ে যায়, তাতেই এই নাম হয়েছে তার ।

তং-কোনান কোনো বাণিজ্যকেন্দ্র নয়, বরং একটি সামরিক শিবির—সাধারণ মাঞ্চু তাতারদের একটা বাহিনী থাকে এখানে—চিনে ফৌজের কোনো নামকরা বাহিনী এটা নয় । সেই জন্য কিন-ফোর সঙ্গীরা এই আশা লালন করেছিলো যে কোনো ভালো হোটেল দেখলে কিন-ফো বুঝি এখানে কয়েকদিন জিরিয়ে নেবে ; তা-ই হয়তো শেষ অব্দি হ'তো, যদি-না সুন বেচারা একটা মস্ত আহাম্মুকি ক'রে বসতো। সব সাবধানতা ভুলে গিয়ে শুল্কদপ্তরে

বেমক্কা কিন-ফোর আসল নাম দিয়ে বসলো বোকারাম—ছদ্মনাম কি-নানের কথা সে একেবারে ভুলে গিয়েছিলো। এই ভুলের ফলে সাধের শূকরপুচ্ছের একটা মস্ত অংশ হারাতে হ'লো তাকে, কিন্তু খবরটা তক্ষুনি একেবারে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো। কিন-ফো এসেছে—একশো বছর যে বাঁচতে চেয়েছে, সেই লোকটা কিনা সশরীরে এই শহরে বর্তমান! তক্ষুনি পথচারীটির চারপাশে মস্ত ভিড় জ'মে গেলো; ফলে অমনি চম্পট দেবার ব্যবস্থা করতে হ'লো তাকে আর তার সঙ্গে যেতে হ'লো ক্রেগ আর ফ্রাইকেও—যেন তার সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ আছে; কুড়ি মাইল দূরে একটা অজ পাড়াগাঁয়ে এসে যখন ক্লান্তিতে ও অবসাদে তারা আধমরা হ'য়ে পড়লো, কেবল তখন থামলো—মনে-মনে ভাবলো এখানে বুঝি আবার অপরিচয়ের অন্ধকারে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারবে।

ওই বেমক্কা ভুলটুকু ক'রে আহাম্মক সুন নিজের উপর যে-দুঃখ ডেকে আনলো, তা নেহাৎ হেলাফেলার নয়। প্রিয় ভৃত্যের এই উজবুক্মুখো কাণ্ডয় প্রভুটি এতই রুষ্ট ও বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন যে তিনি আর দৃক্পাত না-ক'রে তার সাধের বেণীর একটা মস্ত অংশ কেটে দিলেন কচ ক'রে; বেণীর ধ্বংসাবশেষ যতটুকু মাথায় রইলো, তা বেচারাকে সব লোকের উপহাস ও টিটকিরির পাত্র ক'রে তুললো। রাস্তায় বেরুলেই ছেলের পাল তাকে ঘিরে আওয়াজ দেয়। ফলে বেচারা মনে-প্রাণে এই বিষম ভ্রমণের অবসানই কামনা করতে লাগলো শুধু।

কিন্তু অবসান কোথায়? বিডুল্ফকে তো কিন-ফো ব'লেই ছিলো যে-দিকে দু-চোখ যায় নাক বরাবর সোজা সেই দিকেই যেতে থাকবে সে—আর এই জন্যই বুক বেঁধে পথে বেরিয়েছে সে।

যে-ছোট্ট অজ পাড়াগাঁয়ে তারা এসে আস্তানা গেড়েছে, সেখানে না-আছে ঘোড়া বা গাধা, না-আছে খচ্চরে-টানা গাড়ি বা খচ্চুরে চেয়ার। অথচ শিগগিরই আবার বেরিয়ে-পড়া উচিত তাদের। গতিক দেখে মনে হ'লো পদব্রজে হণ্টন ছাড়া আর-কোনো পথ বুঝি খোলা নেই। হণ্টনে অবশ্য কিন-ফোর মোটেই রুচি নেই, কারণ নাক বরাবর যত পথই সে যেতে চাক না কেন, পদব্রজে বেশি দূর যাবার কথা সে কস্মিন কালেও ভাবেনি। এটা অস্বীকার করার জো নেই যে এ-ক্ষেত্রে সে আদৌ কোনো বিচক্ষণ দার্শনিকতার পরিচয় দিলে না। গজগজ করতে শুরু করলো সে, খেঁকিয়ে উঠলো বারে-বারে, মেজাজ তার চ'ড়েই রইলো সপ্তমে। আস্ত জগৎকে দায়ী করলো সে নিজের এই দশার জন্য, সঙ্গীসাথীদের যে কত গালাগাল দিলে, তার তো কোনো হিশেবই নেই।—যদিও এটা তার ভাবা উচিত ছিলো নিজের এই বিপত্তির জন্য নিজেই সে সম্পূর্ণ দায়ী। অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেললো অবিরাম—তখন কোনো চিন্তা বা দুশ্চিন্তা ছিলো না তার—দিব্যি ছিলো। ঘোষণা করলো যে যদি আমার স্বাচ্ছন্দ্যের পূর্ণ মর্যাদা দেবার জন্য দুঃখ-বিপত্তির অভিজ্ঞতা দরকার হয়, তাহ'লে ইহলোকের এই জীবনের উপযোগী দুঃখকষ্ট সে প্রচুর ভোগ ক'রে ফেলেছে এর মধ্যেই। আর, কোন অভিজ্ঞতাই বা হয়নি তার এই ক-দিনে? সে কি দ্যাখেনি কানাকড়ি না-নিয়েও লোকে দিব্য তুষ্ট ও সুখী বেঁচে থাকে? সে কি সেই চাষীদের দ্যাখেনি, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু-মুঠো অন্ন জোগাড় ক'রেও দিব্যি হাসিমুখে বেঁচে থাকে? গান গেয়ে-গেয়ে কাজ করতে দ্যাখেনি কি সে মিস্ত্রিদের? হয়তো শুধু কাজকর্মের মধ্যে দিয়েই লোকে

সত্যিকার সুখ পেতে পারে। অন্তত এই ধারণায় তার সন্দেহ নেই যে, তার মতো পোড়া কপাল আর-কারু নেই।

ক্রেগ আর ফ্রাই কিন্তু এর মধ্যে যানবাহনের জন্য সারা গাঁ তোলপাড় ক'রে ফেলেছে। সহ্যের একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছেছে তারা, মরিয়াদশা যাকে বলে; শেষকালে সারা গাঁ তছনছ ক'রে অবশ্যি একটা শকট জুটলো—কিন্তু তাতে আবার মাত্র একজন লোক বসতে পারে; কিন্তু তাতেও অবস্থার কোনো হেরফের হ'লো না; শকট জুটলে কী হবে, সেটা চালাবার উপায় কী?

গাড়িটা হচ্ছে এক চাকার হাত-গাড়ি—পাড়াগাঁয়ের লোকরা মাল-পত্র আনা-নেয়ার জন্য ব্যবহার করে। প্যাম্পালের এই ঠেলাগাড়ি বোধকরি আদ্যিকালের, নাবিকদের দিগ্দর্শক কি গোলন্দাজদের ভীষণ বারুদ আবিষ্কার হবারও আগের জিনিশ। চাকাটা সামনে বসানো নয়, মাঝখানে— পাটাতনের ঠিক তলায়। পাটাতনটা দু-ভাগে ভাগ করা, একদিকে বসে যাত্রী নিজে, অন্য দিকে তার মালপত্তর। পিছন থেকে ঠেলে-ঠেলে চালিয়ে নিয়ে যায় চালক—যাত্রীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখায় বিঘ্ন ঘটায় না। মাঝে-মাঝে একটা মাস্তুল দাঁড় করিয়ে চৌকো পাল তুলে দিলে অনেক কাজে আসে—হাওয়া অনুকূল থাকলে অধীর যাত্রীকে আশাতীত দ্রুতবেগে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায়।

ঠেলাগাড়িটা ভাড়া দেবে কোন বোকচন্দ্র? দরকার হ'লে ওই পালমাস্তুল সবসমেত কিনে নিতে হবে। কেনাই হ'লো শেষ অব্দি—এবং কিন-ফো গিয়ে গাড়ির উপরে বসলো।

'চল এবার, সুন,' কিন-ফো বললো।

'যাচ্ছি,' ব'লে সুনও গাড়ির উপর উঠে বসবার উপক্রম করলো।

'না, না, ওখানে মালপত্তর থকবে,' কিন-ফো চেঁচিয়ে বাধা দিলে।

'আর আমি?' সুন যেন পথেই ব'সে পড়ে।

'গাড়ির পিছনে বামে গিয়ে দাঁড়া,' কিন-ফো অধীর হ'য়ে নির্দেশ দিলো।

'ক-কোথায়? ক্-কেন...' সুন তোৎলাতে থাকলো, কিন-ফোর কথা তার মাথায় ঢুকছে ব'লে মনে হ'লো না; রেসের পরে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার হাঁটুর জোড় যেমন খুলে যেতে চায়, তারও দশা তখন সেই রকম।

'শুনলি?' কাঁচির মতো আঙুল দিয়ে ঘ্যাচাং করার ইঙ্গিত করলো কিন-ফো, যার মর্মার্থ সুন মর্মে-মর্মেই অনুভব করতে পারলো।

আর-কোনো কথা না-ব'লে সুন পিছনে গিয়ে হাতল ধ'রে দাঁড়ালো। হাওয়া অনুকূল ছিলো তখন, পাল তোলা হয়েছিলো আগেই; ক্রেগ আর ফ্রাই দু-পাশে নিজেদের স্থান নিলে। জোর কদমে যাত্রা শুরু হ'লো। প্রথমে কোচবাক্সের ঘোড়ার স্থান নিতে হ'লো ব'লে সুন রেগে টং হ'য়ে গিয়েছিলো, গজরাতে-গজরাতে ঠেলছিলো গাড়িটাকে; শেষকালে যখন ক্রেগ আর ফ্রাইও মাঝে-মাঝে সাহায্য করতে এলো ধাক্কা দিয়ে, তখন তার জ্বলুনি খানিকটা হ্রাস পেলো। আসলে তখন অন্তত খুব-একটা বেশি পরিশ্রম হচ্ছিলো না তাদের। দক্ষিণের হালকা হাওয়ায় আপনা থেকেই যাচ্ছিলো গাড়িটা—তাদের কাজ অনেকটা ছিলো শাম্পানের সারেং-এর মতো হাল ধ'রে ব'সে-থাকা।

যখন হাত-পায়ের আড়মোড়া ভাঙার দরকার হয়, তখন গাড়ি থেকে নেমে পড়ে

কিন-ফো ; আর যখন হাঁটতে কষ্ট হয়, তখন পাটাতনে উঠে বসে : আর এইভাবেই আরো উত্তর দিকে এগিয়ে গেলো তারা। হোনান-ফু আর কাফং এড়িয়ে, রাজাখালের পথ ধ'রে এগুলো সে ; কুড়ি বছর আগে দুম ক'রে যখন সব ছারখার ক'রে হোয়াং-হো তার পুরোনো খাতে বইতে শুরু করে, তখন থেকে রাজাখাল রাজধানী থেকে চা-বাগান অঞ্চল অবধি মস্ত এক রাজপথে পরিণত হ'য়ে যায়। ৎসিনান আর হো-কিয়েনের মধ্যে দিয়ে অবশেষে পে-চিলি প্রদেশে পৌঁছোলো তারা, তারপর পেইচিঙের উদ্দেশে রওনা হ'লো।

রাস্তায় তিয়েন-সিন ব'লে মস্ত একটা শহর পড়লো—জনসংখ্যা তার চার লক্ষ, শহরের চারপাশে মস্ত প্রাচীর আর দুটো কেল্লা রয়েছে শত্রু প্রতিরোধ করার জন্য। পাই-হো আর রাজাখালের মোহানায় এই শহরের প্রধান বন্দর অবস্থিত—জাহাজ ভিড়তে পারে এই বন্দরে—বছরে কয়েক কোটি টাকার আমদানি-রপ্তানি চলে এখানে ; কুল, জলপদ্ম, তাতারি তামাক এ-রকম নানা ধরনের প্রাচ্যদেশীয় জিনিশ চালান যায় এখান থেকে ; আমদানি হয় আরো-সব বিচিত্র জিনিশ—চন্দন কাঠ, নানা ধাতুখণ্ড, পশম—আর ল্যাঙ্কাশিয়র থেকে আসে কলে-বোনা বসন।

জায়গাটা নানা দিক থেকে কৌতূহলোদ্দীপক—কিন-ফো অবশ্য তাই ব'লে এখানে থেমে-পড়ার কথাই ভাবলে না। যেমন সে নরককুণ্ডের প্যাগোডাটি দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট করলো না, তেমনি 'লণ্ঠনসরণি'তে গিয়ে বিখ্যাত ঝাড়লণ্ঠনগুলি দেখে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করলে না। মুসলমান মালিক লিওন লাও-কির বিখ্যাত রেস্তোরাঁ 'সমতান ও মৈত্রীগৃহে' গিয়ে আহার করা দূরে থাক, ওখানকার বিখ্যাত সুরা পর্যন্ত চেখে দেখলো না ; এমনকী রাজ্যপাল লি-ৎচোং-তাংএর প্রাসাদে গিয়ে নিজের নামাঙ্কিত লাল কার্ড পাঠাবার কথা পর্যন্ত সে বিবেচনা করলো না একবারও—১৮৭০ সাল থেকে ইনি এখানকার লাটসাহেব, অমাত্যসভার অন্যতম সদস্য ; পীত বসন পরেন ইনি, খেতাব পেয়েছেন ফ্রাই-ৎজে-চাও-পাও। এ-সবের কিছুতেই কোনো আকর্ষণ বা কৌতূহল ছিলো না কিন-ফোর—চলা ছাড়া ছাড়া আর-কিছুই যেন সে এখন জানে না। লবণভরা বস্তা প'ড়ে আছে জেটির দু-পাশে, তার মধ্যে দিয়ে কোনোদিকে দৃক্‌পাত না-ক'রেই এগিয়ে গেলো ; পেরিয়ে গেলো মার্কিন ও ইংরেজ বসতি, বিখ্যাত ঘোড়দৌড়ের মাঠ, শহরতলির সুন্দর ভূদৃশ্য ; আঙুর খেত আর ফলবাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে গ্রামের রাস্তায় এসে পড়লো সে। দু-পাশে মস্ত মাঠ গেছে দিগন্ত অব্দি—যব, তিল, আখের খেত প'ড়ে আছে পর পর মাঠ জুড়ে ; সবুজ বনের কাছে খরগোশ, তিতির আর ঘুঘু পাখি ঘুরে বেড়ায়, আর বাজপাখির শিকার হয় হাজারে-হাজারে।

শান-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তারা এবার : ষাট মাইল ধ'রে এই রাস্তা চলবে ; এক পাশে নানা ধরনের গাছপালা, অন্যপাশে নদীর তীর ঘেঁষে চলেছে জংলি জলা ঝোপঝাড়। সোজা পেইচিং পৌঁছে যেতো তারা এই রাস্তা ধ'রে গেলে—কিন্তু পথে তং-চু'তে একবার থামতে বাধ্য হ'লো তারা—কিন-ফো তার এই হুড়মুড় পলায়নে কাতর ও মোহ্যমান, ক্রেগ আর ফ্রাই ঠিক আগের মতোই সতেজ ও অক্লান্ত ; সুন—ধুলিমলিন ও খঞ্জ এবং মাত্র দু-এক ইঞ্চিতে পর্যবসিত তার বেণীর শোকে আকুল ও আর্ত।

জুন মাসের উনিশ তারিখ আজ। এই রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠার অবসান হ'তে আরো ছ-

দিন বাকি। এ-পর্যন্ত অবশ্য কোথাও ওয়াং-এর বেণীর ডগাটিও দেখা যায়নি। কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে সে —কে জানে।

১৩

দৌড় ! দৌড় ! দৌড় !

কিন-ফো যখন তার ওই ঠেলাগাড়িতে ক'রে পেইচিঙের মাইল দশেক আগে তং-চু শহরে পৌঁছলো, তখন হঠাৎ ঘোষণা ক'রে বসলো যে ওয়াং-এর সঙ্গে ওই বিষম চুক্তির মেয়াদ না-ফুরোনো অব্দি এখানেই সে থেকে যাবে।

'চার লাখ লোক যে-শহরে থাকে, সেখানে বোধহয় আমি বেশ খানিকটা নিরাপদ,' বললো কিন-ফো, 'কিন্তু সুন যেন এটা মনে রাখে যে সে শেন-সী প্রদেশের ব্যাবসাদার কি-নানের কাছে চাকরি করে ; না-হ'লে —'

সুন তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ ক'রে জানালো যে দ্বিতীয়বার এই নির্দেশ ভোলবার পাত্তর সে নয় ; একবার আহাম্মুকি ক'রেই যে-ফল পেয়েছে, তাতে আবার সেই একই-ভুল করার মতো বুকের পাটা তার নেই ; তার আশা এবার তাকে যেন কিন-ফো ('কি-নান,' একযোগে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো ক্রেগ আর ফ্রাই) তার যোগ্য কাজে বাহাল করে—যেন ঘোড়ার মতো তাকে গাড়িতে জুতে না-দেয় ; আরো ঘোষণা করলো যে তার সঙ্গে নাকি এখন কোনো মৃতদেহের পার্থক্য নেই—এতই ক্লান্ত সে ; আশা করে কিন-ফো ('কি-নান,' আবার ক্রেগ আর ফ্রাই একযোগে এমনভাবে তাকে শুধরে দিলো যে মনে হ'লো তাঁদের বাক্‌যন্ত্র বুঝি একটাই) তাকে অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা ঘুমুবার অনুমতি দিয়ে হৃত শক্তি ফিরে পেতে দেবেন।

'যা, ইচ্ছে হ'লে এক হপ্তাই নাক ডাকা গে,' তার প্রভু জানালেন, 'কারণ যত বেশি ঘুমুবি, তত কম আবোলতাবোল বকবি।'

তং-চুতে হোটেলের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু সহজে আত্মগোপন ক'রে থাকা যায়, এমন-একটা হোটেলই বেছে নিতে হবে কিন-ফোকে, তার অভিপ্রায়ের পক্ষে তেমন-কোনো হোটেলেই হবে সবচেয়ে বড়ো সহায়। শহরটা আসলে পেইচিঙেরই মস্ত এক শহরতলি —শান-বাঁধানো যে-রাস্তাটি দিয়ে দুই শহরের যোগাযোগ ঘটেছে, তার দু-পাশ দিয়েই সারি-সারি ভিলা ও গোলাবাড়ি গেছে একটানা, আর শহর দুটি থেকে এত লোক নিত্য যাওয়া-আসা করে যে রাস্তার গাড়ি-ঘোড়া লোকজনের স্রোত সবসময় অফুরানভাবে উপচে পড়ে।

জায়গাটা কিন-ফোর চেনা বলেই তাই-ওয়াং-মিয়ার উদ্দেশেই এগুলো সে। তাই-ওয়াং-মিয়া নামটির অর্থ 'যুবরাজের দেবালয়'; এটি ছিলো ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, সম্প্রতি এটাকে হোটেল বানানো হয়েছে—একজন আগন্তুক যা-যা কাম্য ব'লে মনে করতে পারে, তার সব-কিছুরই ব্যবস্থা আছে এখানে। নিজের জন্য একটা কামরা ভাড়া করলো কিন-ফো ; পাশের ঘরেই ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলো আর সুনের জন্যও যোগ্য ব্যবস্থা করা

হ'লো—তারপরেই সুনের আর-কোনো পাত্তা নেই—মুহূর্ত মধ্যে নিজের ডেরায় গিয়ে সে হাত-পা ছড়িয়ে দিলো।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম ক'রে বেশ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজ সেরে তবে তিনজনে চারপাশে নজর দেবার অবসর পেলো। স্থানীয় একটা খবর-কাগজ জোগাড় ক'রে প্রথমেই এটা দেখা দরকার তাদের কাজে লাগবার মতো কোনো খবর বেরিয়েছে কিনা ; ফলে যথারীতি কিন-ফোকে মাঝে রেখে ক্রেগ আর ফ্রাই সরু ঘিঞ্জি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো ; কেউ যাতে খুব-একটা কাছে ঘেঁষতে না-পারে, সেইজন্য দুজনে চেষ্টার ত্রুটি করলো না। বন্দরের কাছে 'সরকারি বার্তাবহ' কাগজটির আপিশ ; যথাকালে সেখান থেকে একটি চলতি সংখ্যা কিনে নেয়া হ'লো। কিন্তু ওয়াংকে খুঁজে বের করতে পারলে দু-হাজার ডলার ইনাম মিলবে, এই বিজ্ঞাপনটি ছাড়া তাদের আকর্ষণ করার মতো কোনো খবর পাওয়া গেলো না।

'এখনো ওর পাত্তা মেলেনি তাহ'লে ?' বললো কিন-ফো, 'অবাক কাণ্ড ! কোথায় গিয়ে লুকোলো ও ?'

'সত্যিই কী আপনার মনে হয় তিনি চুক্তির শর্ত পালন করবেন ?' বাক্যটাকে দু-ভাগ ক'রে জিগেশ করলো ক্রেগ আর ফ্রাই।

'সন্দেহ করার অবকাশ কই ?' উত্তর দিলো কিন-ফো। 'আমার অবস্থা যে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে, তার তো বিন্দুবিসর্গও ও জানে না। তাই ও কী ক'রে আন্দাজ করবে যে আমার মনোভাবও পালটে গেছে। এই ছ-দিনে বিপদের আশঙ্কা মোটেই কম নেই—বরং আগের চেয়ে আরো-বেশি সংকটজনক—বলা যায়।'

'খুব সাবধানে থাকবেন আপনি,' তারা বললো। 'বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবেন।'

কিন-ফো জিগেশ করলো, 'সেটা কী ?'

এ-বিষয়ে ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের ঐক্যমত দেখা গেলো : ভিন্ন-ভিন্ন তিনটে পথ খোলা আছে তার সামনে ; হোটেলে নিজের কামরার দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে বলা কোনোক্ষেত্রেই পাদমেকং ন গচ্ছামি, কিংবা কোনো ছোটোখাটো দুষ্কর্ম ক'রে জেলে যাওয়া—জেলখানার চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর কোথায় আছে ? কিংবা এই গুজবটা ছড়িয়ে দেয়া যে তার মৃত্যু হয়েছে—তারপর বিপৎকাল উত্তীর্ণ হবার সময় পর্যন্ত আত্মগোপন ক'রে থাকা।

কোনো প্রস্তাবই কিন-ফোর মনে ধরলো না। মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না-ক'রেই সে প্রস্তাব তিনটেকে অগ্রাহ্য ক'রে বসলো—এটা সে ভালো ক'রেই জানে যে ওয়াং যদি একবার স্থির ক'রে থাকে তার প্রতিশ্রুতি সে রাখবেই, তবে হোটেল, জেলখানা কি গোরস্থান কোনো-কিছুই তার কাছে দুর্ভেদ্য বাধা ব'লে ঠেকবে না।

'না,' সে বললো, 'ও-সব হবে না। আমি কয়েদি ব'নে যেতে চাই না।'

ক্রেগ আর ফ্রাইকে ঈষৎ সংশয়াকীর্ণ দেখলো ; প্রতিবাদ করতে যাবে, এমন সময় কিন-ফোই আবার অত্যন্ত নিশ্চিত ভঙ্গিতে বললো, 'আমার যা ইচ্ছে হবে আমি তা-ই করবো। কম্পানির যে দু-লাখ টাকা বাঁচাবার জন্য আপনারা এসেছেন, তা বিপন্নই থাকুক না-হয়।'

'কম্পানির প্রতি তো আমাদের একটা কর্তব্য আছে,' তারা বললো।

'আমিও আমার নিজের প্রতি কর্তব্য পালন করবো—আমার নিজের ধরনেই অবিশ্যি। এটা ভুলে যাবেন না যে এ-বিষয়ে আমার নিজের স্বার্থ আপনাদের চেয়ে বহু গুণ বেশি। যা-ই হোক, আমার পরামর্শ শুনুন—চোখ-কান খোলা রাখুন, যথাসাধ্য চেষ্টা করুন আমাকে বাঁচাবার জন্য, আর দয়া ক'রে নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমি যা-যা করি, তার উপর আস্থা রাখুন।'

এর পরে আর-কীই বা বলার থাকে! সদাজাগ্রত সতর্কতা ছাড়া আর-কীই বা করার থাকে এর পর? যে-কাজের দায়িত্ব তারা নিয়েছে, পরের কয়েকদিনে তা যে চরম সংকটে পৌঁছুবে, এতে তাদের সন্দেহ ছিলো না।

তং-চু চিনদেশের প্রাচীন শহরগুলির অন্যতম ব'লেই তার জন-সংখ্যাও বিপুল হ'য়ে উঠেছে। পাই-হো নদী থেকে কেটে-বের করা একটি খালের পাশে গ'ড়ে উঠেছে এই শহর, আর সেই খালের গায়ে পেইচিং থেকে এসে-পড়া আরেকটি খাল এসে মিশেছে ব'লে তং-চুর বন্দর পরিবহণ ব্যবস্থার একটা মস্ত কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শহরে কোনো নতুন লোক এসে কেবল-যে জেটির স্ফীত চঞ্চল জনসমুদ্র দেখে বিস্মিত হবে তা নয়, বন্দরে ভিড়-ক'রে থাকা অগুন্তি শাম্পান আর পাল-তোলা জাঙ্ক দেখেও কিঞ্চিৎ অভিভূত হবে।

এত ভিড় দেখেই ক্রেগ আর ফ্রাই যেন একটু আশ্বস্ত ও নিরাপদ বোধ করলে। ওয়াং যদি সত্যি তার রক্তরাঙা প্রতিশ্রুতি পালন করবার জন্য আবির্ভূত হয়, তাহ'লে কর্মটি সম্পন্ন করার জন্যে সে একটু নিরিবিলিই পছন্দ করবে—নিহত মানুষটার পাশে ওই স্বীকারোক্তি সংবলিত চিরকুটটা ফেলে রেখে সে গোটা ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার চেহারা দিতে চাইবে—অন্তত ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের ধারণা তা-ই। সেইজন্য এই জনসমুদ্রে, বিপুল ভিড়ে, ভয়ের কিছু নেই-শহরের জনাকীর্ণ রাস্তাঘাটে তাই কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত; সেইজন্যই পথচারীদের দিকে আনমনে তাকিয়ে তারা পথ চলছিলো—গুরুতর কিছু ঘটবে ব'লে তারা আশা করেনি।

কিন্তু হঠাৎ কিন-ফো একেবারে পাথরের মূর্তির মতো থেমে দাঁড়ালো। বারে-বারে উৎকর্ণ হ'য়ে কী যেন শুনবার চেষ্টা করলো সে। না, তার কোনো ভুল হয়নি, কিমাকার ও উদ্ভট অঙ্গভঙ্গি ক'রে একদল বালখিল্য রাস্তায় হুল্লোড় করছে, আর মাঝে-মাঝে তার নামই চীৎকার ক'রে আওড়াচ্ছে তারা। নিজের নাম শুনে সে বিষম চমকে উঠলো, বুকের ভিতরটা ধ্বক ক'রে উঠলো; ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হতভম্ব দাঁড়িয়ে রইলো সে ঠায়, আর তার দেহরক্ষীরা আরো গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। তাকে চিনে ফেলেছে তবে? এত ছদ্মবেশ, এই ছদ্মনাম—সব তবে ব্যর্থ? কিন্তু তা তো মনে হয় না। স্পষ্টই তো বোঝা যাচ্ছে এই ছেলের পালের আকর্ষণের বস্তু সে অন্তত নয়। কিন্তু বারে-বারে তার নামই যে তবে আওড়াচ্ছে: 'কিন-ফো! কিন-ফো!' শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে কিন-ফো এই পেল্লায় হেঁয়ালির মর্মার্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করলে।

রাস্তায় গান গেয়ে-গেয়ে চলেছে এক গায়ক, আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতা, প্রচণ্ড করতালি দিয়ে তাকে উৎসাহ জোগাচ্ছে তারা—এমনকী সে গান ধরার আগেই তাদের হাততালি সেই যে শুরু হ'লো, সহজে আর থামতেই চাইলো না।

ভিড় যত বাড়লো, লোকটা ততই খুশি হ'লো। তারপর যখন ভিড়ের আয়তন তাকে যথেষ্ট পরিমাণে তৃপ্ত করলো, তখন পকেট থেকে সে বার করলো একতাড়া রংচঙে ছোটো-

ছোটো প্রচারপত্র, আর খনখনে গলায় চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'শতজীবীর পাঁচপ্রহর ! শতজীবীর পাঁচপ্রহর !'

ও ! সব হৈ-চৈ এর কারণ তবে তা-ই । কিন-ফোকে টিটকিরি দিয়ে লেখা সেই অতিবিখ্যাত ও জনপ্রিয় গানটা তবে ফিরি ক'রে বেড়াচ্ছে এই গায়ক ? ক্রেগ আর ফ্রাই ব্যাপারটা বুঝে কিন-ফোকে নিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু কিন-ফো নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু ; তাকে নিয়ে লেখা গান, অথচ সেই তা কোনোদিন শোনেনি ! এবার, গানটা শুনবে ব'লেই মনস্থির করেছে ; কেউ যখন এখানে তাকে চেনে না, তখন এখানে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে আর আপত্তি কোথায় ?

নানা রকম প্রাথমিক অঙ্গভঙ্গিসহ গায়কটি আরম্ভ করলো :

'নামিলো গোধূলিলগ্ন শাংহাই-আকাশে
বিবর্ণ তরুণ চাঁদ—লাবণ্যে ঢাকা সে,
উইলো গাছের চারা
দিলো সদ্য মাথা-চাড়া,
কিন-ফো পৌঁছালো এবে বিংশতি বছরে ।

যামিনী দ্বিতীয় দণ্ড : স্বচ্ছ অপরূপা
সোমেশ্বরী ইয়ামেনে ছড়াতেছে রুপা ।
মিত্র পোষ্য স্বাস্থ্য-বান
ধনে গড়াগড়ি যান,
কিন-ফো এখনো যুবা চল্লিশ বছরে !'

গায়কের মুখচোখের অভিব্যক্তি কিন্তু প্রত্যেক স্তবকের সঙ্গে-সঙ্গে বদলে যাচ্ছে ; একটা ক'রে স্তবক শেষ হয়, আর সে যেন আরো বুড়ো হ'য়ে পড়ে । আর তাই দেখে ভিড় আরো সহর্ষে হাততালি দিয়ে ওঠে ।

'শর্বরী তৃতীয় যামে : জ্যোৎস্না সমুজ্জ্বলা,
বর্তুল, পূর্ণ ও স্নিগ্ধ ষোলোচন্দ্রকলা ।
কিন্তু হেমন্তের হাওয়া
এই বুঝি করে ধাওয়া,
কারণ কিন-ফো এবে ষষ্টিবর্ষে পড়ে ।

নিশীথিনী চতুষ্পর্ণা : গগনমণ্ডলে
চন্দ্রমা পশ্চিমদিকে অন্তহীন ঢলে !
থলথলে, জবুথবু
খঞ্জ, ও তোৎলা কভু,—
কিন-ফো অশীতিপর শাংহাই নগরে ।

নক্তের পঞ্চম যাম : কনকনে, ভীষণ
হিমাংশু করুণ-কালো, নিস্তারা গগন ।

কোনো দীর্ঘশ্বাস নয়,
এখন মরলেই হয়,—
কেননা পৌঁছেছে কিন-ফো একশো বছরে

বিষম প্রত্যূষে : রুষ্ট সম্রাট ইয়েন
'বুড়োহাবড়া' ব'লে তাকে তাড়ায়ে দিলেন ।
নরকে প্রবেশ তার
নিষিদ্ধ ব'লে আবার
ত্রিশঙ্কুর মতো ঝোলে কিন-ফো চিরতরে ।'

গান শেষ হ'তেই হাততালির আওয়াজ এমন প্রবল আকার ধারণ করলে যে বুঝি-বা বধির ক'রে ফেলবে । প্রত্যেকেই এমন হুড়মুড় ক'রে এক-এক সাপেক দিয়ে রংচঙে কাগজে-ছাপা গানটা কিনে নিতে শুরু করলো যে মুহূর্তে লোকটার সব গান প্রায় শেষ হ'য়ে এলো ।

গানটা কিনে না-নেবার কোনো যুক্তি দেখলো না কিন-ফো । পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার ক'রে গায়কের হাতে দিতে যাবে, এমন সময় ভিড়ের মধ্যে কার দিকে যেন চোখ পড়তেই সে এত চমকে উঠলো যে তার বিস্ময় অস্ফুট ধ্বনি হ'য়ে বেরিয়ে এলো । ক্রেগ আর ফ্রাই ভাবলে শেষ অবধি বুঝি-বা চরম আঘাতটিই সে পেয়েছে ; আরো আঁটো ক'রে তাকে চেপে ধরলো তারা ।

কিন-ফো চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, 'ওয়াং !'

'ওয়াং !' ক্রেগ হতচকিত । 'কোথায় ?'

'কোথায় ?' ফ্রাই পুনরাবৃত্তি করলো প্রশ্নটার ।

কিন-ফো মোটেই ভুল করেনি । ওয়াং যে শুধু সেখানে ছিলো তা নয়, কিন-ফোকে সে চিনতেও পেরেছিলো । কিন্তু হুড়মুড় করে তার দিকে ধেয়ে এসে বিষম কর্মটি সাধন করার বদলে চট ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়েই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে তীরের মতো ছুটে গিয়েছে সে, প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়েছে । স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কিন-ফোকে হঠাৎ দেখে সেও কম বিস্মিত বা বিচলিত হয়নি ।

কিন-ফো আর এক মুহূর্তও ভাবলে না । তক্ষুনি তার পাছু নিলে সে, আর ক্রেগ আর ফ্রাইও তার সঙ্গ ছাড়লো না ।

বারে-বারে চেঁচিয়ে ডাক দিলো সে দার্শনিককে, কিন্তু কোনো ফল হ'লো না ।

'ওয়াং ! ওয়াং !' চীৎকার ক'রে ডাকলো কিন-ফো, 'এখন আর কোনো গণ্ডগোল নেই—সম্পত্তি ঠিকই আছে ! ওয়াং ! ওয়াং, ফিরে এসো ! আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই !'

ওয়াং যাতে শুনতে পায় সেজন্য ক্রেগ আর ফ্রাই যথেষ্ট চেষ্টা করলো, কিন্তু সে ততক্ষণে এত দূরে চ'লে গিয়েছে যে তাদের হাঁকডাক তার কানে যাচ্ছিলো কিনা সন্দেহ।

জেটির পাশ থেকে বেরিয়ে, খালের পাড় ধ'রে এত জোরে সে ছুটছিলো যে খামকাই তারা তার পিছুন নিলে—মধ্যেকার ব্যবধান এক চুলও কমলো না ।

পাঁচ-ছটি চিনেম্যান আর দুটি চৈনিক পুলিশ প্রথমটায় তাদের পিছনে ধাওয়া করেছিলো, ভেবেছিলো বুঝি কোনো চোরকে তারা তাড়া করেছে ; কিন্তু একটু পরেই তা আর ছ-সাত জনের ব্যাপার থাকলো না—পেল্লায় এক ভিড়ও ছুটতে শুরু করলো পিছনে—ওয়াং-এর নাম তাদের কানে গেছে : যাকে খুঁজে বার করতে পারলে মস্ত ইনাম মিলবে, সেই ওয়াং ! উত্তেজনা মুহূর্তে চরমে পৌঁছুলো ; চেঁচিয়ে হাঁক পেড়ে ডাক ছেড়ে এক বিপুল জনতা ওই ধাবমান ত্রিমূর্তির সঙ্গ নিলে ।

প্রাণপণে দৌড়ুলো তারা ; প্রত্যেকের দৌড়ের পিছনেই নিজস্ব কারণ রয়েছে । কিন-ফো দৌড়ুচ্ছে তার আটলাখ ডলারের সম্পত্তির লোভে— প্রাণের মায়ার কথা না-হয় না-ই বললাম ! ক্রেগ আর ফ্রাই দৌড়ুচ্ছে তাদের উপর দু-লাখ ডলার বাঁচাবার ভার আছে ব'লে ! আর এই উচ্চকিত জনতার প্রত্যেকেই কি ওই দু-হাজার ডলার পুরস্কারের লোভে ছুটছে না ?

'ওয়াং ! ওয়াং !' হাঁকডাক ক্রমশ চ'ড়ে যাচ্ছে সপ্তমে ।

'ওয়াং ! এখন আমি বড়োলোক !' কিন-ফো হাঁপাতে হাঁপাতে চীৎকার করলো ।

'ধরো ওকে, পাকড়ো !' চীৎকার তুললো জনতা ।

কিন্তু হয় কিছুই শুনতে পাচ্ছিলো না ওয়াং, নয়তো কিছুই শুনতে চাচ্ছিলো না । কনুই দুটি পাঁজরায় ঠেকিয়ে সে সামনে ছুটে চলেছে, ঘাড় ফিরিয়ে একবারও তাকাচ্ছে না পর্যন্ত । শহরতলি পেরিয়ে একটা খোলা রাস্তায় এসে দ্বিগুণ জোরে ছুটলো সে, আর ধাওয়া-করা ভিড়কেও তাই সেই অনুপাতে ছুটতে হ'লো ।

প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে এই পেল্লায় দৌড় চললো—কেউ হাল ছাড়ছে না, কেউ থামবার লক্ষণ দেখাচ্ছে না । কিন্তু শেষকালে পলায়মান ওয়াং অবসাদ ও ক্লান্তি অনুভব করতে পারলো ভিতরে-ভিতরে ; বুঝতে পারলো যে তার আর জনতার ভিতর ব্যবধান ক্রমেই ক'মে আসছে । ছুটে তাদের হাত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা বৃথা, তাতে একসময় ক্লান্ত হ'য়ে তাকে দপ করে মাটিতে প'ড়ে যেতে হবে সটান : একটা ফন্দিফিকির ছাড়া এই খ্যাপা জনতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো উপায় নেই ; তাই প্রথম সুযোগটাকেই সবলে আঁকড়ে ধ'রে সে ডাইনে মোচড় মেরে একটা ছোট্ট প্যাগোডার সবুজ গাছপালার মধ্যে মিলিয়ে গেলো ।

'যে-ওকে পাকড়াতে পারবে, তাকে দশ হাজার ডলার তায়েল ইনাম দেবো,' কিন-ফো চ্যাঁচালো ।

'দশ হাজার তায়েল বখশিশ,' ক্রেগ আর ফ্রাই জনতাকে শোনাবার চেষ্টা করলে ।

'ইয়াহু !' ব'লে ভিড়ের সামনে থেকে চীৎকার উঠলো, তারপর তারাও প্যাগোডার দেয়ালের কাছে এসে বাঁক ঘুরলো ।

ওয়াংকে মুহূর্তের জন্যও কোথাও দেখা গেলো না । ধাবমান জনতা একটু থমকে গেলো যেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার আকাশফাটা ধ্বনি উঠলো, 'ওই-যে ওখানে !'

সেচের জন্য কেটে-আনা সরু খালগুলির মধ্য দিয়ে পথ ক'রে চম্পট দেবার চেষ্টা করছে তখন ওয়াং ; আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ গেছে খালগুলির মধ্য দিয়ে—আরেকটা মোড় ঘুরলো ওয়াং, অমনি হা হতোস্মি ! আবার খোলা রাস্তায় এসে পড়লো, যেখানে আপ্রাণ

ছোটা ছাড়া কোনো উপায় নেই তার। তার হাঁটুর জোড় যে ক্রমেই খুলে যেতে চাচ্ছে, এত উত্তেজনাতেও এটা তার জানতে বাকি ছিলো না ; সে বারে-বারে ফিরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলো পশ্চাদ্ধাবকদের সঙ্গে কতটুকু ব্যবধান এখনো বজায় আছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো এই অভূতপূর্ব দৌড়ের পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। শেষটায় তরুণ যুবকরাই যে জিতে যাবে, তাতে সংশয় নেই।

আরেকটু এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে সেই বিখ্যাত পালিকাও সেতু ; শিল্পকর্ম হিশেবে জগৎজোড়া খ্যাতি এই সেতুর—মারবেল পাথরের থাম আর খিলান, আর দু-পাশে দুইসার অতিকায় সিংহমূর্তি। আঠারো বছর আগে পে-চি-লি প্রদেশে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'তো না। অন্য ধরনের আরেকদল পলাতক রাস্তাটা আটকে থাকতো তখন। এখানেই ১৮৬০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ফরাশি বাহিনীর কাছ থেকে ঘা খেয়ে রাজার খুড়ো সান-কো-লি-ৎসিনকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিলো, আর অসীম দুঃসাহস সত্ত্বেও মাঞ্চু তাতাররা ইওরোপীয় গোলন্দাজদের হাতে তখন ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু এখন যদিও সেতুটির উপরকার মূর্তিগুলোতে সেই ভীষণ যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন র'য়ে গেছে, তবু আজকাল কারু পক্ষেই সেতুপথে যাবার বাধা নেই। পা টলছে, বুঝতে পারছিলো ওয়াং ; বুঝতে পারছিলো যে তার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে : চট ক'রে মুখ ঘুরিয়ে পিছন দিকে একবার দেখে নিলো সে। ব্যবধান একটু আগে ছিলো কুড়ি কদম, এখন তা দশ পাও হবে না ; পিঠের উপর তাদের নিশ্বেস অনুভব করতে পারছিলো যেন সে, তারা অবশ্য চেঁচিয়ে তাদের দম ফুরোতে চাচ্ছিলো না আর ; মিনিট খানেকের মধ্যেই তো তারা পাকড়ে ফেলবে তাকে। মৃগয়ার অবসান সন্নিকট, পাছুধাওয়া এখানেই এবারকার মতো শেষ।

উঁহু, মোটেই তা নয়। পরমুহূর্তেই ওয়াং সেতুর থামের উপর লাফিয়ে উঠলো—তারপরই ঝপাং করে পাই-হোর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বিষম হকচকিয়ে গেলেও তক্ষুনি কিন-ফো মনস্থির ক'রে ফেললো। 'এখন ওকে পাকড়ানো যেতে পারে,' ব'লে চেঁচিয়ে উঠে সে নিজেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

'দু-লাখ ডলার জলে গেলো !' সমস্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠলো ক্রেগ আর ফ্রাই--মরীয়া হ'য়ে তারাও তক্ষুনি পাই-হো নদীতে ঝম্প দিয়ে পড়লো।

আর সেই অদ্ভুত উত্তেজনার মধ্যে আরো কয়েকজনও নিজেদের শামলাতে না-পেরে ঝপঝপ ক'রে লাফিয়ে পড়লো।

কিন্তু সব চেষ্টাই বিফলে গেলো। অনেকক্ষণ সন্ধান করলো তারা, কিন্তু খামকাই এত খোঁজাখুঁজি। বেচারা দার্শনিক তাহ'লে জলে ডুবেই মরলো—নিশ্চয়ই স্রোতে ভেসে গেছে সে ! কিন্তু সে-ই বা হঠাৎ এমনভাবে জলে ডুবে মরতে গেলো ? এই রহস্য ভেদ করবে কে ?

ক্লান্ত, ভ্যাবাচ্যাকা, বিমূঢ়, হতাশ, নিরুৎসাহ ও আলুথালু কিন-ফো শেষকালে ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের সঙ্গে হোটেলেই ফিরে এলো ! জামাকাপড় ছেড়ে শুকোতে দিয়ে কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করলো তারা, তারপর সুনকে ডেকে পাঠালো। তারা যখন বললো যে আধ ঘণ্টা-খানেক পরেই পেইচিং যেতে হবে সুনের বিরক্তি আর গজরানি একেবারে অসীমে পৌঁছুলো।

১৪

পেইচিং

চিনের আঠারোটি প্রদেশের মধ্যে যেটি সবচেয়ে উত্তরে, সেই পে-চি-লি ন-টা জেলায় বিভক্ত। সদর জেলা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর একটি 'স্বর্গীয় শহর'— ওরফে পেইচিং নগরী।

যদি কোনো চৈনিক হেঁয়ালির ছিন্ন টুকরোগুলো কোনো ১৩৫০০০ একর জমি-জোড়া নিখুঁত আয়তক্ষেত্রে সাজানো যায়, তাহ'লে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মার্কো পোলো যে অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেই রহস্যময় কামবালু ও চিন সাম্রাজ্যের বর্তমান রাজধানীর কিঞ্চিৎ আন্দাজ পাওয়া যাবে।

আসলে দুটো ভিন্ন শহর নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে পেইচিং—মস্ত একটা দুর্গপ্রাচীর দিয়ে শহরটা দু-ভাগে ভাগ করা; চিনে পল্লিটা একটা আয়তক্ষেত্রাকার সামন্তরিকের মতো; আর তাতার পল্লিটা যেন চৌকো একটা বর্গক্ষেত্র; এই তাতার পল্লিতেও দুটো মহল্লা রয়েছে: একটার নাম হোয়াং-ৎচিং, পীতনগর, অন্যটা ৎসেন-কিন-চিং ওরফে লোহিত বা নিষিদ্ধ পল্লি।

আগে এখানে বিশ লাখের বেশি লোকের বাস ছিলো, কিন্তু চরম দুর্দশায় প'ড়ে অনেকে বাস্তুত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। এখন লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে লাখ দশেক; বাসিন্দারা মূলত তাতার আর চৈনিক; তাছাড়া হাজার দশেক মুসলমান, আর কিছু মোঙ্গোল আর তিব্বতিও আছে। তাতার পল্লিটি একটি দুর্গপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা; ইট-পাথরের এই প্রাচীরটি চওড়ায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট হবে, উচ্চতাতেও তাই। দুশো গজ পরে-পরে রয়েছে পেল্লায় একেকটি পাটাতন, সবসময় সশস্ত্র পাহারা থাকে এখানে; পুরো প্রাচীরটা এক চমৎকার বেড়াবার জায়গা, দৈর্ঘে পনেরো মাইল হবে। এই সুরক্ষিত, নগরীর মধ্যেই সম্রাট ওরফে 'দেবপুত্র' বাস করেন।

তাতার পল্লির হলুদ শহর বা পীত নগরীর আয়তন প্রায় ১৫০০০ একর; আটটা তোরণ দিয়ে ঢোকা যায় হলুদ শহরে, তিনশো ফুট উঁচু, কালো স্ফটিক বা কয়লার তৈরি বিশাল এক পিরামিড এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য; আর আছে এক সুন্দর হ্রদ—'মধ্যসাগর' বলে তাকে লোকে; মারবেল পাথরের একটু সেতু আছে তার উপর; আছে বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য দুটি মহাবিহার ও প্যাগোডা; পাই-থা-সে নামে একটি ধর্মপ্রতিষ্ঠান আছে খালের স্বচ্ছ নির্মলজলে ঘেরা একটা ছোট্ট ব-দ্বীপে; ক্যাথলিক মিশনারিদের জন্য আছে পেং-তং, তাদের বাসস্থান। আছে এক রাজমন্দির, উজ্জ্বল-নীল টালি বসানো সেই ঘণ্টার গম্ভীর নিনাদ অনেক দূর থেকে শোনা যায়; আর আছে বর্তমান রাজবংশের উদ্দেশে সমর্পিত একটি বিপুল মন্দির, প্রেতাত্মার মন্দির, 'পবনদেবের মন্দির', বজ্রদেবতার মন্দির, রেশমের দেবতার মন্দির, দেবরাজের দেবালয়, ড্রাগনদের পঞ্চমণ্ডপ, চিরনির্বাণের মহাবিহার—এইগুলোও দ্রষ্টব্য বস্তুর তালিকায় শীর্ষস্থান নিতে পারে।

আর হলুদ শহরের ঠিক মাঝখানে—তার বুকের কাছে, বলা যায়—রয়েছে নিষিদ্ধনগরী। ১৮০ একর জমি জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই লোহিত নগর, চারপাশে পরিখা-কাটা, সাতটি মারবেল পাথরের সেতু আছে তার উপর। এটা নিশ্চয়ই বলা বাহুল্য যে মাঞ্চুরাই যেহেতু বর্তমান শাসক, সেইজন্য পেইচিঙের এই অংশে মূলত কেবল মাঞ্চুদেরই বাস—পরিখার ওপারে, প্রাচীরের বাইরে, চৈনিকেরা তাদের নিজেদের পল্লিতেই কেবল থাকে।

নিষিদ্ধ নগরীর চারপাশে হলুদ রঙের টালিবসানো লাল ইটের দেয়াল; 'মহাশুদ্ধতার তোরণ' দিয়ে প্রবেশ করা যায় এই পল্লিতে, আর তোরণদ্বার কেবল খোলে যখন সম্রাট কিংবা সম্রাজ্ঞী যাতায়াত করেন। ভিতরে আছে তাতার রাজবংশের পূর্বপুরুষদের দেবালয়: রংচঙে টালি-বসানো ডবল ছাত তার; চি আর ৎসি নামে উর্ধ্ব ও অধঃলোকের দুই অধীশ্বরের নামে দুটি মন্দির আছে এখানে; আর আছে খাশমহল: রাষ্ট্রীয় উৎসব ও ভোজসভা উপলক্ষে যেখানে অভিজাতগণ জমায়েৎ হন; তারপরেই মাঝমহল, এই দেবপ্রিয় দেবপুত্রগণের বংশলিপি সেখানে দেখা যায়; তারপরেই আম দরবার, যার বড়ো হলঘরটায় সম্রাট বসেন অমাত্যদের নিয়ে; নাই-কোর পটমণ্ডপে প্রাক্তন সম্রাটের খুল্লতাত যুবরাজ কং-এর সভাপতিত্বে সাম্রাজ্যের সচিবসভা বসে—যুবরাজ কং নিজে পররাষ্ট্র সচিব; তারপরে রয়েছে কলালক্ষ্মীর চন্দ্রাতপ, যার ছায়ায় সম্রাট বছরে একবার ক'রে ধর্মগ্রন্থ পঠনপাঠনে নিয়োজিত থাকেন; তারপরেই হ'লো ৎচুয়ান-সিন-তিয়েনের নাটমণ্ডপ, যেখানে কনফুসিয়সের উদ্দেশে বলিদান হয়: অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে রাজার গ্রন্থাগার, প্রত্নতত্ত্বশালা, ভূ-ইগেন-তিয়েন বা মুদ্রণশালা, বসন-শিল্পালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তারপরে কেউ ইচ্ছে করলে দ্যুলোকশুদ্ধতার প্রাসাদ দেখতে যেতে পারে: রাজপরিবারের যাবতীয় জটিলতা এখানে আলোচনা ক'রে মোচন করা হয়; ঐহিক ভবনে থাকেন তরুণী সম্রাজ্ঞী; সম্রাটের অসুখ হ'লে আশ্রয় নেন ধ্যানসদনে; রাজবংশের শিশুদের জন্য রয়েছে তিনটি অট্টালিকা; ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে হিয়েন-ফং যখন মারা যান, তখন তাঁর বিধবা ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য 'চতুরঙ্গভবনটি' দিয়ে দেয়া হয়। ৎচু-সিকু-কং হ'লো রানীমহল; সখিভবনে রানীর সখিরা রাজঅতিথিদের অভ্যর্থনা করেন; নির্বাণভবন নামটি আশ্চর্য, কারণ এখানে অভিজাত রাজপুরুষদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেখে। পরবর্তী দ্রষ্টব্য: অনশনভবন—যেখানে অনশন ক'রে চিত্তশুদ্ধি ক'রে নেয়া হয়; ক্লান্তিহরভবন—যেখানে রাজকুমাররা থাকেন। গতায়ু পূর্বসূরিদের উদ্দেশে নিবেদিত মন্দিরটির ভাস্কর্য উল্লেখযোগ্য। নগরদেবতার মন্দির ও তিব্বতি দেবালয়টিও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। তাছাড়া রাজভবন ও আপিশকাছারি আছে বহু; লাও-কংচুতে থাকে নপুংসকেরা—লোহিত নগরে তাদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের কম নয়; সব শুদ্ধু ৪৮টি অট্টালিকা রয়েছে রাজভবনের চৌহদ্দির মধ্যে: তার মধ্যে অবশ্য হলুদ শহরের হ্রদের পাশে অবস্থিত ৎজেন-কুয়াং-কো বা বেগুনি আলোর মণ্ডপের কথা ধরা হয়নি; এই মণ্ডপেই ১৮৭৩ সালের ১৯শে জুন ইংরেজ, রুশ, আলেমান, ওলন্দাজ ও মার্কিন রাজদূতেরা রাজসন্নিধানে যাবার অধিকার পেয়েছিলেন। এই তালিকা থেকে ওয়ান-চেয়ু-চানকেও বাদ দেয়া উচিত হবে না—এই গ্রীষ্মবাসটি পেইচিঙের মাইল পাঁচেক দূরে অবস্থিত। ১৮৬৩ সালে এই গ্রীষ্মাবাসটি ধ্বংস হ'য়ে যায়। সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে এখন আর 'অচঞ্চল শিখার বিতান', 'পান্নার ফোয়ারা,' আর 'দশ সহস্র প্রাণের চূড়া' ভালো ক'রে চোখেই পড়ে না।

আর-কোনো প্রাচীন শহরেই এমন অদ্ভুত ও বিচিত্র হর্ম্যরাজি দেখা যায় না ; ইওরোপের কোনো রাজধানী এমন আশ্চর্য ভাষায় তার প্রাসাদগুলির নামকরণ করেনি।

হলুদ শহরের চারপাশে যে-তাতার পল্লি রয়েছে, সেখানে রয়েছে ইংরেজ, ফরাশি ও রুশ দূতাবাস, লনডন মিশনের হাসপাতাল, একাধিক ক্যাথলিক মিশনভবন, আর একটি হস্তিশালা — যার বাসিন্দা এখন কেবল একটি থুরথুরে বুড়ো কানা হাতি। মস্ত একটা ঘড়িঘর সেখানে মাথা তুলেছে শূন্যে—তার লাল ছাতে সবুজ টালি বসানো। কনফুসিয়সের মন্দির, হাজার লামার বিদ্যাভবন, ফা-কুয়ার দেবালয়, মস্ত চৌকো স্তম্ভওলা জ্যোতির্মন্দির, জেসুয়িট ও অধ্যাপকদের ইয়ামেন, পরীক্ষাগ্রহণকেন্দ্র—তাতার পল্লির প্রধান দ্রষ্টব্য এগুলোই। পুবে-পশ্চিমে আছে বিজয়তোরণ। উত্তরসাগর শৈবালসাগর নামে দুটি ছোটো খালে নীল পদ্ম ফুটে থাকে রাশি-রাশি—গ্রীষ্মবাস থেকে বেরিয়ে এসে এই খাল দুটি বড়ো খালটায় গিয়ে পড়েছে। অর্থ, উৎসব, সমর, পূর্ত ও পররাষ্ট্র সচিবদের প্রাসাদগুলো এখানেই অবস্থিত। মহাফেজখানা, জ্যোতির্দপ্তর ও চিকিৎসাবিভাগের প্রধান কার্যালয়ও এই এলাকাতেই অবস্থিত। অদ্ভুত অঞ্চল এটা : দারিদ্রে আর জাঁকজমকে যেন মাখামাখি হ'য়ে আছে এখানে। একদিকে আছে সরু কানাগলি, আলো পৌঁছোয় না, হাওয়া ঢোকে না, ঘিঞ্জি জীর্ণ হতশ্রী বাড়ি সারে-সারে, আর তারই মাঝে-মাঝে গাছপালার আড়ালে ছায়ার ঘোমটা মুখে টেনে আকাশ পর্যন্ত উঠে গেছে মস্ত প্রাসাদ—কোনো সচিব বা অভিজাত পুরুষ হয়তো সেখানে থাকেন। গ্রীষ্মকালে রাস্তাঘাটগুলো ধুলোবালিতে অসহ্য হ'য়ে ওঠে, আর শীতকালে তারা শুকিয়ে-যাওয়া ছোট্ট ঝরনার চেয়ে বেশি ভালো নয়। যত রাজ্যের বেওয়ারিশ কুকুর, কয়লার বোঝা পিঠে মোঙ্গোলীয় উট, আট বেহারার টানা পাল্কি, খচ্চরে-টানা গাড়ি-ঘোড়ায় রাস্তাঘাটে সবসময়েই প্রচণ্ড ভিড় আর হৈ-হল্লা লেগেই আছে। মঁসিয় শুংজের হিশেব মতো অন্তত ৭০,০০০ ভিখিরি থাকে এখানে, আর মঁসিয় আরেঁ বলেছেন যে জীর্ণ খানাখন্দ-ওলা জলভরা খাদগুলি এতই গভীর হয় যে কোনো অন্ধ লোক যে-কোনো মুহূর্তে জলে ডুবে ম'রে যেতে পারে।

চৈনিক পল্লি ওরফে হ্বাই-চেং নানা দিক দিয়ে পেইচিঙের তাতার পল্লিরই আরেক সংস্করণ। দক্ষিণ মহল্লায় দ্যুলোকের আর কৃষির দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত দুটি মন্দির আছে, আর আছে দেবী কোআনাইনের দেবালয়, জগৎপ্রতিভার পূণ্যগৃহ, কালো ড্রাগনের মন্দির, ও ভূলোক-দ্যুলোকের আত্মার উদ্দেশে নিবেদিত পটমণ্ডপ। অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে সোনালি মাছের দিঘি, ফাই-ওয়ান-সের মঠ, বাজার ও নাট্যশালা উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে বড়ো রাস্তাটা যেন পল্লির ধমনী—উত্তর থেকে দক্ষিণে সমস্ত শহর জুড়ে এই গ্র্যাণ্ড অ্যাভিনিউ চ'লে গেছে ভিয়েন তোরণ থেকে হুং তিং ফটক পর্যন্ত। আর একেই সমকোণে ছেদ ক'রে গেছে আরেকটি আরো-লম্বা রাস্তা—পূর্বপ্রান্তের চা-তোরণ থেকে পশ্চিমের কোয়ান-ৎসু ফটক পর্যন্ত। এই রাস্তার নাম চা-কোআ অ্যাভিনিউ—গ্র্যাণ্ড অ্যাভিনিউকে যেখানে এই চা-কোআ অ্যাভিনিউ ছেদ করেছে, সেইখানেই থাকে সুন্দরী লা-ও, কিন-ফো যাকে বিয়ে করবে ব'লে ঠিক ক'রে আছে।

এটা নিশ্চয়ই মনে আছে যে দুঃসংবাদ বহন ক'রে প্রথম চিঠি আসার পর এই তরুণী বিধবাটি কিন-ফোর অবস্থা পরিবর্তনের খবর পেয়েছিলো আরেকটি চিঠিতে, যাতে

জেনেছিলো সপ্তম চাঁদ ডুবে যাবার আগেই তার প্রিয়তম তার কাছে ফিরে আসবে । সেই মাসের ১৭ তারিখের পর থেকে কিন-ফোর আরেকটা কথাও শোনেনি সে । শাংহাইতে বেশ কয়েক বার চিঠি লিখেছে লা-ও, কিন্তু কিন-ফো শূন্যে ঝাঁপ খেয়ে তার ওই খ্যাপা অভিযানে বেরিয়েছে ব'লে তার চিঠিগুলো সব নিরুত্তরই থেকে গেছে । ১৯শে জুন এসে গেলো, অথচ কিন-ফোর কোনো পাত্তা নেই—লা-ওর অস্বস্তি যে কী-পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিলো তার বর্ণনা দেয়ার চেয়ে বরং কল্পনা করা সহজ । এই দীর্ঘ ক্লান্তিকর জীর্ণ-করা দিনগুলোয় একবারও লা-ও বাড়ি ছেড়ে পা বাড়ালো না—তার উৎকণ্ঠা ক্রমেই বেড়ে চললো, আর তার বুড়ি-মা নানও তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুর্বহ হ'য়ে উঠতে লাগলো—সে মোটেই এই নির্জন যন্ত্রণার উৎফুল্ল সঙ্গী নয় ।

যদিও লাওৎসের ধর্মই চিনের সবচেয়ে পুরোনো ধর্মমত (জিশুর জন্মেরও পাঁচশো বছর আগে তার সূচনা হয়েছিলো) আর কনফুসিয়ুসীয় ধর্ম যদিও তারই সমসাময়িক আর স্বয়ং সম্রাট, অভিজাতজন ও প্রধান মান্দারিনদের আরাধ্য, তবু বৌদ্ধ মতবাদ বা ফো-র ধর্মই অধিকাংশ লোককে আকৃষ্ট করেছিলো । পৃথিবীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাই সর্বাধিক—অন্তত ৩০০,০০০,০০০ লোক বোধিসত্ত্বের পুজারী । আর চিনদেশে বৌদ্ধদের দুটো মত আছে—মঠে বা বিহারে যারা থাকে, তারা ধূসর আলখাল্লা আর লাল টুপি মাথায় দেয়—অন্য লামারা আপাদমস্তক পীত বসনে সজ্জিত থাকে । লা-ও এই প্রথম শ্রেণীর বৌদ্ধদের সমর্থক—দেবী কোআনাইনের নামে নিবেদিত যে কোআন-তি-মিআও মন্দির আছে, প্রায়ই সেখানে সে পুজো দিতে যায় । সেখানে পাথরের মেঝেয় সাষ্টাঙ্গে শুয়ে প'ড়ে সে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেবীর পুজো দেয় আর কায়মনোবাক্যে তার প্রেমিকের সুখশান্তি কামনা করে ।

আজ এই ১৯শে জুন তারিখে হঠাৎ তার মন কেন যেন যতরাজ্যের অলুক্ষুনে আশঙ্কায় ভ'রে গেলো । অমনি সে ঠিক করে ফেললো দেবীর কাছে গিয়ে সে কিন-ফোর মঙ্গলের জন্য ধন্না দেবে । নানকে ডেকে সে গ্র্যাণ্ড অ্যাভিনিউর মোড় থেকে একটা পাল্কি ডেকে আনতে বললো । নান কোনো উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলে না, বিরক্তিভরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কর্ত্রীর হুকুম পালন করতে চ'লে গেলো ।

নান চ'লে যেতেই লা-ও করুণ-চোখে একবার তার গ্রামোফোনটির দিকে তাকালো । আহা ! কতদিন এটা কোনো কথা কয় না—চুপচাপ প'ড়ে আছে, বিমর্ষ ! 'আমি যে ওকে কখনো ভুলিনি, অন্তত এটা তো ও জানতে পারবে,' মনে-মনে সে ভাবলে, 'আমার মনের কথা যদি ধ'রে রাখি, ও-তো ফিরে এসে তা শুনে নিতে পারবে ।' কলটা চালিয়ে দিয়ে লা-ও যেন তার হৃদয় ঢেলে দিলে তার মধ্যে । কতক্ষণ যে তার ওই আকুল গুঞ্জন চলতো ঠিক নেই, কিন্তু নান হঠাৎ দুমদাম ক'রে ঘরে ঢুকে তাড়া লাগলো, 'পাল্কি হাজির !' সেই সঙ্গে অবশ্য এ-কথাও বললো যে তার মতে এখন নাকি লা-ওর বাড়ি থাকাই উচিত । কিন্তু বুড়ি দাসীর আপত্তিতে কোনো ফল হ'লো না । লা-ও তাকে একা ব'সে যত খুশি গজগজ করতে দিয়ে পাল্কিতে গিয়ে উঠলো, বেহারাদের বললো তাকে কোআন-তি-মিআও নিয়ে যেতে ।

মন্দিরের রাস্তায় কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই—সোজা গ্র্যাণ্ড অ্যাভিনিউ ধ'রে তিয়েন তোরণ

পর্যন্ত যেতে হয় । কিন্তু যাওয়া বললেই কি যাওয়া হয়, এ-রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি যায় কার সাধ্যি ! একে রাজধানীর সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল এটা—তার উপর এই সময়ই শহরের ব্যস্ততা চরমে পৌঁছোয় । কার সাধ্যি এই হৈ-হুল্লায় কান পাতে ! আর ফিরিওলারা রাস্তার দু-পাশে সারি বেঁধে পশরা সাজিয়ে বসে এ-সময়—দেখে মনে হয় মেলা বসেছে । যতরাজ্যের বক্তা, সরকারি ফতোয়া-ঘোষক, জ্যোতিষী, ছবি-আঁকিয়ে, কৌতুকশিল্পী (মান্দারিনদের অঙ্গভঙ্গি নকল ক'রে তারা টিটকিরি দেয়)—সবাই এই হৈ-হল্লায় নিজেদের গলা যোগ ক'রে দিয়েছে । একসময় আবার জমকালো এক শবযাত্রা রাস্তার গাড়িঘোড়া অচল ক'রে দিলো, আরেক জায়গায় আবার একদল বরযাত্রী গেলো—শবযাত্রার লোকদের মতো ততটা ফুর্তি অবশ্য তাদের দেখা গেলো না—কিন্তু রাস্তার গাড়ি-ঘোড়া থামিয়ে দিতে তারা কসুর করলে না । কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের ইয়ামেনে হয়তো কেউ ঢাকে কাঠি দিয়ে বিচার প্রার্থনা করলে, অমনি রৈ-রৈ ক'রে চারপাশে ভিড় জ'মে গেলো । 'লিও-পিং' পাথরের কাছে এক অপরাধী হামাগুড়ি দিয়ে ঘাড় নিচু ক'রে ব'সে অপেক্ষা করছে কখন জল্লাদের কুঠার নেমে আসে ঘাড়ে—আর চারপাশে লাল ঝাপ্পাওলা মাঞ্চুটুপি মাথায় কড়া পুলিশ পাহারা—কোমরে একই খাপে তলোয়ার আর কৃপাণ রেখেছে তারা । আরেক জায়গায় দেখা গেলো একদল চৈনিক বদমাশের বেণী ধ'রে টানতে-টানতে শাস্তি দেবার জন্য নিয়ে-যাওয়া হচ্ছে । তারপরেই দেখা গেলো এক কাঠের খোপের মধ্যে বন্দী একটা লোকের ডান পা আর বাঁ হাত খোপের দেয়ালের ঘুলঘুলি দিয়ে বের ক'রে রাখা হয়েছে : এক চোরকে বসিয়ে রাখা হয়েছে এক কাঠের বাক্সে, তার মাথাটাই কেবল বাক্সের বাইরে বেরিয়ে আছে : তারপরেই দেখা গেলো আরেকদল গুণ্ডাবদমাশকে জোয়ালে যেমন ক'রে ষাঁড় জোতে তেমনি ক'রে একসঙ্গে জুতে রাখা হয়েছে । আর তাছাড়া রাস্তার যেখানেই বেশি ভিড়, সেইখানেই অন্ধ, কানা, খঞ্জ, আতুর, বোবা, কালারা ভিক্ষে চাচ্ছে—কেউ তাদের মধ্যে আতুর সেজেছে, কেউ-বা আবার সত্যি বিকলাঙ্গ—কুসুমনগরীর চারপাশে তাদের সংখ্যাই সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি ।

মন্থরভাবে এগুচ্ছে লা-ওর পাল্কি, কারণ যতই তারা বহির্দেয়ালের দিকে এগুচ্ছে ততই গাড়ি-ঘোড়া লোকজনের ভিড় বেড়ে যাচ্ছে । অবশেষে দেবী কোআনাইলন-এর মন্দিরের দ্বারে এসে বেহারারা পাল্কি নামালো । পাল্কি থেকে নেমে মন্দিরে গিয়ে ঢুকলো লা-ও । প্রথমে নতজানু হ'য়ে প্রণাম ক'রে পরে সে একেবারে দেবীপ্রতিমার পায়ে শুয়ে পড়লো। তারপর উঠে 'প্রার্থনা-চক্রে'র দিকে এগিয়ে গেলো সে । প্রার্থনা-চক্রটি অনেকটা চরকিকলের মতো, আটটা তার ডাল, প্রত্যেক ডালেই কোনো-না-কোনো পুণ্যলিপি খোদাইকরা । এক শ্রমণ ছিলেন তত্ত্বাবধানের জন্য—ভক্তদের পুজোআচ্চায় সাহায্য করেন, আর নৈবেদ্য গ্রহণ করেন তিনি । লা-ও তাঁর হাতে কয়েকটি তায়েল তুলে দিলো, তারপর বাঁ-হাতে বুক ছুঁয়ে ডানহাতে প্রার্থনা-চক্রের হাতল ধ'রে ঘোরাতে লাগলো । প্রার্থনা যাতে সফল হয় সেজন্য বোধকরি বেশি খাটেনি সে, না-হ'লে শ্রমণটি কেন তাকে উৎসাহ দিয়ে আরো জোরে-জোরে চাকাটা ঘোরাতে বলবেন ?

প্রায় পনেরো মিনিট অতি জোরে চক্রটা ঘোরাবার পর শ্রমণ তাকে জানালেন যে দেবী তুষ্ট হ'য়েই তার নিবেদন গ্রহণ করেছেন । আবার দেবীপ্রতিমাকে দণ্ডবৎ ক'রে মন্দির থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরবে ব'লে পাল্কিতে এসে বসলো লা-ও ।

কিন্তু মন্দিরচত্বর থেকে বেরিয়ে গ্র্যাণ্ড অ্যাভিনিউতে পড়তেই তার পাল্কিবেহারাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হ'লো। নির্দয়ভাবে রাস্তা থেকে ভিড় হঠিয়ে দিচ্ছে সৈন্যরা, দোকানপাট সব বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে হুকুম দিয়ে, আর তিপাওদের তত্ত্বাবধানে নীলঝালর ঝুলিয়ে সব চোরাগলিতে ঢোকবার পথ বন্ধ ক'রে দেয়া হচ্ছে।

এর মধ্যেই শোভাযাত্রাটি ঢুকে পড়েছে রাস্তায়। সম্রাট কোয়াংসিন ওরফে 'মহিমার নির্ঝর, তাতার পল্লিতে ফিরে চলেছেন এখন—তাঁর উদ্দেশে মাঝখানের বড়ো তোরণটা এখন খুলে দেয়া হবে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে রয়েছে দুটি অশ্বারোহী পুলিশ, তারপরে রয়েছে পদাতিক বাহিনী ও বল্লমধারীদের সারি ; অভিজাত রাজপুরুষরা এলেন তারপর, ড্র্যাগন-আঁকা বিশাল এক হলদে ছাতা বহন ক'রে—চিনদেশে ড্র্যাগন সম্রাটের প্রতীকচিহ্ন আর ফিনিক্স পাখি সম্রাজ্ঞীর। তার পরেই শাদা গোলাপ-আঁকা লাল আলখাল্লা পরা আর রেশমি কামিজ আঁটা ষোলোজন বেহারা বহন ক'রে নিয়ে এলো মস্ত এক চতুর্দোলা, আর এই চতুর্দোলার পাশে-পাশে ঘোড়ায় চ'ড়ে এলেন রাজপুত্র আর অন্যান্য অভিজাতগণ ; ঘোড়ার পিঠে জিনের উপর থেকে ঝুলছে হলদে রেশমের ঝালর—তাঁদের অভিজাত্যের প্রতীক। চতুর্দোলার হলদে রঙের রেশমি-পর্দা একটু উঁচু-করা : দেখা যায় স্বয়ং 'দেবপুত্র' হেলান দিয়ে ব'সে আছেন তাতে—প্রাক্তন সম্রাট তং-ৎচির তিনি জ্ঞাতি ভ্রাতা, আর যুবরাজ কং-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। অতিরিক্ত একদল পরিচারক ও বেহারা এলো সবার পিছনে—দেখতে না-দেখতে গোটা শোভাযাত্রা ব্যাবসাদার, ভিখিরি, ফিরিওলা সবাইকে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত ক'রে তিয়েন তোরণ পেরিয়ে চ'লে গেলো। দুম ক'রে হঠাৎ যেমন সব কাজে বাধা পড়েছিলো, তেমনি হঠাৎ আবার একযোগে চ্যাঁচামেচি ও হৈ-হল্লা শুরু হ'য়ে গেলো।

এবার লা-ওর পাল্কি ধীরে-ধীরে এগুতে পেলো। শেষকালে যখন সে বাড়ি পৌঁছুলো তখন দু-ঘণ্টা কেটে গেছে। আর ফিরে এসেই দ্যাখে যে দেবী কোআনাইন তাকে চমকে দেবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন।

পাল্কি থেকে নামতে-না-নামতেই ধূলিধূসর একটি খচ্চরে-টানা গাড়ি হন্তদন্ত হ'য়ে তার বাড়ির সামনে এসে থামলো, আর দরজা খুলে ভিতর থেকে নেমে পড়লো কিন-ফো—আর তার পিছন-পিছন ক্রেগ, ফ্রাই আর সুন।

'কিন-ফো, তু*মি*! সত্যি তুমি? আমি ভুল দেখছি না তো? চোখ খারাপ হয়নি তো আমার?' বিস্মিত লা-ও ব'লে উঠলো।

'বাঃরে, আমিই তো!' কিন-ফো উত্তর দিলে, 'বোন, তুমি কি ভেবেছিলে আমি আর ফিরে আসবো না!'

লা-ও আর একটাও কথা না-ব'লে হাত ধ'রে তাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার গ্রামোফোনের সামনে দাঁড় করালো : তার সব গোপন উৎকণ্ঠা আর দুঃখের মুখর সাক্ষী এই গ্রামোফোন।

'এই শোনো,' লা-ও বললো, 'আমি যে সারাক্ষণ কেবল তোমারই কথা ভেবেছি, তা এখুনি বুঝতে পারবে।' বলতে-বলতে সে গ্রামোফোনটা চালিয়ে দিলে। একটু আগেই ব্যাকুল লা-ও যে-কথাগুলো বলেছিলো স্নিগ্ধ গলায় সেই কথাগুলোই আবার মুখর হ'য়ে উঠলো : 'ফিরে এসো, ভাইটি আমার, ফিরে এসো! রাতের ওই যুগ্মতারার মতো এক হ'য়ে উঠুক

আমাদের হৃদয় । তোমার ফিরে-আসার পথ চেয়ে আছি শুধু ব্যাকুল....'

একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো গ্রামোফোন একটি মুহূর্তের জন্যই কেবল । তারপরে শোনা গেলো ক্যাঁচকেঁচে গনগনে গলায় বিরক্তি : 'যেন কর্ত্রীঠাকরুন একাই যথেষ্ট মন্দ নন—আবার এক কর্তাও এসে হাজির হবেন ! যুবরাজ ইয়েন গলা টিপে মারুক দুটোকেই — তাহ'লেই হয় !'

এর অর্থ খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য নয় । লা-ও পুজো দিতে চ'লে যাবার পর বুড়ি নান এ-ঘরে দাঁড়িয়ে গজগজ করেছিলো—স্বপ্নেও ভাবেনি যে তার কথাগুলো সব হুবহু ওই গ্রামোফোন-রেকর্ডে উঠে যাচ্ছে ।

ওহে দাসদাসীগণ, অবধান করো । গ্রামোফোন সম্বন্ধে সাবধান ! তক্ষুনি বুড়ি নানের চাকরি গেলো—সপ্তম চাঁদ ডুবে-যাবার সময়টুকুও সে পেলে না, সেদিনই তাকে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে হ'লো ।

১৫

কপাল যায় সঙ্গে

কিন-ফোর সঙ্গে লা-ওর বিয়ে হবার সব বাধাই এখন অপসৃত । সত্যি-যে ওয়াংকে যতখানি সময় দেয়া হয়েছিলো তা এখনো সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়নি ; কিন্তু দুর্ভাগা দার্শনিকটি তো শেষ পর্যন্ত অমন অদ্ভুতভাবে পালাতে গিয়ে জলে ডুবেই ম'রে গেলো—এখন আর তার কাছ থেকে অন্তত কোনো আশঙ্কা নেই । একদা কিন-ফো যে-তারিখে নিজের জীবনে ছেদ টেনে দিতে চেয়েছিলো, সেই পঁচিশে জুন তারিখেই বিয়ে হবে ব'লে ঠিক হ'লো ।

প্রথম যে-দিন কিন-ফো চিঠি লিখে লা-ওকে প্রত্যাখ্যান ক'রে জানিয়েছিলো যে তাকে সে তার দারিদ্র ও দুর্দশার অংশিদার করতে চায় না, কিংবা তাকে পুনর্বার বিধবা ক'রে যাবার ইচ্ছে তার নেই, তারপর থেকে কিন-ফোকে যে কতবারই পরিহাসপ্রবণ ভাগ্যের উত্থান-পতন সহ্য করতে হয়েছে সে-সব লা-ও এবার জানতে পেলো ; জানতে পেলো ভাগ্যের সেই আমূল পরিবর্তনের কথা, যার ফলে আবার উন্মুখ কিন-ফো এসে তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে ।

ওয়াং-এর মৃত্যুর বিবরণ শুনে লা-ও তার চোখের জল শামলাতে পারলে না । কত কাল ধ'রে জানে সে এই দার্শনিককে । ওয়াংকে সে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতো চিরকাল ; তাছাড়া লা-ও যখন প্রথম কিন-ফোর প্রেমে পড়েছিলো, তখন ওয়াংই ছিলো তার একমাত্র সহায় ও পরামর্শদাতা—তার কাছেই লা-ও প্রথম হৃদয় উদ্‌ঘাটন করেছিলো । 'আহারে !' ধরা গলায় বললো লা-ও, 'বেচারা ওয়াং ! বিয়ের সময় ওকে না-দেখে বড্ড মন কেমন করবে আমার !'

'সত্যি বেচারা !' কিন-ফোও দুঃখ প্রকাশ করলো, 'কিন্তু এটা মনে রেখো, আমাকে বধ করবে ব'লে শপথ করেছিলো ও ।'

'না, না,' সুন্দর ছোট্ট মাথাটি নেড়ে বললো লা-ও, 'কিছুতেই ও-কাজ সে করতে পারতো না ! এ-কথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না । আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই প্রতিশ্রুতিটা এড়াবার জন্যই সে পাই-হোয় ডুবে মরেছে ।'

তার অনুমানটি যে অসম্ভাব্য নয়, এটা কিন-ফোকে স্বীকার করতেই হ'লো । যৌবনের এই প্রিয় বন্ধুটিকে হারিয়ে তারও মনস্তাপের সীমা ছিলো না । তারা দুজনেই ওয়াংকে খুব শিগগির ভুলে যেতে পারবে ব'লে তো মনে হয় না ।

এটা নিশ্চয়ই বলা বাহুল্য হবে যে পালিকাও সেতুর সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরে খবরকাগজে বিডুল্ফের ওই সাড়া-জাগানো বিজ্ঞাপন বেরুনো বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো—কিন-ফোর নাম যেমন উল্কাবেগে দেশসুদ্ধ কুখ্যাতি কুড়িয়েছিলো, তেমনি উল্কাবেগেই তা আবার বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেলো । ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের চাকরি এখন আর তেমন ভীষণ জরুরি নয় । সত্যি-যে তিরিশ তারিখ অব্দি, বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত, সেন্টেনারিয়ানের স্বার্থের কথা বিবেচনা ক'রে তাদের কিন-ফোর উপর কড়া নজর রাখতে হবে । তবু এটা ঠিক ওয়াং-এর কাছ থেকে কোনো বিপদ আসার এখন আশঙ্কা নেই—কিন-ফো যে এখন আত্মহত্যা করতে চাইবে, এটা ঠিক সম্ভব ব'লে মনে হয় না—বরং এখন সে যথাসম্ভব দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতেই চাইবে । কিন্তু কিন-ফো দুম ক'রে তাদের হঠাৎ বরখাস্ত ক'রে দিতে চাচ্ছিলো না । তারা অবশ্য নিঃস্বার্থভাবে তাকে বাঁচাবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটেনি, কিন্তু তাহ'লেও তারা যথেষ্ট দরদ দেখিয়েছে, শত অসুবিধে সত্ত্বেও কর্মে অবহেলা করেনি ; সেই জন্যেই কিন-ফো তাদের অনুরোধ করলো বিবাহ-উৎসব পর্যন্ত থেকে যেতে । বেশ খুশি হ'য়েই ক্রেগ আর ফ্রাই এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো ।

ফ্রাই ঠাট্টা ক'রে তার তুতোভাইকে বললে, 'বিয়েটাও একধরনের আত্মহত্যাই ।'

'আত্মহত্যা না-হোক, নিজের জীবন অন্যের কাছে সমর্পণ ক'রে দেয়া তো বটে,' ক্রেগ উত্তর দিলো ।

বুড়ি নানের জায়গায় শিগগিরই সভ্যভব্য আরেকজনকে গৃহকর্মের জন্য নিয়োগ করা হ'লো লা-ওর বাড়িতে । তাছাড়া লু-তা-লু এসেছেন বাড়িতে ; লা-ওর মাসি তিনি, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে ; বিয়ের সময় লা-ওকে তিনিই সম্প্রদান করবেন । তিনি আসলে একজন নীল ফিতেওলা দ্বিতীয় শ্রেণীর মান্দারিনের স্ত্রী—(আগে তিনি ছিলেন সম্রাটের উপাধ্যায় আর হানলিন আকাদেমির সদস্য)— মনে হয় লা-ওর মা বেঁচে থাকলে যেভাবে বিবাহের কাজ চালাতেন, ঠিক সেইভাবেই সব কাজ তিনি সমাধা করলেন ।

কিন-ফোর ইচ্ছে ছিলো বিয়ের পরেই পেইচিং ত্যাগ করবে—প্রথমত রাজসভার ধারে-কাছে থাকার অভিরুচি তার ছিলো না, দ্বিতীয়ত তরুণী স্ত্রীকে তার ওই জমকালো ইয়ামেনের কর্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাচ্ছিলো সে । ইতোমধ্যে সে তিয়েন-আন-মেন দুর্গপ্রাচীরের কাছে তিয়েন-ফু-তাং ওরফে স্বর্গ সুখের সরাইখানা নামে একটি মস্ত ও ভালো হোটেলে আস্তানা গেড়েছিলো — চৈনিক ও তাতার পল্লির ঠিক মাঝখানে পড়ে হোটেলটা । ক্রেগ আর ফ্রাইও ওই হোটেলেই উঠেছিলো । সুনও গজগজ করতে-করতে তার কাজে লেগে গিয়েছিলো, কিন্তু আশপাশে কোনো ফোনোগ্রাফ আছে কি না, সেটা সে দেখে নিতে অবশ্য ভোলেনি । বুড়ি-মা নানের দুর্দশা দেখেই সে যথেষ্ট সাবধান হ'য়ে গেছে ।

পেইচিঙে হঠাৎ কোয়াংতুঙের দুই বন্ধুর দেখা পেয়ে কিন-ফো খুব খুশি হ'য়ে উঠলো—ইন-পাং এখানে এসেছে ব্যাবসাসূত্রে, আর সাহিত্যিক হুআল বেড়াতে। তাদেরও আমন্ত্রণ করা হ'লো আসন্ন উৎসবে—রাজধানীর যে-সব অভিজাত রাজপুরুষ ও ব্যাবসাদারদের কিন-ফো চিনতো, তারাও নিমন্ত্রণ-তালিকা থেকে বাদ গেলো না।

অবশেষে ওয়াং-এর সেই চিরনিস্পৃহ অতি উদাসীন শিষ্যটিকে সত্যি সুখী দেখা গেলো; মাত্র দুটি মাস নানা বিপত্তি ও উদ্বেগে কাটিয়েই সে নিজের সৌভাগ্যকে অনুধাবন করতে পেরেছে। ওয়াং-এর দর্শন মোটেই ভুল ছিলো না—তার অনুমানই যে শেষ পর্যন্ত সত্যি হ'লো এটা দেখবার জন্য সে-ই কি না এখন বেঁচে নেই—এটা সত্যি দুঃখের।

সারাক্ষণই কিন-ফো এখন এই তরুণী বিধবাটির সঙ্গে কাটায়। কিন-ফো পাশে থাকলেই লা-ওর সুখের সীমা থাকে না। শহরের সবচেয়ে অভিজাত দোকান থেকে কিন-ফো তার জন্য যে দামি উপহার নিয়ে আসে, কিন্তু সে সবের প্রতি লা-ওর নজর নেই। তার ধ্যানজ্ঞান কেবল কিন-ফোই; বারে-বারে সে মনে-মনে বিখ্যাত পান-হোয়েই পান এর বিচক্ষণ বাণী আওড়ায়: 'মনের মতো স্বামী পেলে তাকে কখনো হারাতে হয় না।' 'যে-মানুষটির নাম বহন করবে, তার প্রতি যেন কনের অসীম শ্রদ্ধা থাকে।' 'ছায়া যেমন থাকে, প্রতিধ্বনি যেমন থাকে, তেমনি যেন পত্নী থাকে পতিগৃহে।' 'স্ত্রীলোকের স্বর্গ স্বামীই।'

এদিকে বিয়ের উদ্যোগ চলেছে পূর্ণোদ্যমে। কিন-ফোর ভীষণ ইচ্ছে বিয়েটা যেন খুব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কোনো মহিলার বিয়ের যৌতুক হিশেবে তিরিশ-জোড়া চটিজুতো লাগে: এর মধ্যেই লা-ওর ঘরে জরির কাজ-করা বহুমূল্য চটি জুতোর মেলা ব'সে গেছে। তাছাড়া মিষ্টি-মেঠাই, শুকনো ফলমূল, চিনেবাদাম-ভাজা, চিনি, সিরাপ, কমলা ছাড়া যত রাজ্যের দামি রেশমি কাপড়, জড়োয়া গয়না, আংটি, বালা, কঙ্কন, অঙ্গুলিত্রাণ, চুলের কাঁটা—অর্থাৎ কোনো তরুণীর সাজগোজে যা-যা লাগে—সব পেইচিঙের দোকানপশার উজাড় ক'রে আনা হ'য়ে গেছে।

আজব মুলুক এটা: বিয়ের সময় মেয়েরা এখানে পিতৃগৃহে থেকে কোনো যৌতুকই পায় না—আক্ষরিকভাবে বর বা বরের আত্মীয়স্বজন যেন তাকে তার পিতামাতার কাছ থেকে কিনে নেয়। ভাই না-থাকলেও পিতার সম্পত্তির কানাকড়িও মেয়েরা পায় না—অবশ্যি পিতা যদি কোনো ইষ্টিপত্র ক'রে যান, তাহ'লে আলাদা কথা। বিয়ের আগেই এ-সব ব্যবস্থা করতে হয়—আর ঘটকালির সময় যারা এই ব্যবস্থা ক'রে দেয় তাদের বলে 'মেই-জিন'। অতঃপর সেই তরুণী কন্যাকে ভাবী স্বামীর পিতামাতার কাছে দেখানো হয়। বিয়ের আগে স্বামীদেবতাটিকে বেচারা দেখতেই পায় না—একটা ঢাকা পাল্কিতে ক'রে তাকে স্বামীগৃহে নিয়ে যাওয়া হয় অতঃপর। পাল্কির দরজা জানলা সব তালাবন্ধ থাকে—স্বামীদেবতাটির হাতে চাবিটি শমঝে দেয়া হয়, এবং তিনি অতঃপর দুয়ার খুলে দেন—ভিতরের কন্যাটি যদি তাঁর পছন্দ হয়, তাহ'লে তিনি হাত বাড়িয়ে দেন কন্যার দিকে—আর তা না-হ'লে সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দেন তিনি মেয়েটির মুখের উপর; আর ঘটকালির সেখানেই ইতি ঘটে—কন্যার পিতামাতা অবশ্য ইচ্ছে করলে সে-ক্ষেত্রেও বায়নার টাকাটা রেখে দিতে পারেন।

কিন-ফোর বেলায় অবশ্যি এ-সব অনুষ্ঠানের কোনো দরকার হ'লো না। লা-ও আর সে—দুজনেই স্বাধীন ও অভিভাবকহীন—সুতরাং বিয়ের আগে আর-কারু পরামর্শ নেবার

কথাই ওঠে না। কিন্তু অন্য কতগুলো রীতি অবশ্য অবহেলা করা চলে না—তা তাদেরও পালন করতে হবে।

বিয়ের তিন দিন আগে থেকেই লা-ওর বাড়ির অন্দরমহলে চব্বিশ ঘণ্টাই আলোয় আলোময় ক'রে রাখা হ'লো। পর-পর তিন রাত্রি কন্যাগৃহের প্রতিনিধি হিশেবে লু-তা-লু নিদ্রা থেকে বঞ্চিত রইলেন—কন্যাকে চিরকালের মতো হারাতে ব'সে তাঁর যে দুঃখের অবধি নেই, সেই বিচ্ছেদ-বেদনা প্রকাশ করার জন্যেই কন্যাকর্ত্রীকে নির্ঘুম কাটাতে হয়। কিন-ফোর বাবা-মা বেঁচে থাকলে তারও বাড়ি শোক প্রকাশের জন্য আলোময় হ'য়ে থাকতো, কারণ হাও-খিএয়ু-চুয়েন অনুযায়ী 'ছেলের বিয়েকে' নাকি 'পিতার মৃত্যুর প্রতীক' ব'লেই গণ্য করা উচিত।

তাছাড়া নানারকম জ্যোতির্গণনাও ক'রে নিতে হয়। ঠিকুজিকুষ্ঠি মিলিয়ে দেখে বর-কনের যোটক বিচার করতে হয়। তিথি, নক্ষত্র, ঋতু, সব মঙ্গলসূচক না-হ'লে চলে না। সব বিচার ক'রে দেখা গেলো এমন রাজযোটক ও শুভ লক্ষণ নাকি কোনোকালে দেখা যায়নি।

অবশেষে সেই প্রত্যাশিত শুভ দিন এলো। উৎসব শুরু হবে ব'লে সব ঠিকঠাক। চিনদেশে অবশ্য শ্রমণ, লামা বা নগরপালের সামনে কোনো সরকারি চুক্তি সম্পাদন করতে হয় না : ঠিক হ'লো যে সন্ধেবেলায় আটটার সময় মহা সমারোহ ও জাঁকজমকের সঙ্গে কনেকে স্বর্গসুখের সরাইখানায় নিয়ে যাওয়া হবে।

সাতটার সময় কিন-ফো অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়ন করার জন্য ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের সঙ্গে তার কোঠার সামনে এসে দাঁড়ালো। লাল কাগজের উপর খুদে-খুদে হরফে লেখা যে-নিমন্ত্রণচিঠি কিন-ফো বিলি করেছিলো, তার বয়ান এই : 'শাংহাইর কিন-ফো যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর *অমুককে* নিবেদন করছেন যে তিনি যেন দয়া ক'রে অধমের অতি দীন বিবাহ-অনুষ্ঠানকে সফল ক'রে তুলতে সাহায্য করেন।'

একে-একে নিমন্ত্রিতরা সকলেই এসে পৌঁছুলেন। বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এসেছেন তাঁরা—যে-রাজকীয় ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে, তাতে তাঁরা অংশ নেবেন; মহিলাদের জন্য আলাদা টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাঁরা সেখানেই বসবেন। অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে-সঙ্গে ইন-পাং আর সাহিত্যিক হুআলও যথাকালে এসে পৌঁছেছে। কয়েকজন মান্দারিন তাঁদের সরকারি টুপির উপর তাদের উচ্চপদের স্মারক হিশেবে পায়রার ডিমের মতো লাল পাথর বসিয়েছেন। অন্য মান্দারিনদের টুপিতে শাদা বা নীল রঙের গোল পাথর বসানো—এঁরা যে তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের, শাদা আর নীল পাথর তা-ই বোঝাচ্ছে। অভ্যাগতদের অধিকাংশই কিন্তু খাঁটি চৈনিক ও রাজকর্মে লিপ্ত। কিন-ফো তাতারদের অপছন্দ করে ব'লে সহজেই এর কারণ বোঝা যায়। অভ্যাগতরা সবাই জমকালো পোশাক প'রে এসেছেন—আর ময়ূরপুচ্ছের মতো বর্ণবহুল জনসমাবেশ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বসে।

অভ্যাগতরা পৌঁছুবামাত্র কিন-ফো তাঁদের সমাদর ক'রে হলঘরে নিয়ে গেলো : দুটো ঘর পেরিয়ে এই ঘরে পৌঁছুতে হয় : জমকালোভাবে সাজানো ঘর দুটির মধ্য দিয়ে যাবার সময় ভৃত্যেরা যখন দরজা খুলে দাঁড়ালো, সে নিজে সবিনয়ে অতিথিদের তার আগে যেতে

অনুরোধ করলে। তার সম্ভাষণে বিনম্রবচনের একেবারে ছড়াছড়ি। 'মহান নাম' ধ'রে তাঁদের সম্বোধন করলে সে, জিগেশ করলে তাঁদের 'মহান স্বাস্থ্যের' কথা, জিগেশ করলে তাঁদের 'মহান পরিবারের' কুশল। কোনো বিশ্বনিন্দুকও বোধকরি তার আচারব্যবহারে কোনো খুঁত বের করতে পারতো না।

সবিস্ময়ে ও যুগ্ম চোখে তার হাবভাব লক্ষ করলো ক্রেগ আর ফ্রাই! আরেকটা কারণেও তারা তার উপর নজর রাখছিলো। একটা কথা সম্প্রতি তাদের দুজনেরই মনে জেগেছে। এমনও তো হ'তে পারে যে ওয়াং জলে ডুবে মরেনি। তার চুক্তির মেয়াদ ফুরোতে আরো কয়েক ঘণ্টা বাকি নেই কি এখনো? হয়তো এখন সে অতিথিদের মধ্যে ছদ্মবেশে ঢুকে তার সেই চরম আঘাত হেনে যাবে। তার সম্ভাবনা অবশ্য নেই—তবে অসম্ভব ব'লে একে একেবারে উড়িয়েও দেয়া যায় না। সেইজন্যই ক্রেগ আর ফ্রাই তীক্ষ্ণ চোখে প্রতিটি অভ্যাগতকে খুঁটিয়ে দেখছিলো। কিন্তু যে-মুখটিকে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, তাকে মোটেই দেখা গেলো না।

এদিকে কনে তখন চা-কোআ অ্যাভিনিউএ তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বন্ধ পাল্কিটায় উঠে বসেছে। প্রাচীন শাস্ত্রে যদিও আছে যে বিয়ের সময় বর মান্দারিনের পোশাক প'রে নিতে পারে, কিন-ফো কিন্তু তবুও তা গায়ে দেয়নি; লা-ও কিন্তু এদিকে অভিজাত মহলের রীতি অনুযায়ী নিখুঁতভাবে সেজেছে। সবচেয়ে মূল্যবান উজ্জ্বল-লাল ঢিলে জামা তৈরি; তার মুখের উপর রয়েছে এক ছোটো-ছোটো মুক্তো বসানো অতি স্বচ্ছ ওড়না, সোনার ঝালর তার কপালে; জড়োয়া গয়না আর পাথর বসানো ফুল পরেছে সে তার দীঘল কালো চুলে আর বেশভূষার মধ্যে আগাগোড়া রুচি ও আভিজাত্যের ছাপ; পাল্কির দরজা খুলে কিন-ফো তাকে দেখে যে অপছন্দ করার কিছু পাবে না, এটা বোধহয় নির্ভয়েই ব'লে ফেলা যায়।

শোভাযাত্রা বেরিয়ে পড়লো। শবযাত্রা হ'লে যে জাঁকজমক আরো বেশি হ'তো তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাও বা কম কি? গ্র্যাণ্ড অ্যাভিনিউ ধ'রে যখন তিয়েন-আন-মেন দুর্গপ্রাচীরের দিকে শোভাযাত্রা চললো, কাতারে-কাতারে লোক দাঁড়িয়ে পড়লো জমকালো মিছিলটি দেখতে। লা-ওর সখিরা গেলো পাল্কির পিছন-পিছন, তাদের হাতে কনের সাজসজ্জার কত-যে উপাদান তার যেন লেখাজোখাই নেই। সবচেয়ে সামনে রয়েছে বাজনদারেরা, তাম্রনির্মিত নানা বাদ্যযন্ত্র তাদের হাতে, আর পাল্কির চারপাশ ঘিরে হাঁটছে দাসদাসীরা, হাতে তাদের মশাল আর রঙিন লণ্ঠন। কনেকে কিন্তু কিছুতেই উঁকিয়ে দেখা যাবে না বাইরে থেকে: পতিদেবতাই প্রথম দর্শনের অধিকারী—অন্তত শাস্ত্রে নির্দেশ তা-ই।

রাস্তায় ভিড় বেশি ব'লে চতুর্দোলাটি যখন স্বর্গসুখের সরাইখানায় পৌঁছুলো, তখন আটটা বাজে। সরাইখানার দরজা জাঁকালোভাবে সাজানো হয়েছিলো, আর কিন-ফো নিজে দাঁড়িয়েছিলো দরজার কাছে। চতুর্দোলার দরজা খুলে দিয়ে কনেকে নামতে সাহায্য করবে সে হাত বাড়িয়ে, তারপর একটি বিশেষ কোঠায় তাকে নিয়ে গিয়ে দ্যুলোকের চার দিক্‌পতিদের প্রণতি জানাবে। তারপর দুজনে যাবে সেই ভোজসভায়, কনে প্রথমে চারবার নতজানু হ'য়ে সর্বসমক্ষে বরকে অভিবাদন করবে, আর বর তার বদলে দু-বার সেইভাবেই

তাকে সম্মান জানাবে। এরপরে তারা দু-তিন ফোটা সুরা ছিটিয়ে দিয়ে পূর্বপুরুষদের তর্পণ ক'রে নেবে, প্রেতলোকের উদ্দেশে তারপর কিঞ্চিৎ খাদ্য নিবেদন করবে, এবং অতঃপর তাদের মিলনের পবিত্রতা সম্পূর্ণ হবে যখন পরস্পরের হাতে একটি ক'রে সুরাপাত্র তুলে দেয়া হবে : প্রথমে তারা আলাদা-আলাদাভাবে অর্ধপাত্র পান ক'রে নেবে, তারপর দুজনেই অবশিষ্ট সুরা একই পেয়ালায় ঢেলে দেবে এবং দুজনেই এবার সেই পেয়ালা থেকে বাকি মদ্যটুকু পান করবে।

কনে এসে পৌঁছেছে দেখে কিন-ফো এগিয়ে গেলো। উৎসবপালিক তার হাতে চাবি তুলে দিলেন, কিন-ফো হাত বাড়িয়ে চতুর্দোলার দরজা খুলে দিলে : আর রূপসী লা-ও আস্তে একটু উত্তেজিত, মধুরভাবেই উত্তেজিত, হালকা পায়ে নেমে এলো, অভ্যাগতরা বুকে হাত তুলে তাকে সম্ভ্রম প্রদর্শন করলেন আর তাদেরই মধ্য দিয়ে লঘু পায়ে সে এগিয়ে এলো। কন্যা যেই সরাইখানার ভিতর পা দিলে, অমনি কে যেন সংকেত করলো আর সঙ্গে-সঙ্গে কত ফানুশ আর ঘুড়ি উড়ে গেলো আকাশে—কত রকম যে সেগুলো দেখতে—কোনোটা ড্রাগনের মতো, কোনোটা যেন কিংবদন্তির ফিনিক্স পাখি, তাছাড়া আরো কত বিয়ের প্রতীক। ল্যাজে ঘুন্টি-বাঁধা পায়রা ওড়ানো হ'লো, আর ঘুন্টির শব্দে চারপাশ ভ'রে গেলো। সেই সঙ্গে তুবড়ি হাউই আর রংমশাল সোনালি বৃষ্টির মতো আকাশ থেকে ঝ'রে পড়তে লাগলো।

আচমকা এমন সময়ে দুর্গপরিখার ওপার থেকে এক তুমুল কোলাহল ভেসে এলো। আর, সব ছাপিয়ে, দূর থেকে ভেসে এলো শিঙার প্রবল শব্দ। কোলাহল যেন থেমে গেলো মুহূর্তের জন্য, তারপরেই আবার যখন শুরু হ'লো, তখন মনে হ'লো কলরোল যেন অনেকটা কাছে এসে পড়েছে। বোঝা গেলো, এই রাস্তা দিয়েই কোলাহলটা এগিয়ে আসছে। কিন-ফো থমকে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে দাঁড়ালো : তার বন্ধুরা অপেক্ষা করতে লাগলো বধূকে স্বাগত জানাবার জন্য। আস্তে-আস্তে কোলাহল কাছে এসে পড়লো, শিঙার শব্দ শোনা গেলো আরো প্রবল ও গম্ভীর।

'কী ব্যাপার, বুঝছি না তো ?' কিন-ফো বিস্ময় প্রকাশ করলে।

পাণ্ডুর হ'য়ে গেলো লা-ও ; কী-এক অলুক্ষুনে আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠলো। আর তক্ষুনি রাস্তায় ছুটে এলো এক উত্তেজিত জনতা। আর এই শোরগোলের কারণ ঘোড়ার পিঠে ক'রে যাওয়া রাজপোশাকপরা এক সরকারি ঘোষক, আর তার সঙ্গে যাচ্ছে একদল তি-পাও। ঘোষক শিঙার আওয়াজ করতেই চারপাশে স্তব্ধতা নেমে এলো, শোনা গেলো তার গম্ভীর স্বর : 'রানীমাতার মৃত্যু হয়েছে ! সব কাজ বন্ধ করো — রাজার নামে নিষেধ জারি করা যাচ্ছে —'

কিন-ফোর মুখ দিয়ে রোষ ও হতাশা-মিশ্রিত আওয়াজ বেরিয়ে এলো। নিষেধ জারি করার অর্থ সে খুব ভালো ক'রেই জানে : ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গেই যতদিন পর্যন্ত রাজসভা শোক পালন করবে, ততদিন মস্তকমুণ্ডন নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ সর্বপ্রকার উৎসব বা অনুষ্ঠান, নাট্যশালা কি আদালত ততদিন বন্ধ থাকবে, সর্বোপরি কোনো বিবাহউৎসব অনুষ্ঠিত হ'তে পারবে না। শুধু তা-ই নয়, রাজসভা যে কতদিন শোক পালন করবে কেউ জানে না —বিশেষ অধিবেশন ক'রে দরবার তার স্থায়িত্ব নির্ধারণ করবে।

অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করলেও লা-ও একেবারে ভেঙে পড়েনি। কিন-ফোর হাত ধ'রে আস্তে একটি চাপ-দিলো সে, তারপর কোনোরকমে ধরা গলায় বললো, 'না-হয় আর ক-টা দিনই অপেক্ষা করবো !'

সুতরাং আবার সেই রূপের ডালিকে নিয়ে চতুর্দোলা ফিরে চললো চা-কোআ অ্যাভিনিউএ ; উৎসব স্থগিত হ'য়ে গেলো ; টেবিল পরিষ্কার ক'রে ফেলা হ'লো ; বিদায় দেয়া হলো গীতবাদ্যের দলকে—আর অতিথিরা বিমর্ষ বরটিকে তাঁদের সমবেদনা জানিয়ে একে-একে বিদায় গ্রহণ করলেন।

শুধু ত্রেগ আর ফ্রাইকে সঙ্গে নিয়ে কিন-ফো তার পরিত্যক্ত ঘরে ব'সে রইলো, আর স্বর্গসুখের সরাইখানা নামটা তাকে যেন নীরবে পরিহাস করতে লাগলো। তার পোড়াকপাল তাহ'লে এখনো তার সঙ্গ ছাড়েনি। রাজার আদেশ অমান্য করার সাহস তার ছিলো না —সম্রাট এখন কতদিন শোক পালন করেন কে জানে। এত দিনে সে বুঝলো ওয়াং কেন তাকে এত তত্ত্বকথা শোনাতো।

ঘন্টাখানেক পরে একটি চিঠি নিয়ে এক ভৃত্য এলো তার ঘরে। এক্ষুনি নাকি কে এক অচেনা লোক এসে চিঠিটা দিয়ে গেছে। চিঠিটা দেখেই কিন-ফো বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো। ওয়াং-এর হাতের লেখা চিনতে তার এক মুহূর্তও লাগেনি।

'প্রিয় বন্ধু,

'এখনো বেঁচে আছি বটে, কিন্তু চিঠিটা যখন তুমি পাবে, তখন আমি আর ইহলোকে নেই। তোমার সঙ্গে যে-চুক্তিটা আমি করেছিলুম কিছুতেই তা সম্পাদন করার ক্ষমতা পেলুম না ব'লে আমাকে মরতে হ'লো। কিন্তু মন খারাপ ক'রে বোসো না যেন ; তোমার ইচ্ছেই যাতে পূর্ণ হয়, আমি তার ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি। লাও-শেন নামে আমার এক বন্ধু তাই-পিং-এর কাছে তোমার অভয়পত্র তুলে দিয়েছি। এ-কাজ করতে গেলে তার হাত অন্তত কাঁপবে না। সে-ই তোমাকে হত্যা করবে। তোমার মৃত্যুর পর আমি যে-টাকা পেতুম, সব আমি তাকেই দিয়ে গেলুম।

'বিদায়, বন্ধু বিদায়। তোমার মৃত্যুর বেশি আগে অবশ্য আমি মরছি না, তবু বিদায়।

'তোমারই চিরবিশ্বস্ত

ওয়াং !'

১৬

পা বাড়ালেই রাস্তা

উভয়সংকট আর কাকে বলে ! কিন-ফোর অবস্থা বরং আগের চেয়েও এখন আরো বিপজ্জনক হ'য়ে উঠেছে। ওয়াং-এর সাহসে যে শেষ অব্দি কুলিয়ে ওঠেনি, তা ঠিক ; তার কাছ থেকে এখন আর কোনো আশঙ্কাই নেই। কিন্তু যে-নামজাদা তাই-পিংটির কাঁধে

সে দায়িত্বটা দিয়ে গেছে, বুকে ছুরি বসাতে তার কি হাত কাঁপবে একবারও ? শুধু তা-ই নয়, তার হাতে আবার এমন একটা দলিল রয়েছে, তাতে সে যে শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যাবে, তা-ই নয়, সঙ্গে-সঙ্গে বিনিময়ে আবার পঞ্চাশ হাজার ডলারও পাবে। এমনিতেই তাই-পিংদের বুকে দয়া-মায়া নেই, তার উপরে আবার এই দলিল !

কী করবে ভেবে না-পেয়ে মাটিতে পা ঠুকলো কিন-ফো, বিড়বিড় ক'রে বললো, 'না, যথেষ্ট হয়েছে আর নয় ! ব্যাপারটার এক ফয়সালা করতেই হবে যে-কোনোভাবে !' কী পরামর্শ দেয় জানবার জন্য ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের হাতে ওয়াং-এর চিঠিটা তুলে দিলে কিন-ফো। তারা প্রথমেই জানতে চাইলো যে ওয়াংকে সে-চিরকুটটা লিখে দিয়েছিলো, তাতে ২৫ তারিখকেই চুক্তির শর্ত পূরণ করার শেষ তারিখ হিশেবে উল্লেখ করা ছিলো কি না।

'না। তারিখের জায়গাটা ফাঁকা রেখে ওয়াংকে চিরকুটটা লিখে দিয়েছিলুম পরে যাতে ইচ্ছেমতো একটা তারিখ সে বসিয়ে দিতে পারে। পাজির পাঝাড়া ওই লাও-শেন তো যখন খুশি তখন ছুরি বসাতে পারে—সময় নিয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা তার নেই।'

'কিন্তু আপনার বিমার মেয়াদ তো,' ক্রেগ আর ফ্রাই বললো, 'তিরিশেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। লাও-শেন নিশ্চয়ই এটুকু বোঝে যে তার এক ঘণ্টা পরেও ছুরি চালালে তার কোনো লাভ হবে না। না, যা করবার তা সে হয় তিরিশের আগেই ক'রে ফেলবে, নয়তো আপনার বেণীর ডগাটিও ছোঁবে না।'

এ-কথার উত্তরে খুব-একটা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য দেখানো যায় না। অস্বস্তি বোধ ক'রে কিন-ফো ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু ক'রে দিলো। 'লাও-শেন লোকটাকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। যেখানেই থাক না কেন, তাকে আমাদের চাইই। ওয়াংকে যে-অভয়পত্র লিখে দিয়েছিলুম, সেটাকে ফেরৎ পেতেই হবে— যা হয় হবে, যত দাম লাগে দেবো, তবু চিরকুটটা ফেরৎ চাই—তার জন্যে যদি পঞ্চাশ হাজার ডলার ওদিতে হয়, তাতেও আমি পেছ পা হবো না।

'অবিশ্যি যদি তাতেও পান, তাহ'লেই,' ক্রেগ সায় দিলে।

'যদি পাই—পেতেই হবে আমাকে—পাবোই !'

কিন্তু কিন-ফো ক্রমশ উত্তেজিত হ'য়ে উঠতে লাগলো। 'আপনারা কি ভেবেছেন আমি কেবলই মুখ বুজে কেবল একের পর এক হতাশা সহ্য ক'রে যাবো ?' আরো দ্রুত পায়ে সে খানিকটা পায়চারি ক'রে নিলো। কয়েক মিনিট পরে বললো, 'আবার বেরিয়ে পড়ছি আমি !'

'আমরাও আছি সঙ্গে,' ক্রেগ আর ফ্রাই জানালো তাকে।

'আমি আবার বেরুচ্ছি। আপনারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন—কিন্তু আমি আর এক মুহূর্তও দেরি করবো না।'

'আমরাও যে সঙ্গে যাবো, তা তো বলাই বাহুল্য,' এক নিশ্বাসে বললো ক্রেগ আর ফ্রাই।

'সে আপনাদের অভিরুচি,' কিন-ফো আবারও বললো।

'আপনাকে একা বেরুতে দিলে আমাদের গাফিলতি হবে—কম্পানি তো আমাদের সেই

জন্যে নিয়োগ করেনি ।'

'বেশ,' কিন-ফো বললো, 'তাহ'লে আর একটুও সময় নষ্ট করা চলবে না ।'

লাও-শেনকে খুঁজে বার করাটা খুব কঠিন কাজ হবে না বোধহয় । পাজির হদ্দ লোকটা, কুকর্মের জন্য দেশজোড়া তার নাম ; ফলে দু-তিন জায়গায় খোঁজখবর নেবার পরেই জানা গেলো যে তাই-পিং বিদ্রোহে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিলো ব'লে বিদ্রোহ নির্মূল হবার পর উত্তরে গিয়ে পে-চি-লি উপসাগেরর শাখা লিয়াও-তং উপসাগরের ধারে বিখ্যাত চিনের প্রাচীরের কাছে সে আস্তানা গেড়েছে । বিদ্রোহের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সরকার যে-ভাবে আপোস করেছিলেন বা শাস্তি দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে তেমন কিছুই করেননি—চোখ বুজে উচ্চবাচ্য না-ক'রে তাকে একেবারে চিন সীমান্তের বহির্দেশে যেতে দিয়েছেন— আর সেখানে লাও-শেন পরমানন্দে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন ক'রে কাল কাটাচ্ছে । ওয়াং তার উপর যে-কাজের ভার দিয়েছে, সে-কাজ হাঁশিল করার সে-যে যোগ্যতম ব্যক্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।

আরো ভালো ক'রে সন্ধান নেবার পর জানা গেলো সম্প্রতি নাকি লিআও তং উপসাগরের একটা ছোটো বন্দর ফু-নিনের আশপাশে দেখা গেছে লাও-শেনকে : শুনে কিন-ফো অবিলম্বে সেখানেই যাবে ব'লে মনস্থির ক'রে নিলো । লোকটার পুরো হদিশ না-পাক, কয়েকটা সূত্র পেতে পারে তো নিদেন ।

প্রথমে অবশ্য লা-ওর কাছে গিয়ে এই নতুন জটিলতার কথাটা জানিয়ে আসা উচিত। শুনে লা-ও যেভাবে ভেঙে পড়লো, তা দেখলে কষ্ট হয় । অশ্রুঝরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় সে মিনতি ক'রে বললে, কিন-ফো যেন কিছুতেই ওই ভাড়াটে খুনীটার ধারে-কাছেও ঘেঁষে না—বরং চিন ছেড়েই চ'লে যাক অন্য-কোথাও । পাগল নাকি ! লাও-শেনের কাছে যাবে ? বরং পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া উচিত !

কিন-ফো যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো । বুঝিয়ে বললো যে পৃথিবীর কোনো কোণায় গিয়েও সে কোনো শান্তি পাবে না—যখনই মনে পড়বে যে তার জীবন এক অর্থপিশাচ নরাধমের দয়ার উপর নির্ভর ক'রে আছে, তখনই জীবন তার কাছে দুর্বহ হ'য়ে উঠবে । বরং লোকটাকে খুঁজে বার করতেই হবে, যেমন ক'রে হোক—টাকা চায় সে ? বেশ, টাকাই দেবে সে তাকে—তবু সেই সর্বনেশে কাগজটা তাকে উদ্ধার করতেই হবে যেমন ক'রে হোক —আর তার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ-কাজে সে সফল হবে । তারপরেই চটপট ফিরে আসবে সে পেইচিং—রাজসভায় অশৌচ কাটার আগেই সে ফিরে আসবে—কোনো ভয় নেই । 'আমাদের বিয়েটা কিছুদিন স্থগিত থেকে একদিক থেকে ভালোই হ'লো কিন্তু,' সব শেষে সে বললো, 'একটা পলকা সুতোয় আমার প্রাণ ঝুলছে—যে-কোনো মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে—আর এই অবস্থায় তুমি আমার স্ত্রী হ'লে কী ভীষণ হ'তো ভেবে দ্যাখো তো!'

'না, না,' ধরা গলায় ব'লে উঠলো লা-ও, 'ও-কথা বোলো না । বরং তোমার স্ত্রী হ'লেই তোমার সঙ্গে যে-কোনোখানে যাবার দাবি করতে পারতুম আমি—প্রত্যেকটি ভয়ংকর মুহূর্তে তোমার পাশে-পাশে থাকতে পারতুম তাহ'লে !'

'উঁহু, বরং এটাই ভালো হয়েছে,' বললো কিন-ফো, 'হাজার বার বিপদে পড়তে হয়, তাও সই ! হাজারবার মরতে হয়, তাও-ভালো—তবু তোমাকে এমন ঝামেলায় যেন কখনো

না-ফেলি ।'

শুনে লা-ও আরো দুঃখ পেলো । তার ওই অঝোর কান্না দেখে কিন-ফোর চোখেও জল এসে গেলো । কোনোমতে 'আমি তাহ'লে...' ব'লে তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো ।

সেদিন সকালবেলাতেই কিন-ফোরা সদলবলে তং-চু ফিরে গেলো । এত ক'রে বিশ্রাম চাচ্ছে সুন, কিন্তু বারে-বারেই তাকে আবার রাস্তায় বেড়িয়ে পড়তে হচ্ছে—দুঃখে তার মনে হ'লো পৃথিবীতে তার মতো পোড়াকপাল বুঝি আর কারু নেই । কিন্তু কী আর করা যাবে ?

কিং কর্তব্য, প্রথমেই সেটা ঠিক ক'রে নেয়া উচিত । ডাঙা দিয়ে যাবে, না জলপথে ? ডাঙা দিয়ে যাওয়া মানে এমন অঞ্চল দিয়ে যাওয়া যেখানে মৃত্যুর আশঙ্কা পদে-পদে । তবু চিনের প্রাচীর পেরিয়ে আরো-দূরে যাবার সম্ভাবনা না-থাকলে সেই ঝুঁকিও তারা হয়তো নিতো, কিন্তু ফু-নিন বন্দরটা আরো পুবে অবস্থিত—কোনো জলপোতের ব্যবস্থা করতে পারলে অনেকটা সময় বাঁচানো যায় : তাহ'লে দু-তিন দিনেই পৌঁছানো যাবে সেখানে । খোঁজ-খবর নিতে লাগলো কিন-ফো : কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানা গেলো এই মুহূর্তেই নাকি পাই-হো নদীর মোহানায় ফু-নিন গামী একটি জাহাজ নোঙর ক'রে আছে—যদি এক্ষুনি একটা শাম্পানে ক'রে রওনা হ'তে পারে, তাহ'লে অনায়সেই জাহাজটাকে ধরা যেতে পারে । হ্যাঁ, জায়গা আছে—বিফল হ'য়ে ফিরে আসতে হবে না ।

ক্রেগ আর ফ্রাই মাত্র একটি ঘণ্টা সময় চাইলো : বেশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিন-ফো শেষ পর্যন্ত তাদের এক ঘণ্টার জন্য ছুটি দিলে : জাহাজডুবি হ'লে প্রাণ বাঁচাবার জন্য নানারকম পোশাক-আশাক নিয়ে এলো তারা : আগেকার দিনের লাইফবেল্ট তো কিনলোই, সেই সঙ্গে সামান্যতম ঝুঁকি না-নিয়ে কিনলো কাপ্তেন বোয়াতোঁর নবাবিষ্কৃত ভাসা-পোশাক ।

চটপট তৈরি হ'য়ে নিয়ে ২৬শে অপরাহ্ণেই তারা পাই-হো নদীর ছোট্ট ফেরি-স্টিমার 'পেই-তাং'-এ গিয়ে উঠলো । নদী এমন এঁকেবেঁকে গেছে যে তংচু থেকে মোহানা অব্দি সোজাসুজি গেলে যতটুকু পথ পেরুতে হ'তো, তার প্রায় দ্বিগুণ পথ পেরোতে হয় স্টিমারকে । নদীর পাড়গুলো মনুষ্যনির্মিত —খালের জলও বেশ গভীর —সেইজন্যই বেশ ভারি-ভারি স্টিমারও যেতে পারে । তাই নদীর অন্য শাখার—প্রায় সমান্তরালভাবে দ্বিতীয় শাখাটা চ'লে গেছে—চেয়ে এখানে জলযানের ভিড় স্বভাবতই অনেক বেশি ।

ছোট্ট দ্রুত স্টিমারটি বয়াগুলোর মধ্য দিয়ে ভেসে চ'লে এলো, তার ঘূর্ণ্যমান চাকার হলদে জল ছিটকে যাচ্ছে, মাঠের মধ্যে সেচের জন্য যে-সব খাল গেছে তাদের জল ফুলে-ফুলে উঠেছে । শহরতলির উঁচু প্যাগোডাটি পেরিয়ে এলো স্টিমার চট ক'রে, তারপর নদী হঠাৎ তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে ব'লে চুড়োটি হারিয়ে গেলো দৃষ্টি থেকে । জোয়ার এলে কী হবে, তেমন প্রশস্ত নয় : কোথাও তীরে বালির চড়া কোথাও-বা ঝোপঝাড় ; আর তারই ধার ঘেঁষে গ'ড়ে উঠেছে মাতাও, হে-সি-ভো, নন-ৎসাই আর ইয়াংৎশুন গ্রাম—তারই মধ্যে সবুজ বনের ফাঁকে-ফাঁকে গ'ড়ে উঠেছে সুন্দর কতগুলো ছোটো পল্লি ।

অল্প পরেই তিয়েন-ৎসিনকে দেখা গেলো কাছে । স্টিমার যাবে ব'লে পুবদিকের ঝোলানো সাঁকোটা তুলে দিতে কিঞ্চিৎ দেরি হ'লো, তার উপরে বন্দরে নানা মাপের নানা ধরনের জাহাজের ভিড় ব'লে তার মধ্যে দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে বেশ বেগ পেতে হ'লো

স্টিমারকে। নোঙর-করা ছোটো-ছোটো জাঙ্ক বা শাম্পানগুলোর মধ্য দিয়েই স্টিমার চালিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করলেন না কাপ্তেন—নোঙর ছিঁড়ে শাম্পানগুলি ভেসে গেলো। যদি বন্দরপাল ব'লে কেউ থাকতেন, তাহ'লে এই বিশৃঙ্খলাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছেন ব'লে হয়তো টেরটা পাইয়ে দিতেন।

ক্রেগ আর ফ্রাই কিন্তু স্থির করেছিলো যে কিন-ফোর পাশ থেকে কখনো একচুলও নড়বে না। অবস্থা পরিবর্তনের ফলে দায়িত্বটা আরো বেড়ে গেছে ব'লেই তারা বোধ করেছিলো। ওয়াংকে তবু চোখে দেখলে চিনতে পারতো—তাকে দেখতে পেলেই আরো সাবধান হ'তে পারতো। কিন্তু এই লাও-শেন —এই নৃশংস ও ভয়ংকর তাই-পিংটিকে কস্মিনকালে চোখেও দ্যাখেনি তারা—জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে যে-কেউ সে হ'তে পারে—যে-কোনো মুহূর্তে ছুরি সে বসাতে পারে। যথেষ্ট সাবধান আছে তো তারা? চোখ-কান খোলা আছে তো ঠিকমতো? আক্ষরিকভাবেই আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে বসলো তারা। খাবার জন্যেও সময় দেবার জো নেই তো ঘুমুবার সময় পাবে কোত্থেকে?

সুন তো প্রথম থেকেই চঞ্চল ও ব্যাকুল হ'য়ে আছে; তার অস্থিরতার কারণ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন; সমুদ্রযাত্রার কথা ভেবেই তার হাত-পা-ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে। নদীর জল শান্ত ও নিস্তরঙ্গ হ'লে কী হবে, সমুদ্র যতই এগিয়ে এলো, ততই তার মুখ-চোখ শুকিয়ে আমশি হ'য়ে গেলো।

'সমুদ্রে তাহ'লে যাওনি কোনো দিন?' ক্রেগ জিগেশ করলো তাকে।

'জীবনে না—,' সুন জানালে।

ফ্রাই বললো, 'তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না সমুদ্র তোমার ভালো লাগবে।'

'মোটেই ভাল্লাগে না।'

'মাথা ঠিক রেখো কিন্তু,' ক্রেগ বললো।

'আর মুখ বন্ধ রেখো সবসময়,' ফ্রাই উপদেশ দান শেষ করলো।

বেচারা সুনকে দেখে বোঝা গেলো যে মুখ বন্ধ রাখতে তার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু ক্রমশ বিস্তীর্ণ-হ'য়ে-আসা জলের দিকে এমন করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো যাতে অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন সমুদ্রপীড়ার যাবতীয় শঙ্কা ও ভয় জেগে উঠলো। কোনো কথা না-ব'লে সে একেবারে স্টিমারের ঠিক মাঝখানটিতে গিয়ে বসলো।

এরই মধ্যে নদীতীরের দৃশ্য ঈষৎ বদলে গেছে। বামতীরের চেয়ে ডানতীর বেশ খানিকটা উঁচু—বামতীর শুধু নিচু নয়, জলোচ্ছ্বাসে জীর্ণ ও ভাঙা-চোরা। দূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে গম, যব, জনারের খেত—কোটি-কোটি অধিবাসীকে খেতে দিতে হয় ব'লে চিন যে একটুকুরো জমিও অনাবাদী ফেলে রাখতে পারে না, খেতগুলো যেন এ-কথাই বোঝাতে চাচ্ছে পথিকদের। সর্বত্র জমির মধ্যে খাল কেটে-কেটে সেচের জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে; বাঁশবেতের তৈরি কলকৌশল দিয়ে জল তুলে তুলে সবদিকে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা দেখা গেলো। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে হলদে মাটি দিয়ে তৈরি ছোটো ঘর-বাড়ি—বাড়ির সামনে আপেল বাগান—নর্ম্যাণ্ডির বিখ্যাত আপেলের চেয়ে এ-আপেল কোনোদিক দিয়ে খাটো নয়। তীরে কোথাও-কোথাও দেখা গেলো একদল লোক পোষা করমোরাণ্ট পাখি দিয়ে মাছ ধরছে; সমুদ্রের পাখি করমোরাণ্ট—প্রভুর ইঙ্গিতে ছোঁ মেরে জলে প'ড়ে ডুব দেয়, যখন উঠে আসে

জল থেকে ঠোঁটের ফাঁকে জ্যান্ত মাছ ছটফট করে—পাখিদের গলায় এমন-এক ধরনের আংটা পরানো তাতে বেচারারা অতিভোজী হ'লেও মৎস্যশাবকটিকে নিজেরা গিলে ফেলতে পারে না। স্টিমারের শব্দ আর ধোঁয়া দেখে লম্বা নুয়েপড়া ঘাসের ডগা থেকে ভয় পেয়ে উড়ে-উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে ছোট্ট পাখিরা : ঘুঘু, হাড়িচাঁচা, লড়ুয়ে চড়ুই, কাক।

কিন্তু নদীতীর আশ্চর্য শান্ত আর নিরালা হ'লে কী হবে, নদীতে শশব্যস্ত শাম্পান, তঙ্কাদিরি, স্টিমারের অভাব নেই। যত ধরনের জলপোত সম্ভব, সব দেখা যাবে এই নদীতে। অবতল ছাত দিয়ে কামান-বন্দুক আড়াল ক'রে রাখা লড়ুয়ে-জাঙ্ক, তাদের কোনো-কোনোটার জন্য আবার দুইসারি বৈঠা রয়েছে—কোনোটার আবার রয়েছে হাতে-ঠেলা চাকা ; আছে শুল্ক বিভাগের দ্বিমাস্তুল জাঙ্ক—গলুইয়ে সব ভয়ংকর কাল্পনিক জানোয়ারের মুণ্ড-আঁকা, আর পিছন দিকটা সেই জানোয়ারেরই ল্যাজের মতো ; আর আছে ব্যবসায়ীদের পেল্লায় জাঙ্ক—দেশের দামি-দামি মালপত্র-সমেত এই জাঙ্কগুলোই প্রতিবেশী সমুদ্রের ভীষণ টাইফুনের সঙ্গে পাল্লা দেয় ; যাত্রীবাহী জাঙ্কগুলো উজানে গেলে গুন টেনে যায়, আর ভাটির টানে যখন তরতর ক'রে এগোয় তখন বৈঠা চালায় মাল্লারা—একমাত্র তাদেরই ভাড়া সবচেয়ে কম ; আর আছে মান্দারিনদের প্রমোদতরী —মস্ত সব বজরা—পিছনে ল্যাংবোটের মতো ডিঙিনৌকা বাঁধা। উপরন্তু কত ধরনের যে শাম্পান রয়েছে, তার ইয়ত্তা কে দেবে। পাল তুলে যাচ্ছে শাম্পানগুলো—আর সত্যি, তিনটে তক্তা দিয়েই তৈরি হয় শাম্পান, নাম থেকে যা বোঝা যায়। এমনকী পিঠে বাচ্চা বেঁধে মেয়েরা সুদ্ধু ছোটো শাম্পানগুলো চালায়। মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে পেল্লায় কাঠের ভেলা—মাঞ্চুরিয়ার কাঠুরেদের সম্পত্তি—ভেলাগুলো আসলে ছোটোখাটো ভাসন্ত গ্রাম যেন—উপরে কেবল কুটিরই তৈরি করা হয় না, এমনকী মস্ত সব মাটির জালায় শাকশব্জি ফলানো হয়।

তীরে কিন্তু গ্রামের সংখ্যা বেশি নয়। তিয়েন-ৎসিন থেকে তাকু অব্দি নদীতীরে মাত্র কুড়িটা পাড়া-গাঁ আছে কি না সন্দেহ। মাঝে-মাঝে আগুন-ধরানো ইটের পাঁজা চোখে পড়ে— তার ধোঁয়া আর পেই-তাং এর চোঙ দিয়ে বেরুনো জোলো হাওয়া কখনো চারপাশে ঝাপশা ক'রে দেয় ধোঁয়াশায় ; সন্ধেবেলায় মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে শাদা-শাদা লম্বাটে মূর্তি : খুব সুন্দর ক'রে সাজানো এই শ্বেত প্রতিভাস সন্ধ্যালোকে যেন জ্বলজ্বল করে : আশপাশের খনির লবণের স্তূপ নাকি এগুলো। এই ফাঁকা ও বিমর্ষ জেলার মধ্য দিয়ে পেই-হো ব'য়ে যাচ্ছে–যার আশপাশে কেবল ধূ-ধূ করে 'বালি আর নুন, ধুলো আর ছাই'—অন্তত মঁসিয় দ্য বোভোআ-র বর্ণনায় তা-ই পাওয়া যাবে।

সূর্যোদয়ের আগেই তাকু পৌঁছুলো ছোটো স্টিমারটি। উত্তর-দক্ষিণে কেবল দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নস্তূপ প'ড়ে আছে : ১৮৬০ সালের ২৪শে আগস্ট যখন জেনারেল কোলিনোর নেতৃত্বে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে ইংরেজ আর ফরাশি বাহিনী নদীর মোহানা দিয়ে ঢুকে পড়ে, তখন প্রতিরোধ করতে গিয়ে কামানের মুখে দুর্গপ্রাচীর উড়ে গিয়েছিলো। ছোট্ট সরু একটুকরো জমি প'ড়ে আছে ফাঁকা—তার মালিক নাকি ফরাশিরা—এখনো সেখানে রাশি-রাশি স্মৃতিস্তম্ভ দেখা যাবে—সেই যুদ্ধে যাদের মৃত্যু হয়েছিলো তাদের সম্মানে এই স্মৃতিফলকগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নদীর মুখটাতেই মস্ত এক বালির চড়া। সেইজন্য বাধ্য হ'য়ে পেইতাং তার যাত্রীদের

তাকুতে নামিয়ে দিলে। ছোটো হলেও তাকু বেশ নামজাদা শহর– মান্দারিনরা যদি রেললাইন বসাতে দেন তাহ'লে তার গুরুত্ব আরো বেড়ে যাবে, উন্নতিও হবে হু-হু ক'রে ।

ফু-নিন-এর জাহাজটা সেদিনই ছেড়ে যাবে ব'লে নষ্ট করার মতো সময় ছিলো না মোটেই । জাহাজটার নাম 'স্যাম-ইয়েপ' ; তীরে খামকা সময় নষ্ট ক'রে কী হবে ভেবে একটা শাম্পান ভাড়া ক'রে কিন-ফো তক্ষুণি 'স্যাম-ইয়েপে' গিয়ে ওঠবার বন্দোবস্ত করলে ।

১৭

জাঙ্কের নাম স্যাম-ইয়েপ

সপ্তাহ খানেক আগে একটি চিনা-ক্যালিফরনিয়ান কম্পানির ভাড়াকরা মার্কিন জাহাজ তাকু বন্দরে নোঙর ফেলেছিলো । সান ফ্রান্সিসকোর লরেল হিল সমাধিস্থলে তিং-তং কম্পানির হেড আপিশ ; আমেরিকায় যে-সব চৈনিক মারা যায় তাদের মৃতদেহ চিনমুলুকে ফিরিয়ে আনাই ছিলো এই কম্পানির কাজ—আর ব্যাবসাটা যে-বেশ ফেঁপে উঠছিলো তার কারণ ছিলো এই যে চিনেরা শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে স্বদেশের মাটিতেই শেষ আশ্রয় চাইতো । জাহাজটা ভাড়া করেছিলো এই তিং-তং কম্পানিই । গন্তব্যস্থল : কোয়াংতুং : ২৫০টা কফিন ছিলো জাহাজে—কিন-ফোরা যে-জাহাজে আশ্রয় নিলে মার্কিন জাহাজটা থেকে ৭৫টা কফিন খালাশ ক'রে সেটায় তোলা হয়েছে —এই কফিনগুলো আরো উত্তুরে প্রদেশে যাবে । সত্যি-যে, এই আবহাওয়ায় ও এই সময়ে কোনো বছরই উত্তরে যেতে দু-দিনের বেশি লাগে না জলপথে—আর এই মুহূর্তে লিয়াও-তংএর উদ্দেশে অন্য-কোনো জাহাজেরও যাবার কথা নেই —এই দুই কারণেই এই জাহাজটিতে কফিনগুলো তোলা হয়েছে, না-হ'লে কখনো ঠিক এ-ধরনের জাহাজ কম্পানি বাছতো না ।

'স্যাম-ইয়েপ' আসলে একটি সিন্ধুগামী জাঙ্ক—মাত্র তিনশো টন ওজন হবে সর্বসমেত । কোনো-কোনো হাজার-টনি জাঙ্ক মাত্র ছ-ফিট জল টানে ব'লে নদীর চড়ার উপর দিয়েও চ'লে যেতে পারে । দৈর্ঘের তুলনায় প্রস্থ বেশি হয় জাঙ্কের, তলার কাঠের ফ্রেমের তুলনায় উপরের কড়ি আর নোঙরের ডাঁটি হয় এক-চতুর্থাংশ । হাওয়া না-থাকলে খুব-একটা তাড়াতাড়ি চলতে পারে না কোনো জাঙ্ক, কিন্তু লাট্টুর মতো নিজেদের কীলকের উপর ঘুরতে পারে সে—এই একটা সুবিধে তার আছে । হালগুলি মস্ত হয়, আর ছোটো-ছোটো ছ্যাঁদা থাকে তাতে—চিনদেশে এই প্রথার খুব চল আছে, কিন্তু তার ফলে মাল্লাদের কোনো সুবিধে হয় কি না, এ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে । তা যা-ই হোক না কেন, এটা বলতেই হয় যে এই জাঙ্কগুলোই সাহসে ভর ক'রে জলঝড়ের মধ্যে দিয়ে নদীর মোহানায় বা সমুদ্রের মধ্যে চলাফেরা করে—আর এ-রকম একটি তথ্যও পাওয়া গেছে যে কোয়াংতুঙের একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান একটি জাঙ্ক ভাড়া ক'রেই সান ফ্রান্সিসকোয় চা আর চিনেমাটি পাঠিয়েছিলো : তারা

যে বার-দরিয়াতেও হিমশিম খায় না, এটা তারই এক নজির। তাছাড়া চিনেরা যে মাল্লা হিশেবে ভালো হয় এ-কথাও যোগ্য ব্যক্তিরা ব'লে থাকেন।

'স্যাম-ইয়েপ' আসলে আধুনিক জাঙ্ক : জাহাজের খোল আর কাঠামোটা ইওরোপীয় কেতায় তৈরি। বাঁশ জুড়ে-জুড়ে খোলটা তৈরি তার, ভিতরে যাতে জল চুঁইয়ে না-ঢোকে সেইজন্য দুই বাঁশের মধ্যেকার ফাঁকা কাম্বোদগার দড়ি, গলন্ত আলকাৎরা, শন, আর রজন দিয়ে আঁটা—তার ফলে ভিতরে কিছুতেই জল ঢুকতে পারে না, জল সেঁচার জন্য কোনো পাম্প নেবার দরকার নেই ব'লেই বরং মনে করা হয়। সে ভেসে থাকে যেন হালকা কর্ক ; কাঠের নোঙর হ'লেও বেশ মজবুত আর টেঁকসই ; জাহাজের পাল আর দড়িদড়া তালপাতার তন্তু দিয়ে তৈরি ব'লে অত্যন্ত নমনীয় ; মাস্তুল আছে দুটি ;— অর্থাৎ সবদিক দিয়েই ছোটোখাটো সমুদ্রযাত্রার পক্ষে 'স্যাম-ইয়েপ' খুব উপযোগী।

বাইরে থেকে দেখে এটা বোঝবার উপায় নেই যে আপাতত 'স্যাম-ইয়েপ' একটি বিপুল শবাধানে পরিণত হয়েছে : বাক্স-বাক্স চা, গাঁট রেশমি কাপড়, চৈনিক গন্ধদ্রব্যের প্যাকেটের বদলে এখন যে এই জাহাজ কতগুলি বিমর্ষ শবাধার বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, বাইরে থেকে দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। অন্য সময়ে যে-রকম জমকালো সাজ থাকে, তা যে এবার ত্যাগ করা হয়েছে, তা নয় ; জাহাজের গলুয়ে আর পিছনে তেমনি ঝলমলে নিশেন আর ফিতে উড়ছে হাওয়ায় ; গলুয়ের গায়ে মস্ত একটা লাল চোখ আঁকা, যেন কোনো একচোখা সমুদ্রদানবের অপলক দৃষ্টি ; মাস্তুলের ডগায় উড়ছে চৈনিক পতাকা ; পাটাতনে দুটো কামানে রোদ প'ড়ে চকচক করছে। জাহাজকে দেখলেই মনে হয় যেন কোনো উৎসবে এক্ষুনি যোগ দিতে যাবে। যে-হতভাগ্যরা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার সময় স্বদেশের পাঁচ হাত মাটিই কেবল চেয়েছিলো, তাদের মৃতদেহ বহন ক'রে নেবার মতো বিষণ্ণ ও শোকাহত দায়িত্বই কি সে পালন করছে না ? কিন-ফো আর সুনের কাছে কিন্তু এই শবাধান মোটেই মনখারাপকরা বিষয় ব'লে মনে হ'লো না। মার্কিন গোয়েন্দা দুটি অবশ্য অন্য-কোনো জাহাজে উঠতে পেলেই খুশি হতো—কিন্তু কিন-ফোর গায়ে লেপ্টে-থাকা ছাড়া তাদের আর-কোনো কাজ নেই ব'লে তারাও 'স্যাম-ইয়েপে' উঠতে বাধ্য হ'লো।

কাপ্তেন, আর ছ-জন মাল্লা—জাঙ্ক চালাতে এই ক-জন লোকই মোটে লাগে শোনা যায়, চিনদেশেই নাকি নাবিকদের দিগ্‌দর্শিকা আবিষ্কৃত হয়েছিলো ; এ-কথা সত্যি কিনা কে জানে, তবে এটা ঠিক যে চিনে মাল্লারা কদাচ ওই দিগ্‌দর্শিকা ব্যবহার করে না, আর 'স্যাম-ইয়েপে'র হর্তাকর্তা কাপ্তেন ইনও কোনোকালে ডাঙার হদিশ হারাবেন না ব'লে ওই সাধারণ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন না।

কাপ্তেন ইন ছোট্ট হাশিখুশি বাচাল মানুষটি—হাসি লেগেই আছে মুখে— এক চিরন্তন আন্দোলনের জলজ্যান্ত উদাহরণ। এক মুহূর্তও সুস্থির থাকতে পারেন না তিনি, হাত-পা-চোখ সবই কেবল এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তাঁর মুখ যেমন দ্রুত চলে, তারাও তেমনি। সবসময় মাল্লাদের ধ'রে ধমকাচ্ছেন, এ-কাজে ও-কাজে পাঠাচ্ছেন ; অথচ আসলে কিন্তু নাবিক হিশেবে তাঁর জুড়ি সহজে পাওয়া যাবে না—সবসময় জাহাজ তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে, উপকূলের প্রত্যেকটা বালি তাঁর নখদর্পণে, এখানকার জল তো তাঁর প্রিয় বন্ধু। কিন-ফো যে-বিপুল অর্থ জাহাজভাড়া হিশেবে দিয়েছিলো, তা তাঁর ফুর্তিকে একফোঁটাও কমাতে

পারেনি—ষাট ঘণ্টার কোনো যাত্রায় দেড়শো তায়েল পাওয়া —এমন ভাবে নিত্য ছপ্পর ফোঁড়ে না ।

কিন-ফো তার দেহরক্ষীদের জায়গা হ'লো জাহাজের পিছন দিকে, আর সুন জায়গা পেলো গলুয়ের কাছে । জাহাজের কাপ্তেন আর মাল্লাদের অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ ক'রে ক্রেগ আর ফ্রাই এই সিদ্ধান্তে এলো যে অন্তত এদের সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। লাও-শেনের সঙ্গে এদের দহরম-মহরম আছে ব'লে মনে হয় না, কারণ কিন-ফো নিতান্তই দৈবাৎ এসে উঠেছে এই জাঙ্কে । যে-কোনো সমুদ্রযাত্রাতেই কতগুলো বিপৎপাতের সম্ভাবনা থাকে —তা ছাড়া আর-কোনো বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে ব'লে তাদের মনে হ'লো না, ফলে কড়াক্কড়ি খানিকটা হ্রাস করায় তারা অসংগতি কিছু দেখলে না ।

আর তারা কড়াকড়ি খানিকটা কমানোতে কিন-ফো একলা হ'তে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো । নিজের কামরায় গিয়ে সাত-পাঁচ ভাবতে লাগলো সে, তার নিজের মতে সবই অবশ্য 'দর্শন-চিন্তা' । যখন কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিলো না, যখন ছিলো ইয়ামেনের বিলাসপ্রাচুর্যে, তখন সুখ কাকে বলে জানতো না । এখন যত ঝামেলা বাড়ছে, বিঘ্ন-বিপত্তিতে যত নাজেহাল হচ্ছে তত তার মন বদলে যাচ্ছে : এখন যদি একবার ওই মারাত্মক চিঠিটা হাতে পায় তাহ'লে হয়তো অবশেষে জানতে পারবে সুখ কাকে বলে । ওই নিদারুণ চিরকুটটি যে সে ফিরে পাবেই এ-বিষয়ে তার কোনো সংশয়ই নেই । প্রশ্নটা কেবল টাকার : লাও-শেনকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিলেই কিন-ফোর জীবন-মরণ লাও-শেনের কাছে অর্থহীন ঠেকবে ; বরং কিন-ফোকে হত্যা করলে লাও-শেনের ঝামেলা বাড়বে বৈ কমবে না– শাংহাই যেতে হবে তাকে তাহ'লে, সেন্টেনারিয়ানের আপিশে ধন্না দিতে হবে, আর সরকার এখন তার সম্বন্ধে তেমন কৌতূহলী না-হ'লেও কোনো প্রাক্তন বিদ্রোহীর পক্ষে তবু তাতে যথেষ্ট ঝুঁকি থেকে যাবে । সেদিক থেকে সে রেহাই পাবে যদি সে কিন-ফোকে চিরকুটটা বেচে দেয় । একমাত্র গণ্ডগোল হ'লো তাই-পিংটি যদি তাকে আচমকা আক্রমণ ক'রে বসে —সে কোনোরকমে টের পাবার আগেই । লাও-শেনের গতিবিধি কিছুই তার জানা নেই, অথচ উলটো দিকে লাও-শেন হয়তো তার সব ক্রিয়া-কলাপের উপরেই কড়া নজর রেখেছে—সেদিক থেকে লাও-শেনের নিজের এলাকায় পা ফেলবামাত্র তার বিপদের আশঙ্কা আরো অনেক বেড়ে যাবে । তবু কিন-ফো যথেষ্ট আশা পোষণ করলো মনে-মনে —সব বিপত্তি চুকে গেলে কী করবে না-করবে তার একটা ঝলমলে খশড়া তৈরি করলো মনে-মনে, যার মধ্যে পেইচিঙের সেই তরুণী বিধবাটির ভূমিকা নেহাৎ নগণ্য হ'লো না ।

সুন কিন্তু তখন একেবারেই অন্য কথা ভাবছিলো । নিজের কুঠুরিটায় চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে সে পে-চি-লি উপসাগরের জলদেবতাদের কাছে তার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো । চিন্তাসূত্রকে বিন্যস্ত ক'রে যে তার প্রভু কিংবা ওয়াং কিংবা দস্যু লাও-শেনকে অভিশাপ দেবে, সে-ক্ষমতাও তখন তার ছিলো না । আই-আই-ঈয়া ! আহাম্মকের হদ্দ সে, নির্বোধ, মাথা-মোটা, এমনকী ধ্যানধারণাতেও উজবুম্মুখোর চূড়ান্ত ! চায়ের পেয়ালা কিংবা ভাতের থালা ছাড়া আর-কিছুই ভাবার তার ক্ষমতা নেই ! আই-আই-ঈয়া ! সমুদ্দুরে যেতে চায় এমন লোকের চাকরি নেয়ার চেয়ে আহাম্মুকি আর কী-ইবা হ'তে পারে ! আস্ত বেণীটাই মানৎ করলো সে—মস্তকমুণ্ডন ক'রে শ্রমণ হ'য়ে যাবে সে, খুরে-খুরে দণ্ডবৎ, আর চাকরিবাকরি ক'রে কাজ নেই —কেবল

একবার এখন ডাঙায় পা দিতে পারলে হয় । হলদে কুত্তা —হ্যাঁ,হ্যাঁ, একটা হলদে কুত্তা এখন তার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে খাচ্ছে ! আই-আই-ঈয়া !

অনুকূল দক্ষিণে হাওয়ায় পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে থাকা বালুতীর ধ'রে তিন-চার মাইল এগিয়ে গেলো 'স্যাম-ইয়েপ' । পেরিয়ে গেলো পে-তাং-এর মোহানা যার কাছে একদা ইওরোপীয় সামরিক বাহিনী অবতরণ করেছিলো ; যথা সময়ে পেরিয়ে এলো তাউ নদীর মোহানায় শানতুং, ৎচিয়াং-হো আর হাই-ভে-ৎসে । উপসাগরের এদিকটা একেবারেই পরিত্যক্ত ; পাই-হোর কুড়ি মাইল এ-পাশে আর জাহাজ-টাহাজ খুব একটা আসে না—কেবল কয়েকটা সদাগরি জাঙ্ক মাঝে-মাঝে অল্প দূরে কোথাও যাবার জন্য পাড়ি দেয়। আর আসে গোটা বারো জেলে-ডিঙি, তাছাড়া তীরের কাছে জনমানবের সাড়া মেলে না—আর বার-দরিয়ার দিক তাকালে দেখা যায় অনন্ত দিগন্ত—কোথাও কোনো জাহাজের চিহ্নও নেই।

ক্রেগ আর ফ্রাই যখন দেখলে যে পাঁচ-ছ টনি জেলেডিঙিগুলোতেও দু-একটা কামান রয়েছে, তখন কাপ্তেন ইনকে সবিস্ময়ে তার কারণ জিগেশ করলে । জলদস্যুদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই কামান থাকে নৌকোয়, এ-কথা শুনে ক্রেগ কি-রকম বিচলিত হ'য়ে উঠলো। 'জলদস্যু ? পে-চি-লি উপসাগরে নিশ্চয়ই জলদস্যু উপদ্রব নেই ?'

'কেন ? পে-চি-লি উপসাগরে চিনের অন্যান্য সমুদ্রের চেয়ে বোম্বেটেদের উপদ্রব কম হবে কেন ?' ধবধবে শাদা দু-পাটি দাঁত বের ক'রে হেসে উলটে জিগেশ করলেন কাপ্তেন ।

'আপনি দেখছি বোম্বেটেদের ভয়ে মোটেই কম্পিত নন?' বললো ফ্রাই ।

'কেন ? হতভাগারা যাতে কাছে ভিড়তে না-পারে সে-জন্য দুটো কামান নেই আমার?' বললেন ইন ।

'কামানগুলোয় গোলাভরা আছে তো?' ক্রেগ জানতে চাইলো ।

'সাধারণত থাকে — তবে এখন অবশ্যি নেই ।'

'এখন নেই কেন ?' ফ্রাই জিগেশ করলে ।

'কারণ এখন জাহাজে কোনো গোলাবারুদ নেই,' শান্তস্বরে বললেন কাপ্তেন ।

'তাহ'লে আর ও-কামান কোন কাজে আসবে ?' ক্রেগ আর ফ্রাই একযোগে বিস্ময় প্রকাশ করলো ।

আবার হেসে ফেললেন কাপ্তেন । 'জাঙ্কে যদি আফিং কিংবা চা থাকতো, তাহ'লে না-হয় বোম্বেটেদের বাধা দেবার একটা মানে হ'তো; কিন্তু এখন যে-মাল নিয়ে যাচ্ছি, তাতে —' কথাটা সম্পূর্ণ না-ক'রেই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তিনি কাঁধ ঝাকালেন । 'আপনারা দেখছি জলদস্যুর ভয়ে থরহরি কম্পমান,' কাপ্তেন ইন বললেন, 'অথচ আপনাদের সঙ্গে কোনো দামি জিনিশই তো দেখছি না ।'

ক্রেগ আর ফ্রাই জানালে যে বোম্বেটেদের হাতে আক্রান্ত না-হ'তে চাইবার একটা বিশেষ কারণ আছে তাদের । তারপর জানতে চাইলো কী মাল যাচ্ছে না-যাচ্ছে তা বোম্বেটেরা টের পায় কী ক'রে । কাপ্তেন ইন হাত তুলে মাস্তুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন : অর্ধনমিত একটি শাদা নিশেন উড়ছে মাস্তুলে ! বললেন, 'এর মানে কী, তা বোম্বেটেরা জানে । কফিন ভর্তি একটা জাহাজে খামকা চড়াও হ'য়ে কী লাভ ?'

'কিন্তু,' ক্রেগ তবু যুক্তি উপস্থাপিত করলো । 'বোম্বেটেরা তো এটা ভাবতে পারে

যে ওই শাদা নিশেনটা কেবল একটা ধাপ্পা মাত্র — হয়তো নিজের চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হবার জন্যই আক্রমণ ক'রে বসলো —'

'তাহ'লে করুক গে আক্রমণ,' ইন তার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন, 'যেমন খালি হাতে আসবে, তেমনি খালি হাতে ফিরে যাবে।'

ক্রেগ আর ফ্রাই আর-কোনো কথা বললো না বটে, কিন্তু কাপ্তেনের মতো অতটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারলো না। একটা তিনশো টনি জাহাজে যদি কিছুই না-থাকে, তবু শুধু সেটাই বোম্বেটেদের কাছে এমন কী মন্দ ঠেকবে! কিন্তু এখন কেবল শান্ত হ'য়ে আসন্ন দুঃসময়ের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কী-ই বা করার আছে তাদের। তেমন নিদারুণ কিছু ঘটবে না — এই আশাটাই কেবল করা যেতে পারে।

কাপ্তেন অবিশ্যি যাত্রা যাতে নির্বিঘ্ন ও শুভ হয় তার জন্য কোনোদিকে কোনো ত্রুটি রাখেননি। জাহাজ ছাড়বার আগে সমুদ্রদেবতার নামে একটা মোরগ উৎসর্গ করেছেন, এখনো সামনের মাস্তুলটায় তার পালক ঝুলছে; মোরগটার রক্ত ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে জাহাজটার পাটাতনে — সেই সঙ্গে এক পেয়ালা মদ উপুড় ক'রে দেয়া হয়েছে খোলে—অর্থাৎ পুজোয় কোনো ত্রুটি রাখতে চাননি তিনি।

কিন্তু মোরগটা যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট ছিলো না ব'লেই হোক বা মদটা খুব ভালো জাতের ছিলো না ব'লেই হোক—জলের দেবতা কিন্তু পুজোয় মোটেই তুষ্ট হননি। সেই দিনই হঠাৎ আবহাওয়া স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ময় হওয়া সত্ত্বেও দুম ক'রে এলো বিষম ঘূর্ণিহাওয়া—চিন সমুদ্রে এই ঝড় এমন আচমকা আসে যে জগতের শ্রেষ্ঠ নাবিকেরও সাধ্য নেই তা আগে থেকে আন্দাজ করে।

সন্ধ্যা আটটা নাগাদ 'স্যাম-ইয়েপ' অন্তরীপ পেরিয়ে উত্তর-পুব উপকূল ধ'রে দ্বিগুণ বেগে চ'লে যেতে চেয়েছিলো; অন্তরীপ পেরুলে হয়তো অনুকূল হাওয়া পেতো জাহাজটি — আর কাপ্তেন ইনের আন্দাজ মতো চব্বিশ ঘণ্টার আগেই ফু-নিন পৌঁছে যেতে পারতো।

পৌঁছোবার সময় যতই এগিয়ে এলো, ওই চিঠিটা হাতে-পাবার জন্য কিন-ফোর অস্থিরতা ততই বেড়ে যেতে লাগলো। আর সুন তো তীরে পৌঁছুতে চেয়ে একেবারে খেপেই গেলো। ক্রেগ আর ফ্রাই মনে-মনে হিশেব ক'রে দেখলো আর তিন দিন হ'লেই সেন্টেনারিয়ানের এই মক্কেলের পাহারাদারির দায়িত্ব শেষ হ'য়ে যাবে। ৩০শে জুন মধ্যরাত্রে কিন-ফোর বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে — আর কোনো কিস্তি না-দিলেই তখন সব উৎকণ্ঠার অবসান হ'য়ে যাবে।

কিন্তু যেই 'স্যাম-ইয়েপ' লিয়াং-তং উপসাগরের মুখে পৌঁছুলো, অমনি হঠাৎ উত্তর-পুবে দিক-বদলালো হাওয়া; একটু পরেই আবার দিক পালটে উত্তর থেকে এলো হাওয়া — দু-ঘণ্টা পরেই হাওয়া এলো আবার উত্তর-পশ্চিম থেকে। কাপ্তেন ইনের জাঙ্কে যদি কোনো তাপমান যন্ত্র থাকতো, তাহ'লে দেখা যেতো পারদ হঠাৎ অনেকটা নেমে গেছে আর বাতাসের এই আকস্মিক তনূভবন দেখে বোঝা যেতো যে টাইফুন আসন্ন, বায়ুমণ্ডল আলো ক'রে যার আন্দোলন এখন শুরু হ'য়ে গেছে। প্যাডিংটন আর মোরির পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যদি তাঁর পরিচয় থাকতো, তাহ'লে তিনি তক্ষুনি জাহাজের দিক-পরিবর্তন ক'রে উত্তর-পুব দিকে গিয়ে সেই ঘূর্ণি হাওয়ার হাত এড়াবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার

তাঁর জানা ছিলো না — সাইক্লোনের রীতি-প্রকৃতিও তাঁর অজ্ঞাত ছিলো। একটা মোরগ তো উৎসর্গই করেছেন — সব তাণ্ডবের হাত থেকে বাঁচাবার রক্ষাকবচ নয় কি সেটা ? কিন্তু যতই কুসংস্কার থাক না কেন, বিপদের মুখে তিনি যেভাবে হাল ধ'রে দাঁড়ালেন, তাতে বোঝা গেলো তিনি কত বড়ো নাবিক — একজন ইওরোপীয় কাপ্তেন বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কারের সাহায্য নিয়ে যা করতেন, স্বজ্ঞা ও সহজাত শক্তির বলেই তিনি ঠিক তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিলেন।

টাইফুনটা আসলে বেশি জায়গা জুড়ে শুরু হয়নি ব'লেই তার বেগ ছিলো ভয়ংকর ; চরকির মতো পাক খাচ্ছে হাওয়া, আর সেই ঘুরুনির বেগ কম ক'রে ঘণ্টায় ষাট মাইল। ভাগ্যিশ, হাওয়া 'স্যাম-ইয়েপ' পুব দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো, না-হ'লে তীরে আছড়ে প'ড়ে জাঙ্কটা একেবারে চূর্ণ হ'য়ে যেতো।

এগারোটার সময় ঝড় একেবারে তুমুল আকার ধারণ করলে। কাপ্তেন ইনের মুখের হাসি তখন মিলিয়ে গেছে — কিন্তু তাই ব'লে তিনি কাণ্ডজ্ঞান ও উপস্থিতবুদ্ধি হারিয়ে বসেননি। হাল ধ'রে আশ্চর্য কৌশলে এই হালকা জলযানটিকে তিনি চালিয়ে নিতে লাগলেন — ঢেউয়ের মাথায় একেকবার অনেক উঁচুতে ভেসে ওঠে জাহাজটা, আর সেই অবস্থাতেই তিন যে-সব হুকুম দেন, টাল শামলাতে-শামলাতে মাল্লারা বিনাবাক্যব্যয়ে তাই পালন করে।

কিন-ফো তার কামরা থেকে বেরিয়ে দেয়াল ধ'রে দাঁড়িয়ে আকাশ আর সমুদ্রের চেহারা পর্যবেক্ষণ করছিলো। বাতাসের তোড়ে মেঘগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে তখন, পাঁজা-পাঁজা মেঘ নেমে এসেছে পাক খেতে-খেতে — এত নিচে নেমে এসেছে যে বুঝি এক্ষুনি ঢেউ ছোঁবে। আর কালো রাতের মধ্যে শাদা ঢেউগুলো যেন কোন গোপন অনির্ণেয় রাগে ফুলে-ফুলে উঠতে চাচ্ছে। কিন-ফোর মোটেই অবাক লাগছিলো না একটুও। দুর্ভাগ্য তার জন্য যে-সব ভয়ংকর বিপত্তি সাজিয়ে রেখেছে, এই ঝড় তো তারই একটা অংশ মাত্র। এই গ্রীষ্মকালে ষাট ঘণ্টার রাস্তা অন্য-কেউ হ'লে দিব্যি নির্বিঘ্নে পেরিয়ে যেতো — কিন্তু সেই কপাল কি আর তার হবে ?

ক্রেগ আর ফ্রাই বরং অনেক বেশি অস্বস্তি ভোগ করছে তখন — নিজেদের প্রাণের মায়া তারা করে না, কিন্তু সেণ্টেনারিয়ানের স্বার্থের কথা ভেবে তাদের অস্বস্তির সীমা নেই। কেবল তিরিশে জুন মাঝরাত অব্দি কোনোমতে বেঁচে থাকলেই হ'লো — তারপরে তাদের বা কিন-ফোর কী হয় না-হয় তা তারা মোটেই পরোয়া করে না।

সুন তো প্রথমেই প্রাণ হাতে ক'রে নিয়ে জাঙ্কটায় উঠেছিলো — কাজেই এই ঝড়ে তার কাছে অবস্থার কোনো উনিশ-বিশ ঘটেছে ব'লে বোধ হ'লো না। আবহাওয়া ভালো কি মন্দ, ঝড়তুফান কি নিস্তরঙ্গ সমুদ্র — সবই তার কাছে সমান। আই-আই ঈয়া ! ওই কফিনগুলোয় যায়া শুয়ে আছে, তারাই দিব্যি আছে — সমুদ্রের এই চণ্ড রূপে তাদের কিছুই এসে যাচ্ছে না ; ঈশ্বরে ! সেও যদি তাদের মতো কফিনে শুয়ে থাকতে পারতো ! আই-আই ঈয়া !

জাঙ্কটা কিন্তু তিন ঘণ্টা ধ'রে সত্যি বিষম অবস্থায় ছিলো। একটু যদি বেকায়দায় হালে মোচড় পড়ে, তাহ'লেই আর দেখতে হ'তো না — পাটাতনের উপর দিয়েই সমুদ্র ছুটে ব'য়ে যেতো। বালতির মতো ডিগবাজি খেয়ে উলটে যেতো না বটে, কিন্তু আস্ত খোলটায়

জল ভর্তি হ'য়ে ডুবে যেতে পারতো। ঢেউয়ের মাথায় যেমন ভাবে বারে-বারে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, তাতে তাকে যেমন কোনো নির্দিষ্ট দিকে চালানো অসম্ভব, তেমনি এটাও বোঝা দুষ্কর সত্যি কোনদিকে সে ভেসে যাচ্ছে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো ব'লেই বুঝি শেষটায় বিশেষ জখম না-হ'য়েই জাঙ্কটা ওই ভীষণ টাইফুনের ঠিক মাঝখানটায় গিয়ে পড়লো — ষাটমাইল জোড়া এই প্রচণ্ড তাণ্ডবের মাঝখানটা কিন্তু রাগি সমুদ্রের মাঝখানে কোনো শান্ত হ্রদের মতো নিস্তরঙ্গ হ'য়ে আছে — কেন্দ্রস্থলের দু-তিন মাইল জায়গার মধ্যে ঢেউও যেমন নেই, বাতাসের প্রতাপও তেমনি ঢের কম।

কুটো গাছটির মতো জলে পাক খেতে-খেতে এখানে এই নিরাপদ জায়গায় এসে পৌঁছেছে জাঙ্কটি। তিনটে নাগাদ হঠাৎ যেন জাদুবলে ওই ঘূর্ণিঝড়ের তেজ ক'মে এলো, আর ওই ছোট্ট হ্রদের চারপাশের গ'র্জে-ওঠা জলস্তম্ভ যেন বেমালুম কোথায় মিলিয়ে গেলো। কিন্তু সকাল যখন হ'লো, তখন আশপাশে কোথাও ডাঙার কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না। 'স্যাম-ইয়েপ' যেন কোনো বিপুল নীল তরল মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে একা : যেমন ফাঁকা অন্তরিক্ষ, সমুদ্রও ঠিক তেমনিই।

১৮

শবাধারের জাগরণ

'এ আমরা কোথায় এলাম, কাপ্তেন ইন?' সব বিপদ কেটে যাবার পর কিন-ফো জিগেশ করলো।

'কী ক'রে বলবো?' ততক্ষণে কাপ্তেনের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠেছে। 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

'পে-চি-লি উপসাগরে আছি তো?'

'অসম্ভব নয়।'

'না কি হাওয়ার টানে লিআও-তং উপসাগরেই চ'লে এসেছি?'

'তাও খুবই সম্ভব!'

'আমাদের জাঙ্ক কোথায় গিয়ে ভিড়বে তাহ'লে?'

'হাওয়া যেখানে নিয়ে যাবে!'

'কখন?'

'তা আমি আপনাকে বলি কী ক'রে?'

কিন-ফোর মেজাজ খারাপ হ'তে আরম্ভ করলো। 'খাঁটি চিনেম্যান জানে,' সে একটি চৈনিক প্রবচন আওড়ালো, 'সে কোথায় আছে।'

'ওঃ, ও-কথা! ও-সব ডাঙাতেই খাটে, সমুদ্দুরে নয়,' আকর্ণ দন্তবিকাশ করলেন কাপ্তেন।

কিন-ফো অধীর হ'য়ে উঠলো । 'এ-কথায় এত হাসির কী আছে ?'

'কাঁদবার কিছু তো দেখছি না,' অমনি ইনের কথা শোনা গেলো ।

সত্যি, হয়তো তেমন বিপজ্জনক হ'য়ে ওঠেনি অবস্থাটা, কিন্তু এটা তো অস্বীকার করবার জো নেই যে কাপ্তেন ইন নিজেই জানেন না জাঙ্কটা এখন বারদরিয়ার কোনখানে ভেসে আছে ; দিগ্দর্শিকা ছাড়া কেমন ক'রেই বা বুঝবেন ঝড় 'স্যাম-ইয়েপ'কে কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে । হাওয়া তো আর একদিক থেকে বয়নি, বারে-বারেই দিক পালটেছে : গোটানো পাল আর অকেজো হাল তো আস্ত জাঙ্ককে ঝড়ের হাতে খেলনাজাহাজ বানিয়ে তুলেছিলো।

কিন্তু জাঙ্কটা ঝড়ের হাতে প'ড়ে যে-সমুদ্রেই এসে পড়ুক না কেন, তাকে পশ্চিমমুখো চালানো ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই বোধহয় — অন্তত সে-বিষয়ে দ্বিধা করা উচিত নয়, কেননা একমাত্র সেদিকে গেলেই শেষ পর্যন্ত ডাঙার দেখা পাবার সম্ভাবনা থাকবে । আকাশে এখন আবার সূর্য উঠেছে, যদিও আলো আর তেমন প্রখর নয় ; সাধ্য থাকলে কাপ্তেন হয়তো তক্ষুনি সব পাল খাটিয়ে সূর্যের পিছন-পিছন ছুটে যেতেন — কিন্তু হাওয়ার নামগন্ধও নেই কোথাও — টাইফুনের পরে প্রকৃতি যেন অবসন্ন হ'য়ে আছে — একটু নড়াচড়ার ক্ষমতাও যেন আর-কারু নেই : শুধু মসৃণ জল আর ফেনার মধ্যে স্থির হ'য়ে ভেসে আছে জাহাজ, এক চুলও নড়ছে না । সমুদ্রের উপর ভারি একটা বাষ্পের আস্তরন ঝুলে আছে যেন : আগের রাতের তাণ্ডবের একেবারে উলটো আবহাওয়া, দেখে কে ভাববে যে একটু আগেই জল আর বাতাস অমন ক্ষিপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছিলো । সমুদ্র যখন এমনি অদ্ভুতভাবে শান্ত হ'য়ে যায়, চিনে মাল্লারা তাকে 'শ্বেত শান্তি' বলে ।

'কতক্ষণ থাকবে এ-অবস্থা ?' কিন-ফো জিগেশ করলো ।

'কে জানে !' কাপ্তেনকে একটুও উদ্বিগ্ন দেখালো না । 'গরমকালে সাধারণত কয়েক হপ্তা ধ'রে এই শান্ত অবস্থা থাকে সমুদ্রের।'

'কয়েক সপ্তাহ !' কিন-ফো আঁৎকে উঠলো, 'আপনি কি ভেবেছেন আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ এখানে এইভাবে থাকবো ?'

'কী করবো বলুন ? গুন টেনে নিয়ে না-গেলে তো যাবার কোনোই উপায় নেই ।'

'গোল্লায় যাক জাঙ্কটা ! কেন যে মরতে এটায় উঠেছিলুম !'

'আপনাকে দুটো ছোট্ট পরামর্শ দিলে কিছু মনে করবেন না তো ? অন্যদের মতো মেনেই নিন না অবস্থাটা—এ-রকম গজগজ ক'রে কী লাভ—আবহাওয়া তো আর আপনি বদলাতে পারবেন না ? বরং আমি যা করতে যাচ্ছি, তা-ই করুন : বিছানায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে নিন খানিকটা ।' এই দার্শনিক বচন ওয়াংকেই মানাতো ; কাপ্তেন এই পরম তত্ত্বকথাটি আউড়ে নিজের কামরায় চ'লে গেলেন ; ডেকের উপর কেবল দু-তিনজন মাল্লা রইলো তদারক করার জন্য ।

কী করবে বুঝতে না-পেরে কিন-ফো মিনিট পনেরো পায়চারি করলো ডেকে ; তারপর চারপাশে তাকিয়ে ওই পরিত্যক্ত ও নিদারুণ দৃশ্যটিকে আরেক বার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে সে মনস্থির ক'রে ফেললো । ক্রেগ আর ফ্রাই তখন জাঙ্কের পিছন দিকের রেলিঙে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো—বোধহয় কোনো বাক্যবিনিময় না-ক'রেও পরস্পরের ভাবনা

তারা বুঝতে পারছিলো। কিন-ফো তাদের কিছু না-ব'লেই ডেক ছেড়ে চ'লে গেলো। কাপ্তেনের সঙ্গে এতক্ষণ কিন-ফোর কী কথাবার্তা হয়েছে, তা সবই তারা দুজনে শুনেছিলো, কিন্তু দেরি হবে শুনে কিন-ফো অত্যন্ত উত্যক্ত ও অস্থির হ'য়ে উঠলেও তারা কিন্তু মোটেই চঞ্চল হয়নি। সময় যত নষ্ট হবে, কিন-ফোর জীবনও ততই নিরাপদ হবে, কারণ যতক্ষণ সে 'স্যাম-ইয়েপে' থাকবে, ততক্ষণ অন্তত লাও-শেন কর্তৃক আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া তাদের দায়িত্বের মেয়াদও শেষ হ'য়ে এসেছে—আর দু-দিন কাটাতে পারলেই—বাস্, —তারপরে যদি আস্ত একটা তাই-পিং বাহিনীও তাকে বধ করতে আসে, তাহ'লে তাকে রক্ষা করার জন্য চুলের ডগাটি পর্যন্ত বিসর্জন দেবার কথা ওঠে না। কাণ্ডজ্ঞানওলা ইয়াঙ্কি তারা—সেণ্টেনারিয়ানের এই মক্কেলের দাম যদ্দিন দু-লাখ ডলার থাকবে, তদ্দিনই কেবল তাদের দায়িত্ব—তারপরে কিন-ফো যে-চুলোতেই যাক না কেন তাতে তাদের কোনো কৌতূহল নেই।

এই অবস্থায় প্রচণ্ড খিদে নিয়ে মধ্যাহ্নভোজে বসলে তাদের বাধা দেবে কে? আর খাদ্যবস্তু চমৎকার: একই রেকাবি থেকে খেলো তারা, দুজনেই সমান-সমান রুটি আর মাংস খেলো, বিড়ুল্ফের স্বাস্থ্য কামনা ক'রে একই পরিমাণ মদ্য পান করলো তারা, আর শেষে সিগারেট যখন ধরালো, তখনও সিগারেটেরও সংখ্যা রইলো দুজনেরই সমান। জন্মের দিক থেকে শ্যামদেশীয় যমজ না-হ'তে পারে, রুচি আর অভ্যেসের দিক থেকে কিন্তু তা-ই।

সারা দিন কেটে গেলো অঘটন দুর্ঘটন ছাড়াই এক ভাবে; আকাশ তেমনি 'পশমিনা' রইলো সর্বক্ষণ, সমুদ্র তেমনি মসৃণ ও নিস্তরঙ্গ—আর একঘেয়ে আবহাওয়ায় কখনোই কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেলো না।

বিকেল চারটে নাগাদ সুন ডেক-এ দেখা দিলে। টলছে সে; মাতালের মতো বেশামাল ও টলটলায়মান, যদিও এমন ব্রহ্মচর্য ও সংযম তার মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। গাত্রবর্ণ নীল আর সবুজের মাঝামাঝি—হলদেটে হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—হয়তো পুনরায় ডাঙায় পা দিলে আবার আগের মতো কমলা রঙের হ'য়ে যাবে। রেগে যখন তিনটে হয়েছিলো তখন সমস্ত শরীর রক্তবর্ণ ধারণ করেছিলো—ফলে অতি অল্প সময়েই বুঝি সে ইন্দ্রধনুর সব রঙ ফোটাতে পারে শরীরে। অর্ধমুদিত তার নয়ন, রেলিঙের ওপাশে তাকাবার সাহস তার নেই; স্খলিত চরণে ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের কাছে এসে সে জিগেশ করলে, 'তাহ'লে পৌঁছে গেলুম ব'লে?'

'উঁহু,' তারা উত্তর দিলে।

'এখনো পৌঁছুবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না?'

'উঁহু।'

'আই-আই-ঈয়া', কাৎরে উঠলো সে, মাথা ঘুরে প'ড়ে গেলো মাস্তুলের তলায়, এমনভাবে ছটফট করতে লাগলো যেন বিকারের ঘোরে আছে, আর তার ছোট্ট অর্ধচ্ছিন্ন বেণীটা কুকুরের ল্যাজের মতো ন'ড়ে-ন'ড়ে উঠলো।

সকালবেলাতেই কাপ্তেন ইন অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে বলেছিলেন যে পাটাতনে নামবার জন্য খোলের গায়ে যে-সব ঘুলঘুলি রয়েছে তা খুলে দেবার জন্য: খোলের মধ্যে টাইফুনের সময় জল ঢুকেছিলো, রোদ প'ড়ে তা শুকিয়ে যেতে পারে। ক্রেগ আর ফ্রাই অনেকক্ষণ

থেকে ডেক-এ পায়চারি করছিলো, মাঝে-মাঝে গিয়ে থেমে প'ড়ে নিচে উঁকি দিয়ে দেখছিলো—শেষকালে কৌতূহল যখন চরম হ'য়ে উঠলো, তারা নিচে গিয়ে সব দেখে আসবে ব'লে ঠিক করলো ।

উপর থেকে যে-জায়গাটা দিয়ে আলো আসে, তা ছাড়া পুরো খোলটাই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা । কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার চোখে স'য়ে গেলে ওই অদ্ভুত মাল-ভরা খোলের মধ্যে পথ খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না ।

অন্যান্য জাঙ্কের মধ্যে খোলগুলোর মধ্যে খুপরি করা থাকে—এটা কিন্তু সে-রকম নয়, পুরোটাই খোলা, আর পুরো খোলটা ওই অদ্ভুত মালে ভরা—মাল্লাদের শোবার জায়গা জাঙ্কের সামনের দিকটায় । পাশে একটার উপর আরেকটা ক'রে ফু-নিন-গামী পঁচাত্তরটা কফিন সাজিয়ে-রাখা : প্রত্যেকটা কফিন ভালো ক'রে বেঁধে-রাখা আংটার সঙ্গে যাতে জাহাজের দুলুনিতে ওগুলো প'ড়ে না-যায়, আর দু-পাশের কফিনের মধ্য দিয়ে গেছে পথ—যার শেষ প্রান্ত ঘুলঘুলি থেকে অনেক দূরে ব'লে অন্ধকারে ঢেকে প'ড়ে আছে ।

আস্তে পা-টিপে-টিপে এগুলো ক্রেগ আর ফ্রাই, যেন কোনো মস্ত সমাধিভবনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে । তাদের কৌতূহলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভয় আর রোমাঞ্চ মেশানো । কফিনগুলোর মাপ নানারকম, অল্প কয়েকটিই কেবল দামি ও কারুকাজ করা, বাকিগুলো নিরাভরণ ও অতি সাধারণ । দারিদ্র যাদের প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে অল্প কয়েক জনই কেবল ভাগ্য ফেরাতে পারে ; নেভাদা, কলোরাডো আর ক্যালিফরনিয়ার খনিতে কাজকর্ম ক'রে বড়োলোক হয় কেবল অল্প লোকেই ; প্রায় সবাই যেমন-কে-তেমন সেই অবিচ্ছিন্ন দারিদ্রেই মারা যায় ; কিন্তু গরিব-বড়োলোক নির্বিশেষে সবাইকেই ব্যতিক্রমহীনভাবে সমান সযত্নে মৃত্যুর পর স্বদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয় ।

এর মধ্যে গোটা দশেক কফিন দামি কাঠে তৈরি : চৈনিক কল্পনা যে কতভাবে কোনো কফিনকে সজ্জিত করতে পারে, এ-ক-টা কফিন তারই জমকালো নজির । বাকিগুলো কেবল হলদে রং-করা চার টুকরো তক্তা জুড়ে বদখৎ ভাবে তৈরি ; প্রত্যেকটার গায়ে মৃত ব্যক্তির নাম-ধাম লেখা । ক্রেগ আর ফ্রাই যেতে-যেতে কফিনগুলোর নাম পড়তে লাগলো : ইয়ুন-পিং-ফুর লিয়েন-ফো, ফু-নিন-এর নান-লুন, কিন-কিয়ার শেন-কিন, কুঠি-লি কোআর লুং-আং । অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে প্রত্যেকটি মৃতদেহ ফেরৎ পাঠানো হয়, যাতে চৈনিক প্রান্তর, বিতান কি সমভূমিতে এই হতভাগ্যরা তাদের শেষ আশ্রয়টুকু খুঁজে পায় ।

'খুব ভালো ক'রেই বাঁধাছাঁদা রয়েছে,' ফিশফিশ ক'রে বললো ক্রেগ । ফ্রাই ফিশফিশ ক'রে পুনরাবৃত্তি করলো, 'খুব ভালো ক'রে বাঁধা—'

সান ফ্রান্সিসকো বা নিউইয়র্ক থেকে-আসা কোনো মালের গাঁট দেখে যে-ভাবে মন্তব্য করতো, তেমনি শান্ত গলায় তারা তাদের মত ব্যক্ত করলো ।

শেষ প্রান্তটায় ঘুটঘুটে আঁধার ; এখানে এসে তারা ফিরে তাকিয়ে দেখলো ও-পাশ থেকে সাময়িক গোরস্থানে ঝাপশাভাবে আলো এসে পড়ছে ডেকের দরজা দিয়ে ; ফিরে যাবে ভাবছে, এমন সময় খুট ক'রে একটা শব্দ হ'তেই তারা থমকে দাঁড়ালো ।

'ইঁদুর বোধহয়,' বললো তারা । তারপরে ক্রেগ প্রথমে বললো, 'কিন্তু ইঁদুররা তো চালের বস্তাই পছন্দ করবে বেশি—,' আর ফ্রাই বললো, 'কিংবা ভুট্টার গাঁটরি —'

খুটখুট আওয়াজটা কিন্তু মোটেই থামেনি। শব্দটা অনেকটা নখ বা থাবা দিয়ে কাঠের গায়ে আঁচড়ানোর মতো। আওয়াজটা উঠছে ডান দিক থেকে, ঠিক তাদের মাথার কাছেই—অর্থাৎ একেবারে উপরের কফিনগুলো থেকে।

শ্‌শি শ্‌শি ক'রে আওয়াজ ক'রে ইঁদুরকে তারা ভয় দেখাতে চাইলো। আঁচড়ের শব্দ কিন্তু তবু থামলো না। রুদ্ধশ্বাসে চুপ করে দাঁড়িয়ে কান খাড়া ক'রে রইলো তারা।

আওয়াজটা যে কোনো কফিনের মধ্য থেকে আসছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'নিশ্চয়ই ম'রে যাবার আগেই কাউকে কফিনে পুরে দিয়েছে,' বললে ক্রেগ।

'কিংবা হয়তো ম'রে গিয়েছে ব'লে ভেবেছিলো—এখন আবার বেঁচে উঠেছে,' ফ্রাই তার মত ব্যক্ত করলো।

কফিনটার কাছে গিয়ে তারা ডালায় হাত দিলে; ভিতরে যে কারু নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, তাতে আর কোনো সন্দেহই নেই এখন।

দুজনেই মৃদু স্বরে ব'লে উঠলো, 'কোনো অনিষ্ট ছাড়া আর কী হ'তে পারে এর মানে!'

একই সঙ্গে দুজনের মধ্যে একটি ভাবনার উদয় হয়েছে—নিশ্চয়ই কোনো নতুন বিপদের কবলে পড়বে কিন-ফো, তাদেরই জিম্মাদারিতে যে আছে; আর মৃতের পুনর্জীবনলাভ নিশ্চয়ই তারই ইঙ্গিত।

কফিনের ডালাটা আস্তে-আস্তে ভিতর থেকে খুলে যাচ্ছে দেখে তারা হাত সরিয়ে নিলো। একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ না-ক'রে তারা দেখতে লাগলো এর পর কী হয়। একচুলও নড়লো না তারা। অন্ধকার অত্যন্ত গাঢ় ব'লে স্পষ্ট ক'রে কিছু দেখা যায় না, এটা ঠিক; কিন্তু তা সত্ত্বেও বামপাশের আরেকটা কফিনের ডালাকে তারা যে উত্তোলিত হ'তে দেখলো, তা মোটেই তাদের চোখের ভুল নয়। পরক্ষণেই কার গলা যেন ফিশফিশ ক'রে কথা ব'লে উঠলো—অন্য আরেকটি মৃদু স্বর তার সাড়া দিলে।

'কনো? তুমি?'

'তুমি তো, ফা-কিয়েন?'

'আজ রাত্তিরেই তো হবে ব্যাপারটা?'

'হ্যাঁ, আজ রাত্তিরেই।'

'চাঁদ ওঠবার আগেই?'

'হ্যাঁ, ঠিক দ্বিতীয় প্রহরে।'

'অন্য-সবাই এ-কথা জানে তো?'

'হ্যাঁ, সবাইকেই ব'লে দেয়া হয়েছে!'

'ঝামেলাটা চুকে গেলে বাঁচতুম!'

'সে তো আমরাও বাঁচতুম!'

'ছত্রিশ ঘণ্টা ধ'রে একটা কফিনে শুয়ে-থাকা মোটেই ইয়ার্কি নয়!'

'ঠিক বলেছো।'

'কিন্তু কী আর করা—লাও-শেনের হুকুম; তামিল করতেই হবে।'

'শ্‌-শ্‌-শ্‌—চুপ! ও কীসের আওয়াজ?'

লাও-শেনের নাম শুনেই অজান্তেই আপনা থেকে ক্রেগ আর ফ্রাই ন'ড়ে

উঠেছিলো—ওই শেষ অস্ফুট কথাটুকু তারই জের । কিন্তু পরক্ষণেই তারা শামলে নিলে—টু শব্দটি না-ক'রে পাথরের মতো স্থির দাঁড়িয়ে রইলো ।

একটুক্ষণ সবই চুপচাপ রইলো, তারপর কফিনের ডালাগুলো আবার আস্তে বন্ধ হ'য়ে যেতেই সেখানে নিরেট স্তব্ধতা নেমে এলো ।

চুপি-চুপি হামাগুড়ি দিয়ে ক্রেগ আর ফ্রাই ফিরে এলো ; ডেকে উঠেই কোনো কথা নয়, সোজা নিজেদের কামরায় গিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো তারা । এখানে বললে আর কারু কানে পৌঁছুবার সম্ভাবনা নেই ।

'যে-মড়া কথা বলে,' ক্রেগ বাক্যটা শুরু করলো ; আর ফ্রাই তার জের টেনে বললো, 'সে এখনো সত্যি মরেনি ।'

এই ভৌতিক পরিবেশে লাও-শেনের নাম শোনবামাত্র পুরো ব্যাপারটা তাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে গেছে । কাজ হাঁশিল করার জন্য তাই-পিং সর্দারটি যে লোক লাগিয়েছে, আর তারা যে কাপ্তেনের অজ্ঞাতসারেই জাঙ্কে এসে উঠেছে—এটা বুঝতে বেশি সময় লাগে না । মার্কিন জাহাজ থেকে কফিনগুলো নামাবার পর দু-তিন দিন প'ড়ে ছিলো বন্দরে—'স্যাম-ইয়েপ'-এর আগমনের অপেক্ষা করছিলো কফিনগুলো ; আর সেই অবসরে কতগুলো কফিন থেকে মৃতদেহ সরিয়ে ফেলে লাও-শেনের অনুচরেরা গিয়ে লুকিয়ে থেকেছে । কিন-ফো যে 'স্যাম-ইয়েপে'র যাত্রী হবে, এটা তারা আগে থেকেই কী ক'রে জানতে পারলো সে-একটা রহস্য বটে ; কিন্তু এখন তাদের মনে পড়লো যে জাহাজঘাটায় তারা কয়েকটি সন্দেহজনক লোককে আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছিলো । শেষকালে যদি সেণ্টেনারিয়ান তাদের নিয়োগ করা সত্ত্বেও এমনভাবে দু-লাখ ডলার হারিয়ে বসে, তাহ'লে তাদের আর বদনামের সীমা থাকবে না ।

কিন্তু তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলার পাত্তর তারা নয় ; একটা অপ্রত্যাশিত ও বিষম বিপদের মুখোমুখি পড়েছে হঠাৎ, এমনকী ভেবেচিন্তে যে একটা ভালো ফন্দি আঁটবে তারও কোনো অবসর নেই—যা করতে হয় রাত দ্বিতীয় দণ্ডের আগেই—খুব-একটা আলোচনা ক'রে দেখার সুযোগও এখন নেই ; আর তাছাড়া একটাই তো পথ খোলা আছে সামনে—রাত দ্বিতীয় দণ্ডের আগেই কিন-ফোকে এই জাঙ্ক থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে ।

কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ সোজা, কাজে খাটানো মোটেই তা নয় । জাঙ্কে মাত্র একটা নৌকো আছে—জরুরি অবস্থার জন্য ; সেটাও আবার এমনি ভারি আর বিতিকিচ্ছি যে জাহাজশুদ্ধু সব মাল্লা লেগে যাবে সেটাকে জলে নামাতে গেলে । তাছাড়া কাপ্তেন নিজেই যদি এই চক্রান্তের সাহায্যকারী হ'য়ে থাকেন তো মাল্লারা যে মোটেই সাহায্য করবে না তা-তো বলাই বাহুল্য । কাজেই নৌকো ক'রে পালাবার কথাই ওঠে না ।

সাতটা বেজে গেলো । কাপ্তেন এখনও তাঁর কামরা থেকে বেরোননি । এমনও তো হ'তে পারে যে তিনি স্বচক্ষে এই ভীষণ কর্মটি দেখতে চান না—নিরিবিলি নিজের কামরায় ব'সে অপেক্ষা করছেন কখন নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হ'য়ে যায় আর সব ল্যাঠা চুকে যায় । জাঙ্কটা বাতাসে আর ঢেউয়ে তাড়িত হ'য়ে ভেসে বেড়াচ্ছে, কোথাও কোনো পাহারার ব্যবস্থা নেই : কেনই বা থাকবে ? শুধু গলুইয়ের কাছে রেলিঙে হেলান দিয়ে ব'সে-ব'সে একটি

মাল্লা ঢুলছে। যদি কোনো ডিঙি বা শাম্পান থাকতো, তাহ'লে এর চেয়ে ভালো পালাবার সুযোগ পাওয়া যেতো না। জাহাজে আগুন লেগে গেলেও বুঝি তারা পালাবার জন্য এত ব্যস্ত ও উত্তেজিত হ'তো না। হঠাৎ দুম ক'রে একটা ভাবনা খেলে গেলো মাথায়; আলোচনা ক'রে সময় নষ্ট করার আর অবসর নেই; এক্ষুনি, এই মুহূর্তেই, কাজে খাটাতে হবে এটা।

কিন-ফোর কামরার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আস্তে-আস্তে গিয়ে ধাক্কা দিলো তাকে। কিন-ফো তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আবার তাকে ধাক্কা দিলো তারা।

ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো সে, 'আপনারা আবার কী চান ?'

যত কম কথার পারে পুরো ব্যাপারটা তারা খুলে বললো; কিন-ফো কিন্তু সব শুনে মোটেই ভীত হ'লো না, একটু ভেবে সে বললে, 'গুণ্ডাগুলোকে জলে ছুঁড়ে ফেললেই তো হয়—'

'তার কোনো প্রশ্নই ওঠে না,' তক্ষুনি তারা ব'লে উঠলো।

'তাহ'লে আমরা কি কিছুই করবো না,' জিগেশ করলো কিন-ফো।

'যা বলি তা-ই করুন,' ক্রেগ বললো, 'আমরা ফন্দি এঁটে ফেলেছি।'

'শুনি কী ফন্দি,' কিন-ফো যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হ'লো।

'টুঁ-শব্দটি না ক'রে এই পোশাকটি নিয়ে প'রে ফেলুন—চটপট তৈরি হ'য়ে নিন—কোনো প্রশ্ন করবেন না !'

হাতে একটা মোড়কে জড়ানো পুলিন্দা ছিলো—সেটা খুললো তারা। কাপ্তেন বোয়ার্তঁ-কর্তৃক সদ্য আবিষ্কৃত চার প্রস্থ সাঁতারের পোশাক রয়েছে ভিতরে। কিন-ফোকে এক প্রস্থ দিয়ে বললে, 'দুটি আমাদের জন্য ও আরেকটা সুনের।'

'যান, গিয়ে সুনকে নিয়ে আসুন,' কিন-ফো বললে।

সুন এমন ভঙ্গিতে এলো যেন সে হঠাৎ চলৎশক্তি হারিয়ে পঙ্গু হ'য়ে পড়েছে।

কিন-ফো বললো, 'এটা প'রে নে—'

কিন্তু সুনের তখন নিজে থেকে ও-পোশাক পরার কোনো ক্ষমতাই নেই। সে কেবল 'আই-আই-ঈয়া' ব'লে কাৎরাতে লাগলো। আর অন্যরা তাকে ধরাধরি ক'রে ওই জলনিরোধী-পোশাকে ঢুকিয়ে দিলে।

ততক্ষণে আটটা বেজে গেছে; সবাই তারা প্রস্তুত; চারটে মস্ত সীল মাছ যেন তারা, এক্ষুনি বরফ-জমা জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেন; — অবশ্যি সুনকে এমন ঢিলেঢালা ও অলবড়ো দেখাচ্ছিলো যে সীল মাছের মতো অমন নমনীয় জীবের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না।

জাঙ্কটি তখন নিবাত-নিষ্কম্প সমুদ্রে স্থির ভেসে আছে; ক্রেগ আর ফ্রাই কামরার একটা ঘুলঘুলি খুলে আস্তে ধাক্কা দিয়ে কোনো গড়িমশি না-ক'রে প্রথমে সুনকে সমুদ্রে ফেলে দিলে। কিন-ফোও সাবধানে নেমে পড়লো; ক্রেগ আর ফ্রাই নামলো সব শেষে—ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে চারপাশে তাকিয়ে নিশ্চিত দেখে নিলো সব নলটল জোড়াতাড়া ঠিক আছে কি না।

এত সাবধানে ও নিঃশব্দে তারা জলে নেমে পড়লো যে 'স্যাম-ইয়েপ' থেকে যে চারজন যাত্রী কেটে পড়েছে, এটা কেউ জানতেই পেলো না।

১৯

অকূল পাথারে

কাপ্তেন বোয়াতোঁর পোশাকটা নানা গাছের আঠা জমিয়ে তৈরি : পা-ঢাকা জামা, ঢিলে গাত্রবাস, আর টুপি—এই তিন প্রস্থে পোশাকটা সম্পূর্ণ। নিরন্ধ্র এই পোশাকে জল ঢোকে না বটে, কিন্তু ঠাণ্ডার কাছে তা মোটেই অভেদ্য হ'তো না—যদি-না দুটো আলাদা স্তরে খানিকটা হাওয়া জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা থাকতো। এই বাতাসই আসলে এটাকে জলের উপর ভাসিয়ে রাখে আর ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচায়—না-হ'লে অনেকক্ষণ খোলা জলে প'ড়ে থাকলে ঠাণ্ডা লাগতো।

পোশাকের ভিন্ন-ভিন্ন অংশ এমনভাবে জোড়া দেয়া হয়েছে, যাতে জল নিরোধ করতে পারে। গোড়ালির তলায় পাজামা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে পায়ের চেটোর নিচে ভারি সোল রয়েছে জুতোর মতো ; কোমর পর্যন্ত উঠে এসেছে এই পাজামা, ধাতুর কোমরবন্ধ দিয়ে আটকানো থাকে—আর পোশাকটা এত ঢিলে যে হাত-পা নাড়তে কোনো অসুবিধে হয় না। ছোট্ট বুক-ঢাকা জামাটা ওই কোমরবন্ধের সঙ্গেই আটকানো থাকে ; গলাবন্ধটি নিরেট, আর শিরস্ত্রাণটি আটকানো থাকে তারই সঙ্গে — আঁটোভাবে কপাল গাল আর চিবুকের উপর স্থিতিস্থাপক দিয়ে আঁটা থাকে টুপিটা—শুধু চোখ, মুখ, আর নাকই খোলা থাকে। জামার সঙ্গে গোটা কয়েক ওই গাছের আঠার নল লাগানো থাকে—যাতে ভিতরে হাওয়া খেলতে পারে ; হাওয়ার ঘনতা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় যে কেউ ইচ্ছে করলে গলা বা কোমর ডুবিয়ে খাড়া ভেসে থাকতে পারে—কিংবা কখনো চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকতে পারে জলের উপরে—কখনোই আশঙ্কার কিছু থাকবে না—সবসময় ইচ্ছে মতো হাত-পাও নাড়তে পারবে।

এই ভাসা-কলের ব্যাবহারিক প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই এর ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আবিষ্কর্তা আমাদের কাছে যথেষ্ট সাধুবাদ দাবি করতে পারেন। পোশাকটাকে সম্পূর্ণ ক'রে-তোলার জন্য সেই সঙ্গে আরো কতগুলো জিনিশ থাকে : কাঁধে ঝোলানো থাকে একটি জলনিরোধ থলি, দরকারি জিনিশপত্তর রাখা যায় যাতে ; আর থাকে ছোট্ট একটা লাঠি—পায়ের চেটোর নিচে ভারি সোলের গায়ে একটা একটা ছোট্ট খাপে সেটা বসাবার ব্যবস্থা আছে—একটা ছোট্ট পাল তুলে দেয়া যায় ইচ্ছে করলে ওই লাঠির গায়ে টাঙিয়ে ; আর আছে হালকা একটা বৈঠা—দরকার-মতো সেটাকেই হাল হিশেবে ব্যবহার করা যায়, অন্য সময়ে দাঁড়ের কাজই করা যায় ওটা দিয়ে।

এইসব শরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে কিন-ফো, ক্রেগ, ফ্রাই আর সুন অকূল পাথারে ভেসে পড়লো : দাঁড় টেনে কিছুক্ষণের মধ্যেই জাঙ্কটি থেকে অনেক দূরে চ'লে এলো তারা। ঘুটঘুটি কালো রাত : কাপ্তেন ইন বা তাঁর কোনো স্যাঙাৎ যদি তখন ডেকে উপস্থিত থাকতো, তাহ'লে তারা কিছুতেই পলাতকদের দেখতেই পেতো না : তারা যে পালাচ্ছে, সেই অন্ধকারে

এটা কেউ ভুলেও সন্দেহ করতে পারতো না।

ছদ্মবেশী শবটি যে-দ্বিতীয় প্রহরের কথা বলেছিলো, তা আসলে মধ্যরাতেই শুরু হবে ; সুতরাং কিন-ফোদের হাতে কয়েক ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় আছে, যার ফলে 'স্যাম-ইয়েপ' থেকে বেশ কিছু মাইল দূরে চ'লে যাবার সুযোগ পাবে তারা। তখন অত্যন্ত মৃদু হাওয়া বইছে, জল ছলছল ক'রে উঠছে ; কিন্তু তবু দূরে যেতে হ'লে ওই দাঁড় টানা ছাড়া আর কিছুর উপরই নির্ভর করার উপায় নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিন-ফো, ক্রেগ আর ফ্রাই এই অদ্ভুত পোশাকে অভ্যস্ত হ'য়ে গেলো : এত চটপট তারা নৈপুণ্য অর্জন ক'রে ফেললো যে মুহূর্তে ইচ্ছেমতো যে-কোনো ভঙ্গিতে যে-কোনো দিকে যেতে তাদের কোনো অসুবিধে হ'লো না। সুনকে অবিশ্যি গোড়ার দিকে টেনে নিয়ে যেতে হ'লো, কিন্তু সেও শিগগিরই তার হৃত শক্তি ফিরে পেলো : জাঙ্কে যখন ছিলো তার চেয়েও অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে সে জলের মধ্যে। সমুদ্রপীড়ার কষ্ট আর মাথা-ঘুরুনি ভাব আর নেই : জাহাজের মধ্যে ছিটকে প'ড়ে গড়াগড়ি যাওয়া কিংবা লোফালুফি হওয়ার চেয়ে সমুদ্রে দিব্যি বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে ভেসে থাকতে পেরে তার স্বস্তি আর আহ্লাদের সীমা ছিলো না।

কিন্তু সমুদ্রপীড়া আর না-থাকলে কী হবে, ভয়ে তার হাত-পা তবু ভিতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছিলো। হাঙরেরা গিলে খাবে, ছিঁড়বে তাকে টুকরো-টুকরো ক'রে—এই ভয় এমনভাবে তার বুকের মধ্যে হানা দিচ্ছিলো যে বারে-বারে সে পা দুটি টেনে দেখছিলো হাঙরগুলো ছিঁড়ে খেয়ে গেলো কি না। এটা অবশ্যই বলতে হয় যে তার এই আতঙ্ক মোটেই ভিত্তিহীন ছিলো না।

কিন-ফোকে নিয়ে যেন লোফালুফি খেলছে তার অদৃষ্ট। এই আশ্চর্য ভাগ্যের জন্যেই একেবারে চিৎ হ'য়ে শুয়ে দাঁড় টেনে-টেনে এগুচ্ছে তারা—যখনই ক্লান্ত লাগে, বিশ্রামের জন্য লম্বের মতো উঠে দাঁড়ায়, না-হ'লে চিৎ-সাঁতারই দেয় সর্বক্ষণ। জাঙ্ক ছেড়ে আসার পর এক ঘণ্টা কেটে গেছে, আর তারা এসেছে আধ মাইল দূরে। বিশ্রাম নেবার জন্য বৈঠার গায়ে হেলান দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো তারা, ফিশফিশ ক'রে কী কর্তব্য তা-ই নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো।

'পাজির পাঝাড়া ওই কাপ্তেনটা!' অনেকক্ষণ ধ'রে মন্তব্যটা করতে চাচ্ছিলো ক্রেগ, এবার প্রথম সুযোগেই ব'লে ফেললো।

'লাও-শেনটাই বা কী কম পাজি, শুনি?' ফ্রাই যোগ ক'রে দিলো।

'আপনারা এতে অবাক হয়েছেন নাকি?' কিন-ফো বললে, 'আমি আর এখন কিছুতেই অবাক হই না।'

'একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না,' ক্রেগ বললো, 'ওই হতভাগাগুলো কী ক'রে আগেভাগেই জানতে পেরেছিলো যে আপনি ওই জাঙ্কে গিয়েই উঠবেন?'

কিন-ফো শান্তগলায় বললে, 'তা, ওদের হাত থেকে যখন বেঁচে গেলাম, তখন আর এ-কথা জেনেই বা কী হবে!'

'বেঁচে গেলেন?' ক্রেগ যেন স্তম্ভিত : '"স্যাম-ইয়েপ" যতক্ষণ কাছাকাছি থাকবে, ততক্ষণ আমরা মোটেই নিরাপদ নই।'

‘কী করবো তাহ’লে বলুন,’ কিন-ফো জানতে চাইলো ।

‘কিঞ্চিৎ জলযোগ ক’রে নবোদ্যমে আমাদের রওনা হ’তে হবে আবার, যাতে সকাল হবার আগেই “স্যাম-ইয়েপে”’র দৃষ্টিসীমার বাইরে চ’লে যেতে পারি ।’

ফ্রাই তার পোশাকে আরো-কিছু হাওয়া ঢুকিয়ে দিয়ে আরো ভেসে উঠতে লাগলো, শেষটায় যখন কোমর পর্যন্ত ভেসে উঠলো তখন কাঁধের জলনিরোধী থলিটা খুলে তার ভিতর থেকে একটা গেলাশ আর বোতল বার ক’রে আনলো । ব্র্যাণ্ডি দিয়ে ভ’রে কিন-ফোর হাতে তুলে দিলে সে গেলাশটা, আর কিন-ফোকে বিশেষ অনুরোধ-উপরোধ করার আগেই গেলাশটা সে গলায় একেবারে উপুড় ক’রে দিলো । ক্রেগ আর ফ্রাই নিজেরাও ব্র্যাণ্ডি খেলে—সুনের কথাও মোটেই ভুললো না ।

গেলাশটা শূন্য ক’রে ফেলতেই সুনকে জিগেশ করলো ক্রেগ, ‘এখন কেমন লাগছে ?’

‘ধন্যবাদ—আগের চেয়ে অনেক ভালো,’ বললে সুন, ‘কিন্তু কিঞ্চিৎ নিরেট খাবার পেলে ভালো হ’তো ।’

‘আলো ফুটলেই আমরা ছোটোহাজরি সেরে নেবো—তখন তোমাকে চা-ও দেয়া হবে ।’

সুন মুখ বেঁকালো । ‘ঠাণ্ডা চা ?’

‘না, না, গরম—’ বললে ক্রেগ ।

এবার সুনের চোখমুখ ঝলমল ক’রে উঠলো । ‘কিন্তু সে আপনি পাবেন কোত্থেকে ?’ সে জানতে চাইলো ।

‘কেন, আগুন জ্বেলে গরম ক’রে নেবো ।’

‘তাহ’লে আর সকাল অব্দি অপেক্ষা করার কী দরকার ?’ সুন যুক্তি উত্থাপন করলো ।

‘ওহে আহাম্মক, আমাদের আলো কাপ্তেন ইন আর তাঁর স্যাঙাৎদের চোখ পড়ুক, এটাই তুমি চাও না কি !’

‘না, না—’

‘তাহ’লে বরং ধৈর্য ধ’রে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করো ।’

এই কথোপকথন চলাকালীন কিন-ফোর দলের অবস্থা হাস্যকর দেখাচ্ছিলো ; ঈষৎ ঢেউয়ে তারা একরাশি কর্কের মতো উঠছে নামছে—কিংবা বলা যায় পিয়ানো বাজাবার সময় রিডগুলো যেমন ওঠে-নামে, তাদের দশাও তখন ছিলো তেমনি ।

এবার কিন-ফো বললো, ‘একটু-একটু হাওয়া আসছে বোধহয় ।’

‘তাহ’লে পাল টাঙিয়ে দিই বরং এবার—’ ব’লে উঠলো ক্রেগ আর ফ্রাই । কিন্তু তারা যেই তাদের ছোটো মাস্তুলগুলো খাড়া করার চেষ্টা করছে, সুন হঠাৎ বিষম আতঙ্কে প্রচণ্ড আর্তনাদ ক’রে উঠলো ।

‘চুপ কর, আহাম্মক !’ তীব্র রাগে ফিশফিশ ক’রে উঠলো কিন-ফো, ‘তুই কি চাস আমরা ওদের হাতে ধরা পড়ি ?’

‘মনে হ’লো—’ তোৎলালো সুন, ‘মনে হ’লো যেন একটা রাক্ষস—একটা ভীষণ হাঙর—দেখলাম কাছে । আমার গায়ে তার গা ঠেকে গেলো পর্যন্ত !’

তন্নতন্ন ক'রে দেখলো ক্রেগ আশপাশে, তারপর জানালো নিশ্চয়ই সুন ভুল করেছে, হাঙরের ল্যাজের ডগাটি পর্যন্ত নেই কোথাও।

কিন-ফো তার প্রিয় ভৃত্যটির কাঁধে হাত রাখলো। 'শোন, সুন, ভিতুর মতো চ্যাঁচাবি না অমন—যদি তোর ঠ্যাংদুটোও ছিঁড়ে খায়, তবু চীৎকার করবি না, বুঝলি ?'

'ফের যদি চ্যাঁচাবে তো,' ফ্রাই যোগ করলো, 'তোমার জামা ছুরি দিয়ে টুকরো ক'রে দিয়ে তোমায় সাগরের তলায় পাঠিয়ে দেয়া হবে : সেখানে তুমি যত ইচ্ছে চেঁচিয়ো, কেউ বারণ করবে না।'

এ-রকম ধাতানি খেয়ে বেচারা সুন বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা না-পেলেও আর টুঁ শব্দটি করতে সাহস করলো না। মনে হ'লো তার দুঃখকষ্ট বুঝি আর কোনোদিনও শেষ হবে না : এ-রকমভাবে আতঙ্কে বুক টিপটিপ ক'রে মরার চেয়ে সমুদ্রপীড়ার কষ্ট আর এমন কী মন্দ ছিলো !

কিন-ফো ভুল বলেনি—সত্যি হাওয়া আসছিলো তখন। অনেক সময় মৃদু হাওয়া দেয় মাঝরাতে, সকালবেলাতেই আবার চ'লে যায় : এটা যদি সে-রকম কোনো হাওয়াও হয়, তবু 'স্যাম-ইয়েপে'র সঙ্গে তাদের ব্যবধান বাড়িয়ে তোলবার জন্য একে পূর্ণ মাত্রায় কাজে খাটিয়ে নিতে হবে। লাও-শেনের শাগরেদরা যখন আবিষ্কার করবে যে কিন-ফো আর তার কামরায় নেই, তখন তারা যে তার সন্ধানে চারপাশ তোলপাড় ক'রে ফেলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ; যদি তাদের একজনকেও তারা দেখতে পায়, তাহ'লে জাঙ্কের ওই ভারি শাম্পানটা মুহূর্তে তাদের বন্দীত্ব আরো সহজসাধ্য ক'রে তুলবে। সেই জন্যেই সকাল হবার আগে যতদূরে যেতে পারবে, ততই তাদের মঙ্গল।

ভাগ্যিশ হাওয়া বইছিলো পুব দিক থেকে। ওই টাইফুন তাদের কোথায় নিয়ে এসেছে, কে জানে ? এটা কি লি আও-তং উপসাগর, না কি পে-চি-লি উপসাগর—না কি ভয়ংকর পীত সমুদ্র ? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে হাওয়া যদি তাদের তাড়িয়ে পশ্চিমে উপকূলের দিকে নিয়ে যায়, তাহ'লে পাই-হো নদীর মুখে কোনো সদাগরি জাহাজ হয়তো তাদের দেখতে পেয়ে তুলে নেবে—কিংবা তীরের কাছে যে-সব জেলেডিঙি দিনরাত শশব্যস্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারাও হয়তো উদ্ধার করতে পারে তাদের। কিন্তু হাওয়া যদি পশ্চিম থেকে আসতো, আর 'স্যাম-ইয়েপ' যদি সেই হাওয়ায় কোরিয়ার দক্ষিণে এসে পড়তো, তাহ'লে কিন-ফোদের উদ্ধারের কোনো আশাই থাকতো না। তাহ'লে হয়তো কালক্রমে বার-দরিয়ায় ভেসে চ'লে যেতো, কিংবা শেষটায় জাপানের উপকূলে গিয়ে ঠেকতো তাদের মৃতদেহ—পরনের এই পোশাকের জন্য ম'রে-যাবার পরেও ডুবতো না, ভেসে প'চে চ'লে যেতো ওই সূর্যোদয়ের দেশে।

এখন রাত দশটা হবে বোধহয়। চাঁদ উঠবে মাঝরাতের একটু আগে : নষ্ট করার মতো এক মুহূর্তও সময় নেই। ক্রেগ আর ফ্রাই যেমনভাবে ব'লে দিলো, তেমনিভাবে পাল তুলে দেবার সব ব্যবস্থা করা হ'লো। ব্যবস্থাটা অবশ্যি খুবই সহজ : প্রত্যেকটা পোশাকের ডান পায়ের তলায় একটা ক'রে মাপ-মতো গর্ত রয়েছে, ওই ছোটো লাঠিটা যাতে ওখানে ঢুকিয়ে মাস্তুলের মতো তুলে দেয়া যায়। প্রথমে তারা চিৎ হ'য়ে শুয়ে হাঁটু মুড়ে ডান পাটা হাতের নাগালে এনে ওই মাস্তুলটা জায়গামতো বসালো : তার আগেই অবশ্য ছোটো পালটা

তারা মাস্তুলে টাঙিয়ে দিয়েছিলো। ফ্রাই আর ক্রেগের সংকেতে তারা একসঙ্গে দড়ি টেনে তেকোণা পালটার উপর দিক একেবারে মাস্তুলের ডগায় নিয়ে গেলো, তারপর দড়িটা আঁটো ক'রে ওই ধাতব কোমরবন্ধে বেঁধে নিলো, আর পালের তলার দিকের দড়িটা হাতে শক্ত ক'রে ধরে থেকে একটা নৌবহরের মতো ভেসে চললো।

দশ মিনিটের মধ্যেই তারা স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে ভেসে-যাওয়ার কৌশল আয়ত্ত ক'রে ফেললো। একে অন্যের মধ্যে সমান ব্যবধান রেখে তারা সহজেই ভেসে চ'লে গেলো : গাংচিলেরা যেমন ক'রে হাওয়ায় ডানা ছড়িয়ে আলগোছে ভেসে যায়, তেমনিভাবই এগিয়ে গেলো তারা। কোনো ঢেউ ছিলো না ব'লে তাদের এগিয়ে যেতে আরো সুবিধে হ'লো : জল ছলকে উঠে বা ঢেউ উঠে-নেমে তাদের চলায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো না।

সুন অবিশ্যি দু-তিনবার ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের নির্দেশ ভুলে গিয়ে বোকার মতো ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গিয়েছিলো পিছনে, আর তার ফলে কয়েক ঢোঁক লবণ জল গিলেছিলো। অভিজ্ঞতা থেকেই, অবিশ্যি, পরে সে অনেকটা শিখে ফেললো। তবু ওই হাঙরের ভয় সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলো না। তাকে অবিশ্যি ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো হ'লো যে চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা অনেক কম থাকে, কারণ হাঙরের হাঁ এমনভাবে তৈরি যে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে চিৎ না-হ'লে চলে না, সেই জন্যই কোনো ভাসমান বস্তুকে কামড়ে ধরা তার পক্ষে কঠিন ; তাকে আরো বলা হ'লো যে সব আমিষখোর জীবই সাধারণত সচল কোনো-কিছুর চেয়ে নিস্তেজ বা নিষ্প্রাণ দেহই বেশি পছন্দ করে। সুন তো শুনেই ঠিক ক'রে ফেললো যে আর কখনো সে স্থির হ'য়ে প'ড়ে থাকবে না। আর এই সংকল্প করার সঙ্গে-সঙ্গেই আগের চেয়ে অনেক ভালো বোধ করলো সে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে ভেসে চললো এই অদ্ভুত বহর। এর চেয়ে কম সময়ে জাঙ্কের পাল্লা পেরিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না—আবার এর চেয়ে বেশি দূর গেলে হয়তো একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়তো। এর মধ্যেই তো ওই পালের দড়ি টেনে ধ'রে থাকার জন্য হাতদুটো টনটন করতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

থামার সংকেত করলো ক্রেগ আর ফ্রাই। তক্ষুনি পালগুলো ঢিলে ক'রে গুটিয়ে ফেলা হ'লো, আর সবাই—কেবল সুন ছাড়া অবিশ্যি—খাড়া হ'য়ে সাবধানি অবস্থায় ফিরে এলো আবার।

'বিশ্রামের সময় পাঁচ মিনিট,' ক্রেগ বললো কিন-ফোকে।

'আরেক গেলাশ ব্র্যাণ্ডি পাবেন এবার,' জানালো ফ্রাই।

দুটো প্রস্তাবেই কিন-ফো সাগ্রহে সম্মতি জানালো। উত্তেজক কোনো-কিছু এখন সত্যি ভারি দরকারি। জাঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কিছু আগেই সান্ধ্যভোজ চুকিয়ে ফেলেছিলো ব'লে আপাতত সকাল পর্যন্ত কোনো খাদ্য না-পেলেও চলবে। ঠাণ্ডাও লাগছে না মোটেই : জল আর তাদের দেহ—এই দুয়ের মধ্যে বাতাসের একটা আস্তর রয়েছে ব'লে ঠাণ্ডা লাগছেই না, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর থেকে গাত্রতাপ এখনো একফোঁটাও কমেনি।

'স্যাম-ইয়েপ'কে দেখা যাচ্ছে নাকি এখনো ? ফ্রাই তার থলি থেকে একটি দুরবিন বার ক'রে পুবদিকে দিগন্তের দিকে তাকালো : কিন্তু আকাশের ঝাপশা বাতাবরণে জাঙ্কটির কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। একটু কুয়াশা পড়েছিলো সে-রাতে ; আকাশে বিশেষ তেমন

তারা নেই, অনেক দূরে শুধু মিটমিট ক'রে কয়েকটি জ্বলছে । ক্ষীণ পাণ্ডুর চাঁদ অবিশ্যি উঠে আসবে একটু পরে—হয়তো তখন কুয়াশা স'রে যাবে ।

'পাজিগুলো নিশ্চয়ই এখনো ভোঁশ-ভোঁশ ক'রে নাক ডাকাচ্ছে,' বললে ফ্রাই ।

'বাতাসের সুবিধে নিলো না তো ওরা,' ক্রেগ বললো ।

কিন-ফো দড়ি টেনে পালটাকে টানটান ক'রে মেলে দিলে ; আর দেরি না-ক'রে এক্ষুনি আবার রওনা হওয়া উচিত ; অন্যরাও তাকে অনুসরণ করলে তক্ষুনি—হাওয়া এখন আগের চেয়েও অনেক ক'মে গেছে ।

তারা যাচ্ছিলো পশ্চিমমুখো, তাই পুবদিকে যখন চাঁদ উঠবে তখন তারা দেখতে পাবে না । তবে জ্যোৎস্নায় অবশ্য বিপরীত দিগন্তও ঈষৎ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে : আর পশ্চিম দিগন্তটাই ভালো ক'রে দেখা দরকার তাদের । সমুদ্র আর আকাশের মিলনরেখার কোনো স্পষ্ট গোল দাগের বদলে যদি ভাঙা-ভাঙা আলোছায়া আঁকাবাঁকা দাগ দেখা যায়, তবেই বুঝতে পাবে যে ডাঙা দেখা যাচ্ছে । আর উপকূল সেদিকটা যেহেতু খোলা ও খাড়িহীন, সেইজন্য অনায়াসে ও নির্বিঘ্নেই তারা তীরে গিয়ে উঠতে পারবে ।

বারোটা নাগাদ মাথার উপরে ভিজে ও স্যাঁৎসেঁতে জলীয় বাষ্পের উপর ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে পড়লো একটু : সমুদ্রের তলা থেকে প্রায়-বর্তুল এক চাঁদ উঠে আসছে, এটা তারই ইঙ্গিত । কিন-ফো বা তার সঙ্গীরা কেউই ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাবার চেষ্টা করলো না । এদিকে আবার হাওয়াও এলো নবোদ্যমে, আর যেমন ওই কুয়াশার আবরণকে ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলো, তেমনি তাদের পালেও ধাক্কা দিলো সজোরে—আর তার ফলে ফেনিল রেখা এঁকে তারা বেশ জোরেই এগিয়ে চললো । আবহাওয়া ক্রমেই স্বচ্ছ হ'য়ে আসছে ; তারাগুলো আরো স্পষ্টভাবে ঝিকমিক করছে আকাশে ; আর তামাটে-লাল চাঁদটি আস্তে-আস্তে উজ্জ্বল রুপোলি হ'য়ে উঠে চারপাশ আলো ক'রে দিলো ।

আর তক্ষুনি ক্রেগ তীব্র স্বরে একটি দিব্যি ক'রে বসলো । চেঁচিয়ে বললো, 'ওই যে, জাঙ্ক—

'পাল খাটিয়ে এগুচ্ছে হুড়মুড় ক'রে,' ফ্রাই অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠলো ।

তক্ষুনি পাল চারটে নামিয়ে নিলো তারা, মাস্তুলগুলো খুলে ফেলা হ'লো পায়ের তলার খোপ থেকে । সোজা হ'য়ে তারা পিছনে তাকিয়ে দেখলো : সত্যি, চাঁদের আলোয় দেখা গেলো জাঙ্কটি কোনো মস্ত প্রেতের মতো সবগুলো পালের বাহু বাড়িয়ে দিয়ে মাইলখানেক এগিয়ে এসেছে ।

কাপ্তেন ইন যে অবশেষে কিন-ফোর পলায়নের সংবাদ শুনে ফেলেছেন, তাতে সন্দেহ নেই । আর তক্ষুনি বেরিয়ে পড়েছেন তাদের সন্ধানে । পলাতকেরা যদি এবার আলো-পড়া জলতল থেকে চোখে না-পড়ার কোনো উপায় বের করতে না-পারে, তাহ'লে মিনিট পনেরোর মধ্যেই কাপ্তেন ও তাঁর স্যাঙাৎদের হাতে ধরা প'ড়ে যাবে ।

'মাথা নামিয়ে নিন !' ক্রেগ ব'লে উঠলো ।

তার নির্দেশের মর্মার্থ অনুধাবন করতে কোনো অসুবিধে হ'লো না । পোশাকের ভিতর থেকে আরো-কিছু হাওয়া বার ক'রে দেয়া হ'লো, জলের আরো তলায় চ'লে গেলো চারজন—কেবল মুখটা ভেসে রইলো জলের উপর । নিঃশব্দে কোনো নড়াচড়া না-ক'রে

তারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

'স্যাম-ইয়েপ' তখন দ্রুত এগিয়ে আসছে—সবচেয়ে উঁচু আর বড়ো পালটা কালো ছায়া ফেলেছে সমুদ্রে : পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জাঙ্কটি তাদের আধমাইলের মধ্যে চ'লে এলো। মাল্লাদের ছোটাছুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তখন ; কাপ্তেন ইন দাঁড়িয়ে আছেন সারেঙের খুপরিতে, হাল ধ'রে। হঠাৎ এমন সময় ভীষণ শোরগোল উঠলো জাঙ্কে ; একদল লোক ছুটে এলো ডেকের উপর, মাল্লাদের আক্রমণ ক'রে। ভয়ানক চ্যাঁচামেচি উঠলো 'স্যাম-ইয়েপে' : রক্ত-জল-করা ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট গর্জন, মার-মার কাট-কাট আওয়াজ, আর তারই সঙ্গে মেশা যন্ত্রণা আর হতাশা-মেশানো আর্তনাদ। তার পরেই হঠাৎ সব স্তব্ধ হ'য়ে গেলো একসময় ; সব হৈ-চৈ থেমে গেলো মুহূর্তে ; শুধু ঝপাং-ঝপাং আওয়াজ হ'তে থাকলো জাঙ্কের পাশে--বোঝা গেলো ডেক থেকে মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে জলে।

তাহ'লে কাপ্তেন ইন আর তার মাল্লারা লাও-শেনের স্যাঙাৎ নন ? বেচারা ! ওই বোম্বেটেগুলো কফিনের মধ্যে জাহাজে উঠেছিলো কেবল জাঙ্কটা একসময় দখল ক'রে নেবার জন্যে। যাত্রীদের মধ্যে যে কিন-ফোও আছে, তা দস্যুগুলো মোটেই জানতো না। কিন্তু যদি এখন জাঙ্কে তাকে তারা দেখতে পেতো তাহ'লে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে দস্যুগুলো তাদের একফোঁটাও দয়া করতো না।

'স্যাম-ইয়েপ' কিন্তু এগিয়েই এলো। চট ক'রে প্রায় তাদের উপর এসে পড়লো, ভাগ্য নেহাৎই সদয় ছিলো ব'লে পালের ছায়া পড়লো তাদের উপর। তবু তারা চট ক'রে ডুব দিলো জলের তলায়। আবার যখন মাথা তুললো জাঙ্কটি তখন পাশ কাটিয়ে চ'লে গেছে—আর তাদের কোনো ভয় নেই এখন।

জাঙ্কটির দিকে তাকিয়েছিলো ব'লে প্রথমে ভেসে-আসা মৃতদেহটা তাদের চোখে পড়েনি ; হঠাৎ চোখে পড়তেই দ্যাখে কাপ্তেন ইনের মৃতদেহ—বুকে একটা ছোরা বেঁধা। তাঁর ঢিলে পোশাকের অসংখ্য ভাঁজই তাঁকে এতক্ষণ ভাসিয়ে রেখেছে। শেষকালে যখন পোশাকটা সম্পূর্ণ ভিজে গেলো, তিনি ডুবে গেলেন চিরদিনের মতো—আর-কোনো দিনই ভেসে উঠবেন না এই সলিলশয্যা থেকে। সেই সৌম্য সদাহাস্যময় মানুষটি নেহাৎই দুর্ভাগ্যবশত চিন সমুদ্রের নৃশংস ও দুর্ধর্ষ বোম্বেটেদের হাতে নিহত হ'য়ে গেলেন।

দশ মিনিট পরেই জাঙ্কটি পশ্চিম দিগন্তে মিলিয়ে গেলো—আর সেই ধূ-ধু জলের মধ্যে বিপুল সমুদ্রে ভেসে চললো তারা চারজন : কিন-ফো, ক্রেগ, ফ্রাই আর অবসন্ন সুন।

২০

সাগরের নেকড়ে

তিন ঘণ্টার আগেই সকাল হ'য়ে এলো, আর ভালো ক'রে আলো ফোটবার আগেই জাঙ্কটি পুরোপুরি অদৃশ্য হ'য়ে গেলো দিগন্তে। যদিও তারাও সেই দিকেই যাচ্ছিলো, তবু আগেই

ন-দশ মাইল এগিয়ে গিয়েছিলো ব'লে 'স্যাম-ইয়েপে'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'লো না ।

সুতরাং সেই দিক থেকে বিপদ আসার সম্ভাবনা আপাতত অন্তত নেই ; তাই ব'লে অবস্থাটা মোটেই কিন্তু সন্তোষজনক নয় । যতদূরে চোখ যায় ডাঙার কোনো চিহ্নও চোখে পড়ে না ; কোথায় যে আছে—পে-চি-লি উপসাগরে, না পীত সমুদ্রে—তাও এখনো ঠিক ক'রে বুঝে উঠতে পারেনি তারা ।

অবশ্য জাঙ্কটা যে-দিকে গেছে, সেই দিকে গেলেই যে একসময়-না-একসময় ডাঙা পাওয়া যাবে তাতে অন্তত সন্দেহ নেই ; অল্প-অল্প হাওয়ায় কেঁপে উঠছে এখন সমুদ্র, কাজেই ওই পশ্চিম দিকেই পাল টাঙিয়ে এগুতে থাকা ভালো ।

দশ ঘন্টা ধ'রে কোনো খাদ্য পড়েনি পেটে ; এবার এই তীব্র ক্ষুধার কিঞ্চিৎ উপশম ক'রে নেয়াও উচিত ।

'প্রাতরাশটা ভালোই হবে আমাদের,' ক্রেগ আর ফ্রাই জানালো ।

ছোটোহাজরির প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলে কিন-ফো । সুন তো আহ্লাদে জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো একটু চেটেই নিলে : ছোটোহাজরির কথায় এবার কিয়ৎক্ষণের জন্যে হাঙরের খাদ্য হবার ভয়টা তার চ'লে গেলো ।

আবার সেই জলরোধক থলিটার প্রয়োজন পড়লো । ফ্রাই তার ব্যাগ থেকে খানিকটা রুটি আর কিঞ্চিৎ শুকনো মাংস বের ক'রে আনলো : খাদ্য-তালিকা অবিশ্যি কোনো নামজাদা চিনে রেস্তোরাঁর মতো বিপুল ও বিচিত্র নয়, তবু পরমানন্দে তা-ই তারা গলাধঃকরণ করলে ।

ওই থলির মধ্যে আরো-একদিনের উপযোগী খাদ্যাদি ছিলো : ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের ধারণা তার মধ্যেই তীরে পৌঁছে যাবে । কিন-ফো অবিশ্যি তাদের এই অতি-আশার কারণটি জানতে চাইলো ; উত্তরে তারা বললে যে আবার কপাল ফিরে যাচ্ছে ব'লেই নাকি তাদের মনে হচ্ছে : ওই ভয়ংকর জাঙ্কের হাত থেকে তারা অনায়াসে রেহাই পেয়েছে । আর কিন-ফোর প্রহরায় নিযুক্ত হবার সম্মান লাভ করার পর থেকে এ-রকম নিরাপদ অবস্থায় নাকি কোনোদিনই তারা ছিলো না । 'জগতের সব তাই-পিংও যদি একযোগে চেষ্টা ক'রে তাহ'লেও তারা এখানে আপনাকে খুঁজে পাবে না,' বললো ক্রেগ । 'আর আপনি যে দু-লাখ ডলারের সমান,এ-কথাটা মনে রাখলে বলতে হয় আপনি বেশ ভালোই ভেসে যাচ্ছেন জলে', যোগ করলো ফ্রাই ।

কিন-ফো হেসে ফেললো । 'আমি যে ভেসে যেতে পারছি, সে তো আপনাদেরই সৌজন্যে । আপনারা না-থাকলে কাপ্তেন ইনের মতোই দুর্দশা হ'তো আমার ।'

মস্ত এক টুকরো রুটি গিলতে-গিলতে সুন বললে, 'আমার অবস্থাও কি তার চেয়ে খুব-কিছু ভালো হ'তো ?'

'কিন্তু আপনাদের এত কষ্ট বৃথা যাবে না,' কিন-ফো বললে, 'আপনাদের কাছে আমার যে কত ঋণ তা আমি কিছুতেই ভুলবো না ।'

'আমাদের কাছে আপনার কোনো ঋণই নেই,' বললে ক্রেগ, 'আমরা সেণ্টেনারিয়ানের ভৃত্য মাত্র ।'

'আর আমাদের একমাত্র আশা এই যে,' ফ্রাই যোগ ক'রে দিলে, 'সেণ্টেনারিয়ান যাতে

কোনোকালে আপনার কাছে ঋণী না-থাকে ।'

কিন্তু স্বার্থ বা উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেন কিন-ফো তাদের জ্বলন্ত -প্রবল অনুগত্য দেখে মুগ্ধ না-হ'য়ে পারলো না ।'এ-বিষয়ে আমরা বরং পরে আলোচনা করবো,' সে বললে, 'লাও-শেনের কাছ থেকে একবার চিঠিটা ফেরৎ পেয়ে নিই—'

ক্রেগ আর ফ্রাই কেবল মুচকি হেসে নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়াচায়ি ক'রে নিলে, কোনো কথা বললো না ।

ঠাট্টা ক'রে সুনকে চা নিয়ে আসতে বললে কিন-ফো । 'এই-যে, দিচ্ছি,' সুন তার প্রভুর রসিকতার উত্তরে কিছু ব'লে-ওঠবার আগেই বললে ফ্রাই ।

আবার তার থলি খুলে সে ছোট্ট একটা যন্ত্র বার ক'রে আনলো—বোয়াতোঁর পোশাকের অচ্ছেদ্য অংশ ব'লে যন্ত্রটা গণ্য হ'তে পারে—যুগপৎ বাতি আর ছোট্ট স্টোভের কাজ চলে এটা দিয়ে । একটা কর্কের গায়ে বসানো উপরে-নিচে ছিপি লাগানো পাঁচ-ছ ইঞ্চি লম্বা একটা ফাঁপা নলচে—অনেকটা হামামগুলোয় যে ভাসন্ত তাপমান যন্ত্র দেখা যায়, তার মতো দেখতে । জলের উপর সেটা রেখে, ফ্রাই দু-হাতে দুটো ছিপি ঘুরিয়ে দিতেই নলচেটার ভিতর থেকে নীল রঙের অগ্নিশিখা বেরিয়ে এলো—বেশ বড়ো শিখাটা, মন্দ তাপ ছড়ায় না ।'এই রইলো আপনার উনুন,' বললে ফ্রাই ।

সুন তার চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না । রগড়ে নিয়ে ভালো ক'রে দেখে ব'লে উঠলো, 'আরে ! আপনি দেখছি জলেই আগুন জ্বালিয়ে দিলেন !'

'হ্যাঁ, জল আর ক্যালশিয়াম ফসফারেট (প্রস্ফুরক খড়ি) মিশিয়েই এই আগুন বানিয়েছে ও,' বললে ক্রেগ ।

যন্ত্রটা আসলে এমনভাবে তৈরি হয়েছে যাতে প্রস্ফুরক খড়ির অনন্য বৈশিষ্ট্যটি কাজে লাগানো যায় : জলের সংস্পর্শে এলেই প্রস্ফুরক খড়ি প্রস্ফুরক উদ্‌জানের জন্ম দেয় আর এই গ্যাস স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্ব'লে ওঠে : জলে বা বাতাসে এই জ্বলন্ত গ্যাস কিছুতেই নেভে না । সেই জন্যই আজকাল উন্নত মানের সব জীবন-তরীতেই আলো জ্বালাবার জন্য এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়—জল ছোঁবার সঙ্গে-সঙ্গেই দীর্ঘ অগ্নিশিখা জ্ব'লে ওঠে জীবন-তরীতে—আর তার ফলে কোনো মিশকালো রাতেও কেউ জাহাজ থেকে জলে প'ড়ে গেলেও তক্ষুনি সেই শিখা দেখে তার উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যায় ।

সেই জ্বলন্ত উদ্‌জানের উপর ক্রেগ পানীয় জলে-ভরা একটা ছোটো সসপ্যান ধ'রে রইলো : এইসবও ওই থলি থেকেই পাওয়া । জল ফুটে উঠতেই চায়ের কেৎলিতে ঢেলে দিলে সে, আগেই অবশ্য কিছু চা-পাতা সেখানে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো । সবাই এবার চা-পাতা ভিজোনো জল পান করলে : এমনকী কিন-ফো আর সুনও, চিনে কায়দায় প্রস্তুত না-হওয়া সত্ত্বেও, এই চায়ে কোনো দোষ খুঁজে পেলে না । বরং এই চা যেন তাদের ছোটো হাজরিকে একেবারে সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ক'রে দিলে । এখন কোথায় আছে তারা, সেটাই কেবল জানতে হবে এবার । অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এই বোয়াতোঁ-পোশাকে একটি ক'রে সেক্সটান্ট ও ক্রনোমিটার থাকবে : তখন হয়তো জাহাজডুবির পরে তারা কোথায় আছে নাবিকদের এটা বুঝতে কোনো অসুবিধেই হবে না ।

ছোটোহাজরির পর দলটা আবার পাল তুলে দিয়ে এগিয়ে চললো । হাওয়া আর বন্ধ

হ'লো না, কয়েক ঘণ্টা ধ'রে ক্রমাগত ব'য়ে চললো, হাল ধ'রে দিক-নিয়ন্ত্রণ করার কোনো চেষ্টাই করতে হ'লো না তাদের—বাতাসই তাদের পশ্চিম দিকে নিয়ে চললো। এইভাবে চিৎ হ'য়ে শুয়ে ভেসে-ভেসে যাচ্ছে ব'লে বড্ড ঘুম পাচ্ছিলো তাদের : কিন্তু এ-অবস্থায় ঘুমের কথা চিন্তা করাও উচিত নয়—ঘুম-ঘুমভাবটা কাটিয়ে ওঠবার জন্য ক্রেগ আর ফ্রাই শৌখিন সাঁতারুদের মতো চুরুট ধরিয়ে টানতে লাগলো।

বেশ কয়েকবার নানা রকম জলজন্তুর লম্ফঝম্ফ সুনকে একেবারে ভয়ে আধমরা ক'রে রেখে গেলো ; তাদের বেশির ভাগই অবশ্য নিরীহ শুশুক, পিঠ বাঁকিয়ে জলের উপর ধনুকের ছিলার মতো উঠেই আবার ভুউশ ক'রে ডুবে গেলো তারা — বোধহয় তাদের দেশে এই অদ্ভুত আগন্তুকদের দেখে কিঞ্চিৎ ভীত আর বিস্মিতই হ'লো তারা। শুশুকরা কখনো একা থাকে না, ঝাঁক বেঁধে তীরের মতো ছুটে আসে তারা, আর তাদের মস্ত চিক্কণ-মসৃণ দেহ জলের তলায় পোকরাজের মতো চকচক ক'রে ওঠে ; কখনো-বা জলের উপর পাঁচ-ছ ফিট লাফিয়ে উঠছে তারা, শূন্যেই ডিগবাজি খাচ্ছে সার্কাসের জীবের মতো—আর তাতেই তাদের পেশীর নমনীয়তা স্পষ্ট হ'য়ে চোখে পড়ছে। প্রচণ্ড তাদের বেগ, দ্রুতগতিসম্পন্ন কোনো জাহাজের চেয়েও অনেক বেশি — দেখে কিন-ফো মনে-মনে ভাবলে এই লম্ফঝম্ফ ঝাঁকুনি ও ডিগবাজি সত্ত্বেও এরা যদি তাকে গুন টেনে নিয়ে যেতো, তাহ'লে বেশ ভালোই হ'তো।

দুপুরবেলার দিকে হাওয়া যেন দপ-দপ করলো খানিকক্ষণ, তারপর একেবারেই বন্ধ হ'য়ে গেলো। ছোটো পালগুলি ঝুলে লেপ্টে গেলো মাস্তুলের গায়ে ; পালে কোনো টানটানভাব রইলো না, পিছনে রইলো না কোনো ফেনিল শাদা রেখা।

'ভারি মুশকিল হ'লো তো,' বললে ক্রেগ।

'হ্যাঁ, মস্ত ঝামেলায় পড়া গেলো,' সায় দিলে ফ্রাই।

শেষটায় তারা একেবারে নিশ্চল হ'য়ে গেলো। নামানো হ'লো মাস্তুল, গোটানো হ'লো পাল, আর তারা সবাই এবার খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকালো।

এখনো দিগন্তরেখা একেবারেই ফাঁকা। না দেখা গেলো কোনো উড্ডীন পাল, না বা ধোঁয়ার রেখা। প্রখর সূর্য জ্বলছে মাথার উপরে, হাওয়া থেকে সব আর্দ্রতা শুষে নিয়েছে সে—পাৎলা ও তনুভূত হ'য়ে গেছে হাওয়া : জমাট আঠার ডবল আস্তরন না-থাকলেও এই জলে তাদের মোটেই ঠাণ্ডা লাগতো না।

পর-পর যা ঘ'টে গেছে সম্প্রতি, তাতে ক্রেগ আর ফ্রাই মনে-মনে বেশ উৎফুল্ল হ'য়েই উঠেছিলো, কিন্তু এবার খানিকটা অস্বস্তি বোধ না-ক'রে পারলো না। গত ষোলো ঘণ্টায় তারা কতদূর এসেছে, তারা তার কিছুই জানে না : কোথাও কোনো ডাঙা বা চলন্ত জাহাজের চিহ্নও কেন দেখা যাচ্ছে না, এই ব্যাপারটা ক্রমশ যেন রহস্যময় ও ব্যাখ্যাতীত হ'য়ে উঠছে। তবু তারা কিংবা কিন-ফো এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয় : আরেকটি দিন চালিয়ে দেবার মতো খাদ্য আছে সঙ্গে—আবহাওয়াও বেশ ভালোই—হঠাৎ ঝড় ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ; তার ঠিক করলো দাঁড় বেয়েই এবার এগুবে। যাত্রার সংকেত করা হ'লো—কখনো চিৎ-সাঁতার দিয়ে কখনো বুক-সাঁতার দিয়ে ওই দাঁড়ের সাহায্যে তারা পশ্চিমদিকে এগিয়ে চললো।

জোরে কিন্তু এগুতেই পারলো না। প্রথমত কায়িক শ্রমের অভ্যেস নেই তাদের, দ্বিতীয়ত ওভাবে বৈঠা চালানোও খুব ক্লান্তিকর। সুন বেচারার তো নালিশের অবধি রইলো না ; সে এতই পিছিয়ে পড়লো যে সে যাতে তাদের ধ'রে ফেলতে পারে অন্যদের বারে-বারে থেমে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে হ'লো। কিন-ফো তাকে ধমকালো, গালি-গালাজ দিলো, এমনকী ভয়ও দেখালো : কিন্তু সবই বৃথা হ'লো ; ওই টুপির তলার তার বেণী নিরাপদ, এটা সুন জানে ; কিন্তু তবু ওরা যদি তাকে ফেলেই চ'লে যায় এই ভয়ে সে খুব একটা পিছিয়ে পড়তেও অবশ্য সাহস করলো না কক্‌খনো।

দুটো নাগাদ কয়েকটা গাংচিল দেখতে পেলো তারা ; এটা ঠিক যে মাঝে-মাঝে গাংচিলেরা সমুদ্রের উপর অনেক দূর উড়ে চ'লে আসে, তবু তাদের দেখে খানিকটা ভরসা পেলো তারা : ডাঙা হয়তো কাছেই আছে, গাংচিলের আগমন হয়তো তারই পূর্বাভাস।

ঘণ্টাখানেক পরে তারা একরাশ সিন্ধু-শৈবালের জালে জড়িয়ে পড়লো : অনেক চেষ্টাচরিত্র ক'রে তবে তার হাত থেকে উদ্ধার পেলে তারা ; মাছ জালে পড়লে যেমন ছটফট ক'রে চারদিকে চেষ্টা ক'রে দ্যাখে কোনোদিক দিয়ে বেরুনো যায় কি না, তাদের অবস্থাও অনেকটা সেই রকমই হ'লো : শেষটায় মুক্তি পাবার জন্য ছুরি ব্যবহার করতে হ'লো তাদের। আর এই অভাবিত গোলযোগে আধঘণ্টা সময় নষ্ট হ'লো তাদের, আর মাঝখান থেকে খামকা আরো ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো।

চারটের সময় অবসাদে নির্জীব হ'য়ে তাদের আরেকবার থামতে হ'লো। হঠাৎ হাওয়া এলো আবার সজোরে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাতাস এবার এলো দক্ষিণ দিক থেকে। যেহেতু পালকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো উপায় নেই, সেই জন্য তারা পাল খাটাতেই সাহস পেলে না : কে জানে, শেষকালে উত্তরমুখো যেতে-যেতে পশ্চিমদিকে যতটুকু এগিয়েছে তাও হয়তো জলাঞ্জলি যাবে।

থেমে রইলো তারা অনেকক্ষণ। অবসন্ন হাত-পাকে বিশ্রাম দেয়া ছাড়াও কিঞ্চিৎ খাদ্যগ্রহণ করলে তারা, কিন্তু প্রাতরাশের মতো তেমন উৎফুল্ল হ'লো না এই সান্ধ্যভোজ। গতিক বিশেষ সুবিধের নয় এখন ; রাত্রি আসন্ন, দক্ষিণা পবনের বেগও বর্ধমান : এই অবস্থায় ঠিক যে কী করা উচিত, তা কেউ বুঝে উঠতে পারলো না।

কিন-ফো বিরস বদনে তার বৈঠায় হেলান দিয়ে ভেসে রইলো ; মুখ বোজা, ভ্রূ কুঞ্চিত, বিপদের আশঙ্কার চেয়েও বিমূঢ় ভাবটাই তাতে বেশি। সুন ফ্যাঁচফ্যাঁচ ক'রে নাকি সুরে জগৎসংসারের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে চললো—হাঁচির দমক শুরু হ'লো তার—যেন ইনফ্লুয়েনজা হয়েছে। ক্রেগ আর ফ্রাই বুঝতে পারছিলো যে ওই ঝুলি থেকে আশু কর্তব্য নির্ধারণ ক'রে একটা কিছু বার ক'রে ফেলা উচিত —কিন্তু এ-অবস্থায় কী করবে তা-ই বুঝতে পারছিলো না।

এমন সময়ে দৈবাৎ তাদের সব বিমূঢ়তার অবসান হ'য়ে গেলো। পাঁচটা নাগাদ দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে তারা দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো : 'পাল দেখা যাচ্ছে! পাল!'

তাদের ভুল হয়নি। সত্যি, প্রায় মাইল তিনেক দূরে থেকে একটা পাল-তোলা জাহাজ তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে—যদি হঠাৎ গতিপথ না-বদলায় তাহ'লে একেবারে তাদের

গা ঘেঁষেই যাবে জাহাজটা। আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না, এক্ষুনি তার দিকে ধাবমান হ'তে হবে। কিছুতেই মুক্তির উপায় ফশকে ফেলা চলবে না। তক্ষুনি দাঁড় বেয়ে-বেয়ে তারা রওনা হ'য়ে পড়লো : আর নতুন হাওয়ায় ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো ওই জাহাজ। আসলে জাহাজ নয়, মস্ত বড়ো একটা জেলে ডিঙি, কিন্তু তা থেকে একটা জিনিশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে ডাঙা আর খুব দূরে নয়, কারণ চৈনিক মৎস্যজীবীরা কদাচিৎ দূর সমুদ্রে মাছ ধরতে আসে।

অন্যদের তাড়াতাড়ি আসতে ব'লে কিন-ফো সর্বশক্তি দিয়ে বৈঠা চালাতে লাগলো, ছোটো নৌকোর মতো দ্রুত ছিটকে যেতে লাগলো যেন সে ; সুনও—সবাই যাতে তাকে ফেলে রেখেই না-চলে যায় এই ভয়ে—এত জোরে তার দাঁড় ব্যবহার করলো যে বেগে প্রভুকে বুঝি ছাড়িয়েই গেলো সে।

আর আধমাইল গেলেই জেলে-নৌকোর কাছে গিয়ে পৌঁছুবে তারা : এখনো যদি জেলেদের কেউ তাদের লক্ষ ক'রে না-থাকে, তখন তাদের হাঁক ডাক কানে যাবে নিশ্চয়ই। একটা ভয় অবশ্য আছে : জলের মধ্যে এমন কিম্ভূত দর্শন চারমূর্তিকে দেখে তারা না আবার ভয় পেয়ে অন্য দিকে নৌকো ছুটিয়ে দেয়। কিন্তু চেষ্টা তো তাদের করতেই হবে—হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না।

প্রায় যখন কাছে এসে পড়েছে, তখন সুন—সে-ই উৎসাহে ও ভয়ে সকলের আগে ছিলো তখন—বিষম আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলো। 'হাঙর ! হাঙর !'

এবার আর এটা কোনো মিথ্যে আশঙ্কা নয়। দশ-বারো হাত দূরেই হাঙরের পাখনা দেখা গেলো : যে-সে হাঙর নয়, নেকড়ে হাঙর বলে একে ; চিন সমুদ্রের এই হিংস্র জীবটির জল-রাক্ষস নাম যে মোটেই বেমানান নয় তা সমুদ্রের এই ভীষণ নেকড়েটিকে দেখেই বোঝা গেলো।

'ছুরি বার করো, ছুরি বার করো,' চেঁচিয়ে উঠলো ক্রেগ আর ফ্রাই।

তক্ষুনি সবাই ছুরি বার ক'রে নিলে, কিন্তু সুন বিচক্ষণতাকেই সাহসের অন্য নাম ভেবে চটপট পিছিয়ে চ'লে গেছে। হাঙরটা তখন দ্রুত এগিয়ে আসছে তাদের দিকে ; এক মুহূর্তের জন্য তার সম্পূর্ণ দেহটা জলের উপর ভেসে উঠলো : সবুজ ফুটফুটওলা সেই বিকট দেহটা মুহূর্তের জন্য পুরো দেখতে পেলে তারা। অন্তত ষোলো ফুট হবে সে লম্বায়—সে যে জলের ভীষণ রাক্ষস, তাতে সত্যি কোনো সন্দেহ রইলো না।

ধনুকের ছিলার মতো পিঠটা বাঁকিয়ে কিন-ফোর দিকে ছিটকে আসার উদ্যোগ করলে হাঙরটা ; কিন-ফো মাথা গরম করলে না মোটেই, অত্যন্ত শান্তভাবে দাঁড়টায় ভর দিয়ে যেন লাফিয়ে তার সামনে থেকে চ'লে গেলো। ততক্ষণে ক্রেগ আর ফ্রাইও কাছে এসে পড়েছে : আত্মরক্ষা বা আক্রমণ—দুয়েরই জন্য তৈরি তারা তখন।

হাঙরটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ততক্ষণে, কিন্তু আবার সে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হ'য়ে নিলো। তার বিকট ও প্রকাণ্ড মুখে নিষ্ঠুর দাঁতগুলো হিংস্র ক্ষুধায় চকচক ক'রে উঠেছে। কিন-ফো আবারও তার দাঁড়ে ভর দিয়ে লাফাবার চেষ্টা করতে গেলো, কিন্তু হাঙরের চোয়ালে গিয়ে পড়লো দাঁড়টা, আর মটাৎ ক'রে দু-টুকরো হ'য়ে ভেঙে গেলো। আবার পিঠ বাঁকিয়ে হাঙরটা তার শিকারের দিকে ছুটে আসবে, এমন সময় জল রক্তরাঙা

হ'য়ে উঠলো। ক্রেগ আর ফ্রাই তাদের তীক্ষ্ণ ও মস্ত মার্কিন ছুরি দিয়ে এই ভীষণ জন্তুর শক্ত চামড়া ভেদ করতে পেরেছে অবশেষে। তার বিকট মুখটা হাঁ হ'লো একবার ; তারপর দাঁতের পাটির উপর দাঁতের পাটি এসে পড়লো প্রচণ্ড জোরে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করছে হাঙরটা, ল্যাজ ঝাপটাচ্ছে প্রবলভাবে, আর তারই এক ঝাপটায় ফ্রাই প্রায় দশ ফুট দূরে ছিটকে পড়লো। ক্রেগ ব্যথায় আর্তনাদ ক'রে উঠলো, যেন ওই প্রচণ্ড ল্যাজের ঝাপটা তারই গায়ে পড়েছে ; ফ্রাই কিন্তু মোটেই জখম হয়নি : জমাট আঠার পোশাক তাকে আহত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে : দ্বিগুণ উৎসাহে সে আবার ছুরি হাতে এগিয়ে এলো আক্রমণ করতে।

হাঙরটা তখন যন্ত্রণায় বারে-বারে পাক খাচ্ছে। কিন-ফো তার ভাঙা দাঁড়টা হাঙরের চোখে চেপে ধরার চেষ্টা করলো : এত কাছে ছিলো যে আরেকটু হ'লে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যেতো সে, কিন্তু তবু প্রাণপণে দাঁড়টা সে তার চোখে বিঁধিয়ে দিয়ে চেপে রইলো, আর ক্রেগ আর ফ্রাই তার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলো আপ্রাণ। অবশেষে তাদের চেষ্টা সফল হ'লো বোধহয়, কারণ একবার প্রচণ্ডভাবে ছটফট ক'রেই হাঙরটা ওই রাঙা জলে ডুবে গেলো।

'হুরে ! হুরে !' বিজয়োল্লাসে ছুরি নাচাতে-নাচাতে চেঁচিয়ে উঠলো ক্রেগ আর ফ্রাই।

'ধন্যবাদ !' রুদ্ধশ্বাস কিন-ফো কেবল তার কৃতজ্ঞতা জানাতেই পারলে, 'ধন্যবাদ !'

'ধন্যবাদের কোনো দরকার নেই,' বললে ক্রেগ, 'ওই রাক্ষুসে জানোয়ারের মুখে দু-লাখ ডলার চ'লে যাক, এটা কে চায় !'

ফ্রাই সোৎসাহে তার কথা সমর্থন করলে।

কিন্তু সুন তখন কোথায় ? ভিতুর ডিম, সবেগে বৈঠা চালিয়ে সে তখন জেলেডিঙির অতি কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু তার এত সাবধানতা বুঝি ক্রন্দনেই শেষ হয় !

ধীবরেরা হঠাৎ নৌকোর কাছে অমন অদ্ভুত একটা জলজন্তু দেখে ধরবার জন্য শশব্যস্ত হ'য়ে উঠলো ; কোনো সীল মাছ বা শুশুক যেভাবে ধরে, সেইভাবেই তারা ওপর থেকে মস্ত বঁড়শিওলা একটা দড়ি ফেলে দিলে জলে, বঁড়শিটা সুনের কোমরবন্ধে আটকে গেলো, তারপর একটু পিছলে গিয়ে তার ওই জমাট আঠার পোশাক চিরে পিঠ আঁচড়ে দিলো। কেবল ওই পাজামাটাই আছে তখন তার : মুণ্ডু রইলো জলের তলায়, পা-দুটো শূন্যে, আর ওই অবস্থায় বঁড়শি-বেঁধা সুন ডিগবাজি খেলো জলে।

কিন-ফো, ক্রেগ আর ফ্রাই ততক্ষণে কাছে পৌঁছেছে ; স্পষ্ট সুবোধ্য চিনে ভাষায় তারা ধীবরদের ডাকতে লাগলো। 'কথা-কওয়া' সীল মাছ দেখে ধীবরদের মধ্যে তো বিষম আতঙ্কের সাড়া প'ড়ে গেলো। প্রথমে তারা পাল খাটিয়ে চম্পট দেবার মৎলব করলে, কিন্তু অবশেষে কিন-ফো ছোটোখাটো বক্তৃতা দিয়ে যখন তাদের বোঝাতে পারলো যে সে আসলে একজন চৈনিক মাত্র তবেই ধীবরেরা তাকে আর ওই দুই মার্কিনকে নৌকোয় তুলে নিল। তারপর সুনকে আস্তে-আস্তে টেনে তোলা হ'লো দড়ি টেনে, আর একটি ধীবর তাকে তুলে নেবার জন্য তার বেণী ধ'রে টান দিলে সজোরে। আস্ত বেণীটাই খ'শে চ'লে এলো তার হাতে, আর সুন অমনি আবার ঝপাৎ ক'রে জলে গিয়ে পড়লো। অবশেষে নানা কসরৎ ক'রে তার কোমরে দড়ি জড়িয়ে ধীবরেরা তাকে নৌকোয় তুলে আনতে পারলে।

পেটের সব লবণজল ওয়াক-ওয়াক ক'রে দেবার সময় দিলো না কিন-ফো, সুনের কাছে গিয়ে বললো : 'তাহ'লে তোর ওটা নকল বেণী ? পরচুলা ?'

'হ্যাঁ, হুজুর,' বললে সুন, 'আপনার মেজাজ তো জানতাম। আসল বেণী নিয়ে আপনার কাছে চাকরি করার সাহস ছিলো নাকি আমার !'

এমন করুণ ও কাতর গলায় সে কথাটা বললে যে কিন-ফো আর হাসি চাপতে পারলে না : অন্যদের সঙ্গে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

ধীবরদের ডেরা নাকি ফু-নিন-এই, যেখানে যাবার জন্য কিন-ফো ব্যাকুল হয়েছিলো ব'লেই এত কাণ্ড ; ফু-নিন বন্দর নাকি আর মাত্র পাঁচ মাইল দূরে, জানতে পারলো তারা।

সেদিনই সন্ধে আটটা নাগাদ তারা নিরাপদে ফু-নিন-এ অবতরণ করলে : বোয়াতোঁ পোশাক ছেড়ে আবার সাধারণ পোশাকে জেটিতে এসে পা দিলে তারা।

২১

গোয়েন্দাগিরিতে ইস্তফা

'এবার ওই তাই-পিংটির খোঁজ নেয়া যাক !' এত ধকল স'য়ে রাতটা কিন-ফো সসঙ্গী বিশ্রামেই কাটিয়েছিলো ; কিন্তু পরদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই প্রথম কথা সে বললে, 'এবার ওই তাই-পিং-এর পালা !' লাও-শেনের এক্তিয়ারের মধ্যেই আছে এখন তারা ; আজ তিরিশে জুন ; পুরো ব্যাপারটা চরম সংকটে পৌঁছেছে একেবারে। এই দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে কিন-ফো অটুট, অক্ষত ও বিজয়ী বেরিয়ে আসবে তো ? ওয়াং-এর এই নির্মম প্রতিনিধি তার বুকে চরম আঘাত বসিয়ে দেবার আগেই সে কি ওই চিঠিটা ফিরে পাবার প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবে ?

ক্রেগ আর ফ্রাই নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় ক'রে প্রতিধ্বনি তুললো : 'এবার ওই তাই-পিঙের পালা !'

আগের দিন সন্ধেবেলায় যখন ছোটো দলটি ফু-নিন-এ পদার্পণ করেছিলো, তখন তাদের ওই অদ্ভুত পোশাক ছোট্ট বন্দরটিতে বেশ সাড়া তুলে দিয়েছিলো। লোকের কৌতূহলের সীমা ছিলো না তাদের দেখে ; সরাইখানার দরজা অব্দি ছোটোখাটো একটা ভিড় তাদের অনুসরণ করেছিলো ; ক্রেগ আর ফ্রাই ভাগ্যিশ তাদের জাদুকরের ঝুলি ওরফে জল-নিরোধী থলিতে টাকাকড়ি রাখতে ভোলেনি—না-হ'লে অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় এমন পোশাক তারা কিনতো কী ক'রে ? আর চারপাশে অমন বিষম ভিড় জ'মে না-গেলে বিশেষ একটি চৈনিককে হয়তো লক্ষ করতে পারতো তারা, যে একবারের জন্যও তাদের পিছন ছাড়েনি। তাদের বিস্ময় হয়তো আরো বিপুল পর্যায়ে পৌঁছুতো যদি তারা জানতে পারতো যে সেই চৈনিকটি সারারাত ওই সরাইখানার দরজায় ব'সে পাহারা দিয়েছে, এবং শুধু তা-ই নয়, সকালবেলাতেও কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ ওই চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

যেহেতু তারা এ-সবের কিছুই জানতো না, সেইজন্য তারা সরাইখানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো তখন। যখন লোকটি এসে বললে সে এই অচেনা মুলুকে তাদের পথপ্রদর্শকের কাজ করতে চায়, তখন তাদের মনে কোনো সন্দেহই জাগলো না। চৈনিকটির বয়েস হবে ত্রিশের মতো, দেখলে মনে হয় ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না এমনি নিরীহ ও নির্বিরোধী এক সাধুপুরুষ। ক্রেগ আর ফ্রাই অবশ্য জানে যে সাবধানের মার নেই, সেই জন্য তারা জিগেশ করলো কেন এবং কোথায় সে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

'একেবারে চিনের প্রাচীর অবধি, বলাই বাহুল্য—' বললে লোকটা, 'ফু-নিন-এ যাঁরাই বেড়াতে আসেন, তাঁরা সবাই চিনের প্রাচীর দেখতে যান—আর এখানকার পথঘাট যেহেতু আমার নখদর্পণে রয়েছে, সেইজন্য আমি ভাবলুম পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে নিয়োগ করতে আপনাদের হয়তো কোনো আপত্তি থাকবে না।'

কিন-ফো মাঝে-প'ড়ে জিগেশ করলো, 'এ-অঞ্চলটা কেমন ? নিরাপদ তো ভ্রমণকারীদের পক্ষে ?' পথপ্রদর্শকটি বললে যে এখানে ভয়ের কিছু নেই—খুবই নিরাপদ জায়গা।

'লাও-শেন ব'লে একটা লোক নাকি এখানে থাকে—তুমি তার হদিশ দিতে পারবে ?' কিন-ফো জিগেশ করলে।

'ও! তাই-পিং লাও-শেনের কথা বলছেন ?' উত্তর করলো পথপ্রদর্শক, 'কিন্তু চিনের প্রাচীরের এ-পাশে তো তাকে ভয় করার কিছু নেই। চিন মুলুকে পা দেবার সাহস তার আদৌ হবে না : সে তার স্যাঙাৎদের নিয়ে মোঙ্গোল এলাকায় লুঠতরাজ ক'রে বেড়ায়।'

'শেষ কোথায় দেখা গিয়েছিলো তাকে ?' জিগেশ করলে কিন-ফো।

'ৎচিন-তাং-হোর আশপাশে—প্রাচীর থেকে মাইল কয়েক দূরে।'

'আর ফু-নিন থেকে ৎচিন-তাং-হো কদ্দুর ?

'তা প্রায় পঁচিশ মাইল হবে।'

'বেশ ; আমাকে লাও-শেনের ডেরায় নিয়ে যাবে, এই জন্য তোমাকে নিয়োগ করলুম।'

লোকটা চমকে উঠলো।

'মোটা টাকা দেয়া হবে তোমাকে এ-জন্য—ইনাম পাবে,' কিন-ফো যোগ করলো তক্ষুনি।

কিন্তু পথপ্রদর্শকটি ঘাড় নাড়লো ; স্পষ্ট বোঝা গেলো সীমান্ত পেরিয়ে এক পা যাবার মতো বুকের পাটা তার নেই। 'চিনের প্রাচীর পর্যন্ত যদি বলেন তো যেতে পারি—তার একচুলও ওদিকে নয়। প্রাণ হাতে ক'রে ওপাশে যাবার দুঃসাহস আমার নেই।'

যত টাকা চায়, দেবে—কিন-ফো তাকে জানালে ; শেষকালে অনেক উপরোধের পর হাত কচলাতে-কচলাতে লোকটার কাছ থেকে একটা অনিচ্ছুক সম্মতি আদায় করা গেলো।

মার্কিন গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে এবার কিন-ফো বললে যে ইচ্ছে করলে তারাও সঙ্গে যেতে পারে, আবার না-ও যেতে পারে—যা তাদের মন চায়।

'আপনি যেখানে যাবেন—' শুরু করলো ক্রেগ।

'আমরাও সেখানে যাবো,' শেষ করলো ফ্রাই, 'এখনো সেন্টেনারিয়ানের মক্কেলের দাম দু-লাখ ডলার।'

পথপ্রদর্শকটি যে শেষ অব্দি বিশ্বস্ত মিলেছে, এ-বিষয়ে গোয়েন্দা দুজনের আর-কোনো সংশয় ছিলো না। মোঙ্গোল দস্যুদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য চিনেরা যে বিরাট প্রাচীর তুলেছে, তার এ-পাশে অন্তত কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হ'লো না। সুনকে অবশ্য এ-কথা কেউ জিগেশই করলে না সে যাবে কিনা—তাকে তা যেতে হবেই।

যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হ'লো ; এই ছোট্ট শহরটিতে না-পাওয়া গেলো কোনো ঘোড়া, না-বা কোনো খচ্চর, না কোনো যানবাহন। তবে উট পাওয়া গেলো অনেক, মোঙ্গোল ব্যাবসাদারেরা তাদের বেসাতি নিয়ে যায় উটে ক'রেই। উটের সার নিয়ে এই ব্যাবসাদারেরা পেইচিং থেকে কিয়াচতা অবধি ঘুরে বেড়ায়, সঙ্গে যায় তাদের বিপুল মেষপাল। রুশদেশের সঙ্গে চিনের যোগসাধন ঘটায় এই উটের পালই—যদিও মোঙ্গোলরা কখনো সশস্ত্র বা দলে ভারি না-হ'লে বিশাল স্তেপভূমিতে পা দিতে চায় না। মঁসিয় দ্য বোভোয়া এই মোঙ্গোলদের সম্বন্ধে এই বর্ণনা দিয়েছেন, 'হিংস্র মানুষ এরা, অহংকারী ও দেমাকি—চিনেদের এরা ঘেন্না করে।'

শেষকালে পাঁচটা উটই কিনলে তারা—জিন-টিন সমস্ত জরুরি উপকরণ সমেত। খাদ্যসম্ভার নেয়া হ'লো সঙ্গে, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করতেও ভুললো না তারা—তারপর সব জোগাড়-যন্তর শেষ হ'লে পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে তারা বেরিয়ে পড়লো।

জোগাড়-যন্তর করতে গিয়ে এত সময় চ'লে গেলো যে বেলা একটার আগে তারা রাস্তায় নামতে পারলে না। পথপ্রদর্শকটি অবশ্য বললো যে মাঝরাতের আগেই তারা চিনের প্রাচীরের কাছে পৌঁছে যাবে—সেখানে তারা একটা সাময়িক শিবির করবে ব'লে ঠিক হ'লো। তার পরেও যদি কিন-ফো প্রাচীর পেরিয়ে ও-পাশে যেতে চায় তাহ'লে না-হয় কাল সকালে তারা সীমান্ত অতিক্রম করবে।

ফূ-নিন-এর আশপাশে জমি ঢেউয়ের মতো বন্ধুর ও অসমতল—রাস্তা গেছে ঘুরে-ঘুরে খেত-খামারের মধ্য দিয়ে : তারা যে এখনো চিন-সাম্রাজ্যের সোনার মতো জমি দিয়ে যাচ্ছে, খেতখামারগুলো তারই ইঙ্গিত ; রাস্তা থেকে হলদে ধুলো ওঠে হাওয়ায়—আকাশ পর্যন্ত যেন উঠে যায়।

উটের চলার ভঙ্গি ধীরস্থির, ছন্দোময়—দুই কুঁজের মাঝখানে বেশ আরাম ক'রে ব'সে থাকে আরোহী। এইভাবে যেতে সুনের কোনো আপত্তি নেই, বরং বেশ খুশিই হ'লো সে : এইভাবে একেবারে পৃথিবীর শেষ সীমায় যেতেও তার কোনো আপত্তি নেই। গরম অবিশ্যি প্রচণ্ড পড়েছে ; মাটি থেকে প্রতিসরিত হ'য়ে গরম হাওয়া অদ্ভুত সব মরীচিকা সৃষ্টি করেছে, রচনা ক'রে যাচ্ছে সিন্ধুবিভ্রম ; যেমন আচম্বিতে তারা দেখা দিলো তেমনি আচম্বিতেই তারা মিলিয়ে-মিলিয়ে গেলো দেখে সুনের সন্তোষের সীমা রইলো না : আরেকটি সমুদ্রযাত্রার কথা ভাবলেই আতঙ্কে ও বিভীষিকায় তার রোমকূপগুলি খাড়া হ'য়ে ওঠে।

ফূ-নিন চিনের একেবারে সীমান্তে অবস্থিত হ'লেও লোকবসতি এখানে নেহাৎ কম নয় : ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা এমনকী একেবারে মধ্য-এশিয়ার মরুভূমি পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে।

লাল আর নীল পোশাক-পরা তাতার পুরুষ ও রমণীরা খেতে-খামারে কৃষিকর্মে লিপ্ত। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে হলদে রঙের ভেড়ার পাল—তাদের লম্বা ল্যাজ বেচারা সুনকে বোধহয় ঈর্ষাতুরই ক'রে তুললো। মাথার উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কালো বাজপাখি, কোনো মেষশাবক দল ছাড়া হ'য়ে তাদের খপ্পরে একবার পড়লেই হ'লো! ব্যস, অমনি এই সমস্ত দুর্দান্ত হিংস্র শিকারি পাখি ভেড়া, হরিণ, শম্বরদের ছোঁ মেরে নিয়ে যায়—মধ্য-এশিয়ার কিরঘিজরা ডালকুত্তার বদলে অনেক সময় এ-সব শিকারি বাজ পোষে।

শিকারের কোনো অভাব নেই আশপাশে ; কারু কাছে বন্দুক থাকলে সে বুঝি কোনো অবসরই পাবে না, যদিও কোনো সত্যিকার শিকারি হয়তো সব জনার আর গমখেতে পেতে-রাখা ও-সব জাল ফাঁদ আরো-সব কৌশলকে খুব-একটা ভালো চোখে দেখবে না কখনো।

কিন-ফো আর তার সহযাত্রীরা একটানা এগিয়েই চললো ধুলো-ঝড়ের মধ্য দিয়ে : কোনো ছায়া-ভরা গাছতলা, একা খামার বাড়ি বা কোনো গ্রামেই তারা থামলো না। দূর থেকেই গ্রাম চেনা যায়, কারণ সব গ্রামেই বৌদ্ধ শ্রমণদের স্মৃতিস্তম্ভ আছে—দূর থেকেই সেগুলো চোখে পড়ে। উটগুলো একটানা লাগিয়ে চললো সার বেঁধে—একটার পিছনে আরেকটা—আর গলায় ঝোলানো গোল লাল ঝুমঝুমির তালে-তালে ছন্দোময় ভঙ্গিতে তাদের পা পড়তে লাগলো।

এ-অবস্থায় কোনো কথাবার্তা সম্ভব ছিলো না। পথপ্রদর্শকটি অত্যন্ত চাপা ও মুখবোজা—সে-ই সবসময় চললো সকলের আগেভাগে : সবসময়েই সামনে হলদে ধুলোর পরদা থাকলে কী হবে, কোন পথে যেতে হবে সে-সম্বন্ধে তার কোনো দ্বিধা বা সংশয় দেখা গেলো না : এমনকী চৌমোহানায় এসে কোনো চিহ্ন না-থাকলেও সে ইতস্তত না-ক'রে নিজের পথ চিনে নিতে পারলে। তার সততা সম্বন্ধে ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের আর-কোনো সংশয় ছিলো না ব'লে তারা এবার কিন-ফোর দিকেই মনঃসংযোগ করলে। স্বভাবতই সময় যতই কেটে গেলো, তাদের উৎকণ্ঠাও ততই বাড়তে লাগলো। এখুনি একটা এসপার ওসপার হ'য়ে যাবে—যে শত্রুর ভয়ে তাদের বুকের ধ্বকধ্বক বেড়ে যায়, এবার নিশ্চয়ই সে-একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য এসে হাজির হবে।

কিন-ফোর কিন্তু এদিকে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো উদ্বেগই ছিলো না—সে মনে-মনে বরং অতীতকেই নাড়াচাড়া ক'রে দেখছিলো। গত দু-মাসের এই একটানা বিপর্যয়ের কথা মনে পড়তেই কেমন যেন বিমর্ষ হ'য়ে পড়ছে সে। সান ফ্রান্সিসকো থেকে তার প্রতিনিধি তার সব সম্পত্তি হারাবার খবর পাঠাবার পর থেকে তার জীবনে এই-যে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে, দুর্ভাগ্য তাকে যে ভাবে তাড়া ক'রে ফিরছে লাট্টুর মতো, এটা কি একটু অদ্ভুত নয়! যখন সব সুযোগ-সুবিধে ছিলো তখন সে তার মর্যাদা বোঝেনি! এখন সেই হারানো দিনগুলোর কী-বিষম বিপরীত তার দশা। ওই চিঠিটা ফিরে পেলেই কি তার দুর্ভাগ্যের অবসান হবে? সত্যি কি শেষে লা-ওকে সে পাবে? মাধুরীর প্রতিমা সে—তার স্নিগ্ধ ও সযত্ন সান্নিধ্য তাকে কি এই বিষম দিনগুলি ভুলিয়ে দেবে? ভাবনারা তাকে কেমন যেন বিমূঢ় ক'রে দিয়ে গেলো! হায়! এখন আবার ওয়াংও নেই যে তাকে দুর্দশায় সান্ত্বনা ও পরামর্শ দেবে—তার যৌবনের বন্ধু ও চিন্তাগুরু তারই জন্য শেষকালে কিনা স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিলো!

আরো কত-কী সে ভাবতো কে জানে ! হঠাৎ তার উটটি পথপ্রদর্শকের উটের গায়ে ধাক্কা খেতেই তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেলো—আরেকটু হ'লেই একেবারে আছড়ে পড়তো সে মাটিতে ।

'কী হে ? থেমে পড়লে কেন ?' জিগেশ করলে কিন-ফো ।

'আটটা বাজে এখন,' পথপ্রদর্শকটি বললে, 'আমি বলি কি এখানে একটু থেমে আমরা নৈশভোজটা সেরে নিই । তারপর আবার না-হয় যাওয়া যাবে ।'

'কিন্তু তখন তো অন্ধকার ক'রে আসবে—', কিন-ফো আপত্তি জানালো ।

'পথ আমি কিছুতেই হারাবো না । চিনের প্রাচীর আর মাইল দশেকের বেশি দূর হবে না । আমরা বরং উটগুলোকে একটু বিশ্রাম দিই এবার ।'

এ-প্রস্তাবে কিন-ফো সম্মতি দিতেই পুরো দলটা বিশ্রাম নেবার জন্য থেমে পড়লো । পথের পাশেই একটা পোড়ো বাড়ি প'ড়ে ছিলো—তার পাশেই ছিলো ছোট্ট একটা ঝরনা—উটগুলো সেখানেই জল পাবে । তখনও অন্ধকার হয়নি । কিন-ফোরা বেশ দেখে-শুনেই ভোজ্যদ্রব্য সাজালো সামনে, বেশ তৃপ্তিসহকারেই উদরপূর্তি করলে তারা অতঃপর ।

কথাবার্তা হ'লো ভেঙে-ভেঙে । কিন-ফো দু-তিনবার লাও-শেনের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলো অবিশ্যি, কিন্তু পথপ্রদর্শকটি বারে-বারে কেবল ঘাড় নেড়ে বোঝাতে চাইলো এ-বিষয়ে সে কোনো কথা বলতে চায় না । সে শুধু তার আগের কথারই প্রতিধ্বনি করলে : লাও-শেন কদাচ চিনের প্রাচীরের এ-পাশে আসে না, যদিও তার শাগরেদরা অবিশ্যি মাঝে-মাঝে আবির্ভূত হয় । 'ভগবান বুদ্ধ আমাদের ওই তাই-পিং-এর হাত থেকে রক্ষা করুন,' এই হ'লো তার শেষ কথা ।

পথপ্রদর্শকটি যখন কথা বলছিলো, ক্রেগ আর ফ্রাই তখন ভুরু কুঁচকে ঘড়ি দেখতে-দেখতে ফিশফিশ ক'রে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছিলো । শেষকালে তারা জিগেশ করলো, 'কাল সকাল অব্দি এখানে থেকে গেলেই হয় না ?'

'এই পোড়োবাড়িতে !' পথপ্রদর্শকটির চোখ যেন কপালে উঠলো : 'তার চেয়ে খোলামেলা জায়গা ঢের ভালো । আচমকা কেউ চড়াও হ'তে পারবে না তখন ।'

'এ-কথা তো আগেই ঠিক হয়েছিলো যে আজ রাতেই আমরা প্রাচীরের কাছে পৌঁছুবো,' বললে কিন-ফো, 'সেখানেই আমি রাত কাটাতে চাই আজকে ।'

তার গলার স্বর শুনে গোয়েন্দা দুজন আর আপত্তি করতে পারলো না । সুন তো ভয়ে একেবারে আমশি হ'য়ে গেছে : প্রতিবাদ করার কোনো ক্ষমতাই তার তখন ছিলো না ।

প্রায় নটা বাজে তখন ; খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে পথপ্রদর্শক যাত্রার সংকেত করলে । কিন-ফো তার উটে উঠতে যাবে, এমন সময় ক্রেগ আর ফ্রাই তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো । 'আপনি কি লাও-শেনের খপ্পরে পড়বেন ব'লেই প্রতিজ্ঞা করেছেন ?'

'প্রতিজ্ঞাই বটে,' বললে কিন-ফো, 'যেভাবেই হোক, ওই চিঠিটা আমায় উদ্ধার করতেই হবে ।'

'মস্ত বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন কিন্তু আপনি—' তারা বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'এই যে এভাবে তাই-পিং-এর ঘাঁটিতে যাচ্ছেন, তাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা ।'

'এত দূরে এসে আর ফেরবার কোনো মানে হয় না,' কিন-ফোর গলায় কোনো অনিশ্চিতির আভাস নেই, 'আপনাদের তো আগেই বলেছি যে আপনারা ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে না-ও আসতে পারেন।'

পথপ্রদর্শকটি ততক্ষণে একটা ছোট্ট পকেটলণ্ঠন বার ক'রে জ্বালিয়েছে। ক্রেগ আর ফ্রাই আরো কাছে এগিয়ে এলো, ঘড়ি দেখলো একবার ; আবারও বললো, 'কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ঢের বুদ্ধিমানের কাজ করতেন।'

'বাজে কথা!' কিন-ফো ব'লে উঠলো, 'লাও-শেন আজও যেমন, কাল-পরশুও তেমনি বিপজ্জনক থাকবে—রাতারাতি তার বদলে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি মনস্থির ক'রে ফেলেছি : এক্ষুনি রওনা হ'য়ে পড়তে হবে আমাদের।'

তাদের কথাবার্তার শেষ দিকটা পথপ্রদর্শকটির কানে গিয়েছিলো। আগেও দু-একবার ক্রেগ আর ফ্রাই যখন কিন-ফোকে নিষেধ করতে গেছে, তার মুখে অসন্তোষের ভঙ্গি ফুটে উঠেছিলো। এবার যখন তাদের নাছোড়বান্দার মতো গাঁইগুঁই দেখলো, তখন সে আর তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারলে না।

তার এই বিরক্তির ভঙ্গিমাটি কিন-ফোর নজর কিন্তু এড়ায়নি। তার বিস্ময় আরো বেড়ে গেলো যখন তাকে উটের পিঠে উঠতে সাহায্য করতে এসে পথপ্রদর্শকটি তাকে কানে-কানে ব'লে গেলো : 'ওই লোক দুটো সম্বন্ধে সাবধানে থাকবেন!'

এ-কথার অর্থ কী, জিগেশ করতে যাচ্ছিলো কিন-ফো কিন্তু লোকটি মুখে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করতে ব'লে যাত্রার সংকেত করলে। ছোট্ট বহরটি রাতের রাস্তায় রওনা হ'য়ে পড়লো।

পথপ্রদর্শকটির ওই রহস্যময় কথাটিতে কিন-ফোর বড্ড অস্বস্তি ও খটকা লাগলো; অথচ এটাও তার আদৌ বিশ্বাস হচ্ছিলো না যে দু-মাস ধ'রে ছায়ার মতো অচঞ্চলভাবে তাকে সেবা ক'রে শেষকালে তারা তার সঙ্গে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে। কিন্তু তাই-পিংয়ের ঘাঁটিতে তাকে যেতে দিতে চাচ্ছে না কেন তারা? এই উদ্দেশ্যেই কি তারা পেইচিং থেকে বেরোয়নি? চিঠিটা কিন-ফো ফিরে পাক, এটা কি তাদেরও স্বার্থের অন্তর্ভুত নয়! সত্যি, এদের আচরণ ক্রমশই ধাঁধার মতো ঠেকেছে!

এ-সব হি টিং ছট প্রশ্ন কিন-ফো মনে-মনেই চেপে রাখলো। পথপ্রদর্শকটির উটের ঠিক পিছনেই রয়েছে সে, আর ক্রেগ আর ফ্রাই রয়েছে তার পিছনে ; কোনো কথা না-ব'লেই ঘণ্টা দু-এক একটানা গেলো তারা।

তখন মাঝরাতের আর বেশি বাকি নেই, হঠাৎ পথপ্রদর্শকটি থেমে প'ড়ে আঙুল তুলে দেখালো উত্তর দিকে : আকাশের গায়ে দীর্ঘ একটি মিশকালো রেখা ফুটে উঠেছে উত্তর দিকে—আর ওই কালো রেখার আড়াল থেকে জ্যোৎস্না-পড়া কতগুলো চকচকে পাহাড়ের চুড়ো দেখা যাচ্ছে : চাঁদ অবশ্যি তখনো ওঠেনি—এখনো দিগন্তের আড়ালে ঢাকা প'ড়ে আছে চাঁদের টুকরো।

'মহাপ্রাচীর!' বললে পথপ্রদর্শকটি।

'আজ রাতেই প্রাচীরটা পেরিয়ে যাবো কি আমরা?' কিন-ফো জিগেশ করলে।

'আপনি যদি বলেন, তাহ'লে যাবো নিশ্চয়ই।

'তাহ'লে তা-ই হোক !'

'আমি তাহ'লে আগে গিয়ে পথঘাট দেখে আসি,' পথপ্রদর্শকটি বললে, 'যতক্ষণ-না ফিরে আসি, ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করুন ।'

উটগুলো সব থেমে পড়লো, মোড় ঘুরে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো পথপ্রদর্শকটি । ক্রেগ আর ফ্রাই এগিয়ে এসে কিন-ফোর কাছে দাঁড়ালো ।

'আপনার দেখাশুনা করবার ভার পাবার পর থেকে আমাদের কাজকর্মে আপনি তুষ্ট হয়েছেন তো ?' এক নিশ্বাসে তারা জিগেশ করলে ।

'নিশ্চয়ই ।'

'তাহ'লে দয়া ক'রে এই মর্মে এই কাগজটায় দস্তখৎ ক'রে দেবেন কি যে আপনার তদারকি করার সময় আমাদের আচার-আচরণে আপনি অতীব সন্তোষ লাভ করেছেন ?'

ক্রেগ তার নোটবইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে হতভম্ব কিন-ফোর দিকে বাড়িয়ে ধরলো ।

'প্রশংসাপত্রটা কর্তাকে দেখালে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন,' ফ্রাই বিশদ করলো বক্তব্য ।

'আমার পিঠটাকে টেবিল ক'রে ওখানে রেখে লিখুন,' ব'লে ক্রেগ কুঁজো হ'য়ে পিঠ বাড়িয়ে দিলো তার সামনে ।

'আর আপনার নাম দস্তখত করার জন্য এই যে কালিকলম—' যোগ করলো ফ্রাই।

কিন-ফো হেসে ফেললো ; সই করতে-করতে বললো, 'কিন্তু এত রাতে হঠাৎ এই অনুষ্ঠান কেন ?'

'কারণ আর দু-এক মিনিটের মধ্যেই আপনার সেণ্টেনারিয়ানের বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'য়ে যাবে,' বললে ক্রেগ ।

'তখন আপনি আত্মহত্যা করুন বা বধ হ'তে যান—আমাদের তাতে কোনো আপত্তি নেই,' বললো ফ্রাই ।

কিন-ফো একেবারে স্তম্ভিত । অত্যন্ত মৃদু, স্পষ্ট ও অনুত্তেজিত স্বরে বললেও তাদের কথার একবর্ণও সে বুঝতে পারছিলো না । হঠাৎ পুবদিকে এমন সময় চাঁদ উঠে এলো ।

'ওই যে, চাঁদ উঠেছে !' ব'লে উঠলো ফ্রাই ।

'আজ তিরিশে জুন তার মাঝরাতে ওঠার কথা,' বললে ক্রেগ ।

'আপনার বিমার মেয়াদ বাড়ানো হয়নি—দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেননি আপনি,' বললে ফ্রাই ।

'সেই জন্যে,' ক্রেগ বুঝিয়ে বললো, 'আপনি আর সেণ্টেনারিয়ানের মক্কেল নন এখন ।'

'শুভরাত্রি,' বিনীতভাবে বিদায় জানালো ফ্রাই ।

'শুভরাত্রি,' ক্রেগও সমান সৌজন্য সহকারে প্রতিধ্বনি তুললো ।

তারপরেই গোয়েন্দা দু-জন তাদের উটের মুখ উলটো দিকে ঘুরিয়ে কিন-ফোকে হতবাক, বিমূঢ় ও স্তম্ভিত ক'রে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো ।

আর তাদের উটের পায়ের শব্দ মেলাবার আগেই রে-রে করে এসে একদল লোক চড়াও হ'লো কিন-ফোর উপরে, তাদের পুরোভাগে ছিলো স্বয়ং পথপ্রদর্শকটি । সুন অসহায়

কিন-ফোকে ফেলে রেখেই পালাতে চাচ্ছিলো, কিন্তু লোকগুলো তাকেও বাদ দিলো না।

পর মুহূর্তেই প্রভু-ভৃত্য দুজনকে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'লো মহা-প্রাচীরের তলায় একটা ছোটো চোর-কুঠুরির কাছে : তারা ভিতরে ঢুকতেই তাদের পিছনে দরজাটি সশব্দে বন্ধ হ'য়ে গেলো।

২২

আবার শাংহাই

চিনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন সম্রাট তিন-চি-হুয়াং—সেই তৃতীয় শতাব্দীতে ; লম্বায় প্রায় ১৪০০ মাইল—লিয়াও-তং উপসাগর থেকে শুরু হ'য়ে কান-সু প্রদেশ পর্যন্ত গেছে, তারপর ক্রমশ সরু হ'য়ে মিলিয়ে গেছে। সারি-সারি গেছে দুর্গপ্রাচীরের ডবল দেয়াল—পঞ্চাশ ফুট উঁচু আর কুড়ি ফুট চওড়া একেকটা অংশ প্রাচীর থেকে ঠেলে বেরিয়েছে ; নিচের দিকটা গ্র্যানাইট পাথরের, উপরের দিকটা ইট দিয়ে তৈরি, চিন-রুশ সীমান্ত ধ'রে যে-গিরিশ্রেণী গেছে, এই প্রাচীর গেছে তারই গা বেয়ে। চিনের দিকে দেয়ালটা এখন জীর্ণ হ'তে চলেছে, কিন্তু যে-পাশটা মাঞ্চুরিয়ার দিকে, তা এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে—সেই দুর্ধর্ষ ঘুলঘুলির সারি এখনো আছে, যার ভিতর থেকে গুলি-গোলা ছোঁড়া হ'তো।

এই দুর্গপ্রাচীর কেউ রক্ষা করে না আজকাল—না-কোনো সেনাবাহিনী, না-কোনো গোলন্দাজ দল। রুশী, তাতার, কিরঘিজ আর চৈনিক—সবাই অবাধে এখান দিয়ে যাতায়াত করতে পারে ; তাছাড়া এই দেয়াল মোঙ্গোল ধুলোর ঝড়কেও কোনো বাধা দিতে পারে না—কখনো-কখনো হাওয়া এমনকী রাজধানী পর্যন্ত রাঙা ধুলো উড়িয়ে নিয়ে আসে।

একরাশ খড়ের উপর একটা হতচ্ছাড়া রাত কাটাবার পর কিন-ফো আর সুনকে পরদিন সকালবেলায় এইসব পরিত্যক্ত ও নিরিবিলি প্রাচীরের থামের তলা দিয়ে জোর ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'লো। বারো জনের একটা দল তাদের নিয়ে যাচ্ছে ; লোকগুলো যে লাও-শেনেরই স্যাঙাৎ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে-পথদর্শকটি তাদের অ্যাদ্দুর নিয়ে এসেছে, তার আর কোনো পাত্তা নেই ; এটা ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো যে সে দুরভিসন্ধিবশতই তাদের এই বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে গেছে—ব্যাপারটা মোটেই কোনো দৈবদুর্ঘটনা নয়। মহাপ্রচীরের ওপাশে যাবে না ব'লে বদমায়েশটা যে গাঁইগুঁই করেছিলো, তা যে আসলে সন্দেহ না-জাগাবার একটা ফন্দি মাত্র—এটা এখন আর বুঝতে অসুবিধে হ'লো না ; সেও যে তাই-পিং-এর হুকুমই তামিল করছিলো, তাও এখন প্রশ্নাতীতরূপে সত্যি।

'তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে লাও-শেনের ঘাঁটিতে নিয়ে যাচ্ছো ?' বাহিনীর সর্দারকে বললো কিন-ফো।

'ঘণ্টাখানেক পরেই সেখানে পৌঁছে যাবো আমরা,' লোকটা উত্তর দিলে।

কিন-ফোর অনুমানই যে ঠিক, এ-কথায় এটাই প্রমাণিত হ'লো, যদিও প্রমাণের কোনো দরকার ছিলো না ; তবু কেন যেন এ-কথা জেনে বেশ তৃপ্তি পেলে সে। যেখানে যাবে ব'লে সে রাস্তায় বেরিয়েছিলো, সেখানেই তো এরা নিয়ে যাচ্ছে তাকে—তাই নয় কি ?

তাছাড়া যে-কাগজটার জন্যে তার প্রাণ ছিন্নপ্রায় সূক্ষ্ম রজ্জুতে ঝোঝুল্যমান, এবার তো সেটাই ফিরে পাবার সম্ভাবনা দেখা দিলো অবশেষে। কোনো চাঞ্চল্যই দেখা গেলো না তার, নির্বিকার ও আশ্বস্ত তার ভঙ্গি—যাবতীয় আতঙ্কের অভিব্যক্তি দেখা গেলো বেচারা সুনেরই হাবভাবে—ভয়ে তখন দাঁতকপাটি লেগে যাচ্ছিলো বেচারার।

দেয়াল পেরিয়ে বাহিনীটা কিন্তু সেই বিখ্যাত মোঙ্গোল সরণি ধরলো না, বরং পার্বত্য অঞ্চলের এক খাড়াই ও বন্ধুর পথ ধ'রে চললো ; বন্দীদের তারা এমনি সাবধানে পাহারা দিচ্ছিলো যে পালাবার সব চেষ্টাই তাদের ব্যর্থ হ'তো — যদি অবিশ্যি তারা পালাবার কোনো মৎলব আঁটতো।

ওই উৎরাই দিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, ততটা দ্রুতবেগেই তারা যাচ্ছিলো। ঘণ্টা দেড়েক পরে একটা ঠেলে-বেরিয়ে-পড়া চূড়োয় বাঁক ঘুরেই তারা একটা জরাজীর্ণ ও হতশ্রী দালানের কাছে এসে পড়লো ; আগে এটা ছিলো একটি বৌদ্ধ বিহার—বৌদ্ধ ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখা গেলো পাহাড়ের চূড়োয়, এই দালানটিতে। এখন বোধহয় সীমান্তের এই ফাঁকা জায়গায় কেউই আর পুজো দিতে আসে না ; বরং দস্যুদের আস্তানা গড়ার পক্ষে এর চেয়ে চমৎকার কুঠি আর হ'তেই পারে না। লাও-শেন যদি এখানেই তার ডেরা বেঁধে থাকে, তাহ'লে সে যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে।

কিন-ফোর প্রশ্নের উত্তরে সর্দার তাকে জানালে যে সত্যি, ওটা লাও-শেনেরই ডেরা।

'এক্ষুনি তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে,' কিন-ফো বললো।

লোকটা বললো, 'সেই জন্যেই তো আপনাকে আনা হয়েছে।'

প্রথমে কিন-ফো আর সুনের পিস্তলগুলো কেড়ে নিলো তারা, তারপর সেই পুরোনো মন্দিরটার ভিতরের একটা বারান্দায় নিয়ে আসা হ'লো তাদের। দুর্দান্ত দেখতে জনাবিশেক লোক এখানে অপেক্ষা করছিলো : পরনে অস্ত্রশস্ত্র সমেত দস্যুদের পোশাক। কিন-ফো ঢুকতেই তারা দু-ধারে সার ক'রে দাঁড়ালো। কিন-ফো বিন্দুমাত্র বিচলিত না-হ'য়ে তাদের মধ্যে দিয়ে নির্ভীকভাবে এগিয়ে গেলো, কিন্তু সুনকে ঘাড় ধরে টেনে আনতে হ'লো সেখানে। বারান্দাটার শেষপ্রান্তে নিরেট দেয়ালের গায়ে খাঁজ কেটে সারি-সারি সিঁড়ি গেছে একেবারে পাহাড়ের মাঝখান অব্দি—এমন জটিলভাবে গোলকধাঁধার মতো ঘুরে-ঘুরে পথ গেছে সেখানে যে, অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে পথ চিনে চলাই মুশকিল হ'তো।

মশাল জ্বালিয়ে বন্দীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো তারা, প্রায় তিরিশটা সিঁড়ি নেমে-আসার পরে একটা সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রায় দুশো হাত হেঁটে এসে শেষটায় একটা মস্ত হলঘরে এসে পৌঁছুলো তারা ; আরো মশাল জ্বালানো ছিলো সেই ঘরে, কিন্তু তবু ঘরটা মোটেই যেন আলো হয়নি—ঝাপশা অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে আছে। নিচু ছাত, বিশাল একেকটা থামের গায়ে চৈনিক পুরাণের নানা অতিকায় ও আতঙ্কজাগানো জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই-করা, থামগুলো যত উপরে উঠেছে, ততই যেন চওড়া হয়েছে। কিন-ফো ঢুকতেই সারা ঘরে একটা মৃদু মর্মর উত্থিত হ'লো, আর তাইতেই সে বুঝতে পারলো যে ঘরটায় লোক আছে, মানে ঘর শুদ্ধু গিশগিশ করছে লোক—যেন কোনো বিশেষ অধিবেশন বসবে ব'লে রাজ্যশুদ্ধু তাই-পিং এসে হাজির হয়েছে।

সেই অর্ধবর্তুল হলঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা পাথরের মঞ্চ—আর তার উপরে

দাঁড়িয়ে আছে একটি বিলাশদেহী মানুষ ; কোনো গোপন বিচারসভার সভাপতি যেন সে, তাকে দেখে এটাই মনে হয় ; তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিন-চারটি অনুচর, যেন তারা তার উপদেষ্টা পরিষৎ ; বিচারপতির ইঙ্গিতে তারা বন্দীদের কাছে এগিয়ে আনার আদেশ দিলো ।

'ইনিই লাও-শেন,' পাহারাওলাদের সর্দার মঞ্চের উপরকার সেই বিশাল মানুষটিকে দেখিয়ে দিলে ।

দৃঢ়পায়ে সামনে এগিয়ে এলো কিন-ফো, একেবারে সরাসরি কাজের কথা পাড়লে ।

'আমার নাম কিন-ফো,' সে শুরু করলে । 'ওয়াং আপনার পুরোনো বন্ধু ও সহযোগী ছিলেন । ওয়াংকে আমি একটা চিরকুট দিয়েছিলুম—তাতে বিশেষ একটা চুক্তি সম্পাদন করা ছিলো । ওয়াং সেই চিরকুটটা আপনাকে দিয়ে গেছেন । আমি এই কথাটি বলতেই এসেছি যে ওই চুক্তি এখন আর বৈধ নয় । আমি আপনার কাছ থেকে চিরকুটটা ফিরে চাই ।'

তাই-পিং-এর একটি পেশীও ঈষৎ কম্পিত হ'লো না ; সে যদি ব্রনজ নির্মিত হ'তো তাহ'লেও বোধকরি এত অচঞ্চল থাকতে পারতো না ।

'তার বিনিময়ে আপনি যে-কোনো দাম চাইতে পারেন,' ব'লে, কিন-ফো উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলো ।

কিন্তু কোনো উত্তর এলো না ।

কিন-ফো ব'লো চললো, 'যে-ব্যাঙ্কে চান, সেই ব্যাঙ্কের নামে আমি চেক লিখে দিচ্ছি । যাকেই পাঠাবেন, সে-ই যাতে টাকাটা পায়, আমি তার গ্যারাণ্টি দিচ্ছি । কেবল একবার মুখ ফুটে বলুন কত টাকা পেলে চিরকুটটা আপনি ফিরিয়ে দেবেন ।'

তবু কোনো উত্তর এলো না ।

কিন-ফো আরো স্পষ্ট করে ধীরে-ধীরে তার কথার পুনরাবৃত্তি করলে, 'কত চান ? পাঁচ হাজার তায়েল ?'

তবু স্তব্ধতা অটুট থেকে গেলো ।

'দশ হাজার ?'

লাও-শেন আর তার দলবল যেন পাথরের মূর্তি ।

কিন-ফো উদ্বিগ্ন ও অধীর হ'য়ে উঠলো ।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না আপনি ?'

লাও-শেন গম্ভীর ভাবে মাথা হেলিয়ে জানালো যে সে শুনতে পেয়েছে ।

'তিরিশ হাজার তায়েল দেবো আমি আপনাকে । সেণ্টেনারিয়ানদের কাছ থেকে যত টাকা পেতেন, সেই টাকাই আপনাকে দেবো । কাগজটা আমার চাই । বলুন, কত চান, একবার বলুন কেবল ।'

তাই-পিংটি আগের মতোই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো ।

উত্তেজনায় ও অস্বস্তিতে অধীর হ'য়ে উঠলো কিন-ফো । হাত মুঠো ক'রে সবেগে সে ছুটে গেলো মঞ্চের কাছে । 'কত টাকা চান আপনি, কত টাকা ?'

'টাকা দিয়ে সে-কাগজ তুমি কিনতে পারবে না,' অবশেষে স্পষ্ট, কঠিন ও নির্মম

গলায় ব'লে উঠলো তাই-পিং : 'তুমি ভগবান বুদ্ধের কাছে দোষ করেছো : তথাগত তোমাকে যে-জীবন দিয়েছেন, সেই জীবনকে তুমি ঘৃণা করতে শুরু করেছিলে । ভগবান বুদ্ধের অবমাননার শাস্তি তোমাকে পেতে হবে । জীবন যে কত বড়ো মহার্ঘ উপহার, তাকে যে তোমার মতো এমন হালকা-ভাবে নেয়া যায় না, এটা তুমি বুঝতে পারবে কেবল মৃত্যু হ'লে ।'

যে-স্বরে এ-সিদ্ধান্ত জানানো হ'লো তাতে এটা বোঝা গেলো যে উত্তর দিয়ে কোনো লাভ হবে না ; আর তাছাড়া কিন-ফো যদি নিজের সপক্ষে কিছু বলতেও চাইতো, তাহ'লে সে সুযোগ সে কিছুতেই পেতো না । লাও-শেন ইঙ্গিত করবামাত্র তাকে ধ'রে সজোরে টেনে নিয়ে একটা খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ে তার দরজাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দেয় হ'লো । হাউমাউ ক'রে কান্নাকাটি করা সত্ত্বেও সুনেরও সেই একই দশা হ'লো ।

'ভালোই হ'লো !' একা হ'য়ে আপন মনে বললে কিন-ফো, 'যারা জীবনকে অপছন্দ করে মৃত্যুই বুঝি তাদের একমাত্র প্রাপ্য ।'

কিন্তু মৃত্যু তাই ব'লে মোটেই নিকটবর্তী ছিলো না । ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো, কিন্তু কেউ তাকে বধ করলে না । তাই-পিং হয়তো তাকে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে মারতে চায় : কিন-ফো মনে-মনে ভাবতে চেষ্টা করলো আর-কী নিগ্রহ তার কপালে আছে । একটু পরে তার কেমন যেন মনে হ'লো খাঁচাটা ধরাধরি ক'রে নিয়ে কোনো শকটে তুলে দেয়া হ'লো । বোঝা যাচ্ছে তাকে দূরে-কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে । প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে একটানা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেলো, শোনা গেলো পাহারাওলাদের অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানি, আর নির্দয়ভাবে সারাক্ষণ তার খাঁচাটা বারে-বারে ধাক্কা খেলো, ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলো । তারপরে খানিকক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ নেই—পরে বোঝা গেলো বুঝি অন্য-কোনো যানবাহনে তোলা হ'লো তার খাঁচাটা, একটা গুঞ্জন উঠলো চাকার, হতাশ বন্দীটি বুঝতে পারলো যে কোনো স্টিমারে তোলা হয়েছে তাকে ।

'জাহাজ থেকে জলে ফেলে দিতে চায় নাকি আমাকে ?' মনে-মনে ভাবলে সে, 'তাহ'লে বলতেই হয় যথেষ্ট দয়া দেখালো—এর চেয়ে ভীষণ-কোনো নিগ্রহের ব্যবস্থা করলো না যখন —'

একে-একে আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেলো । দিনে দু-বার ক'রে খাঁচার দরজা খুলে সামান্য খাদ্য দেয়া হ'তো তাকে : বাড়িয়ে-দেয়া হাতটি ছাড়া আর-কিছুই দেখতে পেতো না সে—কে তাকে খাবার দিচ্ছে তাও না ; কত প্রশ্ন জিগেশ করেছে সে তখন, কিন্তু কোনো উত্তরই আসেনি ।

অঢেল অবসর তার এখন : যতক্ষণ খুশি ভাবতে পারে শুয়ে-ব'সে । বছরের পর বছর কেটে গেছে—কোনো মানবিক অনুভূতিই সে বোধ করেনি ; কিন্তু মানুষ হ'য়ে জন্মেছে যখন, তখন মানুষের আবেগ-অনুভব না-ক'রে তার উপায় কী ! তাই বুঝি গত কয়েক সপ্তাহে চূড়ান্তই হ'লো সবকিছুর : মানুষের যত-রকম অনুভূতি হয়, সব সে অনুভব করলো, যথেষ্ট মাত্রায় ; জানে যে মরতে তাকে এখন হবেই—কিন্তু একটা তীব্র ইচ্ছে তাকে বেঁধে ফেললো— যেন মরবার আগে দিনের আলো দেখতে পায় সে ; আচমকা অজ্ঞাতসারে তাকে যদি গভীর সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এই ভয়ে এখন তার সর্বাঙ্গে শিহরন খেলে যায় ।

হায় রে ! যদি মরবার আগে অন্তত একবার দেখতে পেতো লা-ওকে ; লা-ও তার সর্বস্ব, তার সমস্তকিছু—আর তাকে দেখতে পাবে না সে ! এই চিন্তাও যে কী ভয়ানক !

শেষ পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রাও শেষ হ'য়ে গেলো । তবু এখনো সে বেঁচে আছে ; কিন্তু এবার নিশ্চয়ই তার জীবনের শেষ ক-টি মুহূর্ত সমাগত ; আর এটাই ছিলো তার চরম ভয় । প্রত্যেকটি মিনিট এখন তার কাছে এক-এক বছর ব'লে ঠেকে, এক ঘণ্টাকে একশো বছর ব'লে মনে হয় !

কিন্তু তার বিস্ময় অসীমে পৌঁছে গেলো : হঠাৎ অনুভব করলো আবার তার খাঁচাটি বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে কারা, কোন-এক অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখলো যেন ; বাইরে লোকজনের সাড়া পেলো সে ; কয়েক মিনিট পরে দরজা খুলে গেলো খাঁচার, আর চট ক'রে তাকে ধ'রে তার চোখের উপর একটা পট্টি বেঁধে দেয়া হ'লো, তারপর সজোরে তাকে ধাক্কা দিতে-দিতে নিয়ে গেলো পথ দিয়ে । কিছুক্ষণ পরে সে বুঝতে পারলো তার সঙ্গের লোকজনের পায়ের শব্দ থেমে গেছে : এটাই যে বধ্যভূমি, তাতে তার আর সন্দেহ রইলো না ; সে চেঁচিয়ে উঠলো : 'একটা শেষ আরজি আছে আমার । একটা মাত্র অনুরোধ : আমায় চোখ খুলে দাও—দিনের আলো দেখতে দাও আমায়—মানুষের মতো মরতে দাও আমাকে —মরতে আমি যে ভয় পাই না এটা বোঝাতে দাও ।'

'দাও, অপরাধীর শেষ প্রার্থনাটা পূরণ ক'রে দাও,' কে যেন তার কানের পাশেই গম্ভীর স্বরে ব'লে উঠলো : 'চোখের উপর থেকে বাঁধন খুলে দাও ওর ।'

বাঁধন খুলে দিতেই কিন-ফো স্তম্ভিত বিস্ময়ে কেঁপে উঠলো । স্বপ্ন দেখছে নাকি সে ? অর্থ কী এর ?

তার সামনেই সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্যেসাজানো খাবার-টেবিল । পাঁচজন অতিথি ব'সে মৃদু-মৃদু হাসছেন, যেন তাঁরা এতক্ষণ তারই আগমন প্রত্যাশা করছিলেন । দুটো আসন এখনো ফাঁকা প'ড়ে আছে ।

'আমি কি পাগল হ'য়ে গেছি ?' কিছুই বুঝতে না-পেরে উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো কিন-ফো ।

নিজেকে শামলাতে বেশ কিছুক্ষণ লাগলো তার ; চোখ রগড়ে চার পাশে তাকিয়ে দেখলো সে ভালো ক'রে ; তার ভুল হয়নি : ওই তো ওয়াং, আর ওই তার চার বাল্যবন্ধু, ইন-পাং, হুআল, পাও-শেন আর তিং । দু-মাস আগে কোয়াংতুঙের পার্ল রিভারের বজরায় ব'সে যাদের সঙ্গে সে ভোজ খেয়েছিলো । এই তো এটা তার শাংহাইয়ের ইয়ামেনের খাবার ঘর ।

'বলো,বলো,' চেঁচিয়ে উঠলো সে : 'এ-সবের মানে কী ? এ কি সত্যি তুমি, না তোমার ভূত?'

দার্শনিক মুচকি হাসলো । 'ভয় নেই, আমি সত্যিই ওয়াং !'

কিন-ফো আরো যেন হতভম্ব হ'য়ে গেলো । ওয়াং তখন বোঝালো : 'বেশ শিক্ষা হ'লো তোমার, কী বলো ? অবশেষে জীবনের কাছে একটি নির্দয় পাঠ নিয়ে তুমি বাড়ি ফিরে এসেছো । এই পাঠটা অবশ্য আমারই কাছে তুমি পেলে । তোমাকে যে এত কষ্ট সইতে হ'লো, তার জন্য আমিই দায়ী । কিন্তু সবই করেছি তোমার ভালোর জন্য, কাজেই

আমাকে তোমার ক্ষমা করতে হবে ।'

কিন-ফো আরো হতভম্ব হ'য়ে চুপচাপ তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ।

'এক্ষুনি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি,' বললে ওয়াং, 'তোমার অনুরোধে তোমাকে হত্যা করতে কেন সম্মত হয়েছিলুম, জানো ? যাতে অন্য-কারু হাতে সে-ভার তুমি না-দাও । তোমার আগেই আমি জানতে পেরেছিলুম যে তোমার ওই সম্পত্তি হারাবার খবর সর্বৈব মিথ্যা ; সেই জন্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে এখন মরতে চাইলে কী হবে, একটু পরেই বাঁচবার জন্যে তুমি ব্যাকুল হ'য়ে উঠবে । আমি আমার প্রাক্তন সহযোগী লাও-শেনকে সব খুলে বললুম । লাও-শেন এখন সরকারের অতিবিশ্বস্ত বন্ধুদের একজন : বহু আগেই সে বর্তমান সরকারের আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছে, কিন্তু এই ব্যাপারে সে আমার সহযোগিতা করতে রাজি হ'লো — আর করলোও ; গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো কেমন ক'রে তোমাকে একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো সে; জীবনের মূল্য বোঝবার জন্য এটা তোমার দরকার ছিলো ব'লে আমার মনে হয়েছিলো ; যে-নিগ্রহ আর উৎপাত তুমি সহ্য করেছো, যে-কষ্ট তুমি পেয়েছো এ-ক-দিন, তাতে প্রতিদিন যেন আমারই বুক থেকে রক্ত ঝ'রে পড়েছে ; এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তোমাকে একা ছেড়ে দিতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিলো—কিন্তু আমি এটা জানতুম আর-কোনো সহজ উপায়ে তোমাকে শেষ অব্দি সুখের সন্ধান দেয়া যাবে না ।'

ওয়াং আর-কিছু বলবার আগেই কিন-ফো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো । 'বেচারা ওয়াং ! আমার জন্য কত কষ্টই না-জানি তোমাকে সইতে হয়েছে ! আর তাছাড়া তুমি ঝুঁকিও খুব-একটা কম নিয়েছিলে নাকি ! পালিকাওর সেতুর উপর সেদিন যা হয়েছিলো, তা আমি কোনোদিনও ভুলবো না ।'

দার্শনিক হো-হো ক'রে প্রাণখোলাভাবে হেসে উঠলো । 'সত্যি, কনকনে ঠাণ্ডা ছিলো জলটা—যে-কোনো লোকেরই রক্ত জ'মে যেতো ঠাণ্ডায় ; তায় আমি হলুম পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ, অনেকটা পথ তাড়া খেয়ে ঘেমে একশা হ'য়ে গিয়েছিলুম । আমার দর্শন আর বয়েস—দুয়ের উপরই সেদিন ভীষণ ধকল গিয়েছে । কিন্তু ভেবো না, তাতে কোনো বিপদ হয়নি । অন্যের উপকার করতে গেলে লোকে যত জোরে দৌড়ুতে পারে, তেমন বোধহয় আর-কখনো পারে না ।'

'অন্যের উপকার ? সত্যি, আমার আর এতে কোনো সন্দেহ নেই । অন্যের ভালোর জন্য কাজ করাতেই যে সুখ, তাতে সত্যি বলছি আমার আর-কোনো সংশয় নেই ।'

আলোচনাটা আরো তত্ত্ববহুল হ'য়ে পড়তো হয়তো, যদি-না তখন সুনের আবির্ভাব ঘটতো । দু-দিন সমুদ্রযাত্রার ধকলে বেচারা একেবারে কাহিল হ'য়ে পড়েছে । তার গায়ের রঙ কী হ'য়ে পড়েছিলো তা বলা মুশকিল, কিন্তু প্রভুগৃহে পুনঃপ্রবেশ করতে পেয়ে তার আহ্লাদের সীমা ছিলো না ।

ওয়াংকে ছেড়ে দিয়ে কিন-ফো এবার ঘুরে-ঘুরে তার বন্ধুদের সঙ্গে একে-একে করমর্দন করলো । 'কী আহাম্মকই ছিলুম এতকাল !' বললো সে সবাইকে ।

'কিন্তু এখন থেকে তুমি নিশ্চয়ই পরমজ্ঞানী হ'য়ে উঠবে,' বললে ওয়াং ।

'তাহ'লে আমার প্রথম বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া হবে, যদি এক্ষুনি সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ

করতে পারি। আমার সব বিপত্তির মূল ওই চিরকুটটা না-পেলে আমার কিছুতেই স্বস্তি হবে না। যদি ওটা লাও-শেনের কাছে থেকে থাকে, তাহ'লে ফিরিয়ে দিতে বলো, কারণ কোনো বিবেকহীন লোকের হাতে পড়লে সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।'

ঘরশুদ্ধু লোকের মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠলো।

ওয়াং বললে, 'বন্ধুটির সব রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা তার চরিত্রটা একেবারে আমূল বদলে দিয়েছে। আর সেই নির্লিপ্ত মানুষটি নেই।'

কিন-ফো তবু বললে, 'কিন্তু বললে না তো চিরকুটটা কোথায় আছে। চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলে তার ছাই উড়িয়ে না-দেয়া অব্দি আমি কোনো শান্তি পাবো না।'

ওয়াং বললে, 'তোমাকে বড্ড উৎসুক দেখাচ্ছে—'

'উৎসুক হবো না ?' বললে কিন-ফো, 'কিন্তু চিরকুটটা কই ? লাও-শেন ফিরিয়ে দিয়েছে কি ?'

'লাও-শেনের কাছে ছিলোই না কোনোদিন।'

'তাহ'লে তোমার কাছে আছে ? তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ফিরিয়ে দিতে দ্বিরুক্তি করবে না ? আমার আহাম্মকির পুনরাবৃত্তি যাতে না-হয় তার গ্যারান্টি হিশেবে নিশ্চয়ই ওটা রাখতে চাইবে না তুমি ?'

'নিশ্চয়ই না।' বললে ওয়াং, 'কিন্তু চিরকুটটা তো আমার কাছে নেই। সত্যি-বলতে আমার কোনো অধিকারই নেই ওটার উপর !'

'তার মানে !' কিন-ফো চেঁচিয়ে উঠলো, 'নিশ্চয়ই তুমি বোকার মতো সেটা অন্য-কাউকে দিয়ে দিয়ে দাওনি ?'

'তা-ই করেছি কিন্তু,' উত্তর দিলো ওয়াং।

'কেন ? কখন ? কাকে দিয়েছো ?' কিন-ফো ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

'দিয়েছি —' ওয়াং শান্ত গলায় শুরু করলো।

'কাকে ? কাকে দিয়েছো ?' বাধা দিয়ে জিগেশ করলো কিন-ফো।

'বলবার সময়টা দিচ্ছো কই ? এমন একজনকে দিয়েছি যে নিজেই তোমাকে ওটা ফিরিয়ে দেবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে আছে।'

তার কথা শেষ হবার আগেই কিন-ফো দেখতে পেলে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লা-ও, তার বাড়িয়ে-ধরা কোমল হাতে রয়েছে চিরকুটটা ; পরদার আড়াল থেকে এতক্ষণ সে সব শুনেছে—এখন আর থাকতে না-পেরে এগিয়ে এসেছে কিন-ফোর কাছে।

'লা-ও !' ব'লেই কিন-ফো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গেলো।

কিন্তু লা-ও পিছিয়ে গেলো—যেন যেমন রহস্যময়ভাবে ঘরে এসে ঢুকেছিলো তেমনিভাবেই চ'লে যাবে এক্ষুনি।

'ধীরে, অত তাড়াহুড়ো নয় !' লা-ও বললে, 'আনন্দ করার আগে কর্তব্য শেষ ক'রে নাও। তোমার হাতের লেখা ব'লে চিনতে পারছো এটাকে ?'

'সে আর বলতে ! জগতে এমন আহাম্মক আর দ্বিতীয় আছে না কি যে ও-রকম লিখবে ?'

'সত্যি, ওটাই তোমার মত ?' লা-ও জানতে চাইলো।

'সত্যি ।'

'তাহ'লে কাগজটা তুমি পুড়িয়ে ফেলতে পারো—,' বললে লা-ও, 'সেই সঙ্গে সেই মানুষটারও মৃত্যু হোক, যে ওটা লিখেছিলো ।' উদ্ভাসিত হেসে তাকে সে ওই ছোট্ট কাগজটা ফিরিয়ে দিলো—যা কিনা এতদিন তার এত যন্ত্রণা ও নিগ্রহের কারণ হ'য়ে ছিলো । মোমবাতির শিখায় তুলে ধরলো কিন-ফো কাগজটিকে, যতক্ষণ-না পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো ততক্ষণ তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে । তারপর বাগদত্তা বধূটির দিকে ফিরে তাকে সে বুকে চেপে ধরলো, বললো, 'এবার তুমি এসে আমাদের পুনর্মিলন উৎসবের কর্ত্রী হও এখানে । ভোজ্যদ্রব্যের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করতে পারবো বোধহয় এখন ।'

'তা আমরাও পারবো অবিশ্যি,' অতিথিরা একযোগে ব'লে উঠলো ।

এর কয়েকদিন পরেই রাজশোকের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলো । আগের চেয়েও জমকালো সব ব্যবস্থার পর বিয়ে হ'লো দুজনের ।

আশা করা যায় নবদম্পতির ভালোবাসা আর ভাঙবে না কোনোদিনও ।

পরবর্তী জীবনটা তাদের এমন সুখে কাটতে লাগলো যে শাংহাইয়ের সেই ইয়ামেনে একবার পদার্পণ করলেই আপনি হয়তো অতি সহজেই তার সৌগন্ধ্য ও নির্যাস পেতেন ।

———

দ্য লাইটহাউস

১

বাতিঘর

পশ্চিমের সার-বাঁধা পাহাড়গুলোর আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে আকাশ। তখন সূর্য ডুবতে চলেছে। পাহাড়গুলোর আড়ালে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে শেষ বিকেলের আলো। চমৎকার শান্ত আবহাওয়া, সচরাচর এমন আবহাওয়া এখানে দেখা যায় না। পুব আর উত্তর-পুব দিকে তাকালে আকাশ আর সমুদ্রকে আলাদা ক'রে বোঝবার জো নেই—দুয়েই যেন মিলে-মিশে একাকার হ'য়ে গিয়েছে : অন্তত খালি চোখে তাকালে তা-ই মনে হয়। আকাশের ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘগুলোর গায়ে বিকেলের যে-শেষ রশ্মিগুলো ঝিলিক মারছিলো, গভীর-নীল নির্জন সমুদ্রের চঞ্চল জলে ঝিকমিক ক'রে উঠে সেগুলো যেন অপূর্ব এক মায়াজাল রচনা ক'রে বসেছে।

ইগোর উপসাগরে তখন দাঁড়িয়ে ছিলো সান্তা-ফে, তার সব নোঙর ফেলে। উত্তর-মেহিকোর এক শহরের নামে নাম এই জাহাজের : সান্তা-ফে। হঠাৎ সেই জাহাজের ডেক থেকে গর্জন ক'রে উঠলো একটি কামান। সঙ্গে-সঙ্গে মাস্তুলের ওপর তরতর ক'রে উঠে গেলো আরহেন্‌তিন প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা, আর সমুদ্রের প্রশান্ত হাওয়ায় পৎপৎ ক'রে উড়তে লাগলো।

ঠিক তখনই, যেন সাড়া দিয়েই, বাতিঘর থেকে একটি বন্দুক গর্জন ক'রে উঠলো, আর তৎক্ষণাৎ ইগোর উপসাগরের জলে এক ঝলক তীব্র আলোর ছটা চোখ ধাঁধিয়ে পিছলে পড়লো। সমুদ্র-সৈকতে এসে দাঁড়ালে দুজন আলোকরক্ষী। জাহাজের সামনের দিকে যে-নাবিকটি দাঁড়িয়েছিলো সে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে তাদের অভিনন্দন জানালে।

আরো-দুটি বন্দুকের আওয়াজ স্টটেন আইল্যাণ্ডের স্তব্ধতা ভেঙে গ'র্জে উঠলো, আর অন্যপাশের পাহাড়গুলোর গায়ে ঘা খেয়ে তাদের প্রতিধ্বনি যেন বার-বার গর্জন ক'রে উঠলো তারপর।

অতলান্তিক মহাসাগর আর প্রশান্ত মহাসাগরের জলোচ্ছ্বাস যেখানে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে, সেখানে সবুজ বনানী-ঢাকা মাথা তুলে সূর্যকে অভিবাদন জানায় স্টটেন আইল্যাণ্ড।

কামান-বন্দুকের এই আওয়াজগুলো সমুদ্রের বিস্তারে মিলিয়ে যেতেই আবার একটি নীরবতা নেমে এলো স্টটেন আইল্যাণ্ডের ওপর।

দ্বীপে শুধু তিনজন আলোকরক্ষীকেই কাজে বাহাল করা হয়েছে। একজন এখন বাতিঘরের মিনারে তার কাজে ব্যস্ত, বাকি দুজনকে আমরা দেখেছি সমুদ্র-সৈকতে, সেখানে পায়চারি করতে-করতে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। দুজনের মধ্যে তুলনায় যার বয়স কম, সে বললে, 'তাহ'লে, বাস্‌কেথ, সান্তা-ফে কালকেই আমাদের ছেড়ে চ'লে

যাচ্ছে ।'

'জানি, ফিলিপ ।' বাস্‌কেথ জবাব দিলে, 'এবং আমি আশা করি সান্তা-ফে নির্বিঘ্নেই দেশে ফিরতে পারবে ।'

কথাটা আশা করার । আসলে সান্তা-ফে সত্যি-সত্যি বুয়েনোস আইরেসে ফিরতে পারবে কি না, সে-কথা বাস্‌কেথ বা ফিলিপ কেউই নিশ্চয় ক'রে বলতে পারবে না ।

পারা সম্ভবও ছিলো না । তিয়েরা দেল ফুয়েগো কিংবা পাতাগোনিয়ার মধ্যে দ্বিতীয়-কোনো জায়গায় নেই, যাতে অশান্ত সমুদ্রে তুফান উঠলে সান্তা-ফে ডাঙায় ভিড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারে । মাগেলান প্রণালীর এ-পাশে সমুদ্রের ঝড়তুফান নাবিকদের মধ্যে তার ভয়াবহ তাণ্ডবের জন্যে কুখ্যাত । এখানকার সমুদ্র ভয়ংকর বেয়াড়া, নাবিকদের সম্ভবত আদপেই পছন্দ করে না, প্রায়ই শৃঙ্গ অন্তরীপের শিলাময় প্রাচীরে আছড়ে প'ড়ে কত-যে জাহাজ সোজা পাতালে চ'লে যায়, তার আর কোনো ইয়ত্তা নেই । তবে সে-অবস্থা এখন, এতদিন পর, পালটাতে চলেছে । কারণ স্টটেন আইল্যাণ্ডে এখন বাতিঘর বসানো হয়েছে, আর তার ফলে আশা করা যায় হাজার তুফান, হাজার হারিকেন উঠলেও তার আলো আর নিভবে না । দুর্যোগের সময় এই বাতিঘরের আলোয় জাহাজগুলো তাদের পথ দেখতে পাবে, আর ঘুটঘুটে আঁধার রাতেও সান হুয়ান অন্তরীপ কিংবা সান দিয়েগো অন্তরীপ অথবা ফালোস অন্তরীপের রাস্তায় সংঘর্ষ অর্থাৎ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে ।

ফিলিপ এই জনমানবশূন্য দ্বীপে পুরো তিন-তিনটি মাস কাটাতে হবে ব'লে বেশ-একটু মনমরাই হ'য়ে পড়েছিলো । তিনমাস পরে যতক্ষণ-না নতুন তিনজন আলোকরক্ষী এসে ওদের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছে, ততদিন সভ্যজগতের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কোনো নির্জন দ্বীপে দিন কাটানো খুব-একটা সহজ কাজ নয় । জাহাজে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়া যায়, অন্য মাল্লারা আছে, জাহাজ ভেসেই চলেছে, মাঝে-মাঝেই নতুন-নতুন বন্দরে গিয়ে ভিড়তে পারে । কিন্তু এ-দ্বীপটা এক অর্থে বন্দীশালাই—তিনমাসের মেয়াদ না-ফুরোলে আর মুক্তি নেই । চাকরির জন্যে আরজি পাঠাবার সময় ব্যাপারটা সে এদিক থেকে ভেবে দ্যাখেনি । এখন দ্বীপে এসে হাজির হবার পর এদিকটা তার খেয়াল হয়েছে ।

বাস্‌কেথ বললে, 'দ্যাখো বাছা ফিলিপ, আজ চল্লিশ বছর ধ'রে সমুদ্রকেই আমি আমার ঘর করেছি । জাহাজের ক্যাবিনবয়, খানশামা, নাবিক, অফিসার হিশেবে কত জাহাজে ক'রেই না ঘুরেছি, বলতে-গেলে সারা দুনিয়াটাই চ'ষে বেড়িয়েছি । এবার আমার অবসর নেবার সময় এসেছে । বাতিঘরের রক্ষী হওয়া ছাড়া আর কী-ই বা এখন আমার সাজে ? আর এই বাতিঘর কি যে-সে বাতিঘর না কি ? একেবারে দুনিয়ার শেষ সীমানার বাতিঘর ।' এইসব নানান কথা ব'লে ফিলিপকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করতে-করতে বাস্‌কেথ বাতিঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে ।

প্রশান্ত মহাসাগরের জোয়ারের তেমন বিশেষ শক্তি নেই ব'লে একটা কিংবদন্তি আছে । সেটা ঠিক হোক বা না-হোক, অতলান্তিক মহাসাগরের সংযোগস্থলে প্রশান্ত মহাসাগর কিন্তু প্রচণ্ড খেপেই থাকে সবসময়, আর জোয়ার এলে তো কথাই নেই । সেখানে কী তার উন্মাদ গর্জন আর ঢেউয়ের কী প্রচণ্ড দাপট ! এমনকী এর তীব্র প্রভাব অনেক দূর থেকে মাগেলানের জলেও টের পাওয়া যায় ।

সান্তা-ফে আরহেন্‌তিন নৌ-বাহিনীর জলপোত। একশো ষাট অশ্বশক্তিতে শক্তিমান জাহাজটি দুশো টন ভার বইতে পারে। কাপ্তেন লাফায়েৎ আর লিউটেনান্ট রীগাল ছাড়া পঞ্চাশ জন মাঝিমাল্লা রয়েছে এর খবরদারিতে। এর কাজ হ'লো রিও দে লা প্লাতার দক্ষিণ থেকে লেময়র প্রণালী অব্দি অতলান্তিক মহাসাগর এলাকায় নজর রেখে বেড়ানো। আমাদের এই কাহিনী যখনকার, তখনও দ্রুতগতিসম্পন্ন জাহাজ, ক্রুজার বা টর্পেডো-বোট তৈরি হয়নি। তাই, সান্তা-ফের ঘণ্টায় ন-মাইল গতিবেগই তখনকার দিনে যথেষ্ট ব'লে মনে হ'তো।

এই বছরের গোড়ার দিকে আরহেন্‌তিনার সরকার এই জাহাজের হাতে লেময়র প্রণালীর প্রবেশমুখে নির্মীয়মান বাতিঘরটির তত্ত্বধানের দায়িত্ব দিয়েছিলো। মানুষ-জন, যন্ত্রপাতি, মাল-মশলা প্রভৃতি যা-যা বাতিঘর বানাবার জন্যে দরকার, তাই নিয়েই সে স্টাটেন আইল্যাণ্ডে যাতায়াত করছিলো। বুয়েনোস আইরেসের জনৈক সুদক্ষ বাস্তুকারের নকশা অনুযায়ী বাতিঘরের কাজ এই ডিসেম্বর মাসে অবশেষে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সান্তা-ফে সপ্তাহ তিনেক আগে এসে ইগোর উপসাগরে নোঙর ফেলেছিলো। চারমাসের উপযোগী রসদ ও অন্যান্য জিনিশপত্র বাতিঘরের ভাঁড়ারে জমা ক'রে, বাতিঘরের রক্ষী তিনজন যাতে তিনমাসের মধ্যে কোনোকিছুর অভাবে না-পড়ে সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে, কাপ্তেন লাফায়েৎ স্টটেন আইল্যাণ্ড থেকে বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

বহু আবেদনকারীর মধ্যে থেকে কর্তৃপক্ষ বাস্‌কেথ, ফিলিপ এবং মরিসকেই বিশ্বের শেষ প্রান্তের এই বাতিঘরের আলোকরক্ষী হিশেবে মনোনীত করেছেন। ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি—এই তিন মাস তারা বাতিঘরের ভার নিয়ে থাকবে, তারপর মার্চ মাসে আবার নতুন আলোকরক্ষীরা এসে এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেবে।

আলোকরক্ষীদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে মিনারের নিচেই। ঝড়ের তীব্রতা যাতে ঠেকাতে পারে, সেই জন্যে এই কোয়ার্টারটি পুরু দেয়াল দিয়ে আগাগোড়া মোড়া। কোয়ার্টারটি মিনারের সিঁড়ি থেকে একটা বারান্দা দিয়ে আলাদা করা।। বারান্দাটির একেবারে শেষ মাথায় আলোকস্তম্ভের সিঁড়িতে ওঠবার দরজা। সিঁড়িটা সরু, এবং ঘোরানো। দেয়ালের থাকে-থাকে পাথর গেঁথে তৈরি। সিঁড়িপথ মোটেই অন্ধকার নয়। অনেকগুলো লুপহোল বা ছোটো গবাক্ষ দিয়ে আলো আসার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। বাতিঘরের লুক-আউট কামরায় লণ্ঠনের আতসকাচ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি একেবারে আনকোরা ব'লেই ঝকঝক করছে। দেয়ালের গা ঘেঁষে গ্যালারি। গ্যালারিতে ব'সে চারদিকের সমুদ্রের ওপর নজর রাখতে কোনোই অসুবিধে হবার কথা নয়।

পরদিন সকাল বেলা থেকেই সান্তা-ফে-র ওপর একটা সাজো-সাজো রব উঠলো। বিকেলবেলা জাহাজ ছাড়বে, তারই প্রস্তুতির জন্যে এই শশব্যস্ত কর্মচাঞ্চল্য। কাপ্তেন লাফায়েৎ আর লিউটেনাট রীগাল তীরে নেমে শেষবারের মতো সবকিছু পরিদর্শন ক'রে এলেন। গতকাল সান্তা-ফের ডেক থেকে কামান দাগবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাতিঘরের লণ্ঠনের প্রথম আলো জ্বলেছিলো। কাপ্তেন লাফায়েৎ ভালো ক'রে বাস্‌কেথের কাছ থেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে খবর নিলেন: না, লণ্ঠন ভালোভাবেই কাজ দিয়েছে, চিন্তার কোনোই কারণ নেই।

আলোকরক্ষীদের কাজটা খুবই কঠিন। একটি নির্জন পরিত্যক্ত দ্বীপে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়াটা মোটেই সুখের ব্যাপার নয়। তবে বাস্‌কেথ, ফিলিপ এবং মরিস—তারা

তিনজনই সহ্যশীল ও দক্ষ ব্যক্তি, সমুদ্র সম্পর্কে তাদের বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে । জাহাজে-জাহাজে কাজ করতে-করতে খানিকটা ক্লান্ত হ'য়ে গিয়ে হয়তো বিশ্রামের জন্যেই এই কাজ নিয়েছে । বাতিঘরের কাজকর্ম রুটিন-বাঁধা, তবে জাহাজের শশব্যস্ত তাড়ার তুলনায় এই কাজ তাদের কাছে হয়তো পরিপূর্ণ বিশ্রাম ব'লেই মনে হবে । তাছাড়া মাত্র তো তিন মাসের ব্যাপার । চোখ-কান বুজে তিনমাস কাটিয়ে দিলেই হ'লো, তারপর এদের ছুটি দিতে বদলি এসে যাবে ।

কাপ্তেন লাফায়েৎ রক্ষী তিনজনকে বিস্তর উৎসাহ দিয়ে চাঙ্গা ক'রে জাহাজে ফিরে গেলেন ।

বিকেলবেলা আলোকরক্ষীরা তিনজনেই সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ালে । একটু পরেই সান্তা-ফে এখান থেকে রওনা হবে । স্টটেন আইল্যাণ্ডে তারপর বাস্‌কেথ, মরিস আর ফিলিপ ছাড়া আর কাউকেই দেখা যাবে না । তারা একদৃষ্টে জাহাজের ডেকে কর্মচঞ্চল নাবিকদের দিকে তাকিয়ে রইলো ।

বিকেল পাঁচটায় সান্তা-ফে-র বয়লার গ'র্জে উঠলো । তার চোঙ দিয়ে ভলকে-ভলকে বেরিয়ে এলো কালো-কালো ধোঁয়া, তীক্ষ্ণ বেজে উঠলো বাঁশি, পাহাড়ের গায়ে ঘা খেয়ে তার রেশ জাগিয়ে রাখলে প্রতিধ্বনি । জোয়ারের বেগ এখনও বেশ শিথিল ; একটু পরে যখন জোয়ারের তোড়ে তীরের কাছের জল ফুলে-ফেঁপে উঠলো, তখন ঘড়ঘড় শব্দে সান্তা-ফে-র নোঙর তোলা হ'লো ।

পৌনে ছটার সময় কাপ্তেন লাফায়েৎ এনজিনম্যানকে তৈরি হ'য়ে নেবার জন্যে হুকুম করলেন । শোঁ-শোঁ ক'রে শব্দ উঠলো এনজিনে । লিউটেনান্ট রীগাল এগিয়ে এসে অপারেটর প্রস্তুত কি না দেখে গেলেন ।

সান্তা-ফে নড়তে শুরু করলো ।

আলোকরক্ষী তিনজন তীর থেকে বিদায়-অভিনন্দন জানালে । বাস্‌কেথের মনোভাব এখন কী—সেটা তার মুখ দেখে সঠিক বলা শক্ত । তবে তার অন্য দুজন সহকর্মীকে বেশ একটু বিচলিতই দেখাচ্ছে । সান্তা-ফের লোকজনেরাও আমেরিকার অনেক দূরে বিশ্বের একেবারে শেষ প্রান্তে জনশূন্য দ্বীপে এদের ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে ব'লে বেশ-একটু মনখারাপই করলে ।

ইগোর উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূল ধ'রে মোটামুটি সাধারণ গতিতেই তরতর ক'রে জল কেটে এগিয়ে চললো সান্তা-ফে । আটটার সময় সে গিয়ে পড়লো বারদরিয়ায় ; সান হুয়ান অন্তরীপ ঘুরে, পশ্চিমে প্রণালীটি ফেলে রেখে তারপর সে পুরোদমে চলতে শুরু করলো । ঘন হ'য়ে যখন রাত্রি নামলো, তখন সান্তা-ফের ডেক থেকে পৃথিবীর শেষ প্রান্তের এই বাতিঘরের ঝলমলে আলোই শুধু দেখা গেলো : দিগন্তে একটা ছোট্ট তারার মতো জ্বলজ্বল করছে বাতিঘর ।

তখনও আলোকরক্ষীরা কল্পনাও করতে পারেনি তাদের ভাগ্যের আকাশে কী-ভয়ানক বিপদের কালোমেঘ এসে জমছে ।

...

স্টটেন আইল্যাণ্ডকে স্টটেন ল্যাণ্ড ব'লেও অভিহিত করতো কেউ-কেউ । আমেরিকার

একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম বিন্দুতে এর অবস্থিতি। উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের নীল জল দিয়ে ঘেরা দ্বীপটি দু-দুটো মহাসাগরের জলে অবগাহন করতো। শৃঙ্গ অন্তরীপের মধ্যে দিয়ে যে-সব জাহাজ যেতো, তাদের ডেক থেকে ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো দেখাতো স্টটেন ল্যাণ্ডকে।

এই এলাকায় লেময়র প্রণালী নামে একটি প্রণালী আছে। এই প্রণালী দিয়েই তিয়েরা দেল ফুয়েগো থেকে স্টটেন আইল্যাণ্ড বিচ্ছিন্ন ; পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান কুড়ি মাইলের মতো। দ্বীপটার পুবদিকে সান আস্তোরিয়ো আর কেম্প অন্তরীপ।

স্টটেন আইল্যাণ্ড পুব থেকে পশ্চিমে ঊনচল্লিশ মাইল, আর উত্তর-দক্ষিণে এগারো মাইল। এর উপকূলভাগ অত্যন্ত আঁকাবাঁকা। কোথাও আকাশে মাথা তুলেছে খাড়া পাহাড়, কোথাও-বা কোনো খাড়ির মধ্যে দিয়ে চর্কি দিয়ে ঘূর্ণি দিয়ে ছুটেছে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। ডুবোপাহাড়ও এই এলাকায় প্রচুর। তাই প্রায়ই এই এলাকায় জাহাজডুবি হয়, গত একশো বছরে অগুনতি জাহাজ এখানে ডুবোপাহাড়ে ঘা খেয়ে ভেঙেছে। উপকূলের সমুদ্রের তলাতেও বিস্তর পাহাড়-পর্বত আছে ব'লে সবচেয়ে শান্ত অবস্থাতেও এখানকার সমুদ্র যেন প্রচণ্ড খেপে থাকে, ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস তোলে।

দ্বীপটি জনমানবহীন। অবশ্য এর সবচেয়ে ভালো ঋতুতেই—মানে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি অব্দি—এখানে কোনোরকমে বাস করা চলে—ঐ সময়টুকুই দক্ষিণ গোলার্ধের এই দ্বীপের গ্রীষ্মকাল কি না—অথচ তখনও সেখানে সে-কী হাড়কাঁপানো কনকনে শীত।

দ্বীপের অরণ্যে কিছু-কিছু গুঅনাকো দেখা যায়। গুঅনাকো দক্ষিণ আমেরিকার একধরনের আদিম জাতের হরিণ। এর মাংস বেজায় স্বাদু। শীতকালে যখন ঘন পুরু বরফের চাদর মুড়ি দেয় দ্বীপ, তখনও এই হরিণগুলো খাবারের অভাবে মরে না, কারণ বরফের তলা থেকে তারা গাছগাছড়ার পাতা-শেকড় ইত্যাদি খুঁজে নিয়ে খেতে পারে।

সত্যি-বলতে দ্বীপটিকে একটা প্রকাণ্ড পাথুরে টিলা ছাড়া আর-কিছুই বলা চলে না। প্রাণহীন, নির্জন। ঐ এলাকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু-কিছু পাখপাখালি আর উপকূলের নানান জাতের মাছ ছাড়া আর-কোনো প্রাণীকেই দেখতে পাওয়া যায় না। দ্বীপটির মালিক চিলে ও আরহেন্তিনার প্রজাতন্ত্র। আরহেন্তিনার সরকার পৃথিবীর শেষ কিনারে এখানে একটি বাতিঘর তৈরি ক'রে দিয়ে সব দেশের নাবিকদেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এখানে সমুদ্র জাহাজে-জাহাজে ব্যস্ত—অথচ ঝড়ে-তুফানে ভয়াবহ। এখানকার ভয়ংকর সমুদ্রে স্টটেন আইল্যাণ্ডের বাতিঘর নিশ্চয়ই দেবতার আশীর্বাদের মতোই কাজ দেবে। তাই, আরহেন্তিনার সরকারের উদ্যোগে ১৮৫৯ সালের নয়ই ডিসেম্বর একবছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে বাতিঘরটি তৈরি হয়েছে—তৈরি হয়েছে সবেমাত্র।

দ্বীপটির মাঝখান থেকে চারদিকে রুক্ষ ঊষর মরুভূমি ছড়িয়ে পড়েছে। বাকি দ্বীপটা পাথুরে জমির। এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু-নিচু, মাঝে-মাঝে হাঁ ক'রে আছে মস্ত সব গহ্বর, পাতালের অন্ধকারই যেন উগরে দিতে চাচ্ছে। আর নয়তো উঁচু-নিচু কিছু টিলা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আকাশকে বিদ্রুপ করবার চেষ্টা করছে। দ্বীপটার সৃষ্টি হয়েছে অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। দ্বীপের পুবদিকটা অন্তরীপের মতো ছড়ানো, পশ্চিমদিকটাও সেইরকম : উঁচু, পর্বতবহুল। অরণ্য যেখানে নিবিড়, সেখানে অ্যান্টার্কটিকের সব গাছ। দ্বীপের সমতল অংশটুকু অনেকটাই তুন্দ্রা অঞ্চলের মতন দেখতে—শীতকালে তা তুষারে ঢাকা প'ড়ে যায়।

দ্বীপে সারাক্ষণই ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত লেগে আছে ।

তীর ঘেঁষে খাড়াই পাহাড় । দ্বীপে কোনো নদী বা ঝরনা নেই । গ্রীষ্মকালের সূর্যের তাপে বরফ গললে এদিকে-ওদিকে বরফগলা জলে ছোটোখাটো ঝিল জাগে, আর ঘোর প্রচণ্ড শীতের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত রোদ্দুরে সেই জল ঝিকমিক ক'রে ওঠে । আমাদের কাহিনীর যবনিকা যখন উঠলো তখন ঐসব ঝিলের জলধারা টিলাপাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে এসে ইগোর উপসাগরের সুনীল-ফেনিল জলরাশিকে আলিঙ্গন করছিলো । কিন্তু কে জানতো পৃথিবীর একেবারে শেষ কিনারে, বাসের অযোগ্য এই নির্জন দ্বীপটাতেও একদল বোম্বেটে এসে আস্তানা গেড়েছে !

২

তারা তিন জন

সান্তা-ফের প্রস্থানের পর কয়েকদিন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনাই ঘটেনি । আবহাওয়া ছিলো বেশ ভালো, তাপমাত্রাও ছিলো বেশ উঁচুতেই । সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অব্দি সমুদ্রের হাওয়া বইতো মৃদুভাবে, স্নিগ্ধ একটা আমেজ ছড়িয়ে দিতো । সন্ধের পর অবশ্য একটু শীত-শীত করতো ।

বাতিঘরের চারপাশ ঘিরে ফরাশের মতো ছড়িয়ে আছে সবুজ ঘাস । ঝিলের জলে সমুদ্রমুখী জলের আবেগ । গ্রীষ্মের মিষ্টি সোনালি দিন ।

একদিন, তখন দিন শেষ, বাতিঘরের আলো জ্বালাবার সময় হ'য়ে এসেছে । বাতিঘরের বাতির সামনে বৃত্তাকার গ্যালারিটায় ব'সে কথা বলছিলো তারা তিনজন—অর্থাৎ বাস্‌কেথ, ফিলিপ আর মরিস ।

তামাকের থলে থেকে পাইপে তামাক ভরতে-ভরতে বাস্‌কেথ জিগেস করলে, 'তা, এই নতুন জীবন কেমন লাগছে তোমাদের ? সহ্য হ'য়ে আসছে তো ক্রমশ ?'

'এখনো অবশ্যি অসহ্য হ'য়ে-ওঠার বা একঘেয়ে ক্লান্তিকর মনে হওয়ার সময় আসেনি ।' ফিলিপই জবাব দিলে, 'এখনো তো বেশ নিশ্চিন্ত আর নিরুপদ্রবই লাগছে ।'

'ঠিক বলেছো,' মরিসও সায় দিলে । 'এই তিনমাস তো দেখতে-দেখতেই কেটে যাবে ব'লে মনে হচ্ছে ।'

'যেমন ক'রে দিগন্তে অদৃশ্য হ'য়ে যায় জাহাজের পাল—তাই না ?'

'এই ক-দিনে দিগন্তে কিন্তু কোনো জাহাজের চিহ্নটুকুও দেখা যায়নি ।' ফিলিপ বললো, 'এদিকটায় শুনেছিলুম জাহাজের আনাগোনা খুবই বেশি, তাই এই বাতিঘর বানানো হয়েছে । অথচ কোথাও কোনো জাহাজ দেখা যাচ্ছে না । একটু আশ্চর্যই নয় কি ব্যাপারটা ?'

'ধৈর্য ধরো, বন্ধু । জাহাজ দেখতে পাবে এবং শিগগিরই ।' বাস্‌কেথ আশ্বাস দিলে,

'জাহাজ যদি এদিকটায় না-ই চলাচল করতো তবে মাইল দশেক জুড়ে সমুদ্র আলোয় ঝলমল ক'রে তোলবার জন্যে এই বাতিঘর মিছেমিছি বানাবার কোনো দরকার পড়তো না নিশ্চয়ই। এখনও তো নতুন কি না। কিছুদিন যাক, সবাই জানুক এখানে নতুন বাতিঘর হয়েছে, তারপর দেখো, এই সোজা পথ ধ'রেই, দ্বীপের পাশ দিয়েই অনবরত জাহাজের পর জাহাজ চলাচল করবে। তাছাড়া এখানে যে বাতিঘর আছে, সেটাই তো যথেষ্ট নয়। জানতে হবে সন্ধে থেকে ভোর অব্দি এ-আলো জ্বলে কি-না।'

ফিলিপ বললে, 'তাহ'লে সান্তা-ফে যদ্দিন-না বুয়েনোস আইরেসে পৌঁছুচ্ছে তদ্দিন আর সে-কথা জানতে পারছে না কেউ।'

বাস্‌কেথ সায় দিলে : 'ঠিক বলেছো। কাপ্তেন লাফায়েৎ প্রতিবেদন দেবামাত্র কর্তারা জাহাজি-জগতে খবরটা ছড়াতে একটুও দেরি করবে না।'

'সান্তা-ফে তো মাত্র ছ-দিন হ'লো রওনা হয়েছে,' মরিস বললে, 'তার গিয়ে পৌঁছুতে এখনও ঢের সময় লাগবে —'

'উঁহু, মনে হয় আর সপ্তাহখানেক লাগবে।' বাস্‌কেথ বললে, 'আবহাওয়া ভালো, সমুদ্রও শান্ত, হাওয়ার মতিগতিও ভালোই। পালে আর এনজিনে দিনরাত চ'লে, হ্যাঁ, পুরো দমে চ'লে, ঐ সময়ের মধ্যেই তার পৌঁছোনো উচিত।'

ফিলিপ বললে, 'এতক্ষণে সান্তা-ফে নিশ্চয়ই মাগেলান প্রণালী ছাড়িয়ে গেছে।'

'নিঃসন্দেহে।' বাস্‌কেথ বললে, ' এখন নিশ্চয়ই পাতাগোনিয়ার তীর ধ'রে দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে।'

এখনও যে সান্তা-ফের কথাই এদের মন জুড়ে থাকবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। স্বদেশের জাহাজ তাদের এখানে ফেলে রেখে স্বদেশেই ফিরে চলেছে। তাই এই অখণ্ড নির্জনতায় সান্তা-ফের কথা তারা কিছুতেই ভুলতে পারছিলো না।

বাস্‌কেথ হঠাৎ অন্য কথা পাড়লে। 'কী ফিলিপ, আজ কী-রকম মাছ ধরলে ?'

'বেশ-কিছু। তবে সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার কী জানো ? দেড়সের ওজনের একটা ছানাগোছের কাছিম আমি হাত দিয়েই ধরেছি, একদম খালি হাতে। কাছিমটা তীরের বালির উপর এসে উঠেছিলো।'

'শাবাশ !' বাস্‌কেথ তাকে বাহবা দিলে, 'তবে সমুদ্রের মাছ বা কাছিম-টাছিম ফুরিয়ে যাবে ব'লে মনে কোরো না কিন্তু। ধ'রে-ধ'রে ফুরোতে পারবে না তুমি। আমাদের কৌটোর মাংস কম ক'রে খরচ করতে হবে, সুতরাং যত-ইচ্ছে মাছ ধ'রে যাও। কিন্তু আমিষ তো হ'লো, এবার শাক-শব্জির কথা কিছু বলো।'

'আমি আজ বনের দিকে গিয়েছিলুম,' মরিস জানালে। 'কিছু কন্দ মূল খুঁড়ে এনেছি, রেকাবি ভ'রে খেতে দেবো। খেয়ে আমার পিঠ চাপড়াতে ইচ্ছে করবে তোমাদের।'

বাস্‌কেথ বললে, 'সে-তো অতীব উত্তম প্রস্তাব। টাটকা জিনিশের চাইতে কৌটোর খাবার কি আর খেতে ভালো হয় কখনও ?'

ফিলিপ আপশোশ ক'রে বললে, 'যদি দু-একটা গুঅনাকো শিকার করা যেতো।'

জিভ দিয়ে সড়াৎ ক'রে এক আওয়াজ ক'রে বাস্‌কেথ বললে, 'গুঅনাকো শিকার না-ক'রে, না-রেঁধে-বেড়ে আমার কাছে ও-নাম উচ্চারণ কোরো না কিন্তু। আমার তো এক্ষুনি

খিদে পেয়ে গেছে। কিন্তু মনে রেখো—যত-বড়ো শিকারীই হও না কেন, বাতিঘরের আশপাশ ছেড়ে বেশি দূরে চ'লে যেয়ো না যেন! আমাদের কাজ শিকার ক'রে বেড়ানো নয়, কাজ বাতিঘরের আলো চালু রাখা আর চারপাশের সমুদ্রে সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি রাখা।'

শিকারলোলুপ মরিস বললে, 'কিন্তু মনে করো বন্দুকের পাল্লার মধ্যে চমৎকার একটা গুঅনাকোর মাথা দেখা গেলো—'

'সে-কথা বলিনি।' বাস্কেথ বললে, 'তবে গুঅনাকোগুলো একটু বেয়াড়া গোছেরই হয়। আর যে-রকম শিং—বাপ্স!'

ষোলোই ডিসেম্বর রাত্তির ছটা থেকে দশটা অব্দি বাতিঘরের আলো চালু রাখবার ভার ছিলো মরিসের ওপর। হঠাৎ সমুদ্রের পুবদিকটায়, পাঁচ-ছ মাইল দূরে একটা আলো জেগে উঠলো। নিশ্চয়ই কোনো জাহাজের আলো। বাতিঘর তৈরি হবার পর দ্বীপ থেকে এই প্রথম কোনো জাহাজ দেখা গেলো।

বাস্কেথ আর ফিলিপ ব'সে-ব'সে আড্ডা দিচ্ছিলো। মরিস ভাবলে, এই জাহাজের খবর তাদেরও জানানো উচিত: দ্বীপে আসার পর প্রথম জাহাজ কি-না! তাই সে তাদের ডাকতে গেলো। বাস্কেথ আর ফিলিপ তক্ষুনি তার সঙ্গে এ-ঘরে চ'লে এলো। পুবদিকের জানলা দিয়ে তিনজনে টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালে।

দেখে নিয়ে, বাস্কেথ বললে, 'শাদা আলো। তার মানে একটি স্টীমারের সামনের আলো।'

স্টীমারটি তরতর ক'রে সান হুয়ান অন্তরীপের দিকে এগিয়ে আসছিলো। আধঘণ্টার মধ্যেই তারা স্টীমারটির গন্তব্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'য়ে গেলো। বাতিঘরকে দক্ষিণ-পশ্চিমে রেখে স্টীমারটি দ্রুত গতিতে লেময়র প্রণালীতে চলতে লাগলো। একটু পরে তার লাল আলো চোখে পড়লো তাদের। তারপর সেটা দ্রুতবেগে আঁধারের মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

ফিলিপ বললে, 'পৃথিবীর একেবারে শেষ সীমানার বাতিঘরটার আওতায় এই জাহাজটিই প্রথম পড়লো।'

বাস্কেথ বললে, 'তবে আশা করি নিশ্চয়ই এটা শেষ জাহাজ নয়।'

পরদিন বিকেলের দিকে ফিলিপ একটা মস্ত পাল-তোলা জাহাজ দেখতে পেলে দিগন্তে। চমৎকার আবহাওয়া সেদিন, আকাশ স্বচ্ছ, অনাবিল। দক্ষিণ-পুব থেকে মিষ্টিমধুর মৃদু হাওয়া বইছিলো, কোনো কুয়াশাই ছিলো না তখন। দশ মাইল দূর থেকেও জাহাজটিকে দেখা যাচ্ছিলো।

বাস্কেথ আর মরিসের নাম ধ'রে হাঁক পড়লে ফিলিপ। তারপর সবাই মিলে বাতিঘরে গিয়ে উঁকি দিলে। জাহাজটি পুরো দমে এগিয়ে আসছে, তবে সেটা যে কোনদিকে যাবে, উত্তরে না দক্ষিণে, সেটা তখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তারা তিনজনে এ নিয়ে রীতিমতো তর্কই জুড়ে দিলে। শেষটায় দেখা গেলো যে মরিসের কথাই ঠিক। মরিস বলেছিলো: 'এই পাল-তোলা জাহাজটা কিন্তু প্রণালীর দিকে আসবে না।' জাহাজটা সত্যি মস্ত। কম ক'রেও নিশ্চয়ই আঠারোশো টন ভার বইতে পারে। মার্কিন মুলুকে তৈরি দ্রুতগতিসম্পন্ন জাহাজগুলোর অন্যতম।

বাস্কেথ বললে, 'জাহাজটা যদি নিউ-ইংলণ্ডের না-হয় তো আমার টেলিস্কোপ একটা

ছাতা হ'য়ে যাবে ।'

মরিস জিগেস করলে, 'জাহাজটা কি তার নম্বর দেবে আমাদের ? তোমার কী মনে হয় ?'

প্রধান আলোকরক্ষীর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো : 'নম্বর দেয়া তার কর্তব্য ।'

আর, সত্যি, হ'লোও তাই । একটু পরেই জাহাজটির ওপর পৎপৎ ক'রে সংকেত পতাকা উড়লো । জানা গেলো তার নাম মনডাঙ্ক । ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার নিউ-ইংল্যাণ্ডের বর্স্টন বন্দর থেকে সে রওনা হয়েছে । আরহেনতিন প্রজাতন্ত্রের পতাকা উড়িয়ে আলোকরক্ষীরা জবাব দিলে । আর যতক্ষণ-না দ্বীপের দক্ষিণ দিকের ওয়েবস্টার অন্তরীপের আড়ালে তার মাস্তুল অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, ততক্ষণ তারই দিকে তারা একদৃষ্ট তাকিয়ে রইলো । তারপর একসময় বাস্কেথ তাকে বিদায়-অভিনন্দন জানালে : 'যাত্রা শুভ হোক মনডাঙ্কের । ঈশ্বর করুন, তাকে যেন শৃঙ্গ অন্তরীপের ঝড়ের পাল্লায় পড়তে না-হয় ।

এর পরের ক-দিন সমুদ্র ফের নির্জন—শুধু পুবদিগন্তে, অনেক দূরে, একটা-দুটো পালের চিহ্নই শুধু দেখা গেলো । যে-জাহাজগুলো স্টটেন আইল্যাণ্ডের মাইল দশেক দূর দিয়ে গেলো, তাদের কিন্তু মার্কিন বন্দরে জাহাজ থামাবার কথা নয় । বাস্কেথের মতে এগুলো অ্যান্টার্কটিকে মাছ ধরতে যাচ্ছে । নিরক্ষ রেখার দিক থেকে আসা কতগুলো ছোটো-ছোটো জাহাজও দেখা গেলো । সেগুলো পয়েন্ট সেভারেল থেকে বেশ-কিছু দূর দিয়েই প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে চ'লে গেলো ।

বিশে ডিসেম্বর অব্দি তাদের খাতায় টুকবার মতো উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি । আবহাওয়া কিছুটা বদলাচ্ছে, উত্তর-পুব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে হাওয়া বইছে । বৃষ্টিও হ'য়ে গেলো বেশ কয়েক পশলা । ছোটোখাটো ঝড়ও উঠেছিলো কয়েকবার ।

একুশে ডিসেম্বর সকালবেলায় ফিলিপ পাইপ মুখে দিয়ে চলেছে, হঠাৎ সমুদ্রতীরের অরণ্যে একটা জানোয়ারের মুখ দেখতে পেলে । কয়েক মিনিট সতর্ক চোখে তাকিয়ে তেমন-কিছু যখন দেখা গেলো না, তখন সে সোজা টেলিস্কোপ-ঘরে চ'লে এলো । এবার আর জন্তুটাকে চিনতে তার কোনো অসুবিধেই হ'লো না । হ্যাঁ, একটা গুঅনাকোই বটে । একবার গুলি ছুঁড়ে হাতের টিপ পরখ দেখলে হয় ।

তক্ষুনি সে বাস্কেথ আর মরিসের উদ্দেশে হাঁক পাড়লে । তার হাঁকডাক শুনে দুজনেই হন্তদন্ত হ'য়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালো । একটা সুযোগ নেয়া যে দরকার, সে-বিষয়ে কোনো দ্বিমতই হ'লো না । গুঅনাকোটাকে শিকার করতে পারলে একটু মুখ বদলাতে পারা যাবে । একঘেয়ে টিনের খাবার খেয়ে-খেয়ে সকলেরই বেশ অরুচি লাগছিলো ।

ঠিক হ'লো, ফিলিপ উপসাগরের দিকে যাবার পথে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর মরিস একটা বন্দুক নিয়ে ঐ গুঅনাকোটার পেছনে ধাওয়া করবে । অবশ্য গুঅনাকোটা যাতে তাকে দেখে না-ফ্যালে, সেই জন্যে খুব সাবধানে পা-টিপে যেতে হবে—কাছে গিয়ে সে ওটাকে তাড়া লাগবে ফিলিপের দিকে যাবার জন্যে ।

বাস্কেথ দুজনকেই হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে বললে, 'খুব সাবধান । এটা মনে রেখো এই জানোয়ারগুলোর ইন্দ্রিয়গুলো খুব শক্তিশালী । কোনোমতে যদি একবার দেখে ফ্যালে কিংবা গন্ধ পায়, তাহ'লে এমন ছুট লাগাবে যে কারু সাধ্য হবে না তাদের পেছনে ধাওয়া করবে

অথবা গুলি করবে ।'

মরিস জবাব দিলে, 'আচ্ছা, মনে থাকবে ।'

বাস্‌কেথ আর ফিলিপ ফের টেলিস্কোপে চোখ লাগালে । না, গুঅনাকোটা একটুও নড়েনি । তখন তারা মরিসের দিকে নজর দিলে ।

জঙ্গল মুখো চলেছে মরিস । আড়াল দিয়ে গিয়ে জানোয়ারটার অজানতেই সে তার পেছনে পৌঁছে ধাওয়া করতে পারবে ব'লেই মনে হ'লো । তারা অবশ্য বেশিক্ষণ আর মরিসের ওপর নজর রাখতে পারলে না । খানিক বাদেই সে অরণ্যের অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো ।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেছে । গুঅনাকোটা তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে । বেচারার বরাৎটা নেহাৎই খারাপ । কিন্তু মরিস এখনও গুলি করছে না কেন ?

বাস্‌কেথ আর ফিলিপ একটা গুলির শব্দ শোনবার জন্যে উৎসর্গ হ'য়ে রইলো । অথচ আশ্চর্য, কোনো গুলির শব্দই শোনা গেলো না । আরো তাজ্জব : আচমকা গুঅনাকোটা একটা পাথরের ওপর লুটিয়ে পড়লো ।

ঠিক তক্ষুনি মরিস দ্রুতপদে পাথরের আড়াল থেকে এগিয়ে এলো । তারপর কিছুক্ষণ স্থির, নিশ্চল গুঅনাকোটার দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ছুটতে শুরু করলো ।

দৌড়েই এলো সে বাতিঘরের কাছে, কি-রকম একটা অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে ডাকলে সে বন্ধুদের ।

বাস্‌কেথ বললে, 'নিশ্চয়ই অদ্ভুত-কোনো ব্যাপার হয়েছে । চ'লে এসো, ফিলিপ !'

দুজনেই ছুটে মরিসের কাছে গিয়ে হাজির হ'লো । বাস্‌কেথ ব্যগ্র স্বরে শুধোলে 'কী ব্যাপার ? কী হয়েছে ? গুঅনাকোটারই বা কী হ'লো ?'

'ওখানে গেলেই দেখতে পাবে,' মরিস তখনও হাঁফাচ্ছে । 'আশ্চর্য কাণ্ড !'

তিনজনে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে গুঅনাকোটার কাছে হাজির ।

মরিস আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ঐ দ্যাখো ।'

ফিলিপ জিগেস করলে, 'ম'রে গেছে নিশ্চয়ই ?'

'হ্যাঁ !'

'হার্টফেল ?' বাস্‌কেথ বললে, 'তাহ'লে বুড়ো হ'য়ে গিয়েছিলো, বলো !'

'না । স্বাভাবিকভাবে মরেনি । একে কেউ মেরেছে ।'

'মেরেছে ! বলো কী ?'

'হ্যাঁ, মেরেছে । ঐ দ্যাখো গুলির দাগ !'

'গুলি !' বাস্‌কেথ প্রায় চেঁচিয়েই উঠলো, তার গলায় বিস্ময় আর ভয় ।

'হ্যাঁ, গুলি ক'রেই মারা হয়েছে এটাকে ।'

না, কোনোই সন্দেহ নেই । ঐ-তো, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে গুলির দাগ । বাস্‌কেথ কি-রকম অদ্ভুত ফ্যাশফেশে গলায় বললে, 'তাহ'লে এই দ্বীপে আরো শিকারী আছে ? কিন্তু সে কে ? বা কারা ?'

ব'লেই সে উদ্বিগ্ন চোখে চারপাশটায় চোখ একবার বোলালো ।

৩

কন্‌গ্রের দামামা

বাস্‌কেথ, ফিলিপ আর মরিস যদি কখনও একবার স্টটেন আইল্যাণ্ডের পশ্চিম দিকটায় জরিপে বেরুতো, তাহ'লে দেখতে পেতো যে সেদিককার উপকূলরেখা বেশ অন্যরকম। খাড়া-খাড়া পাহাড় দিয়ে গড়া এই অংশটা যেন অতর্কিতে হুড়মুড় ক'রে সমুদ্র থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অন্যখানে যখন বেশ শান্ত আবহাওয়া, তখনও এখানে জলের মধ্যে ঢেউ আর ঘূর্ণির দাপট ভয়ংকর।

এই পাহাড়গুলোর গায়ে অজস্র গুহা পাতালপ্রসারী হা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সংকীর্ণ, গভীর, স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার। চারপাশে উঁচু-উঁচু ঢিবির মতো পাথরের স্তূপ। দ্বীপের মধ্যেকার সমতলভূমিটায় যেতে হ'লে অন্তত হাজার দুই ফুট উঁচু চূড়া আর মাইল পনেরো পথ পেরুতে হবে এখান থেকে। সমুদ্র এখানে এতটাই ভয়ংকর যে দ্বীপের এই দিকটাতেও একটা বাতিঘর বানালে ভালো হ'তো। আশা করা যায়, আরহেন্‌তিনার সরকারের পন্থানুসরণ ক'রে চিলের সরকার হয়তো একদিন সে-চেষ্টা করবে।

কিন্তু আসল কথাটা হ'লো, স্টটেন আইল্যাণ্ডের দু-দিকে দুটো বাতিঘর তৈরি করা হ'লে এই এলাকার জলদস্যুদের পক্ষে ব্যাপারটা রীতিমতো সঙিন হ'য়ে দাঁড়াবে। অনেকেরই ধারণা, এখানকার সমুদ্রে যত জাহাজডুবি হয় তার সব কটাই প্রকৃতির কৃপায় নয়, বরং বোম্বেটেদের বদান্যতায়। এখানকার জলে জলদস্যুদের উৎপাত অবর্ণনীয়রকম ভয়াবহ।

ক-বছর আগে ইগোর উপসাগরে ঢোকবার মুখটায় বোম্বেটেদের একটা দল একটা ঘাঁটি তৈরি করেছিলো। দ্বীপের এই পশ্চিম দিকেই লুকিয়ে থাকবার মতো একটা গভীর গুহা তারা আবিষ্কার করেছিলো। স্টটেন আইল্যাণ্ডে কখনোই কোনো জাহাজ আসতো না ব'লে এটা তাদের একটা নিরাপদ আশ্রয় হ'য়ে উঠেছিলো। এই বোম্বেটেদের দলে মোটমাট জনা বারো লোক। তাদের সর্দারের নাম কন্‌গ্রে। আর কন্‌গ্রের প্রধান শাগরেদ হ'লো সের্‌সান্তে।

সবাই তারা দক্ষিণ আমেরিকার লোক। জনা পাঁচেক হয়তো আরহেন্‌তিনা বা চিলের লোক, বাকি সবাই তিয়েরা দেল ফুয়েগোর বাসিন্দা। এরা সবাই কন্‌গ্রের পাল্লায় প'ড়ে জলদস্যু ব'নে গিয়েছিলো।

সের্‌সান্তে চিলের লোক। তবে চিলের কোন গাঁয়ে তার জন্ম, কিংবা সে কোন পরিবারের মানুষ, তা কেউ জানতো না। কোনকিস্তাদোরদের সুযোগ্য এই বংশধরটির বয়স বছর চল্লিশ, দোহারা চেহারা, গায়ে প্রচণ্ড জোর, আর প্রচণ্ড খাটতেও পারে। দুনিয়ায় এমন-কোনো দুষ্কর্ম নেই যা সে করতে পারে না।

আর বোম্বেটেদের সর্দার কন্‌গ্রের জীবনের কোনো তথ্যই কেউ জানতো না।

সে-যে কোথাকার লোক, তা পর্যন্ত সে ঘুণাক্ষরেও কারু কাছে ফাঁস করেনি। সত্যি-সত্যিই তার নাম কনগ্রে কি না, তাও কারু জানা ছিলো না।

সমুদ্রের এদিকটায় কনগ্রের দলবলের কুকীর্তির কথা সবাই জানে। নিজে সে বেপরোয়া মানুষ, সেও দানবের মতো খাটতে পারে। অন্য-কোনো পেশা বেছে নিলে সে মস্ত নাম করতে পারতো, কিন্তু স্বেচ্ছায় সে জলদস্যুর জীবন বেছে নিয়েছে। বোম্বেটে বলতে যা বোঝায়, সে আপাদমস্তক তাই : সবরকম কুকাজেই সে সমান ওস্তাদ। ওয়ালটার র‍্যালে বা ফ্রানসিস ড্রেকও বোধহয় দস্যুবৃত্তিতে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতো না।

কী ক'রে যে কনগ্রে আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এই দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো খুব সংক্ষেপেই তা সেরে নেয়া যায়।

ফাঁসিতে ঝোলবার উপযোগী বিস্তর অপকর্ম ক'রে মাগেলান প্রণালীর প্রধান বন্দর থেকে চম্পট দিয়ে তিয়েরা দেল ফুয়েগোয় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো এই মানিকজোড়—কনগ্রে আর সেরসান্তে। সেখানে ডেরা পাতবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের কানে গিয়েছিলো যে সমুদ্রের এদিকটায় প্রায়ই জাহাজডুবি হয়। তার মানে, স্টটেন আইল্যাণ্ডের আশপাশে নানা জায়গা নিশ্চয়ই জাহাজডুবির দামি-দামি মালে ভরা; এ-রকম একটা কথা মাথায় খেলে যেতেই তিয়েরা দেল ফুয়েগোর ডাকাবুকো জনা বারো লোক নিয়ে কনগ্রে আর সেরসান্তে একটা দুর্দান্ত দল গ'ড়ে তুলেছিলো।

একটি জেলে নৌকোয় ক'রে লেময়র প্রণালী পাড়ি দেবার সময় কলনেট অন্তরীপের পাহাড়ে ঘা খেয়ে তাদের নৌকো ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায়। অনেক কষ্টে তারা সেবার প্রাণে বেঁচেছিলো। তারপর পায়ে হেঁটে ইগোর উপসাগরের কাছে এসে পৌঁছেছিলো। সেখানে তাদের নিরাশ হ'তে হয়নি। সান হুয়ান অন্তরীপ থেকে সেভারেল পয়েন্ট অব্দি জায়গায় অগুনতি জাহাজডুবির মাল তাদের দখলে এসেছিলো। বড়ো-বড়ো সিন্দুক থেকে অজস্র সোনারুপোর তাল, অস্ত্রশস্ত্র, পিস্তল-বন্দুক, গুলি-বারুদ লাভ করেছিলো তারা। এই ভয়াবহ স্টটেন আইল্যাণ্ডের কথা নাবিকদের অজানা ছিলো না। যত-কটি জাহাজ ঝড়ের কবলে প'ড়ে এদিকে এসেছে, তাদের একটিও উপকূলের পাহাড়ের সঙ্গে সংঘর্ষ থেকে রেহাই পায়নি। কনগ্রে আর তার দলবল উপসাগরের মাঝখানে আশ্রয় না-নিয়ে সান হুয়ান অন্তরীপের ওপর নজর রাখবার জন্যে এর প্রবেশপথের ডানদিকে আস্তানা গেড়েছিলো। গোটা দলটার থাকবার উপযোগী মস্ত একটা গুহাও চোখে পড়েছিলো তাদের। উপসাগরের উত্তর দিকে একটা টিলার পেছনে গুহাটার অবস্থান ব'লে ঝড়ের প্রকোপ থেকে রেহাই পাবারও সুবিধে হয়েছিলো। তারা প্রথমেই তাদের সমস্ত মালপত্তর নিয়ে গুহায় বোঝাই করেছিলো, এমনকী খাবারদাবার ও বিছানাপাটির ব্যবস্থা করতেও ভোলেনি। এই গুহারই কাছাকাছি অন্য-একটা গুহায় বেশি দামি মালপত্র, যেমন সোনা-রুপো ধনরত্ন ইত্যাদি দিয়ে বোঝাই ক'রে রীতিমতো একটি রত্নভাণ্ডার বানিয়ে তুলেছিলো। কনগ্রের মৎলব ছিলো কোনো জাহাজ দখল করতে পারলে সমস্ত মালপত্র নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো দ্বীপে চ'লে যাবে। তার বোম্বেটে-জীবনের হাতেখড়ি ঐ এলাকাতেই হয়েছিলো ব'লে অঞ্চলটার ওপর অদ্ভুত এক মমতা ছিলো তার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো সুযোগ না-আসায় এই জলদস্যুর দল স্টটেন আইল্যাণ্ড ছেড়ে চ'লে যেতে পারেনি।

দু-বছর ধ'রে ক্রমাগত লুঠতরাজ চালিয়ে-যাওয়ার দরুন তাদের ধনভাণ্ডার ক্রমশ ফেঁপে উঠেছে। জাহাজডুবি থেকেও প্রচুর লাভবান হয়েছে তার দল। দরকার হ'লে হিংস্র লুঠতরাজ চালাতেও একটু পেছপা হয়নি। কিন্তু তবু এই দ্বীপে প্রায় বন্দীর মতোই থেকে গিয়েছে তারা। আজ অব্দি তারা কোনো অটুট জাহাজ দখল করতে পারেনি।

দিনের পর দিন কেটে যায়। লুঠপাটের ফলে রত্নগুহা ভর্তি হ'য়ে যেতে থাকে। কনগ্রের ঐশ্বর্য প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়েই চ'লে যায়।

সেরসান্তের সঙ্গে এই নিয়ে কনগ্রে প্রায়ই আলোচনা করে। তার কাছে মনে হয় এত ধনরত্ন যদি ভোগেই না-আসে তাহ'লে খামকা এ-সব জমিয়ে কী লাভ? জলদস্যু হবার পর এমন-একটা দুর্ভাগ্য যে তাদের তাড়া ক'রে ফিরবে তা কে জানতো?

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সেরসান্তে বললে, 'যদি একটা জাহাজ এই দ্বীপে নোঙর ফেলতো, আর আমরা যদি সেটা দখল ক'রে নিতে পারতুম! কিন্তু হায়, সে-রকম ভাগ্য ক'রে বোধহয় আসিনি আমরা।'

কনগ্রে দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু যেভাবেই হোক এখান থেকে আমাদের পাততাড়ি গুটোতে হবে। এখান থেকে যেতেই হবে!'

'কিন্তু কী ক'রে।' সেরসান্তের সেই পুরোনো জিজ্ঞাসা।

এ-প্রশ্নের অবশ্য কোনো জবাব আসে না। কনগ্রে চুপ ক'রেই রইলো।

সেরসান্তে বললে, 'একদিন-না-একদিন আমাদের রসদ তো ফুরিয়ে যাবেই। যতদিন দ্বীপের আশপাশে মাছ না-ফুরোয় আর শিকার জোটে, ততদিনই ভরসা। তারপর একবার শীতের কথা ভাবো দেখি! শীতের কথা মনে হ'তেই এখনই আমার গায়ের লোম কাঁটা হ'য়ে যায়।'

কনগ্রে কোনোই জবাব দিলে না। মনোভাব চেপে রাখতে তার কোনো জুড়ি নেই। কিন্তু তবু এই অসহায়তার কথা মনে ক'রে মাঝে-মাঝে সে ভীষণ খেপে উঠতো। ভাগ্যের ওপর তার কোনো হাত নেই, নেহাৎ হাত না-কামড়ানো ছাড়া। কিন্তু এই কাহিনী শুরু হবার বছর দেড়েক আগে হঠাৎ একদিন অবস্থা বদলে গিয়েছিলো।

১৮৫৮-র অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে দ্বীপে হঠাৎ একটি জাহাজ এসে ভিড়েছিলো। তার মাস্তুলে পৎপৎ ক'রে উড়ছিলো আরহেন্‌তিনার পতাকা। কনগ্রে আর তার দলবল দেখবামাত্রই চিনতে পেরেছিলো যে এটি একটি যুদ্ধজাহাজ। সুতরাং অযথা কাছে ঘেঁষবার দুঃসাহস না-দেখিয়ে, তাদের উপস্থিতির সমস্ত চিহ্ন লোপাট ক'রে দিয়ে, গুহার ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো তারা, সারাক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ছিলো কখন জাহাজটি দ্বীপ থেকে ফিরে যায়। জাহাজটি ছিলো সান্তা-ফে। বাতিঘর তৈরির বিষয়টার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতেই সান্তা-ফের এই আবির্ভাব ঘটেছিলো। সেবার দিন কয়েক বাদেই প্রাথমিক কাজকর্ম শেষ ক'রে সান্তা-ফে দ্বীপ ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলো। বোম্বেটে দল মোটেই ধরা পড়েনি। বরং সেরসান্তে এক অন্ধকার রাত্রে সান্তা-ফের কাছাকাছি লুকিয়ে-লুকিয়ে ঘোরাঘুরি ক'রে টুকরোটাকরা কথাবার্তা শুনে জাহাজটি কেন দ্বীপে এসেছে তার আসল উদ্দেশ্যটা জেনে ফেলেছিলো।

ইগোর উপসাগরে একটি বাতিঘর তৈরি হবে।

অথচ এই দ্বীপ ছেড়ে অন্য-কোথায় গিয়েই বা তারা আশ্রয় নেবে ?

কিন্তু এখানে তো আর থাকা চলে না। আঁতিপাঁতি ক'রে আরো ভালো একটা আস্তানা খুঁজেছিলো কন্‌গ্রে। শেষ অব্দি স্টটেন আইল্যাণ্ডের পশ্চিম দিকে একটা নতুন গুহার সন্ধান পেয়ে সমস্ত মালপত্র স্থানান্তরিত করেছিলো। এক বছরেরও বেশি থাকবার উপযোগী রসদ নিয়ে সেখানেই তারা উঠে গিয়েছিলো। কারণ, সের্‌সান্তে জেনে এসেছিলো, বাতিঘর তৈরি করবার জন্যে শিগগিরই অনেক লোকজন এই দ্বীপে এসে হাজির হবে। কিন্তু দু-দুটো গুহার মালপত্র সরিয়ে নেবার সময় ছিলো না ব'লে বেশির ভাগ মালাপত্র সরিয়ে নিয়ে, গুহার মুখটা ভালো ক'রে পাথর-টাথর দিয়ে বন্ধ ক'রে, বাকি জিনিশপত্র সেখানে রেখেই দ্বীপের পশ্চিম দিকটায় তারা প্রস্থান করেছিলো।

বোম্বেটেরা নতুন গুহায় চ'লে যাবার পাঁচ দিনের মধ্যেই সান্তা-ফে বাতিঘর তৈরির মালমশলা আর লোকজন সমেত আবার দ্বীপে এসে হাজির হয়েছিলো। বাতিঘর বানাবার জায়গা বেছে নেয়া হ'লো, যথারীতি কাজও শুরু হ'য়ে গেলো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই দ্বীপের পশ্চিম দিকের গুহায় আশ্রয় নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিলো বোম্বেটেদের। একটি ঝরনা থেকে তারা তাদের পানীয় জল সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলো। মাছ ধ'রে, এবং একআধটু শিকারের সাহায্যে, তাদের জমানো রসদ কম ক'রে খরচ করারও আয়োজন করেছিলো তারা। তারা শুধু অপেক্ষা ক'রে ছিলো কবে এই বাতিঘরের নির্মাণ শেষ হয়, কবে সান্তা-ফে তার কাজ সেরে চ'লে যায়। তারপরেই বেজে উঠবে কন্‌গ্রের দামামা। আকাশবাতাস কেঁপে উঠবে তখন তার ভীষণ শব্দে।

কন্‌গ্রে আর সের্‌সান্তে দ্বীপের ঘটনাবলির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলো। বাতিঘর তৈরির কাজ কখন শেষ হবে, তার মোটামুটি একটা আন্দাজ কন্‌গ্রে করেছিলো কাজের গতি দেখে; অধীরভাবে সে প্রতীক্ষা করছিলো ডিসেম্বর মাসের জন্যে, সে ধ'রে নিয়েছিলো তখনই বাতিঘর তৈরির কাজ শেষ হবে। আর তারই ওপর নির্ভর ক'রে সে তার ফন্দি এঁটেছিলো: বাতিঘর বানিয়ে, আলোকরক্ষীদের রেখে, সান্তা-ফে চ'লে যাবে—তখন শুধু ক-জন আলোকরক্ষী ছাড়া দ্বীপে আর-কেউ থাকবে না। তাই পুরো সময়টাই তাদের দলের কেউ-না-কেউ সাত-আট মাইল দূরের পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে বাতিঘরের আলো দেখতে পাবার প্রতীক্ষা করতো। নয় ডিসেম্বরের রাত্রে সের্‌সান্তেই খবরটা নিয়ে আস্তানায় পৌঁছেছিলো।

তারপরের কয়েকটা দিন কেটেছে ঘটনাবিহীন। কিন্তু সেদিন যখন শিকার করবার সময় সের্‌সান্তে তার বন্দুকের গুলিতে একটি গুঅনাকোকে জখম করলে, সেটি কিন্তু বেশ-খানিকটা ছুটে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলো—আর সেটাকে আবিষ্কার করেছিলো মরিস। ঐ ঘটনার ফলেই বাস্‌কেথরা জেনে গেলো যে দ্বীপে আরো লোক আছে, তবে তারা যে কে, সে-সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। এই লোকগুলো যখন খোলাখুলি তাদের সামনে আসতে চাচ্ছে না, তখন তাদের মৎলব খুব-একটা সুবিধের হবে ব'লে বাস্‌কেথের মনে হয়নি।

এদিকে কন্‌গ্রে ফন্দি এঁটেছিলো যে ২২শে ডিসেম্বর রওনা হ'য়ে, বড়োদিনের আগের দিন সন্ধেয়, অর্থাৎ ২৪শে ইগোর উপসাগরের কাছে গিয়ে হাজির হবে। বাতিঘর দখল করতে আর কতক্ষণ লাগবে ? মাত্র তো তিনজন আলোকরক্ষীই আছে, সম্পূর্ণ অরক্ষিত ও অপ্রস্তুত। এর পর ফের আগের গুহায় মালপত্তর সরিয়ে ফেলা যাবে।

আশঙ্কা অবিশ্যি একটা র'য়ে গেলো। সান্তা-ফে নিশ্চয়ই ফিরে গিয়ে নতুন বানানো বাতিঘরের কথা সাড়ম্বরে প্রচার করবে। সুতরাং কোনো-একটি জাহাজ, খুব বড়ো না-হোক মাঝারি মাপের চাই অন্তত, শিগগিরই জোগাড় ক'রে নিতে হবে। কনগ্রের পরিকল্পনা ছিলো, এ-রকম কোনো জাহাজ পেলেই সেটা দখল ক'রে সোজা আগেকার মৎলব অনুযায়ী প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেবে। কিন্তু কোনো জাহাজ যদি এখানে নোঙর না-ই ফ্যালে, তখন ? সান্তা-ফে ফিরে এলে সব ভণ্ডুল হ'য়ে যাবে, আবার পড়ি কি মরি ক'রে ছুটে পশ্চিম দিকে পালিয়ে আসতে হবে। কাজেই এই পরিকল্পনাটা কিছুতেই ভেস্তে দিতে দেয়া চলবে না।

২২শে ডিসেম্বর সন্ধেবেলায় কন্‌গ্রে আর সের্‌সান্তে তাদের গুহার পাশে সমুদ্রের ধারে হাঁটতে-হাঁটতে ওস্তাদ মাঝিমাল্লার মতো সমুদ্রকে খেয়াল ক'রে দেখছিলো। আবহাওয়া চমৎকার। দিগন্তে অবশ্য মেঘ জমেছে একটু, উত্তরপুব থেকে জোর হাওয়া দিচ্ছে। তখন সন্ধে সাড়ে-ছটা। কন্‌গ্রে আর তার স্যাঙাৎরা আগেকার পরিকল্পনা অনুযায়ী যাবার জন্যে তৈরি, এমন সময়ে সের্‌সান্তে জিগেশ করলে, 'তাহ'লে আমরা আমাদের সব মালপত্তর এখানে ফেলে রেখেই যাচ্ছি, তাই তো ?'

কন্‌গ্রে জবাব দিলে, 'হ্যাঁ, ওগুলো বরং পরে নিয়ে গেলেই সুবিধে হবে। আমরা যখন সে-জায়গা দখল ক'রে নেবো, তখন ...' মুখের কথা মুখেই রইলো তার। খোলা সমুদ্রের পানে চোখ পড়তেই সে একটু থমকে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'সের্‌সান্তে! দ্যাখো! ঐদিকে তাকিয়ে দ্যাখো—ঐ-যে দূরে —'

তার দেখানো দিকটায় তাকিয়েই সের্‌সান্তেও চেঁচিয়ে উঠলো, 'জাহাজ—কোনো ভুল নেই—একটা জাহাজ !'

'কী মনে হয় ?' কন্‌গ্রে বললে, 'জাহাজটা তো এদিকেই আসছে, তাই না ?'

'হ্যাঁ। দেখে তো মনে হচ্ছে একটা স্কুনার,' সের্‌সান্তে জানালে।

কন্‌গ্রেও সায় দিলে, 'ঠিকই বলেছো। দেড়শো-দুশো টনের একটা স্কুনার।'

জলদস্যুর দল তক্ষুনি গুহার সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়ালে। কন্‌গ্রে বললে, 'কোনোমতেই এ-সুযোগ হারানো চলবে না। এটাকেই দখল করার চেষ্টা করতে হবে। ঐ দ্যাখো, হাওয়া আর জোয়ারের বিরুদ্ধে কেমনভাবে লড়ছে জাহাজটা—মনে হচ্ছে বেশ মজবুত !'

রাত ঘন হ'য়ে এলো। প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করা এখন আর সম্ভব হবে না।

'কালও এটাকে অন্তরীপের পথেই দেখা যাবে। তারপর বোঝা যাবে আমরা কী করতে পারি।'

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই জাহাজটা অন্ধকারের মধ্যে বেমালুম হারিয়ে গেলো। এমনকী তার কোনো আলো অব্দি চোখে পড়লো না।

পরদিন ভোরবেলায় কন্‌গ্রেরা যখন গুহার ভেতর থেকে বেরুলো, দেখতে পেলে সেন্ট বার্থলোমিউ অন্তরীপের পাহাড়ের নিচে স্কুনারটা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

৪

মউল, ভালপারইসো

মাঝিমাল্লার কাজে কন্‌গ্রের হাত ছিলো পাকা। ওস্তাদ নাবিকই বলা যাবে তাকে। তবে কোন-কোন জাহাজ তার দখলে ছিলো, কোন-কোন সাগরে সে পাড়ি দিয়েছে, সেটা শুধু তার মতোই ওস্তাদ জাহাজি, আর তার দস্যু জীবনের ডানহাত, সের্‌সান্তেই সম্ভবত জানে। কিন্তু সের্‌সান্তে কখনও এ-বিষয়ে কাউকেই কিছু বলেনি।

যখনকার কাহিনী তখন সলোমন আইল্যাণ্ড আর নিউ-হেব্রাইডিস অঞ্চলে বোম্বেটেদের সাংঘাতিক উৎপাত ছিলো। সন্দেহ নেই, জলদস্যু হিশেবে দুজনেরই হাতেখড়ি হয়েছিলো ঐ অঞ্চলে। তাদের দলের অন্যান্যরা মাছ ধরার জাহাজে বা মাল বওয়ার জাহাজে সাগর পাড়ি দিয়েছে ব'লে সমুদ্রের হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। স্কুনারটা দখল করতে পারলে এদের দিয়েই খালাশির কাজ চালানো যাবে। স্কুনারটার তো এখানে থামবার কোনো কথা ছিলো না, হয়তো কালকের ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে যুঝতে না-পেরে এখানে সাময়িক আশ্রয় নিয়েছিলো, সন্ধেবেলায় যদি হাওয়ার গতি পালটে যায়, তাহ'লে তক্ষুনি ফের বারদরিয়ায় পাড়ি জমাবে। স্কুনারটির মাঝিমাল্লারা নিশ্চয়ই বিস্তর চেষ্টা করেছে, তবু স্কুনারটি বালির চড়াতেই আটকে আছে।

জাহাজের কাপ্তেন আর অন্যান্য নাবিকদের কী অবস্থা সে-সম্বন্ধে শুধু অনুমান করা যাচ্ছিলো, কিন্তু সঠিক কিছু বোঝা যাচ্ছিলো না। খুব সম্ভব হাওয়ার টানে জাহাজটাকে সোজা খাড়াই পাহাড়ের দিকে ছুটে যেতে দেখে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে নৌকোয় ক'রে তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। তা যদি হয়, তাহ'লে তাকে নিয়তির পরিহাসই বলতে হয়। যদি তারা জাহাজে থাকতো, তবে তারা নিরাপদেই থেকে যেতে পারতো, জাহাজটারও দেখাশুনো করতে পারতো। উত্তর-পুবদিকে দু-মাইল দূরে তাদের নৌকোকে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝতে দেখা গেলো। হাওয়ার দাপটে প্রায় উলটে-যেতে যেতে ফ্রাঙ্কলিন উপসাগরের দিকে ছুটে যাচ্ছিলো নৌকোটা। অন্তত এটা জানা গেলো যে তারা এখনও মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি।

ভরা জোয়ারের সময়ও স্কুনারে পৌঁছুনো কন্‌গ্রেদের কাছে কোনো কঠিন কাজ ছিলো না। আধমাইল দূরের ঐ স্কুনারে পৌঁছুতে তাদের শুধু কয়েকটা টিলা আর বালিয়াড়ি পেরুতে হবে। কন্‌গ্রের দল তা-ই করলে।

কন্‌গ্রে তার দলবল নিয়ে বেলাভূমিতে পৌঁছে স্কুনারটাকে একটা উঁচু বালির চূড়ায় আটকে থাকতে দেখলে। জোয়ারের সময় যখন সাত-আট হাত ফুলে উঠবে, তখন জাহাজটা চালিয়ে-আনা মোটেই কঠিন হবে না। স্কুনারটি সত্যি একশো-ষাট টনের, কন্‌গ্রের আন্দাজে ভুল হয়নি। স্কুনারটা চারপাশে একবার ঘুরে দেখলে কন্‌গ্রে, তারপর নাম-লেখা পাতটার দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করলে, 'মউল, ভালপারাইসো।'

তার মানে, ২২শে ডিসেম্বর রাত্রে ঝোড়ো হাওয়ায় ভেসে এসে চিলের একটি জাহাজ স্টটেন আইল্যাণ্ডে ভিড়েছে !

সের্‌সান্তে বললে, 'এটাতেই আমাদের কাজ চ'লে যাবে !'

'অবশ্য যদি এখনও এর তলায় কোনো ফুটো না-হ'য়ে থাকে,' কে-একজন ফোড়ন কাটলে ।

কন্‌গ্রে অমনি জানিয়ে দিলে, 'এক-আধটা ফুটো-টুটো হ'য়ে থাকলে মেরামত ক'রে নেয়া যাবে !' জাহাজটাকে সে মোটেই হাতছাড়া করতে চায় না । ভালো ক'রে, খুঁটিয়ে, সে জাহাজটা দেখতে লাগলো । না, কোথাও কোনো চোটের চিহ্ন তো চোখে পড়লো না ।

বেশ-খানিকটা কসরৎ ক'রে ঐ কাৎ-হাওয়া জাহাজটায় তারা উঠে পড়লো । দেখা গেলো, জাহাজের সবকিছুই লেফাফাদুরস্ত । কন্‌গ্রে কাপ্তেনের কামরায় ঢুকে প'ড়ে নানান দেরাজ হাৎড়ে জাহাজ সম্পর্কিত জাহাজগুলো বার ক'রে নিলে—লগবুক শুদ্ধ । তখনই সে আর সের্‌সান্তে জাহাজ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জানতে পেলে ।

চিলের ভালপারাইসো বন্দরের স্কুনার এই মউল । একশো সাতান্ন টন ওজন বইতে পারে । কাপ্তেন, সারেঙ আর দুজন নাবিক ২৩শে নভেম্বর ফকল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলো । শৃঙ্গ অন্তরীপের বাঁকটা ভালোভাবেই পাশ কাটিয়েছিলো মউল, কিন্তু লেময়র প্রণালীতে ঢোকবার সময়ে স্টটেন আইল্যাণ্ডের বালিয়াড়িতে ধাক্কা খেয়ে জাহাজটা তাদের আয়ত্তের বাইরে চ'লে যায় ।

জাহাজটা ফাঁকাই, কোনো মালপত্র নেই । কন্‌গ্রে তা চায়ওনি । এই দ্বীপ থেকে সটকে পড়ার উপযোগী কোনো জাহাজ পেলেই সে খুশি । মউলকে কাজে লাগাতে পারলেই তার অ্যাদ্দিনের স্বপ্ন সার্থক হবে । এখন তার প্রথম কাজ হ'লো, এই বালিয়াড়ি থেকে জাহাজটা উদ্ধার ক'রে কোনোরকমে সমুদ্রে নিয়ে-যাওয়া । শিগগিরই জোয়ার শুরু হবে । কন্‌গ্রে সের্‌সান্তেকে বললে, 'জোয়ার আসার আগেই এটাকে সাগর পাড়ি দেবার জন্যে তৈরি ক'রে নিতে হবে । মনে তো হচ্ছে জাহাজটার তেমন-কোনো চোট লাগেনি । সুতরাং ডুবে মরার সম্ভাবনা নেই ।'

সের্‌সান্তে খুশ মেজাজে বললে, 'শিগগিরই তা জানা যাবে, ওস্তাদ, জোয়ার শুরু হ'লো ব'লে । তারপরে কী করতে হবে, সেটাই বরং বলো ।'

'প্রথমেই এটাকে আমাদের গুহার কাছে নিয়ে যেতে হবে । সেখানে জল বেশ গভীর । সুতরাং আটকে-পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ এই জাহাজ মাত্র দশ-বারো ফুট জলেও ভেসে থাকতে পারবে ।'

'তারপরে ?'

'তারপর আমাদের এতদিনকার জমানো ধনরত্ন তুলতে হবে জাহাজে ।'

'এবং ?'

'এবং কী করা হবে সেটা পরে দেখা যাবে ।' কন্‌গ্রে আপাতত তার মৎলবটা সরাসরি ফাঁস ক'রে দিতে চাইলে না ।

জোয়ার শুরু হবার আগেই জাহাজটিকে সাগর-পাড়ি দেবার উপযোগী ক'রে তোলবার জন্যে তারা ব্যস্তসমস্তভাবে কাজে মেতে গেলো । জলের প্রথম তোড়টা আসবার আগেই

তারা সব কাজ সেরে ফেললে। আর কয়েক লহমা পরেই এই বালিয়াড়ি জলের তলায় ডুবে যাবে। কন্‌গ্রে, সের্‌সান্তে আর আরো জনা ছয় বোম্বেটে জাহাজেই থেকে গেলো, বাকি সবাই হাঁটা পথে গুহার দিকে রওনা দিলে।

এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর-কিছু করবার নেই। ঘটনাচক্র কন্‌গ্রেরই সৌভাগ্য সূচনা করেছে। অবশেষে তার ফন্দি মতন কাজ শেষ হ'তে চলেছে। বালিয়াড়ির ফাঁদ থেকে রেহাই পেতেই যেন মউলের পালে হঠাৎ হাওয়া লাগলো। জলও ক্রমেই ফুলে-ফেঁপে উঠছে। এর চেয়ে ভালো অবস্থা কন্‌গ্রে স্বপ্নেও ভাবেনি।

কিন্তু তবু উদ্বেগ থেকেই গেলো। যদি স্কুনারের নিচে কোনো ফুটো হ'য়ে গিয়ে থাকে, তাহ'লে সাগর-পাড়ি দেয়া তো দূরের কথা, তাদের তবে এখানেই ডুবে মরতে হবে। অধীর হ'য়ে কন্‌গ্রে সদলবলে ধীরে-ধীরে তোড়-বাড়তে-থাকা জোয়ারের জলের দিকে তাকিয়ে রইলো। জোয়ারের জোর যত বাড়ছে, তার আশা আর বিশ্বাসও ততই বাড়ছে। জল ফুলে ফেঁপে নাচানাচি ক'রে ছুটে চলেছে। কাৎ-হওয়া জাহাজটা আস্তে-আস্তে খাড়া হ'য়ে উঠছে দেখে, সের্‌সান্তে তার গলার খুশি চেপে রাখতে পারলে না, 'না, জাহাজে কোনো ফুটো নেই।'

কন্‌গ্রে সবাইকে তৈরি হ'য়ে নিতে হুকুম দিলে। সব ঠিকঠাক। তার দলের লোকেরা পরের হুকুমটার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। আড়াই ঘণ্টা হ'লো জোয়ার শুরু হয়েছে। রেলিঙ ধ'রে জলের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে কন্‌গ্রে জোয়ারের গতি লক্ষ ক'রে চলেছে। আর আধঘণ্টার মধ্যেই বালুকাশয্যা থেকে পুরোপুরি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মউল।

কন্‌গ্রের গলার স্বর কি-রকম তীক্ষ্ণ হ'য়ে গেলো, যখন সে হুকুম করলে নোঙর তুলতে—সম্ভবত অ্যাদ্দিন বাদে তার স্বপ্ন সফল হ'তে চলেছে ব'লেই। নোঙর তোলা হ'লো, কিন্তু জাহাজ নড়লো না। সের্‌সান্তে তখন কী ব্যাপার বোঝবার জন্যে চারপাশে খুব ভালো ক'রে চোখ বুলিয়ে নিলে। ও-হো, তখনও তো সম্পূর্ণ ভেসে উঠতে পারেনি জাহাজ, সামান্য-একটু অংশ তখনও বালিয়াড়িতে আটকে আছে। খানিকক্ষণ বাদে সেই অংশটুকুও যখন ভেসে উঠলো, তখন আচমকা একটা ঘুরপাক খেয়ে জাহাজটির মুখ আপনা থেকেই সমুদ্রের দিকে চ'লে গেলো। কন্‌গ্রের হুকুমে সব্বাই চটপট কাজে হাত লাগালে, এমনকী সের্‌সান্তে শুদ্ধু। শুধু কন্‌গ্রে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

প্রাণপণেই চেষ্টা করছিলো সবাই। দুনিয়ার কোনো অপকর্ম করতেই যারা পেছ-পা নয়, তারা সামান্য একটা বালিয়াড়ি থেকে কোনো জাহাজ নড়াতে পারবে না, এ কী কোনো কথা হ'লো! সুতরাং, 'মারো জোয়ান হেঁইয়ো, আউর ভি থোড়া হেঁইয়ো', এই জাতীয় চীৎকার ক'রে তারা কাজে লেগে গেলো।

উত্তর-পুব দিকে তখন আস্তে-আস্তে মেঘ ক'রে আসছে। যদি চটপট জাহাজটিকে দ্বীপের পশ্চিমদিকে নিয়ে যাওয়া না-যায়, তবে সাংঘাতিক এক ঝড়তুফানের পাল্লায় পড়তে হবে তাদের। তাছাড়া ওদিক থেকে যদি জোরালো হাওয়া বইতে শুরু ক'রে দেয়, তবে কিছুতেই প্রণালীর মধ্যে জাহাজ চালানো সহজ হবে না। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক সুবিধের নয়।

একটু পরেই তো ভাটা শুরু হবে। ফের দেখা দেবে বালিয়াড়ি, ফের খাঁচার মধ্যে

বন্দী হ'য়ে পড়বে মউল ।

এতক্ষণ ধ'রে একটানা খেটে সবাই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে । এতদিনকার অনভ্যাসের ফল । তাদের চেষ্টা অন্তত এবার সফল হবে না ব'লেই তখন মনে হচ্ছিলো ।

কন্‌গ্রে সকলের কাছে ছুটে-ছুটে যাচ্ছিলো । ব্যর্থ আক্রোশ আর রাগে তার মুখটা কী-রকম ভয়ংকর দেখাচ্ছে, বীভৎস । চোখ দুটো ঝকঝক ক'রে উঠেছে উত্তেজনায় । একটা কুড়ুল উঁচিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কাজে একটু ঢিলে দিলে কারুরই আজ রেহাই নেই ।'

তার অনুচরেরা তাকে যতটা জানে, তাতে এটা বুঝতে পারলে এ কেবল নিছক চোখ রাঙিয়ে শাসানো নয়, কন্‌গ্রে সম্ভবত তার কথা রাখতে একটুও দ্বিধা করবে না ।

তাই, প্রাণপণে, গায়ের যত জোর আছে প্রয়োগ ক'রে সম্মিলিত ভাবে তারা চেষ্টা করতে লাগলো । সামান্য নড়লো জাহাজ । 'আউর-ভি থোড়া, হেইয়া !' আর তারপরেই আচমকা বালিয়াড়ি থেকে জাহাজটি ছিটকে বেরিয়ে এলো ।

হর্ষ আর উল্লাসের চীৎকার উঠলো তৎক্ষণাৎ । এবার জাহাজটাকে শুধু গুহার সামনে নিয়ে যাবার ওয়াস্তা—তাহ'লেই কিস্তিমাৎ ।

কন্‌গ্রে নিজেই জাহাজ চালাবার দায়িত্ব নিলে । আর, আধঘণ্টার মধ্যেই মউল তাদের গুহার সামনে পেঙ্গুয়িন টিলার কাছে এসে নোঙর ফেললো ।

৫

ইগোর উপসাগরে

প্রথম বাজিটার কিস্তি তো মাৎ হ'লো, কাজ কিন্তু তখনও ফুরোয়নি । মউল যদিও পেঙ্গুয়িন টিলার কাছের খাড়িটায় নোঙর ফেলেছিলো, কিন্তু খোলা সমুদ্রের ক্ষিপ্ত ঢেউয়ের হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই পায়নি । উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঝড় বইলে মউলের আর বাঁচোয়া নেই । কন্‌গ্রে তা জানতো । সে মৎলব ক'রে রেখেছিলো পরদিন ভাটার টান শুরু হ'লেই সে ঐ খাড়ি ছেড়ে চ'লে যাবে । কিন্তু তার আগে খুঁটিয়ে দেখে নিতে হবে মেরামত করবার কিছু আছে কি না । সাগরপাড়ি দেবার আগে এটা তো জানা চাই যে সেই ধকল সইবার মতো অবস্থায় আছে কি না জাহাজটা ।

কন্‌গ্রে আর সের্‌সান্তে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবকিছু পরীক্ষা ক'রে দেখলে । তাদের সাহায্য করলে ভার্গাস নামে একজন চিলেনো । ভালপারাইসোর জাহাজ তৈরির কারখানায় আগে সে ছুতোরের কাজ করতো ব'লে জাহাজের কাঠামো সম্বন্ধে তার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা । তাছাড়া, মউল তো ছিলো ভালপারাইসোরই জাহাজ, না কী !

জাহাজটা মোটামুটি অটুটই আছে । তবে সামান্য যা টুকিটাকি ত্রুটি ছিলো, তার পরিমাণও কম কিছু নয় । ঐ ছোটোখাটো মেরামতিতেই দিন সাতেক কেটে যাবে ব'লে

মনে হ'লো ভার্গাসের—অর্থাৎ কাল এখান থেকে মউলকে নড়ানো মোটেই ঠিক হবে না। এ-কথা শুনে কন্‌গ্রে রেগে গিয়ে বিচ্ছিরি একটা খিস্তি করলে ভাগ্যকে, তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও বেশ হতাশ হ'য়ে পড়লো, এত চেষ্টা ক'রে স্কুনারটিকে পেঙ্গুয়িন টিলার কাছে আনা হ'লো, আর এখন সেটাকে ঠিকমতো কাজে লাগানো যাবে না! মজাটা এই যে যদ্দিন তারা মউলকে দ্যাখেনি তদ্দিন তাদের কোনো হতাশা ছিলো না, বরং মনের মধ্যে এই আশাটাই ছিলো যে শিগগিরই একদিন কোনো-একটা জাহাজ তারা দখল ক'রে নিতে পারবে। এখন প্রায় কোনো চেষ্টা বিনাই একটা স্কুনার যেই তারা পেয়ে গেছে, এখন আর তাদের একটুও তর সইছে না।

কন্‌গ্রে তার স্যাঙাৎদের মন-খারাপ আলোচনায় বাধা দিয়ে বললে, 'এ-সব ছোটোখাটো দোষত্রুটি সারিয়ে নেয়া যে উচিত, তা মানি। মউলের এখন যা দশা, তাতে তার উপর কোনো আস্থা রাখা যায় না। সম্ভবত সেইজন্যেই তার মাঝিমাল্লারা এটাকে এভাবে ফেলে রেখেই নৌকায় ক'রে পালিয়ে গিয়েছে, যদি-র কথা কে বলতে পারে? তেমন মারাত্মক কোনো ঝড়তুফান হ'লেই জাহাজটি টুকরো-টুকরো হ'য়ে যেতে পারে। প্যাসিফিক আইল্যাণ্ডস এখান থেকে কয়েকশো মাইল দূরে। জাহাজটাকে যদি সারাই না-ক'রে নিয়ে সাগর-পাড়ি দিতে যাই তাহ'লে পথে ডুবে মরারই সম্ভাবনা। তবে, এ-সব দোষ ত্রুটি সারানো যাবে—আমরা এ-সব মেরামত ক'রে নেবোই।'

ভার্গাস বললে, 'কিন্তু মেরামত করবো কোথায়? এখানে ফাঁকা জায়গায়, খাড়ির মধ্যে? যে-কোনো সময়ে এখানে ঝড় উঠতে পারে। একবার ঝড়ের পাল্লায় পড়লে এর আর বাঁচোয়া নেই।'

আরেকটি চিলের লোকও সে-কথায় সায় দিলে: 'কোনোমতেই এখানে মেরামতের কাজ চালানো যাবে না। অন্য-কোনো জায়গা বেছে নিতে হবে।'

কন্‌গ্রে দৃঢ় স্বরে জানালে 'বেশ, আমরা এখান থেকে মউলকে ইগোর উপসাগরে নিয়ে যাবো।'

কন্‌গ্রে যা খুলে বললে, তাতে তার পরিকল্পনা মতো জায়গাটিতে মউলকে নিয়ে যেতে আটচল্লিশ ঘণ্টা তো লাগবেই। লাগে লাগুক। কন্‌গ্রের পরিকল্পনা অন্তত তাদের মনে আস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে। পরদিন জোয়ারের সময়ে যাতে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে চ'লে-যাওয়া যায় তারই প্রস্তুতি শুরু হ'য়ে গেলো।

আলোকরক্ষীদের উপস্থিতিটাকে তারা আমলই দিলে না—সে নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে রাজি নয়। কন্‌গ্রে অল্প কথায় তার পরিকল্পনাটা অন্য বোম্বেটেদের বুঝিয়ে বললে, 'স্কুনারটি প্রস্তুত হবার সঙ্গে-সঙ্গে, যাত্রা শুরু করার আগে, আমি আবার ইগোর উপসাগরের ভার নেবো ব'লে ঠিক করেছি।'

তারপর সে সেরসান্তেকে যখন একান্তে পেলে, তখন প্ল্যানটা সে খুলে বললে, 'আমি কিন্তু আমার মত পালটাইনি, শুধু একটু সংশোধন করেছি মাত্র। দ্বীপের ভেতরে গা ঢাকা দিয়ে না-থেকে, সরাসরি সমুদ্রপথ দিয়েই, ঘুরে গিয়ে আমরা উঠবো সেখানে, স্কুনারটি খুব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গি ক'রেই নোঙর ফেলবে। কেউ কোনো সন্দেহ করতে পারবে না যে আমরা ভালপারাইসো থেকে আসিনি, বরং সাগরপাড়ি দেবার সময় বিপদে প'ড়ে একটা

জাহাজ অল্পক্ষণের জন্যে দ্বীপে আশ্রয় নিতে এসেছে ভেবে আমাদের স্বাগতই করা হবে। আর তারপর .....'

কন্‌গ্রের না-বলা কথাটা বুঝে নিতে কোনোই অসুবিধে হ'লো না সের্‌সান্তের–সে তাকে এত ভালো ক'রে চেনে যে যেন তার মনের কথাও পড়তে পারে ।

এই জ্যান্ত শয়তান দুটি যে-ষড়যন্ত্র করেছে, তার সাফল্য সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো সন্দেহই ছিলো না। বরং সম্ভাবনাটা এ-কথাই বলে যে তারা অনায়াসেই তাদের কাজ হাসিল ক'রে নিতে পারবে ।

যাত্রার প্রস্তুতিতেই সারাটা বিকেল কেটে গেলো । প্রথমে জাহাজে তোলা হ'লো প্রয়োজনীয় রসদ। তার পরেও হাতে অঢেল সময় আছে দেখে এখানকার গুহায় নিয়ে-আসা যাবতীয় জিনিশ জাহাজটিতে নিয়ে গিয়ে বোঝাই করা হ'লো । তাড়াহুড়ো ক'রেই মাল তোলার কাজটা তারা সারলে । বিকেল চারটে নাগাদ মালবোঝাই জাহাজটি নোঙর তোলবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে রইলো ।

তক্ষুনি যাত্রা করা যে চলতো না, তা নয় । কিন্তু রাতের বেলায় সমুদ্রের এদিকটায় জাহাজ চালাবার মতো মাথাব্যথা ছিলো না কন্‌গ্রের । হিশেব-টিশেব ক'রে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো যে তাদের গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছুতে তিরিশ ঘন্টার বেশি লাগবে না ।

আস্তে-আস্তে সন্ধে ক'রে এলো । আবহাওয়া মোটামুটি শান্তই । সূর্য ডুবে গেলো বটে, কিন্তু কুয়াশা না-পড়ায় আকাশ ও সমুদ্রের দিকে তাকাতে কোনোই অসুবিধে হচ্ছিলো না। দিগন্তে যেখানে আকাশের গায়ে মিশেছে সমুদ্র, সূর্যাস্তর শেষ স্বর্ণরশ্মি সেখানে এক অপূর্ব মায়াজাল রচনা করেছিলো; রাত্রিটা মনে হ'লো শান্তই কাটবে । বেশির ভাগ লোকই জাহাজের ডেকে রাত কাটালে, কেউ-কেউ বার্থে । কন্‌গ্রে কাপ্তেনের চেয়ার দখল ক'রে বসলো, আর সের্‌সান্তে লিউটেনান্টের । রাতে অবিশ্যি কন্‌গ্রে বারকয়েক ডেকে এসে হাওয়ার গতি খেয়াল ক'রে দেখলে । না, সবকিছু ঠিকই আছে । ঝড়-তুফানের কোনো ভয় নেই ।

সূর্যোদয়টাও হ'লো অপূর্ব জ্যোতির্ময় । বছরে খুব কম দিনই এ-রকম সূর্যোদয় হয়। আকাশ যেন টলটলে নীল, স্বচ্ছ আর নির্মল, যেন তাতে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ছায়া পড়েছে।

একটা নৌকোয় ক'রে কন্‌গ্রে তীরে এলো । উদ্দেশ্য, একটা টিলার ওপর উঠে সমুদ্রের ওপর চোখ বোলাবে । প্রভাতী সূর্যের সোনালি আলোয় সুনীল নির্মল প্রশান্ত সমুদ্র ঝিকিয়ে উঠেছে। দক্ষিণ দিকের সমুদ্র এমনিতে শান্তই, তবে প্রণালীতে ঢোকবার মুখটায় জল খানিকটা উদ্দাম, কারণ ততক্ষণে ভোরের টাটকা হাওয়া দ্রুত বেগে বইতে শুরু করেছে। সমুদ্রের কোথাও কোনো জলপোতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না । বোঝা যাচ্ছে যে মউলের এই স্বল্পকালীন যাত্রায় অন্য-কোনো জাহাজের সঙ্গে দেখা হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই ।

সবকিছু সরেজমিন তদন্ত ক'রে কন্‌গ্রে ঠিক করলে দ্বীপের পশ্চিম উপকূল দিয়েই কেপ ওয়েবস্টার, সেভারেল পয়েন্ট প্রভৃতি অন্তরীপ ঘুরে তাদের গন্তব্যস্থলে যাবে । তারপর সে টিলা থেকে নেমে পরিত্যক্ত গুহার ভেতর ঢুকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগলো, কোনোকিছু তাদের নজর এড়িয়ে গেছে কিনা ।

তখন বেলা সাতটার একটু বেশি । ভাটার টান শুরু হ'য়ে গেছে । মউল নোঙর তুললো । তারপর উত্তর-পুব থেকে আসা অনুকূল হাওয়ায় ভর ক'রে এগুবার চেষ্টা করতে

লাগলো। দশ মিনিটের মধ্যেই খাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারদরিয়ায় পড়লো মউল, আর তরতর ক'রে এগিয়ে চললো।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেণ্ট বার্থোলোমিউর পাহাড় ঘুরে অনুকূল হাওয়ায় গা এলিয়ে পুবদিকে চলতে লাগলো মউল।

এদিকে কন্‌গ্রে আর সের্‌সান্তে তো মউলের হালচাল দেখে খুব খুশি, কন্‌গ্রে ইচ্ছে করলে সন্ধের আগেই হয়তো অনায়াসে ইগোর উপসাগরের প্রবেশ মুখে গিয়ে পৌঁছুতে পারতো। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিলো উপকূলের কোথাও থেমে গিয়ে পরদিনের সূর্যোদয় অব্দি অপেক্ষা করা। কাজেই তেমন তাড়া নেই ব'লে ঘণ্টায় মাত্র পাঁচ-ছ মাইল বেগেই সে জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করলে।

সারাদিনের মধ্যে কোনো জাহাজই তারা দেখতে পেলো না সমুদ্রে, সন্ধের সময় তারা এসে পৌঁছুলো ওয়েবস্টার অন্তরীপের পুবদিকে, অর্থাৎ দিব্যি চমৎকার ভাবেই তাদের যাত্রার প্রথমার্ধ সমাপ্ত হ'লো। স্কুনারটি তীর থেকে খানিকটা দূরে নোঙর ফেললো।

আবহাওয়া আগের দিনের মতোই শান্ত ছিলো ব'লে জলদস্যুদের মৎলব সিদ্ধ হবার পুরো সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রাত দশটার সময় হওয়ার বেগ থেমে গেলো, তারপর ফের ভোর যখন ফুটি-ফুটি তখন আরেকটা নতুন দিনের বার্তা বহন ক'রে আনলে টাটকা জোরালো হাওয়া। সূর্যের প্রথম আলো ফোটবার সঙ্গে-সঙ্গেই নোঙর তোলবার ব্যবস্থা করলে কন্‌গ্রে। মউল ফের ভেসে চললো তার নতুন লক্ষ্যের দিকে। কন্‌গ্রে কিন্তু মউলকে পুরোদমে চালায়নি, তীরের মাইল খানেক দূর দিয়ে অর্ধগতিতেই চলেছে মউল। এদিককার উপকূল কী-রকম তারা কেউই তা জানতো না ব'লেই অজানা তীরের গা ঘেঁষে চলবার সাহস করেনি কন্‌গ্রে।

বেলা দশটার সময় তার গিয়ে ব্রসম উপসাগরের মুখে পড়লো। এবারে জলের তোড়ের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে দেয়া ছাড়া তাদের কোনো গত্যন্তর ছিলো না। এখানে সমুদ্র যেন ফুঁসছে, তারই মধ্যে দিয়ে খুব সাবধানে স্কুনারটিকে চালাতে লাগলো তারা। বিকেল চারটের সময়ে দিগ্‌দর্শিকায় মাপজোক ক'রে কন্‌গ্রে আবিষ্কার করলে যে অনুকূল হাওয়া পাবে ব'লে তারা গন্তব্যস্থল থেকে বেশ-খানিকটা দূরেই এসে পড়েছে। তখন সে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে সরাসরি ইগোর উপসাগরের দিকে জাহাজ চালাবার হুকুম দিলে। পয়েণ্ট সেভারে তখন জাহাজ থেকে মাইল চারেক উত্তর-পশ্চিমে। দূরে তখন দেখা যাচ্ছে, ছায়ার মতো, সান্ হুয়ান অন্তরীপের উপকূল।

এখান থেকে পৃথিবীর একেবারে শেষ সীমানার আলোকস্তম্ভটির চূড়ায় চোখ পড়লো কন্‌গ্রের। কাপ্তেনের কামরায় যে-টেলিস্কোপটি ছিলো তাতে চোখ লাগিয়ে সে বাতিঘরের দিকে তাকালে। একজন আলোকরক্ষীকে দেখতে পেলে সে, আলোকরক্ষীটি লণ্ঠন-ঘরে ব'সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে।

তখনও সূর্যাস্ত হ'তে তিন ঘণ্টা বাকি। কন্‌গ্রে ঠিক করলে রাত ঘনিয়ে আসার আগেই সে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবার চেষ্টা করবে।

আলোকরক্ষীরাও যে মউলকে দেখতে পেয়েছিলো, সেটা বলাই বাহুল্য। প্রথমে যখন বাস্‌কেথরা তিনজনে স্কুনারটিকে দেখতে পেলে, ভাবলে যে সেটা সম্ভবত ফকল্যাণ্ড

আইল্যাণ্ড যাচ্ছে। কিন্তু একটু বাদেই স্পষ্ট বোঝা গেলো, স্টটেন আইল্যাণ্ডই তার লক্ষ্য।

অবশ্য, মউলকে আলোকরক্ষীরা দেখতে পেয়েছে কি পায়নি এ নিয়ে কন্‌গ্রে কোনোই মাথা ঘামায়নি। তার মাথায় যে-ফন্দি খেলে গিয়েছে তাতে তারা দেখতে পেলো কি পেলো না, এতে কন্‌গ্রের ব'য়েই গেলো। সে বরং যাত্রার শেষ পর্বের নমুনা দেখে সন্তোষই লাভ করছিলো। তবে এবার যাত্রা বিঘ্নসংকুল। যে-কোনো সময়ে এদিক-ওদিক ছড়ানো ডুবো পাহাড়ের চূড়োয় ঘা লেগে মউল ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যেতে পারে।

এবং হ'লোও তাই। লক্ষ্যে পৌঁছুবার একটু আগে তার এক স্যাঙাৎ চেঁচিয়ে জানালে যে জাহাজে একটা ছ্যাঁদা হয়েছে আর সেখান দিয়ে খোলের মধ্যে জল ঢুকছে। ত'বে ফুটোটা নেহাৎই ছোটো ব'লে বাঁচোয়া। ভার্গাস কোনোমতে তাড়াহুড়ো ক'রে সে-জায়গাটা মেরামত ক'রে দিলে। পরে অবশ্য আরো ভালো ক'রে সারিয়ে নিতে হবে, তবে আপাতত এতেই কোনোরকমে কাজ চ'লে যাবে।

সন্ধে ছ-টার সময় মউল আস্তে-আস্তে এসে ইগোর উপসাগরে ঢোকবার মুখটায় পৌঁছুলো। আর সাড়ে-ছটার সময় বাতিঘরের উজ্জ্বল আলোয় সমুদ্র আলো হ'য়ে উঠলো। সামনে যে অন্ধকার ঘনাচ্ছিলো, বাতিঘরের আলোয় তা দূর হ'য়ে গেলো। সবেমাত্র তৈরি হয়েছে এই বাতিঘর আর সরাসরি তার দিকে ছুটে আসছে চিলের একটি স্কুনার, বাতিঘরের জীবনের প্রথম জাহাজ—যার মালিক—বাস্‌কেথরা জানে না—এখন একদল বেপরোয়া জলদস্যু। ক্রমশ তীরের দিকে এগিয়ে আসছিলো মউল।

কন্‌গ্রের ঠিক পেছনেই ডেকে দাঁড়িয়েছিলো সের্‌সান্তে। সে বললে, 'পরিকল্পনার প্রথম পর্ব তাহ'লে ভালোভাবেই শেষ হ'লো!'

কন্‌গ্রে বাঁকা ভাবে বিচ্ছিরি হেসে বললে, 'বাকি পর্বগুলো আরো ভালোভাবে শেষ হবে। এ নিয়ে তুমি অযথা কোনো চিন্তা কোরো না।'

মিনিট কুড়ি বাদে তীরের কাছাকাছি পৌঁছে নোঙর ফেলবার উদ্‌যোগ করতে লাগলো মউল।

আর তক্ষুনি তীরের বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে-থাকা দুটি লোক অভিনন্দন জানালে মউলকে। ....হ্যাঁ, ফিলিপ আর মরিস। মউলের কাছে যাবার জন্যে দড়ি-দিয়ে-বাঁধা নৌকাটা খুলে তারা জলে ভাসালে। বাস্‌কেথ তখন লণ্ঠনঘরে তার কাজে ব্যস্ত।

ঠিক যখন ঘড়-ঘড় আওয়াজ ক'রে মউলের নোঙর পড়ছে, তখনই ফিলিপ আর মরিস লাফ দিয়ে মউলের ডেকে উঠে পড়লো। কন্‌গ্রে একটা ইশারা করলে। অমনি চকচকে ধারালো একটা কুড়ুল নেমে এলো মরিসের ঘাড়ে। কোনো আর্তনাদ করবারও অবসর পেলে না সে, তৎক্ষণাৎ সে ডেকের ওপর ছিটকে প'ড়ে গেলো। আর পরক্ষণেই একসঙ্গে দুটো রিভলভার গ'র্জে উঠলো, আর ফিলিপও বন্ধুর পাশে লুটিয়ে পড়লো। মরতে তাদের এক লহমারও বেশি লাগলো না।

বাস্‌কেথ তখন লণ্ঠনঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো। আচমকা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো রিভলভারের শব্দ কানে পৌঁছুলো তার—সহকর্মীদের এমন নৃশংস হত্যা দেখে সে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। কারা আছে এই জাহাজে? মিথ্যেমিথ্যি, অকারণে, কোনো কথা না-ব'লেই তারা ফিলিপ আর মরিসকে মারলো কেন? উত্তর খোঁজার মতো

সময় তার নেই। এই অজ্ঞাতপরিচয় খুনেগুলো যদি তার সন্ধান পায়, তবে তার কপালেও অমনি অতর্কিত মৃত্যু আছে। খুনেগুলো কারা, তা সে জানে না, তবে তাদের অভিধানে দয়া ব'লে যে কোনো শব্দ নেই তা তো বোঝাই যাচ্ছে। হতভাগ্য ফিলিপ আর মরিস! তাদের বাঁচাবার জন্যে সে কিছুই করতে পারেনি। কী করবে, স্থির করতে না-পেরে বাস্‌কেথ হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। চিলের ভালপারাইসো বন্দর থেকে আসা কোনো জাহাজের লোক কেন এভাবে আলোকরক্ষীদের খুন করবে, সেটা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছিলো না।

কতক্ষণ সে ও-রকম হতভম্বের মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়েছিলো জানে না, তবে সংবিৎ ফিরে পেতেই সে মনে-মনে তার কর্তব্য ঠিক ক'রে ফেললে। তার প্রথম এবং আশু কর্তব্য: যে-ক'রেই হোক এই খুনে শয়তানগুলোর হাত থেকে আত্মরক্ষা করা। হয়তো তাদের জানা নেই যে দ্বীপে তৃতীয় একজন আলোকরক্ষীও আছে। তবে সেটা তো 'হয়তো'র কথা। আর না-যদি জেনেও থাকে, জানতে কতক্ষণ? জাহাজটি তীরে ভেড়াবার সঙ্গে-সঙ্গেই তারা বাতিঘরে ছুটে আসবে, বাতিঘরের আলোও নিশ্চয়ই নিভিয়ে দেবে, অন্ধকারের অভিশাপে ডুবিয়ে দেবে সমুদ্র। ফিলিপ আর মরিসকে তারা নিশ্চয়ই আগেকার কোনো শত্রুতার জন্যে মারেনি—মেরেছে নিশ্চয়ই তারা যে বাতিঘরের আলোকরক্ষী, সেই জন্যেই। তাদের আসল শত্রুতা নিশ্চয়ই এই আলোর সঙ্গে।

এটা ভাবতে তার প্রায় কোনো সময়ই লাগেনি। এক মুহূর্তও ইতস্তত না-ক'রে সে লণ্ঠনঘর থেকে নিচে নেমে এলো। নষ্ট করবার মতো একফোঁটাও সময় নেই তার হাতে। স্কুনারটি থেকে তখন জলে নৌকো ভাসাবার তোড়জোড় চলছে। অর্থাৎ, তার মৃত্যুদূতেরা এগিয়ে আসছে সুনিশ্চিত। বাস্‌কেথ তাড়াতাড়ি গোটা কয়েক রিভলভার কোমরের বেল্টে গুঁজে একটা ব্যাগের মধ্যে প্রচুর গুলি-বারুদ, কিছু খাবার আর অন্য দু-একটা জরুরি জিনিশ ভ'রে হুড়মুড় ক'রে বাতিঘরের লাগোয়া ঢালু জমিটায় নেমে পড়লো। যে ক'রেই হোক, অন্ধকারের মধ্যে তাকে গা ঢাকা দিতে হবে, এক্ষুনি।

৬

রাত্রি একটানা

দিনের আলো নিভে যেতেই স্টটেন আইল্যাণ্ডের ওপর রাতের আঁধার নেমে এলো। বাতিঘরে আলো জ্বালানো হয়নি ব'লে অন্ধকার আরো নিবিড় ঘন। তার ওপর হিম কুয়াশা পড়ছে আজ। সাঁ-সাঁ ক'রে সমুদ্র থেকে ব'য়ে আসছে তীব্র হাওয়া। হয়তো ঝড় উঠবে। কী-রকম থমথম করছে সব! রাতটাকে মনে হচ্ছে ভয়াল-কিছু, করাল। বাস্‌কেথের চোখের সামনেই তো একটু আগে অতর্কিত মৃত্যু হানা দিয়ে গেছে—তার সহকর্মীরা সম্পূর্ণ অকারণে খুন হ'য়ে গেছে।

শীত শেষ হ'য়ে গিয়েছে, অথচ আজকের রাতটা বাস্‌কেথের কাছে ঘোর শীতের কোনো

অন্ধকার রাত ব'লে মনে হচ্ছে। সে যে হি-হি ক'রে কাঁপছে, সে কি ঠাণ্ডার জন্যে, না কি এই কাঁপুনি উঠে আসছে আতঙ্ক থেকে? বাস্‌কেথের চারপাশে এক দুর্বোধ্য আঁধার রাত নেমে এসেছে। তার হতভাগ্য বন্ধুদের রক্তাক্ত মৃতদেহগুলো ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে জলে—তারও তো ঐ দশাই হ'তো যদি-না সে দৈবাৎ লণ্ঠনঘরে সে-সময় একটা জরুরি কাজে আটকে যেতো।

দারুণ মনখারাপ হ'য়ে গেলো বাস্‌কেথের। এই কিছুদিনের মধ্যেই সে তার নতুন বন্ধুদের ভালোবেসে ফেলেছিলো। তারা অনেক বছর একসঙ্গে কাজ করেনি সত্যি, কিন্তু, একসঙ্গে তারা বাতিঘরের কাজের জন্যে আবেদন করেছিলো, আর একসঙ্গেই বুঝে নিয়েছিলো বাতিঘরের ভার। কিন্তু এখন এই দ্বীপটায় সে-যে শুধু সঙ্গীসাথীহীন একা মানুষ তা-ই নয়, তার জন্যে ওৎ পেতে আছে নিশ্চিত মৃত্যু, জনাকতক মানুষমূর্তির ছদ্মবেশে।

কিন্তু স্কুনারটা কাদের? কেনই বা স্টটেন আইল্যাণ্ডে নোঙর ফেলেছে? কী মৎলব এই লোকগুলোর? বোম্বেটেগুলো এই দ্বীপে যে নতুন আসেনি, তা তাদের হাবভাব দেখেই বাস্‌কেথ বুঝতে পেরেছিলো। কিন্তু কী করতে চাচ্ছে এরা? কেন তারা দ্বীপে নেমেই বাতিঘরের আলো নিভিয়ে দিলে? বাতিঘরের সাথে তাদের এই দুশমনি কীসের? কোনো জাহাজ যাতে তাদের অনুসরণ ক'রে এখানে না-আসাতে পারে, সেই জন্যেই কি তারা আলো নিভিয়ে দিয়েছে?

এ-সব হিংটিংছট প্রশ্নের উত্তর বাস্‌কেথ জানে না। তাদের কাছাকাছি বা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ-সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মানেই হ'লো অপঘাত মৃত্যুকে ডেকে আনা। তা সে করবে না। তবে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটা মস্ত ভুল সে ক'রে ফেলেছে এর মধ্যেই। বাতিঘর থেকে পালিয়ে-আসার সময় কোনো কাগজপত্র সে নিয়ে আসেনি। সেগুলো থেকে সহজেই জলদস্যুরা তার উপস্থিতির কথা জেনে যাবে। আর তারপর ...

বাকিটা আর ভাবতে পারলে না বাস্‌কেথ। তীর থেকে দুশো গজ দূরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো সে। সেখান থেকে জাহাজের ডেকে তীরের বালিয়াড়িতে আর বাতিঘরে দুর্বৃত্তদের আলোর নড়াচড়া চোখে পড়ছিলো তার। মাঝে-মাঝে জোর গলায় হাঁকডাকও শুনতে পাচ্ছিলো সে।

রাত দশটা নাগাদ আস্তে-আস্তে সব আলোই নিভে গেলো। স্টটেন আইল্যাণ্ডের বুকে সুষুপ্তি এসে জমাট বেঁধেছে এখন।

এখন সে যেখানে আছে সেখানে আর-কোনোমতেই থাকা চলে না: দিনের আলো ফোটবামাত্র তারা তার উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে। এবং তখন যে এই দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে সামান্যতম দয়াও পাওয়া যাবে না, সেটা সে ভালো ক'রেই জানে। যে-ক'রেই হোক, এদের হাত থেকে তাকে রেহাই পেতেই হবে। কিন্তু যাবে কোথায়? দ্বীপের গভীরে? উপসাগরের প্রবেশমুখে? উঁহু, না, মিথ্যে এ-সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখান থেকে তাকে সটকে পড়তে হবেই—এবং সান্তা-ফে যদ্দিন-না ফিরে আসে, তদ্দিন তাকে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু তাড়াতাড়িতে সঙ্গে যে-রসদ নিয়ে এসেছে তাতে তো দিন তিনেকের বেশি চালানো যাবে না। তারপর কী করবে সে? যদি কোথাও লুকোতেও পারে, তার খাদ্য জুটবে কোত্থেকে? এ-অবস্থায় খোলামেলায় বেরিয়ে গিয়ে মাছ ধরার চেষ্টাও

করা যাবে না। আর আগুনই বা জ্বালাবে কী ক'রে ?

শেষ অব্দি সে সাহসে বুক বেঁধে ঠিক করলে যখন যা ঝামেলা পাকাবে, তখনই তার সমাধান করা যাবে। এখন তো সান হুয়ান অন্তরীপের বেলাভূমিতে রাতটা কাটানো যাক, পরে ভেবে-চিন্তে যা-হয় একটা-কিছু ঠিক করা যাবে। মনে-মনে এ-কথা ভেবে সে স্কুনারটির দিকে তাকালে। না, সেখান থেকে কোনো আলো বা আওয়াজের রেশ পাওয়া যাচ্ছে না। শয়তানগুলো নিশ্চয়ই নিজেদের নিরাপদ মনে ক'রে এখন আরাম ক'রে ঘুমুচ্ছে।

বাস্‌কেথ টিলার তলা দিয়ে উত্তরমুখো চলতে শুরু করলে। থমথম করছে রাত, হাওয়া আর জলের শব্দ ছাড়া আর-কোনো শব্দ নেই। সে যখন অন্তরীপের শেষ মাথায় এসে পৌঁছুলো, রাত তখন প্রায় এগারোটা। একটা সমতল জায়গা খুঁজে নিয়ে সে মাটিতে শুয়েই রাতটা কাটিয়ে দিলে। ঘুম ভাঙলো পরদিন সূর্য ওঠবার আগেই। প্রথমেই চোখ রগড়ে সে আশপাশে ভালো ক'রে তাকিয়ে নিলে। না, কোনোদিকেই কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্রতীরেও কোনো নৌকো নেই। মউলের নিজস্ব নৌকো আর আলোকরক্ষীদের ডিঙি—দুইই এখন এই দুর্বৃত্তদের হাতে। দূর সমুদ্রেও কোনো নৌকো বা জাহাজের চিহ্ন নেই।

বাতিঘর তৈরির আগে এদিকটায় নৌচালনা যে কী ভয়াবহরকম কঠিন ছিলো, সেটা বাস্‌কেথের মনে প'ড়ে গেলো। বিড়বিড় ক'রে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে নিজেকেই শোনালে, 'শয়তানগুলো বাতিঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে। নিজেদের দরকার না-পড়লে সে-আলো আর কখনোই তারা জ্বালবে না। শয়তানের বাচ্চা !'

সত্যি, বাস্‌কেথের রাগ করার কারণ ছিলো। আলো নেভাবার পরিণাম ভয়ংকর হ'য়ে উঠতে পারে। একটা পাথরের ওপর ধপ ক'রে ব'সে প'ড়ে বাস্‌কেথ ফের পূর্বাপর ঘটনাগুলো তলিয়ে দেখলো, আর তক্ষুনি টের পেলে সে কী ভয়ংকর অবস্থায় এসে পড়েছে। কিন্তু কী করতে পারে সে এখন ? একা-একা ?

কিছুই না। সান্তা-ফের ফিরে-আসার অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই আর তার করার নেই। কিন্তু তার ফিরতে-ফিরতে তো এখনও আরো দু-মাস। যদি এটা ধ'রেও নেয় যে এতদিনের মধ্যে সে দস্যুদলের হাতে পড়বে না, তবু প্রশ্নটা থেকেই যায়—কী ক'রে সে এতদিন টিকে থাকবে ?

প্রথমেই এক আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। বাতিঘরের সবকিছু দেখে-শুনে দস্যুরা নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছে যে এখানে সবশুদ্ধু তিনজন আলোকরক্ষী ছিলো। নিরুদ্দেশ তৃতীয়জনকে খুঁজে বের করতে নিশ্চয়ই তারা হন্যে হ'য়ে উঠবে।

ভাবতে-ভাবতে বাস্‌কেথ শেষটায় তার স্বাভাবিক শক্তি ফিরে পেলে। হতাশায় দ'মে যাবার পাত্র বাস্‌কেথ নয়।

কিছুক্ষণ তন্নতন্ন ক'রে খোঁজবার পর পাহাড়ের গায়ে সে একটা সংকীর্ণ গুহা আবিষ্কার করলে। দশফিট গভীর আর পাঁচ-ছ ফিট চওড়া হবে গুহাটি। ভেতরে বিছিয়ে আছে মসৃণ মিহি বালির আস্তর। ভালো ক'রে খেয়াল ক'রে দেখে সে বুঝতে পারলে, জোয়ারের জল বা ঝড়ের আক্রমণ এই গুহায় পৌঁছুতে পারবে না। সেই সংকীর্ণ মুখটা দিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকে সে বাতিঘর-থেকে আনা তার যৎসামান্য জিনিশপত্র ভরা ব্যাগটা নামিয়ে

রাখলে। গুহার পাশেই সে বরফ-গলা জল দিয়ে গ'ড়ে-ওঠা একটা ঝিলের খোঁজ পেয়েছিলো। অতএব পানীয় জলের অভাবে মরবার সম্ভাবনা আপাতত নেই।

কিছু শুকনো জারানো মাংস আর কয়েকটা বিস্কুট গলাধঃকরণ ক'রে সে কিছুটা চাঙা হ'য়ে উঠলো। তারপর জল খাবে ব'লে বাইরে যেতে গিয়ে কীসের একটা আওয়াজ শুনে সে থমকে দাঁড়ালে। বদমায়েশগুলো তাহ'লে তার খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়েছে! গুহার দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সে সাবধানে বাইরে তাকালে। দেখতে পেলে, একটা নৌকোয় ক'রে চারজন লোক দ্বীপের এদিকটায় আসছে। দুজন ব'সে আছে, আর বাকি দুজন নৌকো চালাচ্ছে। নৌকোখানা বাতিঘরের নয়। তার মানে, স্কুনারটিরই নিজস্ব ডিঙি। তারা যে এই দ্বীপে নতুন আসেনি, তা তাদের নৌকো চালাবার কায়দা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

বাস্‌কেথ তার ঐ আড়াল থেকেই লোকগুলোকে ভালো ক'রে লক্ষ করতে লাগলো। যে-লোকটা হাল ধ'রে ব'সে আছে তাকেই তার সর্দার ব'লে মনে হ'লো: নিশ্চয়ই সেই স্কুনারটির কাপ্তেন। নৌকোটা তখন বাস্‌কেথ যেখানে আছে, তার প্রায় শ-খানেক গজ নিচে হবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। সর্দার লোকটি ইশারা করতেই নৌকোটা তীরে ভেড়ানো হ'লো। বেলাভূমির কাছে নোঙর ফেলবার পর তারা তীরে নামলে, এবার তাদের কথাবার্তাও কানে এলো বাস্‌কেথের।

'এ-জায়গাটাই তো?'

'নিশ্চয়ই। পাহাড়টার বাঁকে, এখান থেকে বিশগজটাক দূরে হবে।'

'আলোকরক্ষীরা যে গুহাটি আবিষ্কার করতে পারেনি, সে আমাদের মস্ত সৌভাগ্য।'

'এমনকী দেড় বছর ধ'রে যারা বাতিঘর তৈরি করছিলো তারাও ওটা আবিষ্কার করতে পারেনি।'

'হ্যাঁ। সবসময় তারা নিজেদের কাজ নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছিলো।'

'তাছাড়া গুহার মুখটা যেভাবে আটকে রাখা হয়েছিলো তাতে সেটা আবিষ্কার করা খুব সহজ কাজ ছিলো না।'

'চ'লে এসো।' সর্দারগোছ লোকটার গলা।

কোনাকুনি বালিয়াড়ি পেরিয়ে দুজন সঙ্গীকে নিয়ে চলতে লাগলো সর্দার। লুকোনো জায়গা থেকে বাস্‌কেথ তাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখলে। তাদের কথাবার্তা শুনতেও এতক্ষণ তার কোনো অসুবিধে হচ্ছিলো না। খানিকক্ষণ বাদেই তাদের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেলো। শুধু দেখা গেলো, নৌকোর আশপাশে একটি লোক হাঁটাহাঁটি করছে।

তাহ'লে কাছেই এদের একটা গুহা আছে! এখন আর তার বুঝতে কোনোই অসুবিধে হ'লো না যে এরা একদল জলদস্যু এবং বাতিঘরের কাজ শুরু হওয়ার আগে থেকেই এরা স্টটেন আইল্যাণ্ডে ঘাঁটি গেড়ে ছিলো। দস্যুগুলো তাহ'লে এই গুহাটাতেই লুঠপাটের মাল লুকিয়ে রেখেছে। এবার কি তাহ'লে ঐ স্কুনারে ক'রে লুঠের মাল সরিয়ে ফেলার মৎলবে আছে এরা?

হঠাৎ বাস্‌কেথের খেয়াল হ'লো, আরে, সে তো গুহায় লুকিয়ে-রাখা এদের রসদপত্তরের সুযোগ নিতে পারে। নেয়াটা খুবই জরুরি। ভাবনাটা মনে জেগে উঠতেই

সে যেন আশার আলো দেখতে পেলে এতক্ষণে। নৌকোটা চ'লে গেলে এদের ঐ গুহা থেকে কিছু খাবারদাবার এই গুহায় নিয়ে-আসা যাবে। সান্তা-ফের ফিরে আসা অব্দি খাবারের জন্যে তাহ'লে তার আর তেমন অসুবিধে হবে না। সে তখন মনে মনে প্রার্থনা করলে, সান্তা-ফে ফিরে-আসা অব্দি এই দস্যুগুলো যেন দ্বীপ ছেড়ে চ'লে না-যায়। তারপর দেখা যাবে তাদের কত ক্ষমতা! তার বন্ধুদের হত্যার জন্যে মাশুল এদের দিতেই হবে—এদের কিছুতেই ছেড়ে দেয়া চলে না।

সান্তা-ফে ফিরে-আসা অব্দি এরা দ্বীপে থাকবে কি না, সে-সম্বন্ধে খোঁজ নেবে ব'লে ঠিক করলে বাস্‌কেথ।

...

ঘণ্টাখানেক বাদে দস্যু তিনজন তাদের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে নৌকোর দিকে চলতে লাগলো। তার গোপন জায়গা থেকে তাদের কথাবার্তা শুনে মনে-মনে খুশি হ'য়ে উঠলো বাস্‌কেথ।

'আলোকরক্ষীরা বড়ো ভালো ছিলো হে! অন্যের ব্যাপারে মিথ্যে তারা নাক গলায়নি। মালপত্র সবই ঠিক আছে।'

'যাত্রার সময় মউল একেবারে ঠাশাঠাশি বোঝাই হ'য়ে যাবে।'

'অত রসদ আছে ব'লে অনেক ঝামেলা বেঁচে গেলো।'

'প্যাসিফিক আইল্যাণ্ডস-এ পৌঁছুবার আগে সে-সব বেশি খরচ করা চলবে না আমাদের।'

এইসব কথা বলতে-বলতে প্রাণ খুলে হাসাহাসি করছিলো তারা। তাদের হাসির শব্দ শুনে বাস্‌কেথ রাগে যেন প্রায় উন্মাদ হ'য়ে গেলো। ইচ্ছে করছিলো, গুলি ক'রে এদের মুখের হাসি বন্ধ ক'রে দেয়। কিন্তু উত্তেজনা একটু প্রশমিত হ'লে সে বুঝতে পারলে যে ও-রকম পাগলামো না-ক'রে সে ভালোই করেছে।

'দুনিয়ার শেষ সীমানার সবেধন বাতিঘরটি এবার অন্ধ হ'য়ে পড়লো—' এই ব'লে একজন দস্যু হো-হো করে হেসে উঠলো।

'মউল এখান থেকে যাত্রা করার আগেই আলো নেই ব'লে, আশপাশের পাহাড়গুলোয় ঘা লেগে দু-একটা জাহাজডুবি হবে ব'লেই মনে হচ্ছে আমার। তাহ'লে সে-সব জাহাজের মালপত্রও আমাদের দখলে এসে যাবে।'

'এবার আমাদের কপাল খুলে গেছে ব'লেই মনে হচ্ছে। একটা স্কুনার এসে সেন্ট বার্থোলোমিউর তীরে ভিড়লো, অথচ তাতে কোনো লোকজন নেই। সমস্ত ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।'

বাস্‌কেথের বুঝতে আর-কোনো অসুবিধে রইলো না কী ক'রে মউল এই জলদস্যুগুলোর হাতে গিয়ে পড়েছে।

একজন জিগেস করলে, 'এখন তাহ'লে কী করা হবে, কন্‌গ্রে?'

বাস্‌কেথের যাকে সর্দার ব'লে ধারণা হয়েছিলো, সেই লোকটাই জবাব দিলে, 'মউলে ফিরে-যাওয়া ছাড়া আর-কী করার আছে?'

'তাহ'লে কি এক্ষুনি গুহা সাফ করতে শুরু করে দেবো?'

'না, মেরামতি শেষ না-হওয়া অব্দি জাহাজে মাল তোলা চলবে না। মেরামত শেষ হ'তে কয়েক হপ্তা লেগে যাবে ব'লে মনে হচ্ছে।'

আরেকজন বললে, 'তাহ'লে কিছু-কিছু যন্ত্রপাতি নৌকোয় তোলা উচিত, কী বলো?'

'হ্যাঁ! মেরামতির জন্যে যা-কিছু লাগবে সবই নিয়ে যেতে হবে।'

'তাহ'লে মিছেমিছি আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। শিগগিরই জোয়ার এসে যাবে। সেই সুযোগ আমাদের নেয়া উচিত।'

'তাই ভালো।' যার নাম কন্‌গ্রে, সে-ই জবাব দিলে। 'স্কুনারটা সারাই হ'য়ে গেলেই মালপত্র বোঝাই করবো। এখন তো আর চুরির কোনো ভয় নেই।'

'এ-কথা কিন্তু ভুলো না, ওস্তাদ, যে বাতিঘরে তিনজন লোক ছিলো, তাদের একজন আমাদের হাত এড়িয়ে পালিয়েছে।'

'তাকে নিয়ে মাথা না-ঘামালেও চলবে, সের্‌সান্তে। সে-লোকটা না-খেতে পেয়েই অক্কা পাবে। এছাড়া আমরা তো গুহার আশপাশেই থাকছি।'

কিছুক্ষণ বাদে লোকগুলো কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে নৌকোয় তুললো। তারপরেই নৌকোটা তাদের নিয়ে টিলার আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

বাস্‌কেথ যখন বুঝতে পারলে যে আপাতত তার আর ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন সে তার গুহা থেকে বেরিয়ে বেলাভূমিতে এসে দাঁড়ালে। তার সামনে এখন দু-দুটো মস্ত কাজ। এক. কয়েক হপ্তা কাটাবার মতো খোরাক জোগাড় করা, আর দুই. যে-কোনো উপায়ে মউলের যাওয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা। প্রথমটি না-হয় করা যাবে, কিন্তু দ্বিতীয়টি কীভাবে সম্ভব হবে? কী ক'রে সান্তা-ফে ফিরে না-আসা অব্দি মউলকে এখানে আটকে রাখা যাবে? সে-সম্পর্কে তার মাথায় কোনো ফন্দিই জোগালো না। হ্যাঁ, তবে আরেকটা কাজ সে করতে পারে। কখনও যদি সান হুয়ান অন্তরীপের ধার ঘেঁষে কোনো জাহাজ চলে, তবে সে সংকেতে তাকে থামতে বলতে পারে, অথবা সমুদ্রে সাঁতার কেটে সেই জাহাজে উঠে সবকিছু খুলে ব'লে হত্যার প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু আপাতত যেহেতু কোনো জাহাজই ধার-কাছ দিয়ে চলছে না, সে-কাজটা না-হয় মুলতুবি রাখা গেলো। আদৌ কোনো জাহাজ এর মধ্যে এখান দিয়ে যাবে কি না, তা-ই বা কে জানে। আর গেলেই যে বাস্‌কেথের সংকেত বুঝে থামবে, এমন-কোনো নিশ্চয়তাও নেই।

নিজের নিরাপত্তার জন্যে বাস্‌কেথ তেমন উদ্বিগ্ন হয়নি। দস্যুদের হাত এড়াবার জন্যে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে—আগে থেকে সে নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই। এখন তার প্রধান কাজ: রসদ সংগ্রহ। তাই সে তক্ষুনি বোম্বেটেদের গুহার দিকে পা বাড়ালে।

...

কন্‌গ্রে আর তার দলবল চেষ্টা করছিলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মউলকে যাতে মেরামত ক'রে সাগরপাড়ির উপযোগী ক'রে তুলতে পারে। কাজটা এমনিতে কঠিন, এখানে তো আর জাহাজ মেরামতের জন্যে কোনো কারখানা নেই। তবে ছুতোর হিশেবে ভার্গাসের দক্ষতা আছে, সবরকম যন্ত্রপাতিও হাতে আছে, তাই বেশ ভালোভাবেই কাজ এগুতে লাগলো। প্রথমেই গোটা জাহাজটা খালি করা হ'লো। এতে খানিকটা সময় নষ্ট হ'লো বটে,

কিন্তু কী আর করা যায়। অবশ্য হাতে তাদের অঢেল সময়, তাই কন্‌গ্রে মোটেই উদ্বিগ্ন হয়নি। বাতিঘরের সাহায্য আসতে এখনও প্রায় দু-মাস বাকি, কাজেই অত ভাবনার কিছু নেই।

বাতিঘরের লগবুকেই সে-সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য কন্‌গ্রে জানতে পেরেছিলো। প্রতি তিন মাস অন্তর বাতিঘরের সাহায্য আসার কথা লেখা ছিলো খাতায়।

সান্তা-ফে এখানে এসে পৌঁছুবে মার্চ মাসে, আর এখন সবে ডিসেম্বরের শেষ। ঐ খাতা থেকে তিনজন আলোকরক্ষীর নামও জানতে পেরেছিলো তারা—ফিলিপ, মরিস আর বাস্‌কেথ। কাজেই একজন যে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, তা বুঝতে কোনোই অসুবিধে হ'লো না। কিন্তু লোকটা যে কোথায় গেছে, তা নিয়ে কন্‌গ্রে আদৌ মাথা ঘামালে না। সে একা তাদের আর কী ক্ষতি করতে পারবে? তাছাড়া খাবারদাবারের অভাবেও বেশিদিন তাকে বাঁচতে হবে না। কিন্তু তাহ'লেও মেরামতের কাজ যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই সারতে হবে। সেইজন্যেই খুব তাড়াহুড়ো ক'রে তারা জাহাজ খালি করতে শুরু করেছিলো। এরই মধ্যে তেসরা জানুয়ারি রাত্রে আচমকা আবহাওয়া পালটে গেলো। আকাশের দক্ষিণ দিগন্তে হঠাৎই চট ক'রে কালো-কালো মেঘ জ'মে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হ'লো ঝড়। তাপমাত্রা হু-হু ক'রে ষোলো ডিগ্রি বেড়ে গেলো। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ ছিঁড়ে সাপের মতো আঁকাবাঁকা জ্ব'লে উঠছে বিদ্যুৎ। সঙ্গে-সঙ্গে রাগে গ'র্জে উঠছে বাজ। আর তারই সঙ্গে তাল রেখে সমুদ্রও উম্মাদ হ'য়ে উঠেছে।

ভাগ্য যদি নিতান্তই ভালো না-থাকতো, তাহ'লে এই ঝড়ের আঘাতে মউল তীরে আছড়ে প'ড়ে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যেতো। কিন্তু মউল এমন জায়গায় নোঙর ফেলেছিলো যেটা সরাসরি ঝড়ের প্রকোপের মধ্যে পড়েনি। তবুও এই দুর্যোগটিকে মোটেই উপেক্ষা করা চলবে না ভেবে দ্বিতীয়-একটি নোঙর ফেলে মউলকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলো কন্‌গ্রে। নিজেরা বাতিঘরে আশ্রয় নিয়েছিলো ব'লে নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাদের কোনো ভয় ছিলো না। রসদ সম্বন্ধেও ভাবনার কিছু ছিলো না। বাতিঘরের ভাঁড়ারে তারা প্রচুর খাবারদাবার পেয়েছিলো। নিতান্তই যদি টানাটানি পড়ে তখন গুহা তো আছেই।

বারোই জানুয়ারি অব্দি এই দুর্যোগ চললো, একটা গোটা হপ্তারও বেশি সময় হাত-পা গুটিয়ে বিনা কাজেই বসে থাকতে হ'লো তাদের। বারোই জানুয়ারি রাত্রে হঠাৎ হাওয়ার গতি পালটে গেলো, এবার হাওয়ার তোড় দক্ষিণপশ্চিম দিকে—অর্থাৎ এবার দ্বীপের অন্য দিকটায় ঝড়ের মাতামাতি শুরু হয়েছে।

এই দশ দিনে মাত্র একটা জাহাজই স্টটেন আইল্যাণ্ডকে পাশ কাটিয়ে গেছে, তাও আবার দিনের বেলায়। সুতরাং বাতিঘরের কাজ ঠিকভাবে চলছে কি না সেটা নিশ্চয়ই সে বুঝতে পারেনি। জাহাজটা মাইল তিনেক দূর দিয়ে চলেছিলো ব'লেই বাস্‌কেথের সংকেতও বুঝতে পারেনি।

মউল থেকে সের্‌সান্তে

তেরোই জানুয়ারি ভোরবেলা ভার্গাস মউলকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা ক'রে জানালে যে, এই ঝড়ে স্কুনারটির যা ক্ষতি হয়েছে, তা গুরুতর। এটাকে যদি মেরামত করতে হয় তবে তাদের সবাইকে মিলে খুবই খাটতে হবে। গুহায় জরুরি যন্ত্রপাতির কোনো অভাব না-থাকায় ছুতোর ভার্গাস ঘোষণা করলে যে জাহাজটির ক্ষয়ক্ষতি সারানো সম্ভব, কিন্তু সবাই মিলে একসাথে কাজে হাত না-লাগালে তাতে অনেক সময় লেগে যাবে। আর জাহাজটি না-সারিয়ে নিলে এই জাহাজ নিয়ে সাগরপাড়ি দেয়া অসম্ভব।

কিন্তু মেরামত করতে হ'লে প্রথমে তাদের স্কুনারটিকে চড়ায় ভিড়িয়ে নিতে হবে। ভরা জোয়ারের সময় ছাড়া তার কোনো সুবিধে ছিলো না ব'লে বিনা কাজেই আরো দুটি দিন কেটে গেলো। এই সুযোগে কন্‌গ্রে আর সের্‌সান্তে একবার পুরোনা গুহায় গিয়েছিলো। বাতিঘরের ডিঙিটা তুলনায় একটু বড়ো ব'লে সেইটেতে ক'রেই তারা গিয়েছিলো। সোনারুপো, ধনরত্ন এবং অন্যান্য দরকারি জিনিশ এবার নৌকো-বোঝাই-ক'রে এনে ভাঁড়াড়ে তোলাই ছিলো তাদের মৎলব। চোদ্দই জানুয়ারি সকালবেলায় সেই উদ্দেশ্যেই তারা নৌকো ছেড়েছিলো। আবহাওয়া শান্ত ছিলো তখন, আকাশ ছিলো স্বচ্ছ নির্মল, সমুদ্রের নীল জলে সূর্যের সোনালি আলো ঝিকমিক করছিলো, দেখে কে বলবে যে দু-দিন আগেই এমন প্রচণ্ড ঝড় হ'য়ে গিয়েছে।

যাত্রার আগে আলোকস্তম্ভের লণ্ঠন-ঘরে উঠে চারপাশে তাকিয়ে দেখেছিলো সের্‌সান্তে। না, দুর্ভাবনার কিছুই নেই। কোনোখানে জনমানবের কোনো চিহ্ন-ই নেই।

স্রোতের মুখে নৌকো ছেড়েই তারা যাত্রা করেছিলো। যেতে-যেতে সারাক্ষণ পথের দু-পাশে সতর্ক চোখে তাকিয়ে দেখেছিলো কন্‌গ্রে। তৃতীয় আলোকরক্ষী কোথায় যে আত্মগোপন ক'রে আছে, তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় কিনা তা-ই সে দেখতে চাচ্ছিলো। যদিও তাকে নিয়ে কন্‌গ্রের তেমন মাথা-ব্যথা ছিলো না, তবু মিছেমিছি মাছের কাঁটার মতো গলায় সেটা বিঁধে থাকলে কী লাভ? একবার তার দেখা পাওয়া গেলে তাকে খতম ক'রে দেয়া যেতো।

উভয় তীরেই জনমানবের কোনো চিহ্নই ছিলো না। শুধু কিছু-কিছু পাখ-পাখালির কিচিরমিচির কানে আসছিলো।

বেলা প্রায় এগারোটার সময় তারা গুহার কাছে এসে পৌঁছেছিলো। তীরে নৌকো বেঁধে, দুটি লোকের ওপর পাহারার ভার দিয়ে শুধু কন্‌গ্রে আর সের্‌সান্তেই গুহার দিকে পা চালিয়েছিলো।

গুহার ভেতরটা যেমন ছিলো, তেমনি আছে। কোনোখান থেকেই কিছু খোয়া যায়নি—দেখে অন্তত তা-ই মনে হচ্ছিলো। কেননা গুহার ভেতরে এত মালপত্র ঠাশা ছিলো

যে বাতিঘরের লণ্ঠনের আলো জ্বেলেও বোঝা সম্ভব হ'তো না কিছু খোয়া গেছে কি না।

দরকারি জিনিশপত্তর নৌকোয় তুলে তারা যখন রওনা হবে, তখন হঠাৎ কনগ্রে জানিয়ে দিলো যে সে একবার চারদিকটা দেখে আসতে চায়।

সেরসান্তেও অন্তরীপের এক মাথায় চ'লে গেলো। একটা টিলার ওপর উঠে কনগ্রে ভালো ক'রে তাকালে চারদিকে। অনেক দূর অব্দি দেখা যাচ্ছে : চারদিকই নিষ্প্রাণ, নির্জন —শুধু সমুদ্রের ঢেউই এক মুহূর্তের জন্যেও চুপ ক'রে ব'সে থাকছে না।

কোথাও সন্দেহজনক কিছু দেখতে না-পেয়ে তারা ফের নৌকোয় ফিরে এলো। যখন তারা বাতিঘরের কাছে ফিরে এলো, তখন বেলা প'ড়ে এসেছে, তিনটে বাজে।

দু-দিন বাদে ভরা জোয়ারের সময় তারা মউলকে চড়ায় ভেড়ালে, অবশ্য এজন্যে তাদের বিস্তর মেহনত করতে হয়েছিলো। এটা ষোলোই জানুয়ারির কথা।

জাহাজটাকে চড়ায় এনে ভেড়াবার সঙ্গে-সঙ্গে ভার্গাস কাজে লেগে গেলো। রোজ কিন্তু কয়েক ঘণ্টা ক'রে সময় খামকা নষ্ট হ'তো। জোয়ারের সময় চড়া ডুবে যেতো ব'লে তখন আর কোনো কাজ করা যেতো না। কিন্তু সেটা মেনে না-নিয়ে কোনো উপায় ছিলো না। এটা তো আর সত্যি-সত্যি জাহাজ সারাইয়ের কোনো কারখানা নয়, মাথা পেতে প্রকৃতির বিধান মেনে নেয়া ছাড়া আর কীই বা করা যেতো এখানে ?

পরের পক্ষকাল ধ'রে চমৎকারভাবে কাজ এগুলো। আবহাওয়া শান্ত ব'লে কাজ করতে মোটেই কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। ভার্গাস সহজেই তার কাজের প্রথম পর্বটা নিখুঁতভাবে সমাধা ক'রে দিলে। কোনো বাধা ছাড়াই জানুয়ারির শেষ অব্দি পুরোদমে কাজ চললো। আবহাওয়া বেশ ভালো থাকে, মাঝে-মাঝে খুব অল্প সময়ের জন্যে কয়েক পশলা বৃষ্টি অবশ্য থেকে-থেকে হ'তো, তবে কোনো ঝড়তুফান ওঠেনি।

এই সময়ের মধ্যে স্টটেন আইল্যাণ্ড থেকে দুটো জাহাজ দেখা গিয়েছিলো। প্রথমটা ইংরেজদের। দুপুরবেলার দিকে একদিন সে স্টটেন আইল্যাণ্ডকে পাশ কাটিয়ে দিকচক্রবালে মিলিয়ে গিয়েছিলো; সুতরাং বাতিঘর ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, সেটা বোঝবার বা খেয়াল করবার কোনো কথাই ওঠেনি। দ্বিতীয়টা ছিলো এক মস্ত জাহাজ, পেল্লায়, রাতের অন্ধকারে বোঝা যায়নি সেটা কোন দেশের। লণ্ঠনঘর থেকে সেরসান্তে শুধু তার সবুজ আলোটাকেই দেখতে পেয়েছিলো। জাহাজটি হয়তো কয়েক মাস ধ'রে সাগরপাড়ি দিচ্ছিলো, তাই বাতিঘর শেষ হয়েছে কি না সেটা সম্ভবত জানে না। উপকূলের ধার ঘেঁষেই গিয়েছিলো জাহাজটি। কাজেই বাসকেথ দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বিশেষ চেষ্টা করলে জাহাজের লোকে তা নিশ্চয়ই দেখতে পেতো। কিন্তু বাসকেথ তাদের নজরে পড়বার জন্যে আদপেই কোনো চেষ্টা করেনি। ভোর হবার ঠিক আগটায় জাহাজটি দিগন্তে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিলো। দূরে, দিগন্তে, আরো-যে কয়েকটা জাহাজ দেখা যায়নি তা নয়, তবে সেগুলো এত দূর দিয়ে গিয়েছিলো যে তাদের কথা বলবার মতো কিছু ছিলো না।

একত্রিশে জানুয়ারি আবহাওয়া আবার খারাপ হ'য়ে গেলো। কিন্তু বোম্বেটেদের বরাৎটা ভালো, স্কুনারের মেরামতির কাজ তখন মোটামুটি হ'য়ে গিয়েছে। তাই এবারকার ঝড়ে কনগ্রে আর তার দলবলের হুঁশিয়ারিতে মউলের নতুন-কোনো ক্ষতি হ'তে পারেনি। তাছাড়া, ঝোড়ো আবহাওয়া বেশিক্ষণ থাকেওনি, দোসরা ফেব্রুয়ারি থেকেই হাওয়ার উদ্দাম গতি শান্ত

হ'য়ে এসেছিলো ব'লে ততটা ভয় হয়নি তাদের ।

এবারে একটু-একটু ক'রে জাহাজে মালপত্র বোঝাই করার কাজ শুরু হ'লো । ভার্গাস যাদের জাহাজের কাজে লাগায়নি তারা বার-কতক পুরোনো গুহায় যাতায়াত করেছে, কখনও-কখনও কন্‌গ্রে স্বয়ং কখনও-বা সের্‌সান্তে তাদের সঙ্গে গিয়েছে । প্রতিবারই বেশ-খানিকটা ক'রে মালপত্র তারা নিয়ে এসেছে । সেগুলোকে গোড়ায় সাময়িকভাবে বাতিঘরের ভাঁড়ারেই তোলা হয়েছে । বাতিঘরের ভাঁড়ারটাকেই এ-অবস্থায় কাজে লাগানো সুবিধের ব'লে তাদের মনে হয়েছে ।

দিন কয়েক বাদে মউলের মেরামতিকাজ শেষ হ'য়ে গেলো, সবকিছু সরেজমিন খতিয়ে দেখে মনে হ'লো এবারে সমুদ্রযাত্রা সম্ভব । কাজেই আস্তে-আস্তে জাহাজে মাল তোলা শুরু হ'য়ে গেলো ।

গুহায় ঠাশাঠাশি সব মালের ভেতর একদিন হঠাৎ কতগুলো রঙের পাত্রও তারা আবিষ্কার করেছিলো । সেগুলোকে দেখেই কন্‌গ্রের মাথায় এক চমৎকার ফন্দি খেলে গিয়েছিলো । সে জাহাজের গায়ে নতুন ক'রে রঙের প্রলেপ চড়াতে হুকুম করলে, ঠিক করলে জাহাজটার নামও বদলে দেবে । জাহাজটার নতুন নাম দেয়া হ'লো : 'সের্‌সান্তে' ।

চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি ভরা জোয়ারের সময় চড়া থেকে খাড়ির মধ্যে আগের জায়গাটাতেই নিয়ে-যাওয়া হ'লো 'সের্‌সান্তে'কে । তারপর শুরু হলো নতুন উদ্যমে মালপত্র বোঝাই করা । সকলের মনেই খুশি আর উৎসাহ, অবশেষে এতদিন বাদে তাদের স্বপ্ন সফল হ'তে চলেছে । এখন তারা একটি জাহাজের মালিক, এবার নীল সমুদ্রে পাড়ি দেয়া হবে । বেশ চনমনে লাগছিলো সবাইকার । ফলে মাল বোঝাই করার কাজও হুড়মুড় ক'রে এগুচ্ছিলো । আর ক-দিন বাদেই নোঙর তুলবে নতুন জাহাজ 'সের্‌সান্তে', তারপর ইগোর উপসাগর পেরিয়ে, লেময়র প্রণালী ধ'রে, বারদরিয়ায় প'ড়ে পুরো দমে ছুটে চলবে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে । আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরেই সফল হবে কন্‌গ্রের এতদিনের স্বপ্ন ।

৮

মক্কেলের নাম বাস্‌কেথ

স্কুনারটি স্টটেন আইল্যাণ্ডে ভেড়বার পর থেকেই বাস্‌কেথ সান হুয়ান অন্তরীপের তীরে বাস করেছে । এখান থেকে সে ইচ্ছে করলেই দ্বীপের গহনে যেতে পারতো, কিন্তু যায়নি । মনে উঁকিঝুঁকি ছিলো ক্ষীণ আশার : কাছ দিয়ে যদি কোনো জাহাজ যায়, তবে সে সংকেত ক'রে সেটাকে থামতে বলবে, তারপর জাহাজে উঠে কাপ্তেনকে খুলে বলবে কী ভয়ানক ব্যাপার দ্বীপে ঘ'টে গিয়েছে, তারপর বদমায়েশগুলোকে এক হাত দেখে নেয়া যাবে ।

তবে আদৌ কোনো জাহাজ সেখান দিয়ে যাবে কি না, তার তো কোনোই ঠিক ঠিকানা নেই । নেহাৎ ঝড়ের পাল্লায় না-পড়লে কোনো জাহাজ যে এদিকটায় আসবে, বাস্‌কেথের

কখনোই সে-ভরসা ছিলো না । তবু....

এই 'তবু'র জন্যেই সে এখানে থেকে গিয়েছিলো । নিজের নিরাপত্তার জন্যে সে মোটেই মাথা ঘামায়নি । তার মনে শুধু তীব্র-একটা প্রতিশোধস্পৃহাই ছিলো তখন—কী ক'রে এই বোম্বেটেগুলোকে শায়েস্তা করা যায় । বোম্বেটেদের গুহা থেকে ইচ্ছে মতো রসদ নিয়ে এসে নিজের সম্পর্কে একরকম নিশ্চিন্তই ছিলো সে । এটা সে জানতো যে স্কুনারটি সারিয়ে সাগরপাড়ির উপযুক্ত ক'রে তুলতে কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবে । তবে সান্তা-ফের ফিরে আসা অব্দি স্কুনারটি দ্বীপে থাকবে কি না সেটা অবশ্য সে বুঝে-উঠতে পারেনি ।

সান্তা-ফের এখানে আসতে আরো দুটো গোটা মাস বাকি । ততদিনে বোম্বেটেরা নিশ্চয়ই প্যাসিফিক আইল্যাণ্ডসের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে যাবে । কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া আর কীই-বা সে করতে পারে, একা ? এখন সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন, আরেকটা আশ্রয় খুঁজে বার-করা । এই গুহাটা জলদস্যুদের গুহার খুবই কাছে । সুতরাং দূরে-কোথাও একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বার-করা খুবই জরুরি ।

পাঁচশো গজ দূরে, প্রণালীর কাছেই, আরেকটি গুহা দেখতে পেয়েছিলো বাস্‌কেথ । দুটি বড়ো-বড়ো পাথরের আড়ালে ঢাকা ছিলো তার মুখ । বাস্‌কেথ খুব ভালো ক'রে খেয়াল ক'রে দেখতে পেলে, বাইরে থেকে চট ক'রে এর মুখ খুঁজে বার-করা খুব-একটা সহজ হবে না । কেউ যদি না-জানে যে গুহাটা এখানে আছে, তবে হাজার বার এর পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করলেও নেহাৎই দৈবের অনুগ্রহ ছাড়া গুহার মুখটা আবিষ্কার করা কারু পক্ষেই সম্ভব নয় । দিন কতক তন্নতন্ন ক'রে খোঁজবার পর দৈবাৎ যখন সে গুহাটি আবিষ্কার করলে, তক্ষুনি সে তার জিনিশপত্র নিয়ে সেখানে চ'লে গেলো ।

কন্‌গ্রে বা তার সঙ্গোপাঙ্গরা ক্বচিৎই এদিকটায় এসেছে । দ্বিতীয়বার গুহায় এসে কন্‌গ্রে আর সের্‌সান্তে মাত্র-একবার এদিকটায় এসেছিলো, কিন্তু সে-ই প্রথম আর সে-ই শেষ । এর পর আর-কখনোই তারা এদিকটায় আসেনি ।

সন্ধের দিকে খুব সতর্ক হ'য়ে বোম্বেটেদের হালচাল জানবার জন্যে বেরুতো বাস্‌কেথ । এই নিঃসঙ্গ জীবনের দীর্ঘ মুহূর্তগুলো ঠিক যেন এককটা দিন । তার মগজটা সারাক্ষণ কুরে-কুরে খায় এক তীব্র অস্বস্তি । বার-বার তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই নৃশংস হত্যার দৃশ্য । উঃফ্, তার যেন আর মুক্তি নেই এই দৃশ্যটার কাছ থেকে । সারাক্ষণ তার চোখে হানা দেয় দৃশ্যটা, আর সারাক্ষণই প্রতিশোধের এক তীব্র বাসনা তাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় । হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয় একবার মুখোমুখি গিয়ে সে জলদস্যুদের সর্দারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নেয় । সে ভাবে, অপরাধের সাজা তাদের একদিন পেতেই হবে, পাপের মাশুল গুনে-গুনে দিতে হবে তাদের সবাইকে ।

কিন্তু ভাবগতিক দেখে মাঝে-মাঝে মনে হয় সত্যি কি তারা কোনো শাস্তি পাবে ? সান্তা-ফের এখানে আসতে এখনও অন্তত তিন সপ্তাহ দেরি । বাতিঘরের লগবই দেখেই নিশ্চয়ই সে-কথা বোম্বেটেরা জেনে গিয়েছে । এবং তার আগেই যে কাজ হাসিল ক'রে তারা জাহাজ ভাসিয়ে দেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।

ষোলোই ফেব্রুয়ারি । বাস্‌কেথ সেদিন অধীর, উদ্বিগ্ন, আর কিংকতর্ব্যবিমূঢ় বোধ করছিলো । কী করবে সে ? কী করা সম্ভব তার পক্ষে, একা অতজনের বিরুদ্ধে ? হতভম্ব

লাগছে, কিন্তু অস্থিরতাটাও বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। শেষটায় আর থাকতে না-পেরে, সূর্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গে সে উপসাগরের প্রবেশমুখে গিয়ে হাজির হ'লো। সেখানে যাবার পর নিজেই জানে না কখন সে উত্তর তীর ধ'রে বাতিঘরের দিকে হাঁটতে শুরু ক'রে দিয়েছে। যদিও ঝপ ক'রে আঁধার নেমে এসেছে আর ক্রমেই ঘন হ'য়ে উঠছে আঁধার, তবু ব্যাপারটা হঠকারী—যে-কোনো মুহূর্তে কারু মুখোমুখি প'ড়ে যেতে পারে সে। হুঁশিয়ার হ'য়েই কানখাড়া ক'রে চলেছে সে, উপসাগরের মাঝামাঝি পৌঁছুতে হ'লে তাকে আরো মাইল তিনেক হাঁটতে হবে। এখনও যে তাকে কেউ দ্যাখেনি, সেটা নিশ্চয়ই তার ভাগ্য।

রাত তখন নটা। বাতিঘর থেকে কয়েকশো গজ দূরে এসে তার হুঁশ হ'লো সে কী করতে চলেছে, অমনি সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো : বাতিঘরের জানলা আর ঘুলঘুলিগুলো দিয়ে বাইরের ঘন অন্ধকারে চাপড়া-চাপড়া আলো এসে পড়েছে। দেখেই অসহ্য ক্রোধে জ্ব'লে উঠলো সে।

স্কুনারটা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে প'ড়ে আছে, তাই বাস্‌কেথ সেখান থেকে সেটাকে দেখতে পেলে না। সতর্ক পায়ে, সন্তর্পণে, সে আরো শ'খানেক গজ এগুলো। বোম্বেটেগুলো নিশ্চয়ই যে যার ঘরের ভেতরে, দরজা বন্ধ। হয়তো এখন কেউ খামকা বাইরে আসবে না। বাস্‌কেথ কী ভেবেছে জানে না, সে পায়ে-পায়ে আরো এগুচ্ছে। বেশ-কিছু দূর এগিয়ে এসে দেখতে পেলে স্কুনারটি তীর ঘেঁষে জলে ভাসছে। ওহ্‌! একবার যদি আগুন ধরিয়ে দেয়া যেতো এটায়!

মেরামতের কাজ যদি চলতো, তাহ'লে এখানে লোকজনের সাড়া পাওয়া যেতো। তা যখন নেই, তখন ধ'রে নিতে হবে যে মেরামত হ'য়ে গিয়েছে। কাছে এসে ভালো ক'রে খেয়াল ক'রে বাস্‌কেথ বুঝতে পারলে এখনও জাহাজে মালপত্র বোঝাই করা হয়নি। তাহ'লে জাহাজটা আরো-কয়েকদিন এখানে থাকবে! কিন্তু সে আর কতদিন? দিন তিনেকের মধ্যেই হয়তো মউল দিগন্তে হারিয়ে যাবে।

পরদিন। তখনও ভালো ক'রে দিনের আলো ফোটেনি। রসদে টান পড়েছে দেখে বাস্‌কেথ কিছু খাবারদাবার জোগাড় করবার জন্যে বোম্বেটে গুহায় গিয়েছে। জলদস্যুরা মালপত্র নিতে গুহায় আসবে, তাই তাড়াহুড়ো করা দরকার। তখনও গুহাটি মালে বোঝাই। কিন্তু খাবারদাবার খুঁজতে-খুঁজতে সে একেবারে হয়রান হ'য়ে গেলো। আহার্য বলতে কোনোকিছুই নেই, তারা নিশ্চয়ই সমস্ত-কিছু সরিয়ে ফেলেছে। তাহ'লে দিন তিন-চার পরে তার আর কোনো খাবারই থাকবে না।

কিন্তু তখন ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবারও সময় নেই। বাইরে একটা আওয়াজ হ'লো কীসের। সে তাড়াতাড়ি গুহা থেকে মুখ বার করে দেখতে পেলে, তিনটে লোক নৌকো ভিড়িয়ে তীরে নামছে। এখন তাহ'লে উপায়?

বিপদ দেখে গুহার মধ্যেই ঢুকে পড়লো বাস্‌কেথ। চট ক'রে গিয়ে সবচেয়ে অন্ধকার কোনাটায় একরাশ জিনিশপত্রের আড়ালে সে লুকিয়ে পড়লো। মনে-মনে ঠিক ক'রে নিলে, যদি ধরাই প'ড়ে যাই, তাহ'লে অন্তত বিনামূল্যে আমি আমার জীবন হারাবো না। কোমরের বেল্‌টে হাত বুলিয়ে বাস্‌কেথ নিশ্চিন্ত হলো যে তার রিভলভারটা আছে। কিন্তু সে একা—আর তারা তিন জন!

শুধু সেরসান্তে আর ভার্গাসই গুহায় ঢুকেছিলো। সেরসান্তের হাতে একটা লণ্ঠন ঝুলছে, সে-ই ছিলো আগে, আর তার পেছনে ভার্গাস। নানান দরকারি জিনিশ জড়ো করতে-করতে তারা কথা বলছিলো। ভার্গাস বললে : 'আজ তো সতেরোই ফেব্রুয়ারি। এবার আমাদের সটকে পড়া উচিত।'

—'ভেবো না, আমরা শিগগিরই রওনা হবো।'

—'কবে ?'

—'কাল। অবশ্য মালগুলো যদি তার আগেই জাহাজে তোলা সম্ভব হয়।'

ভার্গাস মন্তব্য করলে : 'আবহাওয়া ভালো থাকলে হবে বৈ কি।'

—'তা ঠিক। কিন্তু আজ সকালে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছো ? ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ জমছিলো। তবে তা শিগগিরই স'রে যাবে ব'লে মনে হচ্ছে।'

—'যদি আরো আট-দশ দিন আটকা প'ড়ে যেতে হয় ?'

—'তাহ'লে অবিশ্যি বিপদের একটা সম্ভাবনা আছে। ততদিনে সান্তা-ফে এসে পড়তে পারে। তবে কালই রওনা হওয়া যাবে ব'লে মনে করছি।'

বাসকেথ দমবন্ধ ক'রে উৎকর্ণ হ'য়ে তাদের কথাবার্তা শুনছে। সেরসান্তে আর ভার্গাস লণ্ঠন হাতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব-একটা দরকারি জিনিশ তাদের চোখে পড়ছিলো না। বেশির ভাগ জরুরি জিনিশই আগেভাগে নিয়ে-যাওয়া হয়েছিলো ব'লে অত্যাবশ্যক কিছু প'ড়ে নেই। ইতস্তত মালপত্র খুঁজতে-খুঁজতে বাসকেথের গা ঘেঁষেও ক-বার তারা চ'লে গিয়েছে। বাসকেথের হাত নিশপিশ করছিলো, ইচ্ছে করছিলো রিভলভারের গুলিতে তাদের মুণ্ডু উড়িয়ে দেয়, কিন্তু সবদিক ভেবে-চিন্তে সে শান্ত হ'য়েই রইলো।

আধঘণ্টাটাক পরে সেরসান্তে নৌকোয় পাহারায়-ব'সে-থাকা লোকটার উদ্দেশে হাঁক পাড়লে। লোকটা চটপট এসে মালপত্র ব'য়ে নিয়ে যেতে তাদের সাহায্য করলে। সেরসান্তে যাবার আগে বাকি মালপত্রের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

ভার্গাস বললে, 'এত-সব জিনিশ ফেলে যেতে কষ্ট হচ্ছে।'

—'কিন্তু কী আর করা যাবে ? ফেলে তো যেতেই হবে। স্কুনারটা যদি আরো কয়েকশো টন মাল বইতে পারতো তবে না-হয় একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যেতো। কিন্তু আমাদের তো এখন শুধু বাছাই-করা জিনিশই নিয়ে যেতে হবে।' বলতে-বলতে তারা গুহা থেকে বেরিয়ে গেলো।

...বোম্বেটেদের গুহা থেকে বেরিয়ে বাসকেথ তখন নিজের গুহায় ফিরে এসেছে। তার মনে তখন একটাই ভাবনা—আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে কোনো খাবারদাবার থাকবে না তার, বাতিঘরের খাবারদাবার নিশ্চয়ই জলদস্যুরা অ্যাদ্দিনে সাবাড় ক'রে ফেলেছে। আর না-ও যদি ক'রে থাকে, ফেলে রেখে যাবে না নিশ্চিত : কিন্তু এর পর ? সান্তা-ফে আসতে এখনও অন্তত দিন পনেরো বাকি। ততদিন কী ক'রে চলবে ? অবস্থা বিষম ঘোরালো হ'য়ে উঠেছে, এই মস্ত সংকটে তার সাহস বা খাটুনি কিছুই কোনো কাজে আসবে না। মাছ ধ'রে হয়তো ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যায়, কিন্তু যতক্ষণ-না মউল দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে, সে-আশাতেও ছাই। তবে কি শেষ অব্দি তাকে না-খেয়েই মরতে হবে ? অন্যদিকে, দস্যুদের যদি সাজা দিতে হয় তবে এমন ব্যবস্থা করাও জরুরি, মউল যাতে দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যেতে না-পারে। যে

ক'রেই হোক, তাকে দ্বীপে আটকে রাখতেই হবে। আর মউল দ্বীপে থাকলে তার পক্ষে খোলাখুলি জলের ধারে গিয়ে মাছধরা অসম্ভব।

সে যখন এই উভয়সংকটে নিজেকে ছিঁড়ছে, দিনটাও তখন কেমন যেন করুণ কান্নার মতো একঘেয়ে মলিন হ'য়ে আছে। একটু পরেই আকাশে মেঘ জমতে লাগলো। বাতাসও জোরালো হ'য়ে উঠছে। সমুদ্রের ঢেউ এখন যেন ফুঁসে উঠে গরজাতে শুরু করেছে। আবহাওয়ায় ঝড়ের পূর্বাভাস। এ-রকম আবহাওয়া থাকলে একটা সংকট মোচন হয়—জলদস্যুর দল পরদিন আর তাদের জাহাজ ছাড়তে পারবে না।

সন্ধে নাগাদ আবহাওয়া আরো খারাপ হ'য়ে উঠলো। সত্যি, ভয়ংকর একটা ঝড় আসছে। মেঘগুলো যেন আকাশে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। বাতাস ছুটছে খ্যাপার মতো। বাস্‌কেথের অভিজ্ঞ চোখ জানে যে এ-ঝড়টা নেহাৎ সাধারণ হবে না। যে-দুর্যোগ আসছে সেটা ক্রমেই ভয়াল চেহারা নেবে।

অথচ তবু শান্ত হ'য়ে গুহায় ব'সে থাকতে পারলে না সে। বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আঁধার-ঢাকা দিগন্তের দিকে আচ্ছন্নের মতো সে তাকিয়ে রইলো। মেঘ ছিঁড়ে সূর্যের শেষ যে-রশ্মিগুলো দেখা যাচ্ছিলো, তারাও এখন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

হঠাৎ তার মনে হ'লো সমুদ্রে কালো মতন কী-একটা যেন নড়ছে।

—'জাহাজ!' সে ঝোড়ো হাওয়ায় নিজের স্বর উড়িয়ে দিলে। 'জাহাজ! এই দ্বীপের দিকেই আসছে!'

সত্যিই পুবদিক থেকে তখন একটা জাহাজ দ্বীপের দিকে আসছিলো।

কিন্তু তার মধ্যেই শুরু হ'য়ে গেছে তাণ্ডব, ঝড়ের প্রলয়নৃত্য। হেজিপেঁজি কোনো ঝড় না, রীতিমতো হারিকেন!

হারিকেন! কী সর্বনাশ!

শয়তানগুলো তবু বাতিঘর অন্ধকার ক'রে রেখেছে! জাহাজটা নিশ্চয়ই বাতিঘরের আলো খুঁজছে। এই অন্ধকার তুফানের মধ্যে জাহাজের লোকজন জানতেই পারবে না যে কয়েক মাইলের মধ্যেই এই দ্বীপ আছে! হাওয়ার পাল্লায় প'ড়ে এদিকেই আসছে, আরেকটু পরেই হয়তো আছড়ে পড়বে তীরের পাথরে!

তা-ই হ'তে চলেছে, এবং তা-ই হবে। আলোকস্তম্ভের লণ্ঠনঘর থেকে নিশ্চয়ই বোম্বেটেরা জাহাজটাকে দেখতে পেয়েছে, অথচ তবু আলো জ্বালছে না। কী নিষ্ঠুর এরা—কারু জন্যে একফোঁটা দয়ামায়া নেই প্রাণে। আধঘণ্টার মধ্যেই জাহাজটা তীরে আছড়ে প'ড়ে ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে যাবে।

ঝড় তখন উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে, ঢেউগুলো উত্তাল। পরদিনও যে এ-ঝড় থামবে না, লক্ষণ দেখে তাও বোঝা যায়।

বাস্‌কেথের কিন্তু নিজের ডেরায় ফিরে যাবার কথা মনেই হ'লো না। সে অপলক চোখে উত্তাল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলো। নিরেট অন্ধকারে জাহাজটাকে তখন ভালো ক'রে দেখা যাচ্ছে না, তবু সে তাকিয়ে আছে। শুধু মাঝে-মাঝে যখন জাহাজটা ঢেউয়ের মাথায় ওঠে, তার ক্ষীণ আলো চোখে পড়ে। সমুদ্র তখন যেন কোনো হিংস্র আনন্দে জাহাজটাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে। জাহাজটার আজ আর কোনোমতেই রেহাই নেই।

অক্ষম বাস্‌কেথ উত্তেজনায় বেলাভূমিতে ছুটোছুটি করছে। একবার যদি বাতিঘরের আলো জ্ব'লে ওঠে! মুঠো-করা হাত ঝাঁকিয়ে সে দস্যুগুলোকে অভিশাপ দিলে। বাজে গালাগাল দিলে একটা।

জাহাজ কিন্তু অনিবার্যভাবে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

আচমকা বাস্‌কেথের মাথায় একটা ফন্দি খেলে গেলো। জাহাজ যদি জানতে পারে যে এখানে ডাঙা আছে, তবে নিশ্চয়ই তার গতিপথ বদল করার চেষ্টা করবে। চারপাশে তাকিয়ে কিছু কাঠকুটো দেখতে পেলে সে। এই কাঠকুটোগুলো জ্বালিয়ে জাহাজটার নজর টানা যায় না কি? এই জোরালো হাওয়ার মধ্যে, যদি কোনোমতে, একবার, আগুন জ্বালানো যায়, জাহাজ কি তা দেখতে পাবে না? অন্তত আধমাইল দূর থেকেও যদি আগুনটা দেখতে পায়, তাহ'লে হুঁশিয়ার হ'য়ে এই ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করতে পারে হয়তো।

তক্ষুনি সে কাজে লেগে গেলো। কিছু কাঠকুটো কুড়িয়ে নিয়ে সে অন্তরীপের মুখটায় চ'লে এলো। সেখানেও কিছু শুকনো কাঠকুটো পাওয়া গেলো। যদিও বেদম তুফান এতক্ষণ ধ'রে প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে, তবু একফোঁটাও বৃষ্টি পড়েনি এখনও। তাই সে কাঠকুটো জড়ো ক'রে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হ'য়ে গেছে, প্রচুর দেরি হ'য়ে গেছে! আর-কিছু ক'রে কোনো লাভ নেই। অন্ধকারে দৈত্যের মতো অতিকায় একটা জিনিশ তার চোখে পড়লো। উন্মাদ ঢেউয়ের মধ্যে সেটা তীব্র বেগে পাক খাচ্ছে। তারপরেই বিকট একটা আওয়াজ ক'রে মস্ত একটা জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে তীরের কঠিন পাথরে আছড়ে পড়লো সেই অচেনা জাহাজ!

আওয়াজটা বিকট, পিলে চমকানো, কানে তালা লাগানো! হাওয়ার মধ্যে কাদের যেন আর্ত চীৎকার ভেসে এলো। তারপর সব চুপচাপ। শুধু ক্রুদ্ধ হাওয়ার ফোঁস-ফোঁস আর উদ্দাম ঢেউয়ের উত্তাল আছড়ানি ছাড়া আর-কিছুই শোনা যাচ্ছে না। আগের মতোই এখন ফের ঝড়ের হিংস্র গর্জন নিরেট অন্ধকারের মধ্যে টালমাটাল তোলপাড় তুলে যাচ্ছে।

৯

জাহাজডুবির পর

পরদিন যখন সূর্য ওঠবার সময়, তখনও ভয়ংকর ক্রোধে ঝড় আছড়াচ্ছে দ্বীপের ওপর। তখনও সমুদ্রে উদ্দাম ঢেউয়ের মাতামাতি। কী তার গর্জন, আর কী তার দামাল উচ্ছ্বাস! এই আবহাওয়ায় স্কুনারটা যে সাগরপাড়ি দেবে না, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বাস্‌কেথ চারদিকে তাকালে, তারপর দেখতে পেলে অন্তরীপের দুশো গজ দূরে উত্তর দিকে ভাঙাচোরা একটা জাহাজ প'ড়ে আছে। প্রায় পাঁচশোটন ভার বইতে পারতো যে-জাহাজ, সেই মস্ত জাহাজটা এখন প্রায় চুরমার হ'য়ে

গিয়েছে। জলদস্যুরা এই জাহাজডুবির কথা জেনেছে কি না, বাস্‌কেথ তা বুঝতে পারছিলো না। যদি জানতে পেরে থাকে তবে নিশ্চয়ই অকুস্থলে গিয়ে হাজির হয়েছে, নিদেন সেদিকে যাবে ব'লে রওনা হয়েছে।

বাস্‌কেথ খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে জায়গাটা। যতক্ষণ-না তাদের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে সে নিশ্চিত হ'লো ততক্ষণ একচুলও নড়লো না। তারপর হন্তদন্ত হ'য়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে ধ্বংসকাণ্ডের কাছে এসে পৌঁছুলো। একটু লক্ষ ক'রে জাহাজটার নামটা পড়তে পারলে বাস্‌কেথ : 'সেনচুরি,' মবিল। তার মানে, মার্কিন জাহাজ। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামা রাজ্যের রাজধানী মবিল-এর জাহাজ ছিলো তাহ'লে। ছিলো, কেননা 'সেনচুরি' একেবারে চুরমার হ'য়ে গিয়েছে। কোনো মানুষ দেখা গেলো না : নিশ্চয়ই কেউ বাঁচেনি। জাহাজের কোনোকিছুই আস্ত বা অটুট নেই, যা গুঁড়িয়ে যায়নি তাও দোমড়ানো তোবড়ানো।

জাহাজ এমনভাবে কাৎ হ'য়ে পড়েছিলো, উঠতে গিয়ে বাস্‌কেথকে খুব-একটা বেগ পেতে হয়নি। ধ্বংস কাকে বলে সেটা এবার ভালো ক'রেই বুঝতে পারলে বাস্‌কেথ। জলের তোড়ে ভেতরের সবকিছুই ভেসে গিয়েছে। ঘুরে-ঘুরে দেখতে-দেখতে একটাও মৃতদেহ চোখে পড়েনি তার। দুর্ভাগা লোকগুলো ঢেউয়ের ধাক্কায় হয় উত্তাল সমুদ্রে ভেসে গিয়েছে নয়তো সংঘর্ষের সময় ডুবে গিয়েছে।

তীরে নেমে বাস্‌কেথ ফের চারদিকে তাকালে। না, জলদস্যুরা এখনও অকুস্থলে আসেনি। হাওয়ার বিষম প্রকোপ সত্ত্বেও বাস্‌কেথ অন্তরীপের শেষ বিন্দুটার দিকে চললো। 'দৈবাৎ যদি সেনচুরির কোনো লোককে এখনও জীবিত দেখতে পাই,' মনে-মনে সে ভাবলে, 'তাহ'লে তাকে বাঁচাবার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।'

কিন্তু কাউকেই পাওয়া গেলো না। ফের সেনচুরির কাছে ফিরে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো, যদি কোনো খাবারদাবারের খোঁজ মেলে। এবার অবিশ্যি তাকে নিরাশ হ'তে হ'লো না। তীরেই প'ড়েছিলো একটা বিস্কুটের বাক্স, আর শুকনো মাংসের কৌটো। পরিমাণটা এত যে একা বাস্‌কেথের তাতে অনেকদিন চ'লে যাবে। রাজা সলোমনের রত্নভাণ্ডারের মতোই মূল্যবান সেই খাবারগুলোকে সে প্রথমে গিয়ে গুহায় রেখে এলো। তারপর অন্তরীপের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে উপসাগরের দিকে তাকালে।

বাস্‌কেথের ধারণা ছিলো, বোম্বেটেরা এই জাহাজডুবির কথা জানে। গতরাতে নিশ্চয়ই তারা সেনচুরিকে তীরের দিকে আসতে দেখেছে; আর মউল যখন যাত্রার জন্যে তৈরি থাকা সত্ত্বেও আবহাওয়ার জন্যে রওনা হ'তে পারেনি, তখন নিশ্চয়ই জাহাজডুবির মালপত্তরের খোঁজে এখানে এসে ঢুঁ মারবে।

হাওয়ার সঙ্গে যুঝতে-যুঝতে একটা টিলার ওপর উঠতে-উঠতে এই বেদম হাওয়ার কথাই সে ভাবছিলো। এমন সময় হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে সে চমকে উঠলো। শব্দ লক্ষ্য ক'রে হনহন ক'রে চললো বাস্‌কেথ। বাস্‌কেথ প্রথম যেখানটায় আশ্রয় নিয়েছিলো, আর্তনাদটা সেদিক থেকেই আসছিলো।

গজ পঞ্চাশ যেতেই একটা মস্ত পাথরের ধারে একটি লোককে প'ড়ে থাকতে দেখতে পেলে বাস্‌কেথ। গোঙাতে-গোঙাতে যেন হাওয়াকে আঁকড়ে ধ'রেই লোকটি উঠে বসবার চেষ্টা করছে। তক্ষুনি বাস্‌কেথ তার কাছে গিয়ে হাজির হ'লো।

দেখে মনে হ'লো আহত লোকটির বয়েস তিরিশ-পঁয়ত্রিশ। শক্ত পেটানো চেহারা, যেমন নাবিকদের হয়, পরনে নাবিকেরই পোশাক। চিৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে। তার গায়ে বা পোশাকে কোনো রক্তের দাগ নেই। খুব-একটা জখম হয়নি ব'লেই মনে হচ্ছে। এইই বোধহয় সেনচুরির একমাত্র জীবিত লোক। বাস্কেথের পায়ের আওয়াজ বোধহয় লোকটির কানে পৌঁছোয়নি। বাস্কেথ ঝুঁকে, নিচু হ'য়ে, লোকটির কাঁধে হাত রাখতেই সে উঠে বসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না : ফের ঐ বালির ওপরেই প'ড়ে গেলো। লোকটির ঠোঁটদুটো কাঁপছে, যন্ত্রণায় সারা মুখটা বিকৃত, অর্ধস্ফুট একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে : 'বাঁচাও ! বাঁচাও !'

বাস্কেথ হাঁটু গেড়ে ব'সে লোকটাকে ধ'রে-ধ'রে পাথরটার গায়ে হেলান দিয়ে বসালে। বললে : 'ভয় নেই। আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।'

বেচারার একটা হাত শুধু একবার হাওয়াকে চেপে ধরতে চাইলো, পরক্ষণে তার জ্ঞান হারিয়ে গেলো। কী দুর্বল লোকটা! বাস্কেথ ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে বুকে কান পেতে, তার বুকের ধুকধুকিটার ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেলে। লোকটা যেহেতু বেঁচে আছে, বাস্কেথের এখন প্রথম কাজ তাকে কোনো নিরাপদ আস্তানায় গিয়ে যাওয়া। যে-কোনো মুহূর্তে জলদস্যুরা এসে পড়তে পারে। লোকটাতে ব'য়ে নিজের ছোট্ট গুহাটায় নিয়ে যেতে হবে, তাছাড়া এই মুহূর্তে তার আর-কিছু করবার নেই। সে তা-ই করলে : মিনিট পনেরোর মধ্যে লোকটির সংজ্ঞাহীন দেহ কাঁধে নিয়ে সে ছোটো গুহাটায় গিয়ে হাজির হ'লো, তারপর সন্তর্পণে. খুব সাবধানে, তাকে শুইয়ে দিলে।

বাইরে থেকে তার দেহে আঘাতের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বাস্কেথের শঙ্কা হচ্ছিলো, হয়তো ছিটকে এসে ডাঙায় পড়বার জন্যে তার কোনো হাড়-টাড় ভেঙে গিয়েছে। এই জন্যেই সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা ক'রে দেখলে। না, হাড়টাড় ভাঙেনি ব'লেই মনে হচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর নাবিকটি চোখ খুললে। কোনোরকমে অস্ফুট স্বরে বললে, 'জল। একটু জল !'

বাস্কেথ তাকে আস্তে-আস্তে জল খাইয়ে দিয়ে জিগেস করলে, 'এখন কি একটু ভালো বোধ হচ্ছে ?'

ভাঙা গলায় লোকটা বললে, 'হ্যাঁ, খানিকটে।' তারপর যেন মনে-মনে সব ঘটনা খতিয়ে দেখবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে বললে, 'আমি কোথায় ? তুমি—কে ? এই জায়গা ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

—'এখন নিরাপদ জায়গাতেই আছো। সেনচুরি তীরে আছড়ে প'ড়ে ভেঙে যাবার পর আমি তোমায় তীরে প'ড়ে থাকতে দেখেছিলুম।'

—'সেনচুরি ?! হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

—'কী নাম তোমার ?'

—'ডেভিস। জন ডেভিস।'

—'জাহাজের কাপ্তেন ?'

—'না ! ফার্স্ট মেট। জাহাজের অন্যরা কোথায় ?'

বাস্‌কেথ ঘাড় নেড়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললে, 'কেউ নেই, আর-কাউকেই দেখতে পাইনি। মনে হচ্ছে, শুধু তুমিই বেঁচে গিয়েছো ।'

—'সবাই মারা গেছে ?'

—'জানিনে । হয়তো মারাই গেছে । কেননা আর-কাউকেই দেখতে পাইনি ।'

জন ডেভিস খবরটা শুনে মুষড়ে পড়লো । সে-ই শুধু বেঁচে গিয়েছে ! কী ক'রে বাঁচলো সে ? বুঝতে পারলে যে এই অচেনা লোকটাই তার উদ্ধারকর্তা । ভাঙা গলায় আস্তে বললে : 'ধন্যবাদ, তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ ।' তার দু-চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল পড়ছে ।

—'খিদে পেয়েছে তোমার ? কিছু খাবে ?'

—'না । আরো-কিছু জল পেলে ভালো হয় ।'

জন ডেভিসকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্যে একটু ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে সে জল খেতে দিলে । খানিকক্ষণ পরে মনে হ'লো, জন ডেভিস কিছুটা সামলে উঠেছে । তারপর আস্তে-আস্তে ভাঙা-ভাঙা কথায় সে যা বললে, তার সারমর্ম সংক্ষেপে এই :

মবিল বন্দর থেকে সাড়ে-পাঁচশো টনের জাহাজ সেনচুরি কাপ্তেন হেনরির পরিচালনায় তিন সপ্তাহ আগে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলো । হেনরি আর জন ডেভিস ছাড়া জাহাজে আরো বারোজন নাবিক ছিলো । যাত্রার গোড়ার দিকটা শুভই হয়েছিলো । কিন্তু স্টটেন আইল্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে ভীষণ ঝড়ের পাল্লায় প'ড়ে জাহাজটার নিয়ন্ত্রণ তারা হারিয়ে ফ্যালে । অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না । বাতিঘরের কথা জানা ছিলো ব'লে কাপ্তেনের আশা ছিলো অন্তত দশ মাইল দূর থেকে বাতিঘরের আলো দেখতে পাবেন । কিন্তু কোনো আলো দেখতে না-পেয়ে তিনি ভেবেছিলেন স্টটেন আইল্যাণ্ড থেকে নিশ্চয়ই অনেকটা দূরে আছেন । এমনি সময়ে বজ্রপাতের মতো একটা ভয়ংকর শব্দ ক'রে জাহাজটি তীরের পাথরে আছড়ে পড়ে । তারপরেই সব শেষ ।

একটু চুপ ক'রে থেকে জন ডেভিস আবার বাস্‌কেথকে তার ধন্যবাদ জানালে, কিন্তু কিছুতেই সে বুঝে উঠতে পারছিলো না সে কোথায় আছে । ধাঁধা লাগছিলো তার । বাস্‌কেথকে সে জিগেস করলে, 'আমরা কোথায় ?'

—'স্টটেন আইল্যাণ্ডে ।'

—'স্টটেন আইল্যাণ্ডে !?' জন ডেভিস কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো ।

—'হ্যাঁ, স্টটেনে আইল্যাণ্ডে । দ্বীপটা ইগোর উপসাগরের মুখে—'

—'তা জানি ! কিন্তু বাতিঘর ?'

—'বাতিঘরের আলো জ্বলেনি ।'

জন ডেভিসের বিস্ময় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে । হতভম্বের মতো হাজারটা জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে সে তাকিয়ে রইলো । তখন বাস্‌কেথ তাকে আদ্যোপান্ত সব খুলে ব'লে বুঝিয়ে দিলে বাতিঘরের আলো কেন জ্বলেনি, আর কেনই বা সে বাতিঘর ছেড়ে বাইরে আস্তানা গেড়েছে । ফিলিপ আর মরিস কীভাবে খুন হয়েছে সে-কথা বলতে-বলতে তার স্বর ব্যথায় আর্দ্র হ'য়ে উঠেছিলো ।

—'কী সাংঘাতিক !' জন ডেভিস আঁৎকে উঠে বললে, 'তাহ'লে ঐ বোম্বেটেরাই এখন বাতিঘরের মালিক এবং তারাই বাতিঘরের লণ্ঠন জ্বালেনি । অর্থাৎ এই শয়তানগুলোর জন্যেই

সেনচুরির এই সর্বনাশ হ'লো ।'

—'হ্যাঁ ।' ঘাড় নেড়ে সায় দিলে বাস্‌কেথ । তারপর সে খুলে বললে দস্যুরা এখন কী মৎলব এঁটেছে । 'মালপত্র তোলা শেষ হ'য়ে গেছে । আজ ভোরেই এদের রওনা হবার কথা ছিলো ।'

—'এরা কোথায় যাবে ব'লে মৎলব করেছে, তার কিছু জানো ?'

—'যাবে প্যাসিফিক আইল্যাণ্ডসের দিকে । সেখানে নিশ্চিন্ত মনে দাপট দেখিয়ে লুঠতরাজ চালাতে পারবে তারা ।'

—'এ-রকম ঝড় থাকলে তারা রওনা হ'তে পারবে না ।'

—'তা পারবে না । যে-রকম আবহাওয়া দেখছি তাতে এক হপ্তার মধ্যে এরা রওনা হ'তে পারবে ব'লে মনে হয় না ।'

—'এদিকে, যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ নিশ্চয়ই বাতিঘরের আলো জ্বালবে না ?'

—'সেইরকমই তো মনে হয় ।'

—'তাহ'লে সেনচুরির মতো আরো জাহাজের সর্বনাশ হ'তে পারে ?'

—'তা পারে বৈ কি ।'

—'তাহ'লে অন্যকোনো জাহাজকে এদিকে দেখতে পেলেই হুঁশিয়ার ক'রে দিতে হবে ।'

—'আমি সেনচুরিকেও সাবধান ক'রে দিতে চেয়েছিলুম কিন্তু এমন জোরালো হাওয়া যে কিছুতেই আগুন জ্বালতে পারিনি ।'

—'আমরা দুজনে মিলে হাত লাগালে নিশ্চয়ই পারবো ।' ডেভিসের গলায় দৃঢ়তা । 'এখানে কাঠকুটোর অভাব হবে না । সেনচুরির ভাঙা টুকরোগুলো তো আছেই, এদিক-ওদিক নিশ্চয়ই আরো কাঠ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে । বোম্বেটেরা যতদিন দ্বীপে আছে, ততদিন আলো জ্বালবে না । কিন্তু সমুদ্রের যা অবস্থা তাতে এই ক-দিনে আরো-কত জাহাজের সর্বনাশ হ'য়ে যাবে, কে জানে ।'

—'এটা ঠিক যে কনগ্রে আর তার স্যাঙাৎরা এই দ্বীপে আর বেশিদিন থাকছে না । যে-মুহূর্তে আবহাওয়া একটু শান্ত হবে, তারা রওনা হ'য়ে পড়বে । তারপরে আর একদিনও সবুর করবে না ।'

—'কেন ?'

—'কারণ তারা জানে শিগগিরই বাতিঘরের রক্ষীদের ছুটি দেবার জন্যে সান্তা-ফে এসে হাজির হবে ।'

—'সান্তা-ফে ?'

—'হ্যাঁ, সান্তা-ফে । আরহেন্‌তিনার মানোয়ারি জাহাজ । সে মার্চের গোড়ার দিকেই আমাদের ছুটি দেবার জন্যে নতুন রক্ষী নিয়ে এসে পৌঁছুবে । আজ আঠারোই ফেব্রুয়ারি —কাজেই খুব বেশি দেরি নেই ।'

—'তাহ'লে একটা জাহাজ এসে, সত্যি-সত্যি, ইচ্ছে ক'রে, স্টটেনে আইল্যাণ্ডে ভিড়বে ?'

—'হ্যাঁ, বুয়েনোস আইরেস থেকে রওনা হ'য়ে মার্চের দশ তারিখের আগেই তার এখানে

এসে পৌঁছুবার কথা।'

—'জিশুর দোহাই,' জন ডেভিস বললে, 'আবহাওয়া তা'হলে যেন এমন খারাপই থাকে। সান্তা-ফে একবার এদিককার জলে আসুক, তারপরে ওই বোম্বেটেগুলোকে দেখে নেয়া যাবে।'

ঠিক এই কথাই বাস্‌কেথও আগে ভেবেছে। হুবহু এই কথাগুলোই।....

১০

ঝড়ের কবলে বোম্বেটেরা

কী ভীষণ ঝড়তুফান আর কী তার ক্রুদ্ধ উচ্ছ্বাস! আরো দিনকতক মিছেমিছি দেরি হ'য়ে যেতে চলেছে তাহ'লে! রকম দেখে মনে হয় এই ঝড় বুঝি এ-মাসের শেষ অব্দি এমনি ফুঁসেই চলবে! তবে ঝড় থাকুক বা না-থাকুক, মাসকাবারের সঙ্গে-সঙ্গেই সের্‌সান্তেকে যেমন ক'রে হোক সমুদ্রে পাড়ি দিতেই হবে। যা-ই হোক, একটা জাহাজ যখন স্টটেন আইল্যাণ্ডের তীরে এসে আছড়ে পড়লো তখন একবার সরেজমিন তদন্ত ক'রেই দেখা যাক কোনো মূল্যবান জিনিশপত্র পাওয়া যায় কি না—মনে-মনে ভাবলে কন্‌গ্রে।

আগের দিন যখন সূর্য ধীরে-ধীরে দিগন্তের নিচে ডুবে যাচ্ছিলো, তখন লণ্ঠনঘর থেকে বারদরিয়ায় একটি জাহাজকে ঝড়ের পাল্লায় প'ড়ে নাকানিচোবানি খেতে দেখেছিলো সের্‌সান্তে। তক্ষুনি সে কন্‌গ্রেকে ডেকে এনে দেখিয়েছিলো। যতক্ষণ-না অন্ধকার জমাট বেঁধে নিরেট হ'য়ে গেলো, ততক্ষণ জাহাজটির দিকে তাকিয়ে থেকে দুজনেই বুঝতে পেরেছিলো যে সান হুয়ান অন্তরীপ আর পয়েণ্ট সেভারেলের মাঝখানে কোথাও সেটার সলিল সমাধি জুটবে। বাতিঘরের লণ্ঠনের আলো জ্বেলে তারা জাহাজটাকে রক্ষা করতে পারতো অবশ্য, কিন্তু তা ক'রে তাদের কী লাভ? বরং জাহাজটা তীরে আছড়ে প'ড়ে চুরমার হ'য়ে গেলে কিছু দামি জিনিশপত্তর হাতিয়ে নেবার মওকা এসে যাবে।

কন্‌গ্রে আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা একটা নৌকোয় ক'রে ভাঙা জাহাজটার খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। অকুস্থলে গিয়ে পৌঁছুতে তাদের খুব-একটা দেরি হ'লো না। তাদের চ্যাঁচামেচি আর হুল্লোড়ে বাস্‌কেথ আর জন ডেভিসের আলোচনায় ব্যাঘাত ঘ'টে গেলো। বাস্‌কেথ খুব সাবধানে গুহার মুখে এসে দাঁড়ালে। জন ডেভিসও পায়ে-পায়ে তাকে অনুসরণ ক'রে এলো। দুজনে মস্ত-একটা পাথরের আড়াল থেকে সাবধানে বোম্বেটেদের পানে তাকালো।

জলদস্যুরা তখন বাস্‌কেথের ছোট্ট গুহাটা থেকে দুশো গজও দূরে নেই। আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে সহজেই তাদের দেখা যাচ্ছিলো। বোম্বেটেদের মধ্যে বাস্‌কেথ যাকে-যাকে চিনতো, জন ডেভিসকে তাদের পরিচয় দিতে লাগলো—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ-যে-লোকটা জাহাজের ভাঙা মাস্তুলটার পাশে দাঁড়িয়ে—তার নাম হ'লো কন্‌গ্রে। যদ্দুর বুঝতে পেরেছি, সে-ই হ'লো এদের সর্দার।'

—'আর যার সঙ্গে তার এত দহরম-মহরম ? ঐ-যে, যার সঙ্গে ও কথা বলছে ?'

—'ও সের্‌সান্তে, কন্‌গ্রের ডানহাত । আমি লণ্ঠনঘর থেকে স্পষ্ট দেখেছি, ঐ বদমায়েশটাই ফিলিপ আর মরিসকে খুন করেছে ।'

দাঁতে দাঁত চেপে জন ডেভিস বললে, 'একবার যদি এই খুনেগুলোকে হাতের কাছে পাই—'

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেলো । বোম্বেটেরা তন্নতন্ন ক'রে সেনচুরির মালপত্তর খুঁজেছে । যে-সব জিনিশ কন্‌গ্রে দরকারি ব'লে মনে করলে, সব সে নৌকোয় তুলতে হুকুম করলে ।

ডেভিস ক্রুদ্ধ চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'শয়তানগুলো যদি সোনারুপো বা ঐ-রকম কোনো দামি জিনিশের খোঁজ করে, তবে অষ্টরম্ভা পাবে ।'

সঙ্গে-সঙ্গে বাস্‌কেথের টিপ্পনী : 'তা-ই বোধহয় এরা চায় । ঐ অষ্টরম্ভা ।'

ডেভিস বললে, 'এদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এরা কোনো নিরাপদ এলাকায় কেটে পড়তে চাচ্ছে । তবে সে-সুযোগ এদের কপালে আছে কি না তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে ।'

—'যদি আবহাওয়া অন্তত আর-কয়েকটা দিন খারাপ থাকে —'

—'কিংবা আমরা যদি কোনো উপায় খুঁজে পাই ...' জন ডেভিস তার কথাটা আর শেষ করলে না ।

কিন্তু উপায়টা কী ? কী ক'রে সান্তা-ফে ফিরে না-আসা অব্দি বোম্বেটেদের এ-দ্বীপে আটকে রাখা যাবে ?

জলদস্যুরা তখন ভাঙা জাহাজটাকে ঘুরে-ঘুরে দেখছে । প্রায় ঘণ্টা দুই ধ'রে খোঁজাখুঁজি চললো । তারপর সের্‌সান্তে তার আরেক শাগরেদকে নিয়ে কুড়ুল হাতে এসে হাজির : জাহাজটাকে তারা আরো ভেঙেচুরে ফেলতে শুরু করলে ।

—'কী ব্যাপার ?' অবাক হ'য়ে বাস্‌কেথ বললে, 'এমনিতেই কি জাহাজটা চুরমার হ'য়ে যায়নি ? একে তো আর কোনোদিনই সারানো যেতো না । তবে মিছেমিছি এটাকে আরো ভেঙে ফেলে কী লাভ ?'

—'আমি বুঝতে পেরেছি ওরা কী করতে চাচ্ছে,' ডেভিস বললে, 'সেনচুরি নামে কোনো জাহাজ যে কোনোদিন অ্যাটলান্টিকে পাড়ি দিয়েছিলো, তার কোনো চিহ্নই ওরা রাখতে চায় না । চিহ্ন-টিহ্ন সব বেমালুম লোপাট ক'রে দিতে চাচ্ছে ।'

জন ডেভিস ঠিকই ধরেছিলো । মিনিট কয়েকের মধ্যেই সের্‌সান্তে কাপ্তেনের কামরা থেকে একটি মার্কিন জাতীয় পতাকা নিয়ে বাইরে এলো আর ছিঁড়ে হাজার টুকরো ক'রে উড়িয়ে দিলে সব তারা আর ডোরা ।

—'বদমায়েশ !' প্রায় চেঁচিয়েই উঠছিলো জন ডেভিস । 'শয়তানটা আমার জাতীয় পতাকাকে ছিঁড়ে ফেলেছে ।'

রেগে, সে প্রায় ছুটেই যায় বুঝি যেদিকে । বাস্‌কেথ কোনোরকমে ধ'রে বেঁধে তুইয়েবুইয়ে তাকে থামালে । ডেভিস গোড়ায় বেজায় চ'টে গিয়েছিলো, তবে একটু ভেবে

নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ তুমি ঠিকই করেছো। হুট ক'রে আবেগের বশে কিছু করা যাবে না। কিন্তু বদমায়েশগুলোকে সজুত করতে না-পারলে আমার আশা মিটবে না। এদের কুকুরের মতো গুলি ক'রে মারবার জন্যে আমার হাত দুটো নিশপিশ করছে!'

বাস্‌কেথ চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললে, 'এ-তুফান খুব শিগগির থামবে ব'লে মনে হচ্ছে না। আর যদিও-বা হাওয়ার বেগ একটু ক'মেও যায়, সমুদ্র কিন্তু আরো-কয়েকদিন এমনি রাগে ফুঁসতে থাকবে। কাজেই এরা যে দিন কয়েকের মধ্যে রওনা হ'তে পারবে না, সে আমি বাজি ধ'রে বলতে পারি।'

—'তোমার আন্দাজটাই ঠিক। তবে তুমিই তো বলেছো, সামনের মাসের গোড়ার দিকে ছাড়া সান্তা-ফের এখানে পৌঁছুবার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

—'সে-যে আরো আগে আসবে না, তা কে বলতে পারে।'

—'জিশুর দোহাই, তা-ই যেন হয়।'

—'আমার তো মনে হয় তা-ই হবে। সান্তা-ফে নির্ধারিত তারিখের আগেই এসে পৌঁছুবে। প্রথমবার চালু হবার পর বাতিঘর কেমন কাজকর্ম করেছে, সে-সম্বন্ধে একটা কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া, কোনো জাহাজই ফিরে গিয়ে এটা নিশ্চয়ই বলবে না যে তারা বারদরিয়া থেকে বাতিঘরের আলো দেখেছে। কাজেই বাতিঘর আলো জ্বালায়নি কেন, সে-কথা জানতেই হয়তো সান্তা-ফে আগেই এসে পৌঁছুবে।'

ঝড় যে শিগগিরি থামবে না, সেটা আকাশবাতাসের দশা থেকে আন্দাজ করা যায়। কিন্তু চার-পাঁচদিনের তুলকালাম ঝড়ের পর ঝড়তুফানের চোট হয়তো কিছুটা ক'মেই যাবে। তুফান একটু কমলেই বোম্বেটেরা হয়তো সে-সুযোগ আর হেলায় হারাতে দেবে না। চারটের সময় কনগ্রে তার দলবল সমেত নৌকা-বোঝাই মাল নিয়ে বাতিঘরের দিকে ফিরে গেলো। সন্ধ্যার সময় ঝড় আরো-ভয়ংকর হ'য়ে উঠলো। এবারে কিছু-কিছু বৃষ্টিও শুরু হ'য়ে গেলো।

বাস্‌কেথ আর জন ডেভিস বৃষ্টির জন্যে গুহা থেকে বেরুতে পারেনি। বৃষ্টির সঙ্গে তাল রেখে কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছিলো। গুহার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা সেঁকেছিলো তারা। গুহার একেবারে শেষ কোনায় আগুন জ্বালানো হয়েছিলো ব'লে তার আলো বাইরে যাবার সম্ভবনা ছিলো না। সুতরাং তাদের ভয় করবার কিছুই ছিলো না। রাতটা আরো ভয়ানক হ'য়ে উঠেছিলো। সমুদ্র খ্যাপার মতো তীরে আছড়ে পড়ছে, অনেক দূর অব্দি ঢেউ এসে পড়ছে ডাঙায়। সমুদ্র যতই ভয়ংকর হোক না কেন এখানে, সচরাচর এতটা ভয়ংকর রূপ কিন্তু ধরে না।

ডেভিস ক্ষুব্ধ স্বরে বললে— 'ঈশ্বর করুন, এই ঝড়ে বোম্বেটেদের জাহাজ যেন চুরমার হ'য়ে যায়।'

সারা রাত ধ'রে অশান্ত সমুদ্রে পাগলা ঝড়ের মাতন চললো। সমুদ্র যেন দুরন্ত আক্রোশে গ'র্জে উঠছে। আর ঢেউগুলো সেনচুরির ভাঙা টুকরোগুলোকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেলো কে জানে। পরদিনও সমুদ্র এমনি ভয়ংকর রইলো। ভাগ্যিশ বাস্‌কেথের খাবারদাবার কম ছিলো না, তাই রক্ষা। সেনচুরি থেকে জোগাড় করা খাবারদাবারে দু-মাস তাদের হেসে খেলেই কেটে যাবে। তার মধ্যেই সান্তা-ফে এসে স্টটেন আইল্যাণ্ডে এসে নোঙর ফেলবে।

—'ঈশ্বর করুন ঝড় যেন একই সঙ্গে দু-রকম হয়, হঠাৎ ঝড়ের জন্যে বোম্বেটেরা

যাতে রওনা হ'তে না-পারে, আবার ঝড় যেন এমন ভীষণ না-হয় যাতে সান্তা-ফে তীরে ভিড়তে না-পারে ।' বাস্‌কেথ তার অদ্ভুত তত্ত্ব শোনালে ।

ডেভিস উত্তর দিলে—'বাতাস যদি আমার কথা শুনতো , তাহ'লে অবশ্য অনায়াসেই তা করা যেতো ।'

—'দুর্ভাগ্যবশত ঈশ্বর ছাড়া এই অলৌকিক কাণ্ড আর কে করবে ?'

—'পাপের শাস্তি ঈশ্বরই দেবেন,' ডেভিস তার বিশ্বাস জানালে ।

দুজনেরই মনের মধ্যে সারাক্ষণ প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিলো ।

একুশে আর বাইশে ফেব্রুয়ারিও আবহাওয়া একই রকম ভয়ংকর রইলো ।

আকাশে আগের মতই কালো-কালো মেঘের গুরু-গুরু আওয়াজ, আগের মতোই দুরন্ত সমুদ্রে ঢেউ উত্তাল হ'য়ে আছে । হাওয়া যেন তীব্র ক্রোধে রী-রী করছে, হাওয়ার সঙ্গে তাল রেখেই চলেছে মেঘের দাপাদাপি, সমুদ্র উথালপাথাল হ'য়ে আছে ।

তেইশে ফেব্রুয়ারি অবশ্য সামান্য উন্নতি দেখা গেলো । তবে সত্যি-বলতে তাকে ঠিক উন্নতি বলা চলে না । সমুদ্র আগের মতোই ফুঁসছে, আকাশকে ঘিরে আছে যেন নিরেট কালো মেঘ, হাওয়া তেমনি খেপে আছে । শুধু বৃষ্টিটা থেমেছে ।

এই তিন দিন এক সেকেণ্ডের জন্যেও ডেভিস আর বাস্‌কেথ গুহা থেকে বেরুতে পারেনি । তেইশে ফেব্রুয়ারি বৃষ্টি পড়ছে না দেখে তারা সত্যি-সত্যি কী হচ্ছে সরেজমিন তদন্ত ক'রে দেখবার জন্যে গুহা থেকে বেরুলো । কিছু দূর এসে ডেভিস হঠাৎ মাটিতে গেঁথে-থাকা কী-একটা জিনিশে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো । উঠে তাকিয়ে দ্যাখে, ধাতু নির্মিত একটা বাক্স, তার গায়ে সেনচুরির নাম খোদাই করা । বাক্সটা গোলা-বারুদে বোঝাই ।

ডেভিস যেন লাফিয়ে উঠলো —'এগুলোকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে । একবার যদি বোম্বেটেদের জাহাজে এ দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো যায়—'

—'একটা-কিছু উপায় ভেবে বার করতেই হবে ।' বাস্‌কেথ বললে—'ফেরবার পথে এটাকে ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে গুহায় ।'

তারা তীর ধ'রেই এগুচ্ছিলো । বেশ কিছুদূর এগিয়ে তারা যখন ফেরবার উপক্রম করছে, তখন হঠাৎ বাস্‌কেথ চেঁচিয়ে উঠলো— 'ওটা কী ?'

দূরে কালো-মতো কী-একটা দেখা যাচ্ছিলো । দুজনে তার দিকে ছুটে গেলো । একটা কামান ! তার গায়েও সেনচুরির নাম খোদাই করা ।

—'এ-যে তোমার সম্পত্তি, ডেভিস !'

—'হ্যাঁ, এই কামান ছুঁড়েই আমরা সংকেত করতুম । কিন্তু এখন এটা আমাদের কী কাজে লাগবে ?'

—'তা কী জানি ! তবে কিছু গোলাবারুদও যখন পাওয়া গেছে, কামানটিকে হয়তো তখন কাজে লাগাবার সুযোগও একটা জুটে যাবে !'

—'আমার কিন্তু তা মনে হয় না ।'

—'কেন ? আর-কিছু না-হোক কামান ছুঁড়ে রাত্তিরে কোনো বিপন্ন জাহাজকে তো হুঁশিয়ার ক'রে দিতে পারবো ।'

ডেভিসের মনে কিন্তু অন্যরকম একটা ভাবনা খেলে যাচ্ছিলো তখন। সে শুধু জিগেস করলে —'এই কি তোমার ইচ্ছে ?'

—'হ্যাঁ, ডেভিস। এবং সেটা কোনো খারাপ প্রস্তাবও নয়। অবশ্য কামানের আওয়াজে বোম্বেটেরা আমাদের খোঁজ করতে শুরু করবে — আর তাতে তাদের হাতে আমাদের মৃত্যুও হ'তে পারে। কিন্তু তাই ব'লে কি আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করবো না ?'

—'আমার মনে হয় দায়িত্ব পালনের আরো-একটি পন্থা আছে।' ডেভিস এ-কথা বললে বটে, কিন্তু পন্থাটা কি সে-কথা সে খুলে বললে না।

আর-কোনো কথা না-ব'লে দুজনে মিলে কামানটা গুহার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কঠিন কাজ, কিন্তু নাছোড় লেগে থেকে এই ঠাণ্ডাতেও ঘেমে নেয়ে গিয়ে তারা কিন্তু শেষ অব্দি কাজটা করতে পারলে। কামানটা নিয়ে যাবার পর গোলাবারুদের বাক্সটাও তারা গুহায় নিয়ে গেলো। এ নিয়ে বলা সহজ, মনে হয় চট ক'রেই বুঝি হ'য়ে গেছে, কিন্তু আসলে অনেকক্ষণ ধ'রে গলদঘর্ম হ'তে হয়েছিলো তাদের। একটু বিশ্রাম ক'রে তারা যখন খেতে বসলো, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

তারা খেতে বসেছে-কি-বসেনি, সেরসান্তে আর ভার্গাস আবহাওয়ার অবস্থা দেখবার জন্যে সেখানকার টিলাটায় এসে হাজির। আকাশ আর সমুদ্রের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে তারা বুঝতে পারলো যে বৃষ্টি ধ'রে এলেও জাহাজের নোঙর তোলা এখনও খুব বিপজ্জনকই আছে। আধঘণ্টাটাক পরে তারা ফিরে গেলো।

—'হুম, শ্রীমানেরা ফিরে গেছেন!' বাস্‌কেথ বললে —'দিন কয়েক বাদে ফের যদি তারা আবহাওয়ার হালচাল জানতে এখানে আসে, আমি তবে তাদের স্বয়ং রাজা সলোমনের রত্নখনিটাই দান ক'রে ফেলবো।'

ডেভিস কিন্তু শুধু তার মাথা ঝাঁকালে। তার কেবলই মনে হচ্ছিলো, দিন দু-একের মধ্যেই ঝড় থেমে যাবে। সমুদ্র যদি পুরোপুরি শান্তও না-হয়, অন্তত পাড়ি জমাবার মতো অবস্থা হ'য়ে উঠবে তখন।

সন্ধের পর গুহায় ফিরে কিছু বিস্কুট চিবিয়েই কোনোরকমে তারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করলে। তার পরই বাস্‌কেথ শোবার উদ্‌যোগ করতে লাগলো।

হঠাৎ ডেভিস বললে —'শোবার আগে আমার একটা প্রস্তাব শোনো।'

—'কী ?'

—'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো। সুতরাং তুমি যা অনুমোদন করবে না তা আমি কখনও করবো না। আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে। সব শুনে বিবেচনা ক'রে দেখে তারপরই তোমার মত দিয়ো। তবে এ-কথা ভেবো না তোমার মত না-পেলে আমি ক্ষুণ্ণ হবো।'

—'ভনিতা বাদ দাও, ডেভিস। কী বলতে চাও, স্পষ্ট ক'রে বলো।'

—'আবহাওয়া তো শিগগিরই বদলে যাবে। ঝড় থামবে, সমুদ্রও শান্ত হ'য়ে উঠবে। আমার তো মনে হয় দু-তিন দিনের মধ্যেই বোম্বেটেরা নোঙর তুলবে।'

ক্ষুব্ধ স্বরে বাস্‌কেথ বললে,—' সন্ধেবেলায় আকাশ দেখে তো তা-ই মনে হ'লো। কিন্তু আমরা যে নিরুপায় —'

ডেভিস বললে—'দু-তিন দিনের মধ্যেই স্কুনারটা গিয়ে বারদরিয়ায় পড়বে তারপর যত

জোরে পারে জাহাজ চালিয়ে পশ্চিমে উধাও হ'য়ে যাবে । আর-কখনোই তার কোনো চিহ্নই দেখা যাবে না । তোমার সঙ্গীসাথীদের, আমার সঙ্গীসাথীদের মৃত্যুর কোনো বদলাই নেয়া যাবে না—সেনচুরির এই দুর্দশারও প্রতিশোধ নেয়া যাবে না ।'

ডেভিস আরো বললে —'শুধু-একটা পথই খোলা আছে আমাদের সামনে । দ্বীপ থেকে বোম্বেটেরা যাতে কেটে পড়তে না-পারে, তাদের যাত্রায় আমরা যদি বাধা দিতে চাই, তাহ'লে তার একমাত্র উপায় হ'লো তাদের স্কুনারটাকে কোনোরকমে ভেঙে-চুরে দেয়া । তা সম্ভব না-হ'লে নিদেন পক্ষে এমন-কোনো ক্ষতি করা যাতে তাদের যাত্রা বিঘ্নিত হয়, সান্তা-ফে আসা অব্দি তাদের দ্বীপে আটকে থাকতে হয় ।' একটু থেমে দম নিয়ে সে আবার বললে —'আমাদের কামান আছে, গোলাবারুদ আছে । এই কামান আর গোলাবারুদ কি বৃথা যাবে ? কোনো কাজেই লাগবে না ? যে ক'রেই হোক কামানটাকে ঐ টিলার ওপর নিয়ে গিয়ে গোলা ভ'রে রাখতে হবে । তারপর যখন—' বলতে-বলতে ডেভিস রীতিমতো উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো—'তারপর যখন বোম্বেটেদের জাহাজ টিলার কাছ দিয়ে যাবে, সেটাকে তাগ ক'রে গোলা ছুঁড়বো । হয়তো তাতে জাহাজটা পুরোপুরি ধ্বংস হবে না, কিন্তু লম্বা পথ পাড়ি দেবার মতো অবস্থাও তার থাকবে না । আবার সেটাকে মেরামত করতে না-পারলে তারা সাগরপাড়ি দিতে পারবে না । আবার তাকে এই দ্বীপেই নোঙর ফেলতে হবে, মালপত্র নামিয়ে নিতে হবে, তারপর মেরামতের কাজে হাত দিতে হবে । কম ক'রেও তাতে দুটো হপ্তা লেগে যাবে । আর সেই ফাঁকে সান্তা-ফে এসে পৌঁছুবে, তারপর ....'

ডেভিস থেমে গেলো । বাস্‌কেথ তার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে চাপ দিলে । দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন স্বরে বললে —'যে-ক'রেই হোক, আমাদের এ-কাজ করতেই হবে ।'

বাইরে তখন হাওয়া শোঁ-শোঁ ক'রে গরজাচ্ছে । আর সমুদ্রের মত্ত ঢেউগুলো প্রচণ্ড জোরে তীরে আছড়ে পড়ছে ।

১১

উপসাগর ছাড়িয়ে

পঁচিশে ফেব্রুয়ারি সকালের দিকেই আবহাওয়া বেশ শান্ত হ'য়ে গেলো । কনগ্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঠিক করলে সেদিনই সে সদলবলে দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যাবে । বিকেলবেলার মধ্যেই যাতে নোঙর তুলতে পারে, তার জন্যে জোর প্রস্তুতি চলতে লাগলো । তবে সন্ধে ছ-টা নাগাদে জোয়ার বইবে : জোয়ারের সময়ই রওনা হওয়া সুবিধের ।

যদি পারতো, তবে সকালবেলাতেই জাহাজ ছাড়তো কন্‌গ্রে । কিন্তু এত ঘন হ'য়ে কুয়াশা পড়েছিলো যে তার সেই আশা সফল হয়নি । জাহাজে এত মাল বোঝাই করা হয়েছিলো যে, জাহাজটি সাধারণ অবস্থায় জলের নিচে যতটুকু ডুবে থাকতো, তার চেয়েও

কয়েক ইঞ্চি বেশি ডুবে গিয়েছিলো ।

দুপুরবেলায় বাতিঘরের সামনেটায় হাঁটতে-হাঁটতে সের্‌সান্তে কন্‌গ্রেকে বললে : 'কুয়াশা ক্রমেই স'রে যাচ্ছে । একটু বাদেই সমুদ্র পরিষ্কার হ'য়ে যাবে । সাধারণত এ-রকম কুয়াশা পড়লে ঝড় থেমে যায়, আবহাওয়া শান্ত হ'য়ে ওঠে, আর জোয়ার একটু তাড়াতাড়ি শুরু হয় ।'

—'জোয়ারের সময়ই আমরা জাহাজ ছাড়বো । আর একবার যদি এখানকার উপসাগর ছাড়িয়ে যেতে পারি, তবে আর আমাদের কে আটকায় ?' কন্‌গ্রের গলায় শুধু আশাই নেই, হর্ষও ছিলো ।

—'তা ঠিক । তবে রাতটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হবে ব'লে মনে হচ্ছে । আজ সবে প্রতিপদ কি না, তাই চাঁদও উঠবে ভোরবেলার দিকে ।'

—'তাতে কিছুই এসে-যায় না । চাঁদ-তারা গ্রহ-নক্ষত্র এদের আমি থোড়াই তোয়াক্কা করি । এ-অঞ্চলটা আমার নখদর্পণে ।'

—'কালকের মধ্যেই আমাদের অনেক দূরে সটকে-পড়া চাই, ওস্তাদ ।'

—'কাল আমরা সেন্ট বার্থোলোমিউ পেছনে ফেলে দূর সমুদ্দুরে গিয়ে পড়বো । আশা করি সন্ধের আগেই কুড়ি মাইল এগিয়ে যেতে পারবো ।'

—'এখানে কিন্তু ভয়ানক দেরি হ'য়ে গেলো, ওস্তাদ ।'

—'সেজন্যে তোমার আপশোশ হচ্ছে ?'

—'আপশোশ আর কীসের ? এখানে বরং আমাদের প্রচুর লাভই হয়েছে ।... তবে একটা খটকাও আছে বৈ-কি । ঐ তিন নম্বর আলোকরক্ষীটি যে কোথায় উধাও হ'য়ে গেলো তার আর কোনোই হদিশ মিললো না । এই দু-মাসে নিশ্চয়ই লোকটা না-খেতে পেয়েই মরেছে । তবে যদি ম'রে না-গিয়ে থাকে —'

—'সান্তা-ফে আসার আগেই যে আমরা রওনা হ'তে পারছি, এটা কিন্তু আমাদের মস্ত সৌভাগ্য ।'

—'বাতিঘরের কাগজপত্তর অনুযায়ী আর হপ্তা খানেকের মধ্যেই তার এসে পড়ার কথা ।'

—'সেই এক হপ্তায় আমরা এখান থেকে অনেক দূরে চ'লে যাবো ।'

—'যা বলেছো, ওস্তাদ । হ্যাঁ, ভালো কথা । একবার বরং লণ্ঠনঘরে গিয়ে শেষবারের মতো সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিই । যদি কোনো জাহাজ চোখে পড়ে —'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে কন্‌গ্রে বললে—' যদি চোখেও পড়ে, তাতে আমাদের কিছুই এসে-যাবে না । সের্‌সান্তে জাহাজের কাগজপত্র সব ঠিক আছে । প্রশান্ত আর অতলান্তিক মহাসাগর সকলের কাছেই অবাধ, মুক্ত । সুতরাং মিথ্যে ভয় পাবার কিচ্ছু নেই । আমরা নিশ্চিন্তে সে-জাহাজকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারবো ।'

তার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হবে, এ-সম্বন্ধে কন্‌গ্রের মনে কোনোই সন্দেহ বা সংশয় ছিলো না । আর সব দেখে-শুনে এও মানতে হয় যে এ-যাবৎ সবকিছুই তার পক্ষে গেছে ।

সের্‌সান্তে আলোকস্তম্ভের লণ্ঠনঘরে গিয়ে হাজির হ'লো । চারপাশে ভালো ক'রে নজর বোলালো সে । প্রায় ঘণ্টাখানেক সে সেখানে কাটিয়ে দিলে । ধীরে-ধীরে তারই মধ্যে কুয়াশা

কেটে গিয়েছে। নীল আকাশ এসে যেখানে সমুদ্রের সুনীলে মিশেছে, সেই দুই-নীলে-মেশা দিগন্তের দিকে বার-কয়েক তাকালে সের্‌সান্তে। সমুদ্র যদিও এখনও বেশ দামাল, তবু ভয়ের কিছু নেই —তার টালমাটাল ভাবটা ক্রমেই শান্ত হ'য়ে আসছে। অনেক দূরে, একেবারে দিগন্তের কাছে, সের্‌সান্তে একটা জাহাজ দেখতে পেলে। তখন বেলা প্রায় দুটো বাজে। টেলিস্কোপ ছাড়াই খালি চোখেই জাহাজটাকে দেখা যাচ্ছিলো। জাহাজটি প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে চলেছে। যতক্ষণ-না সেটা দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলো সের্‌সান্তে সারাক্ষণ সেটার ওপর চোখ রাখলে।

কিন্তু এরই ঘণ্টাখানেক বাদে উত্তর-পুব দিকে কী-একটা দেখে বেশ-একটু উদ্বিগ্নই হ'য়ে পড়লো সে। অনেক দূরে একটা স্টীমারের কালো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। এও বোঝা গেলো, স্টীমারটির লক্ষ্য স্টটেন আইল্যাণ্ড। সের্‌সান্তে বেশ অস্বস্তি বোধ করলে। সান্তা-ফে নয়তো? না, তা-ই বা কী ক'রে হয়? আজ সবে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি, আর সান্তা-ফের আসবার কথা তো সেই মার্চের প্রথম সপ্তাহে। তাহ'লে কি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সান্তা-ফে চ'লে আসছে দ্বীপে? তা যদি হয় তাহ'লে মুশকিল। শেষটায় কি তাহ'লে কূলে এসে তরী ডুববে?

লণ্ঠনঘর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলে সে। তাদের জাহাজ দিব্যি নিশ্চিন্ত হ'য়ে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে। যাত্রার জন্যে তৈরি হ'য়েই আছে, শুধু নোঙর তোলবার যা দেরি। কিন্তু জোয়ার আসার আগে প্রতিকূল হাওয়ার সঙ্গে যুঝে বারদরিয়ায় গিয়ে পড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই ঐ স্টীমারটি আসার আগে তাদের জাহাজ রওনা হ'তে পারবে না। আর স্টীমারটি সান্তা-ফে হয় —

সের্‌সান্তে ভাবনায় প'ড়ে গেলো। কিন্তু কন্‌গ্রেকে বিরক্ত করতে না-গিয়ে সে একাই লণ্ঠনঘরে ব'সে রইলো। স্টীমারটি খুব দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। যে-রকম দ্রুত আসছে, তাতে সান্ হুয়ান অন্তরীপে পৌঁছুতে তার খুব বেশি দেরি হবে না। টেলিস্কোপ থেকে সে আর চোখ সরালে না। স্টীমারটি ক্রমেই যত কাছে আসছে, ততই তার উদ্বেগও বাড়ছে। কিন্তু একটু বাদে সে যখন স্টীমারটিকে দেখতে পেলে তখনই তার ভয়ডর সব উবে গেলো। খুবই ছোটোখাটো একটা স্টীমার। সান্তা-ফে কিছুতেই নয়। সান্তা-ফে যখন স্টটেন আইল্যাণ্ডে ছিলো, তখন সেটাকে সে ভালো ক'রেই লক্ষ ক'রে দেখেছে।

আহ্! সে একটা নিশ্চিন্ত আরামের নিশ্বাস ফেললে। কী ভাবনাই যে হয়েছিলো! ভাগ্যিশ আর-কাউকে স্টীমারটির খবর দিয়ে মিথ্যেমিথ্যি ঘাবড়ে দেয়নি! আরো এক ঘণ্টা লণ্ঠনঘরে থেকে গেলো সে। দেখতে পেলে, জাহাজটা স্টটেন আইল্যাণ্ডের উত্তরে তিন-চার মাইল দূর দিয়ে চ'লে গেলো। এত দূর থেকে জাহাজটার নাম সে টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়েও পড়তে পায়নি। শেষটায় জাহাজটা কলনেট অন্তরীপের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। সমুদ্রে আর কোনোকিছুরই চিহ্ন নেই। অবশেষে সন্তুষ্ট হ'য়ে হৃষ্ট মনে সের্‌সান্তে নিচে নেমে এলো।

ক্রমে জোয়ারের সময় এগিয়ে এলো। এবার সের্‌সান্তে জাহাজের যাত্রার সময় এসেছে। প্রস্তুতি বেশ ভালো হয়েছে। এখন শুধু নোঙর তোলা বাকি।

ছ-টার সময় কন্‌গ্রে সদলবলে গিয়ে জাহাজে উঠলো। জলে জোয়ারের প্রথম চাঞ্চল্য জেগেছে। কন্‌গ্রে জাহাজ চালাবার জন্যে তৈরি হ'য়ে নিতে হুকুম দিলে। ঘড়ঘড় ক'রে

নোঙর উঠলো। তারপর তুলে দেয়া হ'লো পাল। সের্‌সান্তে নড়তে শুরু করলো। আস্তে-আস্তে এখন বারদরিয়ার দিকে চলেছে। দক্ষিণ-পুব থেকে হাওয়া বইছিলো। এলাকাটা সত্যি কিন্তু কন্‌গ্রের নখদর্পণে। তাই সাড়ে-ছটার সময় দেখা গেলো তাদের জাহাজ অন্তরীপের একেবারে শেষমুখে এসে পৌঁছেছে। এখন জাহাজের সামনে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। আস্তে-আস্তে তখন সূর্য ডুবছে।

সের্‌সান্তে কন্‌গ্রের কাছে এগিয়ে এসে খুশি গলায় বললে—'শেষ অব্দি উপসাগর প্রায় ছাড়িয়ে এলুম।'

কন্‌গ্রে বললে—'হ্যাঁ। আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই সান্ হুয়ান অন্তরীপ আমাদের পেছনে প'ড়ে থাকবে।'

এমন সময় মাল্লাদের একজন এগিয়ে এসে বললে—'সামনে তাকিয়ে দেখুন, ওস্তাদ।'

—'কী ব্যাপার?' কন্‌গ্রে জানতে চাইলে।

সের্‌সান্তে লোকটার কাছে দৌড়ে চ'লে এলো। রেলিঙ ধ'রে জলের দিকে ঝুঁকে পড়লো। জাহাজ তখন বোম্বেটে-গুহার পাশ দিয়ে চলেছে। সের্‌সান্তে দেখতে পেলে, বিধবস্ত জাহাজ মউল-এর বেশকিছু ভাঙা টুকরো তখনও জলে ভাসছে। এটা বুঝতে তার দেরি হ'লো না যে এগুলোর সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তাদের জাহাজের বেশ ক্ষতি হ'তে পারে। কিন্তু তখন আর ঐ ভাসন্ত জিনিশগুলোকে সরাবার সময় নেই। তক্ষুনি সে কন্‌গ্রেকে ডেকে এনে জিনিশগুলো দেখালে।

কন্‌গ্রে তক্ষুনি জাহাজটাকে একেবারে তীরের কাছে নিয়ে এলো। ভাঙাচোরা লোহালক্কড় ইত্যাদি জাহাজের পাশ দিয়ে ভাসতে-ভাসতে চ'লে গেলো। এবার সে আবার সের্‌সান্তেকে উপসাগরের মাঝখানে নিয়ে এলো। আর পঞ্চাশ-ষাট গজ এগুলেই অন্তরীপের পাহাড়ের কোনা ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে।

ঠিক এমন সময় হঠাৎ হাওয়ায় একটা শোঁ-শোঁ আওয়াজ উঠলো, আর তৎক্ষণাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনে চমকে উঠলো বোম্বেটেরা। কীসের এক প্রচণ্ড আঘাতে কেঁপে উঠলো তাদের জাহাজ! দেখা গেলো, তীরের একটা জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে।

কন্‌গ্রে চীৎকার ক'রে উঠলো।—'এ কী-ব্যাপার, সের্‌সান্তে?'

—'আমাদের লক্ষ্য ক'রে কেউ কামান ছুঁড়েছে।' সের্‌সান্তে জবাব দিলে। যেখানে গোলা পড়েছিলো, সেখানে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলো কন্‌গ্রে।

জলরেখার চাইতে ফিট দু-এক ওপরে জাহাজের গায়ে মস্ত একটা গহ্বর।

সের্‌সান্তে যখন উপসাগর প্রায় পেরিয়েই এসেছে, ঠিক সেই সময় দ্বীপ থেকে আরেকটা গোলা এসে পড়লো। সর্বনাশ! গোলাটা আরেকটু নিচে লাগলেই হয়েছিলো আর-কি!

কী করবে এখন কন্‌গ্রে? ডিঙি ক'রে নেমে দ্বীপে গিয়ে গোলন্দাজদের একহাত দেখিয়ে দেবে? যদি তারা সংখ্যায় ভারি হয়? তার চেয়ে কামানের পাল্লার বাইরে নিয়ে গিয়ে জাহাজটাকে মেরামত করবার চেষ্টা করাই ভালো।

আবারও এক কামানের নিনাদে কন্‌গ্রের ভাবনায় বাধা পড়লো। আবার তার স্কুনার থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছে। এবার গোলাটা এসে পড়েছে আগের গোলাটার চাইতে কয়েক

ইঞ্চি নিচে ।

কন্‌গ্রে তখন প্রাণপ্রণে চেষ্টা করছে যে-করেই হোক স্কুনারটাকে কামানের পাল্লার বাইরে নিয়ে যেতে । সে ভেবেছিলো, কোনোরকমে একবার উপসাগরের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই আর-কোনো ভয় থাকবে না ।

ভাগ্যিশ আর-কোনো কামানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না । একটু পরেই তারা দ্বীপের শেষ পাহাড়টা পেরিয়ে চ'লে এলো । কন্‌গ্রে ভাবলে, আর-কোনো ভয় নেই । জাহাজ এখন পাহাড়ের আড়ালে এসে গিয়েছে ।

কতটুকু ক্ষতি হ'লো তা এক্ষুনি পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার । কিন্তু মালপত্র না-নামালে ভেতর থেকে তা বোঝবার কোনো উপায় ছিলো না । জাহাজ থেকে তক্ষুনি একটা ডিঙি নামানো হ'লো । কন্‌গ্রে আর ভার্গাস ডিঙিতে ক'রে ঘুরে-ঘুরে সব খতিয়ে দেখে ক্ষতির বহরটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করতে লাগলো ।

না, তেমন-কোনো গুরুতর কিছু ক্ষতি হয়নি । কিন্তু তাও, যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তাতে এই স্কুনার নিয়ে এখন সাগরপাড়ি দেওয়া অসম্ভব । ঠিক জলরেখার কাছে একটা গর্ত তৈরি হয়েছে : কোনোরকমে তা দিয়ে যদি একবার জল ঢোকে তাহ'লে আর রেহাই নেই, একেবারে পাতালে সমাধি । যে-ক'রেই হোক এক্ষুনি তা মেরামত ক'রে নিতে হবে ।

—'কিন্তু কুকুরগুলো কে ? একবার হাতের কাছে পেলে মুণ্ডুগুলো চিবিয়ে খেতুম,' দাঁত কিড়মিড় ক'রে সেরসান্তে বললে ।

—'সম্ভবত সেই তৃতীয় আলোকরক্ষীটি ।' ভার্গাস তার অনুমানটি জানালে । 'বা এমনও হ'তে পারে সেনচুরির কোনো লোককে আলোকরক্ষীটি উদ্ধার করেছে, আর তারা দুজনে মিলে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে ।'

—'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে ।' সেরসান্তে সায় দিলে । 'এ-কামানটা নিশ্চয়ই সেনচুরির । অথচ, আশ্চর্য, ভাঙা জাহাজটার আশপাশে তো আমরা কোনো কামান দেখতে পাইনি ।'

কন্‌গ্রে বাধা দিয়ে বললে —'সে নিয়ে এখন মাথা না-ঘামালেও চলবে । এখন আমাদের সবচেয়ে আগে সব ক্ষতিটতি সারিয়ে নেয়া দরকার ।'

—'নিঃসন্দেহে । মেরামতের কাজে লেগে-পড়াটাই এখন সবচাইতে জরুরি । কিন্তু তার চেয়েও আগে দরকার পয়েন্ট দিয়েগোর অন্য তীরে জাহাজটি নিয়ে ভেড়ানো, কারণ, তা না-করলে আমরা সমুদ্রের জোরালো হাওয়ার পাল্লায় প'ড়ে যাবো—আর তাইতে বিপদ আরো বেশি । আবহাওয়া যদি বেগড়বাই করে তাহ'লে এই অবস্থায় স্কুনারটি একেবারে টুকরো-টুকরো হ'য়ে ভেঙে যাবে । না, তার চেয়ে পুরোনো গোয়ালেই ফিরে-যাওয়া ভালো ।'

কন্‌গ্রে ঠিক করলে রাত গাঢ় হ'য়ে নেমে পড়ার আগেই ইগোর উপসাগরে ফিরে যাবে । সেখানে নিরাপদ আশ্রয়ে সবাই মিলে কাজে লেগে-যাওয়া যাবে ।

কিন্তু এখন-যে জোয়ার ! স্রোতের উলটো মুখে জাহাজ চালানো এখন প্রায় অসম্ভব । কী করা যায় তবে ? এখানেই তাহ'লে অপেক্ষা করতে হবে ? কিন্তু ঢেউয়ের মধ্যে স্কুনারটি যেভাবে দোল খাচ্ছে তা তো সর্বনাশের লক্ষণ । যে-কোনো মুহূর্তে একটু

বেশি কাৎ হ'লেই ঐ ফুটোগুলো দিয়ে জাহাজে জল ঢুকে যেতে পারে। কাজেই শেষটায় পয়েন্ট দিয়েগোর কাছাকাছিই নোঙর ফেলতে বাধ্য হ'লো কন্‌গ্রে।

রাত আসছে। একটু পরেই জমাট হ'য়ে নেমে আসবে ঘন অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে তাদের স্কুনার যে-কোনো মুহূর্তে ডাঙায় আছড়ে পড়তে পারে।

অবশেষে, রাত প্রায় দশটার সময়, একটু সুবিধে পাওয়া গেলো। মাঝরাতের আগেই অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ইগোর উপসাগরের পুরোনো জায়গাতেই ফিরে এলো বোম্বেটেরা। এই দ্বীপে একদিন তারা আইনের চোখে ধুলো দিয়ে আস্তানা গেড়েছিলো, এখন যেন দ্বীপ আর তাদের ছাড়তে চাচ্ছে না।

১২

বিপদের সংকেত

বোম্বেটেদের মনের ভাব আন্দাজ করতে কোনো মুশকিল হবার কথা নয়। যখন তাদের এতদিনের স্বপ্ন সফল হ'তে চলেছে, ঠিক তখনই আচমকা অপ্রত্যাশিতভাবে এলো আক্রমণ —যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! এতে কার না রাগ হয়? এদিকে আবার শিরে-সংক্রান্তি, আর চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই সান্তা-ফে ইগোর উপসাগরে এসে পৌঁছুবে! এর চাইতে বড়ো-কোনো বিপদের কথা এই মুহূর্তে তারা ভাবতে পারছিলো না।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো কন্‌গ্রে। তেরিয়া মেজাজ খাপ্পা খাঁর মতো যাকেই সামনে পায় তাকেই বুঝি মেরে বসে!

স্কুনারের ক্ষতির বহরটা আরেকটু কম হ'লেই কন্‌গ্রে অন্য-কোনো জায়গায় গিয়ে জাহাজের নোঙর ফেলতে পারতো। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ আর ধরনটা গুরুতর, সেটাকে কিছুতেই অবহেলা করা গেলো না। আর এই দ্বীপে ছাড়া, জাহাজটাকে নিরাপদে রাখবার মতো তেমন-কোনো ভালো জায়গাই বা কোথায়, আশপাশে? কাজেই গুড়গুড় ক'রে পুরোনো আস্তাবলেই ফিরে আসা ছাড়াই বা উপায় কী তার?

সেরসান্তে তো বারুদের স্তূপের মতো জ্বলছে —পারলে নিজের হাতটাকেই চিবিয়ে খেতো। সে অবশ্য কন্‌গ্রেকে ব'লেও ছিলো, কারা দ্বীপ থেকে কামান ছুঁড়লো. তাদের একবার তন্নতন্ন করে খুঁজে-দেখা উচিত। কিন্তু কন্‌গ্রে তার প্রস্তাবটি আদৌ আমল দিলে না। বললে যে, তারা ক-জন আর তাদের কাছে কতরকম অস্ত্রশস্ত্র আছে তার কিছুই যখন জানা নেই তখন ও-রকম দুঃসাহস না-করাই ভালো। অনেক ভেবেচিন্তে সেরসান্তেও অগত্যা সে-কথায় রাজি হ'লো। বললে—'সেটা সত্যি কথা। আর, লোকগুলোকে যদি কুকুরের মতো গুলি ক'রেও মারি, তাতেও আমাদের বিশেষ-কোনো লাভ হবে না। এখন আমাদের সবচেয়ে জরুরি কাজ হ'লো যত-শিগগির-সম্ভব এই হতছাড়া দ্বীপটা ছেড়ে চ'লে যাওয়া।'

কন্‌গ্রে বললে —'যেমন ক'রেই হোক দুপুরবেলার মধ্যেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে ।'

এখানে অবশ্য জনান্তিকে এটা ব'লে নেয়া ভালো যে , বোম্বেটেরা দল বেঁধে বাস্‌কেথ আর ডেভিসের খোঁজে সান্ হুয়ান অন্তরীপে গেলেও তাদের কোনো হদিশ করতে পারতো না । আগের দিন বিকেলে, পরিকল্পনা অনুযায়ী, দুজনে উৎসুকভাবে একটা টিলার ওপর সময় কাটিয়েছিলো । একটা পাথরের ওপর কামান বসাতে তাদের তেমন-কিছু বেগ পেতে হয়নি । এটা ঠিক যে কামানটা ঠেলে নিয়ে যেতে তারা একেবারে গলদঘর্ম হ'য়ে গিয়েছিলো. কিন্তু কোনো বিশেষ বাধা পেরুতে হয়নি তাদের । সন্ধে ছ-টা নাগাদ কামানটাকে তারা অতিকষ্টে সেখানে এনে বসিয়েছিলো । কামানটার নলটাকে তারা উপসাগরের দিকেই তাগ ক'রে রেখেছিলো, তারপর বারুদ ভরেছিলো নলে । তৈরি হ'য়ে নিতে তারপর আর বেশি সময় লাগেনি, উৎসুক হ'য়ে অধীরভাবে তারা তাকিয়েছিলো সমুদ্রের দিকে । এবার শুধু আসল সুযোগটার অপেক্ষা—তারপরেই কেল্লা ফতে ।

ডেভিস বলেছিলো বাস্‌কেথকে—'আমি অনেক মাথা ঘামিয়ে ঠিক করেছি আমাদের কী করা উচিত । বোম্বেটেদের জাহাজ একেবার ডুবিয়ে দেয়া ঠিক হবে না । কারণ তাহ'লে পাজিগুলো সাঁৎরে তীরে এসে আমাদের ওপর চড়াও হবে—তখন আমরা অতগুলো বেপরোয়া লোকের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবো না । তার চেয়ে আমাদের এমন ভাবে গোলা ছুঁড়তে হবে যাতে সাগরপাড়ির মৎলব তাদের বাতিল ক'রে দিতে হয়, অথচ জাহাজটাও পুরোপুরি ধ্বংস হয় না — তাতে ওরা জাহাজটাকে মেরামত করতেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়বে ।'

—'বেশ, তা-ই না-হয় করা যাবে । কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ যদি নেহাৎই অল্প হয় ? তাহ'লে তো তারা সহজেই মেরামত ক'রে পাততাড়ি গোটাবে ।'

—'না , তা পারবে না । আমরা এমনভাবে গোলা ছুঁড়বো যাতে বাছাধনেরা মালপত্র না-নামিয়ে কিছুতেই মেরামত করতে না-পারে । তাতে কম ক'রেও দু-তিনদিন লেগে যাবে ।

—'কিন্তু ধরো যদি সান্তা-ফে হপ্তাখানেকের মধ্যেও না-আসে, তাহ'লে ?' বাস্‌কেথ খারাপ সম্ভাবনাটার কথা তুলেছিলো ।—'আমার মতে ক্ষতির পরিমাণ হবে গুরুতর, অথচ এমন-ক্ষতি যাতে জাহাজটা ডুবে না-যায় । অর্থাৎ আমাদের নিখুঁত তাগ ক'রে গুলি ছুঁড়তে হবে ।'

আলোচনা ক'রে সেটাই তারা শেষ অব্দি ঠিক করেছিলো । আর সবকিছু প্রস্তুত ক'রে নিয়ে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলো কখন দেখা দেয় বোম্বেটেদের জাহাজ । দুজনে যেন পুরোদস্তুর গোলন্দাজ, এমনি ভাবেই কামানের পাশে সটান দাঁড়িয়ে ছিলো তারা সজাগ, আর তৎপর ।

তাদের কামান ছোঁড়ার পরিণতি কী হয়েছে, তা আমরা আগেই দেখেছি । যতক্ষণ-না বোম্বেটেদের জাহাজ ফের স্টটেন আইল্যাণ্ডের দিকেই চলতে শুরু করলে, ততক্ষণ দুজনে অনিমেষ লোচনে সেদিকে তাকিয়ে ছিলো । তারপর সেটাকে দ্বীপের দিকে ফিরে আসতে দেখে দ্বীপের একবারে অন্য দিকটায় একটা আস্তানার খোঁজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলো । যদি ঐ বদমায়েশগুলো তাদের খোঁজে এদিকটায় আসবার মৎলব করে, তাহ'লে এবার আর তারা

রেহাই পাবে না। কাজেই তাদের এক্ষুনি কী করতে হবে, তা তারা ঠিক ক'রে ফেলেছিলো।

ঐ ছোট্ট গুহাটি ছেড়ে মাইল দু-এক দূরে উত্তর দিকে এক্ষুনি নতুন-একটা আস্তানা খুঁজে বার করা দরকার। তাতে যেমন দস্যুদের হাত থেকে রেহাই পাবার একটা ভরসা থাকবে, তেমনি ওদিক থেকে কোনো জাহাজ আসে কি না সেটাও নজর রাখা যাবে। খাবার-দাবার, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এককথায় যাবতীয় রসদ নিয়েই দুজনে মাঝরাতে নয়া আস্তানার খোঁজে রওনা হ'য়ে পড়েছিলো।

মাইল পাঁচ-ছয় দূরে, বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর, তীরের ধারে একটা ডেরা পাতবার মৎলব আঁটলে তারা। এই আশ্রয় থেকে অনায়াসেই সমুদ্রের ওপর নজর রাখা যাবে, সান্তা-ফে আসছে কি না তাও দেখা যাবে।

পয়লা মার্চের গোটা দিনটাই দুজনে আড়াল থেকে দস্যুদের ওপর নজর রাখলে। এছাড়া বোম্বেটেরা তাদের ওপর চড়াও হবার মৎলবে আছে কি না, সেটাও হুঁশিয়ার হ'য়ে দেখা দরকার।

কনগ্রেরা অবিশ্যি আপাতত তাদের ওপর হামলা চালাবার কোনো মৎলব না-এঁটে তড়িঘড়ি জাহাজের মেরামতি শেষ করবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলো। যত শিগগির মেরামত শেষ হয়, ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল। কনগ্রে সেজন্য ভার্গাসের ওপর জোর তাড়া লাগালে। ভার্গাস সব দেখেশুনে জানালে যে সবাই মিলে হাত লাগিয়ে খুব ক'রে খাটলে হয়তো সন্ধের মধ্যেই মেরামত সেরে ফেলতে পারবে। অবশ্য সব কাজ ভালো ক'রে শেষ করতে হ'লে একদিনে পারা যাবে না, পরের দিনটাও লেগে যেতে পারে।

...

পয়লা মার্চ, কাজে-কাজেই, নিঃশব্দেই কাটালে ডেভিস আর বাস্কেথ, কিন্তু সময় যে কত দীর্ঘ হ'তে পারে সেটাও যেন তারা এবার মর্মে-মর্মে টের পেয়ে গেলো। সন্ধের সময় যখন বুঝতে পারা গেলো যে সেদিন আর বোম্বেটেদের রওনা হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই তখন তারা তাদের নতুন আস্তানায় ফিরে গিয়ে অনেকদিন বাদে অনেকটা নিশ্চিন্তে ঘুম লাগাতে পারলে।

পরদিন ভোর হ'তে-না-হ'তেই তারা আবার বেলাভূমিতে এসে দাঁড়ালে—দিগন্তে কোনো জাহাজের চিহ্ন পাওয়া যায় কি না দেখবার জন্যে। কিন্তু না, কোনো জাহাজেরই চিহ্ন নেই কোথাও। সান্তা-ফের তো কোনো পাত্তাই নেই, কোনো ধোঁয়ার চিহ্নও নেই দিগন্তে।

বোম্বেটেরা আজ রওনা হবে কি না কে জানে! হয়তো সে-চেষ্টাই করবে যাতে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সান্তা-ফে আসছে না কেন? খুবই অস্থির লাগছিলো তাদের। এবার যদি বোম্বেটেরা ফের জাহাজ ছাড়ে, তাবে খুব হুঁশিয়ার হ'য়েই জাহাজ চালাবে। কাজেই আবার কামান ছোঁড়া যাবে কি না কে জানে।

অশান্ত এক উদ্বেগের মধ্যে তাদের সময় কাটতে লাগলো। যখন সকালবেলার জোয়ার এসে চ'লে গেলো, তখন তারা খানিকটা ভরসা পেলে। অর্থাৎ, এখন আর সন্ধ্যার জোয়ার না-এলে বোম্বেটেরা জাহাজ ছাড়তে পারবে না।

আবহাওয়া ভারি শান্ত হ'য়ে আছে। কিছুকাল আগে যে ভয়ংকর-একটা তুফান প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলো, এখন সমুদ্র দেখে তা কল্পনাও করা যায় না। চারদিকে মিঠে

রোদ্দুর, সমুদ্রের জলে ঝিলিক দিচ্ছে সোনালি আলো।

বাস্‌কেথ আর ডেভিস দোসরা মার্চও তারপর নিশ্চিন্তে কাটালো। দস্যুরা সারা দিনটাই জাহাজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে আছে।

বাস্‌কেথ বললে—'বদমায়েশগুলো আদানুন খেয়ে কাজে লেগে পড়েছে দেখছি—'

—'হুঁ। খুই চটপট কাজ শেষ করবার তালে আছে তারা। মেরামত শেষ হ'য়ে গেলে এবার আর তাদের আটকে রাখা যাবে না। কী আর করা যাবে? আমাদের যতটা সাধ্যে ছিলো, তা আমরা করেছি। বাকিটুকু এখন ঈশ্বরের হাতে।'

দাঁতে দাঁত চেপে বাস্‌কেথ বললে—'ঈশ্বর নিশ্চয়ই পাপীর সাজা দেবেন।'

সমুদের দিকে নজর রাখতে-রাখতে ডেভিস পায়চারি শুরু করলে। দেখে বোঝা গেলো কী যেন গভীরভাবে ভাবছে সে। দিগন্তে কোনোকিছুরই কোনো চিহ্ন নেই। ডেভিস কিন্তু তবু উত্তেজিতভাবে পায়চারি ক'রেই চলেছে।

হঠাৎ একবার থমকে থেমে পড়লো সে, বাস্‌কেথের দিকে এগিয়ে এলো। বললে—'আচ্ছা আমরা যদি কাছে গিয়ে দেখি ওরা কী করছে, তাহ'লে কী হ'তে পারে?'

—'কী সর্বনাশ! তুমি কি দস্যুদের কাছে যাবার কথা ভাবছো না কি?'

—'হ্যাঁ! এক তো তাহ'লে জানতে পারবো ওদের কাজ শেষ হয়েছে কিনা, আর দুই তখন বুঝতে পারবো সন্ধ্যার জোয়ারেই ওরা রওনা হবে কি না।'

—'কিন্তু সেটা জেনে আমাদের লাভ কী হবে?'

—'লাভ একটা হবেই।' ডেভিসের উত্তেজনা ফেটে পড়লো।—'না, আমি আর পারছি না। এ-রকম অধীরভাবে হাঁ ক'রে কতক্ষণ কাটানো যায়? একটা কিছু হেস্তনেস্ত না-হ'লে আমার মন আর শান্ত হবে না।' সত্যি, ডেভিস যেন খেপে উঠেছিলো।—'এখান থেকে বাতিঘর কত দূরে হবে?'

—'যদি ঐ পাহাড়টা ডিঙিয়ে যাও তাহ'লে মাইল তিনেক হবে।'

—'হুঁ। আমাকে যেতেই হবে, বাস্‌কেথ। চারটের সময় রওনা হ'লে ছটা নাগাদ সেখানে পৌঁছে-যাওয়া যাবে। তখন অবশ্য আলো থাকবে, তবে আমাকে যে কেউ দেখতে পাবে না, সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমি তাহ'লে কাছে থেকে ওদের ওপর নজর রাখতে পারবো।'

ডেভিসকে থামাবার কোনো চেষ্টাই করলে না বাস্‌কেথ। বুঝতে পেরেছিলো যে তাকে বাধা দিয়ে কোনো লাভই হবে না। তার নিজেরও কেমন অস্থির লাগছিলো।

ডেভিস ব'লেই চলেছে, 'তুমি এখানেই থেকো। তুমি সমুদ্রের ওপর নজর রাখবে। আমি বেশি রাত হবার আগেই ফিরে আসবো।'

তাকে তার প্রস্তাবটা শেষ করতে না-দিয়ে বাস্‌কেথ ব'লে উঠলো– 'আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।'

এ-অবস্থায় যে নিজেদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়া ভালো হবে না, সেটা বুঝতে পেরেই ঠিক হ'লো যে দুজনে একসঙ্গে বাতিঘরের কাছে যাবে।

চারটে বাজতে তখনো অনেক দেরি। বেলাভূমিতে ডেভিসকে অপেক্ষা করতে ব'লে বাস্‌কেথ নতুন আস্তানায় ফিরে গেলো। সেখানে গিয়ে সে একটা জামা ফালা-ফালা ক'রে

ছিঁড়ে গিঁট দিয়ে-দিয়ে একটা দড়ির মতো তৈরি করলো, কোমরের বেল্টে গুঁজলো ধারালো একটা ছুরি। তারপর দুটো রিভলভার আর কিছু খাবার নিয়ে ডেভিসের কাছে ফিরে এলো। একটা রিভলভার আর কিছু কার্তুজ সে ডেভিসের কাছে দিলে। তারপর দুজনে মিলে কিছু খেয়ে নিলে। খেতে-খেতে ডেভিস বাস্কেথের কাছে দড়িটার রহস্য কী জানতে চাইলে। বাস্কেথ ভাসা-ভাসা জবাব দিয়ে বললে যে সন্ধের সময় সে সব কথা ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলবে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে রিভলভার দুটো ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে নিয়ে দুজনে রওনা হ'য়ে পড়লো। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে কথা বলতে-বলতে চলেছে দুজনে। মাইল খানেক হাঁটার পর বাতিঘরের চূড়া নজরে এলো। তখন নতুন উৎসাহে হনহন ক'রে চললো দুজনে। একদমে প্রায় আধ ঘণ্টার বেশি ঐ ভাবে হেঁটে এলো। এখনও অন্তত আধমাইল পথ বাকি। এবার তারা হুঁশিয়ার হ'য়ে সন্তর্পণে চারপাশে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতে শুরু করলে। আলোকস্তম্ভের লণ্ঠনঘর থেকে কেউ যদি এদিক পানে তাকায়, তাহ'লে স্পষ্ট দেখতে পাবে তাদের।

লণ্ঠনঘরটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিলো। তখন অবশ্য সেখানে কেউ ছিলো না, তবে কেউ যদি উঠে চারপাশে নজর রাখার জন্যে একবার চোখ বোলায় তাহ'লেই সর্বনাশ।

ডেভিস আর বাস্কেথ পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে চলতে লাগলো। ফাঁকা জায়গায় এলে হামাগুড়ি দিয়ে সে-জায়গাটুকু পার হ'য়ে চললো তারা। তখন প্রায় ছটা বাজে, তারা পাহাড়টার কিনারে এসে পৌঁছুলো। সামনেই বাতিঘর। তীরের কাছে বোম্বেটেদের মধ্যে একটা কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ করলে তারা, একটা তাড়াহুড়োর ভাব, একটা শশব্যস্ত ছুটোছুটি। মেরামতের কাজ প্রায় শেষই হ'য়ে এসেছে তখন, তাই মালপত্র তোলবার উদ্যোগ চলেছে দস্যুদের মধ্যে।

রাগে ডেভিসের সর্বাঙ্গ জ্ব'লে যাচ্ছিলো। দাঁতে দাঁত ঘ'ষে সে বললে—'শয়তানগুলো দেখছি যাত্রার জন্যে তৈরি।' তার দু-চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে।—'এরা এক্ষুনি রওনা হ'য়ে যাবে, অথচ আমাদের আর-কিছুই করবার ক্ষমতা নেই।' কেমন-একটা অসহায় আক্রোশ ফুটে উঠছিলো তার কথায়।

ভার্গাস তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিলো। শুধু-যে ভালোভাবেই সব সারিয়ে দিয়েছে তা-ই নয়, এত তাড়াতাড়ি সে কাজ সেরেছে যে তার ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হ'তে হয়। জাহাজের গায়ে জখমের কোনো চিহ্নই নেই আর। মালপত্র তোলা হ'য়ে গেলেই সেরসান্তে ফের সাগর পাড়ি দিতে পারবে।

সময় কখনও বিশেষ-কারুর জন্যে আটকে থাকে না। সময় কেটেই যাচ্ছিলো। সূর্য ডুবে গেলো দিগন্তে, সমুদ্রের জলে। আস্তে-আস্তে অন্ধকার নামতে লাগলো। অথচ—এখন আশ্চর্যই লাগলো দেখে—বোম্বেটেরা যে এক্ষুনি রওনা হবে, তেমন-কোনো লক্ষণ কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। টিলার ওপরে, পাথরের আড়ালে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে, বাস্কেথ আর ডেভিস কিছুই স্পষ্ট ক'রে দেখতে পারছিলো না, তবে শুনতে পাচ্ছিলো সবকিছুই। শুনতে পাচ্ছিলো বোম্বেটেদের হৈ-হট্টগোল, চ্যাঁচামেচি, হাসির হুল্লোড় আর ভারি-ভারি জিনিশপত্র টেনে নেবার শব্দ। রাত দশটার পর সে-সবও আর শোনা গেলো না —সব চুপচাপ হ'য়ে গিয়েছে।

তাহ'লে মালপত্র সব তোলা হ'য়ে গেছে ? যাত্রার সময় তাহ'লে এগিয়ে এসেছে ?

অথচ — কী আশ্চর্য — নোঙর তো তখনো তোলা হ'লো না । পালও খাটানো হয়নি । তখনও তেমনই স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে সের্‌সান্তে-জাহাজ । কী ব্যাপার ?

ক্রমে আরো-একটি ঘণ্টা কেটে গেলো । হঠাৎ ডেভিস সজোরে বাস্‌কেথের হাতে চাপ দিয়ে বললে — 'জোয়ার শুরু হ'লো — ঐ শোনো জলের শব্দ !'

— 'এরা কি এখন তবে রওনা হবে না ?'

— 'আজ না-হোক কাল তো যাবেই ।'

— 'কালও রওনা হ'তে পারবে না, কোনোদিনই না—' এই ব'লেই বাস্‌কেথ হঠাৎ পাথরের আড়াল থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালে ।

ডেভিস কী-রকম হতভম্ব হ'য়ে নীরবে তার অনুসরণ করলে । দুজনেই এখন বাতিঘরের দিকে চলেছে । কয়েক মিনিট পরেই দুজনে আলোকস্তম্ভের কাছে এসে দাঁড়ালে । বাস্‌কেথ হাৎড়ে-হাৎড়ে কী যেন খুঁজলো মাটিতে তারপর একটা জায়গা থেকে একটা পাথর তুলে ফেললো — অমনি মাটির মধ্যে একটা গহ্বর দেখা গেলো । অতিকষ্টে দুজন মানুষ সেই গহ্বরের মধ্যে ঢুকতে পারে । বাস্‌কেথ ফিশফিশ ক'রে ডেভিশকে ভেতরে ঢুকতে বললে । আরো বললে — 'বাতিঘরে থাকবার সময় দৈবাৎ আমি এই গহ্বরটা আবিষ্কার করেছিলুম । তখনই আমার মনে হয়েছিলো এ-জায়গাটা একদিন হয়তো কাজে আসবে আমার ।'

নীরবে তার নির্দেশ-মতো ডেভিস গহ্বরটার ভেতরে ঢুকে পড়লো । তারপর বাস্‌কেথও এসে ঢুকলো তার পেছনে । গায়ে-গা ঠেকিয়ে কোনোমতে দুজন লোক সেখানে গুটিশুটি হ'য়ে থাকতে পারে । ফিশফিশ ক'রে বাস্‌কেথ বললে— 'তুমি এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করো । আমি চটপট কাজ হাসিল ক'রে ফিরে আসছি ।

— 'অপেক্ষা করবো ? কাজ হাসিল করবে ?' জন ডেভিস ভারি অবাক হ'য়ে গিয়েছে তখন ।

— 'হ্যাঁ আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকবে । আমি দস্যুদের জাহাজে যাচ্ছি ।'

— 'বোম্বেটে জাহাজে যাবে ?' ডেভিস হতভম্ব ।

— 'হ্যাঁ ।' দৃঢ় স্বরে বাস্‌কেথ বললে— 'বদমায়েশগুলো দ্বীপ ছেড়ে যাতে চ'লে যেতে না-পারে, আমাকে এখন তারই ব্যবস্থা করতে হবে ।'

ব'লেই বাস্‌কেথ পকেট থেকে দুটো পুঁটুলি বার করলে । তারপর কোমরের বেল্ট থেকে খুলে নিলে ছুরিটা । পুঁটুলি দুটো দেখিয়ে ডেভিসকে বললে, 'বারুদ দিয়ে ডাইনামাইটের মতো বিস্ফোরক তৈরি করেছি আমি । ডাইনামাইটের মতো জোরালো অবশ্য হবে না, তবে নেহাৎ সাধারণ বিস্ফোরকও এ নয় । আর শার্ট ছিঁড়ে দড়ির মতন যা বানিয়েছি তা হ'লো সলতে । মাথায় পুঁটুলি দুটো বেঁধে, সাঁতার কেটে ঐ জাহাজে গিয়ে উঠবো । মাস্তুলের কাছে এই বিস্ফোরকটা রেখে সলতেটা জ্বেলেই চ'লে আসবো । যে-ক'রেই হোক আমাকে এ কাজ করতেই হবে ।'

— 'চমৎকার, কৌশলটা চমৎকার করেছো ।' ডেভিসের হতাশ গলায় এবার উল্লাসের সুর । — ' কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এই বিস্ফোরক তুমি তৈরি করলে কখন ।'

— 'দুপুরবেলা তোমায় যখন তীরে পাহারায় বসিয়ে আমি আমাদের আস্তানায়

গিয়েছিলুম, তখনই এগুলো তৈরি ক'রে নিয়েছি —'

—'কিন্তু, কোম্পানিয়েরো, এমন বিপজ্জনক কাজে তোমাকে তো একা ছেড়ে দিতে পারবো না। আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।'

—'খামকা কী দরকার ? এ আমি একাই পারবো। যে-কাজ করতে চলেছি, তাতে একজনই যথেষ্ট।'

ডেভিস বাসকেথের কথার দৃঢ় সুর শুনেই বুঝতে পারলে এ নিয়ে আর কথা ব'লে লাভ নেই : বাসকেথ কিছুতেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না — এটা যেন বাসকেথের নিজের লড়াই। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বাসকেথের প্রস্তাবে রাজি হ'লো।

অন্ধকার এতক্ষণে ঘন হ'য়ে এসেছে। বাসকেথ গা থেকে জামা খুলে জরুরি মাল-মশলা নিয়ে গহ্বরটি থেকে বেরিয়ে প'ড়ে হনহন ক'রে সমুদ্রের দিকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। তারপর সাবধানে জলে ভেসে সে নিঃশব্দে সাঁতার কেটে জাহাজের দিকে এগুতে লাগলো। জোয়ারের জন্যে ঢেউয়ের শব্দ হচ্ছিলো ব'লে তার সাঁতার কাটার সামান্য যা শব্দ হচ্ছিলো তাও চাপা প'ড়ে গেলো।

অন্ধকারের মধ্যে একটা নিরেট-কালো ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে জাহাজটা। প্রথমে কাউকে সে জাহাজের ডেকে দেখতে পেলো না। কেউ নেই ভেবে বাসকেথ যখন জাহাজে ওঠবার চেষ্টা করতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ তার নজর এলো কে যেন জাহাজের রেলিঙের ধারে ব'সে পাহারা দিচ্ছে। তক্ষুনি সে থমকে গেলো। কী করবে ভাবছে, এমন সময় একটা বেসুরো কর্কশ গলার গানের আওয়াজ শুনে সে চমকে উঠলো। পাহারাওলা পরমানন্দে গান ধ'রে দিয়েছে।

বাসকেথ জাহাজের নোঙর ধ'রে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করলে। প্রথমটায় ঝাঁকুনি খেয়ে শেকলটা ন'ড়ে-ওঠার একটা আওয়াজ হ'লো। বাসকেথ তাড়াতাড়ি জাহাজের গায়ে গা লাগিয়ে অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে দিলে। সে-শব্দে পাহারাদারটির কিন্তু রসভঙ্গ হয়নি—সে একটানা চেঁচিয়েই চলেছে।

এবার নিঃশব্দে, আস্তে-আস্তে, নোঙরটা ধ'রে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলো বাসকেথ। অনেক হয়রানির পর সে শেষটায় রেলিঙের ধারে গিয়ে পৌঁছুলো। পাহারাদারটি গান গেয়েই চলেছে।

বিস্ফোরকের বাণ্ডিল দুটো সন্তর্পণে মাস্তুলের কাছে ডেকের ওপর রাখলে বাসকেথ। তারপর তাতে সলতে লাগিয়ে দেশলাইটা বার করলে পুঁটুলি থেকে। না, জলে ভেজেনি দেশলাইটা।

সবকিছু ঠিক ক'রে অতি সন্তর্পণে, নিঃশব্দে, আস্তে দেশলাই জ্বেলে সে সলতেটায় ধরিয়ে দিলে। তরাপর আর এক মুহূর্তও দেরি না-ক'রে সে নোঙরের শেকল বেয়ে নামতে লাগলো। এত সহজে কাজটা করা যাবে ব'লে সে ভাবতে পারেনি।

ঝপাং ক'রে আচমকা একটা আওয়াজ হ'লো। শেকল থেকে হাত ফসকে জলে প'ড়ে গিয়েছে বাসকেথ!

তক্ষুনি পাহারাদারটির সংগীত থেমে গেলো। বাসকেথ জল থেকে লক্ষ করলে লোকটা রেলিং ধ'রে ঝুকে প'ড়ে দেখবার চেষ্টা করছে কীসের শব্দ হ'লো। বাসকেথ নিঃশব্দে

ডুবসাঁতার দিয়ে ফিরে চললো তীরের দিকে ।

মিনিট খানেক জলের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে না-পেয়ে পাহারাদারটি ফের তার জায়গায় গিয়ে বসলো ।

...

এদিকে গহ্বরটার মধ্যে ব'সে-ব'সে ডেভিস ভাবছিলো যেন অনন্তকাল ধ'রে সে একা-একা ব'সে আছে তো ব'সেই আছে । আধ ঘণ্টা—পৌনে-এক ঘণ্টা—একটি ঘণ্টাই কাবার হ'য়ে গেলো । আর সে থাকতে পারলে না । গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে উদ্বিগ্ন চোখে সমুদ্রের দিকে তাকালে । ঈশ্বর না-করুন, বাস্‌কেথের ভালোমন্দ কিছু-একটা হ'লো নাকি ! কী হ'লো তবে ? তবে কি সে জাহাজে উঠতে পারেনি ? চেষ্টাটা কি তাহ'লে জলে মারা গেছে ? কিছুই সে বুঝতে পারছিলো না ।

হঠাৎ একটা সাংঘাতিক বিস্ফোরণের শব্দে স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে গেলো । সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে এলো হৈ-চৈ, চ্যাঁচামেচি, শোরগোল, আর্তনাদ ।

আর ঠিক তক্ষুনি জল থেকে উঠে এলো একটি লোক । ছুটে ডেভিসের কাছে এসে তার হাত ধ'রে ঢুকে পড়লো গহ্বরটার মধ্যে । গহ্বরের ভেতরে ঢোকবার আগে সেই পাথরটাকে সে এমনভাবে রাখলে যাতে বাইরে থেকে সহজে এই গহ্বরের কোনো হদিশ পাওয়া না-যায় ।

একটু পরেই তারা শুনতে পেলে কার যেন ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর । ' জলদি, শিগ্‌গির চলো । এবার হতভাগাটাকে নাগালে পেয়েছি ।'

—'ঠিক তোমাকে যেমন দেখতে পাচ্ছি, তেমনি ঐ লোকটাকেও আমি দেখতে পেয়েছিলুম ।' হাওয়ায় অন্য একটা স্বর ভেসে এলো— 'লোকটা একা ছিলো—একেবারেই একা ।'

—'এতক্ষণে নিশ্চয়ই একশো গজও যেতে পারেনি—'

—'একবারে যেন শয়তানের বাচ্ছা ! যে-ক'রেই হোক, ওর মুণ্ডুটা আমার চাইই—' ক্রমশ শোরগোল দূরে মিলিয়ে গেলো ।

ফিশফিশ ক'রে ডেভিস বললে —'কাজ হাসিল হয়েছে ব'লে মনে হ'লো ?'

—'মনে তো হচ্ছে । তবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কতটুকু ক্ষতি হয়েছে ।'

বিস্ফোরণের আওয়াজটা এমনই সাংঘাতিক হয়েছিলো যে ক্ষতির বহরটা গুরুতর ব'লেই মনে হচ্ছিলো তাদের । কিন্তু এখানে ব'সে ঠিক কতটা ক্ষতি হয়েছে সেটা আন্দাজ করা যাচ্ছিলো না ।

—'ঈশ্বর করুন, ঐ বদমায়েশগুলোকে যেন আরো-একমাস দ্বীপে থাকতে হয় ।'

—'শ্‌শ্‌শ ! চুপ !' বাস্‌কেথ সজোরে ডেভিসের হাতে চাপ দিলে ।

কয়েকজন লোকের পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে । এদিক পানেই আসছে । সারাটা রাত আর সকাল জুড়েই বাস্‌কেথদের খোঁজে প্রায় পাগলা কুকুরের মতো হন্যে হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো বোম্বেটেরা । তারপর কিন্তু খোঁজাখুঁজিতে ঢিলে পড়লো । কাঁহাতক আর আন্দাজে-আন্দাজে ঘুরে মরা যায় ? বাস্‌কেথ আর ডেভিস ঐ গহ্বরের মধ্যে থেকেই লোকগুলোর পায়ের আওয়াজ আর কথাবার্তা শুনে ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে নিচ্ছিলো ।

হঠাৎ একসময়, অনেকক্ষণ যখন চারপাশে কোনো আওয়াজ শোনা গেলো না, তখন তারা ধ'রে নিলে যে লোকগুলো এতক্ষণে নিশ্চয়ই তাদের খুঁজে-পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছে। এ-রকম মনে হ'তেই তারা গহ্বরটা থেকে বেরুবার চেষ্টা করবে ব'লে যেই মুখের কাছের পাথরটা সরাতে গেছে, অমনি আবার কার গলা শোনা গেলো। 'না। সত্যিই লোকটাকে কোত্থাও খুঁজে পাওয়া গেলো না! তাজ্জব ব্যাপার! লোকটা যেন একেবারে হাওয়ায় মিশে গেছে।'

—'বাদ দাও।' অন্য কার গলা। —'আর-সবাই জাহাজে গিয়ে উঠেছে। চলো, এবার আমরাও গিয়ে উঠি।'

—'হ্যাঁ। আমাদেরও জাহাজে গিয়ে ওঠা উচিত। শয়তানটার তাগ ফসকেছে ব'লেই বাঁচোয়া। আরেকটু হ'লেই জাহাজটা একদম গুঁড়িয়ে যেতো।'

তাহ'লে জাহাজের গুরুতর-কোনো ক্ষতি হয়নি! বোম্বেটেরা তাহ'লে দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যাবে!

বাস্‌কেথ আর ডেভিস উৎকর্ণ হ'য়ে তাদের কথা শুনতে লাগলো।

—'সত্যিই, কপাল জোরে বেঁচে গিয়েছে জাহাজটা। বরাত ভালো ছিলো ব'লেই শয়তানটার মতলব ভেস্তে গিয়েছে। সে কিনা জাহাজের মাস্তুলটাই উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলো।'

—'সত্যি, বড়োজোর বেঁচে-যাওয়া গেছে এ-যাত্রায়!'

—'হ্যাঁ। বিস্ফোরকটা হাউইয়ের মতো জাহাজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে ব'লেই এবারকার মতো রক্ষা পাওয়া গেছে। শুধু ডেকের কিছুটা অংশ উড়ে গিয়েছে। তাতে এমন-কিছু সাংঘাতিক ক্ষতি হয়নি।'

—'আজ আর-কোনো গোল হবে ব'লে মনে হয় না।'

হঠাৎ আরেকজনের রূঢ় কর্কশ গলা ভেসে এলো, 'কী? তোমাদের বিশ্রাম করা হ'লো! খামকা ওখানে ব'সে বক্তৃতা করলে চলবে? শিগগির চ'লে এসো।'

গহ্বরের মধ্যে ব'সে মুখ চাওয়াচাউয়ি করছিলো বাস্‌কেথ আর ডেভিস। কী ব'লে গেলো দস্যুরা?

বাস্‌কেথের চোখ দুটো জলে ভ'রে গেলো। ভাঙা গলায় বললে —'সব আশাই যে নষ্ট হ'য়ে গেলো, কোম্পানিয়েরো।'

ডেভিস নিজেও বিষম মুষড়ে পড়েছিলো। সে আর সান্ত্বনা দেবে কী? কী হবে সান্ত্বনা দিয়ে? আর কী সান্ত্বনাই বা সে দিতে পারে?

কী লাভ হ'লো এই মরিয়া চেষ্টায়, এই বিষম দুঃসাহসে? প্রাণ তুচ্ছ ক'রে বাস্‌কেথ যে জন্যে গিয়েছিলো, তাতে কতটুকু ক্ষতি হ'লো জলদস্যুদের? মাত্র কয়েক ঘণ্টাই দেরিই হ'লো শুধু! কালই ওরা রওনা হ'য়ে পড়বে!

গহ্বরটা থেকে আর বেরুবার সুযোগ পেলে না তারা। একটু পরেই আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে উঠলো। ভোর হ'লো ব'লে।

বাস্‌কেথ জানতো রাতের আঁধারে বোম্বেটেরা তাদের দেখতে না-পেলেও দিনের

আলোয় নির্ঘাৎ তাদের দেখে ফেলবে। সে তখন ডেভিসের সাহায্যে পাথরটাকে আরো ভালো ক'রে গহ্বরের মুখে টেনে দিলে। ভেতর থেকে পাথরটাকে গহ্বরের মুখে এনে চাপা দিতে বেশ হয়রানই হ'তে হয়েছিলো তাদের। অবশেষে অনেকবারের চেষ্টায় পাথরটাকে জায়গামতো এনে বসানো গেলো। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে হাওয়া যাতে ঢোকে, সেজন্যে সামান্য একটু ঘুলঘুলির মতো ফাঁক রেখে পাথরটা দিয়ে তারা গহ্বরের মুখে চাপা দিয়ে ফেললো।

ক্রমে বেলা বেড়ে গেলো। তারা আন্দাজ করলে যে বোম্বেটেরা নিশ্চয়ই এবার রওনা হবার জন্যে তোড়জোড় শুরু করেছে। সন্ধের পর জোয়ার এলেই জাহাজ ছেড়ে দেবে।

বেলা গড়িয়ে এলো।

এত ধকলে, আর রাতে একফোঁটাও না-ঘুমুবার ফলে, তাদের একটু ঢুলুনি মতো এসেছিলো, হঠাৎ একটা ঘড়ঘড় আওয়াজে তাদের চটকা ভেঙে গেলো। তাহ'লে নোঙর তোলা হচ্ছে এখন! একটু বাদেই জলদস্যুরা দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যাবে। বাস্‌কেথ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না। পাথরটাকে সরিয়ে একটু উঁকি দিলে বাইরে।

অস্তসূর্য যখন পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে ঢ'লে পড়েছে; একটু বাদেই সন্ধ্যা হ'য়ে যাবে, অন্ধকার নামবে।

না, এখনও জাহাজের নোঙর তোলা হয়নি। তবে তোলবার জন্যে উদ্‌যোগ-আয়োজন চলছে বটে। বিস্ফোরণের দরুন কোনো জায়গা ভেঙে গেছে কি না, অ্যাদ্দুর থেকে বোঝা গেলো না। না, লোকগুলো ঠিকই বলেছে: বিস্ফোরণে তেমন-কোনো ক্ষতি হয়নি জাহাজের। সব ঠিকঠাক, দুরস্ত দেখাচ্ছে। এখন আর বিপদের আশঙ্কা ক'রে কী লাভ? কপালে যা আছে, তা-ই ঘটবে। গহ্বরটা থেকে বেরিয়ে এলো বাস্‌কেথ। পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সে লুকিয়ে দাঁড়ালে। তার পেছন থেকে তার কাঁধের ওপর দিয়ে ডেভিসও তাকালে জাহাজের দিকে। তার মনে সাংঘাতিক তোলপাড় চলেছে উত্তেজনায়।

বোম্বেটেদের প্রায় সকলেই গিয়ে জাহাজে উঠেছে, শুধু জনাকয়েক এখনও তীরে দাঁড়িয়ে আছে। তীরে যারা ছিলো, তাদের মধ্যে কন্‌গ্রে আর সের্‌সান্তেকে চিনতে পারলে বাস্‌কেথ। কন্‌গ্রে আর সের্‌সান্তে তখন বাতিঘরের দিকে যাচ্ছে।

বাস্‌কেথ নিচু স্বরে ডেভিসকে সাবধান ক'রে দিলে—'হুঁশিয়ার! ওরা বাতিঘরের দিকে আসছে কিন্তু।'

দুজনে তক্ষুনি গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

সের্‌সান্তে শেষবারের মতো চারদিক দেখে নেবার জন্যে বাতিঘরে আসছিলো, এক্ষুনি তারা রওনা হবে, জাহাজ তৈরি। যাত্রার আগে আরেকবার দিগন্তের উপর নজর বোলাতে চায় নিশ্চয়ই—হয়তো দেখতে চাচ্ছে কোনো জাহাজ চোখে পড়ে কি না।

রাতটা ভালোই যাবে ব'লে মনে হচ্ছিলো তার। হাওয়ায় তেমন উদ্দাম গতি নেই, সমুদ্রও শান্ত।

সের্‌সান্তে যখন আলোকস্তম্ভের ভেতর ঢুকলো, ডেভিস আর বাস্‌কেথ তখন তাকে ভালো ক'রেই দেখতে পেলে। লণ্ঠনঘরের প্রত্যেকটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলো সের্‌সান্তে। চোখে দুরবিন এঁটে সবকিছু দেখছিলো ভালো ক'রে।

সমুদ্র দিগন্তে গিয়ে আকাশের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। নজরে পড়ে শুধু কালো একটি

রেখা যেখানে আকাশ নেমে এসে মিলেছে সমুদ্রের সঙ্গে। পৃথিবীকে তখন দিনশেষের অভিনন্দন জানাচ্ছে যেন সূর্য। শাদা হালকা মেঘগুলো রঙিন হ'য়ে উঠেছে, লাল। সমুদ্রের নীল জলে যেন আবিরের গুঁড়ো ঝ'ড়ে পড়ছে। দিনের আলো ক্রমেই নিভে যাচ্ছে। কিন্তু নিভতে গিয়েও যেন পুরোপুরি নিভে যেতে চাচ্ছে না। তাই অস্তসূর্যের লালসোনালি আলোয় সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শান্ত-নীল সমুদ্রকে অপরূপ লাগছিলো দেখতে। কিন্তু সে-দৃশ্য দেখবার অবসর নেই সেরসান্তের।

আচমকা সে তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো। কনগ্রে আর অন্যান্যরা নিচে থেকে তার দিকে তাকালে অবাক হ'য়ে। কী ব্যাপার!'

সর্বজনবোধ্য ভাষায় সুস্পষ্ট স্বরে সেরসান্তে যা ঘোষণা করলে, সকলেই তা ভালো ক'রে শুনতে পেলে।

সেরসান্তে বললে :—'সান্তা—ফে! সান্তা-ফে এসে পড়লো ব'লে!'

সান্তা-ফে! বোম্বেটেদের মাথায় বিনামেঘেই যেন বাজ ভেঙে পড়লো।

১৩

সান্তা-ফে

মানুষের গলা যে বাজের মতো শোনাতে পারে, সেরসান্তের এই কথাই তার নজির। ছোট্ট একটা কথার মধ্যে যে কতখানি ভয়ংকরতা লুকিয়ে থাকতে পারে তা যেন এবার হাড়ে-হাড়ে টের পেলে বোম্বেটেরা। তাদের কানে তখনও যেন গুমগুম ক'রে ফেটে পড়ছে বাজ—'সান্তা-ফে!'

সান্তা-ফে এসে পড়লো ব'লে! ক্রমশ যেন বাড়তে লাগলো সেই আওয়াজ! কী প্রচণ্ড যে শব্দ সেটা! কনগ্রের ঠিক ধুকধুকিটাতেই যেন সেই বাজ ফেটে পড়েছে! দীর্ঘ বিলম্বিত গর্জন ক'রে ফেটেছে যেন বাজ! যেন সারা আকাশ ভেঙে পড়েছে তার মাথার ওপর।

মুহূর্তে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো কনগ্রের মুখ। স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো জলদস্যুরা। মনে হ'লো পায়ের তলায় কোন-এক ভূমিকম্পে সারা পৃথিবী যেন দুলে উঠেছে!

সান্তা-ফে! সান্তা-ফে এসে পড়লো ব'লে!

কিন্তু সেরসান্তের ভুল হয়নি তো? সত্যিই কি সান্তা-ফে এসে পড়ছে? যে-জাহাজটি আসছে, সেটা কি সত্যি আরহেনতিন প্রজাতন্ত্রের মানোয়ারি জাহাজ সান্তা-ফে? সেটা কি এদিকেই আসছে?

সংবিৎ ফিরে পেতেই কনগ্রে প্রায় ছুটে লণ্ঠনঘরে উঠে এলো।—'কই? কোথায় জাহাজ?'

—'ঐ-যে, উত্তর-পুবে।'

—'কত দূরে ব'লে মনে হচ্ছে ?'

—'মাইল দশেক—কিছু কম-বেশি হ'তে পারে ।'

—'তাহ'লে অন্ধকার হবার আগে এখানে পৌঁছুতে পারছে না ?'

—'না । এখানে আসতে-আসতেই রাত নেমে পড়বে ।'

কনগ্রে সেরসান্তের হাত থেকে দুরবিনটা যেন প্রায় ছিনিয়েই নিলে ।

চোঙ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে তরতর ক'রে একটা জাহাজ দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসছে । ভাঙা গলায় স্বীকার করলে কনগ্রে—'হ্যাঁ, সান্তা-ফেই বটে ! কোনো সন্দেহই নেই ।'

—'কী-রকম অভিশপ্ত ভাগ্য, দেখেছো !' সেরসান্তের গলায় প্রচণ্ড একটা ক্ষোভ—'ঐ জ্যান্ত শয়তানগুলো যদি দু-দুবার ব্যাঘাত না-ঘটাতো, তবে এতক্ষণে আমরা প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পৌঁছে যেতুম ।'

—'এখন আর সে-কথা ব'লে কোনো লাভ নেই । এখন বরং ভাবো, আমরা কী করবো ।'

—'কী ?'

—'এক্ষুনি রওনা হ'য়ে পড়তে হবে আমাদের ।'

—'এক্ষুনি ?'

—হ্যাঁ, এক্ষুনি !'

—'কিন্তু আমরা বেশিদূর যাবার আগেই সান্তা-ফের মুখোমুখি প'ড়ে যাবো । সে তো এসে পৌঁছে যাবে ।'

—'না, পৌঁছুবে না ।'

—'তার মানে ।'

—'এর মধ্যে কোনো ধাঁধা নেই । বাতিঘরের আলো জ্বলবে না, কেন জ্বলছে না তা তারা জানে না । অন্ধকারে এখানে জাহাজ ভেড়াতে সাহস করবে না কাপ্তেন ।'

কাপ্তেন লাফায়েৎ অন্ধকার দেখে ব্যাপার না-বুঝে এখানে জাহাজ ভেড়াবেন না—এটা বাস্কেথ আর ডেভিসও বুঝতে পেরেছিলো । এখন সূর্য ডুবে গিয়েছে । নিয়মমাফিক এক্ষুনি বাতিঘরে আলো জ্ব'লে ওঠবার কথা । আলো না-দেখে দ্বীপে জাহাজ ভেড়াতে নিশ্চয়ই ইতস্তত করবেন কাপ্তেন লাফায়েৎ । কেন আলো জ্বললো না—বুঝতে না-পেরে খোলা সমুদ্রেই তিনি রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নেবেন । যদিও অনেকবারই এই দ্বীপে এসেছেন, তবে সে তো দিনের বেলায়, ঝলমলে আলোয় । অন্ধকারে কী ক'রে আসবেন ? তাছাড়া, তিনি এও ভাবতে পারেন যে, এই দ্বীপে নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে, তাই বাতিঘরের রক্ষীরা আলো জ্বালতে পারেনি । সেই বিপদের ধরন আর ভেতরের সবকিছু ভালো ক'রে না-জেনে অন্ধকারে দ্বীপে এসে জাহাজ ভেড়ানো তিনি সমীচীন মনে করবেন না নিশ্চয়ই ।

—'কিন্তু সেনচুরির বরাতে যা ঘটেছে সান্তা-ফের বরাতেও তো তা ঘটতে পারে । আমাদের এক্ষুনি অন্তরীপের মুখে গিয়ে ওদের সাবধান ক'রে দেয়া উচিত ।'

ডেভিস শুধু তার কাঁধ ঝাঁকালে । এটা সেও জানে, বেলাভূমির পাথরে আচমকা ঘা খেয়ে সান্তা-ফে গুঁড়ো হ'য়ে যেতে পারে ।

বাস্‌কেথ ব'লে চললো—'চলো, বেলাভূমিতে ছুটে যাই। আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অন্তরীপের মুখে গিয়ে পৌঁছুতে পারবো। তখনও আলো জ্বেলে সংকেত করা যাবে ব'লে মনে হয়।'

ডেভিস উত্তর দিলে—'না, তাতে দেরি হ'য়ে যাবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সান্তা-ফে উপসাগরের মুখটায় পৌঁছে যাবে।'

—'তাহ'লে? আমরা তাহ'লে কী করবো?'

—'এখন আর অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই।'

সন্ধের অন্ধকার ঘন হ'য়ে আসছে। বোম্বেটেরা জাহাজ ছাড়বার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। সকাল অব্দি আর ব'সে থাকবে না তারা। যেমন ক'রেই হোক, এক্ষুনি পালাতে হবে।

তখন তাদের অনুকূলেই উত্তরদিক থেকে হাওয়া বইছে। এই অনুকূল হাওয়ায় জাহাজ ভাসিয়ে দিয়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সমুদ্রে পড়তে হবে—তারপর সামনে থাকবে কেবল জল, বারদরিয়া—সান্তা-ফে পেছন-পেছন ধাওয়া করলেও আত্মরক্ষার একটা সুযোগ থাকবে। কন্‌গ্রে সব্বাইকে তাড়া লাগালে।

জলদস্যুদের মৎলব বুঝতে ডেভিস বাস্‌কেথ—কারুই কোনো অসুবিধে হয়নি। বোম্বেটেরা এক্ষুনি রওনা হবে, তা বোঝাই যাচ্ছে—এমন অবস্থায় পড়লে তারাও তা-ই করতো। কিন্তু কী ক'রে তারা জলদস্যুদের সব প্ল্যান ভেস্তে দেবে? কী করতে পারে তারা? নিজেদের অসহায় দশায় তারা নিদারুণ হতাশায় ভ'রে গেলো।

একটু পরেই কন্‌গ্রে তার দলবল নিয়ে জাহাজে উঠে পড়লো। সবাই উঠে গেলে নোঙর তুলতে হুকুম দিলে কন্‌গ্রে। তখন সন্ধে সাড়ে-সাতটা, ডেভিস আর বাস্‌কেথ পাথরের আড়ালে ব'সে-ব'সেই শুনতে পেলে নোঙর তোলবার আওয়াজ।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নোঙর তোলা হ'য়ে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে দুলে উঠলো জাহাজ। সবগুলো পাল তুলে দেয়া হয়েছে—হাওয়ার ধাক্কায় পালাগুলো ফুলে-ফেঁপে উঠছে। খুব আস্তেই উপসাগরের মধ্যে গিয়ে পৌঁছুলো জাহাজ। হাওয়ার বেগ ক'মে আসছে—হাওয়া চাই পালে—চাই হাওয়ার ঝাপটা। একটু পরেই জাহাজ চালানো বেশ মুশকিল হ'য়ে পড়লো। নিস্তরঙ্গ নীল জলে কোনো স্রোত নেই। হাওয়াও থেমে গিয়েছে যেন। অসম্ভব, এ-অবস্থায় কোনো স্কুনারই চালানো যায় না। মাঝরাত্তিরের আগে কিছুতেই সান্‌ হুয়ান অন্তরীপ পেরুনো যাবে না। ঘণ্টা কয়েক বাদে যখন জোয়ার আসবে, তখন জাহাজ চলবে; এখন শুধু জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া তাদের আর-কিছুই করার নেই। জোয়ার এলে তাকে যদি ঠিকমতো কাজে লাগানো যায়, তাহ'লে অবশ্য কোনো ভাবনা নেই। সকাল হওয়ার আগেই তাহ'লে সান্‌ হুয়ান অন্তরীপ পেরিয়ে বারদরিয়ায় গিয়ে পড়া যাবে।

জাহাজ তখন ইগোর উপসাগরের দক্ষিণ উপকূলের দিকে চলেছে। এদিককার উপকূলের খবর কন্‌গ্রে ভালো জানে না। তবে এ-কথা জানে যে এদিককার উপকূল 'জাহাজমারি উপকূল' নামেই কুখ্যাত।

এদিকে রাত যত বাড়ছে, হাওয়ার বেগেও ততই কমছে। এ-অবস্থায় অন্যদিকে জাহাজ চালানোও কিছুতেই সম্ভব নয়। যা করতে হয়, এক্ষুনি করা দরকার। কন্‌গ্রে বিপদের গুরুত্ব বেশ ভালোই বুঝতে পেরেছিলো। সামনে তখন শুধু একটা পথই খোলা আর তা-ই করলে

সে। জাহাজ থেকে ডিঙি নামানো হ'লো, জনা সাতেক লোক গিয়ে উঠলো সেই ডিঙিতে। তারপর অনেক চেষ্টায় বিস্তর হয়রানির পর কোনোরকমে গুণ টেনে জাহাজটাকে মাঝদরিয়ায় নিয়ে-যাওয়া হ'লো।

ঘেমে-নেয়ে মাঝদরিয়ায় পৌঁছে দেখা গেলো একফোঁটাও হাওয়া নেই। বাতাস নেই ব'লে পালগুলো নেতিয়ে পড়েছে। ডিঙি ক'রে গুণ টেনে, জাহাজটাকে উপসাগরের মুখে নিয়ে-যাওয়ার কল্পনা করাই এখন বাতুলতা। সুতরাং জোয়ারের জন্যে হাঁ ক'রে ব'সে-থাকা ছাড়া আর-কোনো উপায়ই নেই এখন। তবে জোয়ারের চাঞ্চল্য এর মধ্যেই টের পাওয়া যাচ্ছে। এখনও অস্ফুট আওয়াজ উঠছে জল থেকে, কিন্তু জাহাজ এখন যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে ভরা জোয়ারের সময়ও সেখান থেকে জোয়ারের খুব-একটা সাহায্য পাওয়া যাবে না। আর জোয়ারের টানের উলটো দিকে জাহাজ চালাবার কথা যে ভাবে সে হয় জন্ম-আহাম্মক আর নয়তো ডাহা-পাগল। তাহ'লে মাত্র মাইল দু-এক এসেই কি জাহাজের নোঙর ফেলে ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে ব'সে থাকতে হবে ?

বোম্বেটে জাহাজ দূরে গিয়ে নোঙর ফেলবার পর ডেভিস আর বাস্‌কেথ তাদের গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে সমুদ্রতীরে দাঁড়ালে। উদ্দেশ্য : জাহাজটার গতিবিধির ওপর নজর রাখবে। হাওয়ার অবস্থা দেখে বুঝতে পারলে যে কন্‌গ্রেকে অন্তত বেশ-কিছুক্ষণ থেমে থাকতে হবে। ভাঁটার টান শুরু না-হ'লে কোনোমতেই সে জাহাজ চালাতে পারবে না। কিন্তু তবুও ভোর হবার আগেই সে-যে বারদরিয়ায় গিয়ে পৌঁছুতে পারে, তারও ভালোরকম সম্ভাবনা আছে।

হঠাৎ বাস্‌কেথ চেঁচিয়ে উঠলো : 'এতক্ষণে দস্যুদের বাগে পেয়েছি !'

বিস্মিত জন ডেভিস জিগেস করলে—'কী ক'রে ?'

—'কী ক'রে, তা এক্ষুনি দেখতে পাবে।' ব'লে, বাস্‌কেথ ডেভিসের হাত ধ'রে টানতে-টানতে হন্যে হ'য়ে ছুটতে শুরু করলে বাতিঘরের দিকে।

তার হিশেবমতন সান্তা-ফে এখন উপসাগরে ঢোকবার মুখটায় দাঁড়িয়ে ভোর হবার অপেক্ষা করছে। কাপ্তেন লাফায়েৎ কিছুতেই রাতের অন্ধকারে জাহাজ চালাবার ঝুঁকি নেবেন না।

কন্‌গ্রেও সে-কথা বুঝতে পেরেছিলো, তাই তার মনে তখনও আশা ছিলো, একবার সমুদ্রমুখে ভাঁটার টান শুরু হ'লেই আর তাকে পায় কে ? একঘণ্টার মধ্যেই খোলা সমুদ্দুরে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে।

রাত তখন নটা বেজে গেছে। জোয়ারের ঠ্যালা সামলাবার জন্যে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে জলদস্যুদের জাহাজ সের্‌সান্তে। অপেক্ষা ক'রে আছে ভাঁটার জন্যে। রাত তিনটের আগে সে-আশা নেই। তাই সমুদ্রের দিকে মুখ ক'রে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের জাহাজ।

ডিঙি দুটো এর মধ্যেই ওপরে টেনে তোলা হয়েছে, কারণ ভাঁটার টান শুরু হ'লে আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে রাজি নয় কন্‌গ্রে।

আচমকা কে যেন চীৎকার ক'রে উঠলো—'আলো। বাতিঘরে আলো জ্ব'লে উঠেছে !'

সত্যিই তাই। বাতিঘর থেকে একটি তীব্র আলোকরশ্মি বেরিয়ে এসে অন্ধকার ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলেছে। আলোয়-আলোয় চারদিক ঝলমল ক'রে উঠেছে। বাতিঘরের মিনার থেকে আলোর ছটা প'ড়ে দ্বীপ, সমুদ্র, আর আকাশকে আলোয় আলো ক'রে দিয়েছে!

—'উঃ! বদমায়েশ!' চেঁচিয়ে উঠলো সেরসান্তে।—'বদমায়েশগুলো বাতিঘরে গিয়ে আলো জ্বেলে দিয়েছে!'

—'শিগগির তীরে চলো—' খ্যাপা জাগুয়ারের মতো গ'র্জে উঠলো কনগ্রে।

—'এক্ষুনি তীরে যেতে হবে, উঠতে হবে বাতিঘরের মিনারে, ঢুকতে হবে লণ্ঠনঘরে, তারপর আলোকরক্ষী আর তার সাথী যে বা যারা আছে তাদের খুন ক'রে ফেলে নিভিয়ে দিতে হবে আলো।' কনগ্রে বাৎলায় তার প্ল্যান।

—'কিন্তু এর মধ্যে সান্তা-ফে যদি চলতে শুরু করে?' জিগেস করে সেরসান্তে।

সেরসান্তের কথায় একটু দ'মে গেলো কনগ্রে। সত্যিই তো! সান্তা-ফে যদি তীরের দিকে এগিয়ে আসে! কিন্তু না, ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

কনগ্রে আবার ডিঙি নামাতে হুকুম করে।

হুড়োহুড়ি ক'রে ডিঙি নামানো হ'লো জলে। সঙ্গে-সঙ্গে জলদস্যুদের দল লাফিয়ে উঠলো ডিঙিটায়। সকলেই সশস্ত্র। কারু হাতে বন্দুক, কারু হাতে রিভলভার, আর কারু-বা হাতে কুঠার। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তারা তীরে পৌঁছুলো। পড়ি-মড়ি ক'রে ছুটলো সবাই বাতিঘরের দিকে। বাতিঘর সে-জায়গা থেকে দেড় মাইল দূরে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই সে-দূরত্বটা অতিক্রম করলে তারা।

জন ডেভিস আর বাসকেথ তখনও লণ্ঠনঘরেই রয়েছে। বাসকেথ গোড়ায় ভয় পেয়েছিলো। কনগ্রে লণ্ঠনের আতসকাচ আর যন্ত্রপাতি নষ্ট ক'রে ফ্যালেনি তো? কিন্তু লণ্ঠনের ঘরে ঢুকে সে-ভয় দূর হয় তাদের। না, লণ্ঠন ঠিকই আছে। যন্ত্রপাতি কিছুই নষ্ট করেনি কনগ্রে। তাই আবার বাতিঘরের লণ্ঠন অকস্মাৎ জ্ব'লে উঠেছিলো। আতসকাচের ভেতর দিয়ে ঝলসে উঠেছিলো তীব্র আলোর ছটা।

দূরন্ত গতিতে এসে দস্যুরা বাতিঘরে ঢুকলো। কিন্তু এ কী? সিঁড়িঘরের দরজা যে বন্ধ!

কনগ্রে হুকুম দিলে—এক্ষুনি দরজা ভেঙে ওপরে উঠতে না-পারলে আর-কারু রেহাই নেই।

কিন্তু সিঁড়িঘরের দরজা ইস্পাতের চাদরে তৈরি, খুব শক্ত। কিছুতেই সে-দরজা আর ভাঙা যাচ্ছে না। পরিশ্রম ক'রে সবাই প্রায় ঘেমে নেয়ে উঠেছে। কিন্তু খামকাই এই চেষ্টা! কুঠারের সাহায্যেও সে-দরজা ভাঙবার সাধ্য নেই কারু। সেরসান্তে দরজার নাট-বলটু খুলে ফেলবার জন্যে দরজাটাকে খুঁটিয়ে দেখলে। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হ'লো না। দরজার বলটুগুলো ভেতর থেকে এঁটে দেয়া হয়েছে। বাইরে থেকে খোলা অসম্ভব।

এখন তাহ'লে কী করবে তারা? মিনারে ওঠবার জন্যে কোনো পথ আছে কি? যদি না-থাকে, তাহ'লে দ্বীপের গহনে গিয়ে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা ছাড়া তাদের আর-কিছুই করবার নেই। জাহাজে ফিরে গিয়ে এখন আর কোনো লাভ নেই। তাছাড়া হাতে তো একফোঁটাও সময় নেই। সান্তা-ফে নিশ্চয়ই এতক্ষণে দ্রুতগতিতে তীরের দিকে ছুটে

আসছে। এখনও যদি কোনোরকমে আলো নিভিয়ে দেয়া যায় তাহ'লে হয়তো বাঁচবার একটা উপায় হ'তে পারে।

কিন্তু ওপরে উঠবে তারা কী ক'রে ? মিনারে ওঠবার একটাই মাত্র পথ, আর সেটাও বন্ধ ! কী করা যায় তাহ'লে ?

হঠাৎ সের্‌সান্তে চেঁচিয়ে উঠলো—'এদিকে একটা লোহার মই আছে !'

—'নিয়ে এসো শিগগির ! জলদি !'

মইটা অনেক কষ্টে দেয়ালে লাগানো হ'লে দেখা গেলো মিনারের অর্ধেকও পৌঁছোয় না !

রাগে, ক্ষোভে, তেরিয়া আক্রোশে মরিয়ার মতো হ'য়ে উঠলো কন্‌গ্রে। আর, এমনি সময়ে, হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটা লোহার পাইপ একেবারে মিনারের চুড়ো অব্দি উঠে গিয়েছে। শেষ চেষ্টা তাহ'লে এই পথেই করতে হবে ! সের্‌সান্তে আর ভার্গাস অমনি পাইপ বেয়ে উঠতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

অনেকটা উঁচুতে উঠে গেছে তারা। আর মাত্র সামান্যই বাকি !

এমনি সময় পর-পর কতগুলো রিভলভারের আওয়াজ শোনা গেলো। এবার আক্রমণের ভূমিকা নিয়েছে ডেভিস আর বাস্‌কেথ।

সের্‌সান্তে আর ভার্গাসের গুলি-বেঁধা দেহ নিচে আছড়ে পড়লো।

ওদিকে সান্তা-ফের সিটি বেজে উঠেছে তীব্র শব্দে। তীরের একেবারে কাছে এসে পড়েছে সান্তা-ফে !

পালাবারও সময় নেই আর। আর দু-তিন মিনিটের মধ্যেই সান্তা-ফে তীরে নোঙর ফেলবে।

এবার তবে নিশ্চিত মরণ ! আর তাদের রেহাই নেই !

গভীর আতঙ্ক যেন চোখের সামনে ঘনিয়ে তুলেছে অন্ধকার।

আর-কিছুই করবার নেই, কিছু না।

কন্‌গ্রে আর তার দলবল প্রাণের ভয়ে ছুটতে-ছুটতে অন্ধকার মিলিয়ে গেলো।

এর খানিকক্ষণ পরেই স্টটেন আইল্যাণ্ড সচকিত হ'য়ে উঠলো সান্তা-ফের নোঙর ফেলবার শব্দে।

আর তারই একটু পরে বাস্‌কেথ আর ডেভিসকে দেখা গেলো সান্তা-ফের ডেকের ওপর।

১৪

আবার আলোর ঝলকানি

কাপ্তেন লাফায়েতের কামরায় ডাক পড়লো বাস্‌কেথ আর ডেভিসের। তাঁর প্রথম কথাটাই হ'লো, কোনোরকম সম্ভাষণেরও আগে—'এত দেরিতে আলো জ্বালানো হ'লো কেন,

বাস্‌কেথ ?'

—'ন-হপ্তার ওপর হ'লো বাতি আদৌ জ্বলেনি, সেনিওর ! ন-হপ্তা বাদে আজই প্রথম আলো জ্বললো !' কথার জবাব দিলে বাস্‌কেথ ।

—'ন হপ্তা ! তার মানে ? ফিলিপ আর মরিসই বা—'

—'ফিলিপ আর মরিস খুন হয়েছে, কাপ্তেন ! সান্তা-ফে এখান থেকে চ'লে যাবার পর থেকেই বাতিঘরের মাত্র একজন আলোকরক্ষীই বেঁচে আছে ।'

তারপর ডেভিস আর বাস্‌কেথ কাপ্তেন লাফায়েৎকে সব কথা খুলে বললে । খুলে বললে, কীভাবে ফিলিপ আর মরিসকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে দস্যুরা ; কীভাবে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচেছে বাস্‌কেথ, কীভাবে ধ্বংস হয়েছে সেনচুরি, কীভাবে রক্ষা পেয়েছে জন ডেভিস—সে-জাহাজের ফার্স্ট মেট, কীভাবে কামান ছুঁড়ে তারা বোম্বেটেদের যাত্রায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে, আর শেষে, গতরাতে, কীভাবে বাস্‌কেথ নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে দস্যুদের যাত্রায় বাধা দেবার চেষ্টা করেছে ।

ডেভিস বললে—'আজ রাতে বাতিঘরের লণ্ঠনটা জ্বালাবার ফন্দি বাস্‌কেথের মাথাতেই প্রথম এসেছিলো । এই বিপদের সময় সে যদি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে লণ্ঠন জ্বালবার ফন্দিটা বার না-করতো, তবে দস্যুদল এর মধ্যেই অনেক দূরে চ'লে যেতো ।'

সব শুনে কাপ্তেন লাফায়েৎ তাদের বাহবা দিয়ে হাত ধ'রে বললেন— 'তোমরা যদি সাহস ক'রে বোম্বেটেগুলোকে বাধা দেবার চেষ্টা না-করতে, তাহ'লে ওদের কোনো সন্ধানই পাওয়া যেতো না । ভাগ্যিশ বাস্‌কেথ বুদ্ধি ক'রে লণ্ঠনটা জ্বেলেছে, না-হ'লে এতক্ষণে ওরা বারদরিয়ায় উধাও হ'য়ে যেতো ; যা-ই হোক এবার শয়তানগুলিকে বাগে পেয়েছি । আর ওদের কোনোদিন এমন অবাধে লুঠতরাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে না ! সাহস ক'রে বাস্‌কেথ যে আলো জ্বালতে পেরেছে সেজন্যে শাবাশি দিই !'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সান্তা-ফের নাবিকরা সবাই পুরো কাহিনীটা জেনে গেলো আর বাস্‌কেথ আর ডেভিসের ওপর অজস্র অভিনন্দন বর্ষিত হ'লো ।

কথাবার্তার মধ্যেই রাত্রি কেটে গেলো । অনেক দিন বাদে নতুন ভোরের আলোকে মনে হ'লো প্রকৃতির আশীর্বাদ ব'লে । আকাশের রঙ হালকা নীল । দিগন্তে সমুদ্রে জল রাঙা ফুলের পাপড়ির মতো লাল— ভোরের আলোয় দ্বীপ আর আকাশ যেন ঝলমল ক'রে উঠেছে ।

এরই মধ্যে বাস্‌কেথ নতুন তিনজন আলোকরক্ষীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছে ।

বাহুল্য হবে বলা যে, রাত থাকতে-থাকতেই একদল সশস্ত্র মাঝিমাল্লা বোম্বেটেদের জাহাজ দখল করতে বেরিয়ে পড়েছিলো, কারণ কনগ্রে আর তার দলবল যদি মরিয়া হ'য়ে ঐ জাহাজে উঠতে পারে তবে ভাঁটার টানে জাহাজ ছেড়ে দিয়ে অনায়াসেই বারদরিয়ায় পৌঁছে যাবে ।

নতুন আলোকরক্ষীদের নিরাপত্তার জন্যে—বিশেষ ক'রে ফিলিপ আর মরিসের হত্যার যথোচিত শাস্তি দেবার জন্যে—কাপ্তেন লাফায়েৎ বোম্বেটেদের ওপর চড়াও হবার মৎলব এঁটেছিলেন ।

সের্‌সান্তে আর ভার্গাস অবিশ্যি গতরাতেই মারা গেছে, কিন্তু এখনও বেঁচে আছে পালের

গোদা কন্‌গ্রে, আর অন্তত দশ-বারোজন শাগরেদ। কোথায় গিয়ে তারা লুকিয়েছে কে জানে? সারা দ্বীপটাই তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখতে হবে।

মস্ত দ্বীপ, তাই দস্যুদলকে খুঁজে বার করাটাও কঠিন। তাছাড়া দ্বীপের প্রত্যেকটা ইঞ্চি তোলপাড় ক'রে দেখা মোটেই সহজ কাজ নয়! এত-বড়ো দ্বীপের কোনখানে কোন পাহাড়ের নিভৃত গুহায় যে বোম্বেটেরা লুকিয়ে আছে, তার হদিশ নেয়াটা বেশ মুশকিলই হবে। তবু কাপ্তেন লাফায়েৎ হাল ছাড়বেন না। তাঁরই ওপর দ্বীপের আলোকরক্ষীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যতদিন-না আলোকরক্ষীদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, যতদিন-না নিশ্চিত হওয়া যায় যে এবার থেকে বাতিঘরের কাজ নিয়মিতভাবে চলবে, ততদিন পর্যন্ত সান্তা-ফের পক্ষে দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

বোম্বেটেদের কাছে কোনো খাবারদাবার নেই। সেণ্ট বার্থোলোমিউ অন্তরীপের আস্তানাটাও শূন্য, ইগোর উপসাগরের তীরে বোম্বেটে গুহাতেও কিছু নেই। ক-দিন আর তারা অনাহারে কাটাবে?

ভোরবেলাতেই ডেভিস আর বাস্‌কেথকে সঙ্গে নিয়ে কাপ্তেন লাফায়েৎ বোম্বেটেগুহার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে গেলো একদল সশস্ত্র নাবিক। না, গুহাটা একদম ফাঁকা। অল্পকিছু শস্তা জিনিশপত্র ছাড়া এ-গুহায় আর-কিছুই নেই। খাবার-দাবার থেকে শুরু ক'রে সব দামি-দামি জিনিশপত্র কন্‌গ্রের লোকজন আগেই জাহাজে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলো। রাত্রে যদি কন্‌গ্রে আর তার দলবল গুহাতে এসেও থাকে, তবে নিশ্চয়ই গুহার এই হাল দেখে নিরাশ হ'য়ে ফিরে গিয়েছে। সেরসান্তের ভাঁড়ারে যত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, তাতে মনে হ'লো তাদের কাছে তেমন-কোনো অস্ত্রশস্ত্রও বোধহয় নেই।

এ-রকম পরিস্থিতিতে মনে হ'লো বোম্বেটেরা নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণ করবে, উপোশ ক'রে মরার চাইতে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করাটাকেই তারা নিশ্চয়ই ভালো ব'লে মনে করবে। কিন্তু তারা কী করবে না-করবে, সে তো পরের কথা। যখন আত্মসমর্পণ করবে তখনই সে-কথা ভাবা যাবে। আপাতত অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়াই উচিত।

একটুও ঢিলে না-দিয়ে পুরোদমে তল্লাশি চললো। কাপ্তেন লাফায়েৎ সেণ্ট বার্থোলোমিউ অন্তরীপ অব্দি ধাওয়া ক'রে গেলেন। কিন্তু বোম্বেটেদের কোনো হদিশই পাওয়া গেলো না। লোকগুলো যেন কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে। কয়েকটা দিন এই নিষ্ফল অনুসন্ধানেই কেটে গেলো। কিন্তু বোম্বেটেদের কোনো পাত্তাই নেই।

অবশেষে দশই মার্চ ভোরবেলা যে ক-জন লোক হঠাৎ ধুঁকতে-ধুঁকতে এসে বাতিঘরের ফটকের ভেতরে ঢুকলো, তারা সবাই ফিজির লোক। দুর্দশায় কাতর লোকগুলো শেষটায় আত্মসমর্পণ করবে ব'লেই ঠিক করেছে। খাইয়ে-দাইয়ে তাদের চাঙ্গা ক'রে তুলে হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে তাদের সান্তা-ফের গারদঘরে আটকে রাখা হ'লো।

আরো ক-দিন বাদে লিউটেনাণ্ট রীগাল যখন ওয়েবস্টার অন্তরীপে তল্লাশিতে গেছেন, তখন দেখতে পেলেন পাঁচটি মৃতদেহ প'ড়ে আছে, কিন্তু এদের মধ্যেও কন্‌গ্রের কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেলো, অনাহারেই লোকগুলো মারা গেছে।

এরও কয়েকদিন পরে দেখা গেলো বাতিঘর থেকে শ-পাঁচেক গজ দূরে একটা লোক টলতে-টলতে বাতিঘরের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না! বারে-বারে

মুখ থুবড়ে প'ড়ে যাচ্ছে ।

কন্‌গ্রে !

নতুন আলোকরক্ষীদের সঙ্গে গল্প করতে-করতে বাতিঘরের পাশেই হেঁটে বেড়াচ্ছিলো বাস্‌কেথ ! কন্‌গ্রেকে চিনতে পেরেই সে চেঁচিয়ে উঠলো :— 'কন্‌গ্রে ! কন্‌গ্রে ! ঐ-যে ওখানে !'

তার চীৎকার শুনে কাপ্তেন লাফায়েৎ আর লিউটেনান্ট রীগাল প্রায় ছুটেই সেখানে এসে হাজির হলেন ।

ডেভিস আর জনকয়েক মাল্লা ততক্ষণে কন্‌গ্রের দিকে ছুটে গিয়েছে ।

কী চায় সে এখানে ? কী জন্যে সে ধরা দিতে এসেছে ? সে কি জানে না ধরা দিয়ে তার কোনো লাভ হবে না—তার ফাঁসি একেবারেই অবধারিত !

পরমুহূর্তেই একটা রিভলভারের শব্দ সন্ধ্যার স্তব্ধতা ভেঙে দিলে ।

কন্‌গ্রে কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভার খুলে নিয়ে নিজের কপালে ঠেকিয়ে গুলি করেছে । ভেঙেছে বটে, তবু মচকায়নি । সকলকে দেখিয়ে-দেখিয়ে ফাঁসিকাঠকে সে ফাঁকি দিয়ে গেছে ।

স্টটেন আইল্যাণ্ডে গত তিনমাস ধ'রে যে-রোমহর্ষক নাটক চলেছিলো, কন্‌গ্রের আত্মহত্যার সঙ্গে-সঙ্গে তার ওপর যবনিকা প'ড়ে গেলো ।

...

তেসরা মার্চ রাত্রি থেকে নিয়মিত সময়মতোই জ্বলেছে বাতিঘরের আলো । বাস্‌কেথ নতুন আলোকরক্ষীদের সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছে । লণ্ঠনের আতসকাচ থেকে নিয়মমতোই ছড়িয়ে পড়ছে তীব্র আলোর ছটা ।

বোম্বেটেদের মধ্যে সাতজন বাদে আর-কেউই বেঁচে নেই । যে-সাতজন বেঁচে আছে তারাও সান্তা-ফের অন্ধকার খুপরিতে ব'সে মৃত্যুর দিন গুনছে । বুয়েনোস আইরেসের আদালতে শিগগিরই যে-বিচার শুরু হবে, তার রায় তারা আগে থেকেই আন্দাজ ক'রে নিয়েছে ।

ডেভিস আর বাস্‌কেথ সান্তা-ফেতে ক'রে বুয়েনোস আইরেস ফিরে যাবার জন্যে তৈরি—ডেভিস সেখান থেকে যাবে মবিলে । ওখানে সে নিশ্চয়ই নতুন কোনো কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে । বাস্‌কেথ এবার দেশে ফিরে গিয়ে অবসর নেবে । তার সারাটা জীবন কেটেছে কঠোর সংগ্রামে, দুঃসাহসের কাজে । এই প্রৌঢ় বয়েসে আর ঐ বেপরোয়া কাজকর্ম নয় —এখন চাই বিশ্রাম, চাই অবসর । কিন্তু দেশে ফিরে যাবে সে একাই—তার হতভাগ্য দুই বন্ধু আর তার সঙ্গে ফিরে যাবে না ।

আঠারোই মার্চ সান্তা-ফে থেকে তোপ দেগে বাতিঘরের মিনারকে বিদায় অভিনন্দন জানানো হ'লো ।

...

সান্তা-ফে যখন চলতে শুরু করলো, তখন সূর্য ডুবছিলো ।

আর তখনই অন্ধকারকে ধুয়ে দিলে তীব্র-একটি আলোর বন্যা । সান্তা-ফের সামনে

সমুদ্রে ঢেউগুলো আলো প'ড়ে ঝিকিয়ে উঠেছে। অন্ধকার যত ঘন হ'লো আলোর ঔজ্জ্বল্য ততই বাড়তে লাগলো। আর দূর সমুদ্রে ক্রমেই মিলিয়ে গেলো সান্ত্র-ফে।

লণ্ঠনের আতসকাচ তখন অন্ধকারের ওপর মস্ত এক তেকোনা আলো ফেলেছে! জোয়ারের জল ক্রমশ ফুলে-ফেঁপে বালিয়াড়িগুলো ঢেকে দিচ্ছে! আরো-গভীর আরো-যেন রহস্যময় হ'য়ে উঠেছে সমুদ্রের চাপা কণ্ঠস্বর .... আর হাওয়ার একটানা শন শন শন আওয়াজ।

মাস্টার জাকারিয়ুস

১

হিমরাত্রি

জেনিভা হ্রদেরই একেবারে পশ্চিম উপান্তে জেনিভা নগরী। হ্রদের থেকে বেরিয়েছে রোন নদী ; নগরীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে সে ; কিন্তু হঠাৎ নগরীর মাঝখানে সে নিজেই আবার দুইভাগে ভাগ হ'য়ে গেছে—মাঝনদীতে ছোট্ট একটা দ্বীপ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ব'লে। শিল্প-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে অনেক সময়েই এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করা যায়। যাতায়াতের যে-সুবিধে এই চঞ্চল স্রোত উপহার দেয়, প্রথম বাসিন্দারা যে তাতেই যথেষ্ট প্রভাবিত হ'য়ে পড়ে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'নিজে থেকেই চলতে থাকে এই রাস্তা', নদীদের পাস্‌কাল তো এইভাবেই বর্ণনা করেছেন। রোন নদীর বেলায় বলা যায় এ-রাস্তা কেবল চলে না, ছুটে চলে—দৌড়ে চলে।

দ্বীপটা যেন ওই নদীর মধ্যকার মস্ত এক ওলন্দাজ নৌকো। নিয়মিতভাবে নতুন-নতুন বাড়ি-ঘর তৈরি হবার আগে অদ্ভুত ধরনে বাড়ি বানানো হ'তো এখানে—যেন একটা আরেকটার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তো তারা, বিশৃঙ্খল কিন্তু সুন্দর, এলোমেলো অথচ মনোরম। নদীর একেবারে পাড় ঘেঁষে উঠছে বাড়ি, মনে হয় যেন নদীর মধ্যেই তার ভিত, যেন থামের গায়ে কোনোরকমে হেলানো আছে—আর চঞ্চল নদীস্রোতের মধ্যে এলোমেলো সেই বাড়িগুলি যেন হঠাৎ কেমন ক'রে আটকে গেছে, না-হ'লে তারাও হয়তো ভেসে যেতো দূরে। মস্ত-মস্ত সব থামগুলিকে কোনো অতিকায় কাঁকড়ার দাঁড়া ব'লে মনে হয়—কালো হ'য়ে গেছে তারা দিনে-দিনে, আর জল তাদের খেয়ে-খেয়ে গেছে—দেখে অদ্ভুত ও অবাস্তব একটা শিরশিরে অনুভূতি হয়। পুরোনো ভিতের মধ্যে ছোট্ট হলুদ জলের স্রোত খেলা করে অন্ধকারে, যেন কোনো ঊর্ণনাভের সুতো বেরিয়েছে কেঁপে-কেঁপে, যেন কোনো মস্ত এক-বনের চঞ্চল পাতা তারা—আর জল এই স্তম্ভের অরণ্যে আটকে, বাধা পেয়ে, ধাক্কা খেয়ে, অসীম দুঃখে গ'র্জে-গ'র্জে ফেনিয়ে উঠছে।

দ্বীপের বাড়িগুলোর মধ্যে একটি এত পুরোনো ও জীর্ণ যে তাকাবামাত্র প্রথমেই চোখে পড়ে। বুড়ো ঘড়ি-নির্মাতা মাস্টার জাকারিয়ুসের বাড়ি এটা ; থাকার মধ্যে আছে তাঁর একমাত্র কন্যা জেরাঁদ ; সে ছাড়া ওই বাড়িতে থাকে তাঁর ছাত্র ও সহকারী ওবের তুন, আর পুরোনো দাসী স্কলাস্টিকা।

এই জাকারিয়ুসের সঙ্গে কোনোদিক থেকেই তুলনা চলে এমন কেউ জেনিভায় ছিলো না। কত-যে তাঁর বয়েস, কেউ তা জানেই না। শহরের প্রাচীনতম লোকটি পর্যন্ত এ-কথা বলতে পারবে না কবে থেকে তার কাঁধের উপর লম্বাটে ধরনের তীক্ষ্ণ মাথাটি চঞ্চলভাবে নড়াচড়া করছে কিংবা এটাও কেউ বলতে পারবে না কবে তাঁকে প্রথম এই শহরের রাস্তায়

হাঁটতে দেখা গেছে—লোকে শুধু এটুকুই জানে যে যখন তিনি পথে বেরোন, হাওয়ায় তাঁর শাদা চুল এলোমেলোভাবে ওড়ে। তিনি যেন আদৌ বেঁচেই নেই : শুধু তাঁর ঘড়িগুলির পেনডুলামের মতো সর্বদাই যেন আন্দোলিত হচ্ছেন। ছোটোখাটো অলবড্যে শরীর তাঁর, সব সময়েই গাঢ় ও 'গম্ভীর' রঙের পোশাক পরেন—কালোই বেশির ভাগ সময়। লেয়োনার্দো দা ভিন্‌চির ছবির মতো যেন আদ্যোপান্ত কালো রঙেই আঁকা তিনি।

গোটা বাড়িটার মধ্যে যে-ঘরটা সবচেয়ে ভালো আর সুন্দর, সেই ঘরে থাকে জেরাঁদ ; ঘুলঘুলির মতো ছোট্ট এক টুকরো জানলা দিয়ে জুরা পর্বতের তুষারঢাকা আশ্চর্য চূড়াটি দেখা যায়। কিন্তু জাকারিয়ুসের শোবার ঘর আর কারখানা যেন জলের গায়ে লাগা গহ্বরের মতো—মেঝেয় পাটাতন ফেলা, তলায় জলের স্রোত ছলোছলো ঘুরে বেড়ায়।

মনেই পড়ে না কবে থেকে, কিন্তু এটা সত্যি যে খাবার সময় ছাড়া মাস্টার জাকারিয়ুস কখনো তাঁর ঘর থেকে বেরোন না—শুধু মাঝে-মাঝে যখন শহরের বিভিন্ন ঘড়িগুলোকে দম দিতে যেতে হয়, তখন অবশ্য অন্য রকম। সারা সময়ই তিনি তাঁর বেঞ্চির উপর ব'সে কাটান : আশপাশে ঘড়ির অসংখ্য সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে থাকে—আর এখানে বলা উচিত যে এইসব যন্ত্রের অধিকাংশই তাঁর নিজের আবিষ্কার। আশ্চর্য তাঁর মেধা আর চাতুরী ; আলেমান ও ফরাশি দেশে তাঁর কাজের অত্যন্ত সুখ্যাতি। জেনিভার শ্রেষ্ঠ ঘড়িনির্মাতারা অল্প দিনের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠতা বুঝতে পেরেছিলো। তিনি যে নগরীর একজন সম্মান, এটা তারা স্পষ্টভাবে বলেছিলো তখন ; 'ঘড়ির যে-অংশটা গতি নিয়ন্ত্রণ করে, তা আবিষ্কার করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁর।' সত্যি-বলতে, সত্যিকার ঘড়ির জন্মই হ'লো তখন, যখন কয়েক বছর আগে জাকারিয়ুসের প্রতিভা নানা সূক্ষ্ম জিনিশ আবিষ্কার করলো।

অনেকক্ষণ ধ'রে কঠোর ও একটানা কাজ করার পর আস্তে-আস্তে জাকারিয়ুস তাঁর যন্ত্রপাতি সরিয়ে রাখেন ; আতশকাচ দিয়ে দেখে-দেখে সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রগুলি জুড়ছিলেন তিনি এতক্ষণ—এবার তাঁর লেদ-এর সচল চাকাটা তিনি বন্ধ ক'রে ফ্যালেন ; তারপর মেঝের পাটাতনের চোরা-দরজাটার পাল্লা তুলে ঝুঁকে দাঁড়ান তিনি ; নিচে চোখের তলায় রোন নদীর প্রখর স্রোত আবর্ত তুলে ছুটে যাচ্ছে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওইভাবে দাঁড়িয়ে সেই ভিজে ও ঘন বাষ্প নিশ্বাসে টেনে নেন বুকে।

একদিন শীতের রাত্রে স্কলাস্টিকা যথারীতি খাবার-টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিলে : বাড়ির রীতি অনুযায়ী তরুণ যন্ত্রশিল্পী ওবের আর সে দুজনেই প্রভুর সঙ্গে খেতে বসে। জাকারিয়ুসের খাদ্য অত্যন্ত সাবধানে রান্না করা হয় : সে-রাতে কিন্তু সুন্দর নীল রেকাবিতে সাজিয়ে দেয়া খাদ্যবস্তু তিনি স্পর্শই করলেন না। কন্যা জেরাঁদের মিষ্টি কথাগুলির উত্তরে সংক্ষেপে হু-হাঁ ক'রে যাচ্ছিলেন কিংবা কখনো কোনো কথাই বলছিলেন না। জেরাঁদের কথা থেকে বোঝা গেলো যে বাবার এই অদ্ভুত স্তব্ধতা সে স্পষ্ট লক্ষ করেছে। এমনকী স্কলাস্টিকার একঘেয়ে ও অবিরাম বকুনিতে পর্যন্ত তিনি কোনো কান দিলেন না ; রোন নদীর অবিশ্রাম কলরোলের সঙ্গে স্কলাস্টিকার মুখরতার যে কোনো তফাৎ তিনি ধরতে পেরেছেন, এটা তাঁর মুখ দেখে মনে হ'লো না।

চুপচাপ খেয়ে উঠে জাকারিয়ুস কাউকেই শুভরাত্রি না-জানিয়ে তাঁর কুঠুরিতে চ'লে গেলেন ; অন্যদিন খাওয়া-দাওয়ার পর কন্যাকে আলিঙ্গন ক'রে সস্নেহে তার কপালে চুম্বন

করেন তিনি : কিন্তু আজ তাও করলেন না, বরং তিনি যখন দরজার বাইরে চ'লে গেলেন তখন তাঁর ভারি পায়ের তলায় সিঁড়িটা আর্ত গলায় কেবল কাৎরে-কাৎরে উঠলো ।

জেরাঁদ, ওবের আর স্কলাস্টিকা—তিনজনেই স্তব্ধ ব'সে রইলো কিছুক্ষণ। সন্ধে থেকেই আকাশ মেঘলা হ'য়ে আছে, কেমন বিমর্ষ আর মলিন ; কোনোরকমে নিজেদের টেনে-হিঁচড়ে আল্পসের চূড়ো পর্যন্ত যেতে পেরেছে যেন ভারি মেঘগুলি—তারপর অবসন্ন হ'য়ে সেখানেই ব'সে আছে, কালো ও গম্ভীর ; আর 'বৃষ্টি হবে', এই কথাই জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ভিজে হাওয়া । সুইৎজারল্যাণ্ডের প্রবল বর্ষণকাল যেন মন খারাপ করিয়ে দেয় কেবল—রাশি ও রাশি বিষাদ যেন ছড়িয়ে দেয় সে চারদিকে । সেই থেকে বাড়ির চারপাশে ভীষণ দখিনা বাতাস গজরাচ্ছে, আর তার তীক্ষ্ণ শিসের মধ্যে যেন ভিড় ক'রে আছে অলুক্ষুণে সব আশঙ্কা ।

অবশেষে স্কলাস্টিকাই প্রথমে স্তব্ধতা ভাঙলে । জেরাঁদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কর্তা আজ ক-দিন থেকেই যেন কেমন হ'য়ে আছেন ।' মাতা মেরির নামে শপথ উচ্চারণ করলে সে । খাদ্যে যে তাঁর কোনো স্পৃহা নেই—তা তো স্পষ্ট । বোধহয় অনেক কথা তাঁর ভিতরে ভিড় ক'রে আছে—অথচ সেগুলি যে কী, তা বের ক'রে আনতে গেলে অতি-ধূর্ত কোনো শয়তানও একেবারে হিমশিম খেয়ে যাবে ।

'গোপন কোনো উদ্বেগ রয়েছে নিশ্চয়ই । অথচ উদ্বেগের কারণ যে কী তা তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' গভীর উৎকণ্ঠা ও বিষাদ ফুটে উঠলো জেরাঁদের মুখচোখে ।

'এত মন খারাপ করবেন না, মাদমোয়াজেল, মাস্টার জাকারিয়ুসের স্বভাব তো জানেনই আপনি । তাঁর মনের মধ্যে যে কী আছে, তা কি কোনোদিনই কেউ টের পেয়েছে ? হয়তো আজ অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করছিলেন, দেখবেন, কাল তার চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনি কষ্ট পেয়েছেন জানলে তখন হয়তো আবার অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে পড়বেন ।' জেরাঁদের আশ্চর্য আয়ত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে বললো ওবের ।

ওবের-এর বুদ্ধি বিবেচনা ও সততা জাকারিয়ুসের ভালো লেগেছিলো ব'লেই তাকেই তিনি প্রথম নিজের হাতে কাজ শেখাতে রাজি হয়েছিলেন—ওবের ছাড়া আর-কাউকেই তিনি কখনো তাঁর বিশেষ কর্মপদ্ধতি শেখাতে চাননি । ওবেরের প্রতি এখন জেরাঁদ এমনি আসক্ত হ'য়ে পড়েছে যে তাঁর নিষ্ঠা সম্বন্ধে এখন কোনো প্রশ্নই আর ওঠে না ।

জেরাঁদের বয়স আঠারো বছর । গোল ছাঁদের মুখ তার—মাদোন্নার মতো সরল আর স্বর্গীয় যেন, যে-স্নিগ্ধ শুচিতা এখনও ব্রিটানিয়ার কোনো-কোনো প্রাচীন রাস্তায়-ঘাটে দৈবাৎ চোখে পড়ে । চোখ দুটিতে ছড়িয়ে আছে অসীম সরলতা । কোনো কবির স্বপ্ন-মাধুরীর প্রতিমা যেন সে, আর তা-ই তাকে ভালো না-বেসে কোনো উপায় নেই । তার পোশাকের রঙ স্নিগ্ধ ও সুকুমার—তাতে কোনো তীব্র কর্কশ চীৎকার নেই ; গির্জের রেশমে যে-স্নিগ্ধতার আভা চোখে পড়ে, তেমনি শুভ্র বসনে তার সুডৌল কাঁধখানি ঢাকা । জেনিভায় তো এখনও কালভিনবাদের শুষ্কতা ছড়িয়ে পড়েনি—আর জেরাঁদ যেন তারই মধ্যে কোনো অতীন্দ্রিয় জগৎ খুঁজে পেয়েছে ।

লাতিন স্তোত্র পাঠ করে সে রাত্রে আর সকালে ; সম্প্রতি আবার ওবের তুনের মধ্যে গোপন মমতা আবিষ্কার করেছে সে—তার প্রতি এই তরুণ যন্ত্রশিল্পীর অনুরাগের প্রবলতা তার আর অজানা নেই । এই বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতার বাড়িটাই যেন ওবেরের সমস্ত জগৎ ; নিজের

কাজ শেষ হ'য়ে গেলে জাকারিয়ুসের কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে সে, বাকি সময়টা এই তরুণীর কাছেই কাটিয়ে দেয়, পারতপক্ষে বাড়ি ছেড়ে এক পা-ও বেরোয় না।

বুড়ি দাসী স্কলাস্টিকা দেখছিলো সবই, কিন্তু কিছুই বলতো না। দিনকাল যে বড্ড খারাপ হ'য়ে গেছে, আর গৃহস্থালির টুকিটাকি যে আসলে মোটেই ফ্যালনা নয়—তার যাবতীয় বকবকানি এতেই নিঃশেষ হ'য়ে যেতো। একবার সে যদি কোনো বিষয়ে বকবক শুরু করে তো তার আর বিরাম নেই, এই তথ্যটা সবাই জানতো ব'লেই কেউ তাকে আর থামাবার চেষ্টা করতো না। জেনিভায় যে কলের বাজনা-ওলা নশ্যিদানি তৈরি হয়, সে যেন তা-ই। একবার চাবি দিলে, হাতুড়ির বাড়ি মেরে কেউ তাকে ভেঙে না-ফেললে, সমস্ত দম ফুরিয়ে না-ফেলে কিছুতেই সে থামবে না।

জেরাঁদকে অমন স্তব্ধ ও বিষণ্ণ হ'য়ে পড়তে দেখে স্কলাস্টিকা তার পুরোনো কাঠের চেয়ারটা ছেড়ে উঠে গেলো; মস্ত একটা রুপোর পিলশুজে মস্ত একটা মোমবাতি জ্বেলে পাথরের কুলুঙ্গির মধ্যে গালার তৈরি মেরিমাতার প্রতিমার পাশে বসিয়ে দিলে। গৃহস্থালির অধিষ্ঠাত্রী এই মাদোন্না মূর্তির কাছে নতজানু হ'য়ে বসাই ছিলো বাড়ির নিয়ম; তিনি যাতে দয়া ক'রে আসন্ন রাত্রিকালে সবাইকে দ্যাখেন, ঘুমুতে যাবার আগে এই প্রার্থনা করতে হয় তাঁর কাছে। জেরাঁদ কিন্তু আজ চুপ ক'রে তার চেয়ারেই ব'সে রইলো।

'বাঃ,' স্কলাস্টিকা অবাক হ'য়ে গেলো, 'খাওয়া শেষ হ'য়ে গেছে, শুতে যাবার সময়ও হ'লো—অত রাত অব্দি জেগে থেকে খামকা চোখকে কষ্ট দিচ্ছো কেন? হায়, মেরি মাতা! এর চেয়ে ঘুমিয়ে থাকা অনেক ভালো—তাহ'লে অন্তত স্বপ্নে কিছুটা আরাম পাওয়া যাবে। দিনকাল যেমন জঘন্য হ'য়ে পড়েছে, তাতে সুখশান্তি পাবার কি আর জো আছে আজকাল?'

'বাবার জন্য ডাক্তার ডাকা উচিত না আমাদের?' জিগেস করলো জেরাঁদ।

'ডাক্তার!' বুড়ি দাসী প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'ডাক্তার-বদ্যির বড়ো-বড়ো কথাবার্তা আর খেয়ালে কত্তা কি কোনোদিনও কান দিয়েছেন? বরং ঘড়িকে দামি ওষুধ খাওয়াবেন—কিন্তু নিজে? কক্‌খনো না!'

'কী করবো তাহ'লে?' আপন মনেই বললো জেরাঁদ, 'বিশ্রাম নিচ্ছেন, না কাজ করছেন, কে জানে?'

'জেরাঁদ,' ওবের নরম স্বরে বললে, আপনার বাবা একটু ভাবনায় পড়েছেন, এইমাত্র—আর-কিছুই তাঁর হয়নি।'

'আপনি জানেন, ওবের, কী সে ভাবনা?'

'বোধহয় জানি, জেরাঁদ। অন্তত আন্দাজ করতে পারি।'

'তাহ'লে ব'লে ফ্যালো তো চটপট,' অত্যন্ত উৎসুকভাবে ব'লে উঠলো স্কলাস্টিকা। পয়সা বাঁচাবার জন্য মোমবাতিটা সে নিভিয়ে দিলে।

'জেরাঁদ,' ওবের বললে, 'দিন কয়েক ধ'রে অদ্ভুত কতগুলি প্রহেলিকার মতো ব্যাপার ঘটেছে। আপনার বাবা কয়েক বছর ধ'রে যে-ঘড়িগুলি বানিয়ে বিক্রি করেছিলেন, সব হঠাৎ এক-এক ক'রে বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। সারাবার জন্যে অনেকে ঘড়িগুলি তাঁকে দিয়ে গেছে। অত্যন্ত সাবধানে তিনি ঘড়িগুলি খুলেছেন। স্প্রিং-এ কোনো দোষই নেই, চাকা

আর কাঁটাগুলিও ঠিক আছে—তবু আরো সাবধানে ভালো ক'রে দেখেশুনে তিনি আবার জুড়ে দিয়েছেন সেগুলি। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও একটা ঘড়িও আর চলছে না।'

'নিশ্চয়ই কোনো শয়তানের কাণ্ড!' স্কলাস্টিকা চেঁচিয়ে উঠলো।

'এ-কথা কেন বলছো?' জেরাঁদ জিগেস করলে। 'আমার কাছে তো ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব'লে বোধ হচ্ছে। জগতে তো আর চিরকাল কিছুই থাকে না। মানুষ কি আর অসীমকে স্পর্শ করতে পারে?'

'কিন্তু তবু এটা ঠিক যে,' ওবের বললে, 'ব্যাপারটা কেবল রহস্যময় নয়, অসাধারণও। ঘড়িগুলি হঠাৎ কেন বিকল হ'য়ে গেলো, আমিও তাঁর সঙ্গে তা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোথাও কোনো গোলমাল চোখে পড়েনি। হতাশ হ'য়ে কতবার যে হাল ছেড়ে দিয়েছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই।'

'তা এমন-একটা অর্থহীন কাজ করারও চেষ্টা কেন, বাপু?' স্কলাস্টিকা বললে, 'ওই তামার কলটা নিজে থেকেই চলবে, সময় ব'লে দেবে, জানিয়ে দেবে এমনকী ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড—তাকে কি স্বাভাবিক বলে? এর চেয়ে আমাদের ছায়া-ঘড়িই ঢের ভালো ছিলো।'

'যখন শুনবে যে কেন ওই ছায়া-ঘড়ি বের করেছিলো,' ওবের বললে, 'তখন তুমি আর ও-কথা বলবে না।'

'হা ঈশ্বর! এ আবার কী কথা শোনালে।'

'তোমার কি মনে হয়,' অত্যন্ত সরলভাবে শুধোলে জেরাঁদ, 'বাবার ঘড়িগুলি যাতে ঠিকমতো চলে, সেজন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত আমাদের?'

'নিশ্চয়ই,' তৎক্ষণাৎ বললে ওবের।

'ভালো, কিন্তু এই প্রার্থনায় কোনো ফল হবে না,' স্কলাস্টিকা আপন মনে বিড়বিড় করলে, 'তবে উদ্দেশ্য ভালো ব'লে ভগবান এদের ক্ষমা করবেন।'

আবার জ্বালানো হ'লো মোমবাতি। স্কলাস্টিকা, জেরাঁদ আর ওবের মেঝেয় নতজানু হ'য়ে বসলো একসঙ্গে। জেরাঁদ প্রথমে প্রার্থনা করলো রাত্রির জন্য করুণা ও আশিস, প্রার্থনা করলো বন্দী আর পথিক, ভালো আর মন্দ সকলের জন্য, আর সবশেষে তার বাবার এই দুর্ভাগ্যের জন্য সবচেয়ে কাতরভাবে মিনতি জানালো সে।

ভগবানের কাছে সব দুঃখ নিবেদন ক'রে দিলো ব'লে প্রার্থনার পরে যখন তারা তিনজন উঠে দাঁড়ালো, তখন তাদের মনে বেশ খানিকটা আস্থা জেগে উঠেছে।

ওবের তার নিজের ঘরে চ'লে গেলো; জেরাঁদ একা জানলার পাশে ব'সে-ব'সে কী যেন ভাবতে লাগলো, আর আস্তে-আস্তে রাস্তায় শেষ বাতিগুলো নিভে গেলো; স্কলাস্টিকা প্রথমে চুল্লির নিভু-নিভু অঙ্গারে একটু জল ছিটিয়ে দিলে, তারপর দরজার মস্ত খিল দুটি লাগিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে গড়িয়ে পড়লো—আর শয়তানের ভয়েই ম'রে যাচ্ছে বলে সে স্বপ্ন দেখতে লাগলো পরক্ষণে।

ক্রমেই বাড়তে লাগলো শীতের রাতের বিভীষিকা ও আতঙ্ক। মাঝে-মাঝে নদীর আবর্তের সঙ্গে কনকনে ঝোড়ো হাওয়া এসে মেশে, আর সারা বাড়িটা থরথর ক'রে কেঁপে

ওঠে ; জেরাঁদ কিন্তু তেমনি ঠায় ব'সে আছে জানলায়, বিষণ্ণ ও একা—বাবার চিন্তায় মগ্ন ও তন্ময় । ওবেরের কাছ থেকে বিকল ঘড়ির কথা শোনবার পর থেকেই বাবার উদ্বেগ আর অসুখ ক্রমেই অতিকায় আর ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে ব'লে তার মনে হ'লো । তার বাবার জীবন যেন কেমন যান্ত্রিক হ'য়ে গেছে—এবং এ-কথা ভাবতে তার অত্যন্ত কষ্ট হ'লো বটে, তবু সে অনুভব করলে যে, যে-খুঁটির উপর ভর ক'রে তাঁর জীবন ঘুরে চলতো, তা যেন ক্রমেই জীর্ণ হ'য়ে পড়ছে—আগের মতো তেমন সহজ ও অনায়াস ভাবটা যেন আর নেই।

হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার ছাদের চিলেকোঠার জানলার পাল্লাটা প্রচণ্ডভাবে দেয়ালে গিয়ে লাগলো । যেন ভীষণ ঘা খেয়ে জেরাঁদ শিউরে তার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো, কিন্তু আওয়াজটার উৎস সে ধরতে পারলো না । একটু যখন শিহরন কমলো, ধীরে-ধীরে সে জানলার শার্শি খুলে দিলে । চিরে, ফেটে চুরমার হ'য়ে গেছে যেন মেঘ, আর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে আশপাশের বাড়ির ছাতে । জানলা দিয়ে ঝুঁকে সে খড়খড়িটা টেনে দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন ভয় ক'রে উঠলো, কেমন যেন একটা ছমছমে ভাব ।

মনে হ'লো বৃষ্টি আর নদীর জলে একাকার হ'য়ে গেছে চারদিক, যেন প্লাবন শুরু হ'য়ে গেছে হঠাৎ, জীর্ণ বাড়িটা বুঝি আস্ত ডুবে যাচ্ছে জলে । নড়বোড়ে কাঠ আর পাটাতন কাতর আর্তনাদ ক'রে উঠছে বারে-বারে । ভয় পেয়ে সে তার ঘর ছেড়েই বুঝি পালাতো, কিন্তু এমন সময় হঠাৎ জাকারিয়ুসের শোবার ঘরে সে আলোর রেশ দেখতে পেলে । কোনো-কোনো সময় আদিম দেবতাদের গর্জন আমাদের কানে পৌঁছোয় না, বরং তার চেয়ে অনেক মৃদু ও অস্ফুট শব্দ ঝড়ের মধ্যে অতিকায় হ'য়ে ওঠে । হঠাৎ যেন কোনো অস্ফুট বিলাপের ধ্বনি তার কানে এসে পৌঁছুলো । জানলাটা বন্ধ করার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু পারলো না। ঝোড়ো হাওয়ায় যেন বারে-বারে ঠেলে দিচ্ছে তাকে, লুকিয়ে বাড়িতে ঢোকবার সময় চোরকে যেভাবে বাড়ির দরজা-জানলা ঠেলে ফেলে দিতে চায় ।

মনে হ'লো আতঙ্কে সে বুঝি পাগল হ'য়ে যাবে । এত রাতে কী করছেন তার বাবা ? দরজা খুললো সে, কিন্তু কবাটটা তার হাত থেকে স'রে গেলো । ঝোড়ো হাওয়া তাকে ভীষণ জোরে ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেললো দেয়ালে । অন্ধকার খাবার ঘরে এসে দাঁড়ালো জেরাঁদ, তারপর কোনোরকমে পা টিপে-টিপে অর্ধমূর্ছিত ও বিবর্ণর মতো বাবার কারখানার দিকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো ।

নদীর গর্জনে আর চীৎকারে আস্ত ঘরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে আর তার মাঝখানে সোজা দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা । কেমন এক জ্যান্ত বিভীষিকার মতো তাঁর শাদা চুল উড়ছে ঝোড়ো হাওয়ায় ; হাত-পা নেড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো কথা বলছেন তিনি—যেন তাঁর চোখ-কান নিঃসাড় হ'য়ে গেছে, কিছুই শুনছেন না বা দেখতে পাচ্ছেন না । জেরাঁদ স্তব্ধ হ'য়ে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো ।

'মৃত্যু !' ফাঁকা গলায় বলছেন জাকারিয়ুস, জেরাঁদ শুনতে পেলো । 'মৃত্যু ছাড়া আর-কিছুই না । নিজের অস্তিত্বটাকেই যখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছি তখন আর বেঁচে থাকবোই বা কেন ? আমি, মাস্টার জাকারিয়ুস, আমিই তো আমার সব ঘড়িগুলোর স্রষ্টা ! রুপো, লোহা আর সোনার ওই সব ঘড়ির মধ্যে আমারই প্রাণ তো আমি টুকরো-টুকরো ক'রে বিলিয়ে দিয়েছি—আমার আত্মাকেই দিয়েছি আমি ওদের । একটা ক'রে ওই অভিশপ্ত

ঘড়িগুলো থেমে যায় আর মনে হয় বুকের একটা অংশ যেন ছিঁড়ে গেলো, যেন স্পন্দন থেমে যাবে—কারণ আমারই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন তো আমি ভ'রে দিয়েছি ওদের মধ্যে !'

অদ্ভুত এই কথাগুলি বলতে-বলতে বৃদ্ধ বারে-বারে তাঁর বেঞ্চির দিকে তাকাচ্ছেন। খোলামেলা ঘড়ির টুকরো-টুকরো কলকব্জা ছড়িয়ে আছে বেঞ্চিতে, সারাবার জন্য তিনিই খুলেছেন এই ঘড়িগুলি। স্প্রিংজড়ানো একটা ফাঁপা নল তিনি তুলে নিলেন হাতে ; তারপর শাঁখের পাকের মতো প্যাঁচানো ইস্পাতের ইস্ক্রুপ খুললেন তিনি ; স্থিতিস্থাপকতার নিয়ম অনুযায়ী স্প্রিংটা ছড়িয়ে পড়লো না, বরং কোনো ঘুমন্ত গোখরোর মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে রইলো স্তব্ধ ও নিঃসাড় ; গ্রস্থিল মনে হ'লো এই স্প্রিংকে, মৃত ও শৃঙ্খলিত যেন —যেন কোনো অক্ষম ও অশক্ত বৃদ্ধ যার রক্ত অনেক দিন আগেই ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছে। রোগা লম্বা আঙুলগুলি দিয়ে জাকারিয়ুস মিথ্যেই স্প্রিংটাকে ছাড়াতে চাইলেন আর দেয়ালে তাঁর এই ব্যর্থ ধস্তাধস্তির ছায়া অতিকায় হ'য়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু ব্যর্থ, ব্যর্থ সব চেষ্টা। রোষে আর যন্ত্রণায় হঠাৎ তীব্র চীৎকার ক'রে উঠে তিনি ক্ষুধিত ও টগবগে রোন নদীর বুকে স্প্রিংটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

জেরাঁদের পা দুটি যেন মেঝেয় হঠাৎ আটকে গেছে—নিশ্চল সে দাঁড়িয়ে রইলো রুদ্ধশ্বাসে। বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চাইলো সে, কিন্তু পারলো না। মাথা ঘুরছে তার, অতিকায় সব দুঃস্বপ্ন যেন হানা দিচ্ছে তার মাথায়। হঠাৎ যেন ছায়ার মধ্যে থেকে কে তার তার কানে ফিশফিশ ক'রে ব'লে উঠলো, 'জেরাঁদ ! তুমি ! এখনো জেগে আছো? তোমার ঘরে যাও, লক্ষ্মীটি। কনকনে ঠাণ্ডা পড়ছে আজ।'

'ওবের !' জেরাঁদ ফিশফিশ ক'রে উঠলো, 'তুমি !'

'তোমার কষ্ট কি আমাকেও কষ্ট দেয় না ?'

হঠাৎ এই মৃদু কথাগুলি যেন জেরাঁদের বুকে রক্ত ফিরিয়ে দিলো। ওবেরের কাঁধে ভর দিয়ে সে বললে, 'বাবার নিশ্চয়ই ভয়ংকর কোনো অসুখ করেছে, ওবের। কেবল তুমিই তাঁকে সারাতে পারো, কারণ মেয়ের সান্ত্বনায় তাঁর এই মানসিক বিশৃঙ্খলা মোটেই কমবে না। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই লোকের ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হ'য়ে পড়েছেন তিনি—তাঁর সঙ্গে কাজ করতে-করতে, নষ্ট ঘড়িগুলি সারাতে-সারাতে, তুমিই শুধু তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনতে পারো। ওবের, নিশ্চয়ই তাঁর কথা সত্যি নয় ? নিশ্চয়ই ওই ঘড়িগুলির মধ্যে নিজের প্রাণ তিনি পুরে দেননি ?'

ওবের কোনো কথা বললে না।

'বাবার কাজ কি তবে ভগবানের চোখে দোষী ?' জেরাঁদ ভয়ে কেঁপে উঠলো।

'জানি না, জেরাঁদ।' তার ঠাণ্ডা হাত দুটি নিজের হাতে ঘ'ষে গরম করতে-করতে বললো ওবের, 'জানি না। কিন্তু তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও, লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমুলে পরে আশা ফিরে পাবে।'

আস্তে-আস্তে নিজের ঘরে ফিরে এলো জেরাঁদ, সকাল পর্যন্ত সেখানেই সে ব'সে রইলো একা ও অতন্দ্র, একবারও চোখের পাতা বুজলো না তার। আর মাস্টার জাকারিয়ুস সারাক্ষণ নিশ্চল ও স্তব্ধভাবে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কেমন ক'রে তাঁর পায়ের তলায় চঞ্চল, ক্ষুব্ধ, রুষ্ট রোন নদী অবিশ্রাম বেগে দিগন্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

২

বিজ্ঞানের দম্ভ

ব্যাবসার বিষয়ে জেনিভার বণিকদের কঠোরতা প্রায় প্রবাদবচনে পরিণত হয়েছে । বিপুল তাদের সম্মানবোধ, অতিরিক্ত তাদের সততা, আর মর্যাদার বিষয়ে তারা অত্যন্ত কঠোর । ফলে বিপুল ধৈর্য ও যত্ন সহকারে যে-ঘড়িগুলি বানিয়েছিলেন, সবখান থেকেই সেগুলো যখন ফিরে আসতে লাগলো, তখন লজ্জা ও ধিক্কারে মাস্টার জাকারিয়ুস যে কী পরিমাণ সংকুচিত হ'য়ে পড়লেন, তা সহজেই আন্দাজ করা যায় ।

ঘড়িগুলো যে অকারণেই আচমকা বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । অকারণে, কেননা ঘড়ির ভিতরকার চাকা ভালোই আছে, কোথাও ঢিলে বা আলগা হ'য়ে যায়নি, কাঁটাগুলোও ঠিক আছে ; কিন্তু স্প্রিংয়ের স্থিতিস্থাপকতা আর একটুও নেই । দুর্জ্ঞেয় এই বিফলতা তাঁর মান ও মর্যাদাকে গভীরভাবে ক্ষুণ্ন ও আহত করলো । আশ্চর্য-সব আবিষ্কারের জন্য বহুবারই লোকে তাঁকে 'কালো জাদু' বা ডাকিনী তন্ত্রের উপাসক ব'লে সন্দেহ করেছে—এবার সেই সন্দেহ যেন প্রমাণিত হ'য়ে গেলো । আর এইসব গুজব ও জনরব শেষকালে জেরাঁদেরও কানে পৌঁছুলো ; ভয়ে সে প্রায়ই তার বাবার কথা ভেবে শিউরে ওঠে—বিশেষ ক'রে যখন দ্যাখে যে লোকে দারুণ ক্রূরতাভরা চোখে তাঁকে তির্যকভাবে নিরীক্ষণ করছে, তখন তার বুকের রক্ত যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে ।

তবু এই তীব্র মনস্তাপের রাত্রিটি কেটে গিয়ে যখন সকাল হ'লো, মাস্টার জাকারিয়ুস কিঞ্চিৎ আস্থার সঙ্গে পুনর্বার তাঁর কাজে মন দিলেন । সকাল বেলার সূর্য যেন তাঁকে নতুন সাহস ও প্রেরণা দিলে । ওবের তাড়াতাড়ি গিয়ে কারখানাঘরে ঢুকলো ; জাকারিয়ুস অত্যন্ত শিষ্ট ও অমায়িকভাবে তাকে 'সুপ্রভাত' জানালেন ।

'আগের চেয়ে বেশ ভালো বোধ করছি,' বৃদ্ধ বললেন, 'কাল যে কী একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছিলো মাথার মধ্যে কে জানে । কিন্তু সকালের আলোই যেন রাতের মেঘের সঙ্গে-সঙ্গে তাকেও দূর ক'রে দিয়েছে ।'

'সত্যি-বলতে,' ওবের বললে, 'আমাদের দু-জনের কারু পক্ষেই রাতটা ঠিক সহ্য হয় না ।'

'তুমি ঠিকই বলেছো, ওবের । কোনোদিন যদি বড়ো হ'য়ে ওঠো তো বুঝতে পারবে যে, দিন যেন তোমার কাছে খাদ্যের মতো জরুরি । যাঁরা জ্ঞানীগুণী ও মস্ত মানুষ, তাঁদের সবসময়েই সহযোগীদের প্রশংসা ও প্রশস্তির জন্য তৈরি থাকতে হয় ।'

'মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় আপনাকে বুঝি বিজ্ঞানের দম্ভ পেয়ে বসেছে ।'

'দম্ভ, ওবের ! দম্ভ ? অতীত ধ্বংস করে ফ্যালো আমার, কেড়ে নাও আমার বর্তমান, ভবিষ্যৎকে একেবারে টুকরো-টুকরো ক'রে ফ্যালো—আর একমাত্র তবেই আমি লোকচক্ষুর আড়ালে ও অজ্ঞাতসারে বাঁচতে পারবো । বেচারা, আমার এই শিল্প যে কোন মহান অসীমকে স্পর্শ করেছে, তা কি তুমি বুঝতে পারো না ? এমনকী তুমিও কি আমারই হাতের নিছক

একটা যন্ত্র মাত্র নও ?'

'তবু,' ওবের অত্যন্ত বিনীতভাবে তার গুরুদেবকে বললে, 'আপনিই তো আমাকে আপনার ঘড়ির অতি সূক্ষ্ম কলকব্জাগুলি জুড়ে দেবার জন্যে একাধিকবার প্রশংসা করেছেন। আমি কি তার যোগ্য নই ?'

'সে-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, ওবের। তুমি একজন ভালো কারিগর, এটা সত্যি, আর এই জন্যই তোমাকে আমি স্নেহ করি। কিন্তু কাজ করার সময় তুমি তো এটাই ভাবো যে তোমার হাতে বুঝি সোনা, রুপো বা তামাই রয়েছে কয়েক টুকরো। তুমি তো এটা কল্পনাও করতে পারো না যে এই ধাতুগুলো আমার মনীষা ও মেধার কাছ থেকে প্রাণ পেয়ে রক্তমাংসের জীবের মতো স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। ফলে তোমার তৈরি-করা কোনোকিছু বিকল হ'য়ে গেলে তো আর তুমি ম'রে যাবে না—কিন্তু আমি যাবো।'

কথাগুলি ব'লেই জাকারিয়ুস কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, কিন্তু ওবের তবু কথাবার্তা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

'সত্যি ?' সে বললে, 'আপনার কাজ অফুরানভাবে দেখেও আমার আশ মেটে না। পরিষদের উৎসবের জন্য আপনাকে কিন্তু তৈরি থাকতে হবে—কারণ আমি জানি কেলাস-ঘড়ি নিয়ে আপনি যে-গবেষণা করেছেন, তা অমর হ'য়ে থাকবে।'

'সে-বিষয়ে আমারও কোনো সন্দেহ নেই, ওবের,' বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা ঈষৎ উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। 'আমি যে কেলাসকে কেটে হিরের মতো স্থায়িত্ব ও আকার দিতে পারি, এটা মোটেই কম সম্মানের বিষয় নয়। আহ্, হিরে-কাটার বিদ্যেকে নিখুঁত ক'রে লুই বেরক্ঁেম মহদুপকার ক'রে গেছেন আমাদের—সেই জন্যেই তো আমি সবচেয়ে কঠিন পাথরকেও ঘ'ষে-মেজে এমন মসৃণ আর চকচকে ক'রে তুলতে পেরেছি, তাঁরই জন্যে তাতে ছিদ্র করা সম্ভব হয়েছে আমার পক্ষে।'

কেলাস কেটে তৈরি-করা কতকগুলি সূক্ষ্ম কলকব্জা তুলে দেখালেন জাকারিয়ুস—প্রতিটি কাজই তাঁর দক্ষতার চরম পরাকাষ্ঠার নজির। ঘড়ির চাকা, কীলক, আধার—সবকিছুই কেলাস কেটে বানিয়েছেন তিনি, আর এই অতি কঠিন কাজেই তাঁর অসীম দক্ষতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

জাকারিয়ুসের মুখ আরক্তিম হ'য়ে উঠলো। 'এই স্বচ্ছ আধারের ভিতরে ঘড়িটা স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে, তার হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকি শোনা যাচ্ছে—এটা কি আশ্চর্য লাগে না তোমার ?'

'বছরে এই ঘড়ির যে এক সেকেণ্ডও এদিক-ওদিক হবে না,' তরুণ শিক্ষানবিশটি বললে, 'তা আমি বাজি ধ'রে বলতে পারি।'

'তুমি যে বাজি জিতবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার নিজের মধ্যে যা-কিছু শুদ্ধ ও নিষ্পাপ, সব কি আমি এতে ভ'রে দিইনি ? আর আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কি কখনো এদিক-ওদিক হয় ? বলো, আমার হৃৎপিণ্ডের ধকধক কি কখনো হঠাৎ থেমে যায় ?'

গুরুর দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহস পেলো না ওবের।

'সত্যি ক'রে বলো আমাকে,' জাকারিয়ুসের গলা বিষণ্ণ হ'য়ে এলো, 'আমাকে কি

তোমার কখনো পাগল ব'লে মনে হয়নি ? আমাকে কি কখনো ভয়ংকর নির্বোধ ব'লে মনে হয়নি তোমার ? বলো, মনে হয়নি কি ? কন্যা জেরাদ আর তোমার চোখে মাঝেমাঝে আমি যেন চিরদণ্ডের ছাপ দেখতে পাই । ওহ্ !' আর্ত ও ব্যাথাতুর হ'য়ে এলো তাঁর কণ্ঠস্বর, 'জগতে যাদের সবচেয়ে ভালোবাসা যায়, তারা যদি কখনো ভুল বোঝে তো তার চেয়ে কষ্টের আর-কিছু নেই । কিন্তু, ওবের, আমি তোমাকে আজ বলছি যে আমি কোনো ভুল করিনি, এটা একদিন অত্যন্ত সফলভাবে প্রমাণ ক'রে দেবো ! না, না, মাথা নেড়ো না, তুমি স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে তখন । আমার কথায় গভীর অর্থ যেদিন বুঝতে পারবে, সেদিন আমাকেও তুমি সত্যি-সত্যি বুঝতে পারবে । সেদিন দেখবে যে আমি অস্তিত্বের মূল রহস্য বের ক'রে ফেলেছি । সেদিন দেখবে যে প্রাণ কাকে বলে, তা আমি জেনে ফেলেছি, জেনে ফেলেছি কোন জটিল রহস্যের মধ্যে দেহ আর আত্মার অভেদ মিলন রচনা হ'য়ে যায়।'

এ-কথা বলতে-বলতে গর্বে ও অহমিকায় জাকারিয়ুস যেন রাজার মতো উন্নত হ'য়ে উঠলেন । কোনো-এক অতিপ্রাকৃত আগুন জ্ব'লে উঠলো যেন তাঁর চোখে, তাঁর সর্বাঙ্গ দম্ভে দীপ্ত হ'য়ে উঠলো । আর, সত্যি, যে দম্ভকে ক্ষমা করা যায়, জাকারিয়ুসের এই দম্ভ বোধহয় তাই ।

কারণ তাঁর শৈশবে ঘড়িনির্মাণবিদ্যা যেন আঁতুড় ঘরে ছিল । খ্রিষ্টযুগের চার শতাব্দী আগে প্লাতো বের করেছিলেন রাতের ঘড়ি, এই বিদ্যা তদবধি যেন প্রায় স্থবির হ'য়ে ছিলো । বাঁশির সুরে রাতের প্রহর ঘোষণা করতো, প্লাতোর তৈরি-করা এই ঘড়ি ছিলো অনেকটা 'ক্লেপসিড্রা'র মতো । ওস্তাদ কারিগরেরা তার যান্ত্রিক দিকের চেয়ে শিল্পিতার দিকে বেশি নজর দিতেন, ফলে সে-যুগে যেন কে কত সুন্দর ঘড়ি বানাতে পারে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিলো : লোহায়, তামায়, কাঠে বা রুপোয় কারুকাজ করা হ'তো এইসব ঘড়ি —চেল্লিনির কলসের মতো সুন্দর শিল্পকর্ম যেন । উৎকিরণ বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রচিত হয়েছিলো এ-যুগে : সময় যদিও ঠিকমতো দিতো না, তবু তারা যে কতটা উৎকৃষ্ট ছিলো, সেটা মোটেই অবহেলা অমান্য করার মতো নয় । শিল্পীর কল্পনা কলকব্জার চেয়েও বেশি নিবদ্ধ ছিলো বহির্বিভাগে : আধার ও আবরণ কত সুন্দর করা যেতে পারে, দৃষ্টি ছিলো সেই দিকে, সচল পুতুলে আর গানের সুরে ঘড়িগুলি যেন দামি খেলনা হ'য়ে উঠেছিলো । তাছাড়া, সেই সুদূর অতীতে কে-ই বা সময়ের নিখুঁত পরিমাপ নিয়ে মাথা ঘামাতো ? ঘড়ি কেন হঠাৎ আস্তে চলতে শুরু করে, তার কারণ তখনও আবিষ্কৃত হয়নি ; জ্যোতির্বিদ্যার অনুগণনা তখনও নিক্তিমাপা সংহিতার বশবর্তী হ'য়ে ওঠেনি, পদার্থবিদ্যায় নির্ভুল গণনার ভিত্তি রচিত হয়নি তখনও ; নির্দিষ্ট সময়ে দোকান-পশার খোলা বা বন্ধ করার তাগিদ ছিলো না তখন ; ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় তখন ট্রেন ছাড়তো না । সন্ধেবেলায় ঝমঝম ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠতো তখন—আর বিশ্বজোড়া স্তব্ধতার মধ্যে প্রহর ঘোষণা করা হ'তো চীৎকার ক'রে । যদি কাজের পরিমাণের উপর পরমায়ুর পরিমাপ নির্ভর করে, তাহ'লে—বলতে হয়—লোকে তখন এত দীর্ঘজীবী ছিলো না—কিন্তু তারা আরো ভালোভাবে বেঁচে থাকতে জানতো । এই বিশ্বসৃষ্টির পরম রহস্য ধ্যান ক'রে হৃদয় তখন সমৃদ্ধ হ'তো । দুশো বছর লাগতো তাদের একটি গির্জে বা মঠ বানাতে ; কোনো শিল্পী সারা জীবনে কেবল গোটাকয়েক ছবি আঁকতেন ; কবি লিখতেন

একটি মাত্র মহাকাব্য : কিন্তু তবু উত্তরকাল সেই সরল অতীতের কাছ থেকে কত আশ্চর্য রচনা পেলো।

অবশেষে যখন যথাযথ ও নির্ভুল বিজ্ঞানের অগ্রগতি শুরু হ'লো, ঘড়িনির্মাণবিদ্যাও ক্রমশ উন্নতিলাভ করতে লাগলো। কিন্তু তবু সেই দুরতিক্রম্য বাধা থেকে গেলো বিরাট প্রাচীরের মতো : সময়ের অবিরাম ও নিয়মিত পরিমাপ নেয়া তখনও সাধ্যাতিরিক্তই থেকে গেলো।

এই বন্ধ্যা ভূমিতেই জাকারিয়ুস ঘড়ির এমন-একটি গতি-নিয়ন্ত্রক আবিষ্কার করেছিলেন, দোলকের অন্তর্লীন বলের উপর নির্ভর করতো ব'লে ঘড়িকে যা এক গাণিতিক অবিচ্যুতি দিয়েছিলো। এই আবিষ্কারই জাকারিয়ুসের সর্বনাশ করলো : তাঁর মাথা ঘুরে গেলো। তাপমান যন্ত্রে যেমন পারদ ফুলে ওঠে, তেমনি তাঁর বুকে স্ফীত হ'য়ে উঠলো অমেয় দম্ভ—একেবারে যেন শেষ সীমায় পৌঁছুলো পারদ, এবার যন্ত্র ফেটে বেরিয়ে আসবে। উপমার সাহায্যে নিজেকে তিনি অচিৎ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে দিয়েছেন : আর তাই ঘড়ি বানাতে-বানাতে একদিন তাঁর মনে হ'য়ে গেলো তিনি বুঝি দেহ ও আত্মার মিলনের মূল রহস্যটি ভেদ করেছেন।

কাজেই ওবেরকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনতে দেখে অতি সহজেই তিনি তাঁর নিজের ধ্যান-ধারণা খুলে বললেন :

'তুমি জানো প্রাণ কাকে বলে ? যে-সব স্প্রিং-এর জন্যে জীব বেঁচে থাকে তাদের রহস্য তুমি কখনো ভেবে দেখেছো ? নিজেকে পরীক্ষা ক'রে দেখছো কোনোদিন ? না। অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে তুমি সহজেই আমার কাজ আর ভগবানের কাজের মাঝখানে গভীর মিল খুঁজে পেতে ; কারণ তাঁর প্রাণীদের দেখেই ঘড়ির চাকা বানাবার কৌশল শিখেছি আমি।'

উৎসুকভাবে ওবের ব'লে উঠলো, 'ভগবানের নিশ্বাসকেই তো আত্মা বলি আমরা —হাওয়া যেমন ক'রে ফুলকে কাঁপিয়ে যায় তাঁর নিশ্বাসও তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার ক'রে দেয়—আর তার সঙ্গে কিনা আপনি কতগুলো লোহা আর তামার কলকব্জার তুলনা করছেন ? প্রাণের চেয়ে রহস্যময় অথচ নির্ভুল ও প্রেরণাদীপ্ত কোন যন্ত্রবিদ্যা ?'

'প্রশ্ন সেটা নয়,' অত্যন্ত নরম স্বরে বললেন বটে জাকারিয়ুস, কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে খাদের-দিকে-এগিয়ে-যাওয়া অন্ধের প্রবল জেদ ফুটে উঠলো। 'আমাকে বুঝতে হ'লে, আমার আবিষ্কার-করা সেই সময়-নিয়ন্ত্রক দোলকটির উদ্দেশ্য ও অর্থ মনে রাখতে হবে। যে-সব ঘড়ি ঠিকমতো চলে না, তাদের দেখেই এটা আমি বুঝতে পারি যে যে-গতি তাদের মধ্যে বন্দী হ'য়ে আছে তা ঠিক যথেষ্ট নয়—কোনো স্বাধীন বলের দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন না-করলে সেই গতি কোনো কাজেই লাগবে না। সমতা রাখার জন্যে কোনো চাকা যদি থাকে তাহ'লেই হয়তো এটা সম্ভব হবে—একদিন আমার মনে হ'লো, এবং অবশেষে ওই গতিকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলুম, আমার স্বপ্ন সফল হ'লো। আমার এই চিন্তাটাকে মহান ঠেকে না তোমার ? ঐশ্বরিক ব'লে মনে হয় না কি আমার এই চিন্তাকে, যার বলে আমি বুঝেছিলুম যে কোনোরকমে ঘড়ির মধ্যেই যদি সেই হারিয়ে-যাওয়া গতিকে ফিরিয়ে আনা যায় তাহ'লেই সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে যাবে ?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো ওবের।

ক্রমশ উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন জাকারিয়ুস। 'ওবের, একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। তুমি কি বুঝতে পারছো না যে আমাদের মধ্যে যুগপৎ দুটি শক্তি কাজ ক'রে যাচ্ছে—দেহের শক্তি, আর আত্মার—গতি আর তার নিয়ন্ত্রণ। আত্মাই প্রাণের মূল—অর্থাৎ আত্মাই হ'লো গতি, আন্দোলনের উৎস, আলোড়নের আকর। কী থেকে তার সৃষ্টি হয়? কোনো ভাব থেকে? না কি কোনো স্প্রিং বা কোনো নির্জড় প্রভাব থেকে? তা জানি না, কিন্তু এটা জানি যে হৃৎপিণ্ড হ'লো সেই জিনিশ। কিন্তু দেহ না-থাকলে এই আন্দোলন অসমান হ'য়ে পড়তো, হ'য়ে পড়তো অনিয়মিত ও অসম্ভব। কাজেই দেহই এই আত্মাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—দেহই হ'লো সমতা রক্ষার সেই চাকা, আত্মা যার নিয়মিত দোলনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর এটা যে কত সত্যি, তার প্রমাণই তো এইখানে যে,খাদ্য পানীয় বা নিদ্রা না-হ'লে—অর্থাৎ দেহের ক্রিয়া নিয়মিত সংঘটিত না-হ'লে—মানুষ অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। দোলনের ফলে যে-গতিটুকু হারিয়ে যায় তা ঠিক যেমনভাবে আবার দেহাকে জুগিয়ে দেয় আত্মা, আমার ঘড়িতে আশ্চর্য এই গতিনিয়ন্ত্রকটি তা-ই করে। আর কীসের মধ্যে তাহ'লে দেহ ও মনের মিলনের রহস্য লুকিয়ে আছে? একটি চাকা ঘুরে চলে ব'লেই অন্য চাকাটি চলতে পারে। এটাই আমার আবিষ্কার, আর আমি তা হাতে-কলমে খাটিয়েছি আমার কাজের মধ্যে। প্রাণের আর-কোনো রহস্যই অজানা নেই আমার—প্রাণ যে আসলে আশ্চর্য নিখুঁত একটি কল, তা আমি জেনে গেছি।'

মতিভ্রম, সন্দেহ নেই; কিন্তু তবু জাকারিয়ুস যেন সম্ভ্রম জাগান, কেননা এই বিভ্রমই তাঁকে অসীমের চরম রহস্যের মধ্যে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তাঁর কন্যা জেরাঁদ চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনতে পেলো। ছুটে এসে সে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো—আর তার দেহটি যেন কান্নার তোড়ে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো।

'তোর আবার কী হ'লো?' কন্যাকে জিগেস করলেন জাকারিয়ুস।

'এখানে যদি কেবল একটা স্প্রিং থাকতো,' বুকে হাত চেপে সে বললে, 'তাহ'লে কি তোমাকে এত ভালোবাসতে পারতুম, বাবা?'

নিবিষ্টভাবে জেরাঁদকে নিরীক্ষণ করলেন জাকারিয়ুস, কোনো জবাব দিলেন না। তারপরেই হঠাৎ বুকে হাত চেপে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন তিনি, আর মূর্ছিত হ'য়ে তাঁর পুরোনো চেয়ারটিতে প'ড়ে গেলেন।

'কী হ'লো তোমার, বাবা?'

'শিগগির!' ওবের চীৎকার ক'রে ডাকলো, 'স্কলাস্টিকা!'

স্কলাস্টিকা কিন্তু তক্ষুনি এলো না। সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছিলো তখন—সে গিয়েছিলো দরজা খুলে দেখতে। সে যখন কারখানা-ঘরে এসে ঢুকলো, বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা ততক্ষণে চেতনা ফিরে পেয়েছেন। তাকে ঢুকতে দেখে সে কোনো কথা বলার আগেই জাকারিয়ুস বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি আরেকটা নষ্ট ঘড়ি নিয়ে এসেছো? স্কলাস্টিকা, অভিশপ্ত ঘড়িটা হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেছে, তাই না?'

'কী আশ্চর্য। আপনি তা জানলেন কী ক'রে?' ওবেরের হাতে স্কলাস্টিকা একটি বিকল ঘড়ি তুলে দিলে।

'আমার হৃৎপিণ্ড কখনো ভুল করে না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন জাকারিয়ুস।

অত্যন্ত যত্নসহকারে চাবি ঘুরিয়ে দম দিলো ওবের—কিন্তু তবু সে-ঘড়ি কিছুতেই আর চলবে না।

৩

অদ্ভুত আগন্তুক

বেচারি জেরাঁদ—যদি-না ওবেরের কথা তার মনে জেগে থাকতো—হয়তো পিতার সঙ্গেই তার প্রাণ হারাতো ; ওবেরই এখন তার বেঁচে-থাকার একমাত্র আকর্ষণ।

বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা, ধীরে-ধীরে, নির্জীব ও নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছেন। যতই তিনি কেবল একটি বিষয়েই মনঃসংযোগ করছেন, ততই তাঁর ক্ষমতা যেন আরো দুর্বল হ'য়ে আসছে। স্মৃতির বিষণ্ন অনুষঙ্গ-বশত সবকিছুই কেমন ক'রে যেন তাঁর অদ্ভুত বাতিকটির সঙ্গে জড়িয়ে যায় ; মনে হয় ক্রমেই যেন মানবিক অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছেন তিনি, আর তার বদলে যেন কোনো পরাবাস্তব শক্তি জেগে উঠেছে তাঁর মধ্যে, যেন কোনো অতিপ্রাকৃত জগতে বেঁচে আছেন তিনি এখন। উপরন্তু, কয়েকজন অসূয়াপরায়ণ ও মৎসর প্রতিদ্বন্দ্বীর চেষ্টায় তাঁর পরিশ্রম ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আবার সেই পুরোনো জনরবটা জেগে উঠলো।

তাঁর ঘড়িগুলি হঠাৎ একযোগে বিকল হ'য়ে যাচ্ছে, এই খবর জেনিভার সেরা কারিগরদের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। ঘড়ির চাকাগুলো হঠাৎ এ-রকমভাবে অসাড় হ'য়ে যাচ্ছে কেন ? বৃদ্ধ জাকারিয়ুসের প্রাণের সঙ্গে তাদের যেন গভীর এক সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধটা আসলে কী ? এগুলো এমন-সব রহস্য যে এ-সম্বন্ধে চিন্তা করতে গেলেই কেমন একটা গোপন আতঙ্কে সর্বাঙ্গ শিরশির ক'রে ওঠে। শহরের নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে—তা সে তরুণ শিক্ষার্থী বা প্রাচীন ঘড়িনির্মাতাদের ঘড়ি-ব্যবহারকারী কোনো মস্ত ভূস্বামী, যেই হোন না কেন—সকলেই এই অদ্ভুত ও অসাধারণ তথ্যটি লক্ষ না-ক'রে পারলো না। মাস্টার জাকারিয়ুসের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জেগে উঠলো চারদিকে—কিন্তু লোকের এই আশা সফল হ'লো না। ভয়ানক অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন জাকারিয়ুস ; আর সেই জন্যেই রোজ এই যে অবাঞ্ছিত লোকেরা অবিশ্রান্ত এসে শাসায়, তিরস্কার করে, ভয় দেখায়, তাদের হাত থেকে বাবাকে রক্ষা করতে পারলো জেরাঁদ।

এই জৈব অপলাপ ও ক্ষয়ের বিরুদ্ধে চিকিৎসক আর ওষুধপত্র সমানভাবে অক্ষম ও অসহায় হ'য়ে পড়লো। এই ক্ষয়ের কোনো কারণই কেউ বের করতে পারলো না ; মাঝে-মাঝে মনে হয় এই বৃদ্ধের হৃৎপিণ্ড যেন আর ধুকধুক্ করে না, হঠাৎ-হঠাৎ তা যেন বন্ধ হ'য়ে যেতে চায় ; আর তারপরেই আবার এক বিষম ও ভয়ংকর বেগে সেই নিশ্চল হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া শুরু হ'য়ে যায়।

শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের রচনা জনসমক্ষে প্রদর্শন করার রীতি ছিলো তখনকার দিনে। কাজের নতুনত্ব বা নৈপুণ্য দেখিয়ে বহু প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে

চাইতেন; জাকারিয়ুসের এই অবস্থা কেবল তাঁদের মধ্যেই উজ্জীবন্ত সমবেদনা ও সহানুভূতির উদ্রেক করলো—কেননা তাঁর সম্বন্ধে তাঁরাই সবচেয়ে উৎসুক ও আগ্রহী ছিলেন। এবার আর তাঁকে কোনো ভয় নেই ব'লেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের এত অনুকম্পা। এই বৃদ্ধের সাফল্য ও বিজয়ের কাহিনী তাঁরা কোনোদিনই ভোলেননি। তাঁরা কি জানেন না যখন তিনি তাঁর চমৎকার ঘড়িগুলি প্রদর্শনীতে পাঠাতেন, তখন সচলমূর্তিবসানো, গানের মতো বেজে-ওঠা সেই ঘড়িগুলি লোকের মধ্যে কী পরিমাণ সম্ভ্রম, ভালোবাসা ও প্রশংসার উদ্রেক করতো? ফরাশি দেশ, আলেমান ভূখণ্ড, সুইৎজারলাণ্ড—সবত্রই কী চড়া দামে বিকোতো সেই ঘড়িগুলি, তা কি তাঁরা কোনোদিনও ভুলতে পারবেন?

এদিকে জেরাঁদ আর ওবেরের অবিরাম মমতা ও সেবায় জাকারিয়ুসের হৃত শক্তি একটু-একটু ক'রে ফিরে আসতে লাগলো। তাঁর এই রোগ ও বিক্ষোভ তাঁকে অনেকটা শান্ত ক'রে তুলেছে; যে-চিন্তা এতকাল তাঁকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে বসেছিলো, এখন তা থেকে নিজেকে তিনি সরিয়ে আনতে পারেন। হাঁটার ক্ষমতা যেই ফিরে পেলেন, অমনি তাঁর কন্যা তাঁকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি থেকে বের ক'রে নিয়ে এলো—কেননা এখনো বিরক্ত ও অতৃপ্ত ক্রেতাদের আক্রমণে বাড়িটা সবসময় ভ'রে থাকে। ওবের অবশ্য কারখানায় ব'সে মনোযোগের সঙ্গে সেই বিদ্রোহী ঘড়িগুলোকে বশ মানাবার চেষ্টা করে সারাক্ষণ, নানাভাবে সে কলকজাগুলি জুড়ে দ্যাখে যদি কোথাও কোনো টিকটিক শব্দ জেগে ওঠে—কিন্তু তার সব চেষ্টাই বিফল হয়, মিথ্যেই সে এত পরিশ্রম করে এদের নিয়ে। ফলে শেষটায় বেচারি সম্পূর্ণ হতাশ ও স্তম্ভিত হ'য়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ব'সে থাকে, তবে মনে হয় সেও বুঝি জাকারিয়ুসের মতো পাগল হ'য়ে যাবে।

শহরের সবচেয়ে সুন্দর অঞ্চলগুলিতে বাবাকে নিয়ে বেড়ায় জেরাঁদ। কখনো সে তাঁর হাত ধ'রে-ধ'রে সাঁৎ-আঁতোয়ানের মঠের পাশ দিয়ে নিয়ে যায়, অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় এখান থেকে—হ্রদের গায়ে যেখানে কোলন পাহাড় উঠেছে, একেবারে সেই পর্যন্ত। সকালটি যেদিন জ্যোতির্ময় হ'য়ে দেখা দেয়, ব্যুয়েৎ পাহাড়ের চুড়ো জেগে ওঠে দিগন্তে। আঙুল তুলে-তুলে বাবাকে সব দেখায় জেরাঁদ—তাদের নামগুলো পর্যন্ত জাকারিয়ুস ভুলে গেছেন। তাঁর স্মৃতির ভিতরে যেন একের পর এক পরদা স'রে যায়, নতুন ক'রে সব নামগুলি জেনে নিতে কেমন একটা ছেলেমানুষি আমোদ ও আনন্দ পান তিনি। মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি তাকান দিগন্তের দিকে, আর একই সূর্যের আলো এসে পড়ে দুজনের মাথায়—একটি মাথায় এলোমেলো ওড়ে শুভ্র চুল আর অন্যটি সোনালি চুলের গুচ্ছে ভরা।

অবশেষে ধীরে-ধীরে সেই বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা বুঝলেন যে মোটেই একা নন তিনি জগতে। মাঝে-মাঝে তাঁর এই তরুণী ও রূপসী কন্যার দিকে তাকান তিনি, তারপর নিজের ভেঙে-পড়া জীর্ণ দেহটির দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবেন, তাঁর মৃত্যুর পর মেয়েটি একেবারে সহায়-সম্বলহীনা হ'য়ে পড়বে। জেনিভার তরুণ ঘড়িনির্মাতাদের মধ্যে অনেকেই জেরাঁদের প্রণয়-প্রার্থনা করেছিলো। কিন্তু জাকারিয়ুসের এই দুর্ভেদ্য গৃহে কেউই প্রবেশাধিকার পায়নি। কাজেই, স্বাভাবিকভাবেই, জাকারিয়ুসের উন্মত্ততায় যখন এই সাময়িক বিরতি নেমে এলো, তখন তিনি ওবের তুনকেই পাত্র নির্বাচন করলেন। একবার যেই এই চিন্তাটার উদয় হ'লো,

অমনি হঠাৎ যেন তিনি আবিষ্কার করলেন যে, এরা দুজনে যেন একজনের জন্যই আরেকজন জন্মেছে ; দুজনেরই মনের গড়ন একরকম, একই আস্থা ও বিশ্বাস দুজনের ; তাদের দুজনেরই হৃৎস্পন্দন যেন কোনো এক অনড় দোলকের বশবর্তী ব'লে মনে হ'লো তাঁর—অন্তত এই কথাই তিনি স্কলাস্টিকাকে একদিন বললেন ।

ঘড়ির সঙ্গে যে তুলনাটি তিনি দিয়েছিলেন, তা পুরোপুরি মাথায় না-ঢুকলেও বুড়ি স্কলাস্টিকা এ-কথা শুনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হ'য়ে পড়লো ; সাধু-সন্তদের নামে শপথ ক'রে সে বললে যে, সিকি ঘণ্টার মধ্যেই সমগ্র জেনিভার এ-কথা জেনে-যাওয়া উচিত । তাকে শান্ত করতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হ'লো জাকারিয়ুসকে ; কিন্তু অনেক চেষ্টার পর জাকারিয়ুস তার কাছে থেকে এই কথা আদায় করলেন যে, কিছুতেই সে এই কথা প্রচার করবে না—অবশ্য এই প্রতিশ্রুতি সে আদৌ কখনো রেখেছিলো ব'লে কেউ জানে না ।

কাজেই, জেরাঁদ আর ওবের তার বিন্দুবিসর্গও না-জানলেও আস্ত জেনিভা তাদের আশু বিবাহ সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগলো । কিন্তু লোকে যখন এই সম্বন্ধে গাল-গল্প করে, তখন নাকি মাঝে-মাঝে অদ্ভুত ধরনের এক খুকখুক হাসি শোনা যায়, আর কে নাকি এই কথা ব'লে ওঠে, 'জেরাঁদ কোনোদিনই ওই বরকে বিয়ে করবে না ।'

এই কথা শুনে লোকে ফিরে তাকিয়ে দ্যাখে বেঁটেখাটো এক অচেনা বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে ।

বুড়ো, কিন্তু বয়স কত লোকটার ? সে-কথা বলার ক্ষমতা কারুরই ছিলো না । সে বুঝি কয়েক শতাব্দী ধ'রে বেঁচে আছে—এ-কথাই শুধু মনে হ'তো লোকের । মস্ত একটি চ্যাপটামতো মাথা বসানো তার কাঁধে, আর কাঁধটি এতই চওড়া যে সারা দেহের দৈর্ঘ্যের প্রায় সমান ব'লে মনে হয়—এবং দৈর্ঘ্য তিন ফিটের বেশি হবে না । কোনো দোলক বা পেনডুলাম বসবার আধার হ'তে পারে তার দেহ—বলাই বাহুল্য, ঘড়ির ডায়াল হবে তার মুখমণ্ডল, আর সমতা-রক্ষক চাকাটি অনায়াসেই তার বুকের মধ্যে দুলতে থাকবে । নাকটা প্রায় সূর্য-ঘড়ির ধরনে তৈরি যেন, এমন সংকীর্ণ ও তীক্ষ্ণ ; দাঁতগুলো ফাঁক-ফাঁক হ'য়ে আছে, যেন দুই ঠোঁটের মাঝখানে চাকার দাঁত দেখা যাচ্ছে ও তার গলার স্বরের মধ্যে ঘণ্টার ধাতব ধ্বনি লুকিয়ে আছে যেন, আর কান পাতলে শোনা যাবে তার হৃৎপিণ্ডটি যেন ঘড়ির মতো টিকটিক ক'রে বাজছে । ডায়ালের মধ্যে কাঁটা যেমন ক'রে ঘোরে, তেমনিভাবে হাত নাড়ে সে । কীরকম ঝাঁকুনি দিয়ে চলে সে, একবারও পিছন ফিরে তাকায় না । কেউ যদি তার পিছু নিতো তো দেখতে পেতো ঘণ্টায় সে ঠিক এক লিগ পথ হাঁটে, আর তার রাস্তা গেছে প্রায় যেন বৃত্তের মতো গোল হ'য়ে ।

এই অদ্ভুত জীবটি খুব বেশিদিন ধ'রে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে না—বা, বলা যায়, খুব বেশিদিন হ'লো এই জীবটি অন্ধকার থেকে ছাড়া পায়নি ; কিন্তু এটা লক্ষ করা গেছে যে, প্রত্যেক দিন সূর্য যখন ঠিক মধ্যরেখা পেরিয়ে যায়, সাঁৎ-পিয়েরের গির্জের কাছে গিয়ে সে থেমে পড়ে, তারপর ঠিক বেলা বারোটার ঘণ্টা বেজে যাবার পর আবার সে চলতে শুরু করে । ঠিক এই মুহূর্তটি ছাড়া শহরের যাবতীয় আড্ডা ও গাল গল্পেরই সে অংশ যেন — বিশেষ ক'রে যেখানেই জাকারিয়ুস সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হচ্ছে, সেখানেই সে আছে; ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে লোকেরা পরস্পরকে জিগেস করতে লাগলো,

জাকারিয়ুসের সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে লোকটার। এটাও সবাই লক্ষ করেছিলো যে জাকারিয়ুস যখন তাঁর কন্যার সঙ্গে বেড়াতে বেরোন, তখন এই অদ্ভুত লোকটি যেন একদৃষ্টে সারাক্ষণ জাকারিয়ুসের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জেরাঁদ হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে যে এই অপদেবতাটি তার দিকে তাকিয়ে কদাকারভাবে মুচকি হাসছে। ভয় পেয়ে সে বাবাকে জড়িয়ে ধরলো।

'কী হ'লো তোর?' কন্যাকে জিগেস করলেন মাস্টার জাকারিয়ুস।

'জানি না, বাবা,' ভীতভাবে উত্তর দিলে জেরাঁদ।

'কিন্তু কি-রকম শুকনো দেখাচ্ছে তোকে—পাণ্ডুর ও কালিবর্ণ। এবার কি তোর অসুখ বাধিয়ে বসার পালা নাকি? বেশ, তাহ'লে,' বিষণ্ণভাবে একটু হাসলেন জাকারিয়ুস, 'আমিই তোর শুশ্রূষা করবো না-হয়, অত্যন্ত যত্ন ক'রেই সেবা করবো তোর।'

'না, বাবা, তা নয়। কী-রকম যেন ঠাণ্ডা লাগছে আমার—মনে হয়—'

'কী?'

'মনে হয় ওই লোকটাই এর কারণ। জানো বাবা, লোকটা সবসময়েই আমাদের পিছন-পিছন ঘোরে,' অত্যন্ত নিচু গলায় সে উত্তর দিলো।

জাকারিয়ুস পিছন ফিরে বেঁটে লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন।

'বাঃ, ঠিক চলেছে তো,' তাঁর গলার স্বরে তৃপ্তির ভাবই ফুটে উঠলো। 'কাঁটায়-কাঁটায় চারটে বাজছে এখন। ভয় পাসনি, জেরাঁদ। ও কোনো মানুষ নয়—আসলে মস্ত একটা ঘড়ি।'

স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো জেরাঁদ, আতঙ্কে বাবার মুখের দিকে তাকালো সে। এই অদ্ভুত জীবটির মুখে সময় দেখলেন তিনি কী ক'রে?

'হ্যাঁ, ভালো কথা,' জাকারিয়ুস এ-সম্বন্ধে মোটেই মাথা ঘামালেন না, 'ওবেরকে যে কয়েকদিন ধ'রে দেখছি না!'

'না, বাবা, ও আমাদের ছেড়ে যায়নি,' জেরাঁদের কণ্ঠস্বরে লজ্জা ও কোমলতা জেগে উঠলো।

'কী করছে তাহ'লে আজকাল?'

'কাজ করছে ব'সে-ব'সে।'

'আহ্!' জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও আমার ঘড়িগুলি সারাচ্ছে, তাই না? অন্তত সারাতে চেষ্টা করছে নিশ্চয়ই? কিন্তু ওগুলো ও সারাতে পারবে না কিছুতেই। কারণ ওদের তো আর মেরামত করলে চলবে না, একেবারে পুনর্জীবন দিতে হবে!'

মেয়ে কোনো কথা না-ব'লে চুপ ক'রে রইলো।

'আর-কতগুলো ঘড়ি ফিরে এসেছে, জানতে হবে,' জাকারিয়ুস যোগ করলেন, 'আহ্, যেন শয়তান নিজে এসে তাদের মধ্যে মহামারীর বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে।'

এই কথা ব'লে জাকারিয়ুস কি-রকম গম্ভীর আর স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। বাড়ি ফেরার পথে আর একটাও কথা বললেন না তিনি—বাড়ি ফিরে এসেই সোজা কারখানা-ঘরে চ'লে গেলেন—অসুখ থেকে ওঠবার পর এই প্রথম তিনি সে-ঘরে ঢুকলেন। আর তাঁর মেয়ে অত্যন্ত বিষণ্ণ হ'য়ে নিজের ঘরে চ'লে গেলো।

জাকারিয়ুস যেই তাঁর কারখানা-ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন, অমনি দেয়ালের একটা ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে পাঁচটা বেজে উঠলো। ঘড়িগুলো খুবই ঠিকভাবে চলতো এতকাল—সবগুলো ঘড়ি একসঙ্গে বেজে উঠতো, একতিলও এদিক-ওদিক হ'তো না, আর জাকারিয়ুসের মন গর্ব ও উল্লাসে ভ'রে যেতো। কিন্তু সেদিন একসঙ্গে না-বেজে পর-পর বাজলো ঘড়িগুলো, একটার পরে আরেকটা, ফলে প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে এই ঘণ্টাধ্বনি প্রায় যেন বধির ক'রে দিতে চাইলো তাঁকে। বিষম কষ্টে ব্যথায় জাকারিয়ুস যেন ছটফট ক'রে উঠলেন। হাতুড়ির বাড়ির মতো ঘণ্টাধ্বনি পড়ছে তাঁর গায়ে ; একটার পর একটা ঘড়ির কাছে গিয়ে হাত নাড়তে লাগলেন তিনি—কিন্তু নির্দেশ অমান্য ক'রে বাজনাগুলো ইচ্ছেমতো বেজে উঠলে, কোনো সংগীত পরিচালকের যে-রকম অবস্থা হয়, তাঁর দশাও যেন তেমনি হ'লো ; আর যেন এদের উপর তাঁর কোনোরকম কর্তৃত্বই নেই।

শেষ ঘণ্টার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই ঘরের দরজা আবার দুম ক'রে খুলে গেলো; সামনে সেই খর্বকায় বামনটিকে দেখে জাকারিয়ুসের আপাদ-মস্তক যেন শিউরে উঠলো। একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে সেই অদ্ভুত লোকটি বললে, 'মাস্টার জাকারিয়ুস, আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পারি ?'

'কে তুমি ? কে ?' জাকারিয়ুস হঠাৎ জিগেস ক'রে বসলেন।

'আপনারই একজন সহযোগী। সূর্যের গতিবিধি শাসন করাই আমার কাজ।'

'ওঃ, তুমি সূর্যকে শাসন করো ?' একটুও বিস্মিত না-হ'য়ে জাকারিয়ুস তাকে সাগ্রহে বললেন, 'তা, এই কাজের জন্যে তোমার তো বিশেষ প্রশংসা করতে পারবো না, বাপু। তোমার সূর্যের চলাফেরার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই—ফলে তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে কখনো আমরা ঘড়ির সময় খানিকটা এগিয়ে নিই, আবার কখনো-বা পেছিয়ে দিই।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, হুজুর!' ভীষণ লোকটি ব'লে উঠলো, 'আপনার ঘড়ি যেমন নিখুঁত সময়ে দ্বিপ্রহর ঘোষণা করে, আমার সূর্য সবসময় তা করে না। কিন্তু একদিন লোকে বুঝতে পারবে যে, পৃথিবীর আবর্তনের জন্যই এ-রকম হয়, এবং তখন একটি মধ্যক আবিষ্কার ক'রে লোকে এই অনিয়মের মধ্যে সমতা আনবে।'

'ততদিন পর্যন্ত কি আর আমি বেঁচে থাকবো ?' জাকারিয়ুসের চোখ কেমন চকচক্ ক'রে উঠলো।

'নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবেন!' আগন্তুকটি হেসে উঠলো, 'কেন ? কোনোদিন ম'রে যাবেন-এ-ভয় আপনার হচ্ছে নাকি আজকাল ?'

'হায়! সে-কথা আর কী বলবো! হঠাৎ আমি অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি।'

'সে-সম্বন্ধেই আমার কিছু বক্তব্য আছে। শয়তান জানে, আমি সেই জন্যেই এসেছি।' এই ব'লে অদ্ভুত আগন্তুকটি লাফিয়ে গিয়ে বসলো চামড়ার চেয়ারে। তারপর এমনভাবে পা তুলে আড়াআড়ি ভাঁজ ক'রে রইলো যে মনে হ'লো ঠিক যেন কোনো শিল্পীর আঁকা কোনো মড়ার খুলির তলায় কাটাকুটি ক'রে রাখা দুটি হাড়। তারপর বিদ্রুপের ভঙ্গিতে সে বললে, 'কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুস, তার আগে প্রথমটায় দেখে নিই এই জেনিভা নগরে কী ব্যাপার চলছে। লোকে বলাবলি করছে যে, আপনার স্বাস্থ্য নাকি ক্রমেই ভেঙে পড়ছে,

ফলে আপনার শরীরের ঘড়ি সরিয়ে তোলবার জন্য একজন ধন্বন্তরি নাকি জরুরি হ'য়ে উঠেছে !'

'এইসব ঘড়িগুলির সচলতা আর আমার প্রাণের মধ্যে কোনো গভীর যোগ আছে ব'লে মনে হয় না কি তোমার ?' মাস্টার জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে উঠলেন ।

'বাঃ রে ! আমার তো মনে হয় ঘড়িগুলোর দোষের শেষ নেই—মহা বদমাশ একেকটা । এই হতচ্ছাড়াগুলি যদি শৃঙ্খলা না-মানে, যা-খুশি তাই ক'রে তাহ'লে এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য যোগ্য প্রতিফল পাওয়া উচিত তাদের । মনে হয়, ইদানীং তাদের চরিত্রশোধনের বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে ।'

'উচ্ছৃঙ্খলতা কাকে বলো ?' তার ঠাট্টায় জাকারিয়ুস একেবারে আরক্তিম হ'য়ে উঠলেন । 'বংশমর্যাদার জন্য তারা গর্ব করতে পারে না কি?'

'তাই ব'লে এতটা দম্ভ ভালো নয় ।' আগন্তুকের উত্তর মুহূর্তে তৈরি : 'স্বীকার করি, ভুবনবন্দিত একটি নামের সঙ্গে তাদের সংযোগ আছে, তাদের আধারে এক বিরাট প্রতিভার স্বাক্ষর আছে, তাও মানি ; তাছাড়া জগতের সব অভিজাত পরিবারে আমন্ত্রিত হবার সুযোগ যে কেবল তাদেরই আছে, তাও অস্বীকার করার জো নেই । কিন্তু এটা তো ঠিক যে কিছুকাল হ'লো তারা বিকল হ'য়ে পড়ছে একে-একে, আর আপনি সে-সম্বন্ধে কিছুই করতে পারছেন না । জেনিভার সবচেয়ে হাবা কারিগরও এটা আপনার কাছে মুহূর্তে প্রমাণ ক'রে দিতে পারবে ।'

'আমি—মাস্টার জাকারিয়ুস—আমার —' রুষ্ট দম্ভে জাকারিয়ুস তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না ।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি—মাস্টার জাকারিয়ুস—এমনকী আপনিও হাজার চেষ্টা ক'রেও আপনার ঘড়িগুলিকে সারিয়ে তুলতে পারছেন না ।'

'বাঃ রে ! হঠাৎ আমার অসুখ ক'রে বসেছিলো ব'লেই তো তাদেরও অসুখ করলো,' জাকারিয়ুসের সর্বাঙ্গে ঠাণ্ডা ঘাম ছড়িয়ে পড়লো ।

'বাঃ, তাহ'লে তো ভালোই হ'লো : যেহেতু তাদের স্প্রিং-এ একচুলও স্থিতিস্থাপকতা আনতে পারছেন না, সেইজন্য আপনার সঙ্গে-সঙ্গে তাদেরও মরতে হবে ।'

'তাদেরও মরতে হবে ! মোটেই না, কারণ তুমি তো নিজেই বললে যে আমি কোনোদিনই মরবো না । আমি—জগতের এক নশ্বর ঘড়িনির্মাতা—মাস্টার জাকারিয়ুস—আমিই তো এইসব সূক্ষ্ম কলকব্জা আর নানা চাকার সাহায্যে অত্যন্ত নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে প্রতিটি ঘড়িকে নিয়ন্ত্রিত করেছি । আমি কি বন্দী ক'রে রাখিনি মহাকালকে—আমি কি রাজার মতো তাকে নিয়ে যা-খুশি তা-ই করতে পারি না ? এই ভ্রাম্যমাণ বিশৃঙ্খল মুহূর্তগুলিকে কোনো দিব্য প্রতিভা নিয়ন্ত্রিত করার আগে কি বিশাল অনিশ্চয়তাই মানবজাতির নিয়তি ছিলো না ? জীবনের একটি মুহূর্তের সঙ্গে আরেকটি মুহূর্তের কোনো যোগ-সূত্র ছিলো কি তখন ? কিন্তু তুমি—জানিনা তুমি কে, মানুষ না শয়তান—তুমি আমার এই বিরাট শিল্পের মহিমাকে একবারও তলিয়ে দেখলে না । জানো, মানুষের যাবতীয় বিজ্ঞান আমি কাজে লাগিয়েছি । না, না ! আমি, মাস্টার জাকারিয়ুস—আমি কিছুতেই মরতে পারি না ! কারণ সময়কে শাসন করেছি আমি—বাধ্য অনুগত ও বশংবদ ভৃত্য সে আমার—আমার সঙ্গে-সঙ্গে মহাকালেরও

অবসান ! আবার সেই অসীমে ফিরে যাবে সে ; যে-অফুরন্ত সীমাহীনতা থেকে আমার প্রতিভা তাকে বাঁচিয়েছিলো, আবার সেই অসীম শূন্যতার তলহীন গহ্বরে সে চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে—যদি আমার মৃত্যু হয় কোনোদিন ! এই সৌর পরিবার যাঁর অবদান ও যাঁর সংহিতা ও বিধান কীটাণুকীট থেকে বিপুল নীহারিকামণ্ডলকে বন্দী ক'রে আছে, সেই সৃষ্টিকর্তার মতো আমিও মৃত্যুহীন ! আমিই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী—তাঁরই সমান, আমি মাস্টার জাকারিয়ুস, তাঁর শক্তি কেড়ে নিয়েছি । ঈশ্বর যদি অসীমকে সৃষ্টি ক'রে থাকেন, তা'হলে আমি সৃষ্টি করেছি সীমা, সৃষ্টি করেছি সময়, অর্থাৎ ঘণ্টা, মিনিট, মুহূর্ত ।' দিগ্‌ভ্রান্ত কিন্নরের মতো দেখালো এই বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতাকে, যেন সৃষ্টিকর্তার সামনে তিনি সবেগে ও সজোরে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন । অচেনা আগন্তুকটি একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো ; এই পাপ-চিন্তা বুঝি সে-ই সংক্রামিত করেছে তাঁর মধ্যে, এমনি মনে হয় তাকে দেখলে ।

'ঠিক বলেছেন, কর্তা !' সে উত্তর দিলে, 'স্বয়ং শয়তানও নিজেকে ভগবানের সঙ্গে এমন চুলচেরা তুলনা করতে পারেনি ! কিছুতেই আপনার মহিমার অবসান ঘটতে দেয়া চলবে না । আর সেই জন্যই আপনার এই ভৃত্য আপনাকে এই বিদ্রোহী ঘড়িগুলিকে বশ করার উপায় জানিয়ে দিতে এসেছে ।'

'কী সেই উপায়, খুলে বলো আমাকে, বলো !' মাস্টার জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে উঠলেন ।

'আপনার কন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেই তা আপনি জানতে পারবেন ।'

'কী ? জেরাঁদ—আমার জেরাঁদের সঙ্গে—'

'হ্যাঁ, তাঁরই সঙ্গে ।'

'কিন্তু আমার কন্যা তো আরেকজনকে ভালোবাসে,' এই অদ্ভুত দাবিতে জাকারিয়ুস আদৌ বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হলেন না ।

'আপনার কন্যা ওই ঘড়িগুলোর চেয়ে কম সুন্দর নন—কিন্তু তাঁরও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একদিন থেমে যাবে—'

'কে ? আমার কন্যা ? না ! কিছুতেই না—'

'আপনার ঘড়ির কথাতেই তাহ'লে আবার ফিরে-আসা যাক । বারে-বারে চেষ্টা ক'রে দেখুন, তারা আদৌ সারে কি না ! যান, আপনার সহকারীর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করুন গিয়ে । সেরা জাতের ইস্পাত কেটে বানান গিয়ে স্প্রিং । ওবের আর আপনার কন্যার চিরসুখ প্রার্থনা করুন—কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার ঘড়িগুলি আর-কোনোদিনই চলবে না—আর জেরাঁদের সঙ্গেও ওবেরের বিয়ে হবে না ।'

এই কথা ব'লেই কদাকার বামনটি চ'লে গেলো । কিন্তু যতই সে তাড়াতাড়ি যাক, সে যাবার আগেই জাকারিয়ুস শুনতে পেলেন তার বুকের মধ্যে ঢং ঢং ক'রে ছটা বাজলো ।

৪

সাঁৎ পিয়েরের গির্জে

এদিকে যত দিন যাচ্ছে, মাস্টার জাকারিয়ুসও ততই দেহে ও মনে অবসন্ন হ'য়ে পড়তে লাগলেন। তবু অস্বাভাবিকরকম উত্তেজিতভাবে তিনি প্রত্যেকদিন প্রচণ্ড উৎসাহে কাজে হাত দেন—কে যেন তাঁকে বাধ্য করে কাজ করার জন্য, আর ফলে তাঁর কন্যা কিছুতেই তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত করতে পারে না।

সেই অদ্ভুত আগন্তুকটি তাঁকে ভুলিয়ে অন্যায়ভাবে একেবারে সংকটের মাঝখানে নিয়ে হাজির করেছিলো; কিন্তু সেই জন্যই তিনি যেন জেদ ক'রে আরো বেশি দাম্ভিক হ'য়ে উঠেছেন, যেন স্থির করেছেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা তিনি সমস্ত অন্যায় অপবাদ কাটিয়ে উঠবেন। জেনিভা নগরীর যে-সব ঘড়ি তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলো, প্রথমে তিনি সেগুলিকে গিয়ে মেরামত করলেন! চাকাগুলি যে ভালো আছে, কীলকগুলি যে শক্ত ও সুদৃঢ় এবং ভারের সমতা যে এক চুলও নষ্ট হয়নি—তন্নতন্ন ক'রে পরীক্ষা ক'রে এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। প্রত্যেকটি কলকব্জা, এমনকী ঘণ্টাগুলি পর্যন্ত, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন—ঠিক যেমনভাবে কোনো ডাক্তার রোগীর বুক পরীক্ষা করে। ঘড়িগুলি যে কেন বিকল হ'য়ে পড়ছে তার কারণ কিন্তু তবু কিছুতেই আবিষ্কার করা গেলো না হাজার চেষ্টাতেও না।

তিনি শহরের ঘড়িগুলো মেরামত করতে বেরুতেন, তাঁর মেয়ে আর ওবের তখন প্রায়ই তাঁর সঙ্গে যেতো। তারা যে আগ্রহভরে তার সঙ্গে যেতে চাচ্ছে, এতে যে তিনি খুশি হতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি তিনি জানতেন যে তাঁর প্রিয়জনের জন্যই তাঁর জীবন দীর্ঘায়িত হচ্ছে, যদি তিনি জীবনের এই সত্যটা আবিষ্কার করতে পারতেন যে, পিতার কিছু অংশ তাঁর সন্তানের মধ্যে চিরকালের মতো থেকে যায়, তাহ'লে হয়তো তাঁর আয়ু যে শেষ হ'য়ে আসছে, এই চিন্তায় তিনি এমনভাবে মগ্ন ও তন্ময় হ'য়ে পড়তেন না।

বাড়ি ফিরে এসে বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা যেন কেমন একটা জ্বরাতুরভাবে আবার উঠে-প'ড়ে তাঁর কাজে লাগতেন। তাঁর যে সাফল্যলাভের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, এটা যদিও তাঁকে অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করা হ'লো, তবু তিনি এ-ব্যাপারটা যে সম্ভব তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইতেন না। অবিশ্রান্তভাবে ঘড়িগুলির কলকব্জা খুলে দ্যাখেন তিনি, তারপর এক-এক ক'রে আবার সব জোড়া লাগান, পরাজয় অনিবার্য জেনেও কিছুতেই হাল ছাড়েন না।

সমস্ত গণ্ডগোলের মূল কারণটা খুঁজে বের করার জন্য ওবের কেবল নিজেকেই কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়—কিন্তু কোনো ফল হয় না। 'নিশ্চয়ই কীলক আর চাকার দাঁতগুলি কোনো কারণে খ'য়ে যায় তাই—'

'তুমি আমাকে তিলে-তিলে কষ্ট দিয়ে মারতে চাও?' অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠেন মাস্টার জাকারিয়ুস। 'এই ঘড়িগুলো কি ছেলেখেলা মাত্র? ছোটোদের খেলনা?

লেদ-এ চাপিয়ে এই তামার পাতগুলি দিয়ে কাজ করতে গিয়ে আঙুলে আঘাত লাগেনি আমার ? যাতে তারা আরো শক্তি পায় এই জন্য আমি কি নিজের হাতে আগুনে গালিয়ে গ'ড়ে-পিটে এই তামার টুকরোগুলো তৈরি করিনি ? এই স্প্রিংগুলি কি উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা নয় ? আমার চেয়ে পাৎলা তেল কি আর-কেউ ব্যবহার করতে পারতো ? তা যে অসম্ভব তা তুমি নিজেই জানো—ফলে তোমাকে এটা বলতেই হবে যে, এগুলিকে নিশ্চয়ই শনিতে কিংবা শয়তানে পেয়েছে ।'

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একের পর এক রুষ্ট ক্রেতারা এসে বাড়িতে চড়াও হয়—জাকারিয়ুসের সঙ্গে দেখা না-ক'রে ফেরে না কেউ—আর সবাই মিলে এমন হৈ-চৈ করে যে, কার কথায় যে কান দেবেন জাকারিয়ুস তা ভেবেই পান না ।

'কেবলই পিছিয়ে পড়ে আমার ঘড়িটা—হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই ঠিক সময় দেয় না,' কেউ অভিযোগ করে ।

কেউ-বা বলে, 'এই ঘড়িটা এত একগুঁয়ে যে এক চুলও নড়ে না—জোশুয়ার সূর্যের মতো নিশ্চল কেবল দাঁড়িয়েই থাকে ।'

'আর এ-কথা যদি সত্যি হয় যে,' অনেকেই এ-কথা ব'লে যায়, 'আপনার ঘড়িগুলিতে আপনার স্বাস্থ্যের প্রভাব পড়ে, তাহ'লে দয়া ক'রে যত শিগগির সম্ভব সেরে-ওঠার চেষ্টা করুন ।'

জাকারিয়ুস শুধু উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তাদের দিকে, আর কেবলই মাথা নাড়েন, নয়তো বিষণ্নভাবে ব'লে ওঠেন : 'বসন্তকাল আসুক—অন্তত ততদিন ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করুন । বসন্তকালে তো জীর্ণ ও জরাগ্রস্তও নতুন ক'রে প্রাণ পেয়ে যায় যেন । সূর্য চাই আমাদের, যাতে ঠাণ্ডা রক্তও গরম হ'য়ে ওঠে ।'

'বাঃ চমৎকার ! সারা শীতকাল ধ'রে ঘড়িটা যদি রোগে ভোগে, তাহ'লেই হয়েছে !' রেগে ব'লে ওঠে কেউ-কেউ । 'আধারের উপরে যে আপনার নামটা স্পষ্ট ক'রে লেখা আছে, তা কি আপনি ভুলে গেছেন, মাস্টার জাকারিয়ুস ? ঈশ্বরের দোহাই, নিজের স্বাক্ষরের মর্যাদা রাখার জন্য একটু চেষ্টা করুন ।'

শেষকালে এমন হ'য়ে উঠলো, লোকের তিরস্কার আর সহ্য করতে না-পেরে এই বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা পুরোনো সিন্দুক থেকে স্বর্ণমুদ্রা বের ক'রে এক-এক ক'রে সবগুলি বিকল ঘড়িই আবার কিনে নিতে লাগলেন । এ-কথা শুনে ক্রেতারা দঙ্গল বেঁধে আসতে লাগলো, আর জলের মতো বেরিয়ে যেতে থাকলো তাঁর সব টাকা । কিন্তু তাঁর সততায় একটিও আঁচড় পড়লো না । জেরাঁদ কিন্তু সাগ্রহে তাঁর এই সম্মানবোধের প্রশংসা করলে—অথচ এই জন্য ক্রমে তাঁর সর্বস্বান্ত হ'য়ে যাবার জোগাড় হ'লো ; শেষকালে ওবের নিজের জমানো টাকাও তার গুরুদেবকে নিবেদন করতে চাইলো ।

পিতৃস্নেহের এই ভরাডুবির মধ্যেও মাঝে-মাঝে কাঠকুটো আঁকড়ে ধরতে চান জাকারিয়ুস, 'শেষকালে আমার মেয়ের কী হবে ?'

সাহস সঞ্চয় ক'রে ওবের কিছুতেই আর এ-কথা বলতে পারে না যে ভবিষ্যতের উপর তার অসীম আস্থা ও প্রত্যাশা আছে ; সে-যে জেরাঁদকে গভীরভাবে ভালোবাসে, এ-কথাটি সে আর প্রকাশ ক'রে বলতে পারে না । সেদিন যদি সাহস ক'রে বলতে পারতো,

মাস্টার জাকারিয়ুস হয়তো তক্ষুনি তাকে তাঁর কন্যাজামাতা-রূপে গ্রহণ ক'রে সেই অলুক্ষুণে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ ক'রে দিতেন। 'জেরাঁদের সঙ্গে ওবেরের বিয়ে ? উঁহু, কোনোদিনই হবে না,' এই ভয়ংকর কথাটি এখনো তাঁর কানে অবিশ্রাম গুঞ্জন ক'রে ফেরে ।

বিকল ঘড়িগুলি কিনে-নিতে নিতে জাকারিয়ুস শেষকালে যেন দেউলে হ'য়ে গেলেন। কারুকাজ-করা দামি-দামি সব পুরোনো বাসন-কোশন সব অচেনা লোকের হাতে তুলে দিলেন তিনি, বাড়ির দেয়ালে কাজ-করা যে-সব সুন্দর প্যানেল ছিলো, সব তিনি বেচে দিলেন । প্রাচীন ফ্লেমিশ শিল্পীদের আশ্চর্য ছবিগুলি আর জেরাঁদের চোখে পড়ে না । সব তিনি বেচে দিলেন—এমনকী তিনি নিজে যে-সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিলেন, তাও এই হুলুস্থুলের মধ্যে ক্রেতাদের তুষ্ট করার জন্য বেচে দিতে হ'লো ।

কেবল স্কলাস্টিকাই এ-সম্বন্ধে কারু কাছে কোনোরকম যুক্তিতর্ক শুনতে চাইতো না। কিন্তু এইসব নাছোড়বান্দা লোকগুলিকেও সে কিছুতেই আটকাতে পারতো না—প্রভুর সঙ্গে দেখা ক'রে শেষ পর্যন্ত তারা কোনো-না-কোনো দুর্মূল্য জিনিশ নিয়ে চ'লে যেতো—কোনোরকমেই সে তাতে বাধা দিতে পারতো না । ফলে তার একটানা চ্যাঁচামেচিতে সমস্ত পাড়া তারপর মুখর হ'য়ে উঠতো—পাড়ার লোকের কাছে অবশ্য আগে থেকেই তার মুখের খ্যাতি ছিলো । তার প্রভু ডাকিনীতন্ত্রের উপাসক, আসলে তিনি একজন কালো জাদুকর মাত্র—এই-যে জনরব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো, দৃঢ় স্বরে সে তার প্রতিবাদ করতো ; কিন্তু ভিতরে-ভিতরে শেষটায় তারও মনে হ'লো বোধকরি ব্যাপারটায় কিঞ্চিৎ সত্য আছে—তাই বারে-বারে তার এই শুভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাচারিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতো ঈশ্বরের কাছে।

মাস্টার জাকারিয়ুস যে ইদানীং ধর্মকর্মে অত্যন্ত অবহেলা করছেন, এটা সকলেই খেয়াল করেছিলো । এককালে তিনি মেয়েকে নিয়ে নিয়মিত গির্জেয় যেতেন—মানুষের কল্পনার মহিমা ও বিপুলতা অনুভব করতেন তিনি প্রার্থনা-সভায়—প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের যেমন হয়, তাঁরও বুদ্ধিবৃত্তির কাছে এই স্তব ও স্তোত্রের সেই গভীর আবেদন ছিলো ! অথচ এখন তাঁকে আর কখনও গির্জের দেখা যায় না ; তা ছাড়া মানুষটাও কিছুটা চাপা স্বভাবের—তাঁর চারপাশে যেন অসীম রহস্য ছড়িয়ে আছে ; ফলে তার সঙ্গে এবার তাঁর সেই প্রার্থনাসভার যোগদানে অবহেলাটি যোগ হ'য়ে লোকের সন্দেহ ও অভিযোগকে আরো দৃঢ় ক'রে তুললো । পিতা যাতে ঈশ্বর এবং জগতের কাছে আবার ফিরে আসেন, এই দুই কারণেই জেরাঁদ ধর্মের সাহায্য নেবে ব'লে স্থির করলে । তাঁর ম্রিয়মাণ আত্মায় হয়তো সঞ্জীবনীর কাজ করবে ধর্ম—অন্তত জেরাঁদের তাই মনে হ'লো, কিন্তু আস্থা, দীনতা ও বিনতির সঙ্গে অনতিক্রম্য এক দম্ভের প্রবল দ্বন্দ্ব শুরু হ'লো জাকারিয়ুসের হৃদয়ে ; বিজ্ঞানের অহংকারের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হ'লো অন্তিম গুণ দীনতার, কেননা বিজ্ঞান তো কেবলি সব-কিছুকে নিজের সঙ্গে জুড়ে দিতে চায় ; প্রথম নিয়মের সূত্রগুলি যে একদিন কোনো অসীম থেকেই উৎসারিত হয়েছিলো, বিজ্ঞান এটা তাকিয়ে দেখতে চায় না ।

জাকারিয়ুসের মনের মধ্যে বিজ্ঞানই যখন সর্বেসর্বা, তখন এই তরুণী তার বাবাকে ফেরাতে চাইলো : নতুন ক'রে তাঁকে দীক্ষিত করতে চাইলো জেরাঁদ ; আর তার প্রভাব এতটাই কার্যকরী হ'লো যে, বৃদ্ধ জাকারিয়ুস পরের রোববারে গির্জেয় গিয়ে প্রার্থনাসভায়

যোগ দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন । শুনে মেয়ের মন আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে ভ'রে গেলো, যেন এতদিনে সে স্বর্গ খুঁজে পেয়েছে । বুড়ি স্কলাস্টিকা তো তার আনন্দ আর চেপে রাখতে পারলো না ; এতদিনে সে সমস্ত গুজব ও জনরবের যোগ্য উত্তরটি দিতে পারবে, আর যে-ই তাঁর প্রভুকে ম্লেচ্ছ ও অধর্মাচারী বলতে আসুক, সে তাকে এই দুর্ধর্ষ যুক্তিটি দেখিয়ে দেবে । পাড়াপড়শিদের সবাইকে এই শুভ সংবাদ দিয়ে এলো সে, শত্রু-মিত্র, চেনা-অচেনা —এই খবর না-শুনিয়ে কাউকেই সে ছাড়লো না ।

'তাই নাকি ! সত্যি ? তোমার কথা তো বিশ্বাসই হ'তে'চাচ্ছে না, স্কলাস্টিকা ।' লোকে তাকে বললো, 'মাস্টার জাকারিয়ুস তো এতকাল শয়তানের সঙ্গেই শলা-পরামর্শ করতেন !'

'তাহ'লে তোমরা শোনোনি তাঁর ঘড়ির ঘন্টাগুলো কেমন আশ্চর্যভাবে বেজে ওঠে,' বুড়ি দাসী তাদের ব'লে দিলে, 'ওই ঘন্টাগুলিই ঢং-ঢং ক'রে বেজে প্রার্থনাসভার সময় ঘোষণা করেছে এতকাল ।'

'তা মানি । কিন্তু তিনি কি এমন যন্ত্র আবিষ্কার করেননি যা আপনা থেকেই চলে —ঠিক যেন জ্যান্ত মানুষের মতো কাজ ক'রে যায় ?'

'সেই-যে তিনি আশ্চর্য একটা লোহার ঘড়ি বানিয়েছিলেন, টাকা ছিলো না ব'লে জেনিভার লোক যা কিনতে পারেনি, আন্দেরনাৎ-এর এক বাগানবাড়িতে যেটা এখন আছে,' রেগে ফুঁসে উঠলো স্কলাস্টিকা, 'কোনো শয়তানের কোনো সাধ্য ছিলো কি তেমন ঘড়ি বানায় ? ঘন্টায়-ঘন্টায় একেকটি নীতি-বাক্য বেরিয়ে আসে ডায়াল থেকে—ওই নীতিগুলি পালন করলে যে কোনো ধর্মভীরু খ্রিষ্টানই সোজা স্বর্গে চ'লে যাবে ! একে কি কখনো শয়তানের কাজ বলা চলে ?'

সত্যিই, এই ঘড়িটা জাকারিয়ুসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি । কুড়ি বছর আগে তিনি বানিয়েছিলেন এটা, আর এটার জন্যই খাতির একেবারে শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিলেন । কিন্তু তা সত্ত্বেও কি না তাঁর সম্বন্ধে ডাকিনীতন্ত্রের কথা ওঠে । তবে জাকারিয়ুস গির্জেয় গেলে অন্তত এই হবে যে, লোকের পিশুনভরা কথা স্তব্ধ হ'য়ে যাবে ।

কন্যাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মাস্টার জাকারিয়ুস কিন্তু তা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন ; সকালবেলায় সোজা তিনি তাঁর কারখানায় চ'লে যান । বিকল ঘড়িগুলিকে পুনর্জীবন দেবার ক্ষমতা যে তাঁর মোটেই নেই, এটা বুঝতে পেরে তিনি ঠিক করেছিলেন যে, কোনো নতুন ঘড়ি বানাতে পারেন কিনা তা পরীক্ষা ক'রে দেখবেন । সমস্ত বিফল চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তিনি এবার কেলাস-ঘড়িটা শেষ করার জন্য উঠে প'ড়ে লাগলেন : তাঁর ধারণা ছিলো এই ঘড়িটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হবে । কিন্তু খামকাই তিনি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলেন, ঘর্ষণ রোধ করবার জন্য খামকাই তিনি চুনি আর হিরে বসালেন ঘড়িতে ; কারণ ঘড়িটায় যেই তিনি দম দেবার চেষ্টা করলেন, অমনি সেটা তাঁর হাত থেকে প'ড়ে গেলো ।

এই ঘটনাটা তিনি সকলের কাছে চেপে গেলেন—এমনকী তাঁর কন্যাকেও বললেন না ; কিন্তু তারপর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়তে লাগলো । যেন ক্রমশ-মন্থর হ'য়ে যাচ্ছে এমন-এক দোলক হ'লে গেলেন তিনি, যার মূল শক্তি আর বেগ

কিছুতেই ফিরে আসবে না—যেন শেষবারের মতো আন্দোলিত হচ্ছে সে, তারপর আস্তে-আস্তে একদিন থেমে যাবে। কোনো-এক অপ্রতিরোধ্য অভিকর্ষ যেন সোজাসুজি তাঁর উপর কাজ ক'রে যাচ্ছে—অনিবার্যভাবে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কবরের দিকে।

জেরাঁদ এত উৎসুকভাবে যে-রোববারের প্রতীক্ষা করছিলো অবশেষে তা এলো। আবহাওয়া অত্যন্ত ভালো—আকাশ স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ময়; তাপমাত্রা যেন প্রেরণা জাগায়। জেনিভার লোকেরা রাস্তায় বেরিয়েছে দল বেঁধে: বসন্ত যে আবার ফিরে এলো, খুশি হ'য়ে এই কথা বলাবলি করতে-করতে যাচ্ছে তারা। অত্যন্ত কোমলভাবে বাপের হাত ধ'রে গির্জের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো জেরাঁদ। স্তবকবচমালা নিয়ে স্কলাস্টিকা চললো পিছনে। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলের সঙ্গে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। দেখলো যে, বাচ্চা ছেলেকে যেভাবে ধ'রে-ধ'রে হাঁটতে শেখানো হয়, তেমনিভাবে হাত ধ'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতাকে—না, বাচ্চা ছেলে নয়, আসলে যেন কোনো অন্ধকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জেরাঁদ। সাঁৎ-পিয়েরের অনুগতরা যখন দেখলো চৌকাঠ পেরিয়ে তিনি গির্জেয় ঢুকলেন, তাঁকে আসতে দেখেই কোনো-এক অজ্ঞাত বিষম ভয়ে ভ'রে গেলো তারা।

সারা গির্জে তখন স্তবগানে মুখর। প্রতিবার যেখানে গিয়ে বসে, জেরাঁদ সেখানে গিয়ে ভক্তি ও বিনতিভরে অত্যন্ত সরলভাবে নতজানু হ'য়ে বসলো। মাস্টার জাকারিয়ুস কিন্তু তার পাশে সোজা দাঁড়িয়ে রইলেন, অনমনীয় ও ঋজু।

সে-যুগ বিশ্বাসের যুগ। শ্রদ্ধাশীলভাবে অনুষ্ঠানটি ধীরে-ধীরে সেই উন্নত মহিমার স্মরণ করলো—কিন্তু এই বৃদ্ধের মনে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার লেশমাত্র ছিলো না। যে-তীব্র যন্ত্রণায় মানবজাতি ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা ক'রে কাতরভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, তাঁর অন্তর তাতে সায় বা সাড়া কিছুই দিলো না। 'চূড়ান্ত মহিমা' গানটিতে যোগ দিয়ে তিনি সেই ঐশ্বরিক দীপ্তির গৌরব ঘোষণা করলেন না; সুসমাচারের বাণী তাঁকে তাঁর অচিৎ জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলো না; এমনকী শেষের সেই সমবেত স্তবগানেও তিনি যোগ দিলেন না। অহংকারে দৃপ্ত এই বৃদ্ধ কেবল নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন—পাথরের মূর্তির মতো যেন তিনি তেমনি নিঃসাড় ও তেমনি স্তব্ধ। এমনকী যখন রুটি আর মদের সেই দিব্য রূপান্তর স্মরণ ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠলো, খ্রিষ্টের সেই রক্ত-মাংসের বেদনাতেও তিনি মাথা নোয়ালেন না, শুধু অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন পুরোহিত কেমন ক'রে নতজানু ভক্তদের ঐশী আমন্ত্রণ পাঠালেন। বাবার দিকে তাকিয়েই জেরাঁদের দু-চোখ ঘন অশ্রুবাষ্পে ঝাপশা হ'য়ে গেলো। ঠিক সেই সময়ে সাঁৎ-পিয়েরের গির্জের মস্ত ঘড়িটায় ঘণ্টা বেজে উঠলো: সাড়ে-এগারো বাজে। মাস্টার জাকারিয়ুস সেই প্রাচীন ও বাঙ্ময় ঘড়িটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন তক্ষুনি। তাঁর মনে হ'লো ঘড়িটা যেন অনিমেষ লোচনে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে; এক থেকে বারো—প্রতিটি সংখ্যা এমন ভাবে জ্বলছে, জ্বল-জ্বল করছে যেন রাঙা অঙ্গার দিয়ে লেখা; ঘড়ির কাঁটা থেকে যেন বিদ্যুতের ফুলকি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে।

স্তবগান শেষ হ'লো। গির্জের রীতি অনুযায়ী বেলা দ্বিপ্রহরে দেবদূতের জয়গান করা হয়; তাই বেদী ছেড়ে যাবার আগে পুরোহিতেরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন বেলা বারোটার ঘণ্টা পড়ে। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই এই স্তব তাঁরা সেই ঐশী কুমারীর চরণে নিবেদন ক'রে দেবেন।

কিন্তু হঠাৎ একটা কর্কশ আওয়াজে গির্জের সেই বিনত পরিবেশ টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেলো। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ ক'রে উঠলেন মাস্টার জাকারিয়ুস।

ঘড়ির কাঁটাটা বারোটার ঘরে গিয়ে হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে থেমে গেছে, কোনোদিনই আর এই ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজবে না।

তাড়াতাড়ি বাপের দিকে ছুটে গেলো জেরাঁদ। ছিন্ন গাছের মতো নিশ্চল প'ড়ে গেছেন তিনি মাটিতে; ধরাধরি ক'রে তাঁকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

'মরণকামড় এটা!' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো জেরাঁদ।

ধরাধরি ক'রে বাড়িতে নিয়ে আসা হ'লো তাঁকে; বিধ্বস্তের মতো তিনি প'ড়ে রইলেন—ব্যথায় একেবারে চুরমার হ'য়ে গেছেন যেন। যেন প্রাণ আস্তে-আস্তে তাঁর দেহ থেকে অন্তর্ধান করছে।

মূর্ছা ভেঙে গেলে দেখলেন জেরাঁদ আর ওবের তাঁর পাশে ঝুঁকে আছে। জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁছে ভবিষ্যৎকে তিনি এখুনি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। জেরাঁদ যেন কোনো একাকিনী, সহায়সম্বলহীনা, বিষাদ-প্রতিমায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে, এটাই তাঁর মনে হ'লো।

'পুত্র,' ওবেরকে তিনি বললেন, 'আমার কন্যাকে আমি তোমার হাতেই তুলে দিলাম।' এই ব'লে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি—তাঁর মৃত্যুশয্যাতেই তারা দুজনে মিলিত হ'লো।

কিন্তু পরক্ষণেই যেন কোনো পরম রোষে তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব ভ'রে গেলো। উঠে বসতে চাইলেন তিনি, ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ। সেই ভীষণ আগন্তুকটির কথা যেন এক অবিশ্রাম স্রোতের মতো তাঁর বুকে ব'য়ে গেলো।

'না-না, মরতে চাই না আমি।' প্রচণ্ডভাবে চীৎকার ক'রে উঠলেন জাকারিয়ুস। 'কিছুতেই মরতে পারি না আমি! আমি মাস্টার জাকারিয়ুস—আমার ম'রে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমার খাতা—আমার হিশেবের খাতা!'

এই ব'লে তিনি লাফিয়ে উঠলেন বিছানা ছেড়ে, হিশেবের খাতাটা বের ক'রে আনলেন তাড়াতাড়ি। এই খাতায় ক্রেতাদের নাম-ঠিকানা আর ঘড়ির বর্ণনা লেখা থাকে। তাড়াতাড়ি তার পাতা উলটে গেলেন ক্ষিপ্র ক্ষিপ্ত হাতে—শেষকালে বইয়ের একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালেন তিনি।

'এই যে!' চেঁচিয়ে উঠলেন জাকারিয়ুস। 'এই যে! পিত্তোনাচ্চিয়োকে যে-লোহার ঘড়িটা বিক্রি করেছিলুম, দ্যাখো, কেবল সেটাই আমার কাছে ফিরে আসেনি। এখনো ঘড়িটা চলছে—ঘড়িটা চাই! এখনো তা নষ্ট হ'য়ে যায়নি—এখনো তা বেঁচে আছে! আঃ, এই আমার প্রাণ—যে ক'রেই হোক এই ঘড়িটাকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাকে। ঘড়িটাকে আমি এত যত্ন ক'রে সাবধানে রেখে দেবো যে মৃত্যু আর আমার কাছে ঘেঁষতে পাবে না।'

বলতে-বলতে আবার তিনি চেতনা হারিয়ে ফেললেন।

ওবের আর জেরাঁদ এই বিদ্রোহী বৃদ্ধের শয্যার পাশে নতজানু হ'য়ে ব'সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো।

৫

ঘণ্টা বাজলো

এক-এক ক'রে কত দিন কেটে গেছে। যেন কোনো অতিপ্রাকৃত উত্তেজনা তাঁকে এসে অধিকার করেছে—তাই রোগশয্যা ছেড়ে কেমন ক'রে যেন উঠেছেন মাস্টার জাকারিয়ুস, আবার কাজে হাত দিয়েছেন তিনি—যেন কোনো অমানুষিক শক্তি পেয়েছেন তিনি কোনোখান থেকে। যেন তাঁর অহংকারই তাঁকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু জেরাঁদ আর নিজেকে প্রতারিত করলো না—তার পিতার দেহ ও মন চিরকালের মতো কোনো দুঃস্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে গেছে, এটা সে অবশেষে মেনে নিলো।

পোষ্য কিংবা নির্ভরশীলদের কথা মোটেই চিন্তা না-ক'রে জাকারিয়ুস তাঁর শেষ কপর্দকটুকু পর্যন্ত এক জায়গায় জড়ো করেছেন। কোনো-এক অস্বাভাবিক বল পেয়েছেন যেন তিনি কোত্থেকে—অফুরন্ত যেন তার উৎস : তাঁর হাঁটা-চলায়, কাজ-কর্মে, কথাবার্তায় তা-ই ফুটে বেরোয়—আর সবসময় বিড়বিড় ক'রে অস্ফুট ভাবে কী যেন বলেন তিনি—তার সব কথা স্পষ্ট বোঝাও যায় না।

একদিন সকালে জেরাঁদ তাঁর কারখানা ঘরে গিয়ে দ্যাখে যে, তিনি সেখানে নেই। সারাদিন সে তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে কাটালো—কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুস আর ফিরে এলেন না। সে বিলাপ করলো সারা দিন, কিন্তু তার বাবা আর ফিরলেন না।

সমস্ত জেনিভা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও ওবের যখন তাঁকে কোথাও পেলো না, তখন এটা অনুমান করা গেলো যে, তিনি শহর ছেড়েই চ'লে গেছেন।

'কিন্তু খুঁজে তাঁকে বের করতেই হবে,' ওবের বিষণ্ণ খবরটা পৌঁছে দিতেই জেরাঁদ কেঁদে উঠলো।

'কোথায় যেতে পারেন তিনি ?' নিজেকে শুধোলো ওবের।

হঠাৎ কোত্থেকে যেন এক প্রেরণা এলো তার মনে। মাস্টার জাকারিয়ুসের শেষ কথাগুলি মনে প'ড়ে গেলো তার। যে-একটি পুরোনো লোহার ঘড়ি এখনো ফেরত আসেনি, তাঁর প্রাণ নাকি কেবল তার মধ্যেই রয়েছে এখন ? নিশ্চয়ই তিনি সেই ঘড়িটারই সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন।

ওবের তার ধারণা খুলে বললো জেরাঁদকে।

'বাবার হিশেবের খাতাটা দেখলেই তো হয়,' জেরাঁদ বললো।

তক্ষুনি জাকারিয়ুসের কারখানা-ঘরে গিয়ে ঢুকলো তারা। হিশেবের খাতাটা খোলাই পড়েছিলো একটি বেঞ্চির উপর। বিকল হ'য়ে গেছে ব'লে জাকারিয়ুসের তৈরি সবগুলি ঘড়িই ফিরে এসেছিলো, লাল্ কালি দিয়ে সেগুলি তিনি কেটে রেখেছেন—কেবল একটি বাদে।

'মঁসিয় পিত্তোনাচ্চিয়োর কাছে ঘণ্টা আর সচল মূর্তি সমেত একটি লোহার ঘড়ি বিক্রি

করা হ'লো ; আন্দেরনাৎ-এ তাঁর বাগানবাড়িতে পাঠানো হয়েছে সেটা ।'

এটাই হ'লো সেই 'আদর্শ' ঘড়ি স্কলাস্টিকা যার সম্বন্ধে সোৎসাহে বাঙ্ময় হ'য়ে ওঠে।

'নিশ্চয়ই বাবা সেখানে গেছেন,' বললো জেরাঁদ ।

'চলো, আমরাও সেখানে যাই,' ওবের উত্তর দিলো, 'হয়তো এখনো তাঁকে বাঁচানো যাবে !'

'প্রাণে বাঁচবেন না বটে,' অস্ফুট স্বরে বললো জেরাঁদ, 'কিন্তু অন্তত তাঁর আত্মা রক্ষা পেতে পারে ।'

'কী সর্বনাশ ! জেরাঁদ, আন্দেরনাৎ-এর বাগানবাড়িটা কোথায়, তা জানো ? দেন্‌ৎস-দ্যু-মিদির গিরিসংকটে—জেনিভা থেকে যেতে কুড়ি ঘণ্টা লাগে । চলো, আর দেরি নয়, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের ।'

লেমান্ হ্রদের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে যে-পথটা দিগন্তের দিকে চ'লে গেছে, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় স্কলাস্টিকাকে সঙ্গে নিয়ে ওবের আর জেরাঁদ সেই পথে রওনা হ'য়ে পড়লো। সে-রাত্রে পাঁচ লিগ পথ পেরিয়ে এলো—বেসঁজ বা এরমাস মেঅর-দের বিখ্যাত বাগানবাড়ি—কোথাও তারা থামলো না। অনেক কষ্টে তারা হেঁটেই পেরোলো দ্রঁজ-এর পাহাড়ি নদী—আর যেখানেই গেলো সেখানেই জাকারিয়ুসের খোঁজ নিলো তারা, এবং একটু পরেই এটা বুঝতে পারলো যে ঠিক পথেই তারা যাচ্ছে, কোনো ভুল করেনি ।

পরের দিন ভোরবেলায় তোনঅঁ পেরিয়ে এভিয়াঁতে এসে পৌঁছোলো তারা—আর মাত্র বারো লিগ দূরে সুইৎজারল্যাণ্ডের সীমান্ত। কিন্তু বাগ্‌দত্তা এই যুবক-যুবতী এই ভুবন-মোহন সম্ভাবনাটার কথা একবার ভেবেও দেখলো না । সোজা তারা সামনে দিকে এগিয়ে গেলো—যেন কোনো অমানুষিক শক্তি তাদের হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছে। ওবেরের হাতে একটি বাঁকা ছড়ি রয়েছে ; কখনো জেরাঁদকে, কখনো-বা স্কলাস্টিকাকে হাত ধ'রে-ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে সে ; তারা যাতে কোনোরকমে অবসাদে বা শ্রান্তিতে ভেঙে-না পড়ে, যথেষ্ট চেষ্টা করেছে সে-বিষয়ে। আর তাদের গভীর বেদনা ও অমল প্রত্যাশার কথা নদীর ধারের এই সুন্দর পথটিতে বারে-বারে মুখর হ'য়ে উঠলো । হ্রদের দুই পাড় যেখানে শ্যালেই-এর উচ্চতায় এসে পড়েছে, অবশেষে সেই উঁচু ও সংকীর্ণ মালভূমিতে এসে পৌঁছুলো তারা। তারপর দ্রুত এসে পৌঁছুলো ব্যুভের-এ—রোননদী আর জেনিভা হ্রদের সংগম যেটা ।

ব্যুভের ছেড়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে হ্রদের পাশ থেকে বেঁকে দূরে চ'লে গেলো তাদের পথ । আর এই পাহাড়ি পথে তাদের শ্রান্তি ও অবসাদ ক্রমেই ঘেড়ে যেতে লাগলো । একে-একে তারা পেরিয়ে এলো জনবিরল পাহাড়ি গ্রামগুলি—ফিয়োনাৎস্, শেস, আর কলম্বে । তাদের হাঁটুর জোড়া খুলে আসতে চাচ্ছে তখন, গ্র্যানাইট পাথরের মতো শক্ত ও বন্ধুর পাহাড়ি পথে চলায় বেশ ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে তাদের পা—কিন্তু তবু মাস্টার জাকারিয়ুসের কোনো সন্ধান নেই কোথাও ।

কিন্তু খুঁজে তাঁকে বের করতেই হবে । তাই তারা কোনো ক্ষুদ্র পল্লি বা মোঁতা-র প্রমোদবীথিকায় বিশ্রাম নেবার কথা ভাবতে পারলে না । অথচ এই প্রমোদবীথিকাই বিস্তৃত হ'য়ে দূরের দিকে গেছে এখান থেকে, আর একদা শ্যাভয়-এর মার্গারিৎ এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন । অবশেষে, অবসাদে তারা যখন অর্ধমৃত সেই সময়ে নোৎর-দাম-দ্যু সেক্স-

এর মঠে পৌঁছুলো তারা। দেনৎ-দু মিদির ঠিক তলাতেই এই বীথিকা, রোননদী ঠিক ছশো ফিট উপরে।

রাত ক'রে এসেছে তখন ; তিন পথিকের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন যাজক। তখন তাদের আর এক পাও যাবার ক্ষমতা নেই, ফলে এখানে বিশ্রাম নিতে তারা বাধ্যই হ'লো একরকম।

যাজকটি কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুসের কোনো খবরই দিতে পারলেন না। কী-রকম যেন বিষাদ ভরা এই নিঃসঙ্গ পাহাড়ি পথ—এখানে যদি কোথাও তিনি প'ড়ে গিয়ে ম'রেও যান, কেউ তাঁর কোনো খোঁজই পাবে না। বাইরে গভীর অন্ধকার ক'রে এলো, আর হাওয়া যেন ক্ষুধিতের মতো গর্জন ক'রে ফিরলো পাহাড়ের গায়ে-গায়ে—চূড়া থেকে ধস নেমে পড়লো প্রকাণ্ড চীৎকার ক'রে—যেন এই আঁধার রাতে হঠাৎ ক্ষুব্ধ পাহাড়টি তার সুপ্তি ভেঙে জেগে উঠেছে।

যাজকের চুল্লির সামনে কুঁকড়ে ব'সে ওবের আর জেরাঁদ ধীরে-ধীরে তাঁকে এই করুণ ও শোকার্ত কাহিনীটি খুলে বললো। তুষার ঝ'রে পড়েছিলো তাদের পোশাকে—এক কোনায় সেগুলি শুকোচ্ছে। আর বাইরে চাঁদের এক রাঙা-ভাঙা টুকরো দেখে ডুকরে কেঁদে উঠছে মঠের কুকুরটি—আর বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে সেই বিলাপ যেন অদ্ভুতভাবে মিশে যাচ্ছে।

'দম্ভ,' আস্তে-আস্তে যাজকটি তাঁর অতিথিদের বললেন, 'দম্ভই এক দেবতার ধ্বংস ঘটিয়েছিলো একদা। এই ভয়ংকর দেয়ালের গায়েই মানুষের অদৃষ্ট বারে বারে আছড়ে প'ড়ে মাথা কোটে। দম্ভ কি আর কোনো যুক্তির কথা শোনে! অহংকারের চেয়ে সর্বনেশে অধর্ম আর কিছু নেই, কেননা তার স্বভাবই হচ্ছে কোনো কথায় কর্ণপাত না-করা। তোমার বাবার জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আর-কিছুই করার নেই।'

চারজনে যেই নতজানু হ'য়ে বসেছে, অমনি বাইরে কুকুরটি হঠাৎ দ্বিগুণ জোরে ডুকরে উঠলো : কে যেন মঠের দুয়ারে এসে সজোরে ধাক্কা দিচ্ছে।

'খোলো, দরজা খোলো—শয়তানের নামে বলছি, দরজা খোলো—'

হঠাৎ প্রবল করাঘাতে দরজা খুলে গেলো, আর জীর্ণ বসনপরা বিস্রস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত কে একজন এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে।

'বাবা! তুমি!' জেরাঁদ চেঁচিয়ে উঠলো।

সত্যি, মাস্টার জাকারিয়ুসই বটে।

'কোথায় আছি আমি, জানো?' উদ্‌ভ্রান্ত গলায় ব'লে উঠলেন জাকারিয়ুস। 'অসীমের মধ্যে—চিরন্তনতায়। সময় থেমে গেছে—আর কোনোদিনও ঘণ্টা বাজবে না—সমস্ত ঘড়ির কাঁটাগুলি খ'শে পড়লো!'

'বাবা!' মেয়ের এই করুণ আর্তনাদই বোধকরি বৃদ্ধকে হঠাৎ জীবিতের জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। 'জেরাঁদ? তুমি এখানে।' চেঁচিয়ে উঠলেন জাকারিয়ুস, 'আর ওবের? তুমিও। ওঃ, বাগ্‌দত্ত ব'লে এই পুরোনো গির্জেয় বিয়ে করতে এসেছো তোমরা।'

'বাবা,' তাঁর হাত ধ'রে অনুনয় করলো জেরাঁদ, 'ফিরে এসো, আমাদের সঙ্গে জেনিভায় ফিরে এসো তুমি।'

হ্যাঁচকা টানে হাত ছিনিয়ে নিলেন জাকারিয়ুস তারপর ক্ষিপ্র গতিতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন ; বাইরে তখন অজস্র ধারায় বড়ো-বড়ো তুষার ঝ'রে পড়ছে ।

'সন্তানদের ত্যাগ ক'রে যাবেন না,' ওবের চীৎকার ক'রে বললো ।

'কেন ফিরবো ?' যেন মূর্তিমান বিষাদ কোনো বিষম দূর থেকে কথা ব'লে উঠলো । 'যেখানে আমার জীবন আর নেই, যেখানে আমার একটা অংশ চিরকালের মতো সমাহিত হ'য়ে গেছে, সেখানে আর কীসের জন্য ফিরে আসবো ?'

'কিন্তু আপনার আত্মা ? সে তো মরেনি । জানি তার চাকাটা ভালো আছে—তার টিকটিক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি—'

'আত্মা তো কোনো অচিৎ পদার্থ নয়—সে অবিনশ্বর, সে চিরন্তন,' তীব্র স্বরে ব'লে উঠলেন যাজক ।

'হ্যাঁ, ঠিক আমার মহিমার মতো । কিন্তু সে এখন আন্দেরনাৎ-এর প্রমোদবীথিকায় বন্দী হ'য়ে আছে—আমি তাকে দেখতে চাই আবার—মুখোমুখি দেখতে চাই তাকে ।'

বুকে ক্রুশ আঁকলেন যাজক ; স্কলাস্টিকা কেমন নির্জীব হ'য়ে পড়লো হঠাৎ, ওবের জেরাঁদকে জড়িয়ে ধরলো ।

'আন্দেরনাৎ-এর সেই কেল্লায় যে থাকে, সে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে—সে অভিশপ্ত—তার উদ্ধারের কোনো উপায়ই নেই । সে ক্রুশকে সম্মান করে না—তার মুক্তি হবে কেমন ক'রে ?'

'বাবা, যেয়ো না ওখানে, যেয়ো না !'

'আমার আত্মাকে ফিরে চাই আমি । আমার আত্মা তো আমারই —'

'ধরো ওকে, আটকাও,' জেরাঁদ চীৎকার ক'রে উঠলো ।

কিন্তু এক লাফে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে চ'লে গেলেন বৃদ্ধ । রাতের অন্ধকারে কেবল এক অফুরন্ত আর্তনাদ শোনা গেলো : 'আত্মা, আমার আত্মা, আমার আত্মা....'

জেরাঁদ, ওবের আর স্কলাস্টিকা—তিনজনেই তাঁর পিছন-পিছন ছুটলো । দুর্গম এখানকার পথ, কুটিল আর জটিল আর কষ্টকর । আর সেই পথ ধ'রেই যাচ্ছেন মাস্টার জাকারিয়ুস, যেন কোনো ক্ষিপ্ত ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে, যেন কোনো ভয়ংকর চুম্বক তাঁকে সবেগে টান দিয়েছে । পরম আক্রোশে তুষার ঝরছে তাদের উপর, শাদা টুকরোগুলি ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে শুভ্র হিম অঙ্গারের মতো ।

ধীবান বাহিনীর ভীষণ সংহারের স্মরণে যে-গির্জেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাড়াতাড়ি তারা বুকে ক্রুশ এঁকে নিলে । কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুসকে কোথাও দেখা গেলো না ।

সেই বন্ধ্যা ভূমিতে অবশেষে অন্ধকারের মধ্যে এফিয়োনাৎস নামে ক্ষুদ্র পল্লিটি জেগে উঠলো । ভীষণ নির্জনতার মধ্যে এই ক্ষুদ্র পল্লিটি দেখে অত্যন্ত কঠোর লোকও কেঁপে উঠতো । বৃদ্ধ কিন্তু ঝড়ের মতো এগিয়ে চললেন দেনৎ-দু-মিদির গিরিখাতে, যেখানে তার তীক্ষ্ণ চূড়া আকাশকে ভেদ ক'রে উঠে গেছে, তার গভীরে তিনি ছুটে চললেন উন্মত্তের মতো ।

শীগগিরই জীর্ণ, কাতর ও মলিন একটি কেল্লার ধ্বংসস্তূপ দেখা গেলো চূড়ায়, নিচে

ধারালো পাথরের টুকরোর মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ চ'লে গেছে তার উদ্দেশে ।

'ওই যে—ওই যে আমার আত্মা !' ক্ষিপ্তের মতো ছুটতে-ছুটতে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন জাকারিয়ুস ।

আন্দেরনাৎ-এর কেল্লাটির ধ্বংসই কেবল তখন আছে । প্রচণ্ড স্থূলাকার স্তম্ভ উঠে গেছে কেল্লার উপর—নড়বোড়ে সেই স্তম্ভটা হাওয়ায় দুলছে কেবল এখন—যে-কোনো মুহূর্তে সমস্ত চুরমার ক'রে কেল্লার ছাতে ভেঙে প'ড়ে যাবে । গভীরতর কোনো আর্তনাদ যেন কালো পাথরের সেই বিশাল স্তূপে মূর্তি পেয়েছে । কালো-কালো কতগুলি মস্ত হলঘর দাঁড়িয়ে আছে সেই ভগ্নাবশেষের মধ্যে—পাথর কেটে-কেটে খিলেন তৈরি হয়েছিলো একদা, এখন তাতে গর্ত গজিয়েছে অসংখ্য, কুণ্ডলী পাকিয়ে গোখরোরা শুয়ে আছে সেখানে ।

জঞ্জাল ভরা এক পরিখার মুখে কেল্লায় যাবার গুপ্তদ্বার । কে যে এই কেল্লায় থাকে, কেউ তা জানে না । নিশ্চয়ই কোনো আধা-দস্যু আধা-অভিজাত জার্মান ধনপতির প্রমাদবীথিকা ছিলো এটা একদা—পরে কোনো দস্যুদল বা জাল টাকা নির্মাতারা এসে আশ্রয় নিয়েছিলো এখানে—শেষে তাদের এখানেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেয়া হয় । কিংবদন্তি বলে যে শীতের রাতে স্বয়ং শয়তান এসে তার ভয়ংকর নৃত্যসভা বসায় এই গিরিখাতে—এই ধ্বংসস্তূপের ছায়া যেখানে অতিকায়ভাবে কেঁপে-কেঁপে উঠে সেই ভীষণ নাচে যোগ দেয় ।

কিন্তু এই অলুক্ষুণে জনরব জাকারিয়ুসকে একটুও দমাতে পারলো না । গুপ্তদ্বারের কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন তিনি—কেউ তাঁকে কোনো বাধা দিলো না বা নিষেধ করলো না। মস্ত একটা স্তব্ধ মলিন উঠোনে এসে পৌঁছুলেন তিনি—কেউ তাঁকে সেটা পেরিয়ে যেতে নিষেধ করলো না । সেই অধোগামী উঠোন পেরিয়ে লম্বা একটা বারান্দায় এসে পড়লেন জাকারিয়ুস । বড়ো-বড়ো থাম আর খিলেনগুলি যেন দিনের আলোকে নির্বাসন পাঠিয়েছে এখান থেকে । চিরন্তন আঁধারের মধ্যে হাওয়া যেন ভারি হ'য়ে আছে এখানে । জাকারিয়ুসকে কেউ কোনো বাধা দিলো না । তাঁর একটু পিছনেই আসছে জেহাঁদ, ওবের আর স্কলাস্টিকা।

যেন কোনো অপ্রতিরোধ্য হাত তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাই বুঝি মাস্টার জাকারিয়ুসের মোটেই পথ ভুল হচ্ছে না ; তিনি যেন নিশ্চিত ক'রে জানেন তাঁর পথ, আর তাই এখন ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে যেতে পারছেন । পোকায় কাটা, ঘুণধরা একটা পুরোনো দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি ; তাঁর প্রবল করাঘাতে দরজার পাল্লা ভেঙে পড়লো, আর মাথার উপরে পাখা ঝাপটে অদ্ভুত বৃত্ত এঁকে উড়তে লাগলো বাদুড় ও চামচিকে ।

ঘরটা মস্ত—বিরাট একটা হলঘর আসলে : অন্য ঘরগুলির চেয়ে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন । খিলেনগুলিতে স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন—কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে সাপ, কিম্ভূত ও বিকট সব প্রেতমূর্তি, আরো নানা অদ্ভুত অপজীব—বিশৃঙ্খল ও ভয়ংকরভাবে তারা ভিড় ক'রে আছে দেয়ালে । লম্বা সরু কতগুলি ঘুলঘুলির মতো জানলা—পাল্লাগুলি ঝোড়ো হাওয়ায় যেন শিউরে-শিউরে উঠছে ।

হলঘরটার মাঝখানে পৌঁছে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন মাস্টার জাকারিয়ুস ।

লোহার আংটা দিয়ে দেয়ালের গায়ে টাঙানো আছে সেই ঘড়িটা, যার উপর তাঁর প্রাণ নির্ভর করছে । অতুলনীয় তাঁর এই কীর্তি : প্রাচীন কোনো রোমক মন্দিরের মতো তার গঠন, পেটা লোহার গায়ে ঠেশ দিয়ে আছে সে, ঠেশ দিয়ে আছে তার ভারি ঘণ্টাস্তম্ভ :

আর যখন এখানে ঘণ্টা বেজে ওঠে তখন যেন তার ঢং-ঢং আওয়াজে প্রার্থনাসভার গানের সুর বেজে ওঠে। এই তাঁর পরমায়ু—এই ঘড়িটা। মন্দিরের দুয়ারের উপরে একটা 'গোলাপ' বসানো, আর তারই মাঝখান থেকে বেরিয়েছে ঘড়ির দুটি কাঁটা, আর তারই পাপড়িগুলোর চারপাশে বারো ঘণ্টার বারোটি অঙ্ক বসানো—ঘণ্টা যখন বেজে ওঠে, মন্দিরের দুয়ার যেন খুলে যায় মন্ত্রবলে। দরজা আর গোলাপের মাঝখানে, স্কলাস্টিকা যেমন বলেছিলো সেই অনুযায়ী, অনুশাসন ফুটে ওঠে তাম্রলিপিতে—দিনের বিভিন্ন সময়ে সর্বাবস্থায় আচরণীয় বিভিন্ন অনুশাসন ফুটে ওঠে। একদা সত্যিকার কোনো খ্রিষ্টানের মতো কোনো-এক ঐশী প্রেরণায় আশ্চর্য এই ঘড়িটি বানিয়েছিলেন মাস্টার জাকারিয়ুস, যার প্রতিটি জিনিশ ধর্মপুস্তকের সংহিতা মেনে তৈরি করা হয়েছিলো; প্রার্থনা, স্তব, বিনোদ, নীতিবাক্য, অনুশাসন—সর্বত্রই এক ধর্মীয় যাপন নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার ছাপ: এই ঘড়ির নির্দেশ অনুযায়ী কেউ যদি জীবনযাপন করে, তাহ'লে তার ত্রাণ অবশ্যম্ভাবী।

উল্লাসে মাস্টার জাকারিয়ুস যেন নেশাতুর হ'য়ে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি তিনি ঘড়িটা দখল করবার জন্য এগিয়ে গেলেন, আর এমনি সময়ে ঠিক যেন তাঁর পাশেই বিকট রোলে কে অট্টহাসি ক'রে উঠলো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে, ধোঁয়া-ওঠা এক বাতির আলোয় জাকারিয়ুস দ্যাখেন জেনিভার সেই ভীষণ বামনটি!

'তুমি? তুমি এখানে?' চীৎকার ক'রে উঠলেন জাকারিয়ুস।

ভয়ে জেরাঁদ যেন কুঁকড়ে গেলো। ওবেরের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো সে।

'আপনাকে শুভদিন জানাই, মাস্টার জাকারিয়ুস,' শয়তানের মতো ভয়ংকর লোকটা ব'লে উঠলো।

'কে? কে তুমি?'

'সেনর পিত্তোনাচ্চিয়ো—আপনার সেবার জন্য অধীন সর্বদাই প্রস্তুত! আপনার কন্যাকে আমার হাতে তুলে দিতে এসেছেন? আমি যে বলেছিলুম, জেরাঁদের সঙ্গে কিছুতেই ওবেরের বিয়ে হবে না, তা আপনার মনে পড়েছে তাহ'লে!'

পিত্তোনাচ্চিয়োর দিকে সবেগে ছুটে গেলো ওবের—কিন্তু ছায়ার মতো সে স'রে গেলো এক পাশে।

'থামো, ওবের!' জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে উঠলেন।

'শুভরাত্রি,' ব'লে পিত্তোনাচ্চিয়ো অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

'বাবা, চলো, এই জঘন্য জায়গাটা থেকে পালিয়ে যাই!' কাতরভাবে অনুনয় করলো জেরাঁদ: 'বাবা!'

কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুস আর সে-ঘরে তখন নেই। ভাঙাচোরা বারান্দা দিয়ে তিনি তখন পিত্তোনাচ্চিয়োর ছায়ার পিছনে ছুটেছেন। স্কলাস্টিকা, জেরাঁদ আর ওবের সেই ভীষণ হলঘরে স্তম্ভিতের মতো হতবাক্ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর একটা পাথরের আসনে চেতনা হারিয়ে প'ড়ে গেলো জেরাঁদ। স্কলাস্টিকা তার পাশে নতজানু হ'য়ে ব'সে প্রার্থনা করতে লাগলো; আর; ওবের দাঁড়িয়ে রইল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে দেখতে লাগলো তার বাগ্‌দত্তাকে। অন্ধকারের মধ্যে মরা আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে; মাঝে-মাঝে কেবল

বন্য নিশাচরদের আনাগোনায় শিউরে-শিউরে উঠছে স্তব্ধতা, আর সেই 'মরণ-ঘড়ি' যখন ঢং-ঢং ক'রে বেজে উঠছে তখন সেই নীরবতা যেন ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাচ্ছে।

দিনের আলো জেগে উঠতেই সেই ভগ্নস্তূপের চারপাশ ঘিরে ঘুরে-ঘুরে যে-অফুরন্ত সিঁড়ি চ'লে গেছে, তাতে পা দেবার সাহস পেলো তারা। দু-ঘণ্টা ধ'রে তারা ঘুরলো এই সিঁড়ি বেয়ে কিন্তু কোনো জ্যান্ত প্রাণীর সঙ্গে তাদের দেখা হ'লো না। শুধু দূর থেকে তাদের কাতর ডাকের উত্তরে বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি ভেসে এলো। কখনো মনে হয় বুঝি জ্যান্ত কবর হ'লো তাদের, কারণ সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির তলায় একশো ফুট ; আবার কখনো সিঁড়ি তাদের যেখানে নিয়ে আসে, ক্ষুধিত গিরিচূড়া তার অনেক নিচে হিংস্রভাবে ওৎ পেতে আছে।

শেষকালে তারা হঠাৎ আবার সেই মস্ত হলঘরটায় এসে পৌঁছুলো—এইখানে ছটফট ক'রে ওই কষ্টের রাতটা কাটিয়েছে তারা। ঘরটা এখন আর ফাঁকা নেই : মাস্টার জাকারিয়ুস আর পিত্তোনাচ্চিয়ো কথা বলছেন সেখানে—একজন সোজা ও শক্ত দাঁড়িয়ে আছেন মড়ার মতো, আরেকজন শিকারী জন্তুর মতো, গুটি মেরে ব'সে আছে এক মারবেল পাথরের টেবিলে।

জেরাঁদকে দেখে তার দিকে এগিয়ে এলেন মাস্টার জাকারিয়ুস, তারপর তাঁর হাত ধ'রে পিত্তোনাচ্চিয়োর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'জেরাঁদ, তোমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো—এঁর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।'

জেরাঁদের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত শিউরে উঠলো।

'কক্‌খনো না,' চেঁচিয়ে উঠলো ওবের, 'কারণ আপনার মেয়ে আমার বাগ্‌দত্তা।'

'কক্‌খনো না,' জেরাঁদ যেন দূরাগত কোনো প্রতিধ্বনি।

হো-হো ক'রে হেসে উঠলো পিত্তোনাচ্চিয়ো।

'তাহ'লে কি তুই চাস আমার মৃত্যু হোক!' ভাঙা গলায় বৃদ্ধ ব'লে উঠলেন, 'ওই দ্যাখ, ওই যে ঘড়িটা, ওরই মধ্যে আমার প্রাণ বন্দী হ'য়ে আছে। যতগুলো ঘড়ি বানিয়েছিলুম, তার মধ্যে এটাই কেবল এখনও অব্দি বিকল হয়নি। আর এই লোকটা কেবল বলছে যে "আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে দিলেই ঘড়িটা আপনার হ'য়ে যাবে।" আর-কোনোদিনও নাকি ঘড়িটায় দম দেবে না সে, এই সে স্থির করেছে। সে-ই এখন ঘড়িটার মালিক, তাই সে ইচ্ছে করলেই ভেঙে ফেলতে পারে এটা—ধ্বংসের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারে আমাকে। হায়, জেরাঁদ, শেষকালে তুইও আমাকে ত্যাগ করলি—তুইও আর ভালোবাসিস না আমাকে।'

'বাবা!' যেন কোন মূর্ছা থেকে জেগে উঠলো জেরাঁদ।

'তুই যদি একবার জানতিস কী ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে আমাকে, আমার আয়ুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছি কত-কত দূরে।' ভাঙা গলায় আবার শুরু করলেন জাকারিয়ুস। 'হয়তো কেউই আর ঘড়িটার যত্ন নেয় না আজকাল। হয়তো স্প্রিংগুলোয় মরচে ধ'রে যাচ্ছে, ছিঁড়ে যাবে কোনোদিন—হয়তো চাকাগুলো জং ধ'রে হঠাৎ আটকে যাবে একদিন। কিন্তু একবার যদি আমি একে হাতে পাই তো আমি তার সেবা করতে পারি। দিন-রাত যত্নে অটুট রাখতে পারি তার কলকব্জা—কারণ কিছুতেই মরা উচিত নয় আমার। আমি জেনিভার মহান ঘড়িনির্মাতা...আমার মৃত্যু তো জগতের সর্বনাশেরই নামান্তর। দ্যাখ,

দ্যাখ, কেমন ধুঁকে-ধুঁকে এগুচ্ছে কাঁটাগুলো। দেখেছিস, এক্ষুনি পাঁচটার ঘণ্টা পড়বে। ওই শোন, ঘণ্টা বেজে উঠলো। তাকিয়ে দ্যাখ, কোন অনুশাসন বেরিয়ে আসে ভিতর থেকে।'

ঢং-ঢং ক'রে পাঁচটা বেজে উঠলো, আর তার আওয়াজ যেন এক বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি তুললো জেরাঁদের হৃদয়ে যার রেশ অনেকক্ষণ থেকে গেলো। তারপরে রক্তের মতো রাঙা অক্ষরে এই অনুশাসন ফুটে উঠলো ঘড়ির মধ্যে :

'বিজ্ঞানতরুর ফল তোমাকে অবশ্যই খেতে হবে।'

স্তম্ভিতের মতো পরস্পরের দিকে তাকালো ওবের আর জেরাঁদ। কিন্তু কই, ক্যাথলিক ঘড়িনির্মাতার ধর্মীয় অনুশাসন তো এ নয়! নিশ্চয়ই শয়তানের নিশ্বাস পড়েছে এর উপর। কিন্তু জাকারিয়ুস তার দিকে দৃক্পাতও করলেন না।

'শুনছিস, জেরাঁদ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস তুই? বাঁচতেই হবে আমাকে, আরো বাঁচতে হবে। এই শোন, আমার নিশ্বেসের শব্দ—দ্যাখ, কেমন ক'রে ধমনীর মধ্যে রক্ত ব'য়ে যাচ্ছে। না, তুই তোর বাবাকে মারতে পারিস না। যাতে আমি মৃত্যুহীন হ'য়ে উঠি, যাতে আমি অবিনশ্বর হই, যাতে ঈশ্বরের ক্ষমতা হাতে পাই, সেই জন্যে এই লোকটাকে বিয়ে করতেই হবে তোকে।'

এই পাপবাক্য শুনে স্কলাস্টিকা সভয়ে তার বুকে ক্রুশ আঁকলো, আর উল্লসিত পিত্তোনাচ্চিয়ো অট্টরোলে হেসে উঠলো।

'আর, একে বিয়ে করলে তুই সুখী হবি, জেরাঁদ। দেখেছিস এর দিকে তাকিয়ে? দ্যাখ, এ আর কেউ নয়—মহাকাল! যদি একে বিয়ে করিস, তবে নির্ভুলভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে তোর জীবন। জেরাঁদ, আমি তোর জনক, আমার কাছ থেকেই তুই প্রাণ পেয়েছিস—তোর বাবাকে তুই সেই প্রাণ ফিরিয়ে দে।'

'জেরাঁদ,' ফিশফিশ ক'রে ব'লে উঠলো ওবের, 'তুমি আমার বাগ্‌দত্তা।'

চেতনা হারিয়ে ফেলতে-ফেলতে বললো জেরাঁদ, 'কিন্তু তিনি যে আমার বাবা!'

'পিত্তোনোচ্চিয়ো, জেরাঁদ তোমারই!' মাস্টার জাকারিয়ুস বললেন, 'এবার তোমার কথা রাখো, পিত্তোনাচ্চিয়ো।'

'এই যে ঘড়ির চাবি,' ভীষণ লোকটা উত্তর দিলে।

কুণ্ডলী-খোলা সাপের মতো লম্বা চাবিটা যেন ছিনিয়ে নিলেন জাকারিয়ুস, দৌড়ে গেলেন তিনি ঘড়িটার কাছে, অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে ঘড়িটায় তিনি দম দিতে লাগলেন। স্নায়ুপীড়ন ক'রে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে উঠলো স্প্রিং। কেবল দমই দিয়ে যাচ্ছেন জাকারিয়ুস, চাবি ঘোরাচ্ছেন তো ঘোরাচ্ছেনই, মুহূর্তের জন্য থামাচ্ছেন না—মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা যেন তাঁর স্বায়ত্তের বাইরে চ'লে গেছে। ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততরভাবে চাবি ঘোরাতে লাগলেন তিনি, অদ্ভুত মোচড় দিচ্ছেন জোরে-জোরে, আর যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে উঠছে সর্বাঙ্গ—শেষকালে অবসন্ন অবশ হ'য়ে প'ড়ে গেলেন তিনি নিচে।

'ব্যস, এক শতাব্দী যাবে এবার, এত দম দিয়েছি।' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

হল থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো ওবের—তার মনে হচ্ছে যেন সে পাগল হ'য়ে গেছে। উন্মত্তের মতো ঘুরলো সে অনেকক্ষণ, তারপর কোনোরকমে এই জঘন্য কেল্লার গোলকধাঁধা

থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেলো। খোলা হাওয়ায় এসে যেন বাঁচলো এবার। তাড়াতাড়ি নোৎরদাম-দ্যু সেস্ত্র-এর মঠটায় ফিরে গেলো! এমন হতাশ ও মরিয়ার মতো সে অনুনয় করলে যে শেষকালে সেই যাজক তার সঙ্গে আন্দেরনাৎ-এর কেল্লায় যেতে রাজি হলেন।

এই তীব্র মনস্তাপ ও যন্ত্রণায় জেরাঁদ যদি বিলাপ না-ক'রে থাকে, তাহ'লে তার কারণই হ'লো এই যে তার অশ্রুর উৎস একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিলো।

এক মুহূর্তের জন্যও ওই হল ছেড়ে বেরোননি জাকারিয়ুস। বারে-বারে দৌড়ে গিয়ে কান পেতে সেই পুরোনো ঘড়িটায় টিকটিক শব্দ শুনেছেন তিনি আর এর মধ্যে ঘণ্টা বেজে উঠেছে ঘড়িতে, আর স্কলাস্টিকার সামনে কোনো অনন্ত বিভীষিকার মতো তার চকচকে ডায়ালে সংহিতা ফুটে উঠেছে :

'মানুষকে ঈশ্বরের সমান হ'তে হবে।'

এই পাপ অনুশাসন যে জাকারিয়ুসকে কিছুমাত্র বিচলিত করেনি তাই নয়, নেশাতুরের মতো চেখে চেখে সোল্লাসে পড়েছেন তিনি এই অনুশাসন, দম্ভে তাঁর বুক ভ'রে গেছে, আর পিত্তোনাচ্চিয়ো তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকেছে সহাস্যে।

ঠিক মধ্যরাতে বিয়ের দলিলে স্বাক্ষর করা হবে ব'লে ঠিক হয়েছে। জেরাঁদ তো প্রায় যেন নিশ্চেতন কোনো জীব—তার চোখ-কান সব যেন নিঃসাড় হ'য়ে গেছে—কিছুই তার কানে ঢোকে না—সব ক্ষমতা হারিয়ে সে যেন নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হ'য়ে পড়েছে। আর এই ভারি, দমআটকানো স্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে হয় জাকারিয়ুসের দম্ভোক্তিতে, নয়তো পিত্তোনাচ্চিয়োর খুকখুক হাস্যে।

এগারোটার ঘণ্টা পড়লো ঢং-ঢং। শিউরে উঠে মাস্টার জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে পড়লেন অনুশাসনটি :

'বিজ্ঞানের ক্রীতদাস হ'য়ে পড়তে হবে মানুষকে : স্বজন, পরিজন, বন্ধু—সকলকে উৎসর্গ করতে হবে তার কাছে।'

'ঠিক?' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'জগতে বিজ্ঞান ছাড়া আর-কিছুই সত্য নয়।'

সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস ক'রে কাঁটাগুলি এগিয়ে যাচ্ছে, আর দোলকটি আরো তীব্র ও ক্ষিপ্রভাবে দুলে যাচ্ছে এদিক-ওদিক, আর একটানা কেবল শব্দ হচ্ছে টিক-টিক-টিক।

কথা বলার কোনো ক্ষমতাই আর নেই জাকারিয়ুসের। প'ড়ে গেছেন তিনি মেঝেয়, শুষ্ক হ'য়ে গেছে যেন তাঁর সর্বাঙ্গ, একেবারেই যেন আর্দ্রতাহীন—আর একটা ঘড়ঘড়ে ভাঙা গলায় তাঁর বুক দিয়ে কেবল এই কথাগুলি বেরিয়ে এলো : 'জীবন... বিজ্ঞান?'

আরো দুটি নতুন দর্শক এসে উপস্থিত হ'লো : ওবের আর সেই গির্জের যাজক। জাকারিয়ুস মেঝেয় প'ড়ে আছেন লম্বালম্বি : তাঁর পাশে ব'সে অবিরাম প্রার্থনা ক'রে চলেছে জেরাঁদ—সে যেন আর বেঁচে নেই, এমনই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

ঘণ্টা বাজার আগে যে শুষ্ক কর্কশ আওয়াজ জেগে ওঠে, হঠাৎ অতিকায়ভাবে সেই শব্দটা প্রতিধ্বনিত হ'লো চারদিকে।

লাফিয়ে উঠলেন মাস্টার জাকারিয়ুস!

'মধ্যরাত্রি!' চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন তিনি।

তৎক্ষণাৎ যাজকটি সেই পুরোনো ঘড়িটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন—

এবং মধ্যরাতের ঘণ্টা আর বাজলো না।

অপার্থিব এক যন্ত্রণায় আর্ত চীৎকার ক'রে উঠলেন জাকারিয়ুস : বুঝি তার প্রতিধ্বনি তৎক্ষণাৎ শোনা গেলো নরকের দিগন্ত থেকে দিগন্তে ; আর তিনি তাকিয়ে দেখলেন ঘড়ির ডায়ালে শেষ অনুশাসন ফুটে উঠলো :

'ঈশ্বরের সমান হ'য়ে ওঠবার চেষ্টা যে করবে, চিরকালের জন্য তাকে রসাতলে যেতে হবে।'

একটা যেন বাজ ফেটে পড়লো, এমনি শব্দ ক'রে ফেটে গেলো সেই পুরোনো ঘড়ি—আর ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো স্প্রিংটা, সহস্রবাঁকা ও পেঁচিয়ে-যাওয়া তারটি অদ্ভুতভাবে এঁকে-বেঁকে তালগোল পাকিয়ে গেলো কোনো অতিকায় সাপের কুণ্ডলীর মতো! বিধ্বস্ত সেই মানুষটি দৌড়ে গেলেন তার কাছে, ব্যর্থ চেষ্টা করলেন সেটা কুড়িয়ে নেবার, আর বারে-বারে ভাঙা গলায় ব'লে উঠলেন : 'আত্মা—আমার আত্মা—'

জ্যান্ত হ'য়ে উঠলো যেন সেই তারের কুণ্ডলী : লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠলো মেঝেয়, একবার এপাশে, একবার ওপাশে, আর তিনি কিছুতেই তার নাগাল পেলেন না।

শেষকালে পিত্তোনাচ্চিয়ো সেটা কুড়িয়ে নিলে, তারপর ভীষণ এক পাপবাক্য উচ্চারণ ক'রে যেন মাটি ভেদ ক'রে কোনো অতল গহ্বরে ঢুকে পড়লো।

চিৎ হ'য়ে প'ড়ে গেলেন মাস্টার জাকারিয়ুস। তাঁর দেহে আর প্রাণ নেই।

আন্দেরনাৎ-এর গিরিচূড়াতেই সমাহিত করা হয়েছিলো বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতাকে।

তারপর ওবের আর জেরাঁদ ফিরে এসেছিলো জেনিভায়। ঈশ্বর তাদের দীর্ঘজীবন দিয়েছিলেন : আর যতদিন তারা বেঁচেছিলো এই দিগ্‌ভ্রান্ত বিজ্ঞানসাধকের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করাটা তারা এর পরে তাদের নিত্যকর্মে পরিণত করেছিলো।

———